হৃষীকেশ সিরিজ নং ২৮

পরাজিত জার্ম্মানি

"বাড়তির পথে বাঙালী"-প্রণেতা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক

১৯৩৫

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সী,
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

বার্লিনের পথে

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রুশিয়ানদের জীবন-কেন্দ্র

(সেপ্টেম্বর ১৯২১)

তৃতীয় অধ্যায়

জার্ম্মাণ কুল্টুরে হাতে খড়ি

চতুর্থ অধ্যায়

দুনিয়ার জার্ম্মাণ-সমস্যা

পঞ্চম অধ্যায়

জার্ম্মাণি ১৯২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্পস্ পাহাড়

(অক্টোবর-নবেম্বর ১৯২২)

সপ্তম অধ্যায়

ভিয়েনায় দিনকয়েক

(নবেম্বর ১৯২২)

অষ্টম অধ্যায়

ব্যাভেরিয়ায় মোসাফিরি

নবম অধ্যায়

গ্যেটে-শিলারের কর্ম্মভূমি

দশম অধ্যায়

সত্যাগ্রহের যুগে

(জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ১৯২৩)

একাদশ অধ্যায়

স্যাক্‌সন-নগর ড্রেসডেন

দ্বাদশ অধ্যায়

পরাজিতের ক্রমপতন

(অক্টোবর-নবেম্বর ১৯২৩)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

টিরোলী আল্পসের তালে-তালে

(জুলাই ১৯২৪)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জার্ম্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ

(১৯২৪)

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্যাভেরিয়ার মফঃস্বল

ষোড়শ অধ্যায়

মিউনিক (আগষ্ট ১৯২৪)

সপ্তদশ অধ্যায়

বার্লিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জার্ম্মাণ জাতের হিট্‌লার-রাজ

(১৯৩৪ জানুয়ারি)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

"নয়া সাম্রাজ্য"-গ্রন্থাবলী

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জার্ম্মাণি-মুখো ভারত ও ভারত-মুখো জার্ম্মাণি

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

পরাজিত জার্ম্মাণির শ্বাস-প্রশ্বাস (১৯১-৩৫)

চিত্রসূচী

২০। "ডয়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ্‌" দৈনিকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ
২১। স্প্রেভাল্ডের মেয়ে,—বিয়ের পোষাকে
২২। ,, —পল্লীবেশে
২৩। হাগেলডোর্ফের মেয়ে,—পোষাকী বেশে
২৪। ব্যিকেবুর্গের ,, ,, ,,
২৫। ফ্রাঙ্কফোর্ট,—"ই-গে" রঙের কারখানার শাসন-দপ্তর
২৬। ন্যির্ণব্যর্গ্‌,—বাজার
২৭। ভাইমার,—কবিবর গ্যোটের লেখাপড়ার ঘর
২৮। য়েনা
২৯। শ্রীমতী হেড্‌ভিগ হাইল
৩০। রাইখ্‌ষ্টাগের মহিলা-মেম্বার গ্যট্রুড্‌ ব্যয়মার
৩১। গ্রন্থ-বিনিময়ের বৃত্তান্ত (১৯২২)
৩২। বার্লিনে নব্য ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর বৃত্তান্ত (১৯২৩)
৩৩। অস্ত্রচিকিৎসক বিয়ার
৩৪। অর্থশাস্ত্রী শুমাখার
৩৫। ভারতশাস্ত্রী ল্যিডার্স
৩৬। ,, য়োলি
৩৭। পাস্‌সাও
৩৮। লাণ্ড্‌স্‌হুট
৩৯। ভিয়েনা,—অপেরা-ভবন
৪০। ভিয়েনা,—বাজার
৪১। বোৎসেন (দক্ষিণ টিরোল, ইতালি),—হাসপাতাল
৪২। ইন্‌স্‌ব্রুক,—মারিয়া টেরেজিয়েন শড়ক
৪৩। ইন্‌স্‌ব্রুক (টিরোল),—অষ্ট্রিয়া

৬৫। মহিলা-পরিষদের এল্‌জে ফ্রোবেনিয়ুস
৬৬। লেখিকা লুলু ডিভেরিথ্‌স্‌
৬৭। মিউনিক,—বিয়ার-ভবন
৬৮। শুপ্লাট্‌লার নাচ
৬৯। চিত্রশিল্পী নোল্‌ডের "মাডোনা"
৭০। চিত্রশিল্পী হান্‌স্‌ টোমা (১৮৩৯-১৯২৪)
৭১। ড্রেস্‌ডেনের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থকারের বক্তৃতা (১৯৩১)
৭২। ড্রেসডেন,—টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
৭৩। লোকপ্রিয় জননায়ক যতীন্দ্রনাথ বসু
৭৪। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭৫। মিউনিক,—ডয়চেস মুজেয়ুম
৭৬। মিউনিক,—জলের ফোয়ারা
৭৭। "সোন্‌টাগ্‌স্‌পোষ্ট" পত্রিকায় গ্রন্থকারের মতামত আলোচনা (মিউনিক, ৬ এপ্রিল ১৯৩০)
৭৮। "ম্যিন্‌চেনার ৎসাইটুঙ" পত্রিকায় গ্রন্থকারের মতামত আলোচনা (১৩ মে, ১৯৩০)
৭৯। গীতি-কবি ষ্টেফান গেওর্গে
৮০। শিল্পনায়ক আউগুষ্ট্‌ টিস্‌সেন
৮১। ষ্টুট্‌গার্ট্‌ ইন্‌স্‌ব্রুক-ভিয়েনা-বার্লিনে গ্রন্থকারের বক্তৃতা
৮২। গ্রন্থকারের নিকট মিউনিকের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রী ডর্ণের বিদায়-অভিবাদন (১২ মার্চ্চ ১৯৩১)
৮৩। কাশীবিদ্যাপীঠ-প্রতিষ্ঠাতা "ভাইয়া" শিবপ্রসাদ গুপ্ত
৮৪। যন্ত্রনিষ্ঠ শিল্পবাণিজ্যে উৎসাহশীল ইতিহাসসেবী নরেন্দ্রনাথ লাহা
৮৫। মাইসেন

৮৬। ভিয়েনার অর্থ-রাষ্ট্র-সমাজশাস্ত্রী ওথ্মার স্পান

৮৭। "জীমেন্স্-নগর" (বার্লিন)

৮৮। "আ-এ-গে" বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারখানা (বার্লিন)

৮৯। ন্যুর্ন্ব্যর্গের "ফ্রেঙ্কিশার কুরিয়ার" পত্রিকায় গ্রন্থকারের মতামত সমালোচনা (এপ্রিল ১৯৩১)

৯০। সপরিবারে গ্রন্থকার (কলিকাতা, জুলাই ১৯৩৪)

৯১। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ক্লিঙ্গেনব্যর্গ

৯২। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ডীজেল

৯৩। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট সেনাপতি ফোন হিণ্ডেনবুর্গ

৯৪। জার্ম্মাণি-বিজেতা আডোল্ফ্ হিট্লার

হৃষীকেশ সিরিজ নং ২৮

পরাজিত জার্ম্মানি

"বাড়তির পথে বাঙালী"-প্রণেতা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক

হৃষীকেশ সিরিজ

১৯৩৫

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সী,
৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা

মূল্য ছয় টাকা।

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন হইতে
ক রঘুনাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

যুবক বাঙলার
করকমলে—

শত সহস্র শক্তিযোগী যে চাহিছে সতেজ দুনিয়া,
হাত-শির যার হেলায় টানিবে বিপুল বিশ্ব-হিয়া।
চুমুক লাগাবে পুরাতন গ্রীসে, মিশরে ও এশিয়ায়,
জাপানী-জার্ম্মাণ-ইংরেজে আর ইয়োরামেরিকায়।
স্রধু স্বদেশের মাপকাঠি নিয়ে বিচার চাহে না শক্তিবীর,
তার বিদ্যাবুদ্ধি হবে নিরূপিত করে বিংশ শতাব্দীর।
হজম করে যে বিদেশকে বেশী সেই ত স্বদেশী খাঁটি,
ঘরোআ বুখুনি ছাড়িয়া দেখাবে লাখ কাজ পরিপাটি।

বিনয় সরকার (তোকিও, আগষ্ট ১৯১৬)।

কলিকাতা,
মার্চ্চ, ১৯৩৫।

ভূমিকা

"বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলী

এই বইটা লেখকের "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর অষ্টম খণ্ড। "বর্ত্তমান জগৎ" নামক বইগুলা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকের মারফৎ প্রকাশিত হইয়াছে। খণ্ডগুলা পরপর বাহির হয় নাই। সংখ্যা হিসাবে যে বইটা পরে, কাল হিসাবে সেইটা হয়ত আগে বাহির হইয়াছে। এই কারণে সংখ্যা হিসাবে অষ্টম হইয়াও "পরাজিত জার্ম্মাণি" কাল হিসাবে সকলের পশ্চাতে বাহির হইল।

অধিকন্তু বইগুলা গ্রন্থাকারে বাহির হইবার সময় আমি নানা দেশে ছিলাম। কোনোটার সময়ে ছিলাম বিলাতে, কোনোটার সময়ে ছিলাম ফ্রান্সে ইত্যাদি। প্রকাশক আর ছাপাখানার সুবিধা অনুসারে বইগুলা বাহির হইয়াছে বলিয়া "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলী উল্টা-পাল্টারূপে সংসারে দেখা দিয়াছে। তাহা ছাড়া অনেক পাঠকের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহারা একমাত্র জাপান বিষয়ক বইটাকে "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থ বলিয়া জানেন। কাহারো-কাহারো চিন্তায় "ইংরেজের জন্মভূমি" গ্রন্থই "বর্ত্তমান জগৎ"।

দেখা যাইতেছে যে, "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর মায় আকার-প্রকার আর নাম-ধাম এবং সংখ্যা লইয়াই গোলযোগ সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পাঠকদের আর বইয়ের দোকানদারদের ত কথাই নাই, স্বয়ং গ্রন্থকারের মাথায়ই বইগুলার সংখ্যা, নাম ও আকার-প্রকার লইয়া হ-য-ব-র-ল উপস্থিত হয়। এই সকল দুর্দ্দৈব নিবারণ করিবার জন্য "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর আগাপাছা, বহর, প্রথম প্রকাশের বৎসর আর খণ্ড-বিভাগ নিম্নে দেখানো যাইতেছে :—

(১) কবরের দেশে দিন পনর, মিশর (১৯১৫, ২১০ পৃষ্ঠা), (২) ইংরাজের জন্মভূমি (১৯১৬, ৫৮৬ পৃঃ), (৩) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (১৯১৫, ১৩০ পৃঃ), (৪) ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ (১৯২৩, ৮২৪ পৃঃ), (৫) নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, জাপান (১৯২৭, ৪৮৫ পৃঃ), (৬) বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য (১৯২৮, ৪৫০ পৃঃ), (৭) প্যারিসে দশ মাস (১৯৩২, ৩১২ পৃঃ), (৮) পরাজিত জার্ম্মাণি (১৯৩৫, ৭০০ পৃঃ), (৯) সুইট্‌স্যার্ল্যাণ্ড (১৯৩০, ৭৫ পৃঃ), (১০) ইতালিতে বার কয়েক (১৯৩২, ৩০২ পৃঃ), (১১) দুনিয়ার আবহাওয়া (১৯২৫, ২৭৬ পৃঃ), (১২) নবীন রুশিয়ার জীবন প্রভাত (১৯২৪, ১০০ পৃঃ)।

অর্থাৎ "বর্ত্তমান জগৎ" বারখণ্ডে সম্পূর্ণ, ৪,৪৫০ পৃষ্ঠার মাল। বইগুলা ঢালিয়া এক সঙ্গে এক বহরে ছাপিতে চাহিলে মোটের উপর বড়-বড় চারখণ্ডে প্রকাশ করা সম্ভব। কোনো প্রকাশক এই দিকে লক্ষ্য রাখিলে ১৯২৩ সনে প্রকাশিত "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ" বইটা ষষ্ঠ খণ্ডের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারেন। অধিকন্তু একাদশ আর দ্বাদশ খণ্ডও এক সঙ্গে গাঁথিয়া দেওয়া চলিবে।

একুশ বৎসরের ফিরিস্তি (১৯১৪-৩৫)

এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠা লেখা হইয়াছিল "ডায়েরি" স্বরূপ,—১৯১৪ সনের ৮ই এপ্রিল তারিখে। তখন সওয়ারি ছিলাম বোম্বাইয়ের মিশরমুখো ফরাসী জাহাজে। আর আজ এই গ্রন্থাবলীর শেষ ভূমিকা লিখিতেছি কলিকাতায় বসিয়া ১৯৩৫ সনের মার্চ্চ মাসে। একুশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। এই একুশ বৎসরে একুশ শ' ঘাটের পানি পেটে পড়িয়াছে। একুশ শ' রকমের সু-কু হজম করিয়াছি। একুশ শ' সমাজের আওতায় বা কম-সে-কম আবহাওয়ায় ওলট-পালট খাওয়া গিয়াছে। এখনো খাড়া আছি বলিয়া বার-তেরখানা বইয়ের

নাম এক সঙ্গে এক তালিকার অন্তর্গত করিবার সুযোগ পাইতেছি, আর সঙ্গে-সঙ্গে হাজার-হাজার দেশী-বিদেশী বন্ধুকে "যথানামগোত্রা" রূপে কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারিতেছি। বইগুলার "নাম" একত্র করিলাম বলিতেছি, কেন না বইগুলা সব একসঙ্গে আজও চোখে দেখি নাই। যাহা হউক, বইগুলা কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়। অন্ততঃ পক্ষে এইগুলা যে কোনো দিন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকাশকেরা নিশ্চয়ই তাহা বলিতে পারিবেন। তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহারা আমার অনুপস্থিতির সময়ও মেহনৎ করিয়া লেখাগুলাকে বইয়ের আকারে বাজারে বাহির করিয়াছিলেন।

পত্রিকাসেবীদের দান

অন্যান্যের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি বিশেষভাবে পত্রিকা-সেবীদের কথা বলিতেছি। ১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসে বোম্বাই ত্যাগ হইতে ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রবাসের পর কলিকাতায় ফিরিয়া অস্া পর্য্যন্ত প্রায় বার বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশের বহুসংখ্যক পত্রিকায় এই অধমের লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। এমন-কোনো মাস বা কখনো-কখনো এমন কি এমন-কোনো সপ্তাহ ছিল না যে-সময়ে সম্পাদকেরা আমার রচনা নিজ পত্রিকায় ছাপেন নাই। দেশে ফিরিয়া আসিবার পর কাহারো-কাহারো নিকট শুনিয়াছি :—"আরে, তুই দেশের বাইরে ছিলি কবে? তুই বাইরে গেলিই বা কবে আর ফির্‌লিই বা কবে? তোকে ত আমরা কল্‌কাতার রাস্তায়-রাস্তায় রোজ দেখেছি?" এই কথার ভিতর কিছু রহস্য ছিল সন্দেহ নাই। জিজ্ঞাসা করায় জবাব পাইয়াছি নিম্নরূপ,—"যে-কোনো মাসিক কাগজ খুল্‌লেই দেখ্‌তাম আমরা তোর লেখা। তুই ঠিক যেন আমাদের সঙ্গে বসে রোজের পর রোজ গল্প বলে' যেতিস।"

এইরূপ বৃত্তান্তে কিছু অত্যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু বাঙালী সম্পাদকেরা যে তাঁহাদের পত্রিকার জন্য এই গ্রন্থকারকে পরম আত্মীয় বিবেচনা করিয়া সস্নেহ স্থান দিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ।

পত্রিকাগুলার এ-দল, ও-দল, সব-দল আমার সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। ছোট-বড়-মাঝারি কোনো পত্রিকাই এই লেখককে বর্জ্জনীয় বিবেচনা করেন নাই। ইহা খুব বরাতের জোর। "গম্ভীরা" (মালদহ), "গৃহস্থ," "উপাসনা", "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "মানসী ও মর্ম্মবাণী", "ভারতী", "নব্যভারত," "সাহিত্য", "বসুমতী", "বঙ্গবাণী" (মাসিক), "শঙ্খ", "বিজলী", "সারথি", "শিশির", "আত্মশক্তি", "প্রভাতী", "আনন্দ বাজার" ইত্যাদি পত্রিকার নাম মনে পড়িতেছে। তাঁহাদের সকলকেই এবং অন্যান্যকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিদেশে থাকিবার সময় পত্রিকা-পাঠকদের নিকট হইতে নানা প্রকার চিঠি পাইতাম। কেহ বলিতেন :—"অমুক লেখা পড়িয়া আমি বিজ্ঞান-গবেষণায় ঝুঁকিয়াছি।" কেহ বলিতেন :—"শিল্প-বাণিজ্যে মাথা খেলাইবার খেয়াল অমুক লেখা পড়িবার পর জাগিয়াছে।" কাহারো চিঠিতে দেখিতাম :—"ঐ লেখাটায় ধনবিজ্ঞান-গবেষণার জন্য নতুন আলোচনা-প্রণালী পাইলাম।" কাহারো চিঠিতে থাকিত :—"ভুগোল-চর্চ্চা কাহাকে বলে এইবার বুঝিতে সুরু করিলাম।" কবি, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, সাহিত্য-সমালোচক, উকিল, চিকিৎসক, কবিরাজ, ব্যবসায়ী, এঞ্জিনিয়ার, দর্শন-গবেষক, ধর্ম্মপ্রচারক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, অর্থ-শাস্ত্রী, ইস্কুল-মাষ্টার, সংবাদপত্রসেবী ইত্যাদি নানা পেশার প্রতিনিধি আর নানা বিদ্যার সেবক উৎসাহের সহিত লিখিয়া জানাইতেন যে, তাঁহারা পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের রচনাবলী হইতে জীবনের খোরাক কিছু-কিছু পাইয়াছেন।

আর তাহা ছাড়া, দেশবিদেশে ভবঘুরেগিরি করিবার নেশায়

মস্‌গুল হইয়া কত লোক যে কত কথা লিখিতেন তাহার হিসাব করা কঠিন। বস্তুতঃ যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে বিদেশে গিয়াছেন তাঁহাদের কেহ-কেহ বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিদেশ-গমনের পশ্চাতে বিরাজ করিতেছে এই গ্রন্থকারের লেখালেখি।

বাঙ্‌লা দেশে আজকাল যাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্ম্মকাণ্ডে নানা প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং আন্দোলন চালাইতেছেন তাঁহাদের কাহারো-কাহারো মুখে দেশে ফিরিয়া আসিবার পর শুনিয়াছি যে, এই সমুদয়ের অনেক-কিছুর আত্মিক সূত্রপাত কথঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে পত্রিকায়-পত্রিকায় প্রকাশিত "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন রচনার ভিতর।

এই সকল কথা মনে রাখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, বাঙালী সম্পাদকেরা একমাত্র লেখকেরই নয়, গোটা পাঠক-সমাজেরও কৃতজ্ঞতার পাত্র। কালটা নেহাৎ অল্পও নয়,—প্রায় বার বৎসর,—বিপুল যুগ বিশেষ। বঙ্গসমাজকে এত লম্বা মেয়াদের সেবা করা যে-বাহনের সাহায্যে সম্ভবপর হইয়াছে সেই বাহনের নিকট বিনীতভাবে মাথা নোয়াইতেছি।

প্রথম উচ্ছ্বাসে পত্রলেখকেরা অথবা প্রথম সাক্ষাতের আনন্দে মোলাকাৎকারীরা "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর নিকট যে-সকল ঋণ স্বীকার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভিতর খানিকটা বন্ধুত্ব-সুলভ আতিশয্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই সকল বৃত্তান্তের ভিতর ঝড়্‌তি-পড়্‌তি যে-টুকু সাচ্চা মাল বাকি থাকে তাহাতে বুঝা যায় যে, পত্রিকা-সম্পাদক ইত্যাদি সুধীবর্গের নিকট আমি প্রচুর পরিমাণে ঋণী। তাঁহাদের দান সম্বন্ধে নির্ব্বিকার থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ আমার বিবেচনায় বাঙলাদেশের পত্রিকা ও সংবাদপত্র একটা বিপুল শক্তিকেন্দ্র। এই শক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের

সম্মান ইজ্জদ্ দেওয়া আমার দস্তর। বস্তুতঃ পত্রিকাও সংবাদপত্রসমূহকে আমি অন্যতম অনামী বা অজানা বা অস্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়রূপে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকি। দরবারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপর এই ধরণের অস্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলার প্রভাব খুব জবর। অনামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যাহা-কিছু সুরু করে তাহার অনেক-কিছু পাঁচ-সাত-দশ-পনর বৎসর পর দরবারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির ভিতর ঠাঁই পায়। দরবারীরা অনামীদের পেছন-পেছন চলে,—দুনিয়ার সর্ব্বত্র।

"বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর সঙ্গে-সঙ্গে বাংলায় এবং ইংরেজিতে অন্যান্য বইও লেখা হইতেছিল। সেই সমুদয়ের মালও বিদেশে এবং স্বদেশে পত্রিকার মারফৎ প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু সেই সকল পত্রিকা সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছু বলিবার দরকার নাই। "বর্ত্তমান জগৎ"-বইগুলার বোঝা ঘাড় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার সময় একমাত্র এই সম্পর্কে যতপ্রকার ঋণ আছে তাহার কিছু-কিছু শোধ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

বিশ্বশক্তির আরাধনা

"বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলী লেখকের "দিনলিপি" বা "রোজনামচা" বিশেষ। বইগুলার মলাটের ভিতর কি কি মাল আছে এই বিষয়ে নতুন-করিয়া কিছু বলা অনাবশ্যক। হনুমানের গন্ধমাদন-গবেষণা যে চিজ এই লেখকের পক্ষে বর্ত্তমান জগৎ-গবেষণা ও সেই চিজ। অর্থাৎ গোটা দুনিয়াটাকে উপ্ড়াইয়া আনিয়া হাজির করিয়াছি বঙ্গজননীর পায়ে।

দুনিয়ার সর্ব্বত্র আমি ঢুঁড়িয়াছি জীবন, জীবন-বেদ, জীবনের বাড়তি ভারতের জন্য, বাঙালী জাতির জন্য বিদেশে বসিয়া রপ্তানি করিয়াছি জীবন, জীবন-বেদ, জীবনের বাড়্তি। ধর্ম্ম পাঠাইয়াছি, অর্থ পাঠাইয়াছি, কাম পাঠাইয়াছি, মোক্ষ পাঠাইয়াছি। ভারত-

বাসীর পাতে-পাতে তথ্য পরিবেষণ করিয়াছি, তত্ত্ব পরিবেষণ করিয়াছি, সংখ্যা পরিবেষণ করিয়াছি, আলোচনা-প্রণালী পরিবেষণ করিয়াছি, বইয়ের তালিকা পরিবেষণ করিয়াছি, প্রমাণ-পঞ্জী পরিবেষণ করিয়াছি, আর কিছু-কিছু হেঁয়ালিও পরিবেষণ করিয়াছি। এই সমুদয় হইতে কেহ বাছিয়া লইয়াছে সিদ্ধান্ত, কেহ পাইয়াছে সূত্র, কেহ উদ্ধার করিয়াছে 'ইঙ্গিত', কেহ আবিষ্কার করিয়াছে সমস্যা, কেহ দখল করিয়াছে কর্ম্মকৌশল,—যার যেমন মর্জ্জি, মগজ ও মুরোদ।

১৯১১ সনে বিজ্ঞানবীর জগদীশচন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের ময়মনসিংহে-অধিবেশনে "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানব-জাতির আশা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে ছিল বিশ্বশক্তি-গবেষণার সূত্রপাত। এই রচনার ইংরেজি সংস্করণ ১৯১২ সনে লংম্যান্‌স্ গ্রীণ অ্যাণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক লণ্ডনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই আবহাওয়ায় ১৯১২-১৪ সনে "গৃহস্থ"-পত্রিকার মারফৎ 'বিশ্বশক্তি'-গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় বাহির করিতেছিলাম।

১৯১১-১৪ সনে বিশ্বশক্তির বিশ্লেষণ করিতে করিতেই সমুদ্র পাড়ি দেওয়া হইয়াছিল। সেই বিশ্লেষণের সঙ্গেই বিদেশগমন গাঁথা ছিল। বর্ত্তমান জগৎ বিষয়ক গবেষণা আমার নিকট বিশ্বশক্তির আরাধনা বিশেষ। একাধারে ইহা আমার জীবনে বিদ্যাচর্চ্চাকে বিদ্যাচর্চ্চা আর স্বদেশ-সেবাকে স্বদেশ-সেবা। দেখা যাইতেছে যে, "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর ভিতর বিদ্যাচর্চ্চা আর স্বদেশ-সেবা যে মূর্ত্তি পাইয়াছে সেই মূর্ত্তি ইতিমধ্যে যুবক বাঙলার আর সমগ্র যুবক ভারতেরও মহলে-মহলে কিছু-কিছু উদ্দীপনা জোগাইয়াছে। এই কথা লেখকের পক্ষে যার পর নাই সৌভাগ্যের কথা। এই সঙ্গে আরও দু'একটা কথা প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে।

এই অধমের মুদ্রিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থ সমূহের মাল্ দেশ-বিদেশের

পত্রিকায় অপর কোনো-কোনা ভারত-সন্তানের নামে পূরাপূরি ছাপা হইয়াছে দেখিয়াছি। লেখককে এইরূপ "বেমালুম গাপ" করিবার মত লোক মাঝে-মাঝে এখনো নজরে পড়ে। অধিকন্তু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ভারতীয় পণ্ডিতের লেখা এমন টেক্‌ষ্ট্‌বুক ও ব্যবহৃত হইতেছে যাহার ভিতর এই গ্রন্থকারের কেতাব হইতে মাল উদ্ধৃত হইয়াছে। অথচ ঘটনাচক্রে উদ্ধৃত অংশের লেখক হিসাবে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। উল্লেখ করা হইয়াছে অন্য একজনের নাম! এই দৃশ্যও চিত্তাকর্ষক। এই ধরণের তথ্য হইতে বুঝা যায় যে, লেখকের অকিঞ্চিৎকর গবেষণাগুলা দেশের ও দুনিয়ার কাজে লাগিতেছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে "পরের দ্রব্য না বলিয়া লইয়া" তাঁহারা লেখকের বিদ্যাসেবার এবং স্বদেশসেবার সুযোগই আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ দিতেছি। আর যাঁহারা এই লেখককে উল্লেখ করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ত কৃতজ্ঞ বটেই।

১৯০৫ সনে বিলাত যাইবার সহায়ক সরকারী "ষ্টেট স্কলার্শিপ" নামক ছাত্রবৃত্তি পাওয়া গিয়াছিল,—কিন্তু লওয়া হয় নাই। অথচ পরে অল্প কয়েক বৎসরের ভিতরেই,—১৯১০ ও ১৯১১ সনে, মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি ও বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সংশ্রবে,—পনর জন বাঙালী যুবাকে বিদেশে পাঠাইবার সৌভাগ্য জুটিয়াছিল। তাহা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক বাঙালী-অবাঙালীকে বিদেশ-পর্য্যটনের এবং বিদেশে বসবাসের ব্যবস্থায় সাহায্য করা বা হদিশ দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। অধিকন্তু নিজের কপালেই দুইবারে চৌদ্দ বৎসরব্যাপী দুনিয়া-মন্থনের যোগও দেখা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে লেখালেখির মারফৎ হাজার-হাজার বাঙালী-অবাঙালীর ভিতর দুনিয়া-পর্য্যটনের ফলাফল নিত্য-নৈমিত্তিকরূপে বাঁটিতে পারিয়াছি।

বিদেশ-পর্য্যটন পূর্ব্বে পয়সাওয়ালা লোকের অনেকটা যেন

বিলাস-সামগ্রী ছিল। এই দুরবস্থা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিবার মতলবে "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর রচনা সমূহের মারফৎ দেশবিদেশকে রামা-শ্যামার দুয়ারে-দুয়ারে আনিয়া ফেলিতে সচেষ্ট ছিলাম। প্রবাস-জীবন, প্রবাসের অভিজ্ঞতা, ইয়োরামেরিকা, এশিয়ার চীন-জাপান, আফ্রিকার ঈজিপ্ট ইত্যাদি মুল্লুক সম্বন্ধে গল্পগুজব আজকাল আর একমাত্র বড়-লোকদের "চালবাজি" নয়। বিদেশ, বিদেশী কাহিনী, বিদেশের সু-কু আজকাল বাঙালী গৃহস্থের সনাতন হেঁসেল-ঘরের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে বিদেশ-পর্য্যটনকে ধনতন্ত্রের আওতা হইতে গণতন্ত্রের আওতায় আনিয়া খাড়া করানো লেখকের অন্যতম ধান্ধা ছিল। বিদেশ-বিষয়ক অভিজ্ঞতাসমূহকে মামুলি বাঙালীর চিন্তায় মুড়ি-মুড়্‌কির মতন শস্তা করিয়া ছাড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। হয়ত তাহাতে কিছু-কিছু সুফল ফলিয়াছে।

অনেক ভারতসন্তান এই সমুদয় রচনাবলীর সংস্পর্শে আসিয়া,—দুধের সোআদ ঘোলে মিটাইবার মত,—বর্ত্তমান জগৎকে যেন খানিকটা স্বচক্ষেই দেখিতে সমর্থ হইয়াছে। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায়ও কেহ-কেহ এই সমুদয় হইতে কিছু-কিছু সাহায্য পাইয়াছে। "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর শেষ ভূমিকা লিখিবার উপলক্ষ্যে এই সকল কথা উল্লেখযোগ্য। কাজেই ১৯৩৫ সনেও ১৯০৫ সনের সুবুদ্ধিকে প্রণাম করিতেছি।

এই বিপুল সাধনা বহুসংখ্যক বন্ধুর সহযোগিতায় সম্ভবপর হইয়াছে। অসংখ্য বাঙালী আর অন্যান্য ভারতবাসীর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ একথা বলিলে পূরাপূরি সব-কিছু বলা হইল না। কেননা আফ্রিকার ঈজিপ্ট হইতে এশিয়ার চীন-জাপান পর্য্যন্ত আর ইয়োরামেরিকার বিলাত হইতে ইতালি ও সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশের ডজন-ডজন, এমন কি শত-শত নরনারীর আত্মিক এবং অন্যান্য সাহায্য না পাইলে

বিশ্বশক্তির আরাধনা এবং বর্ত্তমান জগৎ-গবেষণা পরিপূর্ণ হইত না। গোটা দুনিয়াই আমাকে নিমক জোগাইয়াছে। কাজেই গোটা দুনিয়া আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

জার্ম্মাণ-জাতের সওয়া ষোল বৎসর

(১৯১৮-৩৫)

প্রথম প্রবাসের প্রায় বার বৎসরের ভিতর ১৯২১ সনের আগষ্ট হইতে ১৯২৪ সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত তিন বৎসর জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া (জার্ম্মাণ), এবং সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড ও ইতালির (দক্ষিণ টিরোলের) জার্ম্মাণ সমাজে কাটিয়াছিল। এই "পরাজিত জার্ম্মাণি"-গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায় পর্য্যন্ত (৫২৬ পৃষ্ঠা) সবই সেই সময়কার রচনা।

তাহার পর আর একবার জার্ম্মাণিতে প্রবাস ঘটিয়াছিল। ১৯২৯ সনের জুন হইতে ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সওয়া দুই বৎসরের অধিকাংশ সময় জার্ম্মাণিতে কাটিয়াছিল। এই দ্বিতীয় প্রবাস সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে কিছু স্মৃতি-কথা বিবৃত করা গিয়াছে। অধিকন্তু জার্ম্মাণি-বিষয়ক আরও কতকগুলা রচনা এই বইয়ের ভিতর জুড়িয়া দেওয়া গেল।

১৯১৮ সনে বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে পরাজয়ের পর হইতে ১৯৩৫ সনের জানুয়ারি মাসে সার-জনপদ ফিরাইয়া পাওয়া পর্য্যন্ত মোটের উপর ষোল-সতর বৎসরের জার্ম্মাণি এই বইয়ের আলোচ্য বস্তু। এই যুগের জার্ম্মাণিকে পরাজিত জার্ম্মাণি রূপে বিবৃত করিতেছি। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, অষ্ট্রিয়াকে সর্ব্বদাই জার্ম্মাণির সঙ্গে সামিল করিয়া লইয়াছি। অবশ্য রাষ্ট্র হিসাবে অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

ও ফ্রান্স উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। অর্থাৎ অষ্ট্রিয়া যাহাতে জার্ম্মাণির সঙ্গে "আন্শ্লুস্" ভোগ না করিতে পারে বা সংযুক্ত না হইয়া পড়ে এই ধান্ধায় ইয়োরোপ আজ ব্রতবদ্ধ হইতেছে।

বস্তুনিষ্ঠ জার্ম্মাণি-গবেষণা

অবশ্য জার্ম্মাণরা পরাজিত কি বিজেতা জাতি সেই সম্বন্ধে অতি-মাত্রায় ঘাঁটাঘাঁটি বা বিশ্লেষণ করা আমার জার্ম্মাণি-গবেষণার মতলব ছিল না। বিলাত, আমেরিকা, জাপান, চীন, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি দেশ সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান-প্রণালী চালাইয়াছি জার্ম্মাণি ও জার্ম্মাণ নরনারী সম্বন্ধেও সেই অনুসন্ধান-প্রণালীই চালানো গিয়াছে।

জীবনের কোনো অঙ্গ বাদ দিয়া চলা বর্ত্তমান লেখকের বিদ্যা-চর্চ্চার দস্তুর নয়। কাজেই কোনো দেশে গিয়া একচোখো, এক-তরফা অথবা একবগ্‌গা ভাবে একমাত্র রাষ্ট্রকে অথবা একমাত্র অর্থকে অথবা একমাত্র আত্মাকে লইয়া মাতামাতি করার দিকে মেজাজ কখনো খেলাই নাই। যেখানে যেমন সুযোগ ও সুবিধা জুটিয়াছে তখন সেখানে তেমন অনুসন্ধান-গবেষণা-লেখালেখির ব্যবস্থা করিয়াছি। সুতরাং আর্থিক জার্ম্মাণি, আত্মিক জার্ম্মাণি, সব-কিছুর সঙ্গেই ছোঁয়াছুঁয়ি ঘটিয়াছে। হরেক-প্রকার জার্ম্মাণ সমাজের অলিতে-গলিতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

জার্ম্মাণির পল্লীতে গিয়াছি, শহরে গিয়াছি, পাহাড়ে গিয়াছি, হ্রদে গিয়াছি, বনে গিয়াছি, দরিয়ায় গিয়াছি। জার্ম্মাণ চাষীর সঙ্গে ভাব করিয়াছি, জার্ম্মাণ মজুরের সঙ্গে ভাব করিয়াছি, জার্ম্মাণ মধ্যবিত্তের সঙ্গে ভাব করিয়াছি। মামুলি জার্ম্মাণের ধরণ-ধারণ দেখিয়াছি, নামজাদা জার্ম্মাণের ধরণ-ধারণ দেখিয়াছি। গরীব জার্ম্মাণের হাঁড়ির খবর রাখিয়াছি, পয়সাওয়ালা জার্ম্মাণেরও হাঁড়ির খবর রাখিয়াছি। জার্ম্মাণ কারখানায়-

ব্যাঙ্কে-বীমাভবনে-বণিকদপ্তরে গতিবিধি ছিল বেশ। জার্ম্মাণ গ্যালারি-মিউজিয়াম-প্রদর্শনীতে এবং গ্রন্থাগার-হাসপাতাল-পরিষৎ-পাঠশালায়ও আনাগোনা ছিল তদ্রূপ। গায়ক, বাদক, কবি, চিত্রশিল্পী, সাহিত্য-সমালোচক,—কোনো আসরেই বেরসিক ভাবে দেখা দিবার প্রয়োজন হয় নাই। অপর দিকে এঞ্জিনিয়ার মহলে, রাসায়নিক মহলে, বেপারী মহলে, লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলেও ঢুঁ মারিবার ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণেই ছিল।

দেখাশুনা, মোলাকাৎ, লেখাপড়া, তর্কাতর্কি যেখানে যাহা ঘটিয়াছে তাহার ছাপ বইয়ের ভিতর একপ্রকার রোজনামচার আকারে রাখিয়া দিয়াছি। প্রত্যেক বিষয়েই এক একটা ঢাউস বিশ্বকোস ঝাড়া সম্ভবপর নয়। সেইদিকে চেষ্টা করিও নাই। অধিকন্তু যখন-তখন নিজের মতামত, নিজ চোখের সমালোচনা, নিজের পছন্দসই দর্শনের বুখ্‌নি ঝাড়িয়া জার্ম্মাণির পল্লী-শহরকে অথবা পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে পাঠকের চোখ হইতে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করি নাই। পাঠকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ নরনারীর বস্তুনিষ্ঠ যোগাযোগ কায়েম করানো আসল উদ্দেশ্য রহিয়াছিল।

জার্ম্মাণিকে ভারতবাসীর কাজে—বিশেষ করিয়া বাঙালীর কাজে—লাগাইবার দিকে নজর ছিল তীক্ষ্ণ। জার্ম্মাণি খাইয়া ভারতসন্তান আর বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতি বৃহত্তর ও মহত্তর হউক এই ছিল আকাঙ্ক্ষা।

বস্তুতঃ, "বর্ত্তমান জগৎ" রচনার আসল মতলবই ছিল তাই। কোন্ দেশ হইতে ভারতের জন্য আর বিশেষতঃ বাঙলার জন্য কোন্ রস বা কোন্ বস্তু রপ্তানি করিলে ভারতবাসীর শরীর-মন-প্রাণ চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারে তাহার হদিশ সংগ্রহ ছাড়া বর্ত্তমান জগৎ-গবেষণার অন্য কোনো লক্ষ্য ছিল না। বর্ত্তমান জগৎ খাওয়াইয়া ভারতবাসীর

হাড়মাস বদলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা এই সকল গবেষণার এবং এই সমুদয় "ডায়েরি"র একমাত্র ধান্ধা।

এই মতলব প্রথম হইতে আঁটিয়া সাগরে তরী ভাসাইয়াছিলাম। কাজেই বাদ-বিচার করার দিকে আলোচনা-প্রণালীর প্রধান গতি ছিল না। আমার মেজাজে কি ভাল, কি মন্দ, কি গ্রহনীয়, কি বর্জ্জনীয় সেই বিষয়ের বিশ্লেষণ কোনো খণ্ডেরই মুখ্য আবহাওয়া জোগায় নাই। অবশ্য যে-সাহিত্য জন্মিয়াছে খোলাখুলি "রোজনামচা" হিসাবে অর্থাৎ প্রধানতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার "দিনলিপি"-রূপে সেই সাহিত্যের গায়ে সাহিত্য-স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ কিছু-কিছু অঙ্কিত হইয়া থাকিতে বাধ্য।

বার্লিনে বক্তৃতা (১৯২২)

অন্যান্য দেশের মত জার্ম্মাণিতেও বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম জার্ম্মাণ প্রবাসের সময় শিক্ষা-সচিব কার্ল্ বেক্কার, অর্থশাস্ত্রী শুমাখার, "ডয়চে রুণ্ডশাও"-সম্পাদক রুডল্ফ্ পেখেল, ভারতশাস্ত্রী ল্যিডার্স, যন্ত্রশাস্ত্রী মাচ্চস্স (উচ্চারণ মাট্‌শোস কখনো-কখনো), ভূগোলশাস্ত্রী ফোগেল, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (চ্যান্সেলার) গ্রীসশাস্ত্রী এডোয়ার্ড মায়ার, রাসায়নিক টোম্‌স্, শিক্ষাশাস্ত্রী রেম্মে, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক আলোআ ব্রাণ্ড্‌ল্, পদার্থশাস্ত্রী ড্যগেন ইত্যাদি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। এই সময়ে বার্লিনের যে-কয় কেন্দ্রে বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

১। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২২।

২। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এংলিশেস সেমিনার (ইংরেজি বিভাগ), ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২।

৩। "ডয়চে মর্গেনল্যেণ্ডিশে গেজেলশাফ্‌ট্" (জার্ম্মাণ প্রাচ্যতত্ত্ব পরিষৎ), ফেব্রুয়ারি, ১৯২২।

৪। ষ্টাট্‌স্‌-বিব্লিওটেকের (সরকারী গ্রন্থাগারের) "লাউট্‌-আবটাই-লুঙ" (ধ্বনি বিভাগ), ২২ মার্চ্চ ১৯২২।

৫। "ডয়চে গেজেলশাফ্‌ট্ ১৯১৪" (১৯১৪ সনে প্রতিষ্ঠিত জার্ম্মাণ সভা), ৩ এপ্রিল, ১৯২২।

বার্লিনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। আলোচ্য বিষয় থাকিত "বিশ্বসভ্যতায় ভারতবর্ষ" অথবা "আর্থিক ভারত ও বিশ্বদৌলৎ"। বক্তৃতা করিতে হইত জার্ম্মাণ ভাষায়। বার্লিনের দেখাদেখি জার্ম্মাণির নানাকেন্দ্র হইতে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। কিন্তু বার্লিনের বাহিরে গিয়া কোনোটাই রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। বক্তৃতাগুলার সুবিস্তৃত সারাংশ বার্লিনের বাহিরে ও জার্ম্মাণির বিভিন্ন জনপদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বার্লিনের পণ্ডিত-সমাজের নিকট গ্রন্থকারের ঋণ অশেষ। এই উপলক্ষ্যে প্রাচ্য-তত্ত্বের গবেষক ফোন ভেজনডঙ্ক, ফোন গ্লাজেনাপ ও নোবেল ইত্যাদি সুধীগণের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

মিউনিকে "অতিথি-অধ্যাপক"

(১৯৩০-৩১)

১৯২৯ সনের শীতকালে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জেনীভা নগরে থাকিয়া লীগ অব নেশ্যন্‌সের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে চাক্ষুষ অনুসন্ধান ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা চালাইতেছিলাম। এই বিষয়ে "জার্ণ্যাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স" পত্রিকার ১৯৩১ সনের জুন সংখ্যায় "দি জেনীভা কম্‌প্লেক্‌স ইন্ ওয়াল্‌ড্ ইকনমি" রচনায় বৃত্তান্ত দিয়াছি।

এই সময়ে ২২ নবেম্বর তারিখে মিউনিকের "ডয়চে আকাডেমী"

হইতে কর্ম্মকর্ত্তা ডক্টর টিয়ারফেল্ডার চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, ব্যাভেরিয়ার শিক্ষাসচিব ডয়চে আকাডেমীর প্রস্তাব অনুসারে গ্রন্থকারকে এক বৎসরের মেয়াদে মিউনিকের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ("টেখ্‌নিশে হোখ্‌শুলে"র) "গাষ্ট্‌-প্রোফেসর" (বা "অতিথি-অধ্যাপক") রূপে বাহাল করিতে চাহেন। এই পদ লইতে প্রস্তুত আছি কি না জানাইবার জন্য টেলিগ্রাফে জবাব দিবার অনুরোধ ছিল। জার্ম্মাণির স্বদেশী অধ্যাপকেরা যে-সকল আইন-কানুন মানিয়া চলিতে বাধ্য অতিথি-অধ্যাপকদেরকেও সেই সব আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়। যথাসময়ে মিউনিকে (১৯৩০ সনের ১৪ মার্চ্চ) ডয়চে আকাডেমীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হই। সেই চুক্তির সঙ্গে-সঙ্গে আকাডেমীর ভারতবিষয়ক "ইন্‌ষ্টিটিউটের" সূত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রবাসের সময় আমি প্রথমবারকার মতন স্বাধীন অর্থাৎ অবৈতনিক জীব ছিলাম না। কাজেই ছুটির জন্য দরখাস্ত করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই উপলক্ষে অনুগ্রহপূর্ব্বক ছুটি মঞ্জুর করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা লেখকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই ছুটি না পাইলে মিউনিকের পদ গ্রহণ করা সম্ভবপর হইত না। দুইবারই অবশ্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলাম। দ্বিতীয় প্রবাসের সময়ে এই পরিষদের অধীনস্থ অবৈতনিক "রেক্টর" পদও ছিল।

১৯৩০-৩১ সনে মিউনিকের "অতিথি-অধ্যাপক" হিসাবে কি সপ্তাহে দস্তুর-মাফিক ছাত্র-ছাত্রী পড়াইতে হইত অর্থাৎ ক্লাসে গিয়া বক্তৃতা করিতে হইত। বক্তৃতার বিষয় ছিল "আর্থিক ভারত ও বিশ্বদৌলৎ"। ক্লাসে সর্ব্বসমেত একাশীটা বিভিন্ন বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য সবই জার্ম্মাণ্‌ ভাষায়।

অধিকন্তু জার্ম্মাণির ও অষ্ট্রিয়ার নানা কেন্দ্রের টেক্‌নলজিক্যাল,

বাণিজ্য, কৃষি এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। যেগুলা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

১। য়েনা—অয়কেন-পরিষৎ (মে, ১৯৩০)।

২। কীল বিশ্ববিদ্যালয়—বিশ্বদৌলৎ-পরিষৎ (মে, ১৯৩০)।

৩। ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া)—রেডিওর সাহায্যে সমগ্র অষ্ট্রিয়ার জন্য বক্তৃতা (অক্টোবর ১৯৩০)।

৪। মিউনিক—রেডিওর সাহায্যে সমগ্র ব্যাভেরিয়ার জন্য বক্তৃতা (অক্টোবর, ১৯৩০)।

৫। ষ্টুটগার্ট—টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (নবেম্বর, ১৯৩০)।

৬। বার্লিন—কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় (নবেম্বর, ১৯৩০)।

৭। বার্লিন—জার্ম্মাণ বিশ্বদৌলৎ-পরিষৎ (নবেম্বর, ১৯৩০)।

৮। ইন্‌স্‌ব্রুক (অষ্ট্রিয়া)—বিশ্ববিদ্যালয় (নবেম্বর, ১৯৩০)।

৯। কার্ল্‌স্‌রুহে—টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (ডিসেম্বর,১৯৩০)।

১০। ন্যিনর্ব্যর্গ—বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয় (ডিসেম্বর, ১৯৩০)।

১১। বীলেফেল্ড—শিল্পবাণিজ্য-পরিষৎ (জানুয়ারি, ১৯৩১)।

১২। ভ্যিৎর্স্‌বুর্গ—শিল্পবাণিজ্য-পরিষৎ ও বিশ্ববিদ্যালয় (জানুয়ারি ১৯৩১)।

১৩। জোলিঙ্গেন (রাইন প্রদেশ)—যন্ত্রশিল্প-পরিষৎ (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১)।

১৪। লাইপ্‌ৎসিগ—বিশ্ববিদ্যালয় (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১)।

১৫। আউগ্‌স্‌বুর্গ—ডয়চে আকাডেমীর শাখা (মার্চ্চ, ১৯৩১)।

১৬। ড্রেসডেন—টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (জুলাই, ১৯৩১)।

প্রত্যেক বক্তৃতায় শ্রোতার দলের ভিতর দেখিতাম শহরের মেয়র হইতে সুরু করিয়া সকল মহলের নবীন-প্রবীণ প্রতিনিধি। ঘরগুলা

লোকে ভরা থাকিত। জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্রই ডাক পড়িয়াছিল। সর্ব্বত্রই বক্তৃতাগুলার সারমর্ম্ম সুবিস্তৃতরূপে বহু-সংখ্যক পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল।

১৯৩১ সনের দ্বিতীয় অর্দ্ধে স্যাক্সনির ড্রেসডেন ও লাইপৎসিগ এবং প্রুশিয়ার কোলোন ও বার্লিন কেন্দ্রে লেখকের জন্য "গাষ্ট্-প্রোফেসুর" অর্থাৎ অতিথি-অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং ইতালিতে আন্তর্জ্জাতিক লোকবল-কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ঘরমুখো মুসাফির।

প্রথমবার প্রবাসের সময় বার্লিনের মারফৎ সমগ্র জার্ম্মাণির নিকট যতটা ঋণী ছিলাম দ্বিতীয়বারকার প্রবাসের সময়ও মিউনিকের মারফৎ জার্ম্মাণ সমাজের নিকট আমার ঋণ ততটা। দুইবারই জার্ম্মাণ নরনারীর নিকট আত্মিক হিসাবে অনেক পাইয়াছি। মিউনিক কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাউসহোফার ও জোম্মারফেল্ড, টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রী ডর্ণ এবং যন্ত্রশাস্ত্রী প্রিন্‌ৎস্, ডয়চে আকাডেমীর ডক্টর টিয়ারফেল্ডার ইত্যাদি সুধীর সৌজন্যে বেশ-কিছু লাভবান হইয়াছি।

"ভাইয়া" শিবপ্রসাদ

একুশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসে পরবর্ত্তীকালের কাশী-বিদ্যাপীঠ-প্রতিষ্ঠাতা, দৈনিক "আজ"-প্রবর্ত্তক, "জ্ঞানমণ্ডল"-প্রকাশ-ভবনের ধুরন্ধর, স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত'র সঙ্গে বর্ত্তমান জগৎ মন্থন করিতে বাহির হইয়াছিলাম। তাহার অনেক আগে হইতেই, বস্তুতঃ ১৯১০ সনে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত "ভাইয়া" শিবপ্রসাদের নিকট দেশে-বিদেশে অনেক-কিছু পাইয়াছি। প্রথম প্রবাসের সাহচর্য্য সম্বন্ধে শিবপ্রসাদ আনন্দের সহিত

তাঁহার সুবৃহৎ "পৃথ্বী-প্রদক্ষিণা" নামক সচিত্র হিন্দী গ্রন্থে (কাশী, ১৯২৪) বহু তথ্য প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই সাহচর্য্যের আবহাওয়ায় যে সকল জল্পন-কল্পন চলিত তাহারই কিছু-কিছু ফল পরবর্ত্তীকালে তাঁহার স্বদেশ-সেবামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে মূর্ত্তি পাইয়াছে।

দ্বিতীয়বারকার প্রবাসও সপত্নীক শিবপ্রসাদের সাহচর্য্যেই ঘটিয়াছে (১৯২৯-৩১)। বিশেষ কথা, গ্রন্থকারের সৌভাগ্যে সপরিবারেই তাঁহাদের প্রবাসাতিথ্য জুটিয়াছিল।

জার্ম্মাণিতে পর্য্যটনের সময়ে ফ্রাঙ্কফোর্ট, কোলোন, ডুইসবুর্গ, বার্লিন ও মিউনিক নগরে একসঙ্গেই দেখাশুনা করিয়াছি। ফ্রাঙ্কফোর্টের "মাশিনেন-ফাব্রুক" (যন্ত্রকারখানা), কোলোন-ড্যয়ট্সের "মোটোরেন-ফাব্রুক" (বৈদ্যুতিক এঞ্জিন কারখানা), ডুইসবুর্গের "ডেমাগ" কোম্পানী (যন্ত্র-কারখানা), বার্লিনের "ক্লিঙ্গেনব্যর্গ" (বৈদ্যুতিক শক্তি ভবন), এবং মিউনিসিপ্যাল জলনিষ্কাসন বিভাগ ইত্যাদি কারবার-পরিদর্শনের সময় আমরা একসঙ্গেই বসবাস করিতাম। ভিয়েনা আর মিউনিকেও একত্র ছিলাম (অক্টোবর ১৯২৯)।

"বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠার প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই শিবপ্রসাদের সৌহার্দ্দ্য সুজড়িত। "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলী হইতে এবং এই গ্রন্থাবলী-প্রণেতার বিদ্যাচর্চ্চা আর স্বদেশসেবা হইতে যুবক বাঙ্‌লা অথবা যুবক ভারত যদি সামান্য-কিছুও পাইয়া থাকেন তাহার জন্য এই দানবীরের ভাবুকতা ও স্বদেশনিষ্ঠার প্রতি তাঁহাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এই প্রার্থনা।

চাই বৃহত্তর "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলী

১৯১৪ সনের তুলনায় আজকাল দেশও বড় হইয়াছে, দুনিয়াও বড় হইয়াছে। অতএব চাই বাঙালীর হাতে দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে আরও বড়-বড়

বই। আজ আবার নতুন করিয়া বর্ত্তমান জগৎ মন্থনের আয়োজন করা আবশ্যক। দেখিতেছি যে, বিশ্বশক্তিকে শক্ত ও নিরেট মুঠোয় পাকড়াও করিবার জন্য বাঙালী স্ত্রীপুরুষেরা বিদেশে বেশ খোলা চোখে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে চলাফেরা করিতেছে। একালের বাঙালী সমাজের কেহ-কেহ এই লেখকের বাতিক লইয়া গভীরতর ও বিস্তৃততররূপে বিভিন্ন বিদেশী সমাজের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ খুঁটিয়া-খুঁটিয়া বিশ্লেষণ করিতে সুরু করুন। দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বড়-বড় বই বাহির হইতে থাকুক। তাহা ছাড়া একখানা বৃহত্তর "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর গোড়াপত্তন চলিতে থাকুক। বাড়্তির পথে বাঙালীর জীবন-স্পন্দন স্বরূপ আবার কতকগুলা নতুন মূর্ত্তি গজিয়া উঠিবে। সেইসব নয়া-নয়া রূপ দেখিয়া বাঙ্লার নরনারী নতুন আশায় ও নতুন কর্ম্মমূলক উৎসাহে ভবিষ্যতের পানে চাহিতে পারিবে।

আজও বাঙালীর ভাষায় ডুয়ী, ভুণ্ট, ক্রচে, হবহাউস, বুত্রু বা টোন্নীস ইত্যাদি দর্শনসেবীদের চিন্তাসম্পদ বঙ্গসমাজে বিতরিত হইতেছে না। বাঙালী গবেষকেরা বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও পান্তালেঅনি, শ্মোল্লার, টাওসিগ বা এমন কি মার্শ্যালকেও বাংলা রচনার ভিতর আনিয়া খাড়া করিতে পারে নাই। হাউপ্ট্মান, মান্ৎসনি, আনাতল ফ্রাঁস ইত্যাদির ত' কথাই নাই, এমন কি দান্তে, গ্যেটে, ভিক্তর-উগো, ব্রাউনিং, হুইট্ম্যান ইত্যাদি সাহিত্যবীরগণ সম্বন্ধে তথ্যবহুল বাংলা গ্রন্থের লেখক বাঙালীর হাড়মাসে আজও দেখিতে পাইতেছি না। অপর দিকে জাপানী রাষ্ট্র, চীনা সাহিত্য, ফরাসী শাসনপ্রণালী, আর্থিক রুশিয়া, মার্কিণ বাণিজ্য, বিলাতী মজুর, জার্ম্মাণ সমাজবীমা, ইতালিয়ান ভূমিসংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙালী লেখকদের ক্ষমতা বাংলা ভাষায় এখনও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

"একালের" ভারত আর "একালের" দুনিয়া সম্বন্ধে বাঙালী

গবেষকেরা ইংরেজিতে আর বাংলায় যতটুকু চর্চ্চা করিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা যুবক বাঙলার পক্ষে লজ্জার কথা। এই মহলের দারিদ্র্য দূর করিবার মতলবে বাঙলার করিৎকর্ম্মা ভাবুকেরা উঠিয়া-পড়িয়া লাগুন। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সকল মহলেই চাই জোরের সহিত বর্ত্তমান-নিষ্ঠার জয়-জয়কার।

"বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর চীনখণ্ড "বর্ত্তমানযুগে চীন সাম্রাজ্য" নামে (১৯২৮ ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার আনুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। "পরাজিত জার্ম্মাণি"-খণ্ড ও তাঁহার আগ্রহেই প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটা একপ্রকার বেহাতই হইয়া গিয়াছিল। তিনি নানা-প্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহার উদ্ধারসাধন করিয়াছেন বলিয়া বইটা বাহির হইতে পারিল। তাঁহার সহযোগিতায় লেখক-প্রবর্ত্তিত চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালী পূর্ব্বে বেশ-কিছু পুষ্ট হইতে পারিয়াছে এবং এখনও পুষ্ট হইতেছে। এই বন্ধুত্বের জন্য আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

কলিকাতা,

৯ মার্চ্চ, ১৯৩৫।

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

বার্লিনের পথে

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রুশিয়ানদের জীবন-কেন্দ্র

(সেপ্টেম্বর ১৯২১)

তৃতীয় অধ্যায়

জার্ম্মাণ কুল্টুরে হাতে খড়ি

চতুর্থ অধ্যায়

দুনিয়ার জার্ম্মাণ-সমস্যা

পঞ্চম অধ্যায়

জার্ম্মাণি ১৯২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্পস্ পাহাড়

(অক্টোবর-নবেম্বর ১৯২২)

সপ্তম অধ্যায়

ভিয়েনায় দিনকয়েক

(নবেম্বর ১৯২২)

অষ্টম অধ্যায়

ব্যাভেরিয়ায় মোসাফিরি

নবম অধ্যায়

গ্যেটে-শিলারের কর্ম্মভূমি

দশম অধ্যায়

সত্যাগ্রহের যুগে

(জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ১৯২৩)

একাদশ অধ্যায়

স্যাক্সন-নগর ড্রেসডেন

দ্বাদশ অধ্যায়

পরাজিতের ক্রমপতন

(অক্টোবর-নবেম্বর ১৯২৩)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

টিরোলী আল্‌পসের তালে-তালে

(জুলাই ১৯২৪)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জার্ম্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ

(১৯২৪)

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্যাভেরিয়ার মফঃস্বল

ষোড়শ অধ্যায়

মিউনিক (আগষ্ট ১৯২৪)

সপ্তদশ অধ্যায়

বার্লিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জার্ম্মাণ জাতের হিট্‌লার-রাজ

(১৯৩৪ জানুয়ারি)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

"নয়া সাম্রাজ্য"-গ্রন্থাবলী

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জার্ম্মাণি-মুখো ভারত ও ভারত-মুখো জার্ম্মাণি

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

পরাজিত জার্ম্মাণির শ্বাস-প্রশ্বাস (১৯১-৩৫)

চিত্রসূচী

২০। "ডয়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ্‌" দৈনিকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ
২১। স্প্রেভাল্ডের মেয়ে,—বিয়ের পোষাকে
২২। ,, —পল্লীবেশে
২৩। হাগেলডোর্ফের মেয়ে,—পোষাকী বেশে
২৪। ব্যিকেবুর্গের ,, ,, ,,
২৫। ফ্রাঙ্কফোর্ট,—"ই-গে" রঙের কারখানার শাসন-দপ্তর
২৬। ন্যির্ণবার্গ্‌,—বাজার
২৭। ভাইমার,—কবিবর গ্যেটের লেখাপড়ার ঘর
২৮। য়েনা
২৯। শ্রীমতী হেড্‌ভিগ হাইল
৩০। রাইখ্‌ষ্টাগের মহিলা-মেম্বার গ্র্যট্রুড্‌ ব্যয়মার
৩১। গ্রন্থ-বিনিময়ের বৃত্তান্ত (১৯২২)
৩২। বার্লিনে নব্য ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর বৃত্তান্ত (১৯২৩)
৩৩। অস্ত্রচিকিৎসক বিয়ার
৩৪। অর্থশাস্ত্রী শুমাখার
৩৫। ভারতশাস্ত্রী ল্যিডার্স
৩৬। ,, য়োলি
৩৭। পাস্‌সাও
৩৮। লাণ্ডস্‌হুট
৩৯। ভিয়েনা,—অপেরা-ভবন
৪০। ভিয়েনা,—বাজার
৪১। বোৎসেন (দক্ষিণ টিরোল, ইতালি),—হাসপাতাল
৪২। ইন্‌স্‌ব্রুক,—মারিয়া টেরেজিয়েন শড়ক
৪৩। ইন্‌স্‌ব্রুক (টিরোল),—অষ্ট্রিয়া

৪৪। ইন্‌স্‌ব্রুক,—কিণ্ডারগার্টেন (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৩১)

৪৫। উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রী ডীল্‌স্‌

৪৬। ভেষজ-রসায়নশাস্ত্রী টোম্‌স্‌

৪৭। বার্লিনের "ফারাইন ডয়চার ইঞ্জেনিয়রে"-পত্রিকায় গ্রন্থকারের রচনা (১৯২৪)

৪৮। "সোৎসিয়াল-ভিস্‌সেন্‌শাফ্‌টলিখেস্‌ লিটারাটুর-ব্লাট্‌" পত্রিকায় গ্রন্থকারের "ফিউচ্যারিজ্‌ম্‌ অব ইয়ং এশিয়া" সম্বন্ধে সমালোচনা

৪৯। কন্‌ষ্টান্‌ৎসার হিট্টে (অদূরে পাটেরিয়োল পাহাড়)

৫০। আল্প্‌স্‌ পাহাড়ে গোসেবা

৫১। শিক্ষাশাস্ত্রী কের্শেনষ্টাইনার

৫২। ডয়চে আকাডেমীর প্রেসিডেণ্ট কার্ল হাউসহোফার

৫৩। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ওস্কার ফোন মিলার (১৮৫৫-১৯৩৪)

৫৪। এঞ্জিনিয়ার-পরিষদের ডিরেক্টর কন্‌রাড মাচ্চস

৫৫। শিক্ষা-নায়ক কর্ম্মবীর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৫৬। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অন্যতম প্রবর্ত্তক দানবীর রাসবিহারী ঘোষ

৫৭। লেখিকা রিকার্ডা হুখ

৫৮। ,, মারিয়া ফোন বুন্‌জেন

৫৯। "ডয়চে রুণ্ড্‌শাও"-সম্পাদক রুডল্‌ফ্‌ পেখেল

৬০। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে গ্রন্থকারের প্রদত্ত বক্তৃতা উপলক্ষে "ডয়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙে"র বৃত্তান্ত

৬১। চিত্রশিল্পী মাক্‌স্‌ রেবেল

৬২। সঙ্গীতাচার্য্য ওখ্‌স্‌

৬৫। মহিলা-পরিষদের এল্‌জে ফ্রোবেনিয়ুস
৬৬। লেখিকা লুলু ডিডেরিথ্‌স্‌
৬৭। মিউনিক,—বিয়ার-ভবন
৬৮। শুপ্লাট্‌লার নাচ
৬৯। চিত্রশিল্পী নোল্‌ডের "মাডোনা"
৭০। চিত্রশিল্পী হান্‌স্‌ টোমা (১৮৩৯-১৯২৪)
৭১। ড্রেস্‌ডেনের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থকারের বক্তৃতা (১৯৩১)
৭২। ড্রেসডেন,—টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
৭৩। লোকপ্রিয় জননায়ক যতীন্দ্রনাথ বসু
৭৪। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭৫। মিউনিক,—ডয়চেস মুজেয়ুম
৭৬। মিউনিক,—জলের ফোয়ারা
৭৭। "সোন্‌টাগ্‌স্‌পোষ্ট" পত্রিকায় গ্রন্থকারের মতামত আলোচনা (মিউনিক, ৬ এপ্রিল ১৯৩০)
৭৮। "ম্যিন্‌চেনার ৎসাইটুঙ" পত্রিকায় গ্রন্থকারের মতামত আলোচনা (১৩ মে, ১৯৩০)
৭৯। গীতি-কবি ষ্টেফান গেওর্গে
৮০। শিল্পনায়ক আউগুষ্ট্‌ টিস্‌সেন
৮১। ষ্টুট্‌গার্ট্‌ ইন্‌স্‌ব্রুক-ভিয়েনা-বার্লিনে গ্রন্থকারের বক্তৃতা
৮২। গ্রন্থকারের নিকট মিউনিকের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রী ডর্ণের বিদায়-অভিবাদন (১২ মার্চ্চ ১৯৩১)
৮৩। কাশীবিদ্যাপীঠ-প্রতিষ্ঠাতা "ভাইয়া" শিবপ্রসাদ গুপ্ত
৮৪। যন্ত্রনিষ্ঠ শিল্পবাণিজ্যে উৎসাহশীল ইতিহাসসেবী নরেন্দ্রনাথ লাহা
৮৫। মাইসেন

৮৬। ভিয়েনার অর্থ-রাষ্ট্র-সমাজশাস্ত্রী ওথ্মার স্পান

৮৭। "জীমেন্স্-নগর" (বার্লিন)

৮৮। "আ-এ-গে" বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারখানা (বার্লিন)

৮৯। ন্যুর্ণ্‌ব্যর্গের "ফ্রেঙ্কিশার কুরিয়ার" পত্রিকায় গ্রন্থকারের মতামত সমালোচনা (এপ্রিল ১৯৩১)

৯০। সপরিবারে গ্রন্থকার (কলিকাতা, জুলাই ১৯৩৪)

৯১। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ক্লিঙ্গেনব্যর্গ

৯২। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ডীজেল

৯৩। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সেনাপতি ফোন হিণ্ডেনবুর্গ

৯৪। জার্ম্মাণি-বিজেতা আডোল্ফ্ হিট্‌লার



অর্থ-রাষ্ট্র-সমাজ-শাস্ত্রী আডাম ম্যিলার

(১৭৭৯-১৮২৯)

পৃঃ ৪৫৩



শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম প্রবর্ত্তক এঞ্জিনিয়ার বয়েট
(১৭৮১-১৮৫৩)

পৃঃ ৪২৫



কৃষি-বিষয়ক অর্থশাস্ত্রী হাইনরিখ্ ফোন ট্যিনেন
(১৭৮৩-১৮৫০)

পৃঃ ৪৫৩



স্বদেশী আন্দোলনের জগদ্‌গুরু অর্থশাস্ত্রী ফ্রীড্‌রিশ লিষ্ট
(১৭৮৯-১৮৪৬)

পৃঃ ৪৫৩, ৫৯০, ৬৪৮, ৬৫৬



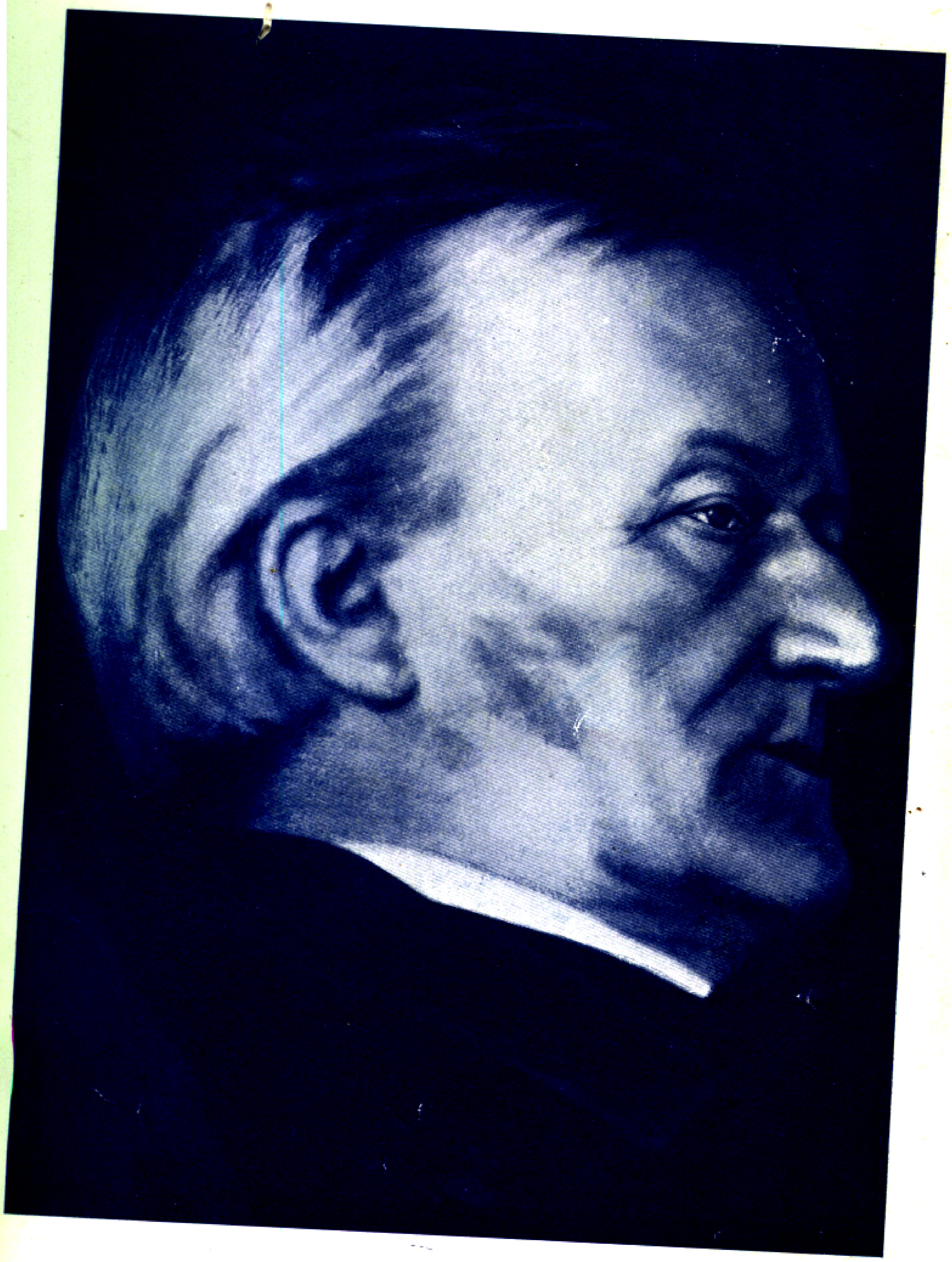
রেলশিল্পের প্রবর্ত্তক আউগুষ্ট্ বজিশ
(১৮০৪-১৮৫৪)

পৃঃ ১২৫



আলফ্রেড ক্রুপ
(১৮১২-১৮৮৭)

পৃঃ ২৬৩, ৩৩২, ৪২৫



সঙ্গীতগুরু রিখার্ড ভাগ্নার
(১৮১৩-১৮৮৩)

পৃঃ ১২০, ১৫৫, ৩২৬, ৪৪৭



রাষ্ট্রবীর বিস্‌মার্ক
(১৮১৫-১৮৯৮)

পৃঃ ৩২৫, ৪৩৯, ৬৫৫



বিজলী-শিল্পের প্রবর্ত্তক ভ্যার্ণার ফোন জীমেন্স
(১৮১৬-১৮৯২)

পৃঃ ১৫৯-১৬২, ৩৩২, ৪২৫



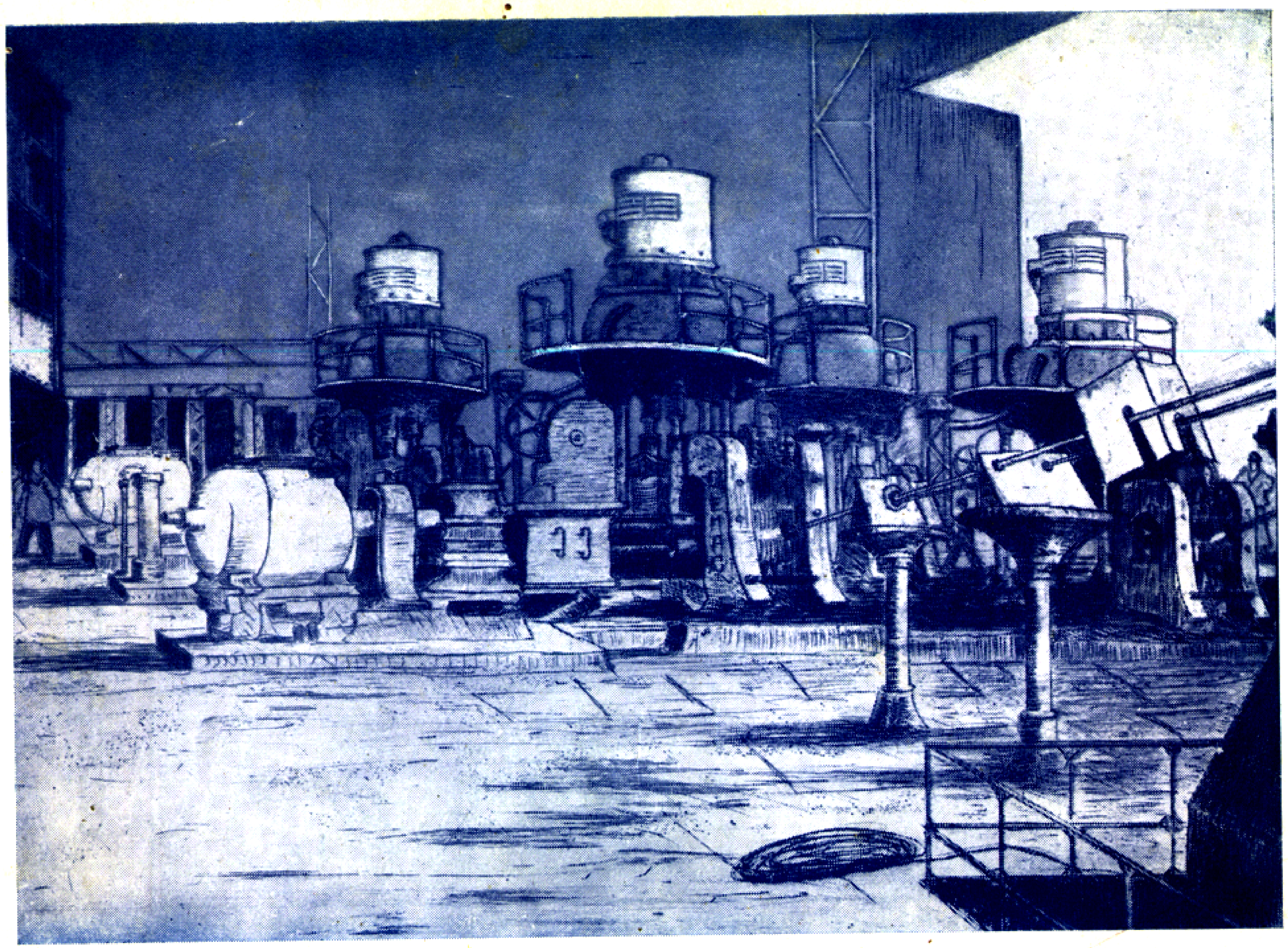
বিজ্ঞানবীর হেল্‌ম্‌হোল্‌ট স্‌
(১৮২১-১৮৯৪)

পৃঃ ৪৫২, ৬৫৫



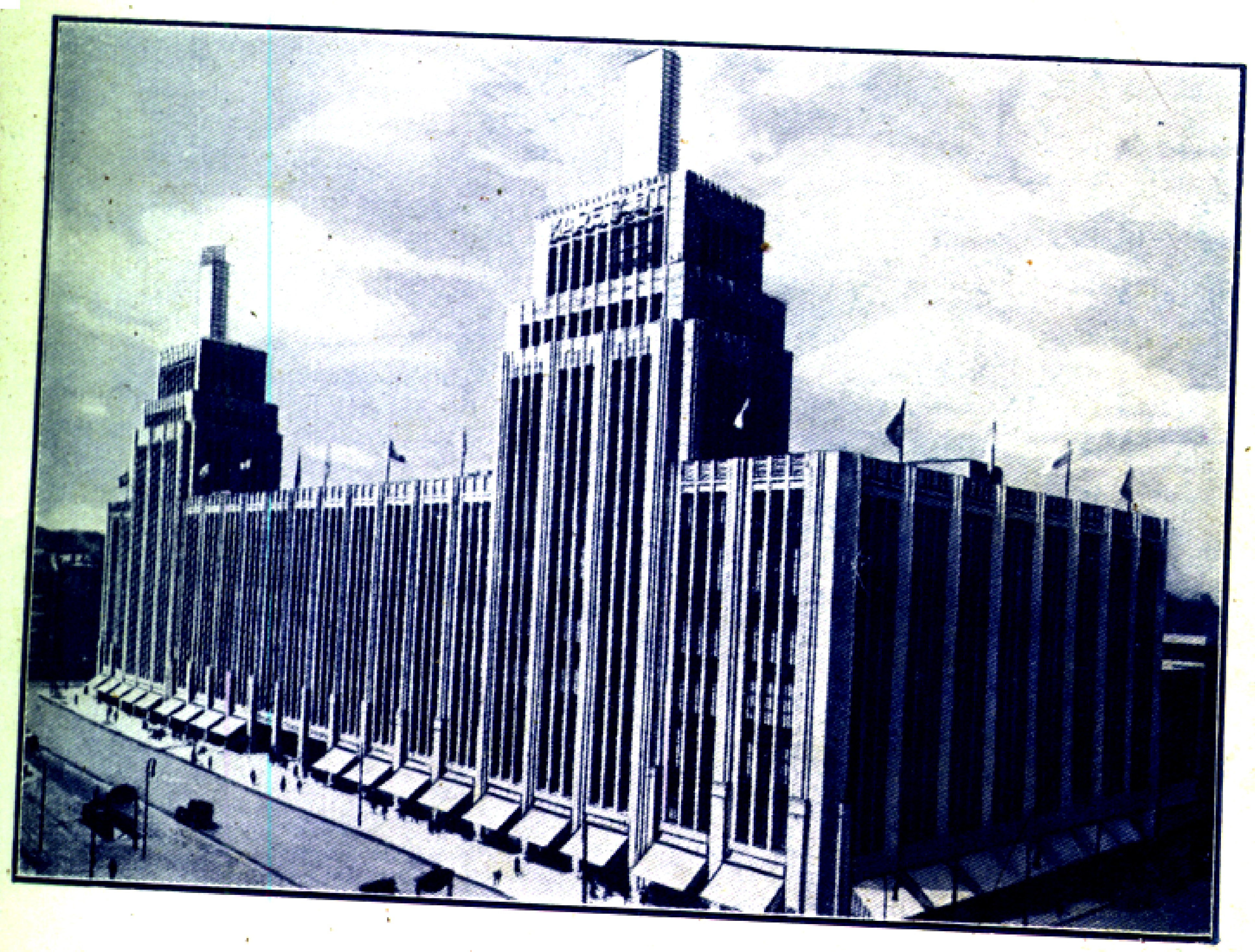
কোলোন,—"ডোম" (ক্যাথিড্র্যাল-গির্জ্জা)

পৃঃ ৭



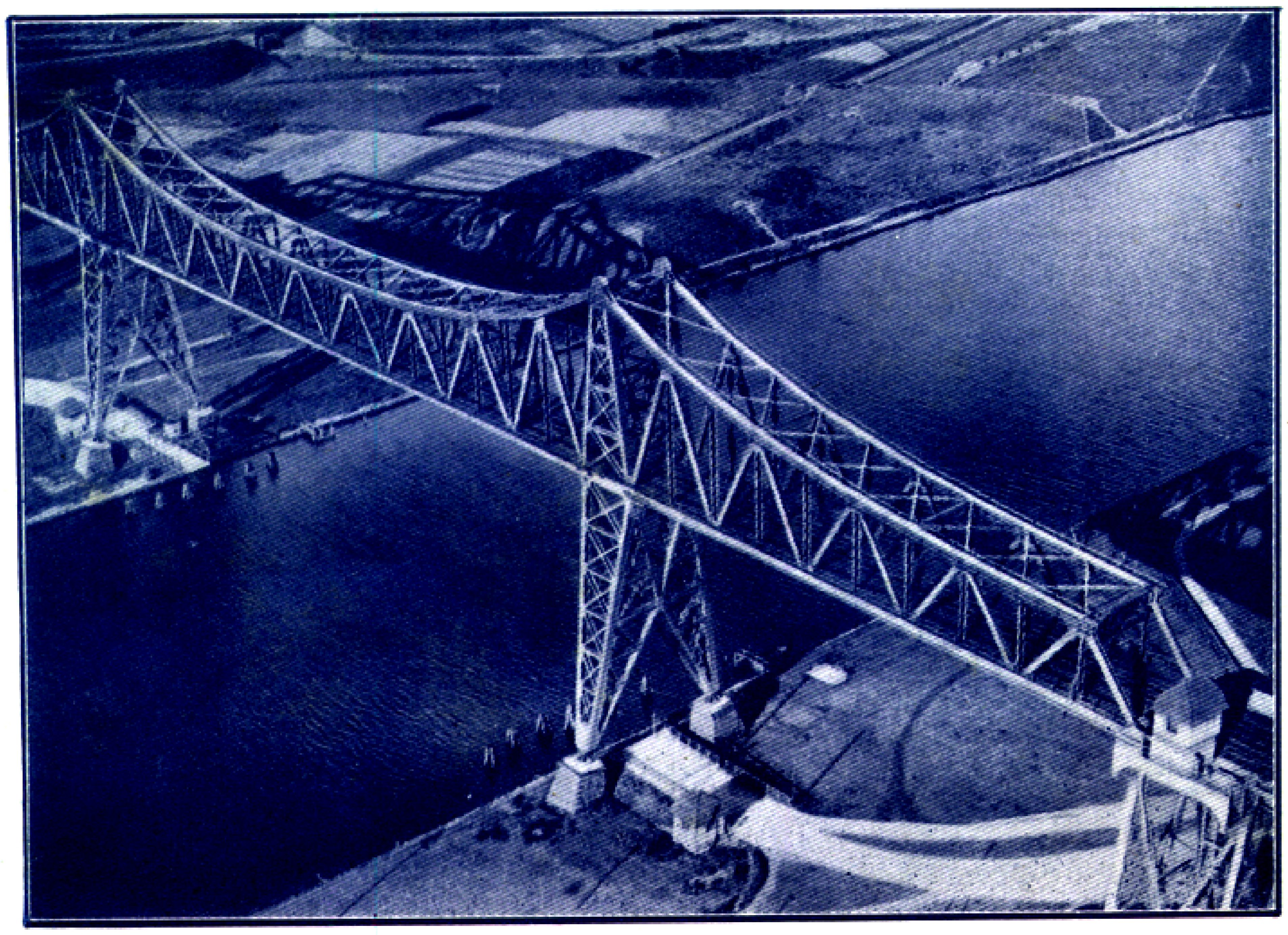
ইস্পাত প্রস্তুত করার কল,—ডুইসবুর্গের "ডেমাগ" কোম্পানীর তৈয়ারী

(ডিরেক্টর রয়টারের নিকট হইতে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত তক্ষণ-চিত্র হইতে ফটো তোলা হইয়াছে)



বার্লিন,—"কারষ্টাট্" (দোকান)

পৃঃ ৫৯৯



কীল,—কাইজার ভিল্‌হেল্‌ম্‌ খালের উপরকার পুল

পৃঃ ৫৯৫

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থকারের বক্তৃতা (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)
পৃঃ ৮/০, ৩৩৩

Auslandstudien der Universität Berlin

Mittwoch, den 8. Februar 1922, mittags 12 Uhr c.t.

spricht

Professor Benoy Kumar Sarkar

Direktor der Akademie Panini in Allahabad
Mitglied des Nationalen Erziehungsrats von Bengalen

über

Politische Strömungen in der indischen Kultur

Hörsaal 1 des Aulagebäudes

Freier Eintritt gegen Vorweis der Studentenkarte oder des Hörerscheins.

Druck von Franz Weber, Berlin W66, Mauerstraße 80

Politische Strömungen in der indischen Kultur.

Der indische Professor Benoy Kumar Sarkar, Direktor der Akademie Panini in Allahabad, einer der bekanntesten bengalischen Gelehrten der Gegenwart, hielt am 8. d. M. im Aulagebäude der Universität eine Gastvorlesung über das Thema „Politische Strömungen in der indischen Kultur." Der Vortragende führte einleitend aus, man habe bisher Indien einseitig als das Land der mystischen Religiosität gekennzeichnet, ohne zu berücksichtigen, daß es auch in Indien seit alter Zeit eine ausgebildete Staatsphilosophie und praktische Realpolitik gegeben habe, die nach ihren starken und ihren schwachen Seiten der des Abendlandes an die Seite gestellt werden könne. Diese These illustrierte Sarkar durch Beispiele aus den verschiedenen Gebieten des öffentlichen Lebens. Im alten Indien (der Autor beschränkte sich zumeist auf die Zeit zwischen 500 vor und 300 nach Christi) gab es soziale Institutionen demokratischer Färbung, Geschworenengerichte, wirtschaftliche Verbände, die den Innungen und Zünften des Mittelalters entsprechen, und Ratsversammlungen verschiedenster Art, von den Ortsvorständen bis zu den städtischen Korporationen und dem obersten Reichsrat. Wohl hat es in Indien ebensowenig wie in Europa an Zeiten gefehlt, wo eine Unzahl von größeren und kleineren Staaten miteinander in Fehde lagen, wo die „Logik der Fische" herrschte, nach der im Kampfe aller gegen alle nur der Kräftigste seine Gegner zu überleben vermag. Wenn es aber einer Macht gelungen war, sich zu behaupten, dann strebte sie danach, die Herrschaft über das ganze Land oder über große Gebiete desselben zu zentralisieren und sie durch große Kulturwerke wie Bau von Heerstraßen, Volkszählung und Vermessung auszubauen sowie durch Organisation der Landesverteidigung zu sichern, um so einen allgemeinen Friedenszustand zu schaffen, der seiner Ausdehnung und Wirkung nach nur mit der „Pax universalis" des römischen Imperiums verglichen werden kann. Die Staatsverfassungen in Indien waren sehr mannigfaltig, neben unvollkommeneren Formen finden wir einen aufgeklärten Despotismus, bei welchem das Königtum als auf einem Vertrag zwischen Herrscher und Volk beruhend angesehen und den Untertanen das Recht zuerkannt wurde, den Fürsten im Falle seiner Mißregierung zu vertreiben oder zu töten. Daneben finden wir schon in alter Zeit die republikanische Staatsform vertreten; so war z. B. Buddhas Vater nicht ein König, wozu ihn die spätere Legende macht, sondern eher der Präsident einer Adelsrepublik. Es wird Aufgabe der Wissenschaft sein, uns über all dieses neue Erkenntnisse zu schaffen, die Forschung hat aber die Aufgabe, mehr als bisher die reine Objektivität zu wahren und muß vor allem danach streben, die Vorurteile von Klima und Rasse fallen zu lassen.

Reicher Beifall lohnte den Redner für seine interessanten Ausführungen, die er in fließendem Deutsch vortrug. Es ist zu hoffen, daß Professor Sarkar noch öfter Gelegenheit nehmen wird, die neuartigen Ergebnisse seiner Studien einem interessierten Kreise vorzulegen.

v. Gp.

বার্লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ ("ডয়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ" দৈনিকে অধ্যাপক ফোন গ্লাজেনাপ কর্ত্তৃক লিখিত), ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২

পৃঃ ৬/০, ৬৩৮



স্প্রেভাল্ডের মেয়ে,—বিয়ের পোষাকে

পৃঃ ২৩৫



স্প্রেভান্ডের মেয়ে,—পল্লীবেশে

পৃঃ ২৩৫



হাগেলডোর্ফের মেয়ে,—পোষাকী বেশে (শাউম্‌বুর্গ-লিপ্পে জনপদ)

পৃঃ ২০৫



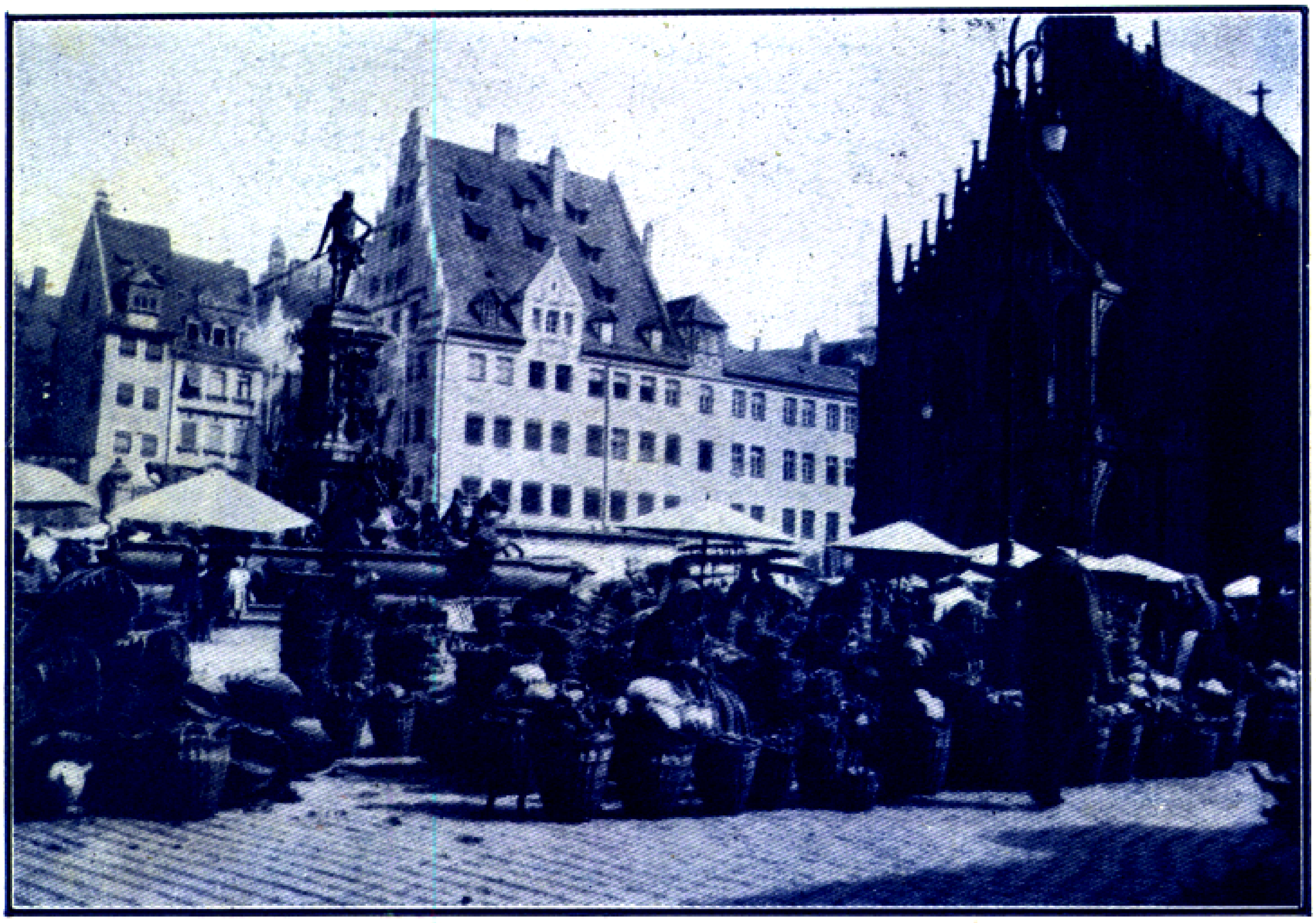
ব্যিকেবুর্গের মেয়ে,—পোষাকী বেশে

পৃঃ ২৩৫



ফ্রাঙ্কফোর্ট,—"ই-গে" রঙের কারখানার শাসন-দপ্তর

পৃঃ ৬০০



ন্যুর্ণব্যর্গ,—বাজার

পৃঃ ২৩৬



ভাইমার,—কবিবর গ্যেটের লেখাপড়ার ঘর

পৃঃ ২৫৪



য়েনা

পৃঃ ২৪৮



শ্রীমতী হেড্‌ভিগ হাইল

পৃঃ ৪৩৪



রাইখষ্টাগের মহিলা-মেম্বার গ্যাট্রুড ব্যয়মার


Deutsche Allgemeine Ztg

Deutsche-indischer Buchaustausch. Der in Berlin weilende indische Gelehrte Professor Benoy Kumar Sarkar hat an die Gelehrten, Journalisten, wissenschaftlichen Institute, Bibliotheken und Verleger Indiens einen Aufruf gerichtet, in dem er vorschlägt, mit **deutschen** Interessenten einen Bücheraustausch zu beginnen. Diesen ist es angesichts der Kursverhältnisse unmöglich, sich die in Indien erscheinende wichtige Literatur zu verschaffen, so daß durch den Vorschlag des indischen Gelehrten eine wesentliche Abhilfe der gegenwärtigen Not eintreten könnte. Zuschriften erbeten an Geh. Reg.-Rat Lueders, Akademie der Wissenschaft, Unter den Linden 38.

Berlin 29/IV. 1922

গ্রন্থ-বিনিময়ের বৃত্তান্ত

("ডয়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ্‌" দৈনিকে প্রকাশিত, ২৯ এপ্রিল, ১৯২২)

পৃঃ ১০৯-১১২, ৬৩৭

Moderne indische Maler.

In der Nationalgalerie.

Mit der nationalen Bewegung der Inder ist auch eine Anknüpfung an die Kunst der Ahnen verbunden. Professor Benoy Kumar Sarkar, der den Katalog einleitet, weist sehr treffend auf die parallele Erscheinung in der deutschen Geschichte hin. Wir können das vielleicht etwas bestimmter formulieren, und die Neuentdeckung der Nibelungen und des Volksliedes, der gotischen Dome, Dürers und der niederländischen und altdeutschen Malerei, die mit Pausen und Rückschlägen im letzten Viertel des 18. und im ersten des 19. Jahrhunderts geschah, als entscheidend für die ganze Entwicklung der neueren Zeit hinstellen, eine Entwicklung, in der gerade jetzt wieder die Neuentdeckung der gotischen Plastik als starker Faktor wirkt.

Dieser treffende Hinweis ist sehr geeignet, unser Interesse für das anzuregen, was jetzt in Indien geschieht, und uns mehr als bloß äußerliches Verstehen dafür zu geben. Ein lang unterdrücktes Volkstum will wiederum sprechen und sucht die Ausdrucksmittel. Es greift in die eigene Vergangenheit zurück, begeistert sich für indische Fresken und Miniaturen, findet sich aber doch in einer anderen Zeit, auch als verändertes, durch den aktivistischen Okzident verändertes Temperament, und ist nicht mehr abgeschlossen, sondern kennt, wie wir alle, alles, was geschah und jetzt geschieht, kennt vor allem verwandtes Asiatisches, besonders Japanisches, und Englisches, von dem Raffinement Whisters bis zu der Banalität der Buntdrucke in den Magazines. Und greift nach allem, nach allem zugleich.

Man kann, man muß über diese Mischung manchmal lächeln. Aber man darf nicht vergessen, daß die deutschen Werke der Periode, die zum Vergleich herangezogen wurde, für uns heute zum Teil denselben Beigeschmack haben, daß da auch Antikes, Gotisches, Wirkliches in merkwürdigster Weise vermengt wurden. Man denke nur an die Fresken der Casa Bartholdy! Wie sie können auch diese Bilder ein Anfang sein, der eine bedeutende Entwicklung einleitet. Zumal, nach dem Katalog zu schließen, wenn auch nicht die Künstler, so doch ihr Wortführer ein Bewußtsein des Zustandes hat, wie es auf dem entsprechenden Punkt unserer Entwicklung nicht vorhanden war.

Und ein positives Moment ist hier vorhanden. Die besten Dinge zeigen den ererbten sehr feinen Farbensinn und die ebenso ererbte Fähigkeit einfacher Zeichnung, die nicht Wirklichkeit nachzieht, aber ausdrückt, und als natürliche Folge gute Form, um die man bei uns so heftig ringt. Das ist ziemlich viel. Es gibt ein rechtes Handwerk, aus dem immer Kunst wachsen kann. Diese Vorhut besteht ja doch wohl aus anglisierten Indern, wenn sie auch heute Nationalisten sind. Es wird darauf ankommen, ob aus dem unberührten Volk ein Nachwuchs entsteht, der weniger gesehen hat und unmittelbarer lebt.

Fritz Stahl.

"টাগেব্লাট" দৈনিকে প্রকাশিত,—বার্লিনে অনুষ্ঠিত নব্য-ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর বৃত্তান্ত (চিত্র-সমালোচক ফ্রিট্স্ ষ্টাল কর্তৃক লিখিত)

৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩

পৃঃ ২৯৩-৩০১, ৩৩৬, ৬৩৯

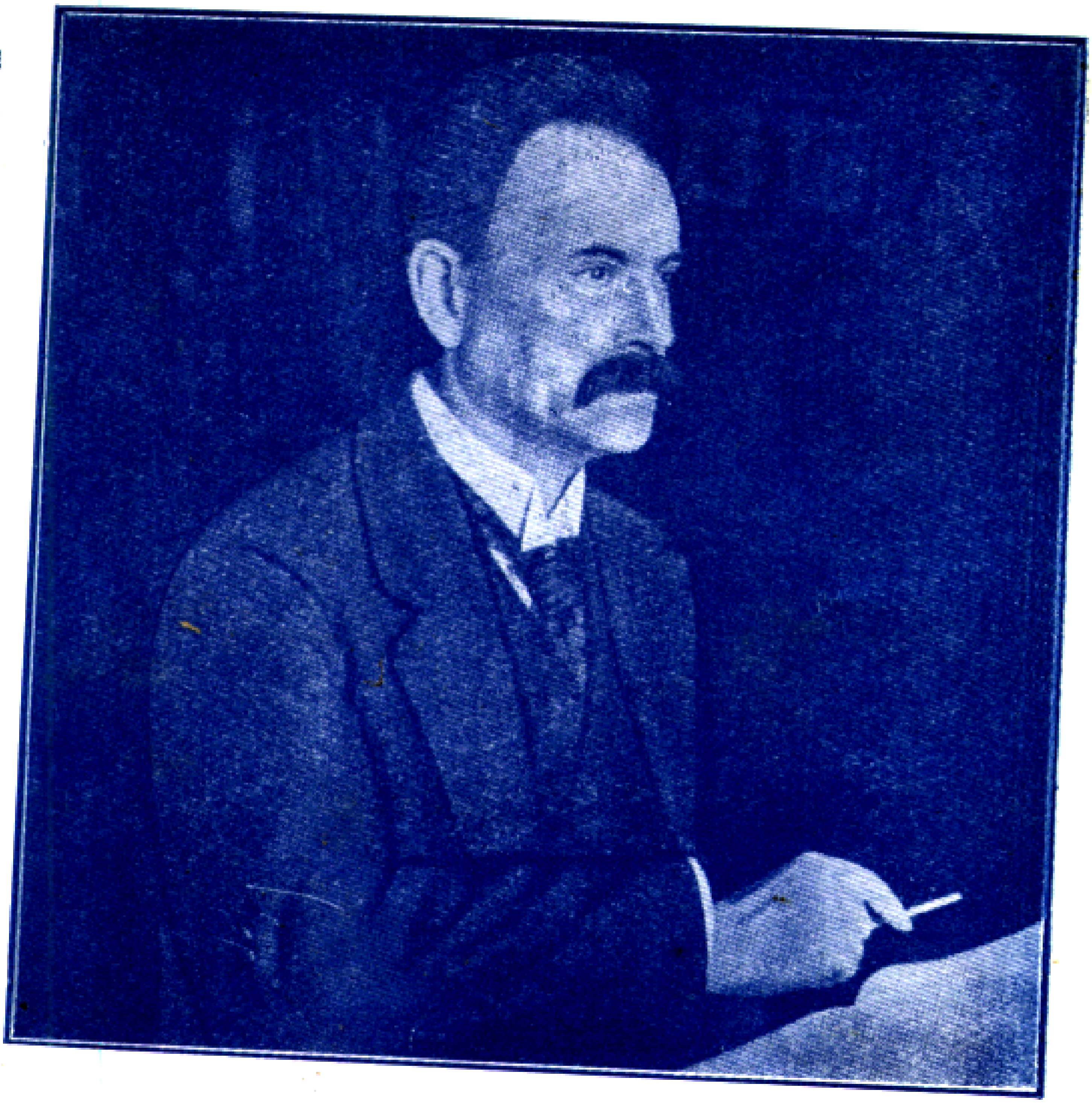


ব্যায়াম-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অস্ত্রচিকিৎসক বিয়ার



অর্থশাস্ত্রী হার্মাণ শুমাখার

পৃঃ ৮/০, ৩৩৪, ৪৫৪, ৬০৩, ৬৩৮



ভারতশাস্ত্রী লিয্যাডাস

পৃ: ৮/০, ৩৩৫, ৪৫৬, ৬০৩, ৬৩৮, ৬৫৮



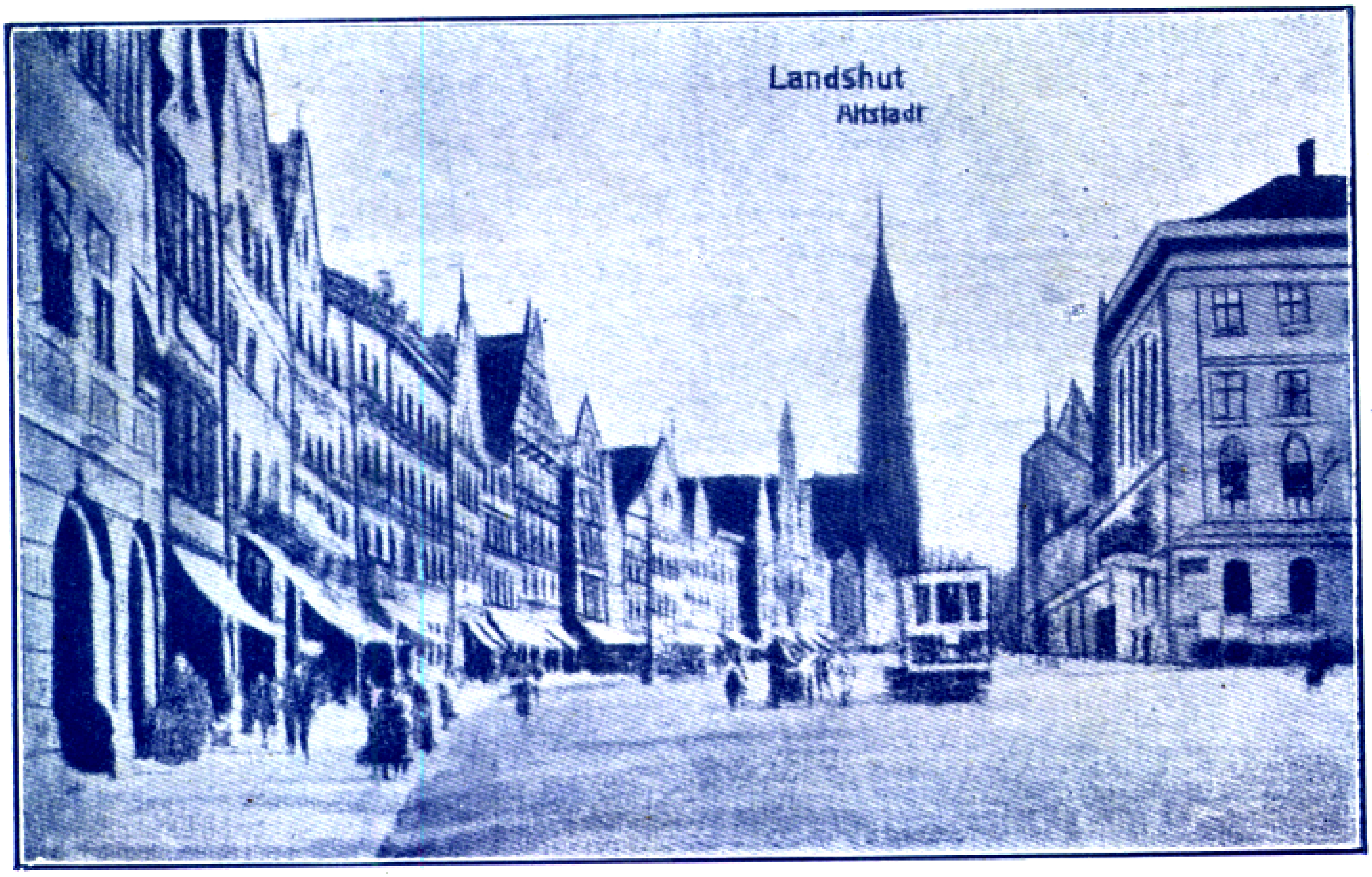
ভারতশাস্ত্রী য়ুলিউস য়োলি

পৃঃ ৩৩৫, ৬০২, ৬৪১



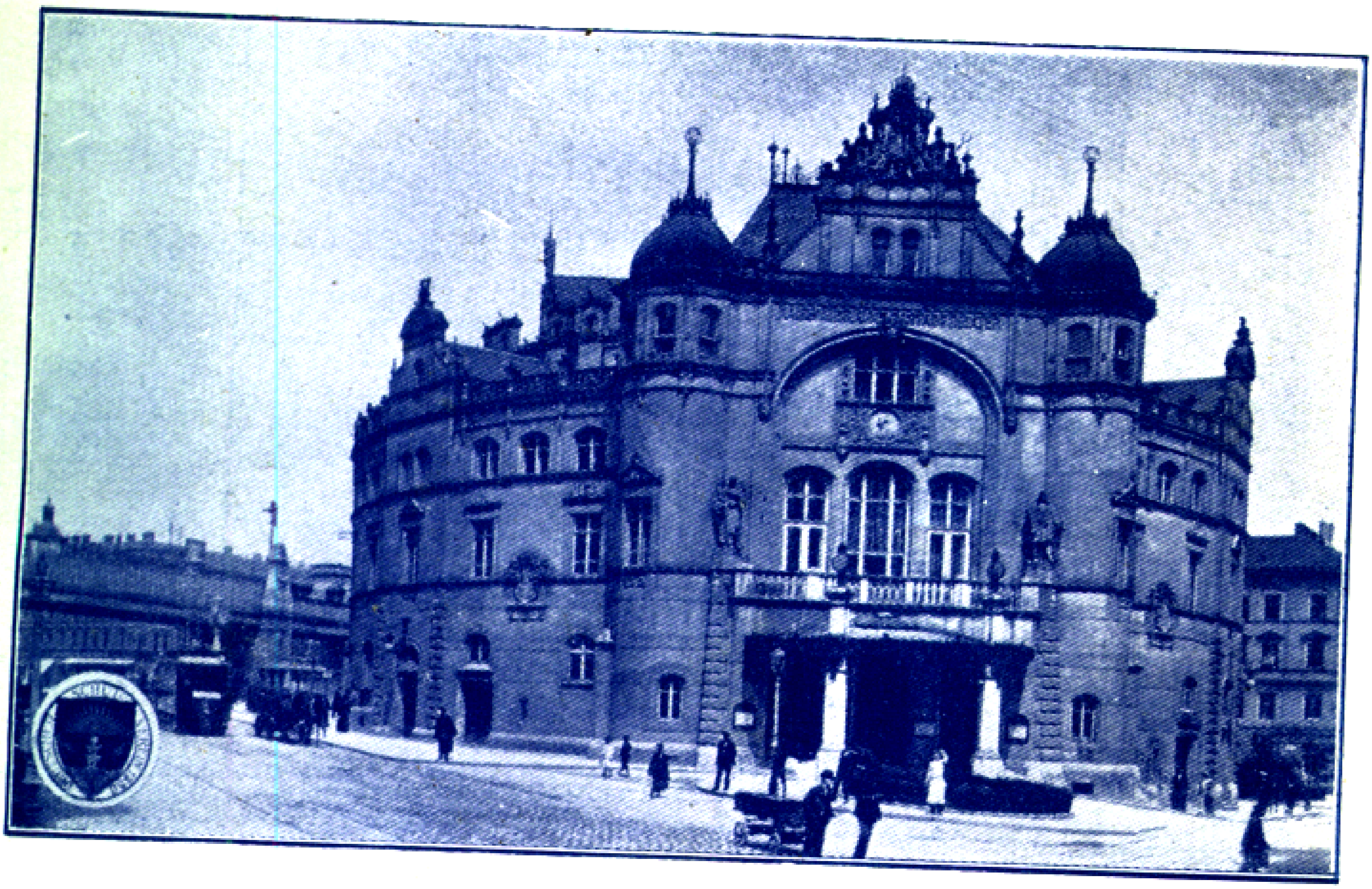
পাস্‌সাও

পৃঃ ২৩৩-২৩৫



লাণ্ড্স্হুট

পৃঃ ৪৭৫



ভিয়েনা,—অপেরা-ভবন

পৃঃ ২২৬



ভিয়েনা,—বাজার

পৃঃ ২২৬



বোৎসেন (দক্ষিণ টিরোল, ইতালি),—হাসপাতাল

পৃঃ ১৮১



ইন্‌স্‌ব্রুক,—মারিয়া টেরেজিয়েন শড়ক

পৃঃ ১৭৯



উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রী ডীল্‌স্‌

পৃঃ ৪৪৩, ৫৪১



ভেষজ-রসায়নশাস্ত্রী টোম্‌স্

পৃঃ ৪৪৩

V·D·I NACHRICHTEN

MITTEILUNGEN DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE UND DES DEUTSCHEN VERBANDES TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHER VEREINE

Bezugsbedingungen: Die VDI-Nachrichten erscheinen jeden Mittwoch. Bezug durch jede Postanstalt oder den Verlag. Bezugspreis für das ganze Jahr 15,—, vierteljährl. 4,00 Goldmark. Einzelnummer 0,30 Mark. Für das Ausland bei portofreier Zusendung [illegible] amerik. Dollar. Nachforderungen bei Kursverschlechterungen vorbehalten. Mitglieder des V. d. I. erhalten die VDI-Nachrichten kostenlos.

VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin SW 19, Beuthstr. 7. Fernsprecher: Zentrum 11500–11512, Merkur 8171, 7454, 3126, 3127. Telegramm-Adresse: Ingenieurverlag Berlin. Postscheckkonto: Berlin 102373. Bankkonten: Dresdner Bank, Depositenkasse, Berlin SW 19, Spittelmarkt; Darmstädter und Nationalbank, Kommandit-Ges. a. A., Depositenkasse 15, Kommandantenstr.

Anzeigen: Die für diese Ausgabe gültigen Anzeigenpreise sind am Kopfe der Beilage mit den Kleinen Anzeigen veröffentlicht. Anzeigenschluß für Erweiterungen: Donnerstag vor Erscheinen, für Kleine Anzeigen Sonnabends vor Erscheinen. Fernsprecher: Merkur 8171, 7454, 3126, 3127.

Nr. 47 — MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER 1924 — 4. Jahrg.

Zur 25. Jahresversammlung der Schiffbautechnischen Gesellschaft.

Am 20. und 21. November 1924 hält die Schiffbautechnische Gesellschaft in der Technischen Hochschule Charlottenburg ihre 25. Hauptversammlung ab. Die Gesellschaft ist um die Jahrhundertwende gegründet worden. Im Jahre 1896 hatte die englische Institution of Naval Architects in Hamburg ihre Sommerversammlung abgehalten und war vom Kaiser nach Berlin eingeladen worden. Durch diese Tagung wurden den deutschen Schiffbauern, die sich gerade in jener Zeit dem Bau der weltbekannten deutschen Schnelldampfer zuwandten, der Wert einer solchen Fachvereinigung für die Pflege der Beziehungen zu den in- und ausländischen Fachgenossen und die sich hieraus ergebenden Anregungsmöglichkeiten vor Augen geführt. Die Gründung sollte durch [illegible] Admiralitätsrat Dietrich erfolgen und wurde nach dessen Tod von Geh. Regierungsrat Busley in die Wege geleitet. Die Gründungssitzung fand am 23. Mai 1899 statt, nachdem Busley sich vergewissert hatte, daß er die Vereinigung auf eine genügend breite Grundlage würde stellen können und daß er bei den führenden Männern des Schiffbaues, der Schiffahrt und des Hilfsbetriebes den erforderlichen materiellen Rückhalt finden würde. Die erste Hauptversammlung war am 5. Dezember 1899. Im vergangenen Jahre sollte die 25. Hauptversammlung stattfinden, mußte aber in Anbetracht der damaligen Wirtschaftslage unterbleiben.

Außer den Hauptversammlungen, die regelmäßig in Berlin im November abgehalten werden, veranstaltet die Vereinigung auch Sommerversammlungen, die dem persönlichen Zusammenschluß der Mitglieder und der Annäherung an ausländische Fachgenossen dienen sollen. Die Gesellschaft unternahm Reisen nach Paris (1900), [illegible] Düsseldorf (1902), Stockholm [illegible] London (1911), Kiel (1912) und Stuttgart (1914). Die wissenschaftlichen Vorträge bleiben vorwiegend den Hauptversammlungen vorbehalten und werden jedesmal in den Jahrbüchern veröffentlicht, die auch andere wertvolle Beiträge enthalten.

Die Vorträge auf dem Gebiete des Schiffbaues behandeln Forschungsergebnisse von [illegible] (Meldahl), Widerstandsuntersuchungen (Weitbrecht) und Untersuchungen über [illegible]

Große deutsche Schiffbauer.



Rudolf Haack, Baurat, Schiffbau-Direktor, Erbauer des ersten deutschen Panzerschiffes „Preußen“.

Ferdinand Schichau, Geh. Kommerzienrat, Begründer der Schichauwerke Elbing, Danzig, Pillau, Memel.

Alfred Dietrich, Wirkl. Geh. Admiralitätsrat, Schöpfer der deutschen Kriegsmarineschiffe.

Ludwig Gümbel, Prof. Dr.-Ing., Forscher auf dem Gebiete der technischen Mechanik fester und flüssiger Körper.

Otto Schlick, Marinebaurat Dr.-Ing., Erfinder des Massenausgleichs und Erbauer des Schiffskreisels.

Die Industrialisierung Indiens.

Von

Prof. Benoy Kumar Sarkar, Kalkutta.

I.

In der jetzigen Entwicklungsstufe der Industrialisierung Indiens bemerkt man zwei verschiedene, und zwar gegensätzliche Strömungen. Erstens muß die Swadeshi, d. h. die nationalistische industrielle Selbständigkeitsbewegung, genannt werden, die seit dem Jahre 1905 mit größerem oder geringerem Erfolge fortwährend 20 Jahre die Boykottierung englischer Waren sowie die Einrichtung moderner Fabriken wie primitiver Werkstätten gefördert hat. Zweitens ist das industrielle Leben Indiens heutzutage nicht weniger gekennzeichnet durch die Bestrebungen, die Großbritannien während und seit dem Weltkriege unternommen hat, um in Indien die modernen Industrien, und zwar die sogenannten „Schlüsselindustrien“, mit englischem oder indischem Betriebskapital entstehen zu lassen, damit im nächsten Kriege die materielle und wirtschaftliche Kraft Indiens gegen die Feinde des Britischen Reiches ausgenutzt werden kann.

Obwohl die politischen Ziele der beiden Strömungen weit auseinander gehen, können Wirtschaftspolitiker, Ingenieure, Chemiker und Sozialwissenschaftler in den industriellen Ereignissen in Indien eine gemeinsame Richtung der Entwicklung erkennen, die das Land mehr und mehr zu einer technisch-wirtschaftlich selbständigen Stellung innerhalb der Weltwirtschaft emporhebt. Wie weit oder wie tief Indien schon industrialisiert ist, wird durch die Tatsache aufgewiesen, daß sich die Zahl der streikenden Arbeiter durchschnittlich auf zwei Millionen jährlich beläuft. Unter den Ansprüchen der indischen Arbeiter sind auch diejenigen Forderungen bemerkbar — betreffend Lohn, Arbeitszeit, Behandlung usw. —, die heute von ihren Genossen in den seit langer Zeit industrialisierten Ländern Europas und Amerikas gestellt werden.

Allerdings verdankt nicht jede neue Fabrik in Indien ihre Entstehung der Swadeshi-Bewegung von 1905 oder der britischen Schlüsselindustriepolitik von 1914 bis 1918. Die Anfänge der Industrialisierung — bald mit indischem Kapital und indischer Leitung, bald mit englischem Kapital

বার্লিনের "ফারাইন ডয়চার ইঞ্জেনিয়রে" পত্রিকায় গ্রন্থকারের "ডী ইণ্ডুস্ট্রিয়ালিজীরুঙ্‌ ইণ্ডিয়েন্‌স্‌" রচনা (১৯ নবেম্বর ১৯২৪)

পৃঃ ৬৫১

Sarkar, Benoy Kumar: The Futurism of Young Asia and other essays on the relations between the east and the west. Berlin: Springer 1922. X, 399 S. 4°. ℳ 5. Gz.

Eine reiche Sammlung anregender Essays des hervorragenden indischen Soziologen über „allerhand und noch etwas": Schule, Philosophie, Geschichte, Politik. Gemahnt vielfach an Spengler durch die verblüffend vielseitige Erudition und die geistige Gelenkigkeit, mit der diese Gelehrsamkeit in gewaltigen Sprüngen alle Räume und Zeiten der menschlichen Kultur durchhüpft. Das einigende Band aller Aufsätze ist der Zweck, der europäisch-amerikanischen Auffassung über orientalische Dinge neue Blickpunkte zu geben. Sie bedarf, meint S., solcher Zurechtrückung dringend, denn sie ist gänzlich schief. Alles, was die westliche Wissenschaft hierzu zu Tage förderte, hat sich dadurch subjektiv verschoben, daß unwillkürlich alles andersartige, „befremdende" als das augenfällige überstark betont, das ähnliche leicht übersehen wurde. Gar nicht zu reden davon, daß manches einfach aus dem stumpfen Gesichtswinkel des Vorurteils oder des überheblichen und daher verständnislosen Dünkels betrachtet ist.

S. ruft den Westvölkern zu: lernt erst richtig sehen, gerecht urteilen, „gleichmäßig", d. h. mit gleichem Maße die Dinge vergleichen. Er selbst strebt dies dadurch an, daß er uns einmal mit dem Gegenbild unserer Irrtümer aufwartet, indem er uns vorhält, wie unsere Kultur sich in der Anschauung der Orientalen spiegelt. Ferner wird er nicht müde, unsere Auffassungen vom orientalischen Geist zu berichtigen, indem er große Parallelen der Entwicklung zeichnet und uns darlegt, daß der Orient nicht nur seine Buddhas und Christusse, sondern auch seine Napoleone, Alexander, Caroli Magni und Cäsaren hatte. Ebenso weist er auf verblüffende Ähnlichkeiten zwischen Ost und West in Philosophie, Literatur und Kunst nach. Er glaubt, eine völlige Gleichartigkeit beweisen zu können.

Indem S. jedenfalls festgerannte Falschheiten in unserem Wissen von dem ebenso fälschlich „geheimnisvoll" genannten Orient auflockert, läßt er manchen bittren Hohn mit unterlaufen über die Heuchelei der Weißen und sagt herbe Wahrheiten über die hohe Politik und die Lage nach dem Weltkrieg, die er einer ebenso großzügigen wie weitblickenden Kritik unterzieht. Überhaupt durchweht politisches Wollen das Buch. Es ist das Aufbegehren gegen das geistige und wirtschaftliche Joch der Weißen. — das Geschrei über die Gelbe Gefahr sei historisch weniger begründet, als die „Weiße Gefahr", die den Ostvölkern durch die Jahrtausende hindurch drohte.

Das Buch des gelehrten Hindu zeigt uns sozusagen einmal die Geschichte „unserer" Menschheit . . . von der anderen Seite gesehen. Aus Verkümmerungserscheinungen einer Niedergangsepoche, deren Zeugen und Zeitgenossen wir zufällig sind, haben wir den Inhalt des Orients zu erfassen geglaubt und darüber die großen Werdegänge der Ewigkeit übersehen.

Das Buch ist mit viel Gelehrsamkeit, aber auch mit verhaltenem Temperament geschrieben. Daher ist es eine Fundgrube von Anregungen für den Historiker und Philosophen nicht nur, sondern auch für den Politiker.

Jenny.

বার্লিনে প্রকাশিত গ্রন্থকারের "ফিউচ্যারিজ্‌ম অব ইয়ং এশিয়া" সম্বন্ধে সমালোচনা ("সোৎসিয়াল-ভিসসেনশাফ্‌টলিখেস্‌ লিটারাটুর-ব্লাট" পত্রিকায় প্রকাশিত, মার্চ্চ, ১৯২৩)



কন্‌ষ্টান্‌ৎসার হিট্টে,—টিরোল
(অদূরে পাটেরিয়োল পাহাড়)



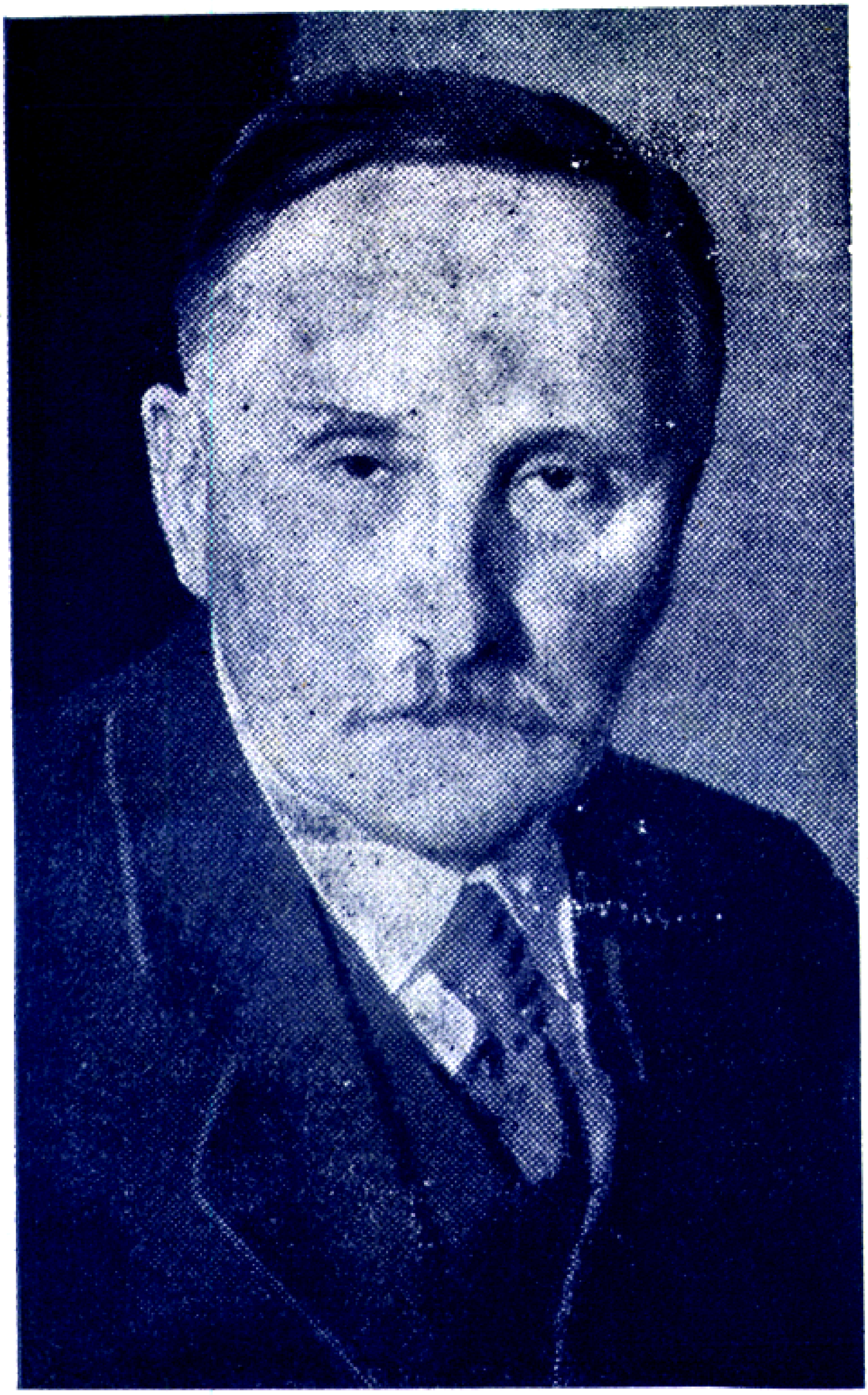
আল্‌প্‌স্‌ পাহাড়ে গো-সেবা (টিরোল)

পৃঃ ১৮৪, ৪০৭



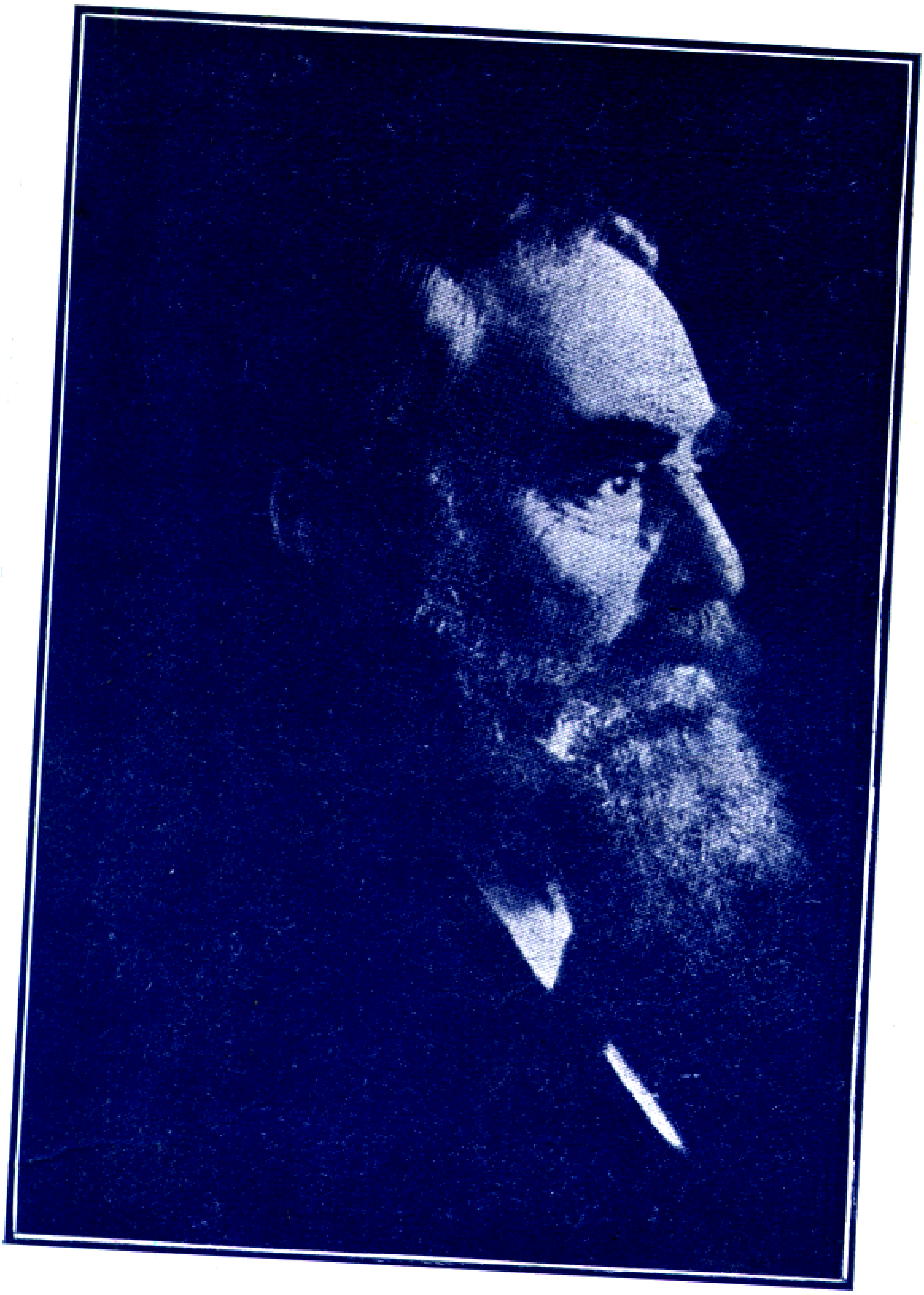
শিক্ষাশাস্ত্রী কের্শেনষ্টাইনার

পৃঃ ৫১৮-৫২০, ৫৯৭, ৬৪৭



"ডয়চে আকাডেমী"র প্রেসিডেণ্ট কার্ল্ হাউসহোফার

পৃঃ ১/০, ৬৩০, ৬৩৬, ৬৪১, ৬৪৭



"ডয়চেস মুজেয়ুম"-প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ওস্কার ফোন মিলার
(১৮৫৫-১৯৩৪)

পৃঃ ৫১০-৫১১, ৫৯৭, ৬৪৭



এঞ্জিনিয়ার-পরিষদের ডিরেক্টর কন্‌রাড্‌ মাচ্চস্‌

পৃঃ ৸/০, ৩৩১-৩৩২, ৪৫৭-৪৫৮, ৫৭২-৫৭৩, ৫৯৮, ৬০৩, ৬৩৮



শিক্ষানায়ক কর্ম্মবীর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পৃঃ ৬৫৬



“জাতীয় শিক্ষাপরিষদে”র অন্যতম প্রবর্ত্তক দানবীর রাসবিহারী ঘোষ

পৃঃ ৬৫৬



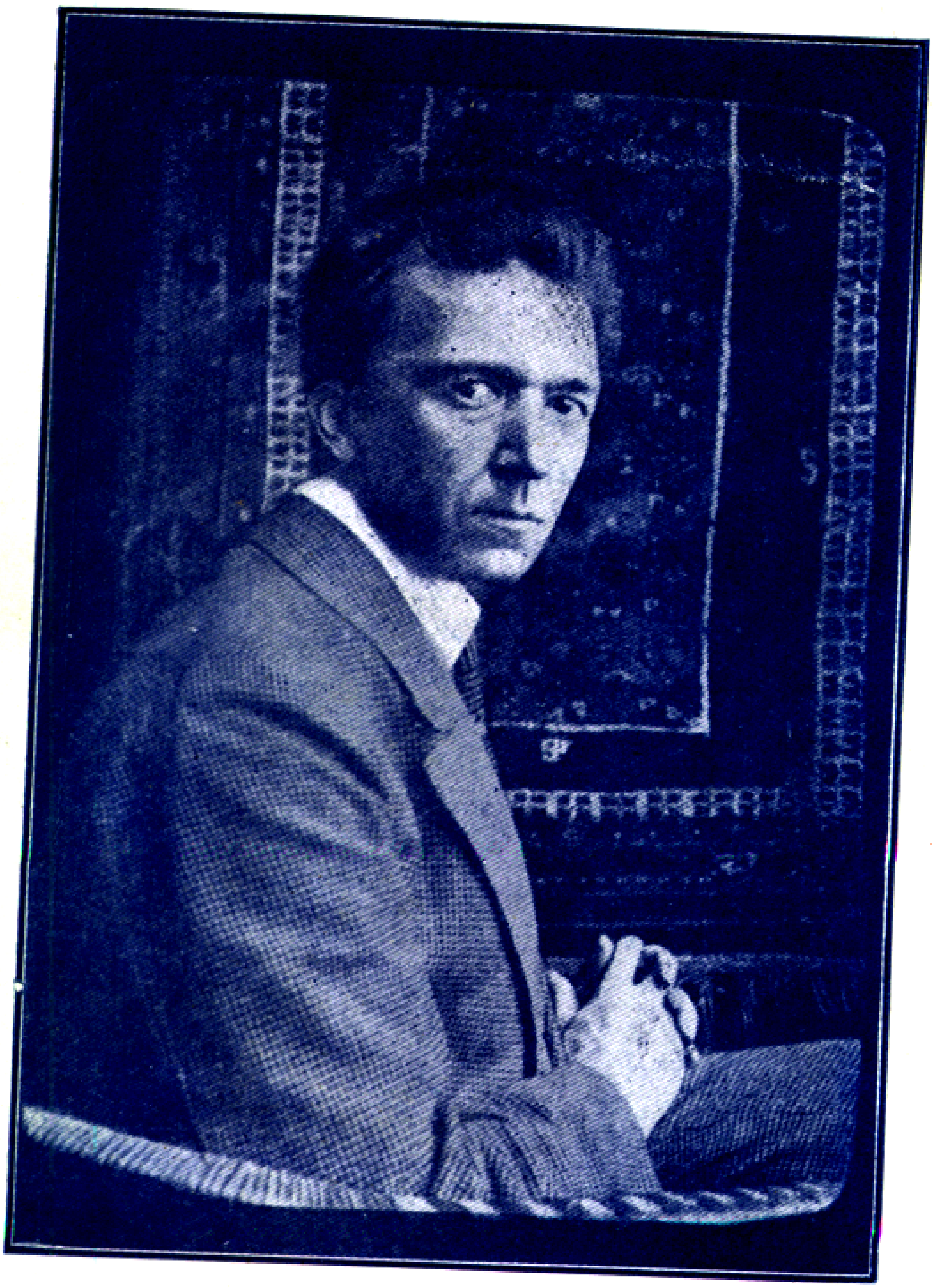
লেখিকা রিকার্ডা হুখ্

পৃঃ ৪৩৬



লেখিকা মারিয়া ফোন বুন্‌জেন

পৃঃ ৪৩৭-৪৩৮



চিত্রশিল্পী মাক্‌স্ রেবেল

পৃঃ ৪৪১-৪৪২



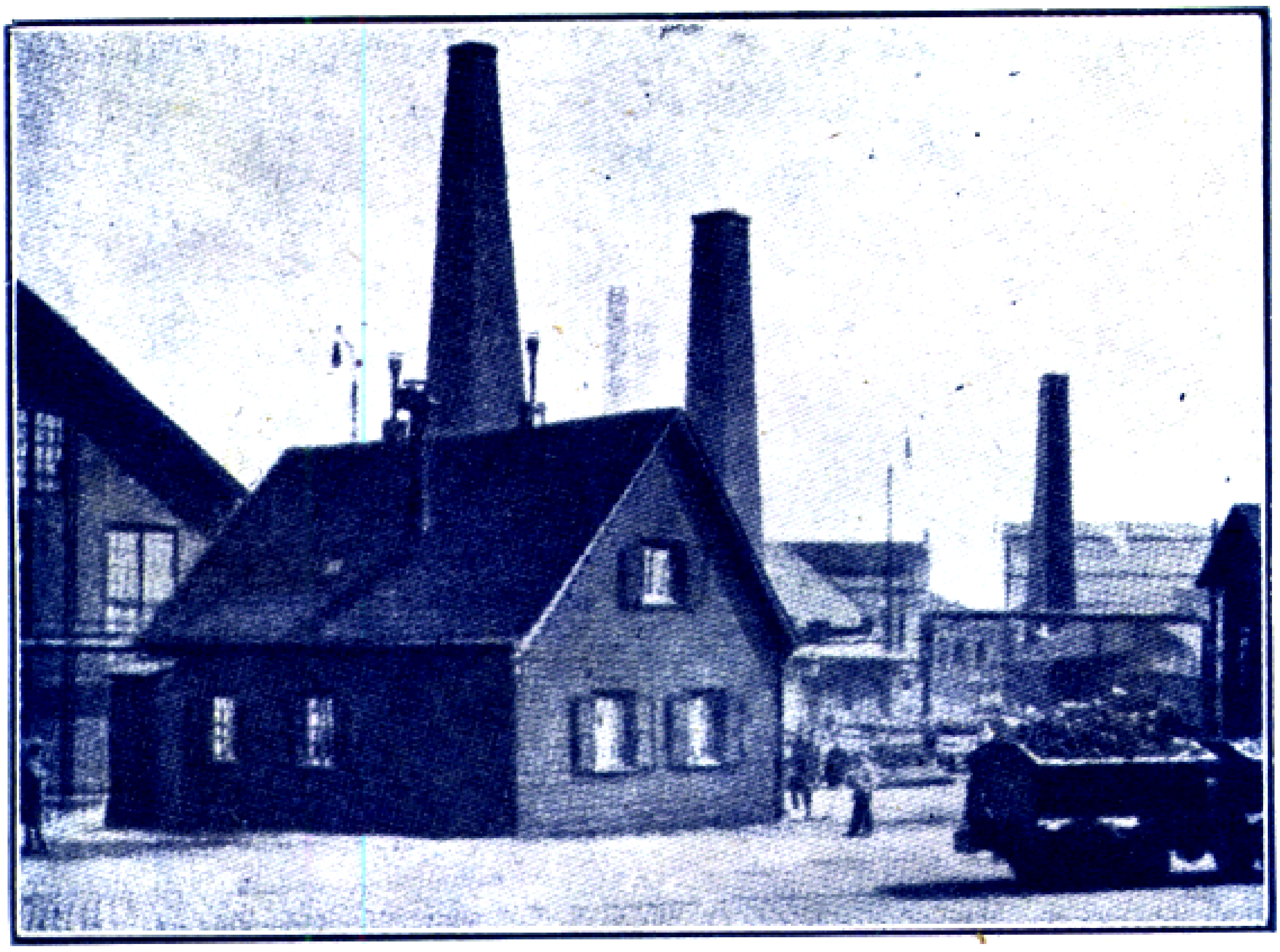
সঙ্গীতাচার্য্য ওখ্স্

পৃঃ ৪৫০-৪৫১



বার্লিনের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (শার্লোটেনবুর্গ্‌)

পৃঃ ৩১৮



ক্রুপ কারখানার "ষ্টাম-হাউস" (বাস্তভিটা)—এসসেন

পৃঃ ৬২৫

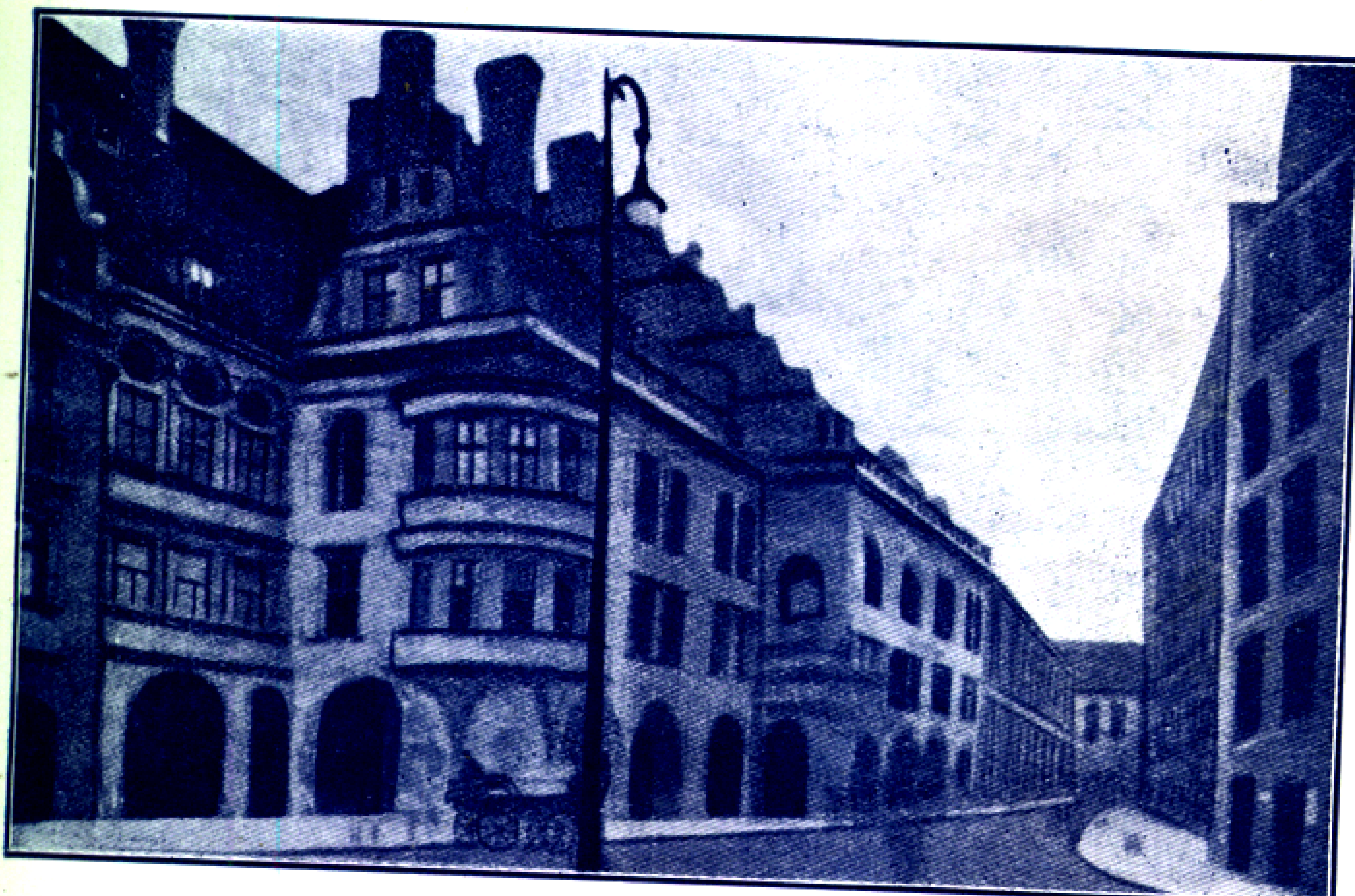


মহিলা-পরিষদের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্রী
এল্‌জে ফ্রোবেনিয়ুস



লেখিকা লুলু ডিডেরিখ্‌স্‌

পৃঃ ৪৩৬



মিউনিক,—হোফ-ব্রয়হাউস (বিয়ার-ভবন)

পৃঃ ৫১৩



শুপ্লাট্‌লার নাচ

পৃঃ ৪৬৪



চিত্রশিল্পী নোল্‌ডের "মাডোনা"

পৃঃ ৫২৩



চিত্রশিল্পী হান্‌স্‌ টোমা (১৮৩৯-১৯২১)

(শিল্পীর নিজের আঁকা)

পৃঃ ৫২৩

Außen-Institut der
Sächsischen Technischen Hochschule

Professor **Benoy Kumar**

SARKAR

Direktor des Bengalischen Instituts für
Wirtschafts-Wissenschaften in Kalkutta

hält im **Hörsaal 77** der Technischen Hochschule
am Bismarckplatz
abends 8 Uhr folgende Vorträge:

Mittwoch, den 1. Juli:

1. Die staatlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen des indischen Volkes im Rahmen der indogermanischen Kultur.

Freitag, den 3. Juli:

2. Die industriellen und kommerziellen Wandlungen im heutigen Indien.

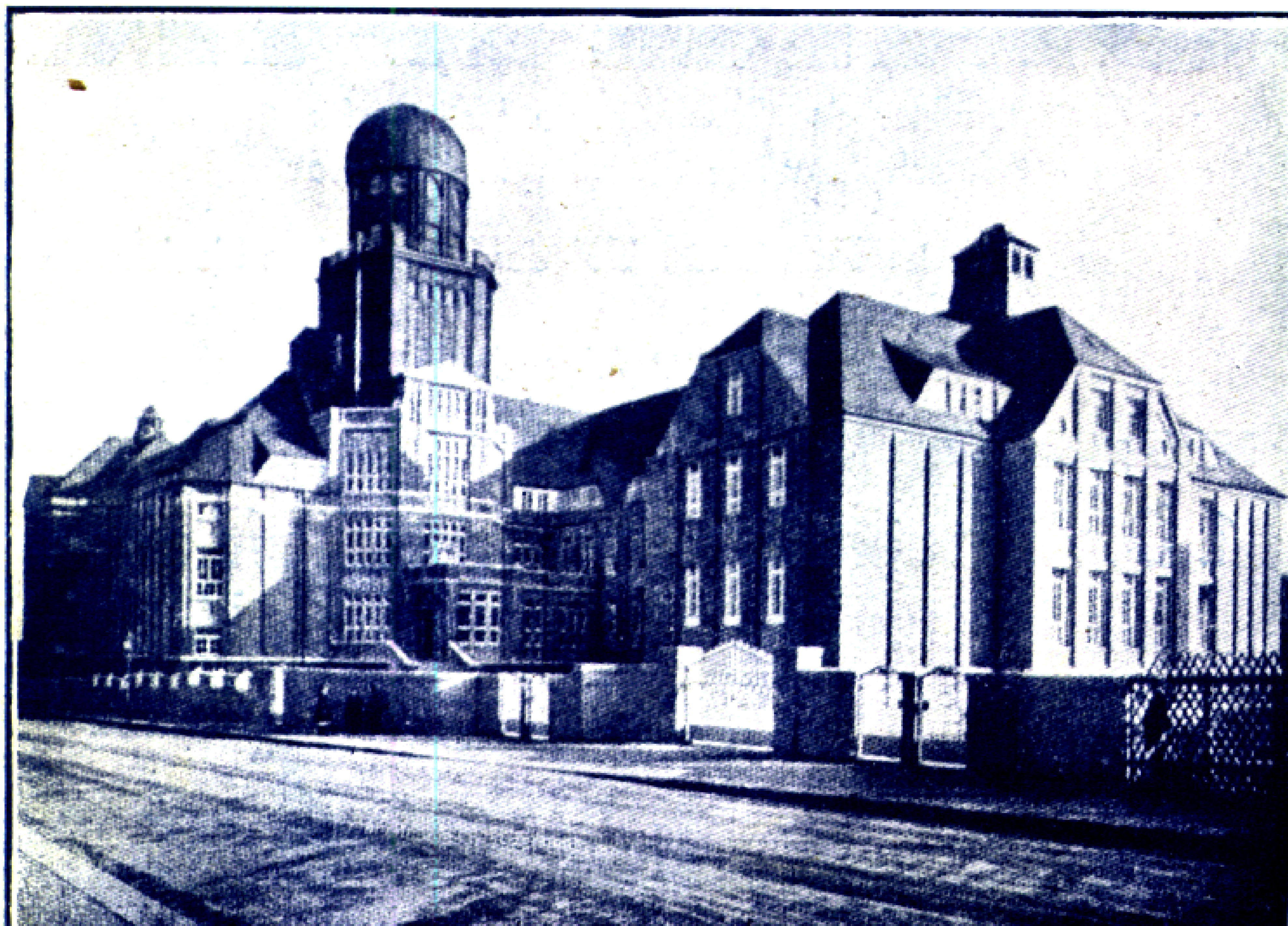
Honorar für einen Vortrag RM. 1.—

Vorverkauf in der **Akademischen Buchhandlung Focken & Oltmanns,** Bismarckplatz 14, und bei den **Kastellanen** der **Technischen Hochschule,** Bismarckplatz 18 und Helmholtzstraße 5.

Verkauf der Eintrittskarten auch an der Abendkasse

ড্রেসডেনের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থকারের বক্তৃতা
(১ ও ৩ জুলাই ১৯৩১)

পৃঃ ১৯



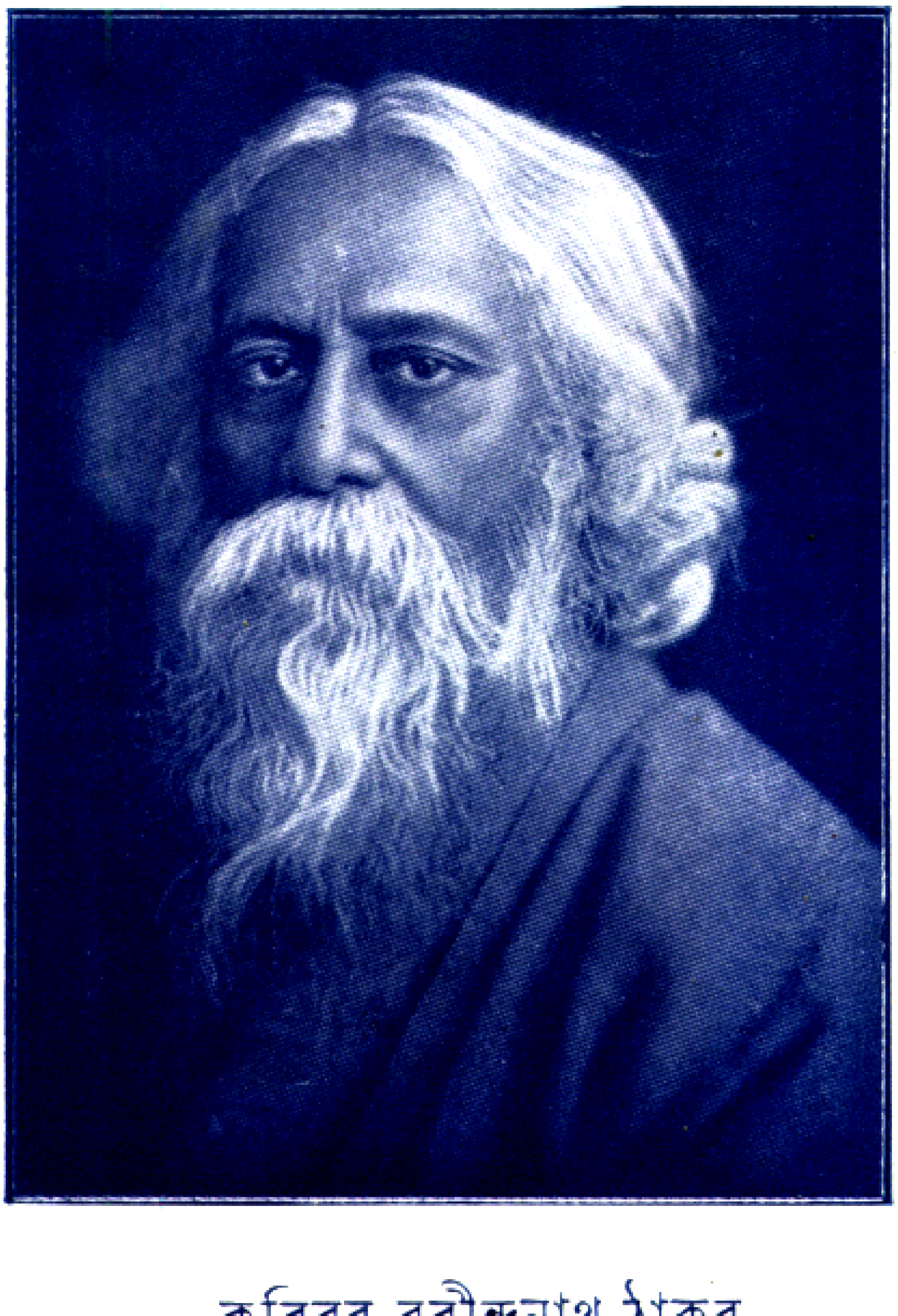
ড্রেসডেন,—টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

পৃঃ ৩৫৯,৬০২



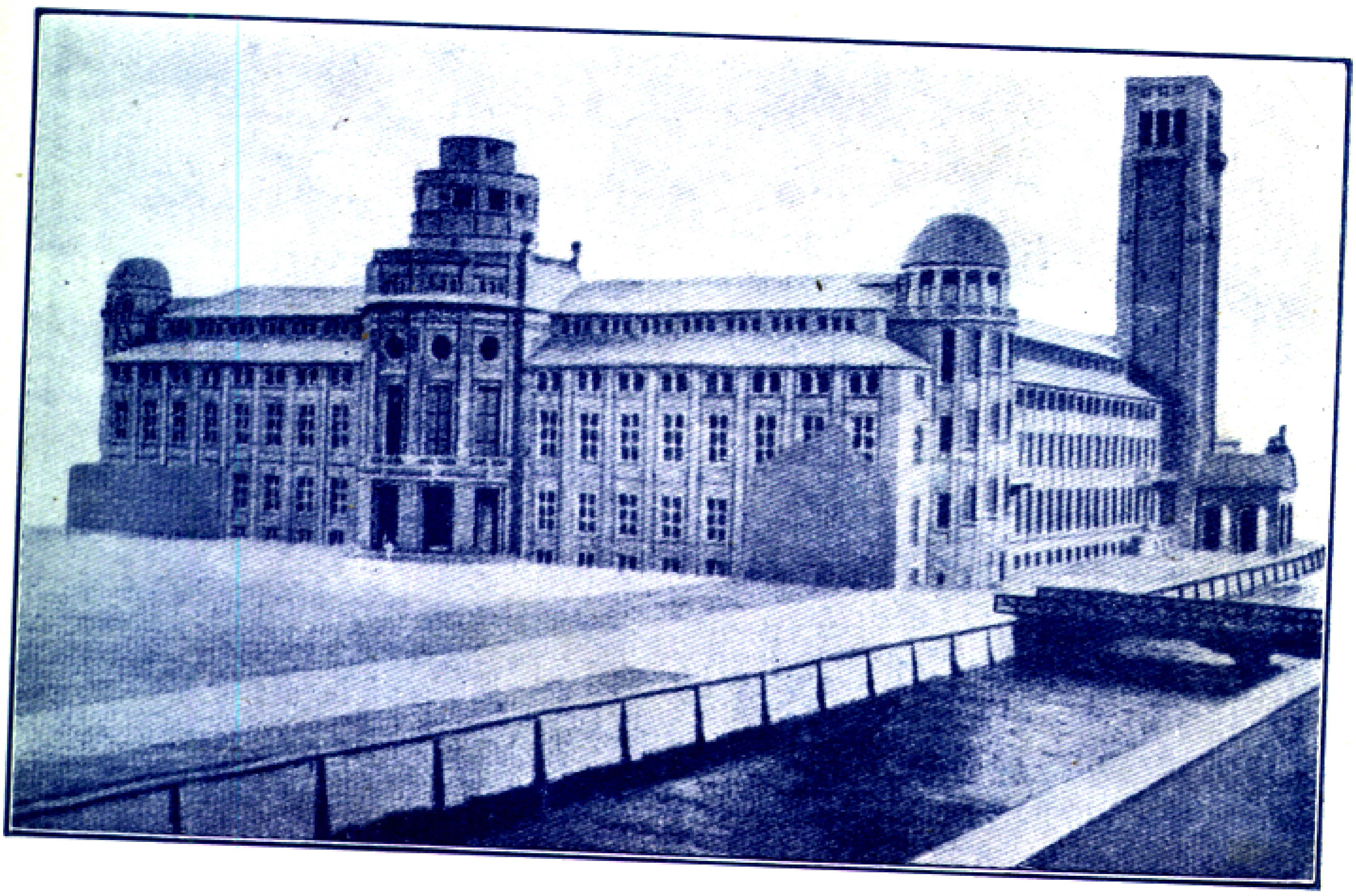
লোকপ্রিয় জননায়ক যতীন্দ্রনাথ বসু

পৃঃ ৬৫৮



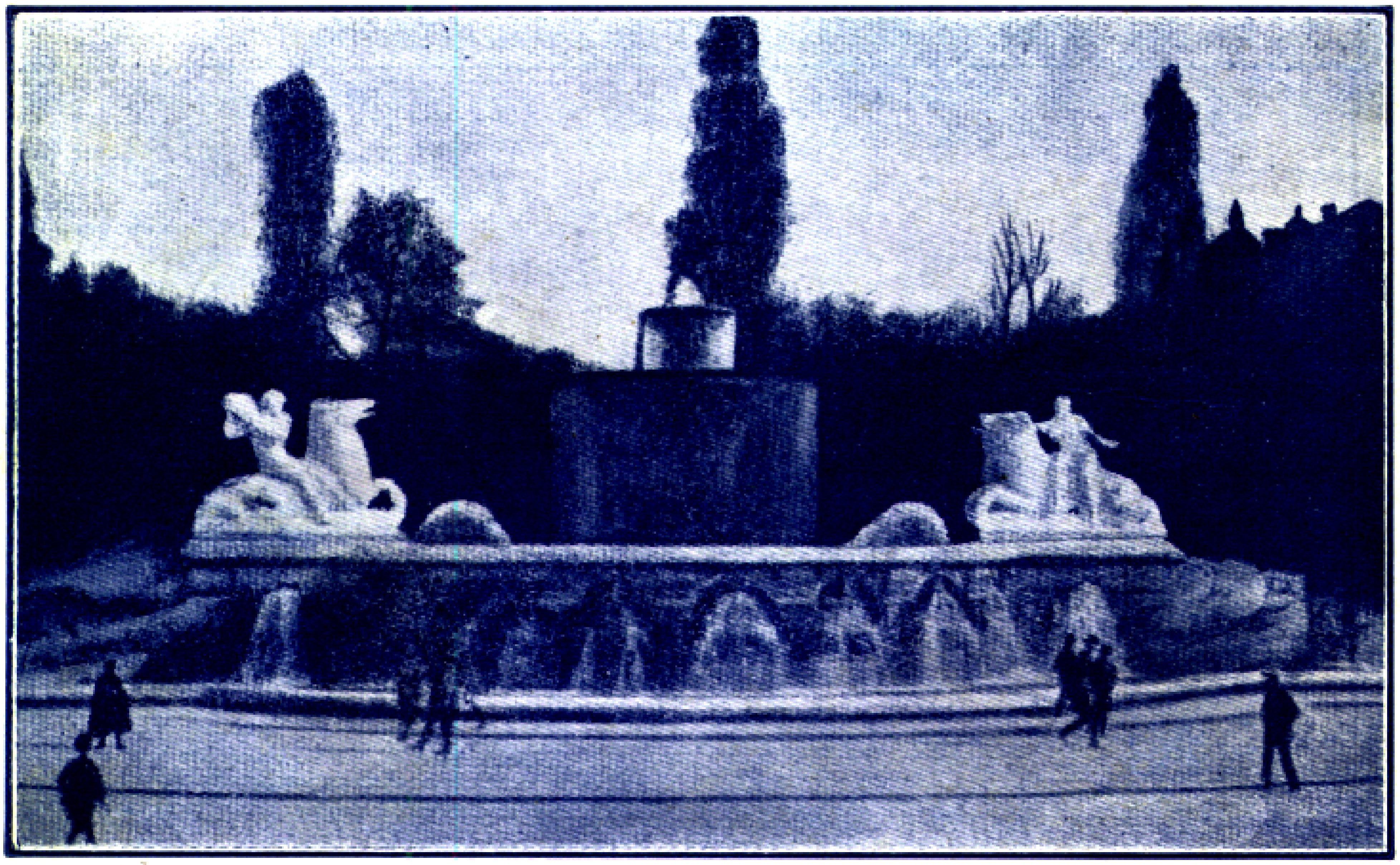
কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃঃ ৩৩৪,৩৩৯,৬৫৭,৬৫৮



মিউনিক,—"ডয়চেস্ মুজেয়ুম"

পৃঃ ৫১০,৫৯৭,৬৪৭



মিউনিক,—জলের ফোআরা (হিল্ডেব্রাণ্ডের গড়া)

পৃঃ ১৬৬, ৫২২

Deutschland und das moderne Indien

Unterredung mit Professor Benoy Kumar Sarkar in München



Das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat bekanntlich durch Vermittlung der Deutschen Akademie Herrn Professor Benoy Kumar Sarkar aus Kalkutta für zwei Semester an die Technische Hochschule in München berufen. Der hervorragende Gelehrte, der schon in München weilt, hatte die Freundlichkeit, uns eine Unterredung zu gewähren.

„Deutschland macht mit Indien ein jährliches Geschäft von über 700 Millionen Reichsmark. Das sind pro Kopf der Bevölkerung 10 Reichsmark. In dieser Tatsache drückt sich schon etwas von der Wichtigkeit meiner hiesigen Tätigkeit aus."

Mit diesen Worten begann Professor Sarkar das Gespräch. Er ist ein noch junger, sehr sympathischer und äußerst lebhafter Mann, der beweist, daß ein Übermaß von Wissen noch lange keine weißen Haare und keinen weltfremden Sonderling machen müssen. Denn der indische Professor ist ein hervorragender Gelehrter.

Im Jahre 1887 in Kalkutta geboren, bekommt er von der indischen Regierung das Staatsstipendium für höhere Studien. Mit 20 Jahren veröffentlicht er seine ersten Arbeiten. Es erscheint die „Nationalerziehung im alten Griechenland", mehrere Sprachunterrichtsbücher, Hilfswerke zur Allgemeinbildung, ferner „Geschichtskunde und die Hoffnung der Menschheit", ein Werk, das seinerzeit großes Aufsehen erregte. Sarkar wandte sich später pädagogischen Problemen zu und errichtet Schulen in Brugalan. Er bildete eine Anzahl Lehrer heran und gründete einen Fond, aus dessen Mitteln indische Schüler zum höheren Universitätsstudium in das Ausland geschickt werden konnten. In der gleichen Zeit begründete er eine bengalische Monatsschrift für Weltkultur, Wirtschaftswohlfahrt und sozialen Wiederaufbau.

1914 bis 1925 war Sarkar auf Forschungsreisen. Er studierte 11½ Jahre Fragen der Industrie, der Erziehung, der Literatur, Kunst und Wissenschaft und die sozialen Einrichtungen in England, Amerika, Deutschland, Frankreich, Österreich, in der Schweiz, in Italien, Japan, China, in der Mandschurei und in Hawai. Eine Reihe von Büchern sind der Niederschlag seiner Studien. Viele Universitäten der ganzen Welt laden ihn zu Vorlesungen ein. Er wird Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften. Er übersetzt Werke der deutschen Nationalökonomen Lißt und Engels ins Bengalische und gibt in Indien drei Zeitschriften heraus. Dann begründet und leitet er das bengalische Institut für Wirtschaftswissenschaft und wird Rektor der Technischen Hochschule in Kalkutta. Seit 1929 wieder in Europa, hat er fast an allen Universitäten Vorträge gehalten und hat nun die Einladung der Technischen Hochschule in München angenommen.

„Was betrachten Sie als Ihre vornehmste Aufgabe an den deutschen Universitäten?"

„Ich will hier in Deutschland ein Bild des modernen Indien, wie es wirklich ist, zeigen. Denn es gibt in Indien nicht nur Asketen und Religionsstifter, sondern auch Männer, die mit Stahl und Eisen zu tun haben. Ich betone das positivistische Element und will die indische Kultur von einem Standpunkt aus erörtern, der bisher von den europäischen Gelehrten negiert worden ist. Indien ist auf dem Wege, ein moderner Staat zu werden, und ich will meinem Lande dabei nützen. Deutschland hat durch sein soziales Fürsorgewesen die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gelenkt. Nicht nur das klassische Deutschland, das Land Goethes und Beethovens ist groß, sondern auch die wirtschaftlichen Einrichtungen in Deutschland sind nachahmenswert. Das Berufswesen, die Fachschulen, die Arbeitergesetze, die sozialen Frauenschulen usw. sind ganz große Beiträge zur modernen Weltkultur, konkrete Dinge, die zu Hauptfaktoren des öffentlichen Lebens geworden sind. Wenn ein Ausländer nach Deutschland kommt, muß er diese Dinge ansehen. Deutschland, das heute schon wieder den Vorkriegsstand im Außenhandel erreicht hat, muß für die nächsten zehn Jahre noch einen neuen großen Plan suchen. Ich bin durchaus optimistisch; nur aus der Wissenschaft können die führenden Männer der Industrie und des Handels lernen. Und so will ich Deutschland mit den Tatsachen über das moderne Indien informieren. Ich lese in München zwei Semester über das wirtschaftliche und soziale Indien der Gegenwart."

Max Pillieger

"সোন্‌টাগ্‌স্‌-পোষ্ট" পত্রিকায় গ্রন্থকারের মতামত আলোচনা

(মিউনিক, ৬ এপ্রিল, ১৯৩০)

পৃঃ ৮৶০

Stadtzeitung

. Mai 1930 Nr. 130

Indien in München.

Eine Unterredung mit Professor Sarkar.

Seit kurzer Zeit weilt der indische Forscher und Gelehrte Prof. Benoy Kumar Sarkar aus Kalkutta in München, um auf Einladung der bayerischen Staatsregierung durch Vermittlung und mit Unterstützung der deutschen Akademie als Gast-Professor an der Technischen Hochschule Vorlesungen über indische Volkswirtschaft der Gegenwart zu halten.

In einem kleinen, stillen Stübchen an der Karlstraße sitze ich einem schlanken, jung aussehenden Mann gegenüber, dessen faltenloses, braunes Antlitz mit den blitzenden Augen und glatten, schwarzen Haaren den Inder verrät. Das jugendliche Aussehen läßt in dem sonnenbraunen Herrn kaum einen Gelehrten vermuten, dessen Forschungen und zahlreiche Veröffentlichungen in der Kulturwelt großes Aufsehen erregten. Das Problem, das Prof. Benoy Kumar Sarkar beschäftigt, ist das Weltwirtschaftsproblem in seiner Beziehung auf Indien, das heute politisch und wirtschaftlich-kulturell aufgewühlte Land, das „erwachende Indien". Wenn auch heute der Name Sarkar noch nicht so volkstümlich geworden ist und von Scheu und Bewunderung getragen von Mund zu Mund fliegt, wie etwa der Ghandis, so sind die Forschungen Sarkars doch vielleicht grundlegend, um eines Tages unsere Anschauungen über Indien vollkommen zu ändern. Als Pionier Indiens geht Sarkar von seinem wirtschaftlichen und soziologischen Standpunkt aus vollkommen mit den Erweckern und Trägern der neuen Zeit in Indien einig.

Während wir über die kulturelle Stellung der Führer des heutigen Indiens plaudern, habe ich plötzlich gar nicht das Gefühl, einem Ausländer, einem Exoten sogar, dessen Heimat, in der seine Vorstellungen doch verwurzelt sind, Tausende von Meilen von hier liegt, gegenüberzusitzen. Nicht allein darum, weil Prof. Sarkar fließend deutsch spricht, im Bannkreis der Frauentürme sehen sich vielmehr die von uns berührten indischen Probleme so natürlich, so wenig fremd, so verwandt mit den unsrigen an, als wären es eigene. Fast natürlich finde ich es, daß Sarkars Gattin, die am Nebentisch sitzt und bisweilen mit klugen Bemerkungen am Gespräch sich beteiligt, namentlich, wenn von Frauenfragen die Rede ist, wie sich herausstellt eine waschechte — Tirolerin ist.

Wir sprechen von dem Gegensatz zweier Gefühlswelten, der orientalisch-indischen und der christlich-deutschen, von den zwei Kulturen des Orients und des Okzidents. „Ein Gegensatz zwischen Osten und Westen?" lacht Sarkar und fügt ernst hinzu: „Ein Gegensatz zwischen Indiens und Europas Kultur, Geschichte des Altertums und des Mittelalters bis in die neue Zeit herein existiert überhaupt nicht! Ueberlieferungsgemäß ist allerdings jeder Wissenschaftler der Meinung, daß die Weltanschauung des Ostens sehr verschieden sei von der des Abendlandes. Meine Mission hingegen ist es gerade, gestützt auf meine elfeinhalbjährigen Studien und Forschungen auf dem Gebiete der Industrie, Erziehung, Literatur, Kunst, Wissenschaft und des Sozialdenkens in vielen Ländern der Welt, in Aegypten, England, Schottland, Irland, in den Vereinigten Staaten, Hawai, Japan, Korea, Mandschurei, China, Frankreich, Deutschland, Oesterreich, Schweiz und Italien, in diesem Punkt aufklärend zu wirken. In Deutschland sehe ich nur den jüngeren Bruder," erklärt Sarkar, der Deutschland seit 1921 genau kennt und viele Beziehungen zu deutschen Wissenschaftlern und Politikern unterhält. Indien braucht heute diesen Bruder, der ihm ein Vorbild ist, dem es aber auch viel zu geben hat. Deutschland und Indien, den Osten und den Westen, trennte bis zur Erfindung der Dampfmaschine nichts. Sarkar hat in seinen Forschungen und erstaunlich vielen Veröffentlichungen die These aufgestellt, daß objektiv und chronologisch kein Unterschied in der Ideologie und in den wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen der Ost- und Westvölker durch Jahrtausende besteht. Das mittelalterliche materialistische und geistige Leben Indiens und des katholischen Europas, die verfassungsrechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen waren fast vollkommen gleich. Auch in der alten Geschichte läßt sich bis auf 5000 Jahre zurück die Gleichheit der Weltanschauungen nicht nur in geistigem und metaphysischem Sinne, sondern auch im materialistischen Element verfolgen. Mit dem Aufkommen der Dampfmaschine in der Weltgeschichte hingegen trat zum erstenmal ein wichtiger Unterschied im Leben der östlichen und westlichen Völker ein. Die östlichen Völker blieben in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zurück, die westlichen industrialisierten sich unter der Herrschaft der Maschine. Seit dem Jahre 1875 aber griff die Industrialisierung auch auf Indien über. Die Weltgeschichte ist noch nicht, aber sie wird wieder ausgeglichen. Den Vorsprung des Abendlandes können Indien und der Osten nicht auf einmal einholen. Aber, wie Geheimrat Prof. Dr. Ossana bei der Einführung des indischen Gelehrten in unserer Technischen Hochschule ausführte: „Nationalökonomen und Großindustrielle in Deutschland können nur irregeführt werden, wenn sie annehmen, daß die indische Volkswirtschaft der Gegenwart ausschließlich Agrarwirtschaft ist. Die allmähliche Entwicklung der Industrien auf indischem Boden bildet heute eines der wichtigsten Merkmale der Weltwirtschaft."

Das ist das indische Problem, wie es, im Bannkreis der Frauentürme aufgerollt, sich ansieht. Der Anteil Deutschlands an Indiens Wirtschaft ist im Geben und Nehmen nicht gering. Deutschland hat im Ein- und Verkaufsmarkt heute sogar bereits wieder seinen vorkriegszeitlichen Stand erlangt, und mit dem Fortschritt der Industrialisierung Indiens, die in raschem Tempo vor sich geht, werden, abgesehen von seiner angestrebten politischen und wirtschaftlichen Freiheit, die Verhältnisse für Deutschland, das als altes Kulturland sich höchster Achtung bei den Indiern erfreut, noch günstiger

Von diesem Standpunkt aus ist die wissenschaftliche Aufklärungsarbeit, die der große indische Gelehrte leistet, für uns sehr bedeutungsvoll. Er hat zum erstenmal die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt auf die innere Uebereinstimmung des Ostens und Westens gelenkt und große Beachtung gefunden. Das Wort Europa und Orient, Osten und Westen wird, nach seiner Ueberzeugung, einmal verschwinden, und es wird nur noch die Begriffe Altertum, Mittelalter und neue Zeit geben. Die eigenartige Betrachtungsweise Sarkars, dessen Schriften in allen Kultursprachen, besonders englisch und deutsch, erschienen sind, der große nationalökonomische Zeitschriften begründete und herausgibt und das bengalische Institut für Nationalökonomie zu weiterer Forschertätigkeit in seinem Sinne ins Leben rief, wird manche Hemmungen und Vorurteile im Verkehr mit Indien bei uns Deutschen hinwegräumen.

Das kleine Stübchen wurde zur weiten Welt. Ich sah das Sonnenland Indien, das heute in Erregung sich befindet, im Aufstieg und wirtschaftlicher und kultureller Einheit mit uns, dem einstigen Abendland

gu.

“ম্যিন্‌চেনার ৎসাইটুঙ্‌” পত্রিকায় গ্রন্থকারের মতামত আলোচনা

(১৩ মে, ১৯৩০)



গীতি-কবি ষ্টেফান্ গেওর্গে

পৃঃ ২৯০



শিল্পনায়ক আউগুষ্ট্ টিস্সেন

পৃঃ ৩৩২,৪২৬

Ausschuß für auslandkundliche und auslanddeutsche Veranstaltungen an der Technischen Hochschule Stuttgart

Vorankündigung

Im Wintersemester 1930/31

ist ein auslandkundlicher Kursus

über Indien

in Aussicht genommen. Eine Reihe hervorragender Kenner Indiens ist dafür als Redner gewonnen worden.

Es werden sprechen:

Herr Prof. Dr. Kraus-Frankfurt über „Land und Leute in Indien" (mit Lichtbildern).
Voraussichtlich am 6. November 1930.

Herr Prof. Dr. Sarkar Kalkutta über „Die Entwicklung und weltwirtschaftliche Bedeutung des modernen Indien".
Voraussichtlich am 14. November 1930.

Herr Dr. Nobel-Berlin über „Technik und Verkehr im heutigen Indien".
Voraussichtlich am 28. November 1930.

Herr Prof. Dr. Haushofer-München über „Indien, Asien und Europa. Die geopolitischen Probleme Indiens".
Voraussichtlich am 12. Dezember 1930.

Samtliche Vorträge finden im großen Hörsaal des Neubaus der Technischen Hochschule (Keplerstr. 10) statt.
Der Eintritt zu samtlichen Vorträgen ist frei.



Univ.-Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar (Kalkutta) spricht am Freitag, 24. Oktober über das Problem der Industrialisierung Indiens

Radio-Wien 17.OKT.1930

Ein Inder über Indien.

Ein Inder über Indien. Der große Hörsaal in der Technischen Hochschule war überfüllt, als der noch junge, dunkelhäutige, sehr freundliche Professor aus Kalkutta Dr. Sarkar das Podium betrat, um über die Entwicklung und [illegible] wirtschaftliche Bedeutung Indiens [illegible] sprechen. Dr. Sarkar sprach Deutsch, sehr fließend, nur manchmal infolge einer noch nicht ganz richtigen Aussprache etwas schwer verständlich. Was er sagte, war außerordentlich bezeichnend für die Stellungnahme des modernen Asiens. Er sprach geradezu europäischer als ein Europäer. Die technisch-wirtschaftliche Entwicklung ist nicht etwa, auf Klima, Rasse und Weltanschauung beruhend, eine europäische Angelegenheit. Die Völker der Welt unterscheiden sich lediglich im Zeitpunkt des Beginns und im Tempo der Industrialisierung, und Indien ist heute einer Reihe von europäischen Ländern voran. Sein wirtschaftlicher Zustand entspricht etwa dem Deutschland kurz vor 1870, d. h. kurz vor der Zeit, in der Deutschland in raschem Aufstieg das bis dahin weit voran liegende England einholte. Dr. Sarkar zog die Vergleiche bis ins Einzelne. Er ging davon aus, daß am Ende des 18. Jahrhunderts (1784) Europa und Asien in der wirtschaftlichen Entwicklung noch gleich gewesen seien, nämlich im Zustand von Agrarstaaten. Dann hat zuerst England, später Frankreich und Deutschland sich industrialisiert. In Indien wurde die Entwicklung von den Engländern künstlich niedergehalten, es sollte Agrarland bleiben. Erst der Weltkrieg hat England gezwungen, die wirtschaftlichen Kräfte Indiens sich freier entwickeln zu lassen, (da es selbst den Ausfall Mitteleuropas nicht auszufüllen vermochte) und heute geht der Zwang für England von dem Bedürfnis aus, sich gegen seine zukünftigen Kriegsgegner (Türkei, Rußland) in Indien eine starke Unterstützung heranzubilden. Indien muß heute um zwei Dinge kämpfen, die die führenden Staaten Europas längst erreicht haben und die die wirtschaftliche Entwicklung entscheidend beeinflußten, um einen nationalen, demokratischen Staat und um eine Staats-Finanzwirtschaft nach sozialen Gesichtspunkten.

Man müsse sich darüber klar sein, daß Indien genau die gleiche technisch-wirtschaftliche Entwicklung durchmache wie die europäischen Staaten. Die gegensätzlichen Begriffe sollten nicht die Europa und die Asien, sondern die Mittelalter (in Asien und Europa) und die Neuzeit (ebenfalls in Europa und Asien) heißen. Man übersehe allzusehr auf der einen Seite die durchaus auch noch vorhandene mystische, nichtmaterialistische Strömung in Europa und auf der andern Seite die technisch-wirtschaftlichen Leistungen Asiens.

Die Konkurrenz der erstarkenden indischen Wirtschaft werde sich natürlich bemerkbar machen, sie werde dazu beitragen, die „zweite Industrierevolution" in Europas hochentwickelten Staaten — Sarkar meinte damit offenbar die Sozialisierung — zu beschleunigen. Sie werde aber auch der Ausfuhr verfeinerter Erzeugnisse der Spezialindustrien immer größere Möglichkeiten — mit dem steigenden Wohlstand und den steigenden Bedürfnissen in Indien — eröffnen.

Professor Dr. Sarkar, der im Rahmen des Auslandkundlichen Kurses der Technischen Hochschule sprach, erhielt für seine interessanten Ausführungen starken Beifall.

Württemberger Ztg 15.NOV 1930 Stuttgart

[illegible] des modernen Indiens

Der auslandskundliche Kurs über Indien an der Technischen Hochschule Stuttgart fand mit einem Vortrag des indischen Professors Dr. Sarkar aus Kalkutta über „Die wirtschaftliche Bedeutung des modernen Indiens" seine Fortsetzung. Sarkar, ein hervorragender Typus seiner Rasse, schon äußerlich und noch mehr durch seine in fließendem Deutsch vorgetragenen Ausführungen gewinnend, versuchte den zahlreich erschienenen Zuhörern ein Bild von der Entwicklung Indiens zum modernen Industriestaat zu geben. Wenn man in Betracht zieht, daß Indien heute bereits 64 000 Kilometer Eisenbahnlinien besitzt, 10 Prozent mehr als Deutschland, ferner 340 eigene Baumwollfabriken mit 9 Millionen Spindeln, an denen 400 000 Arbeiter beschäftigt sind, so ist allein dadurch schon der ungeheure Einfluß dieses Landes auf den Welthandel augenfällig gemacht. Die Ausschaltung der englischen Konkurrenz schreitet fort. Wenn auch Indien heute noch zwei Generationen im Hinblick auf die europäische Kultur zurücksteht, so ist doch auch hier ein langsames und sicheres Aufholen festzustellen.

Der Redner gab nun mittels der Methode des vergleichenden Industrialismus eine Uebersicht über die wirtschaftliche Entwicklung Indiens im Vergleich zu derjenigen Deutschlands von 1785—1860. Durch die starke Förderung des Bergbaus, der Oelgewinnung, der metallverarbeitenden Industrien sei das kapitalistische System fortgeschritten, was durch Entstehen einer Arbeiterbewegung einerseits, durch Erlaß eines Fabrik- und Arbeiterschutzgesetzes, Gründung von Handelskammern, Banken usw. andererseits zum Ausdruck gekommen sei.

Professor Sarkar erläuterte eingehend die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe der modernen, gegen England gerichteten Swa-Deshi-Bewegung, die auf nationaler Grundlage eigenes Land mit eigener Industrie fordert. Er betont als Inder für sein Land die Notwendigkeit, zu einer nationalgesinnten [illegible] Staatsleitung zu kommen, die eine sozialisierte Staatsfinanzpolitik betreiben müsse, um die Selbständigkeit Indiens als Volks- und Wirtschaftskörper mehr und mehr zu entwickeln. — Professor Sarkar verstand es, durch seine mit großer Ueberzeugung vorgetragenen Ausführungen die Zuhörer stark für die Zukunft Indiens zu interessieren.

D.

Neues Tagblatt, Stuttgart 17. Nov 1930

Die Gesellschaft der Freunde u. Förderer der Universität Innsbruck

und die

Tiroler Freunde der Deutschen Akademie

laden zu nachfolgenden

VORTRÄGEN

des

Herrn Professor Benoy Kumar Sarkar

aus Kalkutta (Indien) ein

1. *Freitag, 28. November 1930: Die staatlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen des indischen Volkes im Rahmen der indogermanischen Kultur*
2. *Samstag, 29. November 1930: Die industriellen und kommerziellen Wandlungen im heutigen Indien.*

Ort: Hörsaal III des alten Universitäts-Bibliotheksgebäudes, Universitätsstr. 6/II St. Zeit: 20 Uhr. – Die Vorträge sind allgemein zugänglich und unentgeltlich.

Am 28. November findet nach dem Vortrag eine zwanglose Zusammenkunft mit dem Vortragenden im blauen Saale des Hotels Maria Theresia statt.

Gilt als Eintrittskarte.

DWG

Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellschaft E. V.
Berlin W 50, Spichernstr. 16IV links
Fernsprecher: B 4 Bavaria 0522 - Postscheckkonto: Berlin 118512

Einladung zum **Diskussionsabend**
im Preußischen Oberverwaltungsgericht Hardenbergstraße 31
(Nähe Bahnhof Zoologischer Garten)
am **Freitag,** dem **21. November 1930, abends 8 Uhr pünktlich**

Britisch-Indien

Einleitende Referate: Prof. Benoy Kumar **Sarkar**-Calcutta (mit Vorlesungen an der Technischen Hochschule München beauftragt.)
Prof. Dr. **Horovitz**-Frankfurt (Main)

Nach dem Vortrag geselliges Beisammensein im Restaurant Koschwitz
Stadtbahnbogen Bhf. Zoo, hinterer Saal.

Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellschaft E. V.

ষ্টুটগার্ট-ইন্‌সব্রুক-ভিয়েনা-বার্লিনে গ্রন্থকারের বক্তৃতা
(অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৩০)
পৃঃ ১৮, ৫৬২-৫৬৭, ৫৭০-৫৭৪, ৫৯৮-৬০১

TECHNISCHE HOCHSCHULE MÜNCHEN
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE ABTEILUNG

MÜNCHEN, den 12.März 1931.
FERNSPRECHER 54601

Herrn Professor Benoy Kumar S a r k a r ,

M ü n c h e n ,
Luisenstr.23/III.

Sehr geehrter Herr Kollege,

Nachdem das Sommersemester nunmehr abgelaufen und damit Ihre Lehrtätigkeit als Gastprofessor an unserer Hochschule zum Abschluß gekommen ist, möchte ich nicht unterlassen, namens der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung noch einmal, wie ich das bereits im vorigen Jahre getan habe, meiner Freude darüber Ausdruck zu geben, daß wir durch das großzügige Entgegenkommen der Deutschen Akademie in Ihnen im vergangenen Studienjahre einen Fachkollegen aus Indien haben kennen lernen und als unseren Gast in unserem Lehrkörper haben aufnehmen dürfen.

Indem ich mich der Hoffnung hingebe, daß Sie die Zeit Ihrer Gastprofessur an der Technischen Hochschule München in angenehmster Erinnerung behalten und daß die durch Ihre Tätigkeit in Deutschland angebahnten freundschaftlichen indisch-deutschen Beziehungen sich durch Sie unter Führung der Deutschen Akademie recht ersprießlich weiter entwickeln mögen, verbleibe ich

mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochschätzung

Ihr ergebener

[signature]

derz.Vorstand
d.Wirtschaftswissenschaftl.Abteilung
d.Technischen Hochschule München.

গ্রন্থকারের নিকট মিউনিকের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের
অর্থশাস্ত্রী হান্‌স্‌ ডর্ণের বিদায়-অভিবাদন (মার্চ্চ, ১৯৩১)

পৃঃ ৮৩০, ১/০, ৫৬২, ৬৪৭



কাশীবিদ্যাপীঠ-প্রতিষ্ঠাতা "ভাইয়া" শিবপ্রসাদ গুপ্ত

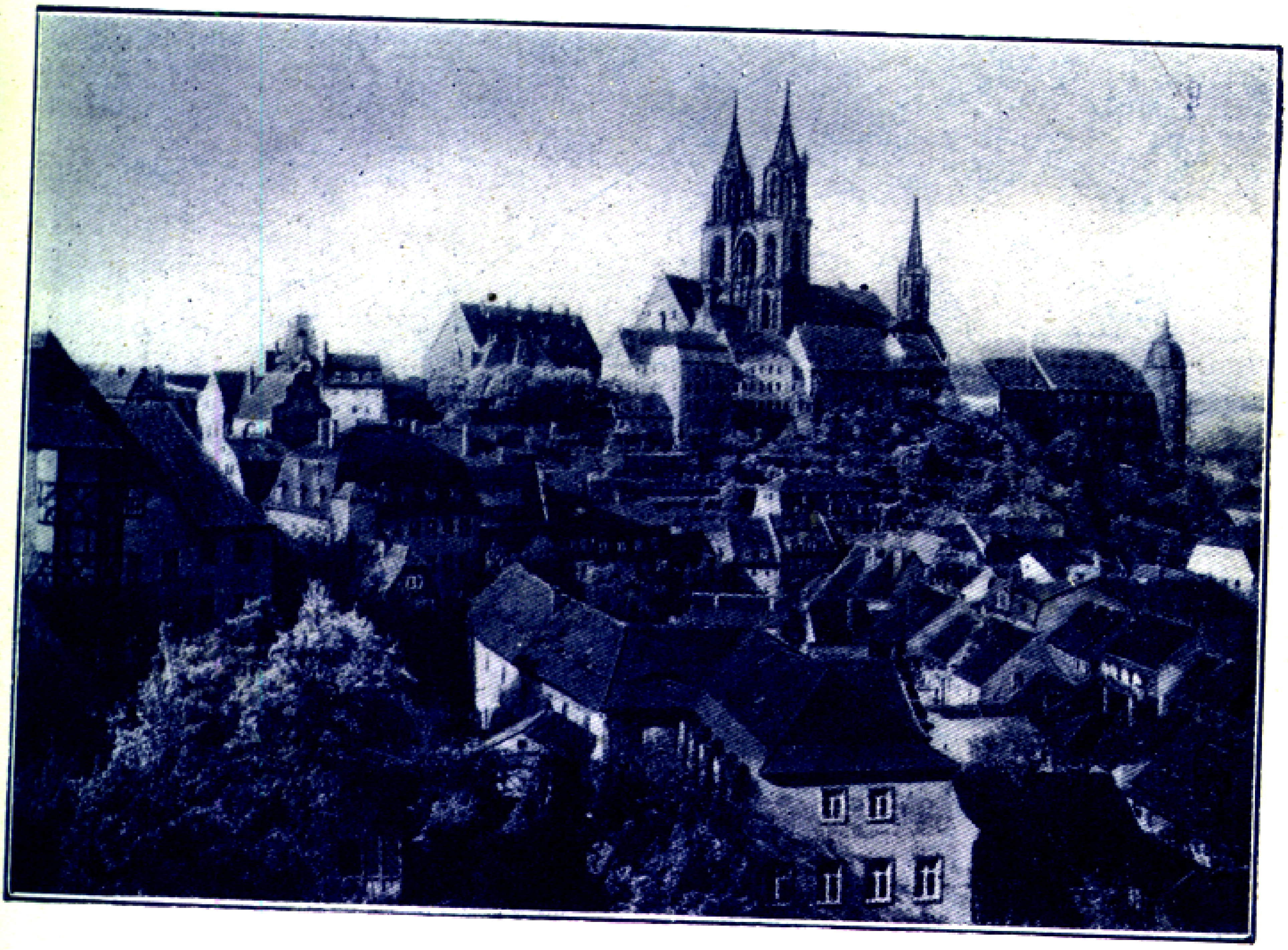
পৃঃ ১/০, ১৷০



যন্ত্রনিষ্ঠ শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহশীল
ইতিহাসসেবী নরেন্দ্রনাথ লাহা

পৃঃ ১।০, ৬৫৯

(৮৫)



মাইসেন

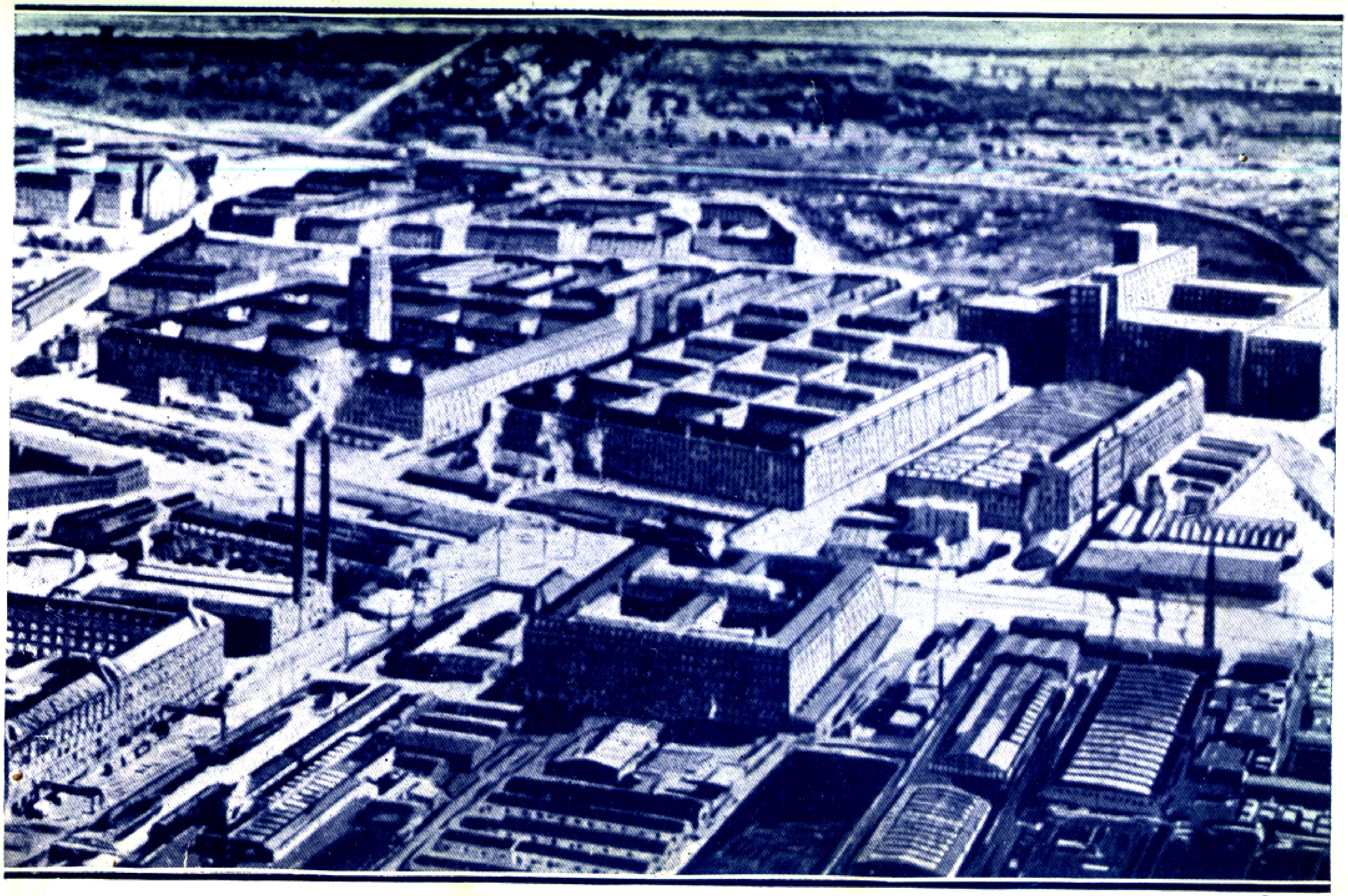
পৃঃ ৩৬৪



ভিয়েনার অর্থ-রাষ্ট্র-সমাজশাস্ত্রী ওথ্‌মার স্পান

পৃঃ ৪৫৫, ৫৯৮

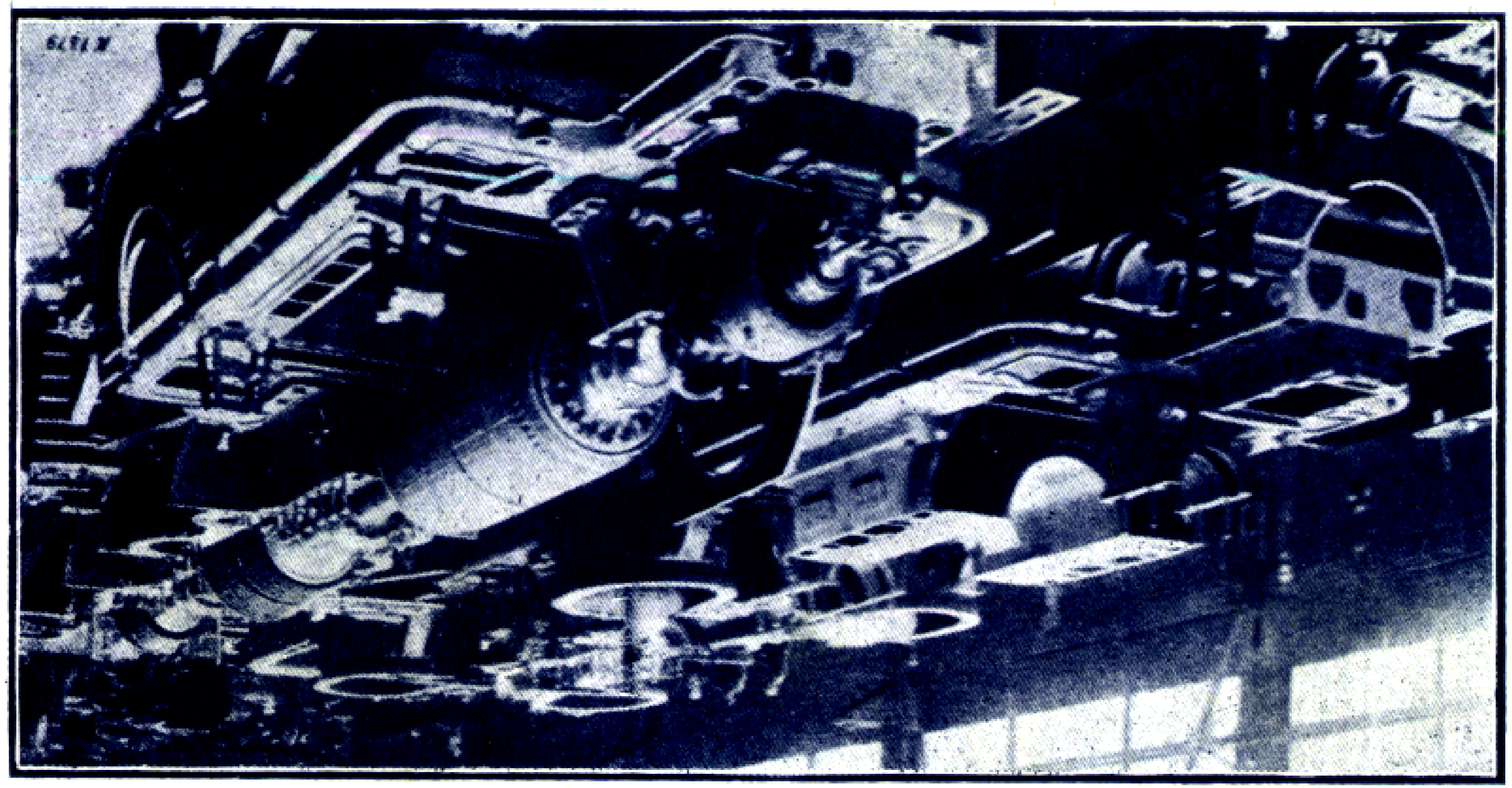
(৮৭)



"জীমেন্স্-নগর,—বালিন

পৃঃ ১৫৯-১৬১,৪২৫

(৭৭)



“আ-এ-গে” বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারখানা (বার্লিন)

পৃঃ ৪৪

Die andere Seite.

Von Prof. Dr. Max Rumpf-Nürnberg.

Vor einigen Wochen hatte das wirtschaftlich und geistig interessierte Nürnberg ein Erlebnis von besonderem Reiz und Seltenheitswert. Im Rahmen eines vom Nürnberger Hochschulbund veranstalteten Vortragsabends sprach Professor Benoy Kumar Sarkar, Direktor des Bengalischen Instituts für Wirtschaftswissenschaften in Kalkutta, über Wirtschaftsprobleme des modernen Indien. Auch die Nürnberger Presse würdigte den anregenden Vortrag.

Dem Deutschen ist es seit 1914 nicht mehr leicht gemacht, auf kürzestem Wege und aus erster Hand sich ein lebensechtes Bild zu machen von fremdem Volkstum, fremder Kultur und fremder Wirtschaft. Hier aber waren die besten Garantien dafür gegeben, daß man von einem sehr sachkundigen Kenner des fernen Ostens Richtiges und Wesentliches über das Indien und Asien von heute berichtet bekommen konnte. Wie er aussah und wie er sich gab, das nahm gleich für den Vortragenden ein: Ein schmaler, schlanker, nicht eben hochgewachsener Mann „in den besten Jahren", mit sympathischem Aeußeren, mit ebenso klugen wie lebhaften dunklen Augen; das Geistige und zugleich Aktive der ganzen Erscheinung noch unterstrichen durch eine schlichte abendländische Kleidung, die in ihrer Unauffälligkeit den Geboten abendländischer Herrenmode nur gerade so wenig einräumte, wie, um unauffällig zu bleiben, eben angängig; bei aller Anspruchslosigkeit der Gebarung aber dennoch voll weltmännischer Sicherheit und Urbanität.

Lediglich Sachlichkeit und Nüchternheit waren die Kennworte für jenen Vortrag in Nürnberg; wir erfuhren viel Neues über die jüngste Wirtschaftsentwicklung in Indien und deren Verhältnis zu den großen euramerikanischen Wirtschaften und Industrie- und Handelsvölkern: Mit welcher inneren Einstellung, mit welchen Zielen und welchen Hoffnungen der Fremde sich seit Jahren eine sehr eindringliche Kenntnis abendländischer Wissenschaft und Wirtschaft, Kultur und Zivilisation, Gesellschaft und Politik auf mehrfachen Europareisen und -aufenthalten verschafft hatte und worauf es dem derzeitigen Gastprofessor an der Technischen Hochschule in München in Richtung auf Europa und Asien über die wirtschaftlichen Probleme hinaus eigentlich ankam, das konnte man an jenem Abend noch mehr ahnen als unmittelbar aus dem Vortrag selber entnehmen.

Jetzt liegt mir eine Reihe von Veröffentlichungen Sarkars, freilich immer noch nur ein Bruchteil einer ungewöhnlich reichen schriftstellerischen Produktion, aus der Nachkriegszeit vor, und damit wird das Gesicht des Autors um vieles deutlicher und durchscheinender.

Soziologisch-volkskundlich und noch alles andere als kämpferisch ist zunächst noch ein 1917 in London erschienenes Werk über „Die Bedeutung des gemeinen Volks in der Hindukultur" („The Folk-Element in Hindu Culture"): ein fesselndes Buch, das der Verschlingung des Volkstümlichen mit dem Hochkulturlichen in religiösen Festen und Zeremonien, in Anrufungen, Gesängen und Tänzen sorgsam nachgeht und daher liebevoll besonders eben den eigenen Anteil des schlichten gemeinen Volkes am religiösen Leben würdigt.

Es ist dann gewiß nicht von ungefähr, daß die Nachkriegsbücher unseres Autors zwar auch noch vollgültige Zeugnisse von dem Schatze wissenschaftlicher Kenntnisse des Verfassers, aber doch zugleich viel mehr sein wollen, etwas ganz anderes sein wollen als bloß Zeugnisse sich selbst genügender Gelehrsamkeit.

Das sind recht eigentlich Aufklärungsschriften eines seine Heimat und seinen Erdteil leidenschaftlich liebenden Inders, gerichtet an das über den Osten sehr schlecht informierte und darum besser zu informierende Europa, Plädoyers für die Sache einer zu Unrecht unterschätzten Rasse und Kultur, — nein, zuweilen mehr als Verteidigungsreden, eher einen geistigen und zivilisatorischen Angriff in einem großen Befreiungskampfe vorbereitende schmetternde Fanfarenklänge.

„Der Wahrheit und Wissenschaft sowie dem Wiederaufbau der Kulturgeschichte" ist das „Die Lebensanschauung des Inders" betitelte, 1923 (bei Markert u. Petters, Leipzig) erschienene Buch gewidmet. „Jung-Asien" die 1922 ebenda auf Englisch veröffentlichte Schrift über „Die politischen Institutionen und Theorien der Hindus". Fällt die koloniale Ausbeutung und Unterdrückung Indiens den Engländern, Franzosen und Holländern zur Last, so hat Deutschland seinen besonderen Anteil an der geistigen Verfälschung des indischen Geschichtes.

Die Romantiker glaubten in Indien und seiner Literatur das Idealbild verträumter oder verzückter Romantik und Mystik entdeckt zu haben. Schopenhauer legte den Ton auf den Pessimismus und die Weltflucht des Nirwanaglaubens. Später fand Max Müller, anglisierter Deutscher und Oxfordmann und Sanskritforscher, auf die Frage „Was kann Indien uns lehren?" nur die Antwort „eine sublime Spekulation übersinnlicher, anderweltlicher Art", und — so können wir noch hinzufügen — um die Zeiten, als diese Schriften Sarkars erschienen, erneuerte des Grafen Keyserlingk „Tagebuch eines Philosophen" noch einmal das Bild eines unter einem heißen Himmel vegetativ dahinträumenden Indiens.

Sarkar führt seinen Kampf für Indien und für Asien insofern nach japanischem Muster, als er Euramerika zurückdrängen möchte mit den neuesten Waffen seiner Gegner selber. Die abendländische Zivilisation und Wissenschaft und Technik werden vollauf von ihm anerkannt und übernommen. Ja, mehr als das, es wird nachzuweisen unternommen, daß Indien und Asien von alters her ihre dem Abendlande nicht nachstehenden rechtlichen und politischen, sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen, auch ihre „Ismen", wie Demokratismus und Militarismus, in Theorie und Praxis gehabt haben, daß der Glaube an die Lässigkeit und Passivität und Außerweltlichkeit der Inder und des Orients widerlegt werde durch eine höchst bewegte Geschichte und oft überaus aktivistisch und energisch betriebene Politik und eine vollauf lebenmeisternde Organisation und Verwaltung. Alles in allem, so merkt unser asiatischer Berichterstatter einmal mitten im Texte, und gar nicht etwa bloß beiläufig am Rande, an, habe der Orient dem Okzident viel öfter den Krieg ins Land getragen und ihn seine Macht fühlen lassen als umgekehrt.

Während in den letzterwähnten beiden Werken mehr der Inder von Indien spricht, kommen in dem gleichfalls 1922 (bei J. Springer, Berlin) auf Englisch erschienenen Werke „Der Futurismus Jung-Asiens und andere Essays über die Beziehungen zwischen Ost und West" in realpolitischer Beleuchtung die ganzen schweren und weitschichtigen Probleme des fernen Ostens zu Raum.

Eigen ist die Haltung gegenüber Japan, demgegenüber es dem Inder wohl leichter sein wird als dem Chinesen, den panasiatischen Standpunkt innezuhalten. Sarkar betont, daß die Masse des Volkes in Japan sich auch heute noch der chinesisch-indisch-japanischen, also kürzer: der panasiatischen Wesensgemeinschaft bewußt geblieben sei. Nur die offizielle Politik müsse demgegenüber mitunter das Gesicht wahren, daß Japan um den Preis des Eintritts in die Reihe der euramerikanischen Großmächte nun auch als eine Macht und eine Zivilisation aufzufassen sei, die sich aus dem Rahmen der rückständigen asiatischen Welt herausgelöst und dem Abendlande wesentlich angenähert habe.

Auch Deutschland hat innerhalb Euramerika und seiner Großmächte und Wirtschaften nach dem verlorenen Kriege eine eigenartige und vorerst noch längst nicht wieder eindeutig gewordene Stellung eingenommen. Jetzt, wo die Deutschen auf eine letzte lange Weile weltpolitisch nicht so recht mitzuwirken vermögen, mag der Orient mit Recht vermuten, daß das wohl oder übel weltpolitisch ausgeschaltete Deutschland, das geistig zudem sonst doch sein Verständnis gerade auch für fremde und ferne Kulturen immer wieder bewiesen hat, innerhalb Euramerikas am ehesten den politischen und den kulturlichen Ansprüchen des Orients auf Unterlassung kolonisatorischer Intervention und auf Anerkennung menschlich-kulturlicher Ebenbürtigkeit zwischen West und Ost entgegenzukommen bereit sein wird.

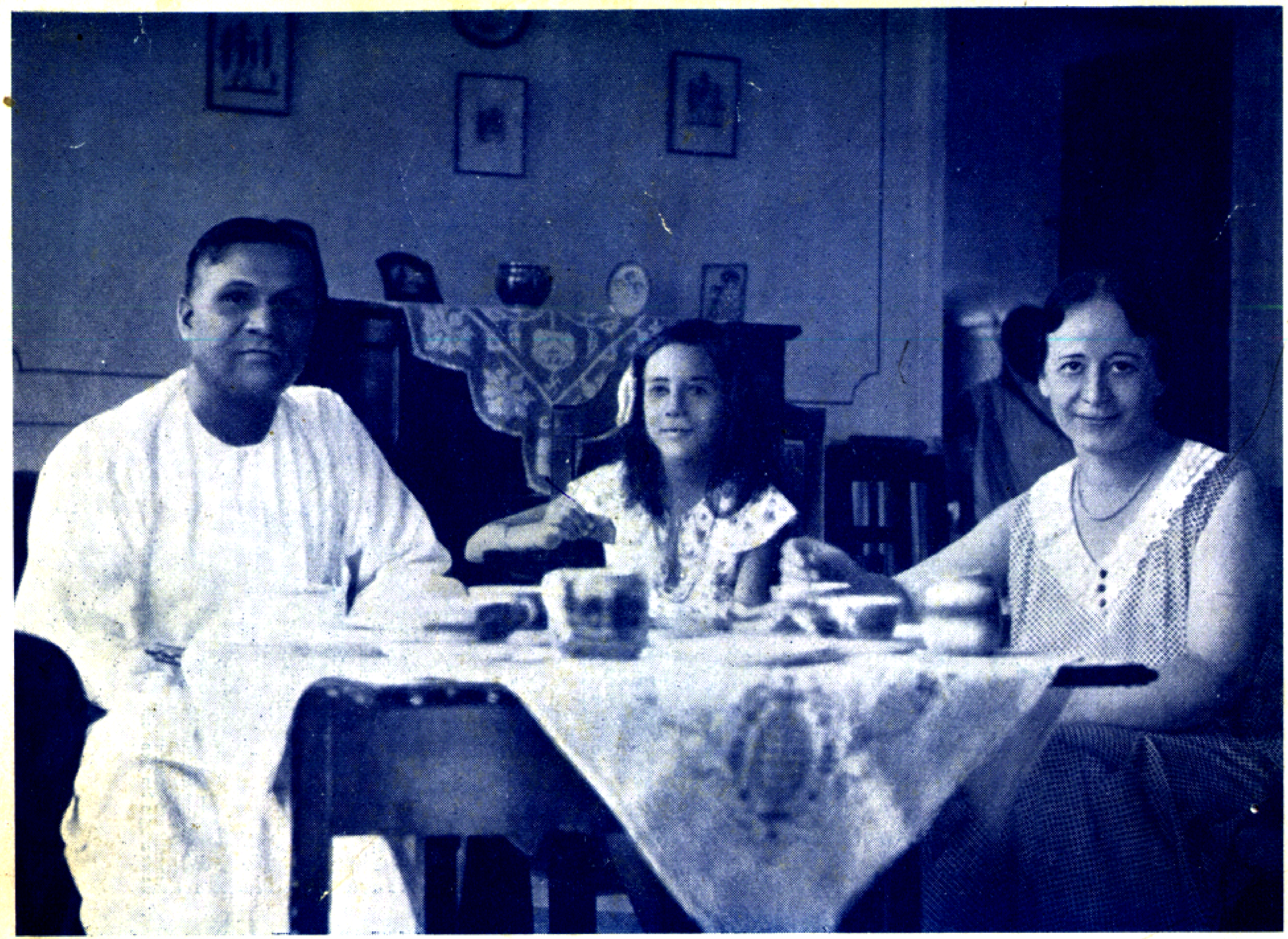
Freilich sagt uns unser indogermanischer Vetter nicht ausdrücklich, daß es Jungindien und Jungasien auf nichts weiter ankomme als auf ein solches faires Anerkenntnis wechselseitiger Gleichberechtigung. Wohl aber sagt er uns ausdrücklich, wieviel an Aktivismus und Selbstgefühl Asien durch den Europa verstümmelnden Weltkrieg zugeflossen ist. Und weil Asien dies so ansehen muß, wäre ihm eine zweite Auflage eines wiederum hauptsächlich auf dem Rücken der alten europäischen Kulturvölker auszupaukenden Weltkrieges durchaus nicht zuwider. Der Deutsche als das durch den Krieg so schmerzhaft gebrannte Kind wird mit gemischten Gefühlen bei Sarkar mit Anspielung auf die nationalen Blut- und Gebietsverluste Deutschlands den Satz lesen (Futurisme S. 25): „Eine große Hoffnung liegt für die unterjochten Nationen Asiens in der Aktivität dieser deutschen „Irredentas", deren jede die Saat eines neuen Krieges in sich birgt."

Wie dem auch sei und wie es werden möge: Sicher ist, das deutsche Volk und die deutsche Politik werden in der Zukunft Enttäuschungen und Fehlschläge am ehesten dann zu vermeiden wissen, wenn sie die Weltlage stets so sehen und einschätzen, wie sie wirklich ist. Dazu aber ist es gut, die Lage und die Nöte und die Hoffnungen des eigenen Volkes und Weltteils zur Selbstkontrolle und Selbstaufklärung immer wieder auch einmal ins Auge zu fassen ganz anders, wie wir es gemeinhin gewohnt sind, nämlich von „der anderen Seite" aus.

Fränkischer Kurier
Nürnberg. 8. April
1931

ন্যুর্ণ্‌ব্যার্গের "ফ্রেঙ্কিশার কুরিয়ার" পত্রিকায় অধ্যাপক রুম্ফ্‌-লিখিত গ্রন্থকারের মতামত-সমালোচনা (৮ এপ্রিল, ১৯৩১)

পৃঃ ১৯, ৫৯৮-৬০২

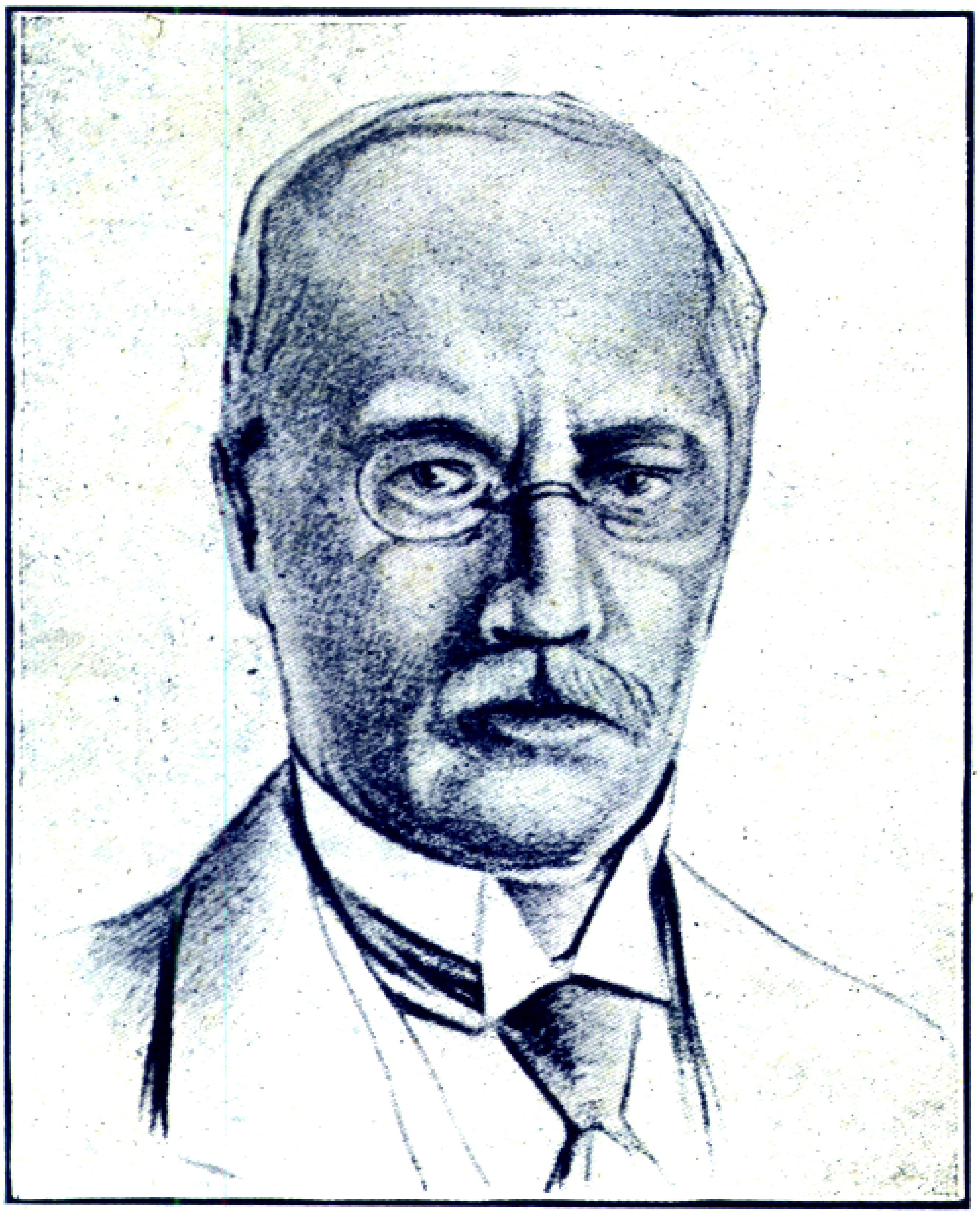


সপরিবারে গ্রন্থকার,—কলিকাতা, জুলাই, ১৯৩৪ (ভিয়েনার ফটোশিল্পী
শ্রীমতী মিট্‌সি স্পির্ক্‌ কলিকাতায় এই ছবি তুলিয়াছিলেন)।



বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ক্লিঙ্গেনবার্গ

পৃঃ ১৭০, ৫৯৯



বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ডীজেল



জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট সেনাপতি ফোন হিণ্ডেনবুর্গ
(১৮৪৭-১৯৩৪)

পৃঃ ৩৭৬, ৬৫৮



জার্ম্মাণি-বিজেতা আডোল্‌ফ হিট্‌লার

পৃঃ ৩৭৫,৩৯২,৩৯৩,৬০৫-৬২১,৬৩৫, ৬৫৬,৬৬০-৬৬৩

প্রথম অধ্যায়

বার্লিনের পথে

উত্তর ফ্রান্স ও দক্ষিণ বেল্‌জিয়াম

সেইনের জল পেটে পড়িতে না পড়িতেই প্যারিস ছাড়িতেছি। টিকেট কাটিলাম বার্লিন পর্য্যন্ত। ভরা গরম চলিতেছে, আগষ্ট মাসের প্রায় শেষাশেষি (১৯২১)। বার্লিন প্যারিসের উত্তর-পূবে, কাজেই গার-দু-নর্ অর্থাৎ উত্তরী ষ্টেশনের রেলে বসিতে হইল।

বিপ্লব-মুখো হইয়া বার্লিন চলিতেছি,—কেননা জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের এক পাকা কর্ণধার এর্ৎস্‌ব্যার্গ্যার গুপ্তঘাতকের হাতে মারা পড়িয়াছেন। ইনি ছিলেন সোশ্যালিষ্টপন্থী-ঘেঁশা, বেশী গরম নয়, নরম-গরম-মেশানো একপ্রকার বড় মাতব্বর ব্যক্তি। অবশ্য নাম-লেখানো সোশ্যালিষ্ট ইনি ছিলেন না। ইঁহাকে খুন করিয়াছে বোধ হয় অ-সোশ্যালিষ্ট বা 'বুর্জোআ' ও ন্যাশন্যালিষ্ট এবং সমরপন্থী কোনো জার্ম্মাণ ছোক্‌রা।

জার্ম্মাণির স্বদেশ-সেবক মহলে এর্ৎস্‌ব্যার্গ্যারকে দেশদ্রোহী বিবেচনা করা হইত। ইঁহার দোষ, ইনি ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি পাতাইবার সময় জার্ম্মাণির ইজ্জৎ বাঁচাইয়া চলিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, ভার্সাইয়ের সন্ধিটা সই করাই ইঁহার বিরুদ্ধে ন্যাশন্যালিষ্টদের প্রধান নালিশ। ফরাসীদের প্রত্যেক কথায় একপ্রকার সায় দিয়াই ইনি জার্ম্মাণ তরী চালাইতেছিলেন। কাজেই এর্ৎস্‌ব্যার্গ্যারের মরায় ফ্রান্সের স্বার্থে কিছু গোল বাধিবার সম্ভাবনা। ফরাসী কাগজগুলা একবাক্যে জার্ম্মাণ ন্যাশন্যালিষ্টদেরকে গালাগালি করিতেছে।

চল্লিশ পঞ্চাশ মাইলের ভিতর লড়াইয়ের মাঠ সুরু হইয়াছে। সাঁক্যাতাঁ শহরটা গুঁড়া হইয়া গিয়াছিল। জার্ম্মাণির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের বাবদ যে টাকা আজ পর্য্যন্ত ফ্রান্স পাইয়াছে, তাহার অনেক পরিমাণ জুটিয়াছে সাঁক্যাতাঁর কপালে। তাই শহরটা দেখিতেছি আবার নয়া জাঁকিয়া উঠিতেছে। বৃহৎ নগর বটে।

চাষ-আবাদে রেলপথের দুইধার শস্যশ্যামল। পার্ব্বত্য উপত্যকাও মাঝে মাঝে চোখে পড়িতেছে। প্রায় সাড়ে তিন বা চার ঘণ্টার পর ফ্রান্সের সীমানা ছাড়াইয়া বেল্‌জিয়ামে পড়িলাম। গাড়ীর ভিতরই পাশপোর্ট পরীক্ষা করা হইয়া গেল। কাষ্টম-অফিসের বাবুরা মাল খোলাখুলির জন্য তাগিদ করিল না কেন বুঝিতে পারিলাম না,—সহযাত্রীরা সকলেই গাঁটরি বোঁচ্‌কা খুলিয়া প্রস্তুত থাকিতে কসুর করিল না যদিও।

বেল্‌জিয়ামে দেখিতেছি পাহাড়ের পর পাহাড়। অনেকগুলাই মরা আগ্নেয়গিরির ন্যায় ন্যাড়া-বোঁচা। ধাতুর খনি সর্ব্বত্রই বিস্তর। শহরে পল্লীতে কলকারখানার চিম্‌নি অগণিত। আগাগোড়া সমস্ত রেলপথটাই যেন ফ্যাক্টরি দিয়া বাঁধানো বোধ হইতেছে। লোহা-গলানো, ইস্পাতগড়া, কারখানার জন্য যন্ত্র-হাতিয়ার ইত্যাদি তৈয়ারি করা, এই সবই এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। একটা বড় নামজাদা শহর পার হইলাম। নাম শার্ল্‌রোআ। এখানে কাচের কাজও বড় রকম চলিয়া থাকে। মোটের উপর এই শহরকে বেল্‌জিয়ামের সাক্‌চি (টাটা-নগর) বলিতে পারি, অবশ্য অনেকগুণ বড়।

ছোটখাট খালসদৃশ নদী বা ঝরণাগুলায় যন্ত্র বসাইয়া তড়িৎ বা আগুনের শক্তি তৈয়ারি করা হইতেছে। নদীর উপর বহু ষ্টীমলঞ্চ বা কলে-চলা নৌকা ভাসিতেছে। কোথাও কোথাও ছিপে মাছ ধরার

ফ্রান্সে জানোয়ার চোখে পড়ে নাই। বেল্‌জিয়ামের মাঠে মাঠে ভেড়া চরিতেছে পালে পালে। সেদিনকার লড়াইয়ে এই দেশের সকল পল্লী-নগরই খবরের কাগজে বিখ্যাত হইয়াছে। বস্তুতঃ, উত্তর ফ্রান্স আর বেল্‌জিয়াম চিরকালই লড়াইয়ের মাঠরূপে বিরাজ করিতেছে। নামুর ও লিয়েজ শহর দুইটার দুর্গ নামজাদা। পাহাড়ী দুর্গের ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু গাড়ীতে বসিয়া বুঝা যাইতেছে।

লিয়েজে মধ্যযুগের মন্দিরাদি অট্টালিকার নমুনা আজও দেখা যায়। বেল্‌জিয়ামের অন্যান্য নগরের মতন লিয়েজও শিল্পপ্রধান।

বেল্‌জিয়ান নারীরা বাঁক ঘাড়ে করিয়া জল বহিতেছে। ইয়োরোপে বাঁকের রেওয়াজ এই প্রথম দেখিলাম। বাঁক যন্ত্রটা তাহা হইলে বুঝিতেছি এশিয়ারই খাস আবিষ্কার নয়!

বহুসংখ্যক পাহাড়ে সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া রেল চলিতেছে। বেল্‌জিয়ামের যতটুকু চার পাঁচ ঘণ্টার ভিতর নজরে আসিল সবই হয় হাজারিবাগ, রাঁচি, না হয় আল্‌মোড়া দার্জিলিঙ। কথাটা খাটে প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক তরফ হইতে। কিন্তু আসল তফাৎ এই যে, বেল্‌জিয়ামের প্রতি বর্গমাইলে লোকের বসত পাঁচশতেরও অধিক। অর্থাৎ এমন ঘনসন্নিবিষ্ট লোকালয় জগতের অতি অল্প জায়গায়ই দেখা যায়। অবশ্য বাঙালীর কাছে ইহা হাতী-ঘোড়া কিছু নয়।

পরাধীন জার্ম্মাণি

বিকাল হইয়া আসিল। গাড়ী সকাল হইতে জোরে চলিয়াছে। এখন দেখিতেছি গাড়ী চলেও না জোরে, থাকেও প্রত্যেক ষ্টেশনে অনেকক্ষণ। এদিকে আবার প্ল্যাটফর্ম্মে প্ল্যাটফর্ম্মে বেল্‌জিয়ান বা ফরাসী ফৌজ। অথচ বাহিরের লোকজন কথা বলিতেছে জার্ম্মাণ।

বাড়ীঘরগুলির গড়ন পর্য্যন্ত ঠেকিতেছে নূতন ধরণের। অর্থাৎ পরাধীন জার্ম্মাণির ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আসিয়া পৌছিলাম আখেন্ শহরে। এইটার ফরাসী নাম এ-লা-শাপেল। জার্ম্মাণে বিখ্যাটা জাহির করিবার জন্য এক জার্ম্মাণ শিশুর সঙ্গে কথা পাড়িলাম। প্রথম বাক্যটা বাহির হইল আধা-জার্ম্মাণ আধা-ফরাসী। খবরের কাগজে দেখিলাম জার্ম্মাণির জনসাধারণও কালিকটের ভারতীয় 'মোপ্‌লা বিদ্রোহে'র খবর পাইয়াছে।

আখেন ইয়োরোপের এক প্রসিদ্ধ শহর। এখানে যুগে যুগে অনেক লড়াই হাঙ্গামা দরবার ও রাষ্ট্রীয় জটলা ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পর যেমন ভার্সাইয়ে বসিয়াছিল জেতাদের এক বড় কংগ্রেস, সেইরূপ নেপোলিয়ানি সমরের পর ১৮১৮ সনে আখেনে বসে 'সর্ব্ব-রাষ্ট্র-সম্মেলন'।

আখেন আজ পরাধীন জার্ম্মাণির পশ্চিম সীমানা। এই শহরটা জার্ম্মাণির প্রতিজ্ঞাপালনের জামিন-স্বরূপ ফরাসী-বেল্‌জিয়ান-ইংরেজের হাতে রহিয়াছে। যতদিন জার্ম্মাণ রাষ্ট্র সুদে আসলে লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের টাকা সমঝাইয়া না দেয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই শহর বিজেতাদের তাঁবে থাকিবে। এই ধরণের আরও অনেক জার্ম্মাণ শহরই আজ পরহস্তগত বন্দী। বলিতে কি, গোটা রাইন-মাতৃক জনপদই এইরূপ পরাধীন।

ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে আখেন উত্তর-ইয়োরোপের এক দিল্লী বিশেষ। এইখানেই ছিল শার্ল্‌মেনের রাজধানী। এই কেন্দ্র হইতে তখনকার ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি একতাঁবে শাসিত হইত। তখন উত্তর-ভারতে চলিতেছে ধর্ম্মপালের সাম্রাজ্য। আজকালকার খেয়ালের 'জাতীয়তা' বা স্বাদেশিকতা তখন পৃথিবীর কোনো লোকের মগজেই

যাহা হউক,—কিছুদিন পরে ফ্রান্সের ও জার্ম্মাণির জেলাগুলা ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। কিন্তু তখনও আখেনের গৌরব লুপ্ত হয় নাই। অন্ততঃ জার্ম্মাণভাষাভাষী জেলাগুলার জোড়া-তালি-দেওয়া কথঞ্চিৎ-ঐক্যবিশিষ্ট এক তথাকথিত সাম্রাজ্য ফ্রান্স-কাটা হইয়া চলিতে থাকে। সেই সাম্রাজ্যের সম্রাট্-বাহাদুরদের রাজ্যাভিষেক হইত এই শহরে। সাড়ে তিনশ' বৎসর আগে পর্য্যন্ত আখেনে এই ধরণের রাজদরবার বসিয়াছে। সাবেক কালের চিহ্ন প্রাসাদে কবরে গির্জ্জায় দেখিতে পাওয়া যায় শুনিতেছি।

আজ রবিবার। পল্লীতে পল্লীতে জার্ম্মাণ নরনারীরা বিকালে সান্ধ্য সফরে বাহির হইয়াছে। কোথাও কোথাও খোলা উঠানে রেষ্টরাণ্ট-জাতীয় দোকানে বসিয়া লোকেরা কাফি বা বিয়ার 'ইচ্ছা' করিবার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা মারিতেছে। ভূমি সর্ব্বত্র দেখিতেছি তরীতরকারীর জন্য চষা। স্বচ্ছন্দ সচ্ছল জীবনযাপনের প্রমাণ পাইতেছি।

মাঠে মাঠে গরুর পাল দেখিতেছি অনেক। গরুগুলা হৃষ্টপুষ্টও বটে। জার্ম্মাণ গাইয়ের রং অদ্ভুত। আমরা ভারতে সাধারণতঃ এই ধরণের গরু দেখি না। প্রায় প্রত্যেকটাই দুই রংয়ের, সাদায় ও কালোয় চিত্রিত। আর চামড়ার বর্ণসমাবেশটাও বিচিত্র। প্রায়ই মনে হয় যেন জেব্রাজাতীয় দুই রংয়ের রেখা বা লেপাওয়ালা জানোয়ার বিশেষ দেখিতেছি। তবে জেব্রার গায়ে রেখাগুলা সরু, সমান্তরাল এবং গুন্‌তিতে অনেক। কিন্তু জার্ম্মান গাভীর পিঠে অত বেশী দাগ নাই।

রাইনের কিনারায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। প্যারিস হইতে লাগিল বার ঘণ্টা। এইটাই প্যারিস-বার্লিনের সোজা পথ। রাত্রি এখন প্রায় নয়টা। শহরের নাম ইংরেজিতে কোলোন, ফরাসী উচ্চারণও তাই। খাঁটি স্বদেশী জার্ম্মাণ নাম কোল্‌ন্।

জার্ম্মাণ ভাষায় 'ও' হরপের উপর দুই ফুট্‌কি থাকিলে ওর দাম বদ্‌লাইয়া যায়। সাধারণতঃ ইংরেজিতে লিখিতে হইলে দুই-ফুট্‌কি-ওয়ালা 'ও'র বদলে লেখা হইয়া থাকে 'ও, ই'। উচ্চারণের সময় 'ও'-কারকে প্রায় 'এ'-কারে নামাইতে হয়। বলা বাহুল্য অ-জার্ম্মাণ মাত্রের পক্ষেই এই হরপ উচ্চারণ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য।

হোটেলের ছোক্‌রা ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হে বাপু, এশিয়ার নাম শুনিয়াছ কি ?" নিজকে কিছু অপমানিত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া উঠিল—"এদেশ কি রুশিয়া মনে করিতেছেন ? আমাদের দেশে ইস্কুল আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আরে চটো কেন ? ইংরেজিটা শিখিলে কোথায় ?" "ক্যেল্‌নেরই পাঠশালায়। আমার পরিবারের কেহ কেহ বহু বৎসর ধরিয়া নিউইয়র্কে বসবাস করিতেছে।" নানা কথাবার্ত্তার ভিতর যুবক বলিল—"আজকাল ক্যেল্‌ন্ শহরটা বানান করা হয় 'কে' দিয়া। এইটা বিপ্লবের ফল।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ বিপ্লব ?" জবাব—"১৯১৮ সনের ঘটনা,—যাহাতে কাইজার পলাইতে বাধ্য হইয়াছেন হল্যাণ্ডে।" প্রশ্ন—'কে' দিয়া বানান করার ভিতর এমন কি বিশেষত্ব আছে ?" "আরে মশায়, কাইজারটার বাতিক ছিল সব 'কে'ওয়ালা শব্দগুলাকে 'সি' দিয়া লেখানো। বাদ্‌শার আমলে এই শহরটার নাম বানান করা হইত সি, ও(ফুট্‌কি), এল্‌, এন্‌-রূপে। কিন্তু জার্ম্মানরা আবহমানকাল পছন্দ করিয়া আসিতেছে কে, ও(ফুট্‌কি), এল্‌, এন্‌। কাজেই কাইজারকে গদি হইতে তাড়াইবার মুহূর্ত্ত হইতেই জার্ম্মান-রিপাব্লিক শব্দের বানানেও স্বরাজ ফিরাইয়া আনিয়াছে।"

ক্যেল্‌ন্ অনেকদিনের পুরাণা শহর। রোমাণ সাম্রাজ্যের আমলে এইটা ছিল 'সভ্যতা'র উত্তর-পূব সীমানা। রোমাণরা রাইন পার

হইয়া পূর্ব্বদিকে—অর্থাৎ আজকালকার জার্ম্মাণির বুকের উপর—রাজ্য কায়েম করিতে পারে নাই। শহরটার ল্যাটিন নাম ছিল কলনিয়া।

ষ্টেশনের নিকটেই বিরাট মন্দির দেখিলাম। ক্যাথিড্র্যালকে জার্ম্মাণে বলে ডোম্। এটা মধ্যযুগের কীর্ত্তি। গড়া স্থরু হইয়াছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিতে লাগিয়াছে ছয়শত বৎসরের অধিক। শুনিতেছি ১৮৮০ সনে নাকি মন্দির গঠন সমাপ্ত হইয়াছে। এ এক বিপুল ব্যাপার—এপাশ ওপাশ যেদিক্ হইতেই দেখি, মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে দাঁড়াইয়া আছি। বাস্তুরীতি বিল্‌কুল 'গথিক',—যাহার প্রসিদ্ধ নিদর্শন প্যারিসের "নৎর্ দাম"। তবে ক্যেল্‌নের ডোমের শিখরগুলা পুরাপুরি ছুঁচোল আর ফরাসী-গথিকের প্রধান শিখর দুইটার মাথা সাধারণ ছাদের মতন সমতল। ক্যেল্‌নের গির্জ্জা এক জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মসৌধ সন্দেহ নাই। ইতালীর মিলান শহরে এবং অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় এই ধরণেরই আর দুইটা জগদ্বিখ্যাত গথিক 'ডোম' আছে।

রাস্তায় রাস্তায় ছেলেরা নিশান লইয়া 'ম্যাণ্ডোলিন' বাজাইয়া গান করিয়া ফিরিতেছে। সর্ব্বত্র দেখিতেছি ইংরেজ পল্টনের গতিবিধি। ক্যেল্‌ন্ রহিয়াছে ইংরেজের দখলে। রাইনধৌত জনপদে ক্যেল্‌ন্‌ই জার্ম্মাণির সর্ব্ববৃহৎ ও সর্ব্বপ্রসিদ্ধ নগর। এত বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রও জগতে খুব অল্পই আছে। বাড়ীঘরগুলা নিরেট এবং ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক।

ক্যেল্‌ন্ হইতে কোব্‌লেন্‌ৎস্

পরদিন সকালে রেলে বসিলাম। গাড়ী চলিতেছে দক্ষিণে রাইনের ধারে ধারে নদী উজাইয়া ;—ঠিক যেমন কায়রো হইতে গিয়াছিলাম

দিকে। এখনো রাইন পার হই নাই,—অর্থাৎ নদীর বাঁদিকেই চলিতেছি। সমতল ভূমি, উর্ব্বর ও চষা। কোথাও কোথাও লাঙ্গলে দেখিতেছি তিন তিন ঘোড়া জুতিয়া আবাদ চালানো হইতেছে। পল্লীকুটিরের গড়ন-ভঙ্গিমায় ত নূতনত্ব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি আখেনের অঞ্চল হইতেই।

একটা বড় শহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। নাম বন্। ফরাসী পল্টনের আওতা দেখিতেছি। জমিন এখানে সমতলই বটে, কিন্তু গাড়ী হইতেই দেখিতেছি শহরের সীমান্তে কিছু দূরে অল্পোচ্চ পাহাড়শ্রেণী আর গিরিপৃষ্ঠে বিলাসভবন বা 'শাত্যো'জাতীয় গ্রীষ্মকুটির বা ঐ ধরণের কিছু। গড়নরীতিতে এই সকল ঘর দেখায় মধ্যযুগের দুর্গজাতীয় হর্ম্ম্য। নিকটেই বাঁদিকে রাইন।

রাইন-মাতৃক ক্ষেতগুলা লাল্‌চে মাটির ভূমি। বিশেষ শুকনা বোধ হইতেছে না। বিহার প্রদেশের মাটিই মোটের উপর লক্ষ্য করিতেছি। কপি শালগম কুম্‌ড়া আলু ইত্যাদির আবাদ সুপ্রচলিত। মাঝে মাঝে গাঁ্যাদাফুলের হল্‌দে বাহারও ক্ষেত গুল্‌জার করিয়া রাখিয়াছে।

লড়াইয়ের দাগ ফ্রান্সে দেখিয়াছি জমিনে ঘরবাড়ীতে। জার্ম্মাণিতে দেখিতেছি লোকজনের ঘাড়ে কপালে নাকে মুখে। জার্ম্মাণ পুরুষদের একটা বিশেষত্ব ইতিমধ্যেই নজরে পড়িয়াছে। ইহাদের চুল ছাঁটা হয় একদম মাথার চাম্‌ড়া ঠেকাইয়া। ক্ষুর দিয়া কামানো মাথাই যেন দেখিতেছি অনেক,—অথবা মাথাগুলা আগাগোড়াই কি টাক-পড়া? যাহোক একটা রহস্য বটে।

অনেক সহযাত্রীকে দেখিতেছি ঘাড়ে বোঁচ্‌কা বা বস্তা বাঁধিয়া চলাফেরা করিতেছে। বোঁচ্‌কাগুলা ছেলেদের হাতের কেতাবী ব্যাগের মতনই অনেকটা,—যাকে বলে ন্যাপ্‌স্যাক্,—তবে কিছু বড়।

ভাবিতেছি, মধ্যবিত্ত জার্ম্মাণ সমাজে এ একটা লড়াইয়ের সুফল। লড়াইয়ের সময়কার মোট বহা ও কষ্টস্বীকার করার অভ্যাসটা দেশে রহিয়া গিয়াছে আজও। বাবু-সমাজকে দুরস্ত করিবার পক্ষে লড়াইয়ের সমান মুগুর আর নাই। মাঝে মাঝে লড়াইয়ের দেখা পাওয়া জগতের পক্ষে মঙ্গলকর।

বন্ জার্ম্মান কুল্টুরের এক বড় খুঁটা। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতগুরু বেঠোফেন জন্মিয়াছিলেন এই নগরে। বেঠোফেনের সঙ্গীতকলা ভারতবাসীকে ভাষায় বুঝানো আজও সহজ নয়। ইঁহার রচিত সুরের 'রূপ'গুলাকে বলে 'সিম্ফনি'। 'সিম্ফনি' বস্তুর বাংলা প্রতিশব্দ ঢুঁড়িতে বসা সময় নষ্ট করা মাত্র। কোনো কোনো 'সিম্ফনি' এত লম্বা যে অনর্গল একঘণ্টা লাগে বাজাইয়া শেষ করিতে। ভারতসন্তান পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হইবে না কি? যদি রেডিও-অ্যাক্টিভিটি আর বোল্‌শেভিক-তত্ত্ব পর্য্যন্ত ঝুকিতে পারিলাম, তাহা হইলে সিমফনি-মাহাত্ম্য বশে আনিতে অরাজি থাকিব কেন?

ঘণ্টা দু-একের ভিতর কোল্‌ন্ হইতে গাড়ী কোব্‌লেন্‌ৎস্ পৌঁছিল। পথে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাইনের লাগাই রেল। এখানে এক বড় বন্দর রেমাগেন। ল্যাটিন আমলেও এই বন্দর প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্য যুগের গির্জ্জা পুনর্গঠিত হইয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য, রাইনধৌত অঞ্চলের গির্জ্জাগুলা সবই প্রায় ক্যাথলিকপন্থী। বস্তুতঃ, আখেন হইতে শুরু করিয়া ক্যাথলিক আওতাতেই আছি। নয়া প্রটেষ্টাণ্ট মতের গির্জ্জার সঙ্গে গোঁড়া ক্যাথলিক গির্জ্জার সদ্ভাব আজও গজাইয়া উঠে নাই।

কোব্‌লেন্‌ৎস্ এই অঞ্চলের এক প্রয়াগ-স্বরূপ। মোজেল ও রাইনের সঙ্গমে ইহার অবস্থিতি। পুল দেখিতেছি দুইটা দুই নদীর উপর। সঙ্গমের কোণে এক বিরাট "কাইজার ভিলহেল্‌ম

বা স্মৃতিস্তম্ভ। এই ধরণের বাদশাহী মনুমেণ্ট আখেন, ক্যেল্‌ন্‌, বন্‌ ইত্যাদি সকল শহরেই আছে। কোব্‌লেন্‌ৎসের 'ডেক্ক্‌ মাল'টায় অশ্বপৃষ্ঠে কাইজার বাহাদুর নদীর অপর দিকে তাকাইয়া আছেন। ওপারে এরেনব্রাইটষ্টাইন নগরের বিপুল গিরিতুর্গ পাহাড়ের উপর পাহাড়ের মতন দেখাইতেছে। স্মৃতিস্তম্ভে লেখা রহিয়াছে :—"নিম্মার হ্বিয়ার্ড ডাস্‌ রাইখ্‌ ৎসার্ষ্টোরট্‌, হ্বেন্‌ ঈয়র আইনিষ্‌ জাইড্‌ উণ্ট্‌ ট্রয়।" অর্থাৎ "সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হবে না কোনো দিন, থাকিস্‌ যদি দেশভক্ত আর একাধীন।" জার্ম্মাণ-সমাজে একতা, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদির দরদ ছিল খুব বেশী। কাজেই মুল্লুক জুড়িয়া (১৮৭০ সনে সাম্রাজ্য গঠনের পর অবশ্য) নগরে নগরে বাদ্‌শাহী বয়েৎ আর হিতোপদেশ জারি করা হইয়াছে।

কোব্‌লেন্‌ৎসে দেখিতেছি ইয়াঙ্কি পল্টনের দৌরাত্ম্য। যেখানে-সেখানে খাকি-পরা মার্কিন সৈনিক চলাফেরা করিতেছে। বড় বড় সরকারী অট্টালিকার উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিশান উড়িতেছে। মায় এরেনব্রাইটষ্টাইনের কেল্লার মাথায়ও আমেরিকান পতাকা। জার্ম্মাণ নরনারীর চরম দুর্গতি সন্দেহ নাই। আর দেখিতে পাইলাম, মস্ত মস্ত মার্কিন মোটর-লরিগুলা এ-রাস্তা হইতে ও-রাস্তায় ছুটিতেছে,—যেন কাজে শশব্যস্ত। অথচ কাজটা যে কি বোধ হয় ঢুঁড়িয়া পাওয়া কঠিন। বোধ হয় জার্ম্মাণ জাতকে এবং বিশেষতঃ জার্ম্মাণ সরকারকে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝানো হইতেছে—"দেখিতেছ না আমাদিগকে কত খাটিতে হইতেছে? এইসকল খাটার মজুরি তোমাদের খাজাঞ্চি-খানা হইতেই ত উসুল হইবে। ভাবিও না আমরা না খাটিয়া তোমাদের রাষ্ট্রকোষ দুহিতেছি। অর্থাৎ ভার্সাইয়ের সন্ধিতে আমাদিগকে যত টাকা দিবার জন্য তোমাদিগকে হুকুম করা হইয়াছে, তাহার কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত ন্যায্য।"

একটা রাইন-মিউজিয়াম কোব্‌লেন্‌ৎসে স্থাপিত হইয়াছে। এই ধরণের মিউজিয়াম বোধ হয় রাইনের উপরকার প্রত্যেক শহরেই এক-আধটা আছে। কোব্‌লেন্‌ৎস্ মিউজিয়ামের কর্ত্তা ডক্টর স্পীজ্ একখানা কেতাব প্রকাশ করিয়াছেন। নাম 'রাইন-কুণ্ডে' অর্থাৎ রাইন-তত্ত্ব। রাইন বিষয়ক তথ্য,—ভূ-তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, শৈল্পিক, আর্থিক, সবই কিছু কিছু পুস্তিকায় পাওয়া যায়।

এই আদর্শে 'গঙ্গা-কুণ্ডে' বা গঙ্গাতত্ত্ব লইয়া কাশীতে একটা ছোট মিউজিয়াম তৈয়ারি করিতে হইলে প্রথম তলায় রাখা হইবে নানা প্রকার মানচিত্র, নদীর প্রাকৃতিক অবস্থা ও গঠন বুঝাইবার জন্য। দ্বিতীয় তলায় রাখা হইবে নদীর উপর মানুষের কাজের নিদর্শন—অর্থাৎ যুগে যুগে ভারতসন্তান কবে কোথায় কিরূপ নগর বা পল্লী নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহার ছবি ও বিবরণ ইত্যাদি। তৃতীয় তলায় দেখিতে পাইব গঙ্গা লইয়া কোন্ শিল্পী বা কবি কিরূপ কারিগরি করিয়াছেন তাহার পরিচয়। রাইন-মিউজিয়ামে দেখিলাম কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ আর চিত্রে রাইনের দুইধারকার দৃশ্যাবলী। গঙ্গা-মিউজিয়ামে আরও দেখিতে হইবে শিল্প ও বাণিজ্যের ধারা, অর্থাৎ নৌকা, ষ্টীমার, পুল, রেল, বন্দর ইত্যাদির ক্রমবিকাশ। আমাদের দেশে যাঁহারা গঙ্গা-মাহাত্ম্য, গোদাবরী-মাহাত্ম্য ইত্যাদি গাহিয়া থাকেন তাঁহাদের কেহ কেহ রাইন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের এই নয়া কায়দা হইতে কিছু নয়া কার্য্যপ্রণালী শিখিতে পারেন।

স্পীজ্ মহাশয় বলিলেন "কোব্‌লেন্‌ৎসেও ভারতবাসী? ব্যাপার কি?" ইনি ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে জানেন— "ইণ্ডো-গার্ম্মাণিষে স্প্রাখে" যার সোজা প্রতিশব্দ 'আর্য্য' ভাষা। ইহার বেশী ভারতকথা কোনো জার্ম্মাণ জানে কি না তাহা "রিসার্চ্চ" করিবার বস্তু। খানিকটা সেই আবিষ্কারেই বাহির হইয়াছি।

রাইন-বক্ষে

কোব্লেন্‌ৎসে কাটাইলাম প্রায় চার ঘণ্টা। প্যারিসের প্রায় আধা দামে রেষ্টরাণ্টে খাওয়া গেল। আর কিছুক্ষণ রেলে থাকিলে পৌঁছিতাম রাইন-মাইন সঙ্গমে। সেই সঙ্গমের এলাহাবাদের নাম মাইন্‌ৎস্, যে শহরটাকে ইংরেজিতে লেখা হয় মেয়েন্স রূপে। মাইন্‌ৎস্ও জার্ম্মাণ কুল্টুরের এক প্রধান স্তম্ভ। এই শহরে জন্মিয়াছিলেন গুটেনব্যার্গ ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে। গুটেন্‌ব্যার্গ নব্যজগতের প্রথম মুদ্রাকর।

মাইন্‌ৎসের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে হ্বীজ্‌বাডেন শহর। এটা জার্ম্মাণির এক নামজাদা বিলাসনগর। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পয়সাওয়ালা লোকেরা এখানে শফর করিতে আসেন। হ্বীজ্‌বাডেনের পূর্ব্বে বোধ হয় আধঘণ্টার রেলপথে মাইন নদীর উপর ফ্রাঙ্কফোর্ট নগর অবস্থিত। ফ্রাঙ্কফোর্ট গ্যোটের জন্মভূমি। দেখা যাইতেছে রাইনের আশপাশ আগাগোড়াই জার্ম্মাণ সমাজের গৌরবস্থল।

ভার্সাইয়ের সন্ধির কড়ার অনুসারে কোব্লেন্‌ৎসের দক্ষিণ হইতে মাইন্‌ৎস্ পর্য্যন্ত ফরাসীদের তাঁবে। কাজেই মাইন্‌ৎসে ফরাসী ফৌজের হুড়াহুড়িই দেখিতে পাইলাম। আরও দক্ষিণে মান্‌হাইম্ শহরেও ফরাসীদের কর্ত্তৃত্ব। মান্‌হাইম্ রাইন ও নেকারের সঙ্গমস্থল। রাইন-মাহাত্ম্যে মান্‌হাইমের ইজ্জৎ খুব বড়—শিল্প ও বাণিজ্যের আসরে।

ইহারই অল্প দূরে পূর্ব্বদিকে নেকারের উপর হাইডেল্‌ব্যার্গ শহর। হাইডেল্‌ব্যার্গে জার্ম্মাণির সর্ব্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় সুবিদিত। হাইডেল্‌ব্যার্গের উপর ফরাসী আওতা নাই। মান্‌হাইমের অনেক দক্ষিণে রাইনের এক বড় শহর ষ্ট্রাস্‌বুর্গ; এটা অবশ্য লড়াইয়ের ফলে আজ পুরাপুরি ফ্রান্সের অন্তর্গত।

এইসব দেখিতে হইলে রাইন-যাত্রায় বাহির হইতে হইত। তাহাতে প্রলুব্ধ না হইয়া ক্যেল্‌নে ফিরিবার মতলবে কোব্‌লেন্‌ৎসে ষ্টীমার ধরিলাম। রাইনে স্রোত খুব জবর। ষ্টীমার চলিতেছে উত্তর দিকে অর্থাৎ স্রোতের মুখে। আরোহীর সংখ্যা অনেক,—বোধ হয় দুই হাজারেরও বেশী। এক মোসাফির বলিলেন, "এরেনব্রাইট্‌ষ্টাইনে পুরাণা মন্দির আছে কতকগুলা। তীর্থ-যাত্রীর ভিড় ওখানে খুব বেশী।" দুই কিনারায় পাহাড় দেখিতে দেখিতে ভাটাইয়া অগ্রসর হইতেছি।

রাইন ইয়াংসিকিয়াঙের মতন রক্ত-দরিয়া নয়। অথবা সেইনের মতন নেহাৎ বর্ণহীনও নয়। অনেকটা গঙ্গার ঘোলা জলই এখানে চোখে পড়িতেছে। বিকালে ঘাটের ধারে বেড়াইতে আসিয়া অনেকেই দেখিতেছি সাঁতার কাটিতেছে। ষ্টীমারের ষ্টেশনে ষ্টেশনে হুটাপুটি করিয়া যুবার দল আসিয়া জুটিতেছে। অনেকেরই হাতে লাউটে, গিটার, ম্যাণ্ডোলিন ইত্যাদি তারের বাদ্যযন্ত্র; গান বাজনা চলিতেছে।

কোনো কোনো দলে 'যুবক সমিতি'র নিশানে লেখা আছে—"জয় যৌবনের জয়।" একদিন না একদিন এই যৌবন-পূজাই ভার্সাই-সন্ধির প্রতিহিংসা লইয়া ছাড়িবে। যে ব্যক্তি জীবনে কখনো প্রতিহিংসা চাখে নাই সে নরাধম,—আর যে জাতি প্রতিহিংসা শব্দটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে, সে জাতি বাঁচিয়া নাই। মানবরক্তের এইটাই অতি প্রাথমিক কথা।

ইংরেজ ফরাসী বেল্‌জিয়ান মার্কিন ফৌজের আওতায় জার্ম্মাণ সমাজ মুশ্‌ড়িয়া রহিয়াছে, বেশ বুঝিতেছি; এই কয় ঘণ্টাতেই কিন্তু জার্ম্মাণ নরনারীর জীবনবত্তাও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। জার্ম্মাণি আবার উঠিবে, অল্প দিনের ভিতরেই; তবে কোন্ মূর্ত্তিতে তাহা আন্দাজ

রাইনের দুই ধারের পাহাড়ে পাহাড়ে মধ্যযুগের আমল হইতেই দুর্গ বিরাজ করিয়া আসিতেছে। ক্যোনিগ্‌জ্‌ভিণ্টার বন্দরের জীবেন্‌গেবির্গে বা সাত-পাহাড় জার্ম্মাণ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। পুরাণা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ তরুহীন পাহাড়ের মাথায় পাথরের স্তম্ভের মতন বোধ হইতেছে। বলা বাহুল্য, এইসকল অঞ্চলে ক্যাথলিক দুর্গের গির্জ্জাগুলা আজও জার্ম্মাণ নরনারীর লৌকিক ধর্ম্ম বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে বন্‌-এ পৌঁছিলাম। পথে পড়িল অজস্র ষ্টীমার বা ষ্টীম-চালিত নৌকার সারি। এইগুলার অধিকাংশই মালের নৌকা। প্রায় অর্দ্ধেকেরও বেশী হইবে ওলন্দাজ জাতীয় লোকের জলযান। চিম্‌নি এবং ফ্যাক্টরির ধোঁয়াও প্রায় প্রত্যেক বন্দরেই লক্ষ্য করিয়াছি। ইয়াংসি বা গঙ্গা ও পদ্মার উপর অবশ্য নৌকায় ও ষ্টীমারে মাল চালান হয় কম না। কিন্তু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গা আর হ্যাংচাওয়ের নিকট-বর্ত্তী ইয়াংসি ছাড়া আর কোথাও কলকারখানার আওতা নাই। পরন্তু রাইন ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন চঞ্চল, শিল্প কারখানায়ও তেমন সন্ত্রস্ত।

বন্‌-এ পূর্ব্বেই দেখিয়া গিয়াছি ফরাসী ফৌজের তাঁবু ও কুচকাওয়াজ। অথচ এই অঞ্চলটা থাকা উচিত ইংরেজের অধীনে সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে। এক ব্যক্তিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। জবাব পাইলাম—"সিলেশিয়ার আর আয়র্ল্যাণ্ডের হাঙ্গামার জন্য ইংরেজকে এখান হইতে অনেক সৈন্য সরাইয়া লইতে হইয়াছে। তাহাদের স্থানে বসিয়াছে ফরাসী।"

সেনাপতি হিণ্ডেনবুর্গ আর লুডেনডর্ফের ছবিতে এই দুই জনের ভুঁড়ি দেখিয়া আমরা বুঝিয়া রাখিয়াছি যে, জার্ম্মাণরা ভুঁড়িওয়ালা জাত। কিন্তু ষ্টীমারের এতগুলা পুরুষের ভিতর সেই ছবিপ্রসিদ্ধ ভুঁড়ি ঢুঁড়িয়া পাইতেছি না। আর কাইজারি গোঁফও নেহাৎ বিরল। বরং দেখিতেছি উল্টা। খাড়া-উঠা গোঁফের বদলে দেখিতেছি আধা-

মোসাফিররা খুব আমোদে সময় কাটাইতেছে। বোতল বোতল বিয়ার (শরাব-বিশেষ, যদিও নেশা হয় না) উজাড় হইতেছে, তাসের জুয়া চলিতেছে। মাঝে মাঝে পুরুষেরা দল বাঁধিয়া গান ধরিতেছে, মেয়েরা কোনো দিকেই বিশেষ অগ্রণী নয়।

এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"রাইন অঞ্চলে বিজেতাদের পল্টন বসিয়াছে সত্য কথা। কিন্তু ইহাতে জার্ম্মাণির টাকা খরচ ছাড়া আর কোনো লোক্সান হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।" সহযাত্রী বলিলেন—"তাহা হইলে আপনি কিছুই বুঝিলেন না। যে-যে অঞ্চলে ইংরেজ ফরাসী মার্কিন বেল্জিয়ানের এক্তিয়ার কায়েম হইয়াছে, সেই সেই অঞ্চলের খবরের কাগজের উপর কড়া আইন। সভাসমিতি বক্তৃতা ইত্যাদি এক প্রকার রদ হইয়াছে। বিজেতাদের মঞ্জুর না হইলে কোথাও জনসমাগমের ব্যবস্থা হইতে পারে না। এমন কি ইস্কুল-গুলায় পর্য্যন্ত ইহাদের হাত আসিয়াছে। স্বদেশী গান গাওয়ায় বাধা পড়িয়াছে। ইতিহাস-বিষয়ক কেতাবগুলা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে অথবা বদ্লাইয়া দেওয়া, হইয়াছে ইত্যাদি।" শুনিলাম ক্যেল্নের এক গির্জ্জায় ইংরেজ সিপাহীরা সশস্ত্র খ্রীষ্টপূজা করিয়া থাকে, আর সেখানে 'নেটিভ'দের অর্থাৎ জার্ম্মাণ নরনারীর প্রবেশ-নিষেধ।

একব্যক্তি বিলাতে বসবাস করিয়াছেন একপ্রকার আজীবন; স্ত্রী তাঁহার ইংরেজ। বিলাতী ব্যবসা-মহলে এই জার্ম্মানের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ইনি বলিতেছেন—ইংরেজে আর জার্ম্মাণে সামাজিক লেনদেনে রেষারেষি বাড়াইয়া তুলিয়াছে লর্ড নর্থক্লিফের দুই কাগজ 'ডেলিমেল' আর 'ঈভ্নিং নিউজ'।

লড়াইয়ের সময় যাট হাজার জার্ম্মাণ নরনারীকে বিলাতের লাগালাগি ছোটখাটো দ্বীপগুলায় নির্ব্বাসিত করা হয়। তাহাদের

হাজার লোক কপর্দ্দকহীন ভাবে জার্ম্মাণিতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।"

বন্-এর নিকট রাইন অনেকটা প্রশস্ত, কলিকাতার গঙ্গার সমান যদিও নয়। এখান হইতে আর পাহাড় দেখিতেছি না। সমতল ভূমি দুইধারে ক্যোল্ন্ পর্য্যন্ত। ক্যোল্নের পুল জাঁকালো বটে।

রাইনের বিদেশী সৈন্যরা জার্ম্মাণ নারী বিবাহ করিতেছে। ইংরেজ আর মার্কিনের সঙ্গে বিবাহ সহজেই নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু ফরাসীদের সঙ্গে জার্ম্মাণ সমাজ এখনো ঘনিষ্ঠতা চাহে না।

বিদেশী ফৌজ অতি উঁচু হারে বেতন পায়। শুনিলাম ইংরেজ সৈনিক পায় রোজ ছয় শিলিঙ্। অর্থাৎ ইহারা স্বদেশে কারখানায় খাটিয়া খাইতে হইলে যত মজুরি পাইতে পারে এই পরাধীন মুল্লুকের রক্ত শুষিতে আসিয়া তাহার অন্ততঃ চারগুণ বেশী ভোগ করিতেছে।

পরাধীনতার অবস্থা জগতের সর্ব্বত্রই একপ্রকার, কি এশিয়ায় কি ইয়োরোপে। এমন কি সাদাচামড়াওয়ালা পরাধীন জাতির সঙ্গেও সাদাচামড়াওয়ালা বিজেতারা বিশেষ ভ্রাতৃত্বের সহিত ব্যবহার করিতেছে না। এশিয়ায় যাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করিতেছেন অথবা ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ল' সম্বন্ধে গবেষণা চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পরাধীন জার্ম্মাণি সংক্রান্ত দলিলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিলে নূতন আলোক পাইবেন।

প্রুশিয়া

ক্যোল্নে বার্লিনের রেলে বসিলাম। প্রথমেই পার হইতে হইল রাইন পুলের দুই মাথায় ইংরেজ পল্টন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার

জন্য এই ঘরগুলা মার্কামারা রহিয়াছে। অথচ কোনো ঘরেই বিদেশী সৈন্যসামন্তের টিকি দেখিতে পাইলাম না।

সমতল ভূমির উপর রেলপথ নির্ম্মিত। রাইনের কিনারায় ড্যিসেল্‌ডর্ফ এক প্রসিদ্ধ শিল্প-বন্দর। আর এক বড় বন্দর ডুইজ্‌বুর্গ। শহর দুইটায় আবার বেলজিয়ামের শার্লরোআ অঞ্চলের লোহালক্কড়ের আওতা পাইলাম। ড্যিসেল্‌ডর্ফ হায়নে কবির জন্মভূমি। জার্ম্মাণ পল্লী-শহরের নামে ডর্ফ্‌ আর বুর্গ্‌ শব্দ অতি সাধারণ। এইগুলা আমাদের সুপরিচিত পুর, গঞ্জ ইত্যাদি। বস্তুতঃ ডর্ফ্‌ শব্দের অর্থ গ্রাম, আর বুর্গ্‌ শব্দের অর্থ শহর।

ডুইজ্‌বুর্গ্‌ রুর-রাইন সঙ্গমে অবস্থিত। অল্প দূর পূর্ব্বে পাইলাম মুল্‌হাইম শহর রুরের উপর। মুল্‌হাইমে জার্ম্মাণ ক্রোরপতি ষ্টিন্নেস্‌ তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ কারখানা কায়েম করিয়াছেন। ষ্টিন্নেসের নাম জানে না জার্ম্মাণিতে এমন লোক নাই। সমরপন্থী আর ন্যাশন্যালিষ্ট লোকেরা ষ্টিন্নেসের ষ্টীল-ফ্যাক্টরিগুলাকে স্বদেশের লৌহবর্ম্ম বিবেচনা করে। ঠিক এই কারণেই কমিউনিষ্ট আর ইন্টার্ণ্যাশন্যালিষ্টরা এই-গুলার উপর হাড়ে হাড়ে চটা। বলা বাহুল্য, এই জন্যই ষ্টিন্নেস্‌ ফরাসী রাষ্ট্রেরও চক্ষুশূল।

অল্পক্ষণের ভিতরেই ষ্টিন্নেসের আওতা হইতে ক্রুপের আওতায় পৌঁছিলাম। শহরের নাম এস্‌সেন। ক্রুপ আর-এক ক্রোরপতি, পুরাণা কাইজারের বন্ধু, হিণ্ডেনবুর্গের এক-গেলাসের ইয়ার ইত্যাদি। ক্রুপের নাম জানে জগতের সকল লোকেই। এস্‌সেনের তোপখানা ছিল মরা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের আসল কেল্লা।

এস্‌সেনে শেষ হইল রাইন প্রদেশের পূর্ব্ব সীমানা। বিজেতারা ড্যিসেল্‌ডর্ফ, মুল্‌হাইম্‌ আর এস্‌সেন—এই শহর কয়টা ভার্সাইয়ের সন্ধিতে স্ববশে আনিবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াছিল। ঘটনাচক্রে

এই অঞ্চল জার্ম্মাণদের হাতছাড়া হয় নাই। তবে ফরাসীরা আজও যখন-তখন জার্ম্মাণিকে শাসাইয়া থাকে—"বেশী বাড়াবাড়ি যদি কর, তাহা হইলে রুর উপত্যকা দখল করিয়া বসিব।" মুল্‌হাইম্‌ আর এস্‌সেনকে যদি চূরমার করিতে পারিত, তাহা হইলে ইংরেজ-বেল্‌জিয়ান-ফরাসীর সাধ মিটিত। শুনিতেছি ইতিমধ্যে এস্‌সেন ছাড়া অন্য শহর তিনটায় কয়েকমাস ধরিয়া বিজেতাদের নিশান উড়িতেছে।

রাইন জেলার পর হ্বেষ্ট্‌ফালেন জেলায় গাড়ী পড়িল। দেখিবার নাই কিছুই। সমতল মাঠের পরে মাঠ, কিন্তু "মাঠের শেষে সুদূর গ্রামখানি" আর চোখে পড়িতেছে না। কদাচ এক-আধটা পল্লী-কুটির দেখা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপে এক বিরাট লড়াই হয়। তাহাতে জার্ম্মাণির হাড় গুঁড়া হইয়া যায়। সেই যুদ্ধের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্বেষ্ট্‌ফালিয়া প্রদেশে। শহরটার নাম ম্যিন্‌ষ্টার। রেলপথের অনেক উত্তরে এই নগর অবস্থিত।

হ্বেষ্ট্‌ফালিয়ার পূর্ব্ব সীমানায় হ্বেজার নদী পার হইলাম। হান্নোফার জেলার ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। এই জেলায়ই আজ-কালকার বিলাতী রাজাদের পূর্ব্বপুরুষের জমিদারী ছিল। পাঠশালায় শেখা গিয়াছিল, এই বংশের প্রথম দুই রাজা ইংরেজিতে কথা বলিতে পারিতেন না, তাঁহাদের ভাষা ছিল জার্ম্মাণ।

হান্নোফার জেলার কেন্দ্রের নামও হান্নোফার। শহরটা অনেক দূর হইতেই রেলে বসিয়া দেখিতে পাইলাম। নানা রং-বেরঙের শিখর ও গুম্বজওয়ালা ঘরবাড়ীর পরিচয় পাইতেছি। ফ্যাক্টরির চিম্‌নিও দেখা গেল অনেক। রাইনের কিনারায় হ্বীজ্‌বাডেন শহরে শুনিয়াছি সোনালী-চূড়া-সমন্বিত সৌধ আছে। হান্নোফারেও এইরূপ হর্ম্ম্য নজরে পড়িল। কিন্তু গোটা হান্নোফার জেলার মধ্যে রেলপথে একটা

কুঁড়েও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেবল জঙ্গল, পাইনগাছের বন-বিশেষ, আর রেলপথের ধারে ধারে কাটা কাঠের স্তূপ।

কাম্‌রার ভিতরই খান্‌সামা চা দিয়া গেল। সম্মুখে উপবিষ্ট এক ওলন্দাজ জাতীয় ইহুদি যুবক ও তাঁহার স্ত্রী। সদ্য বিবাহের পর ইঁহারা সফরে বাহির হইয়াছেন। যুবক গরুর ব্যবসা করে। ওলন্দাজ গাভীর দাম অনেক। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে যে-সকল গরু রপ্তানি করা হয়, তাহার দাম এক হাজার হইতে তিন হাজার টাকা। রোজ আধমণ দুধ হল্যাণ্ডের প্রায় প্রত্যেক গরু হইতেই পাওয়া যায়। যে গরুর দাম তিন হাজার টাকা তাহার দুধ মাখন ও চর্ব্বি হইতে সপ্তাহে আয় হয় অন্ততঃ ষাট টাকা।

হান্নোফার জেলার বন্দরের নাম ব্রেমেন, এই শহর হ্বেজারের উপর সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত। সেই শহর অবশ্য পথে পড়িল না। বন-জঙ্গলের আওতাতেই আছি। মাঠের কোথাও কোথাও দু'একটা কুঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুযন্ত্র বা বাতাসে নিয়ন্ত্রিত কল দেখা যাইতেছে। এইগুলা বাষ্পযুগের পূর্ব্বেকার অর্থাৎ মধ্যযুগের নিদর্শন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পোলো নাকি চীনে এই ধরণের 'উইণ্ড-মিল' দেখিয়াছিলেন।

স্যাক্সনি জেলায় বা প্রদেশ পড়িলাম। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দৃশ্য "যথাপূর্ব্বং তথাপরম্"। চোখ বুজিয়া থাকিলেও কোনো ক্ষতি নাই। যাহা হউক, চোখ খুলিয়াই এদিক ওদিক চিন্তা করা গেল।

ভারতসন্তান ও ইয়োরামেরিকান

ভারতবাসীতে আর ইয়োরোমেরিকানে আজ তফাং কিসে? পশ্চিমাদের মাথার জোর বেশী, ইহা ত কখনো মনে করিতে পারি নাই। ইহারা চরিত্রবলে বড়, তাহাও কোনো দিকে লক্ষ্য করি নাই।

কর্ত্তব্যজ্ঞানে আমরা ইহাদের চেয়ে ছোট, তাহাও বিশ্বাস করি না। দলাদলি, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা (এমন কি বিদেশী শত্রুর মুখামুখি থাকিয়াও) পশ্চিমে পূর্ব্বের চেয়ে কম নয়।

তবে পার্থক্য কোথাও? পশ্চিমারা বাঁচে বেশীদিন,—ইহারা খাইতে পায় পেট ভরিয়া,—আর ইহারা মেহনত করে যত, খাইতে পায় তাহারই মাপে অর্থাৎ ভূতের মতন। মোটের উপর, ইয়োরামেরিকান যে-কোনো ব্যক্তির জীবনব্যাপী কাজের পরিমাণ ভারতসন্তানের জীবনব্যাপী কাজের তুলনায় অনেক বেশী দাঁড়াইয়া যায়। আমাদের পঁয়ত্রিশ কোটি লোক কাজ করে ঠিক যেন পঁয়ত্রিশ লাখ নরনারীর মতন। আর পশ্চিমের বড় বড় দেশের পঁয়ত্রিশ লাখ কাজ করে প্রায় আমাদের পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর সমান। অনুপাতটায় হয়ত অত্যুক্তি রহিয়া গেল।

কিন্তু কথাটা এই যে, গুণ হিসাবে বা মূল্য হিসাবে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নরনারী বর্ত্তমান ভারতসন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমাদের ব্যক্তি-গুলার প্রত্যেকের কার্য্যক্ষমতা বাড়াইয়া দিতে পারিলে,—অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নরনারীর আয়ুর মাত্রাটাও লম্বা করিয়া দিতে পারিলে, ভারতের নামেও ত্রিভুবন কাঁপিবে। যাক্, সম্প্রতি এইখানেই খতম।

স্যাক্সনি জেলায় এল্‌বে নদীর উপর দিয়া রেলগাড়ী ছুটিয়া গেল। পুল হইতে অদূরে একটা শিল্প-নগর দেখিতে পাইলাম। এল্‌বের মোহনায়, অনেক উত্তরে জার্ম্মাণির সর্ব্ববৃহৎ সমুদ্র-বন্দর হাম্বুর্গ্।

এল্‌বের একটা শাখানদী পার হইয়া ব্রাণ্ডেন্‌বুর্গ জেলায় পড়িলাম। নদীর কিনারায় রাটেনাও এক শিল্প-নগর বোধ হইল।

'ভোজপুরিয়ার দেশ'

সারাদিনের ভিতর গোটা কয়েক শহর ছাড়া চোখে পড়িল মাত্র বন-জঙ্গল। ঠিক যেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিম প্রদেশগুলার ভিতর দিয়া আসিলাম। একদম 'ভোজপুরিয়ার দেশ' আর কি! উত্তর-চীনেরও কোনো কোনো অঞ্চল মনে পড়ে।

ঐতিহাসিক বা প্রাচীন সভ্যতাবিষয়ক কোনো বড় জনপদ এই পথে পাইলাম না। রাইন প্রদেশের তুলনায় ভেষ্টফালিয়া, হান্নোফার, স্যাক্সনির উত্তরাংশ আর ব্রাণ্ডেন্‌বুর্গ এই চার জেলা যেন বিল্‌কুল বর্ব্বর বা অর্দ্ধসভ্য—সাবেকী কৃষ্টির মাপে। প্রুশিয়ার এই জেলাগুলা মান্ধাতার আমলে রোমাণ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। রাইন ছিল সেই যুগের সভ্যতামণ্ডলের পূর্ব্ব কিনারা। সুতরাং রাইনের অপর পারে বিরাজ করিয়া আসিতেছে 'অনার্য্য' জাতির আবাস। ঠিক যেমন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বাংলা দেশে ছিল বহুকাল পর্য্যন্ত 'পক্ষী' জাতীয় অর্থাৎ 'ভোজপুরিয়া' নরনারীর বাথান। অর্থাৎ প্রুশিয়া বা উত্তর-জার্ম্মাণি নেহাৎ অর্ব্বাচীন দেশ। এখানে পুরাণা সভ্যতার নিদর্শন, বনিয়াদি সমাজের ইটকাঠ ঢুঁড়িতে আসা উচিত নয়। এমন কি হাজার বৎসর পূর্ব্বে এখানে খ্রীষ্টধর্ম্মই প্রচারিত হয় নাই।

নৃ-তত্ত্বের তরফ হইতেও এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রুশিয়ায় স্লাভিক রক্তের প্রভাব খুব বেশী। খাঁটি টিউটনিক ধাত্‌ এই অঞ্চলে কম। স্লাভিক জাতিসম্ভূত নরনারী সভ্যতার মাপকাঠিতে শিশুজাতি বটেই।

এই ভোজপুরিয়ার আবহাওয়াতেই নবীন সভ্যতার এক নয়া কর্ম্মকেন্দ্র সজোরে মাথা তুলিয়াছে। এই কেন্দ্রের নাম বার্লিন, স্বদেশী জার্ম্মাণ উচ্চারণ বের্লিন (ফরাসীতে বলে ব্যার্লাঁ)।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় বার্লিনে পৌছিলাম। পথে শহরের চার-পাঁচটা রেলওয়ে-ষ্টেশনে গাড়ী থামিল,—শার্লোটেন্‌বুর্গ, ফ্রিড্রিখ-

ষ্ট্রাসে ইত্যাদি। কয়েকবার স্প্রে দরিয়াও পার হওয়া গেল। শেষে আসিয়া ঠেকিলাম বার্লিনের পূর্ব্বতম কিনারায়। গাড়ী হইতে নামিলাম বোধ হয় আমিই এক মোসাফির! আর সকলেই অন্যান্ত ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছে।

ষ্টেশনে নাই মুটে! অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ফরাসীতে জার্ম্মাণে বচসা করিয়া এক ছোক্‌রার ঘাড়ে মাল চাপাইয়া দিলাম। এক ড্রোশ্‌কেতে বসা গেল। চলিল ঠিক একার মতন। গাড়ীটা যদি নতুন থাকে আর ঘোড়াটা যদি চলে ভাল, তাহা হইলে ড্রোশ্‌কেকে বলিব ল্যাণ্ডো। এক মিনিট চলিয়াই গাড়োয়ান বলিল—"বাবু, সম্মুখেই হোটেল, নিয়ে এস দশ মার্ক্‌ ড্রোশ্‌কেভাড়া।" রাত্রে আর যাওয়া যায় কোথায়? যথাস্থানেই নামা গেল। পাঁচ মার্ক্‌ বাহির করিয়া দিলাম। গাড়োয়ান নাছোড়বন্দ। হট্টগোল স্বরু হইল,—লোক জমিয়া গেল। মজাটা দেখিতেছে কে? উহারা, না আমি? গাড়োয়ানকে বলিলাম—"বিরক্ত করিলে ফোন্ করিয়া পুলিশ ডাকিব।" এই বলিয়া হোটেলওয়ালীকে টেলিফোনের নম্বরওয়ালা কেতাবটা আনিতে বলিলাম। এমন কি একটা ফোনে কথা পর্য্যন্ত বলিয়া ফেলিলাম। জার্ম্মাণ ভাষায় একটা সুবিধা এই যে, যে শব্দটা জানি তাহার উচ্চারণ যে-কোনো লোকের মুখেই ধরিতে পারি। কিন্তু ফরাসীতে বিপদ্ অনেক, বহু জানা-শব্দও উচ্চারণের দৌরাত্ম্যে অবোধ্য থাকিয়া যায়।

এতক্ষণে ড্রোশ্‌কেওয়ালা বুঝিয়াছে যে, এই মোসাফির সহজে ছাড়িবে না। ঘর পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিল। আর দুই মার্ক্‌ দিয়া বিদায় করিলাম। অতঃপর অদ্য রজনী (৩০ আগষ্ট, ১৯২১) প্রুশিয়ান সমাজের জীবনকেন্দ্র বার্লিনে প্রথম রাত্রিবাস। প্যারিস হইতে বার্লিন সোজাপথে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা দূর।

উচ্চারণ-সমস্যা।

প্রত্যেক ভাষায়ই উচ্চারণের মারপ্যাচ্ এক মহা হাঙ্গামা। জার্মাণেও তাই। তবে জার্মাণে বাঁধাবাঁধির জোর এত বেশী যে, নিয়মগুলা জানা থাকিলে ভুল করা একপ্রকার অসম্ভব। তা ছাড়া নিয়মের ব্যতিক্রম গুন্‌তিতে খুবই কম। এই হিসাবে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিদেশীমাত্রের পক্ষে উচ্চারণ হিসাবে যারপর নাই কঠিন। জার্মাণের মোটা নিয়মগুলা দেখানো যাইতেছে।

স্বরবর্ণ :—ইংরেজি এ = আ, ই = এ, আই = ই, ও = ও, ইউ = উ, এ আই = আই, এ ইউ = আউ, ই ইউ = অয় ; বার্লিন = বের্লিন, স্প্রী = স্প্রে। কয়েকটা সুপরিচিত জার্মাণ নাম :—অয়কেন, রয়টার। ও (ফুট্‌কি) = ওই = এ্য (ও) ; এখানে 'ও' ধ্বনি একপ্রকার উঠিবেই না বলা যাইতে পারে। অথচ আওয়াজটা খাঁটি—'এ' নয় ; 'এ' উচ্চারণ করিতে করিতে ঠোঁট দুইটা পাকাইয়া গোলাকার করিয়া তুলিতে হইবে। ইউ (ফুট্‌কি) = ইউই = ই্য (উ) ; এখানে 'উ' ধ্বনি একপ্রকার উঠিবেই না, অথচ আওয়াজটা খাঁটি 'ই' নয়। (ফরাসীতে 'এর উএ' শব্দ 'রু' নয়,—অনেকটা 'রি্য' ধরণের। অথচ 'ই'-কারটাও সুস্পষ্ট না হওয়া চাই।)

ব্যঞ্জনবর্ণ :—ডি = ড অথবা ট ('দ' কখনো নয়), সি এইচ = শ্ অথবা খ, (ইশ্, নোখ্, নিষ্ট্), এস সি এইচ = শ, জি = গ, অথবা শ, অথবা ক ('জ' কখনো নয়), এস = জ, ভি = ফ, ডব্লিউ = হ্ব, জেড্ = ৎস্ (ৎসাইটুগাইষ্ট্)।

লেখায় বিশেষ্য শব্দগুলা সবই বড় অক্ষরে সুরু করা হয়, বাক্যের যে-কোনো স্থানেই এইসব ব্যবহৃত হউক না কেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রুশিয়ানদের জীবন-কেন্দ্র

(সেপ্টেম্বর, ১৯২১)

উণ্টার ডেন লিণ্ডেন

বার্লিনে চুরি ছ্যাঁচড়ামি বাড়িয়াছে শুনিয়াছি। যাহা হউক, রাতটা কাটিল ভালয় ভালয়। ঘরটা বড়ই, ভাড়াও প্যারিসের চেয়ে শস্তা। এখন আরো শস্তা আবিষ্কার করা আবশ্যক! বাহির হইলাম এক ট্যাক্সিতে। পূব্ বার্লিনের গলিঘোঁচগুলা দেখিয়া লওয়া গেল। স্প্রেও পার হইলাম একবার। এটাকে আর নদী বলা চলে না। নেহাৎ খাল-বিশেষ।

আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর অফিসে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীটা ব্যবসা-পাড়ায়, শহরের কেন্দ্রস্থলে। সম্মুখেই বার্লিনের বড় শাওস্পীল-হাউস বা থিয়েটার। দু'চার মিনিটের পথে ফ্রীড রিশষ্ট্রাসে 'বানহোফ'। রেলওয়ে ষ্টেশনকে বলে বানহোফ। ডায়চে বাঙ্ক, পুরাণা বাদশার মোকাম, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, ফ্রেড্রিক দি গ্রেটের মূর্ত্তি ইত্যাদিও সন্নিকটে।

ঘরের ভিতর এদিক ওদিক করিতেছি। হঠাৎ এক নারীকণ্ঠে একদম সাধা মার্কিন গলায় শুনিলাম:—"আরে কোথায়? কোথ্ থেকে? কবে?" পরে স্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ। এক মিনিটের ভিতর জানা হইয়া গেল:—"রামা সুইডেনে, শ্যামা ইতালীতে, হরা

নিউইয়র্কে, পদা আর কোথাও” ইত্যাদি। পরেই প্রশ্নাপ্রশ্নি :— “এ কোথায় ?” “ও কোথায় ?” গোটা মৌচাকেই যেন হাত পড়িয়াছে। পৃথিবীটা যারপর নাই ছোট দেখিতেছি! কলিকাতা, বোম্বাই, লাহোরের নরনারীর কুশলও ইয়াঙ্কি লোকেরা বার্লিনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে।

দেড় দুই মিনিট হাঁটিয়া পৌঁছিলাম ‘উণ্টার ডেন্ লিণ্ডেন’ সড়কে। লিণ্ডনকে লেবু গাছ ধরা যাউক। অবশ্য কাগজি, পাতি বা বাতাবি নেবু নয়। সড়কটা দেখিবা মাত্র মনে হইল প্যারিসের ‘শাঁজ এলিজে’ সড়ক। প্রকাণ্ড চৌড়া রাস্তা, মধ্যভাগে লিণ্ডেন গাছের দুই সারি, গাছগুলা বেশী উঁচু নয়। গাছতলায় বসিবার বেঞ্চ আছে। রাস্তার দুইধারে প্রাসাদ-শ্রেণী। এইগুলা হোটেল, রেষ্টরাণ্ট, দোকান। ‘উণ্টার ডেন লিণ্ডেন’ রাস্তার খাঁটি বাংলা ‘নেবুতলা’।

ন্যাশন্যালিষ্ট বনাম সোশ্যালিষ্ট

এৎস্‌ব্যার্গ্যারের খুন লইয়া জার্মাণিতে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ‘লোকাল আন্‌ৎসাইগার’ বা ‘স্থানীয় প্রদর্শক’ কাগজের সুর :— “বেশ হইয়াছে। দেশের শত্রুর উচ্ছেদ এই ধরণেই হওয়া উচিত। এৎস্‌ব্যার্গ্যার তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।” বুঝা যাইতেছে ‘আন্‌ৎসাইগার’ ঘোরতর ন্যাশন্যালিষ্ট বা সমরপন্থী, এক কথায় কট্টর ‘স্বদেশী’। উল্টা সুর ‘ফোরহ্ব্যার্ট্‌স্’ শ্রেণীর কাগজের। ফোরহ্ব্যার্ট্‌স্ (বা “আগে চল্ আগে চল্ ভাই”) বলিতেছেন :— “আর কতদিন আমরা বুর্জোআ ধনিসমাজের আর ন্যাশন্যালিষ্টপন্থীদের অত্যাচার সহিব? আমাদের লিব্‌ক্লেষ্ট ইহাদের হাতে মারা পড়িয়াছে,— ইহাদের হাতেই শ্রীমতী রোজা লুক্‌সেম্বুর্গের প্রাণ গিয়াছে। সোশ্যালিষ্ট এবং কমিউনিষ্ট মতের কত লোক যে এই দুই বৎসর জবাই হইল,

তাহার ইয়ত্তা নাই। জার্ম্মাণির শ্রমী নরনারী এৎস্‌ব্যার্গ্যারের মৃত্যুঘটনা সহজে ভুলিবে না। ইহার যথোচিত প্রতিশোধ লইতেই হইবে।" 'ফোরহ্ব্যার্ট্‌স্‌' বার্লিনের 'লিয়্ম্যানিতে' অর্থাৎ মজুরপন্থী সোশ্যালিষ্ট কাগজ। তবে 'লিয়্ম্যানিতে' চরম মতের অর্থাৎ কমিউনিজমের পৃষ্ঠপোষক।

একখানা পুস্তিকায় পড়িলাম, জার্ম্মাণিতে আর্ম্মিষ্টিসের পর হইতে দুই বৎসরের ভিতর গুপ্তহত্যায় মারা পড়িয়াছে তিন শত উনত্রিশ জন। ইহাদের সকলেই সোশ্যালিষ্টপন্থী। হত্যাকারী যে যে ক্ষেত্রে ধরা পড়িয়াছে সকলেই অ-সোশ্যালিষ্ট। বিচারে কাহারো প্রাণদণ্ড হয় নাই। অনেকস্থলে হত্যাকারীরা পুরাণা পল্টনের নায়ক-পদস্থ কর্ম্মচারী। কেতাবের নাম 'ৎসোয়াই ইয়ারে মর্ড' অর্থাৎ 'হত্যা-কাণ্ডের দুই বৎসর'। লেখক গুম্বেল। প্রকাশক নয়েস ফাটার্লাণ্ড কোম্পানী। লেখক ও প্রকাশক উভয়েই চরমপন্থী কমিউনিষ্ট অর্থাৎ *বোলশেভিক। গুম্বেল লড়াইয়ের সময়েই এক কেতাব ছাপাইয়া-*ছিলেন। নাম 'ফ্যীয় ইয়ারে লিয়্গে' অর্থাৎ 'মিথ্যাকথার চার সাল'।

বার্লিনে লাল তামাসা

'নেবুতলার' নিকটেই একটা হোটেল পাওয়া গেল। অদূরের বাড়ীঘরগুলা বড়ও বটে, জাঁকালোও বটে, কিন্তু প্যারিসের সৌধগৌরব বার্লিনে যেন চোখে পড়িতেছে না। গ্রীষ্মকালই চলিতেছে,—বার্লিনেও গরম মন্দ নয়। তবে জুলাই মাসের প্যারিস সহ্য থাকিলে কলিকাতার গরম পাশ করাও সোজা কথা। বস্তুতঃ জুন, জুলাই, আগষ্ট মাসে তোকিও, নিউইয়র্ক, প্যারিস ইত্যাদি শহরে আর ভারতীয় শহরে কোনও তফাৎ আছে কিনা বহুবার সন্দেহ করিয়াছি।

বিকালে ড্রোশকেতেয় সওয়ারি হইয়া নয়া আবাসে আসিতেছি। যে

রাস্তায়ই যাই না কেন, লোকে লোকারণ্য। ব্যাপার কি? রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বাহির হইয়াছে। কোনো দলের নিশানে লেখা:— "জয় বিপ্লবের জয়"! কোনো নিশানে লেখা:—"বার বার এই বার।" কোনো কোনো নিশানে পড়িলাম:—"দুনিয়ার শ্রমীরা, দাঁড়াও এক হইয়া।" নিশানগুলা সব লাল। কোনো কোনো মিছিলে সুর বাজিতেছে ফরাসী মার্সেইয়ে! যেদিকেই যাই পথ বন্ধ। মাসুল বাড়িয়াই যাইতে লাগিল।

যাহা হইক, এমন দৃশ্য আর দেখিতে পাইব না। প্রুশিয়ার বুকের উপরে বোলশেভিকীর তাণ্ডব! পাহারাওয়ালাগুলা ভয়ে গলিঘোঁচে লুকাইয়াছে। কোনো কোনো কারখানার মজুরের দলে মেয়েদের সংখ্যা কম,—মিছিলেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু প্রত্যেক দলেই মেয়ে দেখিতেছি। বার্লিনের কোনো কারখানাই এই বিপুল প্রোসেশনে যোগ দিতে বাদ পড়ে নাই। 'বুর্জোআরা' বোধ হয় ঘরের জানালা হইতে নয়া জীবনের স্রোত দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিতেছে।

প্রোসেশন চলিতেছে কোথায়? কাইজারি আমলের প্রাসাদগুলার আওতায়। পরে খবর পাইলাম এইখানে মজুর নরনারীরা পুরাণা রাজরাজড়াদের মূর্ত্তির উপর লাল নিশান চড়াইয়াছে। তবে জার্ম্মাণদের রক্ত বেশী গরম নয়। ইহারা মূর্ত্তি, অট্টালিকা ইত্যাদি ভাঙিবার দিকে নজর দেয় না। ফরাসীরা এই বিষয়ে ঠিক উল্টা। প্যারিসে বিপ্লব মানে কোটি কোটি টাকার বাড়ীঘর লুটপাট ও অগ্নিকাণ্ড। সত্যিকার লাল তামাসা না দেখাইয়া ফরাসী জনসাধারণ বিপ্লবে হাত দেয় না। ফরাসীরা অন্ততঃ পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ উন্টার ডেন্ লিণ্ডেনের 'অশ্বারোহী ফ্রেড্রিক দি গ্রেট'-মূর্ত্তি চুরমার করিয়া ছাড়িত।

অনেক কষ্টে ড্রোশকেওয়ালা উন্টার ডেন লিণ্ডেন পার হইল।

হোটেলে পৌঁছিতেছি এমন সময়ে এক জার্ম্মাণ নারী চীৎকার করিয়া তাঁহার স্বামীকে দেখাইলেন "ঐ দেখ ড্রোশ্‌কেতে কে?" তৎক্ষণাৎ ড্রোশ্‌কে থামাইয়া করমর্দ্দন-হাসাহাসি আর দহরম-মহরম। দু'চারটা মোলাকাতের বন্দোবস্ত হইয়া গেল। যুবক ভারতের আত্মীয় জুটে দুনিয়ার স্বর্ব্বত্র।

শ্রেণী-বিবাদ

এৎসব্যার্গ্যারকে খুন করিয়া সমরপন্থী ন্যাশন্যালিষ্টরা ভাবিয়াছিল রাতারাতি কাইজারকে আনিয়া আবার গদীতে বসাইবে। কাইজার বাহাদুরও বাপেবেটায় হল্যাণ্ডের ময়দানে (যদিও দুই স্বতন্ত্র খোঁয়াড়ে) দাঁড়াইয়া হয়ত গোঁপে চাড়া মারিতেছিলেন। কিন্তু উল্‌টা বুঝিলি রাম! ফল দেখিতেছি ঠিক বিপরীত। জার্ম্মাণিতে রিপাব্লিক আরও শক্ত হইয়া বসিল। প্রেসিডেণ্ট এবার্ট যদিও চরম সোশ্যালিষ্ট নন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তিনি শ্রমজীবীদের স্বপক্ষেই কাজ করিলেন।

মজুর নরনারীদের মিছিলের বিরুদ্ধে ন্যাশন্যালিষ্ট দলের কোনো প্রতিবাদ হইতে পারিল না। যে সকল কাগজ,—লোকাল আন্‌ৎসাইগার, ডয়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ ইত্যাদি,—এৎস্‌ব্যার্গ্যারের হত্যাকারীকে স্বদেশভক্ত বলিয়া তারিফ করিতেছিল, প্রেসিডেণ্ট এবার্টের গবর্মেণ্ট তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। পনর দিনের জন্য পাঁচ-সাতটা জগৎ-প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজের প্রকাশ স্থগিত থাকিল। মজুরের ভয়ে পল্‌টন সন্ত্রস্ত! অদূর রুশ মুল্লুকে বোলশেভিকীর হুঙ্কার শুনা যাইতেছে বুঝি!

এবার্ট সমরপন্থীদেরকে জব্দ করিয়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের এক সঙ্গে প্রশংসা পাইতেছেন। মজার কথা,—ইংরেজ ও ফরাসী সরকার নিজ নিজ দেশে বোলশেভিকী ও কমিউনিজমের যম। অথচ এই দুই গবর্মেণ্টই জার্ম্মাণিতে মজুরপন্থীদের ক্ষমতাই বাড়াইয়া তুলিতে সচেষ্ট।

মজুর-গবর্মেণ্ট লড়াইয়ের বিরোধী,—কাজেই এই ক্ষেত্রে ইংরেজ ও ফরাসীদের মিত্র। ফ্রান্সের 'তাঁ,' 'ম্যার্ত্যাঁ' ইত্যাদি কট্টর সাম্রাজ্যপন্থী ও সমরপন্থী দৈনিকগুলা জার্ম্মাণির 'ফোরহ্বেয়ার্ট্‌স্‌' ইত্যাদি কাগজের মতামত সর্ব্বদাই উদ্ধৃত করিয়া থাকে। অথচ ফরাসী ফোরহ্বার্ট্‌স্‌ যথা 'ল্যিম্যানিতে'—ইহাদের চিন্তায় বিষস্বরূপ।

দেখা যাইতেছে, আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় লেন-দেন আজকাল আর এক-তরফা শত্রুতা-মিত্রতার সম্বন্ধ মাত্র নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই ভিন্ন ভিন্ন 'জাতে' বিভক্ত। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই 'জাত'গুলা পরস্পর কামড়া কামড়ি সুরু করিয়াছে। এই 'ক্লাস্‌-ষ্ট্রাগ্‌ল্‌' বা শ্রেণী-বিবাদ কাণ্ড আজকাল আর কার্ল মার্ক্‌সের কেতাব মাত্রে আবদ্ধ নয়। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে এই দলাদলি ও জাত-লড়াই দেখা দিয়াছে।

এই জন্য জার্ম্মাণ মজুর জাত জার্ম্মাণ ধনী জাতের মিত্র না হইয়া ফরাসী মজুর জাতকেই 'আপনার জন' সমঝিতেছে। এই কারণেই জার্ম্মাণির সঙ্গে কারবার করিতে আসিয়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স গোটা জার্ম্মাণ দেশের মতামত লইয়া মজিতেছে না। জার্ম্মাণির যে জাতগুলা জার্ম্মাণ-সমর-প্রচেষ্টার বিরোধী, একমাত্র তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হওয়াই পুরাণা শত্রুরা বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করিতেছেন।

জার্ম্মাণিতে মজুরসঙ্ঘের ডেমক্রেসি প্রবল হইতে থাকিলে ভবিষ্যতে ফরাসী এবং ইংরেজ মজুরসঙ্ঘও চাঁড়িয়া উঠিবে। তখন ফরাসী এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যপন্থী ও সমর-ব্যবসায়ীদেরও ভাত মারা যাইবার সম্ভাবনা। অবশ্য একথা সম্প্রতি ধামা চাপা রহিয়াছে।

জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা

ফরাসী ভাষাটা দখল করিতে না করিতেই আর একটা নয়া বুলির আওতায় আসিয়া পড়িয়াছি! জার্ম্মাণ বশে আনা এক অতি ভীষণ

কাণ্ড। ডিক্‌শনারির সাহায্যে জার্ম্মাণ গদ্য-পদ্য পড়িয়া আসিতেছি —যখনই সময় পাই—আমেরিকা হইতে। কিন্তু জার্ম্মাণ জানি, একথা বলি নাই কোনো দিনও—আজ ত নয়ই। এক ঘণ্টায় এক কলমের বেশী খবরের কাগজ হজম করিতে পারিতেছি না। কথাবার্ত্তা মামুলি বিষয়ে চালানো নেহাৎ কঠিন নয়। কিন্তু কাজের কথায়,—বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অথবা দীর্ঘকালব্যাপী বাক্‌বিতণ্ডায় জার্ম্মাণ ব্যবহার করা অসাধ্য।

ফরাসীতে এই বিষয়ে ঠিক উল্‌টা। আলোচ্য বিষয় যত কঠিন বা যত গভীর হউক, ইংরেজি-জানা লোকের পক্ষে ফরাসী ভাষা তত সোজা। কারণ লম্বা চৌড়া শব্দগুলা ফরাসীতে আর ইংরেজিতে অধিকাংশই একরূপ। কিন্তু জার্ম্মাণের আটপৌরে শব্দের রাজ্য ছাড়িয়া উঠিবা মাত্রই যতগুলা শব্দ দরকারে লাগে সবগুলাই ইংরেজি ও ফরাসী ভাষা দুইটার অজানা। আর এই সব নয়া শব্দের বহরই বা কি প্রকার! 'রঘুবংশের' কোনো কোনো কাণ্ডের শেষাশেষি কতকগুলা 'পাটনাই' শ্লোক আছে। সেই সব দেখিয়া যাঁহারা ভয় পান জার্ম্মাণে দন্তস্ফুট করা তাঁহাদের কার্য্য নয়। তা সত্ত্বেও দেখিতেছি দু'একজন বাঙালী জার্ম্মাণে ফোআরা ছুটাইতেছে। সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নাই।

হোটেলে জার্ম্মাণি

হোটেলের নারী কেরাণী বলিতেছেন:—"যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ জাতকে আমরা যতটা শত্রু ভাবিতাম, আজ আর্মিষ্টিসের পর হইতে ফরাসী জাতকে সেইরূপ শত্রু ভাবিয়া আসিতেছি। ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মাণকে শীঘ্রই লড়িতে হইবে। ফরাসীরাও তাহা বেশ জানে। বোধ

হয় দশ বৎসরের ভিতরই এই লড়াই আসিবে,—আর সেই লড়াইয়ে ইংরেজরা নিশ্চয়ই জার্ম্মাণির স্বপক্ষে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।”

হোটেলের এক ঝীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—“কাইজারকে তাড়াইবার পর জার্ম্মাণ নরনারীর সুখ বাড়িয়াছে কতটা?” জবাব ঃ—“রিপাব্লিকের আমলে ‘ফ্রাইহাইট’ অর্থাৎ স্বাধীনতা শব্দটার চল বোধ হয় বাড়িয়াছে। এখন আছে সব সুখই, কেবল অন্নবস্ত্রেরই অভাব।” “কেন?” “জার্ম্মাণিতে মজুররা আজও খাটিতেছে পনর ঘণ্টা করিয়া রোজ। আর বেতন যাহা পাই, তাহাতে কোনো লোকই ইজ্জদ রক্ষা করিতে পারে না। কাইজারের আমলে জার্ম্মাণ সমাজের বিশেষ দুঃখ আর কিই বা ছিল?”

ব্যাঙ্ক-পরিচালক য়াইডেল্‌স্

য়াইডেল্‌স্ বলিতেছেন ঃ—“আপনারা ভাবিতেছেন ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক জন ভারতীয় ছাত্র পাঠাইয়া এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কৃষিতত্ত্ববিৎ ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া লইয়া পরে তাহাদের সাহায্যে দেশে কারখানা চালাইবেন? শিল্প প্রতিষ্ঠা করা আর ব্যবসা দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধিকরা ইস্কুলমাষ্টার, পি-এইচ. ডি., ডি. এস-সি.র কার্য্য নয়। যদি ইয়োরোপে বা আমেরিকায় ভারতীয় যুবকেরা ফ্যাক্টরির কলযন্ত্রগুলা অনেকদিন ধরিয়া নাড়িবার চাড়িবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে হয়ত সুফল ফলিতে পারে। আর কোনো পথ দেখিতেছি না।”

য়াইডেল্‌স্ এক বড় ব্যাঙ্কের মালিক ও পরিচালক। জার্ম্মাণিতে এই ব্যাঙ্কের নাম-ডাক খুব বেশী,—যদিও বার্লিন ছাড়া অন্য কোনো শহরে ইহার শাখা স্থাপিত হয় নাই। নাম ‘বের্লিনার হাণ্ডেল্‌স্-গেজেল্‌শাফ্‌ট্।’ গেজেলশাফট্ শব্দের অর্থ সমিতি, সমাজ বা কোম্পানী। হাণ্ডেল্ বলে ব্যবসাকে। য়াইডেল্‌স্ স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ে

সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি পাওয়া লোকও বটে। তবে ইস্কুলমাষ্টার জাতটাকে ইঁনি নেহাৎ বেয়াকুব্ বিবেচনাই করিয়া থাকেন। বিলাতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়, জাপানেও দেখিয়াছি যে, ধনবিজ্ঞান-বিস্তার অধ্যাপক-গুলাকে ব্যবসায়ীরা আর কারখানার মালিক মহাশয়েরা আস্ত গরু বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত।

শুনিলাম পোল্যাণ্ড ইত্যাদি নয়া রাষ্ট্রগুলার টাকার দাম এত কম যে, জার্ম্মাণির সঙ্গে এই সকল দেশের আমদানি-রপ্তানি ব্যাপারে মুদ্রার ব্যবহার করা হয় না। মালে মালে বিনিময় সাধিত হইতেছে। য়াইডেলস্ বলিতেছেন:—"রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মাণির কারবার অতি শীঘ্রই তুমুলভাবে সুরু হইবে। এখনও কিছু কিছু চলিতেছে। এই কারবারটা বহু বৎসর ধরিয়া মাল-বিনিময়ের আকারেই চলিতে বাধ্য। মুদ্রার চল জারি হইতে অনেক দিন লাগিবে মনে হইতেছে।"

স্প্রে দরিয়া

গঙ্গার কিনারাটা বাদ দিলে কাশীর কাশীপ্রাপ্তি ঘটিবে। ভারত-সন্তান মাত্রেরই জানা আছে,—ঘাটে ঘাটে কাশী-মাহাত্ম্য বিরাজ করিতেছে। প্যারিসে সেইনের কিনারায় এইরূপই এক নদী-মাহাত্ম্য দেখিয়া আসিয়াছি। গ্রীষ্মকালে জুলাই-আগষ্ট মাসের সন্ধ্যাবেলায় সেইনের পুলে পুলে, সেইনের তটে তটে অপূর্ব্ব নরনারীর সমাগম হয়। সেইনের দুই কিনারার প্রত্যেক অট্টালিকার প্রত্যেক ইটপাথর প্যারিসবাসীর মাথায় নানা খেয়াল গজাইয়া থাকে। সৌধশ্রেণীর বাস্তুকলাও অপরূপ সৌন্দর্য্যবোধ জাগাইয়া দেয়। কি কবি, কি ঐতিহাসিক, কি স্থপতি, কি চিত্রশিল্পী সকল প্রকার লোকই সেইনের জলে, সেইনের আকাশে ও সেইনের আবহাওয়ায় যুগে যুগে অগণিত প্রেরণা পাইয়া আসিয়াছে।

বার্লিনে স্প্রে দরিয়ায় সেইনের সেই গৌরব অনুভব করা দুষ্কর, না শিল্পের তরফ হইতে, না পুরাকাহিনীর তরফ হইতে, না প্রাকৃতিক শোভার তরফ হইতে। যেন বঙ্গীয় পল্লীর পচা পুকুরের কালো তরল পদার্থ অথবা কল কারখানা পরিষ্কার-করা নোংড়া তেলা জল,—নির্জ্জীব স্রোতহীন ভাবে শুইয়া রহিয়াছে। কাইজার বাহাদুরদের প্রাসাদ ও গির্জ্জা ভবনগুলি এবং মিউজিয়ামও এই ধরণের নর্দ্দমার উপরেই অবস্থিত। এই অঞ্চলে বেড়াইতে আসা ত দূরের কথা,—এক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতেও ইচ্ছা করে না। কিছু অত্যুক্তি করা হইল অবশ্য।

স্প্রেটা যদিও নেহাৎই ছোট খালের মতন সরু, তবুও ষ্টীমলঞ্চ এবং বড় বড় কারবারী নৌকার চলাচল নদীর উপর কম দেখিতেছি না। লেয়র্টার বান্‌হোফ ষ্টেশনের নিকটে স্প্রের ঘাট দেখিয়া এক প্রকাণ্ড বন্দরের কথাই মনে পড়িবে। মালের বোঝাই-নামাই এখানে বিস্তর হইয়া থাকে।

প্রাথমিক অভিজ্ঞতা

বার্লিনের পাহারাওয়ালাগুলা এক অদ্ভুত রকমের টুপি মাথায় দেয়। চেহারায় ইহারা মার্কিন বা ইংরেজ শিপাহীদের চেয়ে ছোট খাটো। তথাকথিত জার্ম্মাণত্ব বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। অধিকন্তু, সবুজ পোষাকের উপর কালো টুপিওয়ালা আদমির বাহ্য গৌরব লোকের নজরেই আসে না। শুনিলাম, এই পোষাক রিপাব্লিকের আমলে কায়েম করা হইয়াছে।

খবরের কাগজে পড়িতেছি, জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের শীঘ্রই দেউলিয়া হইবার উপক্রম। আয় যত, খরচ তার অনেক বেশী। পুরাণা শত্রুদিগকে লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ সুদে আসলে ত দিতেই হইবে। অধিকন্তু বিনিময়ের বাজারে জার্ম্মাণ-মার্ক্ রোজ রোজই নামিয়া চলিয়াছে। এক মার্কিন ডলারে প্রায় একশ' মার্ক্ পাওয়া যাইতেছে।

অথচ বাজার দর খতাইয়া দেখিতেছি প্যারিসের চেয়ে বার্লিন প্রায় অর্দ্ধেক শস্তা। সকল বিষয়েই যেন এইরূপ বোধ হইতেছে। এখানে ঘরভাড়া অনেক কম, পোষাকের দাম অনেক কম, রেষ্টরাণ্টের খাই খরচও অনেক কম। অধিকন্তু, জার্ম্মাণেরা নয়া নয়া ব্যবসা ফাঁদিতেছে,—অন্ততঃ পুরাণা ব্যবসাগুলাকে আবার তাঁবে আনিতেছে। বার্লিনের মফঃস্বলে মফঃস্বলে অর্থাৎ বৃহত্তর বার্লিনের পাড়ায় পাড়ায় অনেক নতুন নতুন ইমারত গড়া সুরু হইয়াছে দেখিতেছি।

উণ্টার ডেন্ লিণ্ডেন অঞ্চলটার নাম-ডাক যতই থাকুক না কেন, ওখানে বসবাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এক বন্ধুর বাড়ীতে চা খাইতে গিয়া দেখি বার্লিন শহরের ভিতরই পল্লীগ্রামও আছে। অর্থাৎ পরিষ্কার হাওয়া, ধোঁয়াহীন নীল আকাশ, ঝক্ ঝকে রাস্তা, সূর্য্যের আলো, শক্ত নিরেট নয়া নয়া ঘর,—আর এমন কি বাসভবনের লাগাই কুমড়া, শসা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, সূর্য্যমুখী এবং গ্যাঁদাফুলের ক্ষেত। পাড়াটার নাম হ্বিলমর্সডর্ফ। আধ ঘণ্টার ভিতরই আন্তর্ভৌম (উণ্টার গ্রুণ্ড্) গাড়ীতে শহরের কেন্দ্র হইতে এই অঞ্চলে পৌছানো যায়। জার্ম্মাণ নরনারীরা আছে সুখে।

ব্যাভেরিয়া-সমস্যা

এক উচ্চপদস্থ ওস্তাদ ডাক্তারের পত্নী বলিতেছেন—"মহাশয়, জার্ম্মাণিতে পাইবেন ঠিক আপনাদেরই দেশ,—এখানে বার রাজপুতের তের হাঁড়ী। ফ্রান্সে প্যারিস ফরাসী জাতির জীবন-কেন্দ্র, বিলাতে লণ্ডন ইংরেজ সমাজের জীবন-কেন্দ্র। কিন্তু বার্লিনকে জার্ম্মাণ জাতের জীবন-কেন্দ্র বলিলে প্রদেশে প্রদেশে লাঠালাঠি সুরু হইবে। এই প্রাদেশিকতায়ই আমরা মরিতে বসিয়াছি। হান্নোফার, ষ্টুটগার্ট, মিয়েন্খেন, লাইপৎসিগ প্রত্যেকেই বার্লিনের সঙ্গে টক্করদিতে চায়।"

বস্তুতঃ বার্লিনে পৌঁছিয়া অবধি কাগজে পড়িতেছি যে, ব্যাভেরিয়া জার্ম্মাণ মুল্লুক হইতে আলাদা থাকিতে চায়। বাভেরিয়াকে এক কথায় দক্ষিণ-জার্ম্মাণি বলা হয়, ব্যাভেরিয়ার সঙ্গে উত্তর-জার্ম্মাণির,—অন্ততঃপক্ষে প্রুশিয়ার বিরোধ ও লড়াই দু'দিনকার একদিনকার কথা নয়। এই ঝগড়া জার্ম্মাণ জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ও আটপৌরে ঘটনা।

এক ব্যক্তি বলিলেন:—"১৯১৪ সালে যখন জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সঙ্গে অন্যান্য দেশের লড়াই জারি করা হয়, তখন উত্তর-জার্ম্মাণির প্রদেশগুলা প্রুশিয়ার আইন মাফিকই সেনা চলাচলের হুকুম করিয়াছিল। কিন্তু ব্যাভেরিয়া এই ক্ষেত্রেও নিজের স্বরাজ বাঁচাইয়া চলে। অর্থাৎ উত্তর-জার্ম্মাণির হুকুমগুলাকে ব্যাভেরিয়া-রাষ্ট্রের স্বাধীন বিচারে পেশ করা হয়। পরে ঐ হুকুমগুলাকেই ব্যাভেরিয়ার হুকুমরূপে, জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের হুকুমরূপে নয়, নিজ ফৌজ-বিভাগে জারি করা হইয়াছিল। ব্যাভেরিয়ার লোকেরা প্রুশিয়ার অর্থাৎ উত্তর-জার্ম্মাণির একতিয়ার এতই ঘৃণা করিয়া আসিতেছে।"

তাই দেখিতেছি, প্যারিসের জার্ম্মাণ কন্সালের আফিসে যখন আমার পাশ পোর্টে 'ভিজা' পাইলাম, তখন কর্ম্মচারীরা বিশেষভাবে লিখিয়া দিল যে, ব্যাভেরিয়ার কোনো শহরে যাইতে হইলে এই 'ভিজায়' চলিবে না। সেই শহরের পুলিশ আফিস হইতে আগে অনুমতি না পাইলে—কোনো ব্যক্তির, এমন কি কোনো জার্ম্মাণেরও সেখানে প্রবেশ নিষেধ। অনুমতি পাওয়াটা এমন কিছু কঠিন নয়। আসল কথা, সকল বিষয়েই ব্যাভেরিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বা স্বরাজ বজায় রাখিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

জার্ম্মাণ সমাজের ব্যাভেরিয়া-সমস্যাই সব চেয়ে বড় আভ্যন্তরীণ সমস্যা। যদি কোনো মতে ব্যাভেরিয়া স্বাধীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উত্তর-জার্ম্মাণির প্রদেশগুলা স্যাক্সনি, হান্নোফার ইত্যাদিও

প্রুশিয়ার সঙ্গে এক হইয়া থাকিবে না। তাহা হইলে জার্ম্মাণ মুল্লুক আবার বিস্মার্কের পূর্ব্বেকার অবস্থায় আসিয়া পৌছিবে। এই ভয় জার্ম্মাণদের খুবই বেশী।

তৃতীয় অধ্যায়

জার্ম্মাণ কুল্টুরে হাতে খড়ি

পাংসিওঁনে বসবাস

বাড়ী বদলানো গেল। শার্লোটেনবুর্গ পাড়ায় আসিলাম। পাড়াটা নামজাদা,—আব্‌হাওয়া হ্বিল্‌মার্সডর্ফেরই অর্থাৎ নির্জ্জন 'পল্লীগ্রামে'র। বাড়ীগুলা দেখিবা মাত্রই মনে হয় একদম নয়া,—দশ বার বৎসর আগে হয়ত এই অঞ্চলে বস্তি ছিল খুব কম। কাইজারডাম রাস্তায় আসিলে বুক চওড়া হইয়া যায়। দুইধারকার সড়কগুলার কোনো কোনোটা কথঞ্চিৎ ছোট বটে, কিন্তু নেহাৎ গলি এখনও চোখে পড়ে নাই। বাড়ী সর্ব্বত্রই পাঁচ-ছয় তলা।

বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে খাওয়া সাড়ে সাত বৎসরে এই প্রথম। এই ধরণের বসবাসকে ইয়োরোপে 'পাংসিয়োনে' থাকা বলে। শব্দটা ফরাসী। সারা জীবন রেষ্টরাণ্টে রেষ্টরাণ্টে খাইয়া কাটানো মানুষ-মাত্রের পক্ষেই বোধ হয় এক চরম দুর্ভাগ্য। বোধ হয় পাংসিওঁনে খাওয়ায় মনুষ্যত্ব কথঞ্চিৎ বজায় থাকে। এক রেষ্টরাণ্টে বুঝিলাম,—জার্ম্মাণরা মাছের ঝোল রাঁধে ভাল! রান্নাবাড়ির প্রভেদ ইয়োরামেরিকার দেশে দেশে বড় কম নয়। তবে কেতাবে পড়া অভিজ্ঞতা অনুসারে এই দিকেও জাতে জাতে তফাৎ করা নিতান্ত কঠিন নয়।

প্যারিসের মতন বার্লিনেও পদার্পণ করা মাত্রই পুলিস আফিসে হাজির হইতে হয়। পাড়া বদলাইবার পরও পাড়ার থানায় নাম ধাম এবং চৌদ্দ পুরুষের বৃত্তান্ত দিয়া আসিতে হইল।

বাড়ীওয়ালী ইংরেজি জানে না। ভালই হইয়াছে। ঘরেই আমার জার্ম্মাণ ইস্কুল। বাড়ীওয়ালীর খোকার বয়স বার বৎসর। সে এক বই লইয়া আসিয়া বলিল:—“ইস্কুলে আমরা এই বইটা জার্ম্মাণ ব্যাকরণের জন্য ব্যবহার করি। আপনার কাজে লাগিতে পারে। আমাদের বাড়ীতে একজন চীনা অতিথি ছিলেন। এই বই তিনি পড়িতেন”। কেতাবটায় অবশ্য নতুন শিখিবার কিছু নাই। কিন্তু ছোঁড়ার সঙ্গে জার্ম্মাণ বুলি সাধিবার সুযোগ ফেলিয়া দিবার বস্তু নয়।

সারা দিন কাটাইতেছি ঘরের বারান্দায়। খাওয়া দাওয়াও করি নীল আকাশের তলে। দিন বেশ গরম,—রাত ঠাণ্ডা। আমাদের দেশী হিসাবে বলিব শীত আসিতেছে। পশ্চিমা পারিভাষিকে এই ঋতু পত্র-‘পতনের’ কাল। গাছের পাতাগুলি লাল্‌ছে মারিতেছে,—এবং একটা দুইটা করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছেও। তবে এখনো—সেপ্‌টেম্বার মাসের মাঝামাঝি—সবুজের রাজত্বই মোটের উপর চলিতেছে। মাঝে মাঝে ঝড়ের প্রকোপ দেখা যায়। মেঘ বৃষ্টির দৌরাত্ম্য এখনো খুবই কম।

‘টাগেব্লাটে’ দান্তে-কথা

আজ ১৪ সেপ্‌টেম্বার, ১৯২১। ছয়শ’ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে ইতালীয় কবিবর দান্তের মৃত্যু হয়! এই উপলক্ষ্যে ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরে—দান্তের জন্মভূমিতে বিরাট সম্মেলন বসিয়াছে। দুনিয়ার দান্তে-ভক্তেরা সেই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া অথবা সম্মেলনের জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া বর্ত্তমান জগতের আন্তর্জ্জাতিকতা সপ্রমাণ করিতেছেন।

এক জার্ম্মাণ অধ্যাপক দৈনিকে লিখিয়াছেন, “দান্তে এক হিসাবে জার্ম্মাণ কবি, কেননা জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরাই দান্তে-সাহিত্যকে জগতে দাঁড়

করাইয়া দিয়াছেন!" 'টাগেব্লাট' কাগজে ইতালীয় দার্শনিক ক্রচে লিখিত প্রবন্ধের জার্ম্মাণ তর্জ্জমা বাহির হইয়াছে। ক্রচে বেয়াত্রিচে 'তত্ত্ব' বা বেয়াত্রিচে-'সমস্যা' লইয়া তুই চার মামুলি কথা বলিয়াছেন। প্রশ্নগুলা এই ঃ—"বেয়াত্রিচে কি কোনো রক্ত মাংসের নারী? বেয়াত্রিচের সঙ্গে দান্তের কখনো দেখা হইয়াছিল কি? বেয়াত্রিচে কি কল্পনার গড়া? যদি কল্পনাই হয়, কল্পনাটাই বা উঠিল কোথা হইতে? দান্তের কোনো ভালবাসার অভিজ্ঞতা হইতে অথবা বিলকুল মাথা খাটাইয়া এক নারীমূর্ত্তি খাড়া করিবার প্রয়াস হইতে?" এই সব প্রশ্নের জবাব যাঁহার যেরূপ খুসী, তিনি সেইরূপ দিতে পারেন, বোধ হয় প্রত্যেকের জবাবই আংশিক সত্য বলিয়া গৃহীতও হইবে। আমাদের রাধা সুন্দরীর তত্ত্ব-কথাও বেয়াত্রিচে-সমস্যারই সমগোষ্ঠীভুক্ত।

তুনিয়ায় ইংরেজ

জার্ম্মাণের বিভক্তি আর উপসর্গগুলা প্রাণ অস্থির করিয়া ছাড়িতেছে। পাঁচ সাত লাইনের চিঠি এক ঘণ্টায় চারখানার বেশী লেখে সাধ্য কার? যাহা হউক "শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্।" জার্ম্মাণির সকল ক্ষেত্রেই এই "শনৈঃ শনৈঃ" নীতি পালনীয় মনে হইতেছে। যুবক ভারতের জীবন-লীলায় ফ্রান্স যে বস্তু, জার্ম্মাণিও আজ সেই বস্তু। তুই দেশে উনিশ-বিশ করিতে বসিয়া লাভ নাই।

ইংরেজের খোসামোদ করা ছাড়া জার্ম্মাণির "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-অয়নায়।" ফ্রান্সের অবস্থাও তাই, জাপানের অবস্থাও তাই। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রও,—যার লোকবল ধনবল কিছুরই অভাব নাই,—বিশ্বের বাজারে ইংরেজের হুকুম তামিল করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করে। আর আজ 'টাগেব্লাটে' রয়টারের সংবাদ পড়িয়া বুঝিতেছি,

কয়েক মাস হইল ইংল্যণ্ডে আর 'বোলশেভিকীয়ায়' বাণিজ্যসন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। তাহার সর্ত্ত অনুসারে ইংরেজরা সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে জগতে কোনো প্রকার আন্দোলন তুলিবে না, এবং রুশিয়াও ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ গোলাম ও বিদ্রোহী এশিয়ার স্বপক্ষে) কোনপ্রকার হুজুগ সৃষ্টি করিবে না। উভয় পক্ষে এইরূপ চুক্তি হইয়াছে। পেটের দায়ে, অন্নকষ্টের ভয়ে, দুর্ভিক্ষের তাড়নায় বোলশেভিকেরা বিশ্ববিপ্লবের ধ্বজা পুড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য হইবে,—অনেক সুবিবেচক লোক পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ ভাবিতেছিল। হাতে হাতে তাহা প্রমাণিতও হইল।

রুশরা নাকি ইতিমধ্যে পারস্যে, আফগানিস্থানে ও মধ্য এশিয়ায় ইংরেজের শত্রুদিগকে সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। ইংরেজ এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মস্কোর কর্ত্তাদের নিকট এক কড়া চিঠি পাঠাইয়াছেন। হয়ত মস্কো জবাব দিবেন ঃ—"নাকে খত দিতেছি। আর এমন কুকর্ম্ম করিব না।" ফলতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যের হিসাবে তোকিও, প্যারিস, বার্লিন এবং মস্কো, এই চার কেন্দ্রই একাকার। অর্থাৎ ইহারা প্রত্যেকেই লণ্ডনের শত্রু। প্রত্যেকেই ইংরেজ জাতকে বিষের মতন বর্জ্জনীয় এবং দুনিয়ার পাপস্বরূপ বিবেচনা করে। অথচ প্রত্যেকেই আবার কায়ে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব,—কাগজে কলমে অবশ্য, পেটে পেটে থাকুক বা না থাকুক,—পাতাইয়া চলিতে অভ্যস্ত।

বিদেশে পরাধীনের আন্দোলন

এই গেল দেশগুলার সরকারী গবর্মেণ্টের কথা। কিন্তু বে-সরকারী নর-নারীর মেজাজ কিরূপ? এক কথায়,—প্রত্যেক দেশের

প্রতিহিংসা লইবার সাধ জার্ম্মাণের যেমন, ফরাসীর আর রুশেরও তেমন। কিন্তু খোলাখুলি মনের কথা বলা কোনো চতুর ব্যক্তিরই স্বভাব নয়। কোনো কোনো 'তুঁখো' লোক হয়ত বা প্রকাশ্য ভাবেই ইংরেজ-বিরোধী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পাণ্ডা দাঁড়াইয়া যাইতেও পারেন। সহজে বলিব যে, মোটের উপর জার্ম্মাণ, রুশ, ফরাসী সকল সমাজেরই সাধারণ মেজাজ ইংরেজ-বিরোধী, যদিও বিরোধটা নীরব।

রুশিয়ার বিপ্লবপন্থীরা নিজ দেশীয় গবর্মেণ্টের এলাকার বাহিরে একটা সঙ্ঘ গড়িয়াছেন। তাহার নাম 'তৃতীয় ইণ্টারন্যাশন্যাল'। সঙ্ঘে গোটা জগতের লোক আহূত হয়। বৎসর বৎসর এই আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের সভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মাস দু' এক হইল মস্কোয় ইহার এক বড় বৈঠক হইয়া গিয়াছে। 'তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকে'র এই সভায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিপ্লবপন্থীরা গুলতান করিবার জন্য উপস্থিত ছিল। অথচ শুনা যাইতেছে, এশিয়ার স্বপক্ষে এবং এমন কি এশিয়ার অবস্থা সম্বন্ধেই আদৌ কোনো প্রকার আলোচনা এই কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত হয় নাই। অর্থাৎ চরমপন্থী মানব-সেবকরাও এশিয়াবাসীর স্বাধীনতার স্বপক্ষে বাজারে দাঁড়াইয়া লম্বা গলা করিয়া বুথ্‌নি ঝাড়িতে আজ অসমর্থ। কিন্তু এক বৎসর পূর্ব্বে ইহারাই গোটা দুনিয়াকে পরাধীনতার বগলস্‌ হইতে বাঁচাইবার জন্য হুঙ্কার ছাড়িতেছিলেন। ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে এমন কি? ইংরেজ-রুশের বাণিজ্য-সন্ধি (মার্চ্চ ১৯২১)।

ডি-ভ্যালেরার আইরিশ স্বাধীনতার লড়াইয়ে মার্কিন 'সমাজ' আয়র্লণ্ডকে যতটুকু সাহায্য করিতেছে, তাহার বেশী সাহায্য কোনো বিপ্লবীদল কোনো বিদেশী সমাজ হইতে পাইতে আশা করিলে বেয়াকুবি সপ্রমাণ করা হইবে। পরন্তু, পৃথিবীর যে কোনো দেশেই এই ধরণের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, এইরূপ ধরিয়া লওয়া উচিত। অবশ্য চাই মাথার জোর আর তদবির করিবার ক্ষমতা।

লাইপ্‌ৎসিগার মেস্‌সে

জার্ম্মাণিতে 'লাইপ্‌ৎসিগার মেস্‌সে' একটা বড় অনুষ্ঠান,—সেপ্টেম্বার মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। লাইপ্‌ৎসিগের প্রদর্শনীটা জার্ম্মাণ সমাজে আমাদের হরিহর ছত্রের মেলার সমান বিখ্যাত। এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই মেলার খবর রাখে।

এবারকার মেলায় জার্ম্মাণ ফ্যাক্টরিগুলার কাজ বিশেষরূপে দেখানো হইয়াছে। যুদ্ধের পর জার্ম্মাণি কত নূতন দিকে নয়া নয়া কল-কব্জা উদ্ভাবন করিয়াছে লাইপ্‌ৎসিগের 'মেস্‌সতে' তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশের শিল্পের ওস্তাদ ও ব্যবসাদারেরা এই মেলা দেখিয়া বহু নয়া অভিজ্ঞতা লইয়া গেল। সাধারণতঃ এখানে গোটা দুনিয়ার বাজার বসে।

মেলাকে জার্ম্মাণে বলে 'মেস্‌সে'। জার্ম্মাণির বড় বড় শহরে এই ধরণের মেস্‌সে খোলা হইয়া থাকে। এই সকল হাটে ছুঁচ-সূতা হইতে এরোপ্লেন-টেলিফোনের কল পর্য্যন্ত সব চীজই পাওয়া যায়। সুকুমার শিল্পও বাদ পড়ে না।

অটোমোবিলের হাট

বার্লিনে একটা 'আউস্‌ষ্টেল্লুঙ্' বা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। আমার বাড়ীর লাগাই প্রদর্শনীর বিরাট প্রাসাদ। হাট বসিয়াছিল এক মাত্র অটোমোবিলের জন্য। এখানে এক সপ্তাহে লাখলাখ নরনারী মোটরকারের মেলা দেখিয়াছে।

দশ বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণিতে আর কোনো অটো-মেলা খোলা হয় নাই। এই দশ বৎসরে,—বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়কার বিজ্ঞান-বিস্তারের ফলে,—মোটরগাড়ীর প্রত্যেক কল-কব্জায় অদ্ভুত অদ্ভুত

উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার ওস্তাদেরা এই সকল উন্নতির কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। প্রদর্শনীর নয়া মোটরকারে আর মামুলি পুরাণা মোটরকারে কোনো ফারাক আছে কিনা আনাড়ির চোখে তাহা ধরা পড়া মুস্কিল। মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালিয়ান, জাপানী এবং অন্যান্য দেশীয় শিল্পবিৎ ও সওদাগরেরা বার্লিনে এই অটোর হাটে হাজির ছিল।

বার্লিনের মেলায় মের্সেডেস কোম্পানীর গড়া মোটরগাড়ী নাম করিল। ওস্তাদেরা বলিতেছেন,—"এরোপ্লেনের এঞ্জিনে যে ধরণের কারিগরি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, মের্সেডেস-মোটরে সেই ধরণের যন্ত্র-নৈপুণ্য লাগানো হইয়াছে।"

আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানীর গাড়ী শস্তা বটে। কিন্তু তাহাতে আরাম মিলে না। অধিকন্তু ফোর্ড গাড়ীগুলা বেশি দিন টিকেনা। বার্লিনের অটো-মেলায় যে সকল গাড়ী দেখা গেল, সেগুলা দামে যেমন শস্তা আবার তেমন আরামদায়ক এবং টেঁকসইও বটে। কাজেই এখন ফোর্ডে মের্সেডেসে টক্কর চলিবে।

ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময়ে ফোর্ড-গাড়ী খুব প্রচারিত হইয়াছে। এখন হইতে হয়ত জার্ম্মাণ অটোই ফোর্ডের বাজার দখল করিয়া বসিবে। শুনিতেছি ইতিমধ্যে ফোর্ড-কোম্পানী নিজেই জার্ম্মাণির ফ্যাক্টরি হইতে ভিন্ন ভিন্ন কল-কব্জা খরিদ করিয়া ভারতে চালান দিতেছে, আর সেই সকল একত্র করিয়া ফোর্ডগাড়ী নামে ভারতবাসীর নিকট বেচিতেছে। জার্ম্মাণ গাড়ীর দাম বেশী।

বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতসন্তান

এই ধরণের কাজ ভারতবাসীরা নিজেই চালাইতে পারে। ইহাতে অত্যধিক মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার দরকার [illegible]

না। ভারতের স্বদেশী পাকা মিস্ত্রির সাহায্যে (আর অল্পমাত্র মূলধনে) ভারতের শহরে শহরে অটো-ফ্যাক্টরি খাড়া করা সম্ভব। অন্ততঃ জার্ম্মাণ যন্ত্রজ্ঞদের ত এই মত। আমাদের চাই কেবল দশবিশ জন বিদেশী-কারখানার অভিজ্ঞতাওয়ালা কর্ম্মঠ ও উদ্যোগী ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার। ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলিতেছেন:—"মের্সেডেস, বেন্‌ৎস্‌ ইত্যাদি বড় বড় জার্ম্মাণ কোম্পানীরা আমাকে এজেন্সি দিতে চায়। অথচ দেশের কোনো লোক কারখানা খুলিতে রাজি কিনা এখনো জানি না।"

স্বদেশী আন্দোলন পাকা রকম চালাইবার জন্য অনেক লাইনেই ভারতসন্তানকে বিদেশী মাল খরিদ করিতে হইবে। ষোল আনা বিদেশী বয়কট করার প্রস্তাব বোধ হয় পাগল ছাড়া আর কাহারো মুখে কোথাও শুনা যায় না। ফ্যাক্টরির আসবাব, বিজ্ঞানশালার যন্ত্রপাতি, টেক্‌নিক্যাল বিদ্যাপীঠের কলযন্ত্র,—ইত্যাদি ধরণের জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানি না করিলে ভারতবর্ষের এক পা-ও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

কাজেই এই বিদেশী-আমদানিঁ ব্যবসায়ের অনেক হিস্যা ভারত-সন্তানের কব্জায় আনাটাও স্বদেশী আন্দোলনেরই এক মস্ত কাজ। যে-সকল ভারতীয় মহাজন ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য ইংরেজের এবং অন্যান্য বিদেশীর হাত হইতে স্বদেশীয় লোকের হাতে আনিতে সাহায্য করিবেন, তাঁহারা খাঁটি স্বদেশসেবক ত বটেই। ভারতীয় স্বরাজেরও তাঁহারা পাকা খুঁটী।

জার্ম্মাণ কারখানায় কাজের ভিড়

একজন মার্কিণ বন্ধু সস্ত্রীক জার্ম্মাণির উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম ঘুরিয়া

কারখানায় আর রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে মজুর খাটিতেছে চৌপর দিনরাত। যুদ্ধের সময়ে এখানে যত কাজ হইত, যুদ্ধের পরও ঠিক সেই পরিমাণ কাজই চলিতেছে।"

শুনিলাম, কোনো কোনো ফ্যাক্টরিতে দিনে (চব্বিশ ঘণ্টায়) তিনবার করিয়া লোক বদল হইয়া থাকে। এত মাল বিক্রি হইতেছে কোথায়? বিদেশে।

বহির্ব্বাণিজ্য লইয়া ইংরেজের সঙ্গে জার্ম্মাণদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আড়াআড়ি শীঘ্রই আবার দেখা দিবে। জার্ম্মাণ কাগজগুলায় ইতিমধ্যে তাহার আওয়াজ পাইয়াছি। ইংরেজের বাজারে বাজারে—যথা ভারতবর্ষে—জার্ম্মাণ মালের কাট্‌তি খুব প্রবল।

সেদিন অটোর হাটে দেখিলাম ক্রুপ কোম্পানীর গাড়ী। দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বন্ধু বলিলেন—"লাইপ্‌ৎসিগের মেস্‌সতেও ক্রুপ কোং প্রেক্, কল-কব্জার দোকান পাঠাইয়াছিল।" ক্রুপ 'আজ আদার ব্যাপারী'?

লড়াইয়ের সময় যে-সকল ফ্যাক্টরিতে অস্ত্রশস্ত্র; গোলাবারুদ, কামান, বিষাক্ত গ্যাস এবং অন্যবিধ রাসায়নিক মাল তৈয়ারি হইতেছিল, আজকাল ভার্সাই-সন্ধি হজম করিবার ফন্দে সেই সকল ফ্যাক্টরিতে জার্ম্মাণ ওস্তাদ ও মজুরেরা তৈয়ারি করিতেছে আটপৌরে শান্তিময় জীবনের শিল্পদ্রব্য। যে কারখানায় শান্তির রসদ জোগাইতে হইবে, সেই কারখানায়ই লড়াইয়ের সরঞ্জামও প্রস্তুত করা চলে।

চাই লোহার কারখানা

পশ্চিম-জার্ম্মাণির রাইন প্রদেশের এস্‌সেন শহর প্যারিস হইতে আসিবার সময় পথে পড়িয়াছিল। লড়াইয়ের সময় এই শহরের নামে

তোপখানা এই শহরে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আজ ক্রুপের কারখানাগুলায় গড়া হইতেছে ব্রেক্, ইস্পাত, ইস্ক্রুপ্, লেদ্, ক্রেন্, সিঁড়ি, গাড়ী অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক জীবন যাপনের কল-কব্জা লোহালক্কড়। অবশ্য লড়াইয়ের পূর্ব্বে ক্রুপ্ শান্তির মালই তৈয়ারি করিত বেশী।

লড়াইয়ের যন্ত্র-গৃহগুলাকে শান্তির কারখানায় পরিণত করিতে ক্রুপকে ছয় মাসের বেশী খাটিতে হয় নাই। ভাবার্থ ঃ—যে জাতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, সে জাতি সহজেই শান্তির কাজেও লাগিয়া যাইতে পারে।

শান্তির যন্ত্রকর্ম্মে আর লড়াইয়ের যন্ত্রকর্ম্মে বিশেষ কোনো তফাৎ নাই। লড়াই আর শান্তি,—জীবনের এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র। লোহালক্কড়ের যে কোনো কারখানাকে অতি অল্প সময়ের ভিতরেই জীবনের যে-কোনো মতলবে ব্যবহার করা সম্ভব।

১৯১৬।১৯১৭ সালে আমেরিকায় মজুত ছিল কেবল শান্তির জীবনের কলকারখানা। লড়াই কাহাকে বলে ইয়াঙ্কি জাতি এক প্রকার জানিতই না বলিলে চলে। অথচ মাত্র ছয় মাসের মেহনতে মার্কিনেরা তাহাদের শিল্প ঘরগুলার রং বদলাইয়া দিয়াছিল। যেখানে মামুলি দোকানদারীর মাল তৈয়ারি হইত, সেখানে দেখিয়াছিলাম একমাত্র লড়াইয়েরই ফ্যাক্টরি। অর্থাৎ যে জাতি শান্তির জন্য সর্ব্বদা সজাগ কাজ করিতেছে, সে জাতি সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্যও তৈয়ারি রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

জগৎটা সর্ব্বত্র স্বাভাবিক নিয়মেই চলিতেছে,—বুজরুকি, রহস্য 'মিষ্ট্রি' কোথাও নাই। যে লোহায় ছুরি, কাঁচি, বঁটি, কোদাল, খন্তা তৈয়ারী হয়, সেই লোহায়ই বোমা, বারুদ, কামান, গোলারও পূজা

শার্লোটেনবুর্গের বাগবাগিচায়

পলাশের মাথায় আগুন দেখিতেছি না বটে, কিন্তু পার্কের পার্কের ফুলবাগানে লাল জিরানিয়ামগুলা ময়দান জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। নানাবর্ণের কার্ণেশনও বার্লিনের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। এই ফুলগুলা জার্ম্মাণির বিশেষত্ব নয়। ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্রই এই সব চোখে পড়ে। নাম এক এক দেশে এক এক প্রকার। আমাদের গাঁদাকে জার্ম্মাণে বলে ষ্টুডেণ্টেন-ব্লুমেন বা 'ছাত্র-ফুল'।

প্রায় প্রত্যেক বড় রাস্তায়ই প্যারিসের মত বার্লিনেও ফুলের দোকান দেখিতেছি। ফুলের তোড়া তৈয়ারি করাটা জাপানী 'ইকেবানা' গড়ার মতন পশ্চিমেও একটা শিল্প-বিশেষ।

বার্লিনের আশে পাশে মোটের উপর সবুজ পাইন তরুরই আওতা। শার্লোটেনবুর্গ পাড়ার বাহিরেই পাইন বন। লিণ্ডেন আর মেপ্‌ল্ গাছ শহরের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায়। মেপ্‌ল্ গাছের পাতাগুলা লাল হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। বাড়ীওয়ালী একদিন এক প্রকাণ্ড পাতার তোড়া আনিয়া টেবিলের উপর বসাইয়া দিল। বারান্দার আইভি লতা আর টোমেটো চারাটা শুকাইয়া আসিতেছে। চারিদিকে জীবন-লীলার অবসান চিহ্ন নজরে পাইতেছি। পাইন অবশ্য চিরসবুজ।

মাস ছয় সাতেক বার্লিনে কাটাইয়া মেঘনাদ সাহা দেশে ফিরিতেছেন। এখানকার অধ্যাপক ন্যর্ণষ্ট্ নিজ ল্যাবরেটরিতে কাজ করিবার জন্য মেঘনাদকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ন্যর্ণষ্ট্ এই বৎসরের বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট। ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রী বিজ্ঞানে ন্যর্ণষ্ট্ জগতে এক অদ্বিতীয় শ্রেণীর লোক।

মেঘনাদ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদির কাজে আইনষ্টাইনের মতন

আমাদের দেশের 'ছোকরারা' পদার্থবিজ্ঞানে, রসায়নে আর উদ্ভিদ্ বিদ্যায় আজকাল পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া যে-সকল গবেষণা চালাইতেছে, সেগুলা বর্ত্তমান জগতের বিজ্ঞান মহলে নং ১ শ্রেণীর অন্তর্গত। কথাটা বোধ হয় এখনো আমাদের বেশী লোকের মাথায় বসে নাই।

মেঘনাদ ম্যিন্‌খেন ও বার্লিনের 'ফিজিকালিশে কলোকোয়াম" অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার সংসদে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। বক্তৃতা জার্ম্মাণভাষায় লেখা,—প্রবন্ধাকারে জার্ম্মাণির ৎসাইটশ্রিফ্‌টফ্যির ফিজিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। বার্লিন, য়েনা, লাইপ্‌ৎসিগ ইত্যাদি নগরে বড় বড় ইলেক্‌ট্রিক, কাচ ও অন্যান্য ফ্যাক্টরি দেখিবার সুযোগ মেঘনাদের জুটিয়াছিল।

জার্ম্মাণভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে এমন ভারতসন্তান কয়েকজন জার্ম্মাণিতে বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রায় আট দশ বৎসর ধরিয়া এদেশে আছেন। কয়েক দিন হইল লাইপ্‌ৎসিগ শহরে জার্ম্মাণ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভায় পাঞ্জাবী সংস্কৃতজ্ঞ তারাচাঁদ রায় জার্ম্মাণে এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

ইহুদি ও অন্যান্য 'ইতর' শ্রেণী

সেদিন পুরাণা পররাষ্ট্রনীতি-বিভাগের এক উচ্চ কর্ম্মচারী বলিতেছিলেন ;—"মহাশয় বার্লিনের কোনো দিকেই কোনো উঁচু মহলেই আর ভদ্রলোকের দেখা পাইবেন না। ইহুদিগুলা গোটা জার্ম্মাণ সমাজের উপর একতিয়ার কায়েম করিয়া বসিয়াছে।" ইহুদিরা এই জার্ম্মাণের চিন্তায় 'ভদ্রলোক' নয়। সংবাদ-পত্রের পরিচালনায়, ব্যাঙ্কের কাজে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আর বর্ত্তমান রিপাব্লিকের শাসন-বিভাগে সর্ব্বত্রই ইহুদির গন্ধ। কাজেই এই 'ইতর'দের পাল্লায় পড়িয়া

মহাশয় দুঃখের সহিত বলিলেন :—"কি বলিব মহাশয়? ইহুদিদের মাথা আছে। ইহারা যা ধরে তাতেই দক্ষতার পরিচয় দেয়।"

এক বড় ঘরের জার্ম্মাণ মহিলা বলিলেন ;—"আমরা, অন্ততঃ প্রুশিয়ার লোকেরা রিপাব্লিক-শাসনের উপর অনেক কারণেই নারাজ। আমরা বিশেষভাবে বর্ত্তমান বিধানের শিক্ষানীতির উপর চটা।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—"কাইজারের আমলের পর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কি?" মহিলা জবাব দিলেন—"একি মাত্র পরিবর্ত্তন? খাঁটি বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণির উঁচু নীচু জাতগুলাকে রিপাব্লিক একাকার করিতে ব্রতী হইয়াছে। এই ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে অসহ্য। জার্ম্মাণ সমাজে যদি বেশী দিন থাকেন তাহা হইলে আপনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের 'ছোট' লোকে আর 'ভদ্র' লোকে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমরা এই প্রভেদ ভাঙ্গিয়া দিতে রাজি নই। কিন্তু আজকাল গণতন্ত্রের নিয়মে ঝি-চাকর-মজুর-চাষীদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের মতন উচ্চশ্রেণীর সন্তান-সন্ততির একত্র লেখাপড়া চলিতেছে। এই ধরণের সামাজিক ডেমক্রেসি বা সাম্য জার্ম্মাণির হাড়ে সহিবে না।"

কোনো ক্লাবে 'ফিঁযফ্ উর টে' বা 'পাঁচ ঘটিকার চা' ইচ্ছা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন উচ্চশিক্ষিতা 'বুর্জোআ' মহিলা তাঁহার কার্ড দিবার সময় বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন :—"এই যে আমার নামের আগে 'ফোন্' শব্দটা দেখিতেছেন, এটা অ্যারিষ্টক্রেসি বা আভিজাত্যের উপাধি।"

বাদ্যযন্ত্রের দোকান

বাদ্যযন্ত্রের দোকান বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় যত দেখিতেছি লণ্ডন আর নিউ ইয়র্কে তত দেখি নাই, এমন কি প্যারিসেও তত নজরে

পড়ে নাই। বাস্তবিক পক্ষে, ইয়োরামেরিকার অন্যান্য শহরে বাদ্য-যন্ত্রের দোকান আদৌ দেখিয়াছি কিনা মনে পড়িতেছে না। এই দোকান বার্লিনের এক বিশেষত্ব।

ম্যাণ্ডোলিন, লাওটে, বেহালা, চেলো, গিতার, হার্প, ব্যাঞ্জো, ৎসিথার ইত্যাদি তারের যন্ত্রই প্রধান ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেহালা ছাড়া এই যন্ত্রগুলার কোন্ কোন্টা আমাদের দেশে কোন্ কোন্ নামে প্রচলিত জানি না। এইগুলার কোনোটাই ভারতে স্বাধীন-ভাবে আবিষ্কৃত হয় নাই। বেহালাকে সাধারণতঃ বোধ হয় স্বদেশী বলিয়া ধরা হয়। বস্তুতঃ, এই যন্ত্র ভারতে পর্ত্তুগীজদের আমদানি।

বার্লিনের বিস্তার ও সড়ক-সৌন্দর্য্য

প্যারিস দেখিয়া চোখ কানা হইয়া গিয়াছে! বার্লিনের বাড়ীঘর নেহাৎ সাদাসিধা বোধ হইতেছে। সৌধগৌরব, নগর-সৌন্দর্য্য বা স্থাপত্য-সম্পদ্ ইত্যাদি শব্দ বার্লিনে প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ। এখানকার বড় বড় সড়কগুলা খট্‌খটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই যা। লোকেরা আবাসগুলায় সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতেছে,—এই ধারণাটাও বার্লিনের যে কোনো পাড়ায়ই দর্শকমাত্রের মনে জন্মিবে।

প্যারিসে শহরের কেন্দ্র হইতে যতই দেওয়ালের দিকে যাইতে থাকি ততই যেন দারিদ্র্য ও নোংরামির রাজত্ব চোখে পড়ে। বার্লিনে দেখিতেছি উল্‌টা। যতই কেন্দ্র ছাড়াইয়া বাহিরের দিকে যাই ততই সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদির আওতা যেন বাড়িয়া যায়। অন্ততঃ, পশ্চিম অঞ্চলটায় এই কথাই বারবার মনে পড়িতেছে।

বোধ হয়, বিশত্রিশ বৎসর ধরিয়া বার্লিন শহরের সীমানা বাড়াইবার জন্য নগরশাসকদের মাথা ঘামাইতে হইবে না। বড় বড় পালিশ করা পাকা রাস্তা শহরের নয়া নয়া অংশে গড়া রহিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায়

গাছ পোঁতা ত হইয়াছেই, আলো পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে। এই সকল রাস্তায় বাড়ীঘর এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। নয়া বস্তিগুলার কোনো কোনো রাস্তার কিনারায় দু'একটা বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে মাত্র। এই 'বৃহত্তর বার্লিনে'র সকল সড়কে ঘর তুলিতে এক পুরুষের অধিক সময় লাগিবে বোধ হয়। তবে জার্ম্মাণরা চলে দ্রুত।

শরৎকালেও পাইন বনে বেড়াইতে বেড়াইতে 'সরল' নির্য্যাসের সুগন্ধ পাইতেছি। বুড়া গাছগুলার দীর্ঘ আকৃতি, আর জোআন চারাগুলার নিবিড় সবুজ বর্ণ উপভোগ করিতেছি। জার্ম্মাণ ছোকরারা এই আবেষ্টনে কুস্তী, মল্লযুদ্ধ, টেনিস, দৌড় ইত্যাদির অনুশীলন করিয়া থাকে। 'অনুশীলন-সমিতি'কে জার্ম্মাণে বলে 'টুর্ণ-ফারাইন'। পাইন বনের ভিতরে দু' একটা গ্রীষ্মপাঠশালাও আছে। বাড়ীওয়ালীর ছেলে এইরূপ এক ইস্কুলে যাইত।

বার্লিনের সব কয়টা রাস্তাকেই 'উণ্টার ডেন লিণ্ডেন' বা 'নেবুতলা' বলিতে পারি। প্রায় প্রত্যেক রাস্তায়ই লিণ্ডেন গাছের সারি। অনেকটা-গোলাকার ছোট ছোট পাতাগুলা আজকাল হল্‌দে বা খানিকটা গিনি সোনার রং ধরিয়াছে। লিণ্ডেন তরু বেশী উঁচু নয়। মোটের উপর, অক্টোবর মাসে বার্লিনের সড়ক-সৌন্দর্য্য যার-পরনাই চিত্তাকর্ষক।

অবিবাহিতা নারীর আর্থিক সমস্যা

লড়াইয়ের ধাক্কায় জার্ম্মাণিতে আর-একটা সমাজ-সংস্কার সাধিত হইতে চলিল ভাবিতেছি। ক্যেল্‌ন্ নগরে 'জার্ম্মাণ স্ত্রী-মহামণ্ডলে'র বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। সভায় ফ্রয়লাইন অর্থাৎ কুমারী 'ডক্টর' ব্যয়মার জার্ম্মাণির নারী-সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। যুদ্ধে অনেক পুরুষ মারা গিয়াছে। অধিকন্তু জার্ম্মাণি...

পুরুষ স্বদেশ ছাড়িয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবাসী হইতেছে। ফলতঃ, আজ জার্ম্মাণিতে পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশী। কাজেই অনেক জার্ম্মাণ নারী চিরজীবন অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য।

ব্যয়মার বলিতেছেন:—"অবিবাহিত স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন-ভাবে অন্নসংস্থানের উপায় শিখাইবার জন্য বিশেষ আয়োজন করা দরকার। এই নিমিত্ত বহুসংখ্যক শিল্প ও ব্যবসার পাঠশালা গড়িয়া তোলা আবশ্যক। অথচ এইসকল বিদ্যাপীঠ গড়িয়া তুলিতে যত টাকা দরকার তত টাকা জার্ম্মাণদের নাই। কাজেই এখন হইতে পুরুষের পাঠশালায়ই স্ত্রীলোকদের জন্যও ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ এক সঙ্গে একই পাঠশালায় একই প্রকার বিদ্যালাভ করিতে থাকিবে।" ব্যয়মার রাইখ্‌ষ্টাগের (জার্ম্মাণ পার্ল্যামেণ্টের) মেম্বর।

এই ধরণের ইস্কুল কায়েম করিবার প্রস্তাব জার্ম্মাণ সমাজে নূতন। অর্থাৎ যুগযুগান্তর ধরিয়া পশ্চিম দেশেও ভারতের 'প্রাচ্য' স্ত্রীপুরুষ-ভেদই মানিয়া চলা হইতেছে। সমাজে নারীজাতির মর্য্যাদা লইয়া পূর্ব্বে পশ্চিমে কোনো আদর্শ-গত পার্থক্য ছিল না।

আমেরিকা এই হিসাবে ইয়োরোপ হইতে পৃথক্—অন্ততঃ পক্ষে ইয়োরোপের আগে আগে চলিতে সুরু করিয়াছে। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া ইয়াঙ্কি মুল্লুকের কোনো কোনো নগরে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য সমবেত বিদ্যাপীঠ বর্ত্তমান আছে। এইসকল প্রতিষ্ঠানকে মার্কিন বুলিতে 'কো-এডুকেশন্যাল' বলা হইয়া থাকে।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে,—শেষ পর্য্যন্ত পয়সার অভাবে (আদর্শের প্রেরণায় নয়) জার্ম্মাণরা একটা নূতন দিকে সমাজটা 'শুধরাইতে' উদ্যোগী হইল। দুনিয়ার অনেক সংস্কারই এই ধরণে 'পেটের দায়ে' [illegible] হইয়াছে। কঠিন পারিভাষিকে 'পেটের

'ইতিহাসের বৈষয়িক ব্যাখ্যা'কে সোজা বাংলায় বলিব :—'সভ্যতার মূলে খাওয়া-পরা।' জবরদস্তি ভাষায় ইহার নাম :—"গুতোঁর চোটে বাবা বলায়।"

মেয়েদের ভয়

চীনে দেখিয়া আসিয়াছি, রাত্রিকালে কোনো চীনা-বন্ধুর বাড়ীতে যাইয়া দেখা করা এক প্রকার অসাধ্য। ধাক্কাধাক্কি করিয়া কপাট থাব্‌ড়াইয়া থাব্‌ড়াইয়া হাত ভোঁতা করিয়া ফেলিলেও গৃহস্থ দুয়ার খুলিয়া দেয় না। নৈশ অন্ধকারে আগন্তুক মাত্র সম্বন্ধেই চীনাদের ভয় এত বেশী।

প্যারিসে দুয়ার খোলানো এত কঠিন নয়, তবে কিছু বেগ পাইতে হয়। নিউ ইয়র্ক শিকাগোতে এ উৎপাত এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কিন্তু বার্লিনে পাইতেছি ঠিক যেন চীনা উৎপাত! রাত্রে লোকের সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া ত ঝকমারি বটেই। কোনো লোক যদি রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায় সে আরও গণ্ডগোলের কথা।

রাত্রি ৮ টার সময় ঘরে ঘরে কপাট বন্ধ হইয়া যায়। তারপর যদি নিজের হাতে চাবী না থাকে কার সাধ্য কোনো বাড়ীতে ঢুকে? শার্লোটেনবুর্গ পাড়ায় দেখিতেছি রাত্রি নয়টার পূর্ব্বেই সকল জানালায় আলো নিভিয়া যায়, অর্থাৎ নরনারী ঘুমাইতে প্রস্তুত। কাজেই, যদি কোনো বন্ধু রাত্রে ৮টার পর তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার জন্য বাড়ীর বাহিরে আসিয়া রাস্তায় পায়চারি করিতে হইবে। যদি কেহ খবর না দিয়া আসে অথবা যদি খবর না দিয়া কোথাও যাও তাহা হইলে হাঁটাই সার।

এই অবস্থা অনেকটা লড়াইয়ের এক কুফল মনে হইতেছে। তবে ইহার ভিতর খানিকটা সনাতন

আগন্তুকের সম্মুখে সহজে স্বাধীনভাবে বাহির হইয়া আসিতে ইতস্ততঃ করাটা 'চীনা' বা প্রাচ্য দস্তুর নয়। এমন কি নিউ ইয়র্কেও এইরূপ দেখিয়াছি। দিনে দুপুর বেলায় যখন স্বামী মহাশয়রা আফিস করেন তখন তাঁহাদের পত্নীরা সাধারণতঃ একলাই নিজ নিজ 'অ্যাপার্টমেণ্ট' বা বসতকুঠুরি আগ্‌লাইয়া থাকেন। এই সময় যদি কোনো নিকট আত্মীয়ও অ্যাপার্টমেণ্টের দুয়ারে ধাক্কাধাক্কি করে তবে কোনো মতেই ইয়াঙ্কি রমণী দুয়ার খুলিয়া দেন না। দরজা খুলিবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ দুই দিকে বচসা চলে। গলার আওয়াজ নেহাৎ পরিচিত ঠাওরাইবার পর দুয়ার খুলিয়া দেওয়া হয়।

বার্লিনে দেখিতেছি প্রত্যেক দুয়ারের গায়ে ছোট এক খানা কাচ বসানো আছে। এই কাচের ভিতর দিয়া বাড়ীর লোক বাহিরের লোককে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলে তবে কেওয়াড়ি খুলিবার রেওআজ। সর্ব্বত্রই অবশ্য বলা বাহুল্য, রাত্রিকালে এই সতর্কতা শতগুণ বাড়িয়া যায়।

ভয়টা এশিয়ান আবহাওয়ারই একচেটিয়া বস্তু নয়। ইয়োরামেরিকার মেয়েরাও ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকে। ভারতীয় নারীরা যে-যে অবস্থায়, যে-যে সময়ে, ও যে-যে স্থানে ভয় পায়, ইয়োরামেরিকান নারীরাও ঠিক সেই সেই অবস্থায়, সেই সেই সময়ে ও সেই সেই স্থানে ভয় পায়। তবে ঊনিশ-বিশ করা সম্ভব।

গুণ্ডা, বাটপার, বদমায়েস বাংলা দেশেও যেমন বিলাতে, ফ্রান্সে, যুক্তরাষ্ট্রে, জার্ম্মাণিতেও তেমন। মেয়েদের ভয়ের কারণ দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এক। এই জন্যই সন্ধ্যার সময় এবং সন্ধ্যার পর পশ্চিম দেশের কোনো শহরে 'ভদ্র ঘরের' স্ত্রীলোকেরা একলা রাস্তায় বাহির হয় না। স্বামী ভাই অথবা বন্ধু পুরুষের সঙ্গ না লইয়া কোনো পাশ্চাত্য নারীই রাত্রিকালে বড় সড়কের উপর দিয়াও হাঁটিতে ইতস্ততঃ করিবে।

পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রভেদটা কোথায়? ঘাঘরা পরিয়া যাহারা চলা ফেরা করে, তাহারা স্বভাবতই সাহসী হয় আর যাহারা ঘোম্‌টা পরে তাহারা কাপুরুষ হইয়াই জন্মে—এই মত বিংশ শতাব্দীতে আর বাজারে চলিবে না। ঘোম্‌টার আড়াল হইতেও খাঁড়ার ঘা মারা সম্ভব, বিংশ শতাব্দীর সমাজ-বিজ্ঞান এই কথাই বলিবে।

সিলেশিয়ার ভাগাভাগি

সিলেশিয়ার এক টুক্‌রা পোল্যাণ্ড পাইবে, আর-এক টুক্‌রা জার্ম্মাণি পাইবে। এই রায় বাহির হইয়াছে স্থইট্‌সারল্যাণ্ডের জেনেভা হইতে। বিচারক ছিলেন লীগ অব নেশুন্‌স্ (বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎ)।

আল্‌সাস-লোরেণের কয়লা ও লোহার খনি ফ্রান্স দখল করিয়াছে। পূর্ব্ব অঞ্চলে সিলেশিয়া ছিল জার্ম্মাণির দ্বিতীয় আল্‌সাস ও লোরেণ। এখন এই ডানারও বড় এক ভাগ হাতছাড়া হইতে চলিল। কাজেই জার্ম্মাণরা আগাগোড়া বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদের রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন রুজু করিতেছে।

সিলেশিয়া-ভাগাভাগির প্রস্তাবে ওলন্দাজ জাতি বিশেষ চিন্তিত। রটার্ডামের 'কুর‍্যাণ্ট' কাগজ বলিতেছেন:—"যদি জেনেভার বিচার টিকিয়া যায়, তাহা হইলে জার্ম্মাণ রিপাব্লিকের বর্ত্তমান ক্যাবিনেট কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইবেন। এবার্ট-গবর্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী হ্বির্ট এতদিন জার্ম্মাণ জাতিকে ইংরেজ-প্রেমে মজাইয়া আসিতেছেন। বৃটিশ গবর্মেণ্টের প্রত্যেক কথায় সায় দেওয়াই জার্ম্মাণির পক্ষে মঙ্গল-কর, এই মতই তাঁহার রাষ্ট্র-নীতির মূলে রহিয়াছে। হ্বির্টের কথা মানিয়া লইয়া তাঁহার দলের লোকেরা ভাবিতেছিল যে, বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদের বিচারের বেলায় ইংরেজ গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণির স্বপক্ষে কথা বলিবেন এবং তাহা হইলে গোটা সিলেশিয়াই জার্ম্মাণির সঙ্গে থাকিয়া

যাইবে।" কিন্তু বিচারের ফল হইল উল্টা। কাজেই এখন হির্ট-ক্যাবিনেট টলমল করিতেছে।

রুশ সম্বন্ধে ইতালিয়ান ও জার্ম্মাণ ঐক্য

রুশিয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের আওতা হইতে রুশ নরনারীকে বাঁচাইবার জন্য ইয়োরামেরিকার বড় বড় দেশের লোকেরা একটা সাহায্য-সমিতি গঠন করিয়াছেন। সেদিন বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স্ নগরে এই সমিতির এক বৈঠক বসিয়াছিল। হল্যাণ্ডের কোনো কোনো কাগজে এই বৈঠকের সলা সম্বন্ধে টিপ্পনী বাহির হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স নাকি দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার পূর্ব্বে সোভিয়েট গবর্মেণ্টের নিকট কতকগুলা কড়া শর্ত্ত দাবী করিতে চাহেন। প্রধান কথা এই যে,—১৯১৪ সালের পূর্ব্বে রুশিয়া, বৃটিশ ও ফরাসী জাতিদ্বয়ের নিকট যত টাকা ধার লইয়াছিল, সেই সব টাকা সে সুদে আসলে ফিরাইয়া দিতে রাজি না হইলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আর রুশিয়াকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নন।

১৯১৭ সালে সোভিয়েট-রিপাব্লিক কায়েম করিবার সময় বোলশেভিকীরা পুরাণা জারের আমলের সকল দেনা তামাদি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। সোভিয়েট রুশিয়া পুরাণা কর্জ্জ শোধ করিতে অনিচ্ছুক। এই জন্যই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এই কয়বৎসর ধরিয়া বোলশেভিকীদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত রহিয়াছেন।

আজ অন্নাভাবে এবং ব্যাধির তাড়নায় সোভিয়েট-রুশ নেহাৎ কাবু,—এই বুঝিয়া ইংরেজ ও ফরাসীরা তাহাকে তাহার পুরাণা দেনা স্বীকার

ইতালীর প্রতিনিধি ক্রুসেল্‌সের বৈঠকে বলিয়াছেন :—"দুর্ভিক্ষে সাহায্য করাটা লোকহিতসাধনের অঙ্গ। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক গণ্ডগোলযুক্ত প্রশ্নগুলা উঠানো উচিত নয়। অনাথ বালকবালিকা এবং মৃতপ্রায় নরনারীকে অন্নদান, বস্ত্রদান ও ঔষধদান করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক কথা লইয়া জটলা বাড়ানো নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।" রুশিয়া ইতালীর টাকা ধারে না কিনা ?

ক্রুসেল্‌সের জার্ম্মাণ প্রতিনিধিও ইতালিয়ানের মতেই সায় দিয়াছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইতালী ও জার্ম্মাণি এক পথের পথিক দেখিতেছি।

আমেরিকা প্রথম হইতেই রুশিয়ার সাহায্য সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মতের বিপক্ষে। হল্যাণ্ডের 'টেলিগ্রাফ' বলিতেছেন :—"এই ধরণের বাক্‌বিতণ্ডায় বেচারা রুশ জাতি যারপর নাই কষ্ট পাইতে থাকিবে।" ইংল্যাণ্ডেই অনেকে ইংরেজ, বৃটিশ ও ফরাসী সরকারী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে।

সিলেশিয়া-কাণ্ডে ইতালীর মত

পোল্যাণ্ডের উপর ইতালিয়ানরা যারপর নাই চটা। সিলেশিয়ার কোনো কোনো অংশ পোল্যাণ্ডের হিস্যায় পড়িবে, এই খবর পাইয়া ইতালীয় কাগজগুলা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্সের বিপক্ষে গাওয়া ইতালিয়ানদের এক মহা স্বধর্ম্মে দাঁড়াইতেছে !

রোমের 'পপল রমাণ' বলিতেছেন :—"জেনেভার বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎ ভার্সাই-সন্ধির কড়ারগুলাই হুবহু নকল করিয়াছেন। জার্ম্মাণি তাঁহাদের সিলেশিয়া-সংক্রান্ত বিচার কোনো মতেই মানিবে না। ফরাসীরা জার্ম্মাণিতে আর পোল্যাণ্ডে শত্রুতা জ্বালাইয়া তুলিতে সচেষ্ট। কিন্তু জার্ম্মাণির শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিকের সাহায্য

ছাড়া পোলিশ জাতি একদিনও বাঁচিতে পারিবে কি? বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তারা জার্ম্মাণিকে কুপোকষা করিয়া মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু জার্ম্মাণ জাতিকে গলা টিপিয়া মারা সহজ নয়,—জার্ম্মাণির ফুস্‌ফুস্ লোহায় তৈয়ারি।"

'পপল রমাণ'র মতে 'লীগ অব নেশ্তন্‌স্' এইবার খাটে উঠিলেন। শীঘ্রই ইহার গঙ্গাযাত্রার সময় উপস্থিত হইবে। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন:—"বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎটাকে পৃথিবীর কোনো বিচক্ষণ লোকই সুনজরে দেখে নাই। নেহাৎ ছেলেছোকরারা বা কাঁচা লোকেরা হয়ত এই পরিষদের উপর কিছু কিছু বিশ্বাস রাখিত। কিন্তু সিলেশিয়া-কাণ্ডের পর কেহই আর ইহাদের নাম মুখে আনিবে না।' এই ধরণের অন্যায়পূর্ণ শালিশীর ফলে পরিষদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিল।'

ইতালিয়ান্ গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে যে ব্যক্তি জেনেভার পরিষদে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অবশ্য বিচারের তারিফই করিয়াছেন; যথা,—"বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎ সুবিচারই করিয়াছেন। জার্ম্মাণি বা পোল্যাণ্ড এই দুয়ের কোনো দিকেই এক চুল টানিয়া পক্ষপাত করা হয় নাই।" এই 'সরকারী' ইতালীয় মতের প্রতিবাদ করিয়া রোমের 'পায়েজে' বলিতেছেন:—"ইহার নাম যদি সুবিচার ও পক্ষপাতহীনতা হয়, তাহা হইলে এই দুই বস্তু কাহাকে বলে, তাহা আমাদের সরকারী প্রতিনিধি মহাশয় কখনো শিখিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই!"

'পায়েজে'র সংবাদদাতা ঘোরতর পোল্যাণ্ড-বিরোধী। জেনেভা হইতে তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:—"সিলেশিয়া ইয়োরোপের এক অতি সুগঠিত শিল্পপ্রধান জনপদ। এই অঞ্চল ছাড়িয়া দেওয়া হইল কাহার হাতে? জগতের সব চেয়ে ওঁচা, নিষ্কর্ম্মা, মূর্খু ও দেউলিয়া

পুষিতে পারিবে কি? এই ঐশ্বর্য্যের খনি পোলিশ জাতির হাতে বেয়াকুবের মতন গছাইয়া দিয়া বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষৎ জার্ম্মাণির সম্পদবৃদ্ধির পথ ত মারিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের সর্ব্বনাশ করিলেন! ধর্ম্ম ও ন্যায় পদদলিত করিয়া জেনেভার বিচারক মহাশয়রা জগতে আনিলেন কি বস্তু? জার্ম্মাণির দারিদ্র্য। ইহার কুফল শীঘ্রই গোটা মানব-জাতিকে ভুগিতে হইবে! লড়াইয়ের ক্ষতি পূরণের জন্য টাকা জার্ম্মাণির আসিবে কোথা হইতে? জার্ম্মাণির নিকট মিত্ররাষ্ট্ররা অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সোনার মার্ক্ দাবী করিতে ছাড়িতেছেন না,—অথচ আবার তাঁহারা জার্ম্মাণ জাতিকে ধনে প্রাণে মারিতেও কসুর করিলেন না।"

বীরপূজার রেওয়াজ

ফরাসীরা বীরপূজা বেশী করে কি জার্ম্মাণরা বীরপূজা বেশী করে হিসাব করিয়া উঠা মুস্কিল। প্যারিসে দেখিয়া আসিয়াছি আজ অমুক বৈজ্ঞানিকের মৃত্যুর শতবৎসর, কাল অমুক স্বদেশসেবকের জন্মতিথি। এই ধরণের তিথি আর উৎসব ইয়াঙ্কি সমাজে বড় বেশী চোখে পড়ে নাই। মার্কিন নরনারী প্রধানতঃ বর্ত্তমাননিষ্ঠ ও ভবিষ্যৎপন্থী। ইহারা অতীতের তোআক্কা এক প্রকার রাখেই না বলা চলে। কিন্তু জার্ম্মাণরা ফরাসীদেরই মাসতুত ভাই। "অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী"র দৌড় এই দুই সমাজে খুবই লম্বা।

ফিরখোভ্ ছিলেন আয়ুর্ব্বেদের বীর। চিকিৎসাশাস্ত্রের উনবিংশ শতাব্দীকে জার্ম্মাণরা 'ফিরখোভের যুগ' বলিয়া থাকে। অর্থাৎ ফিরখোভ্ জার্ম্মাণির প্যাস্ত্যয়র। ইঁহার জন্মতিথির শতবার্ষিক উৎসব লইয়া নানা প্রতিষ্ঠানে নানা প্রকার সভা হইল। নগরের স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি কার্য্যাবলীতেও ফিরখোভ্ বার্লিনের জনসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। অ্যান্থ্রপলজি বা নৃ-তত্ত্ববিদ্যার প্রতিনিধিরাও ইঁহাকে

বলিয়া মানিয়া থাকেন। 'টাগেব্লাট' ইত্যাদি বড় বড় কাগজে ফিরখোভের কৃতিত্ব লইয়া বিশেষজ্ঞদের আলোচনা বাহির হইয়াছে। 'ফোল্কারকুণ্ডে' বা নৃ-তত্ত্বের মিউজিয়ামে ফোন্ লুশান এবং গুথ্হার্ট বক্তৃতা করিলেন। বুঝিলাম না এক রত্তি। জার্ম্মাণ 'বক্তৃতা' বুঝিতে এখনো অনেক দেরি। মাত্র কয়েক সপ্তাহের দৌড় কতই বা হইবে?

হার্টম্যান ছিলেন অষ্ট্রীয়ার এক কবি। ১৮৪৮ সালের ইয়োরোপীয় বিপ্লবের যুগে ইনি জার্ম্মাণ সমাজে নয়া আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অষ্ট্রীয়ায় রিপাব্লিক বা গণতন্ত্র স্থাপনের প্রচেষ্টায় ইনি সাহায্য করিতেন। কাজেই কপালে জুটিয়াছিল নির্ব্বাসন। তবে ঘটনাচক্রে সে দিন ১৯১৮ সালে এই ভাবুক আদর্শপ্রচারক কবিবরের পুত্র অষ্ট্রীয়ান রিপাব্লিকের প্রথম সরকারী প্রতিনিধিরূপে ইয়োরোপের আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রমণ্ডলে হাজির হইতে পারিয়াছেন। দেখা যাইতেছে—এমন কি কবিদের আকাঙ্ক্ষাও এক পুরুষেই কার্য্যে পরিণত হয়। হার্ট-মানের কবিতা আলোচনা করিয়া আজ জার্ম্মাণ সমাজের নরনারীরা আনন্দিত হইতেছে।

'ড্যয়চে ৎসাইটুং' কাগজে ক্লাইষ্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সরস প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ক্লাইষ্ট ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যুবক জার্ম্মাণির অন্যতম শিলার। অর্থাৎ ক্লাইষ্ট কবিতা ও নাটক রচনা করিয়া দেশের লোক মাতাইতেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ১৮১০ সালে। তখন জর্ম্মাণ সমাজে রোমাণ্টিক আন্দোলনের জোআর ছুটিতেছে। গ্যেটে সেই সময়ে প্রায় বুড়া মারিতেছেন এবং ভাবুকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন।

ক্লাইষ্টের সাহিত্য আলোচনা করিয়া লেখক বলিতেছেন:—

"যুবক জার্ম্মাণি, আবার তোরা মানুষ হ। ক্লাইষ্টের সাধনায় প্রাণ

ক্রাইষ্টের স্বদেশানুরাগ আবশ্যক।" ক্রাইষ্টের এক বয়েৎ নিম্নরূপ:— "যে লোকটা পেট ভরিয়া কোনো লোককে হিংসা করিতে পারে না সে কোনো লোককে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেও অসমর্থ।" অর্থাৎ "শত্রুধ্বংসের কথা দিনরাত জপিতে থাক,—জার্মাণ জাত শীঘ্রই আবার জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে।"

নয়া জার্ম্মাণির গোড়াপত্তন

এক আড্ডায় জার্ম্মাণরা বলাবলি করিতেছে:—"আমরা মারা গেলাম মাত্র এক কারণে,—রাষ্ট্রনীতি না জানার ফলে। জার্ম্মাণ জাত কারখানা চালাইতে মজবুদ। আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যেও কোনো জাতের পেছনে নই। আমাদের জননায়কেরা যদি রাষ্ট্রনীতিতে পাকা ওস্তাদ হইতেন, তাহা হইলে এই যুদ্ধে হারিতাম না।"

এক নারী বলিতেছেন:—"কি বেয়াকুবি? এখনো বিদেশের লোকেরা জার্ম্মাণিতে লেখাপড়া শিখিবার জন্য আসিতে চায়? আমাদের যদি কিছু শিখাইবার থাকিবে, তাহা হইলে লড়াইয়ে হারিলাম কেন? আমরা লড়াইয়ে হারিয়াছি,—ইহার দ্বারাই বুঝিতে হইবে আমাদের স্কুল-কলেজগুলা 'হাতুড়ে' গড়িবার কারখানা আর আমাদের মাষ্টারগুলা পণ্ডিতমূর্খ।"

যুবক জার্ম্মাণিকে রাষ্ট্রনীতি শিখাইবার জন্য নানা আয়োজন চলিতেছে। একটা আয়োজনের মাথায় দেখিলাম শিলারের এক নাতি,—মেয়ের তরফ হইতে। নাম ফোন গ্লাইখেন। শিলারের বাস্তুভিটা ফোন গ্লাইখেনের তাঁবে পরিচালিত হইতেছে।

'পোলিটিশার কোল্লেগ' বা 'রাষ্ট্রনৈতিক সমিতি' নামক একটা

তাতাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বাথানে এক সঙ্গে অনেক লেখক, সম্পাদক, শিল্পী ও খবরের কাগজের সংবাদদাতার সঙ্গে আলাপ হইল। এই কোল্লেগের পাঁচ-ছয় বিভাগে বর্ত্তমান জগতের সকল প্রকার সমস্যাই আলোচিত হয়।

ফোন গ্রাইখেন আর একটা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। সেইটাতে বিশেষভাবে সাহিত্যসেবী ও শিল্পীর আনাগোনা। নাম 'বুণ্ড ড্যয়চার গেলের্টার উণ্ড্ কিন্‌ষ্ট্‌লার' অর্থাৎ 'জার্ম্মাণ সুধী ও শিল্পী সঙ্ঘ'। জার্ম্মাণির ছোট বড় মাঝারি প্রায় সকল লোকই এই ঘাঁটিতে জুটিয়া থাকে।

'ফাউষ্ট' কাব্যের অমরতা

জার্ম্মাণরা 'ফাউষ্ট'কে কোনো দিনই ভুলিতে পারিবে না। সুইডিশ কবি ইব্‌সেনের 'পিয়ার গিণ্ট' বার্লিনের বড় থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। পালাটাকে থিয়েটারওয়ালারা "উত্তর ইয়োরোপের ফাউষ্ট্" বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। দুনিয়ার সকল কবিকেই জার্ম্মাণিতে গ্যেটের মাপকাঠিতে কষা হয়। বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

আজকাল হেবেফের্ল নামক এক কবি জার্ম্মাণির সাহিত্যমণ্ডলে জাঁকিয়া উঠিয়াছেন। ইহার লেখা 'স্পীগেল-মেন্শ্' বা 'আয়নার মানুষ' নাটককে জার্ম্মাণসমাজে 'দ্বিতীয় ফাউষ্ট'রূপে অভ্যর্থনা করা হইতেছে। হেবেফের্লের রচনা ফ্রান্সেও আদর পাইতেছে। প্যারিসের 'লা নুভেল রভিয়ু ফ্রাঁসেজ' মাসিকে 'আয়নার মানুষে'র বিস্তৃত সমালোচনা দেখিলাম। এই পত্রিকাটা বিশ্বসাহিত্যের বেপারী।

কুল্‌টুর-বিনিময়

লড়াই হারিবার পর হইতে জার্ম্মাণরা আমেরিকার নিকট

অনেক কিছু আশা করে। এই জন্য জার্ম্মাণিতে আমেরিকার আদর ঢের। মার্কিন জাতের সঙ্গে 'কুল্‌টুর'-বিনিময়ের জন্য জার্ম্মাণরা লালায়িত। ভারতবাসীর নিকট জার্ম্মাণির পাইবার কিছু আছে কি? এক কথায় কিছুই না। কাজেই জার্ম্মাণরা ভারত-সন্তানকে লইয়া মাতামাতি করে না।

এদিকে জার্ম্মাণির নিকট ইয়াঙ্কি জাত বেশী কিছু আশা করে কি? কিছুই না। কাজেই আমেরিকায় জার্ম্মাণ জাতকে লইয়া নাচানাচি দেখা যায় না। লড়াইয়ের পূর্ব্বে কিন্তু ইয়াঙ্কিরা জার্ম্মাণ কুল্‌টুর আমদানি করিবার জন্য স্বদেশে প্রপাগাণ্ডা চালাইত।

যাহার যেখানে স্বার্থ তাহার সেখানে মাতামাতি,—অর্থাৎ 'প্রপাগাণ্ডা' আর সভ্যতা-বিনিময়ের আন্দোলন। ভারতবাসী জার্ম্মাণ-জাতের নিকট কিছু আশা করিতে পারে কি? প্রত্যেক সুবিবেচক লোকই বলিবে:—"অনেক কিছু।" কাজেই জার্ম্মাণিতে ভারতবাসীর প্রপাগাণ্ডা আবশ্যক। অর্থাৎ জার্ম্মাণ কুল্‌টুর ভারতে আমদানি করিবার জন্য ভারত-সন্তানকে জার্ম্মাণিতে বসিয়া খাটিতে হইবে। ভারতেও এই জন্য নানা কেন্দ্র থাকা চাই। গরজ ভারতবাসীর, জার্ম্মাণির নয়,—বুঝিয়া রাখা উচিত।

বার্লিনের বড় লাইব্রেরীর কতকগুলা ঘরে বের্টলিঙের সঙ্গে আলাপ হইল। এই সকল ঘরে 'আমেরিকা-ইন্‌ষ্টিটিউট' কায়েম করা হইয়াছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই প্রতিষ্ঠান গড়া হইয়াছিল। আর্মিষ্টিসের পর হইতে এইটাকে জাগাইয়া তোলা হইতেছে। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গ্রন্থ-বিনিময়, অধ্যাপক-বিনিময় ইত্যাদি বিষয় লইয়া এই ইন্‌ষ্টিটিউট আমেরিকায়-জার্ম্মাণিতে সদ্ভাব বাড়াইতে সচেষ্ট।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেন্ট আসিয়াছেন বার্লিনের থিয়েটার ও নাট্যসাহিত্য জরীপ করিতে। আর্জেণ্টিনা হইতে

আসিয়াছে জার্ম্মাণ ভূতাত্ত্বিক ও আকরতাত্ত্বিকদিগকে দক্ষিণ আমেরিকায় লইয়া যাইবার জন্য। আমেরিকার 'নেশুন' কাগজে এক মার্কিন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন :—"জার্ম্মাণরা যুদ্ধের এই কয় বৎসরে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" এই উন্নতির মাপজোক করিবার জন্য আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ আসিতেছে দলে দলে।

বেহালাবাদক ক্রাইস্‌লার

ভিয়েনার জগদ্বিখ্যাত বেহালা-বাদক ক্রাইস্‌লার এখন বার্লিনে। বার্লিনের নরনারী ক্রাইস্‌লারের গুণপনায় মুগ্ধ। সঙ্গীতভবনে ঠাঁই পাওয়া কঠিন। ক্রাইস্‌লার পাকা সমাজসেবকও বটে। কয়েক মাস হইল ওপাও নগরে অসংখ্য নরনারীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছেও বিস্তর। উৎপাত আরম্ভ হয় কোনো ফ্যাক্টরির ভিতরকার আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে। ওপাওয়ের দুঃস্থ নরনারীকে সাহায্য করিবার জন্য জার্ম্মাণির নগরে নগরে ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। ক্রাইস্‌লার এই 'রিলীফ' ব্যাপারে একজন অগ্রণী।

সঙ্গীতভবনের আয়ের প্রায় সবই ক্রাইস্‌লার ওপাও সাহায্যভাণ্ডারে দান করিতেছেন। আমেরিকায় থাকিবার সময়েও ইনি অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণির বালক-বালিকাদের জন্য বেহালা বাজাইয়া অজস্র টাকা তুলিয়াছেন। অবশ্য আর্মিষ্টিসের পর। কেননা, যুদ্ধের সময় ক্রাইস্‌লারকে ইয়াঙ্কি মুল্লুকে নাকাল হইতে হইয়াছিল।

জনসাধারণের সঙ্গীত-ভবন

জার্ম্মাণির প্রায় প্রত্যেক শহরেই 'জনসাধারণের' সম্পত্তিস্বরূপ

থিয়েটার বা অপেরাগুলা যৌথকারবার-রূপে পরিচালিত হয়। চাঁদা করিয়া মূলধন তুলিয়া কর্ম্মকর্ত্তারা সুকুমার শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছেন।

এই ধরণের ব্যবসাতে আপামর জনসাধারণ হাতের কাছেই কম-বেশী টাকা খাটাইবার সুযোগ পায়। অধিকন্তু শস্তায় সর্ব্বোচ্চ ওস্তাদ-গণের সঙ্গীত শুনিবার অধিকারও তাহাদের থাকে। বার্লিনে জন-সাধারণের টাকায় পরিচালিত 'ফোল্‌ক্‌স্‌ওপারে'র সভ্যসংখ্যা অর্থাৎ মালিক সংখ্যা, শুনিতে তিনলাখেরও বেশী।

ক্রাইস্‌লার বলিতেছেন :—"অমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছি, জার্ম্মাণিতে সঙ্গীতচর্চ্চা এবং সঙ্গীতের সমাদর যারপর নাই বাড়িয়া গিয়াছে। গোটা জার্ম্মাণ চরিত্রেই এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেছি। লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা এবং আমিষ্টিসের অত্যাচার,—দুইই জার্ম্মাণিকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই গভীরতা ও দৃঢ়তার এক বিশেষ পরিচয় পাইতেছি সঙ্গীতকলার বিকাশে।"

অনেক প্রতিভাবান্‌ জার্ম্মাণ যুবা অন্যান্য অর্থকরী জীবিকা ছাড়িয়া দিয়া সঙ্গীতে জীবন উৎসর্গ করিতেছে। তাহাদের সাধনায় জার্ম্মাণির সঙ্গীত-শিল্প নবনব ক্ষেত্রে মানব-চিত্তের স্বাধীনতা বাড়াইয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই।

বাস্তুশিল্প

প্যারিসের রাস্তায় চৌমোহনীতে যে দরের বাস্তুশিল্প দেখা যায়, বার্লিনে সেই দরের কাজকর্ম্ম চোখে পড়িতেছে না। বার্লিনের সেই বিজয়মিনারটা লাল গ্রানাইটে দেখায় খবসুরৎই বটে। কিন্তু প্যারিসের

অনেকটা নিষ্প্রভ। সৌন্দর্য্য আছে গৌরব নাই বলিলে যাহা কিছু বুঝা যায় ক্যোনিগ্‌স্‌-প্লাট্‌সের,—(রাইখ্‌ষ্টাগ ভবনের সম্মুখস্থ) এই জার্ম্মাণ মিনার সেইরূপ মনে হইবে।

১৮৬৪ হইতে ১৮৭১ সালের প্রুশিয়ান বিজয়গর্ব্ব এই স্মৃতিস্তম্ভের উপর খোদিত,—প্যারিসের 'আর্ক দ ত্রিয়ঁফ্‌' যেমন নেপোলিয়ানি কীর্ত্তির বাস্তমূর্ত্তি। জগতের সকল দেশের বিজয়স্তম্ভেই মানব-চরিত্রের একাকার রূপ দেখিতে পাই। প্রাচীন মিশরীয় ফারাওদের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই হিসাবে মানুষের কোনো পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই,—যদিও পশ্চিমারা পূর্ব্বে পশ্চিমে তথাকথিত প্রভেদ বুঝাইবার জন্য জোর জবরদস্তি করিয়া শিল্পে শিল্পে প্রভেদ জাহির করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

দুনিয়ার বিজয়স্তম্ভগুলা একসঙ্গে স্বচক্ষে দেখিবার এক সুযোগ ঘটিল। হোফমান-প্রণীত 'ডেঙ্কম্যেলার' বা স্মৃতিস্তম্ভ নামক গ্রন্থ দুইখণ্ডে বিভক্ত। একখণ্ডে আছে স্তম্ভের ইতিহাস, আর একখণ্ডে স্তম্ভ-শিল্পের বিবরণ। কেতাব দুইটা সচিত্র,—'হাণ্ডবুখ ড্যর আর্কিটেক-টুর' গ্রন্থমালার অন্তর্গত।

রাইখ্‌ষ্টাগ পাড়ায় এক গলির নাম 'জীগেস্‌-আল্লে' বা বিজয়-সড়ক। দুইধারে দেখিতেছি হোহেনৎসোলার্ণ বংশের রাজাদের প্রতিমূর্ত্তি। স্থাপত্যে মুগ্ধ হইলাম না। শিল্পের আসরে মূর্ত্তিগুলা টেঁকসই হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না।

রিকার্টের 'ভারতীয় প্রেমসঙ্গীত'

ফোন গ্লাজেনাপ একখানা কেতাব উপহার দিলেন। কেতাবের সম্পাদক ইনি নিজে। নাম 'ইণ্ডিশে লীবেশ্‌লিরিক্‌' অর্থাৎ

অধ্যাপক রিয়্কার্ট। অনেক দিনের কথা,—কিন্তু একত্রে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইল এতদিনে।

রিয়্কার্ট (১৭৮৯-১৮৬৩) জার্ম্মাণির 'স্বর্ণযুগের' লোক। রোমান্টিক ভাবুকতার লহরে তাঁহার যৌবন কাটিয়াছিল। সংস্কৃত শিখিবার জন্য ইনি উইলসনের অভিধান খানা স্বহস্তে নকল করিয়া লইয়াছিলেন। অর্থাৎ বই তখন জুটিত কম, আর রিয়্কার্টের পয়সার টানাটানিও ছিল খুব বেশী।

অনুবাদগুলা জার্ম্মাণ কাব্য হিসাবে সুললিত। ভাষার উপর লেখকের জোর জার্ম্মাণরাও তারিফ করিয়াছেন। রঘুবংশ, কিরাতার্জ্জুনীয়, শৃঙ্গারশতক, গীতগোবিন্দ ইত্যাদির সরস জার্ম্মাণ সংস্করণ জার্ম্মাণদের আদরের বস্তু। রিয়্কার্ট আরবী কাব্যেও সুদক্ষ ছিলেন। তখনকার দিনে যুবক জার্ম্মাণি বিশ্বসাহিত্যের বন্যা আনিয়া জার্ম্মাণ কুল্টুরের তেজ বাড়াইতে সচেষ্ট থাকিত। কেতাবের ভিতর মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্র কতকগুলা ছাপা হইয়াছে। বার্লিনের 'ফোল্কারকুণ্ডে' অর্থাৎ নৃ-তত্ত্ব বিষয়ক মিউজিয়ামে চিত্রগুলার মূল রক্ষিত হইতেছে।

'দস্যুবীর ষ্টোর্টেবেকার'

লাইপ্‌ৎসিগের এক প্রকাশক একখানা নভেল ছাপাইয়াছেন। মধ্য যুগের—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর—কথা লইয়া এই গল্প লিখিত। লেখক বিশ বৎসর ধরিয়া এই কাহিনীতে মস্‌গুল ছিলেন। সাগরের ডাকাইত ষ্টোর্টেবেকার কি কৌশলে হান্সা বণিক্‌সঙ্ঘের সওদাগরি জাহাজ লুটপাট করিত, তাহার বিবরণ এই উপন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। লেখকের নাম এঙ্গেল।

মহাজন তাঁহার জনক। দল পাকাইয়া ডাকাইতি করার ব্যবসাতে ইনি অসাধারণ কেরদানি দেখাইতে সমর্থ হন।

ষ্ট্যের্টেবেকার যে-সে ডাকাইত নন। এঙ্গেল কেতাব লিখিয়াছেন ১৯২১ সালে,—অর্থাৎ যখন রুশিয়ায় বোল্‌শেভিকীর চলিতেছে জয় জয় কার! কাজেই অন্ততঃ কাগজে কলমে ষ্ট্যের্টেবেকার কমিউনিষ্ট-পন্থী ভাবুক। বিশ্বামিত্রের মতন ইনি যে নয়া জগৎ গড়িলেন, সেই উপনিবেশের 'নীতিশাস্ত্র' ছিল ধন-সাম্যের বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, লুটের ভাগবাটোয়ারায় ষ্ট্যের্টেবেকার প্লেটোসংহিতা ও লেনিন-নীতি অথবা মোরের 'ইউটোপিয়া' কাজে লাগাইয়াছিলেন।

ডাকাইতের গল্প পড়িতে পড়িতে হয় 'আনন্দমঠ' মনে আসিবে, না হয় গ্যেটে-সাহিত্যের 'গ্যেট্‌স্' অথবা শিলার-সাহিত্যের 'রয়বার' অর্থাৎ 'দস্যুবীর'। কাব্যশিল্পে ডাকাইত-জীবন স্বাধীনচেতা নির্ভীক বিপ্লবী সমাজসংস্কারক স্বদেশসেবকের আদর্শ ফুটাইয়া তুলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্যেটে যখন ডাকাইতের আদর্শ জার্ম্মাণির সম্মুখে ধরিয়াছিলেন অথবা শিলার যখন তাঁহার উদ্দীপনাময় নাটকের দ্বারা যুবক জার্ম্মাণিকে তাতাইতে ও কর্ম্মঠ করিয়া তুলিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁহাদের বাণী ছিল ন্যাশন্যালিজ্‌ম্, স্বাদেশিকতা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা।

কিন্তু বিংশশতাব্দীর জার্ম্মাণ আখ্যায়িকাকার সেই পুরাণা মামুলি ধুয়া ধরেন নাই। এঙ্গেল ডাকাইত-জীবনের বীরত্বে দেখাইতেছেন মানব মাত্রের আর্থিক স্বাধীনতা। জগতে এ এক নব আদর্শ—নয়া আধ্যাত্মিকতা। "ভগবানের ভক্ত মোরা ধ্বংস করি দুনিয়া"—এই হুঙ্কার আজকালকার জার্ম্মাণ ভাবুকতায় 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঠাঁই অধিকার করিয়াছে।

সংবাদ-পত্রে শিল্প-সাহিত্য

জাপানী বালক-বালিকাদের আঁকা ছবি বার্লিনের কাগজে কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। অপর দিকে জার্ম্মাণ বালক-বালিকাদের হাতের কাজ তোকিওতে প্রদর্শিত হইতেছে—এই ধরণের প্রদর্শনী-বিনিময় জগতের নূতন ঘটনা। দুনিয়ার লোকেরা পরস্পর জানাশুনা বাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

জাপানী ছবির ভিতর দেখিতেছি,—দশ বৎসরের এক শিশু এক 'দাইম্যো' মূর্ত্তি আঁকিয়াছে। এগার বৎসরের বালিকার আঁকা জাপানী রমণী এবং চৌদ্দবৎসরের ছোকরার এক 'প্রাকৃতিক দৃশ্য'ও জার্ম্মাণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

গাউল নামক জার্ম্মাণির সুপ্রসিদ্ধ স্থপতির মৃত্যু হইল। গাউল সিংহ গড়িয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। জীবজন্তুর স্থাপত্যে ইঁহার কীর্ত্তি জার্ম্মাণি-জোড়া। নামজাদা জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ ৭৫।৮০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মরেন না। কিন্তু গাউল মরিয়াছেন ৫২ বৎসর বয়সে।

বার্লিনের আইনাধ্যাপক ফোন গীর্কের নাম ভারতবর্ষে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় 'নীতিশাস্ত্র' ও ধর্ম্মানুশাসনের আলোচনায় গীর্কে ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত। কয়েকদিন হইল ৮১ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পুরাণা হিন্দুরাষ্ট্রনীতির আলোচনায় গীর্কের আলোচনাপ্রণালী যথাস্থানে কাজে লাগাইয়াছি।

জার্ম্মাণ কাব্যের হ্বিটম্যান

এক রাত খানিকটা কড়া হাওয়া বহিল। পরদিন সকালে দেখি, লিণ্ডেন গুলা আধা-ন্যাড়া অবস্থায় [illegible]

গোলাকার পাতাগুলা কে যেন ঝাঁটাইয়া রাস্তার কিনারায় আনিয়া ঠেকাইয়াছে।

য়েনার এক প্রকাশক 'নয়া ইয়োরোপের কাব্য' নামক এক ছোট কাব্যগ্রন্থ বাহির করিয়াছেন। কবির নাম এঙ্গেল্‌কে। কবি যৌবনের আরম্ভে মারা গিয়াছেন—লড়াইয়ের মাঠে—আর্মিষ্টিসের প্রায় সমসম-কালে। এঙ্গেল্‌কে মজুরি করিতেন।

এই ধরণের আর এক বড় কবি ডেমেল বৎসর দু'এক হইল মারা পড়িয়াছেন। জনসাধারণের দুঃখদৈন্য ছন্দে প্রচার করিয়া যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন, তাঁহাদিগকে ইয়োরোপে—অন্ততঃ জার্ম্মাণিতে 'নয়া হ্বিট্‌ম্যান্' নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এই জাতীয় এক হ্বিট্‌ম্যান্ নাকি বোলশেভিক রুশিয়ায়ও আজকাল আসর জাঁকাইয়া রহিয়াছেন।

রোমাণ্টিক আন্দোলন

রোমাণ্টিক যুগের ভাবুকবৃন্দের এক মেলা দেখিলাম। 'ষ্টাট্‌স্ বিব্লিওটেক' নামক বার্লিনের বড় গ্রন্থশালার এক ঘরে রোমাণ্টিক সাহিত্যরথীদিগের গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণ প্রদর্শিত হইতেছে। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ানি আমল—মোটের উপর ১৭৯০ হইতে ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত এই ত্রিশ বৎসর কালকে জার্ম্মাণ সাহিত্যের ভাবুকতার যুগ ধরিয়া লইতে পারি। রোমাণ্টিকতা ও স্বাদেশিকতা তখন ছিল এক সূত্রে গাঁথা। সেই রোমাণ্টিক আদর্শের কথা মনে করাইয়া দিয়া জার্ম্মাণ জননায়কগণ যুবক ও শিশু জার্ম্মাণিকে আবার সেই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন।

ভাবুক লেখকেরা অনেকেই ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানসেবী, চিত্রকর, সঙ্গীতের ওস্তাদ। প্রায় সকলেই—গ্যেটে পর্য্যন্ত—খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদির সম্পাদন করিয়া

জনগণের ভিতর নয়া নয়া খেয়াল ঢালিবার চেষ্টা করিতেন। আন্দোলনের জন্য তখনকার দিনের মহামহোপাধ্যায়েরাও বাজারে দাঁড়াইয়া নাচানাচি করিতে লজ্জিত হইতেন না। জগদ্বিখ্যাত শ্লেগেল ছিলেন এই ধরণের এক 'প্রপাগাণ্ডিষ্ট' অর্থাৎ হুজুগের চাঁই।

ক্লাইষ্ট কবির স্বদেশী সঙ্গীত আজও জার্ম্মাণির প্রত্যেক বালক-বালিকার হৃদয়ে শত্রুধ্বংসের উৎসাহ জাগাইয়া থাকে! গ্রিম ভাইয়েরা পল্লী-প্রচলিত লোক-সাহিত্য এবং কথাকাহিনী সংগ্রহ করিয়া নরনারীকে 'দেশের মাটি'র দিকে নজর দিতে শিখাইয়াছিলেন। এই সকল অনুসন্ধান ও গল্পের প্রভাবে জার্ম্মাণসমাজে স্বদেশ-প্রীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে সমর্থ হয়।

ভাবুকেরা সকলেই স্বদেশসেবক ছিলেন বটে,—কিন্তু তাহা বলিয়া কেহই বিদেশী শিল্প-সাহিত্যকে বয়কট করেন নাই! বরং দুনিয়ার শক্তিপুঞ্জকে জার্ম্মাণির শিল্পে ও সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই রোমাণ্টিক আদর্শবাদীদের এক বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

জার্ম্মাণ ভাষায় বিশ্বসাহিত্য ছড়াইবার ভার লইয়াছিলেন শ্লেগেল ভাইয়েরা। ইঁহাদের সহকারী জুটিয়াছিলেন নাট্যকার টীক। তাঁহাদের উৎসাহে বিলাতী শেক্‌স্‌পিয়ার হইতে ভারতীয় শেক্‌স্‌পিয়ার কালিদাস পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ 'কুল্‌টুরের' নিজস্ব হয়।

সেই স্বর্ণযুগের নামজাদা কবি শিলার ও হায়নে ভারতেও অজানা নাই। হায়নের 'গঙ্গা'-সঙ্গীতে জার্ম্মাণির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভারতীয় পদ্মের গন্ধ শুঁকিয়াছে। রোমাণ্টিক জীবনের দার্শনিক ব্যাখাকার হার্ডার যুবক ভারতেরই জীবন যেন সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুনিয়া চলিতেছে সর্ব্বত্র একই নিয়মে। এই জন্যই একশত বৎসর পূর্ব্বেকার যুবক জার্ম্মাণির কর্ম্মসাধনায় আর নবীন এশিয়ার জীবন-প্রবাহে একই পুনর্গঠন-ধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাই।

জার্ম্মাণির মজুর-কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ

রাইণ-রুর অঞ্চলের ডিয়াস্‌সেলডর্ফ শহরে জার্ম্মাণ মজুরদের এক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইল (১৬ অক্টোবর, ১৯২১)। সভাপতি ছিলেন রুডল্‌ফ রোক্কার। ইনি জার্ম্মাণ মজুর-সঙ্ঘের এক বড় কর্ম্মবীর।

মজুর-কংগ্রেসে উপস্থিত ছিল চাষী, ছুতারমিস্ত্রী এবং খনি, ধাতুর কারখানা, রেলওয়ে ইত্যাদিসংক্রান্ত ফ্যাক্টরির শ্রমজীবীর দল। সভায় নারীর সংখ্যা মন্দ ছিল না। হল্যাণ্ড, সুইডেন, চেকোস্লোভাকিয়া এবং আমেরিকা হইতেও মজুর-প্রতিনিধির সমাগম হইয়াছিল।

ডিয়াস্‌সেলডর্ফের এই মজুর-কংগ্রেস হইতে ভারতীয় মজুর ও কিষাণদের নিকট এক ভ্রাতৃত্বের রাখী পাঠানো হইয়াছে। অবশ্য এই সৌহার্দ্দ্যের ইস্তাহার ভারতবর্ষে পৌঁছিবে কিনা আলাদা কথা। জার্ম্মাণ মজুরেরা বলিতেছেন :—"হে ভারতের মজুর-চাষী, বিদেশী সাম্রাজ্যের এবং বিদেশী ধনি-সম্প্রদায়ের আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তোমরা যে সংগ্রাম সুরু করিয়াছ, সেই সংগ্রামে আমরা তোমাদের সফলতা কামনা করি। মনে রাখিও কিন্তু যে, বিদেশীরাই তোমাদের একমাত্র শত্রু নয়। তোমাদের স্বজাতীয় ধনী মহাজন এবং জমিদারেরাও অনেক স্থলে তোমাদের খাঁটি দুস্‌মন।"

জার্ম্মাণির মজুরেরা পূর্ব্বে কখনো কোনো কাজকর্ম্মে ভারতীয় মজুর-চাষীদের কথা মুখে আনে নাই। যুদ্ধের সময়ে অবশ্য জার্ম্মাণ রাষ্ট্র-নায়ক এবং পত্রিকা-সম্পাদকেরা আয়র্ল্যাণ্ড, ঈজিপ্‌ট এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা বহুবার আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্মিষ্টিসের পর জার্ম্মাণির রাষ্ট্রীয় জীবনে ভারতবর্ষের কথা খোলাখুলি উঠিল এই প্রথম।

সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্ বনাম সোশ্যালিজ্‌ম্

রোস্কার যে-মতের মজুর-কংগ্রেসের কর্ণধার সেই মতকে পশ্চিমা ভাষায় বলে 'সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম'। ভারতবর্ষে বোধ হয়, এই শব্দ এখনো সুপরিচিত নয়। ইয়োরামেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই সিণ্ডিক্যালিষ্ট নামে মজুর-চাষীদের দল আছে। দূর হইতে যাহারা জাত বিচার করিতে অপারগ, তাহারা সিণ্ডিক্যালিষ্টদিগকে সহজে সোশ্যালিষ্ট বলিয়া থাকে।

কিন্তু এই দুই 'লিষ্ট'-ভাগান্ত শব্দের অর্থে অনেক ফারাক। বস্তুতঃ মামুলি সোশ্যালিষ্ট নাম আজকাল নেহাৎ নিন্দনীয়। কোনো চরমপন্থী শ্রমজীবীর দলই সোশ্যালিষ্টরূপে পরিচিত হইতে চায় না। দিনকাল যেমন পড়িয়াছে, তাহাতে খাঁটি মজুরদের সর্ব্ববাধাহীন স্বরাজ ছাড়া ইহারা আর কিছুতে সন্তুষ্ট নয়। সেই স্বরাজকে কমিউনিষ্ট বা ধনসাম্যশীল স্বরাজ বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু এই কমিউনিষ্ট গণতন্ত্রটাই কি উপায়ে গড়িয়া তোলা যাইবে? এই সম্বন্ধে মজুরদের ভিতর দলাদলি বিষম। ১৯১৭ সালের ৭ নবেম্বর হইতে আজ চার বৎসর ধরিয়া কমিউনিষ্ট স্বরাজের একটা যাচাই হইতেছে রুশিয়ায়। বোল্‌শেভিকীদের প্রবর্ত্তিত 'সোভিয়েট রিপাব্লিক' বা পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র জগতের একমাত্র ধনসাম্যশীল স্বরাজ। ক্রমশঃ দেখিতেছি যে, ইয়োরামেরিকার বিপ্লবী চরমপন্থী মজুরগণ রুশিয়ার 'এক্‌স্‌পেরিমেণ্টে' আস্থা হারাইতেছে। বোল্‌শেভিকীদের মত ইহাদের আর পছন্দসই নয়। ইহারা এখন কমিউনিজ্‌মের এক নয়া পথে ঝুঁকিতেছে।

সেই নয়া পথের নাম সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্। অন্ততঃ বিশ বৎসর ধরিয়া এই শব্দটা পাশ্চাত্য শ্রমজীবী মহলে সুপ্রচলিত। কিন্তু মে মাসে (১৯২১) মস্কো নগরে 'বিশ্বমজুর-সঙ্ঘের' যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়,

সেই কংগ্রেসের পর হইতে সিণ্ডিক্যালিষ্ট দল নয়া তেজে দেখা দিয়াছে। রুশিয়ার বোল্‌শেভিক কমিউনিষ্টদের সঙ্গে ইয়োরামেরিকার সিণ্ডিক্যাল কমিউনিষ্টদের ছাড়াছাড়ি সেই কংগ্রেসের কার্য্যাবলীর ফল। ১৬ অক্টোবর ড্যিস্‌সেলডর্ফে যে কংগ্রেস বসিল, সেই কংগ্রেসে মজুরদের নয়া ফার্ম্মাণ জারি দেখিতে পাই। আশা করি, প্রাচীন ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের ও তাম্রলিপির ভিতর 'রিসার্চ্চ' চালাইয়া কেহ সিণ্ডিক্যালিজমতত্ত্বকে হিন্দু সভ্যতার এক আবিষ্কাররূপে সপ্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইবেন না।

মজুর মহলে দলাদলি

জার্ম্মাণির সিণ্ডিক্যালিষ্টরা ভারতীয় মজুর-কিষাণকে যে মর্ম্মে 'হামদর্দ্দি' পাঠাইয়াছেন, রুশিয়ার 'বিশ্বমজুর সঙ্ঘে'র কংগ্রেস হইতেও ভারতীয় শ্রমজীবীদের উপলক্ষ্য করিয়া অবিকল সেই মর্ম্মেই বন্ধুত্বের দাখিলা পাঠানো হইয়াছিল। দুনিয়ার মজুরেরা, যে যেখানেই থাকুক না, সকলেরই স্বার্থ এক, আর সকল জাতীয় শ্রমজীবীদেরই দুস্‌মন এক,—এই কথা বোল্‌শেভিকীরাও বলিতেছেন আবার সিণ্ডিক্যালিষ্টরাও বলিতেছে।

তাহা হইলে সিণ্ডিক্যালিষ্টরা বোল্‌শেভিকীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন কেন? কয়েক দিন হইল জার্ম্মাণির হাম্বুর্গ বন্দরে জাহাজের খালাসীদের এক সভা হইয়াছে। তাহাতে এই ঝগড়ার কারণ বিশেষরূপে বুঝা যায়। বিগত জুলাই ও আগষ্ট মাসে (১৯২১) মস্কোতে যে আন্তর্জ্জাতিক মজুর কংগ্রেস বসিয়াছিল সেই কংগ্রেসে বোল্‌শেভিকীরা নাকি অনেক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। এই জন্য ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো দেশের সিণ্ডিক্যালিষ্টরা মস্কোর 'বিশ্বমজুর-সঙ্ঘ'কে বয়কট করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

সিণ্ডিক্যালিষ্টরা মজুরদের কোনো আন্দোলনে কোনো প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক দলের কিছু মাত্র প্রভাব পছন্দ করে না। কিন্তু মস্কোর মজুর-কংগ্রেসকে নাকি বোল্‌শেভিকীরা সোভিয়েট রুশ গভর্মেণ্টেরই একটা খাশ মজুর-বিভাগে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে।

জার্ম্মাণ সিণ্ডিক্যালিষ্ট রোকার

হাম্বুর্গের খালাসী-সভায় রোকার বলিয়াছেন :—"মস্কোর কর্ত্তারা বিশ্বমজুর-কংগ্রেসকে যেন তেন প্রকারেণ সোভিয়েট মতে আনিতে সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তাঁহারা জলের মত টাকা খরচ করিয়াছেন। অনেক নির্দ্দোষ শ্রমজীবি-প্রতিনিধিকে একমাত্র সন্দেহের জোরে রুশিয়া হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর, যে সকল বিদেশী ডেলিগেট রুশিয়ার ভিতরকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নানা উপায়ে বাধা দেওয়া হইয়াছে। 'হোটেল লুক্‌স্' হইতে মস্কোর মজুর-জীবন যতটুকু বুঝা যায়, তাহার বেশী বুঝিবার অবসর কোনো বিদেশীকেই দেওয়া হয় নাই। (সোভিয়েট রুশিয়ার জোরজবরদস্তির নিকট দুনিয়ার মামুলি গবর্মেণ্টগুলার অত্যাচার এবং জুলুমও পরাস্ত হইবে। কাজেই জার্ম্মাণি, পর্ত্তুগাল, স্পেন, ইতালী ও আমেরিকার চরমপন্থী বিপ্লবী শ্রমজীবীরা রুশিয়ার বোলশেভিক মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এখন হইতে আমরা নূতন প্রণালীতে মজুর-চাষীদের স্বরাজ গড়িতে যত্ন করিব।")

সিণ্ডিক্যালিষ্টরা গবর্মেণ্টের এলাকার বহির্ভূত স্ব স্ব প্রধান মজুর-কিষাণদের সঙ্ঘ কায়েম করিতে উদ্যোগী। কিন্তু বোলশেভিকীরা মজুর-কিষাণদের কাজকর্ম্মে গবর্মেণ্টের শাসন পুরামাত্রাই জারি করিয়া থাকেন। এই হিসাবে রুশিয়ার সোভিয়েট গবর্মেণ্ট আর অন্যান্য 'বুর্জোআ' গবর্মেণ্ট এক গোত্রেরই অন্তর্গত। কাজেই সিণ্ডিক্যালি-

ষ্টরা 'আনার্কিষ্ট'। দেখা যাউক, রাষ্ট্রহীনতার বা গবমে'ণ্টশূন্যতার আদর্শে পশ্চিমা শ্রমজীবীদের দৌড় কতদূর যায়।

যে আধ্যাত্মিকতার জোরে নবীন ইয়োরামেরিকার নরনারী নিত্য নূতন সমাজ-গঠনের কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে, যে আধ্যাত্মিকতার জোরে ইহারা গতকল্যের পরীক্ষাগুলাকে অকেজো বিবেচনা করিয়া আগামীকল্যের জন্য নয়া সাধনায় চিত্ত সমর্পণ করিতেছে, যে আধ্যাত্মিকতার জোরে ইহারা প্রতি মুহূর্ত্তেই মানবজীবনকে নয়া নয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্য দলে দলে প্রাণপাত করিতেছে, যে আধ্যাত্মিকতার জোরে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সকল প্রকার স্বাধীনতার সুযোগ না পৌছানো পর্য্যন্ত ইহারা অস্থির ও কর্ম্মতৎপর থাকিতেছে,—সেই আধ্যাত্মিকতা যে চাখে নাই সে কখনো মানবের 'অনন্ত'-পিপাসা বুঝিতে পারিবে না।

সিণ্ডিক্যাল মতের দুই স্বীকার্য্য

ডিসসেলডর্ফের কংগ্রেসে সিণ্ডিক্যালিষ্টরা দুনিয়ার মজুরচাষীদের জন্য এক গীতার মোসাবিদা প্রচার করিয়াছেন। এই মোসাবিদায় গবর্মেণ্ট বস্তুটাকে এক দম লুপ্ত করা হইয়াছে।

পৃথিবীর সকল দেশেই রাষ্ট্রনৈতিক দলের পাণ্ডারা দেশের ভিতরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগুলি দখল করিতে সচেষ্ট থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনায় গবর্মেণ্ট-সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলা হস্তগত না হইলে বিদ্যা, ব্যবসায়, ধন-সম্পত্তি, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি জীবনের কোনো বিভাগেই উন্নতি সাধন করা অসম্ভব। কিন্তু যখনই কোনো দল শাসন-বিষয়ক অর্থাৎ পোলিটিক্যাল ক্ষমতা পাইয়া বসে তখনই দেখা যায় যে, দলনায়কগণ পুরাণা পথেই সমাজকে চালাইতে অগ্রসর হন। নূতন নূতন

এই গেল সিণ্ডিক্যালিষ্ট মতের প্রথম স্বীকার্য্য। বলা বাহুল্য, এই মত পুরাপুরি গ্রহণীয় নয়। এই যুক্তির গলদ অনেক। যাহা হউক, সম্প্রতি সিণ্ডিক্যালিজমের সমালোচনা করিতেছি না। ইয়োরামেরিকার লাখ লাখ নরনারী এই মত অনুসারে জীবন চালাইতেছে,—এই কথাটা অন্ততঃ জানিয়া রাখা আবশ্যক।

সিণ্ডিক্যালিষ্টদের আর একটি স্বীকার্য্য আছে। ইহারা বলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে দেশের উন্নতি নির্ভর করে একমাত্র আর্থিক ও বৈষয়িক সংস্থানের উপর। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি লাইনে সম্পত্তি-বিষয়ক পুনর্গঠন স্বরু না হইলে মানবজীবনে নয়া স্রোত বহিতে পারে না।

বৎসর ষাটেক পূর্ব্বে কার্ল মার্ক্‌স্ দুনিয়ায় যে ধুয়া ধরাইয়া গিয়াছেন, সেই ধুয়ার চরম বিকাশ দেখিতেছি সিণ্ডিক্যালিষ্টদের এই মতে। বস্তুতঃ এইখানে সিণ্ডিক্যালিষ্টদের সঙ্গে বোল্‌শেভিষ্টদের আদৌ বিরোধ নাই। 'সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যা'—দুই মহলেরই গোড়ার কথা। এই তত্ত্ব মার্কিন অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান-প্রণীত 'ইকনমিক ইণ্টারপ্রেটেশন অব হিষ্টরি' গ্রন্থে সোজা কথায় বুঝানো আছে। কার্ল মার্ক্সের কটমট বইয়ে দন্তস্ফুট করা অনেকের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। তবে ফরাসী পণ্ডিত জিদ্ ও রিস্ত্-প্রণীত 'আর্থিক মতবাদের ইতিহাস' গ্রন্থে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম ইত্যাদি নয়া নয়া মতবাদের বিবরণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা সহজেই বোধগম্য।

জার্ম্মাণ মজুরদের নবীন গীতা

সিণ্ডিক্যালিষ্টদের প্রথম স্বীকার্য্য দুইটা হজম করিয়া লইলে অন্যান্য কথা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ। ডিসসেলডর্ফের মোসাবিদায় প্রকাশ :—

১। "আমরা রাষ্ট্র নামক কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বা প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে চাই না। আমরা বৈষয়িক জীবনের বিভাগে

বিভাগে নানা প্রকার নয়া সংস্থান সৃষ্টি করিতে চাই। কাজেই গবর্মেণ্টের শাসন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, পোলিটিক্যাল দল ইত্যাদি বস্তু তুলিয়া দিয়া সমাজে আর্থিক পুনর্গঠন কায়েম করিতে আমরা সচেষ্ট।"

২। "আর, আমরা যখন কোনো গবর্মেণ্টের শাসনই পছন্দ করি না, তখন কোনো দল-বিশেষের একচ্ছত্র আধিপত্য অথবা কোনো দেশব্যাপী আইন-কানুন আমাদের আদর্শের বহির্ভূত। আমরা ভিন্ন ভিন্ন মজুর দলের ভিন্ন ভিন্ন আইন দেখিলে সুখী হইব। ভিন্ন ভিন্ন কৃষাণ সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে জীবন যাপন করিতেছে জানিলে আমাদের আদর্শ মাফিক যুগান্তর সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিব। আমরা দেশের সর্ব্বত্র নানাবিধ সঙ্ঘ, নানাবিধ আইন-কানুন গড়িয়া তুলিতে চাই। সমাজের ভিতরকার প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠী বা দলকে আপন আপন নিয়মে বিচিত্র আকারে স্বাধীনভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ প্রদান করাই সিণ্ডিক্যালিষ্ট স্বরাজের উদ্দেশ্য।"

বস্তুতঃ, জার্ম্মাণ সিণ্ডিক্যালিষ্ট দলের কোনো শ্রমজীবীই কোনো রাষ্ট্রনৈতিক দলের সভ্য হন না। ডুস্‌সেলডর্ফের কংগ্রেসে জগতের সকল গবর্মেণ্টকেই টেলিগ্রাফ করিয়া তিরস্কার করা হইয়াছে। সিণ্ডিক্যালিষ্টদের চিন্তায় সোভিয়েট রুশিয়ার সর্দ্দার লেনিন, সোশ্যালিষ্ট জার্ম্মাণ রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট এবার্ট আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হার্ডিং সকলেই এক পাপে পাপী। কারণ, ইঁহারা সকলেই গবর্মেণ্টের আবশ্যকতা স্বীকার করেন।

ইয়োরামেরিকার সিণ্ডিক্যালিষ্টরা সকলে মিলিয়া এক বিপুল বিশ্ব-সিণ্ডিক্যালিষ্ট-সঙ্ঘ গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। এই আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন এক জন ওলন্দাজ। নাম বার্ণার্ড

চলিবে। এশিয়ার ইহাতে ক্ষতি নাই। কেননা দুইদলই এশিয়ার স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করিতে অগ্রসর।

আর্থিক ও সামাজিক জীবনে 'ট্রাষ্ট' গঠন

জার্ম্মাণির সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই কেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ দেখিতেছি। ছোট ছোট দল একত্র হইয়া বড় বড় দল গড়িতেছে। পল্লী-স্বাতন্ত্র্যের স্থানে 'ফেডার‍্যাল' বা সর্ব্ব-জার্ম্মাণ ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইতেছে। লড়াইয়ে হারিবার পর জার্ম্মাণরা এইদিকে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছে।

জার্ম্মাণিতে যতগুলা বড় বড় শিল্প-কারখানা আছে, সবগুলি মিলিয়া এক বিশাল 'ফার্ব্বাণ্ড' গড়িয়াছে। এই ফার্ব্বাণ্ডের কর্ত্তা বা সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, জার্ম্মাণির কোন্ কারখানায় কত খরচে কোন্ মাল তৈয়ারি হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। সমগ্র জার্ম্মাণির শিল্প-শক্তি এক তাঁবে, এক দায়িত্বে পরিচালিত হইতেছে। 'রাইখ্স্-ফার্ব্বাণ্ড ড্যর ড্যয়চেন ইণ্ডষ্ট্রী' প্রতিষ্ঠানকে এক শিল্প-সাম্রাজ্য বিবেচনা করা চলে।

এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ক্রোমার সাহেব সেদিন বলিতেছিলেন:—"ইংল্যাণ্ড জার্ম্মাণিতে বিলাতী মাল বেচিবার সুযোগ খুঁড়িতেছেন। এই জন্যই জার্ম্মাণদের সঙ্গে হাম-দর্দ্দি দেখাইতে ইংরেজরা এত লালায়িত।"

মজুরদলের কেন্দ্রীকরণ জার্ম্মাণ-সমাজে খুব প্রবল। জার্ম্মাণিতে যতগুলি 'ইউনিয়ন' বা মজুর-সমিতি আছে, অত নাই দুনিয়ার আর কোনো দেশে। সকলগুলি এক নিয়মের অধীন কাজ করেও।

কেন্দ্রীকরণ দেখিতেছি ছাপাখানার শিল্পে। জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন শহরে ছাপাখানার কলকব্জা যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার জন্য বহু জগৎ-প্রসিদ্ধ ফ্যাক্টরি আছে। ...

খানেক হইল এক বিপুলায়তন অ্যাসোসিয়েশন গঠন করিয়াছে। পরস্পর আড়া-আড়ি অনেক কমিতেছে,—বিদেশে ছাপাখানার বাজারে বিলাতী ও মার্কিন মালের সঙ্গে টক্কর দিবার পক্ষে এইরূপ কেন্দ্রীকরণে জার্ম্মাণির অনেক লাভ হইতেছে।

জার্ম্মাণির অনেক বড় বড় গ্রন্থ-প্রকাশক এবং পুস্তক-বিক্রেতা আজকাল ঐক্যবদ্ধ 'ট্রাষ্ট' গড়িবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এমন কি, বৈজ্ঞানিক পরিষৎ, সাহিত্য-সভা ইত্যাদি বিদ্যার কর্ম্মকেন্দ্রেও দেখিতেছি, অনেকগুলা পরস্পর স্বাধীন ছোটখাটো সঙ্ঘের স্থানে নিখিল-জার্ম্মাণি-ব্যাপী বিরাট পরিষৎ গড়িয়া উঠিতেছে। জার্ম্মাণির 'প্রাচ্যতত্ত্ব'-বিদেরাও এই হিড়িকে গোটা জার্ম্মাণির পণ্ডিত সম্প্রদায়কে একসূত্রে গাঁথিয়াছেন।

জার্ম্মাণি ও ভারত

জার্ম্মাণিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা আলোচিত হইতেছে। সোশ্যালিষ্ট মহলে 'গান্ধি আন্দোলন' লইয়া বক্তৃতাদি চলিতেছে। ভারতীয় বক্তার ডাক পড়িয়াছে।

জার্ম্মাণ ভাষায় বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা দুই-একজন ভারতবাসীর আছে দেখিতেছি। ত্রিবাঙ্কুরের চম্পক রাম পিল্লে জার্ম্মাণ মহলে সুপরিচিত ভারতীয় জার্ম্মাণ বক্তা। জহর খৈরি এবং সত্তর খৈরি নামক দুই ভারতীয় মুসলমান ভাই বার্লিনের 'প্রাচ্য বক্তৃতাভবনে' মুসলমান মহিলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম 'টাগে-ব্লাট' কাগজে বাহির হইয়াছে।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রিফাট-ডোৎসেণ্ট' অর্থাৎ সরকারের অনুমতি-প্রাপ্ত অবৈতনিক অধ্যাপক—জার্ম্মাণ যুবা—ফোন্ গ্লাজেনাপ্ 'ডায়চে আল্‌গেমায়নে ৎসাইটুঙ' দৈনিকে বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে

লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ভারতীয় নারী-মজুরদের মহলে ধর্ম্মঘট ও হরতাল কেমন চলিতেছে, সেই সম্বন্ধেও এই কাগজে এক বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে। লিখিয়াছেন এক জার্ম্মাণ মহিলা।

জার্ম্মাণদের সাহসিকতা

জার্ম্মাণির কোথাও নৈরাশ্য বা দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই না। আগামী জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯২২) পুরাণা শত্রুদিগকে অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ সোনার মার্ক্ লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে জার্ম্মাণ মহাজনেরা অথবা গবর্মেণ্ট কিছুমাত্র ভীত নন। বরং সর্ব্বত্রই শিল্পকারখানার মালিকেরা এই রাষ্ট্রীয় দেনা শোধ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ক্রোরপতি হুগো ষ্টিন্নেস্ এবং হ্বাল্টার রাটেনাও,—এই দুইজনে জার্ম্মাণিকে বিজেতাদের বাজারে-বাজারে জাহির করিয়া বেড়াইতেছেন। 'রাইখ্স্-ফার্ব্বাণ্ডের' সভাপতি ব্যিশরও বিদেশী ব্যবসায়ী মহলে জার্ম্মাণির স্বপক্ষে সহানুভূতি টানিয়া আনিতেছেন। রিপাব্লিকের মন্ত্রী হ্বির্ট্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক নামজাদা লোকই হাটে-বাজারে গলা ফাটাইয়া নিম্নরূপ বক্তৃতা করিতেছেন:—

"ওগো পৃথিবীর নরনারী, শোনো-শোনো তোমরা সকলে। জার্ম্মাণি লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের সকল টাকাই সুদে-আসলে সমঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছে। আমাদের প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করিও না।"

মন্ত্রী হ্বির্টের বক্তৃতা

ন্যাশন্যালিষ্ট অর্থাৎ সমরপন্থী এবং কাইজার-ভক্ত অথবা রাজতন্ত্রী জার্ম্মাণরা অবশ্য প্রাণে-প্রাণে বর্ত্তমান হ্বির্ট-গবর্মেণ্টকে ঘৃণা করেন।

এত সহজে ইংল্যাণ্ডের আর ফ্রান্সের সকল আবদারেই 'যো হুকুম' বলিতে রাজি নন। ইঁহারা কট্টর 'স্বদেশ-সেবক'।

রাইখ্‌ষ্টাগের (পার্ল্যামেন্টের) বক্তৃতায় ন্যাশন্যালিষ্ট দলের উপর মেজাজ গরম করিয়া হ্বির্ট্‌ বলিতেছেন :—"জার্ম্মাণির কোনো কোনো ন্যাশন্যালিষ্ট কাগজে দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথা প্রচার করা হইতেছে। ইহা নেহাৎ ভুল। আমাদের অবস্থা কিছু কাহিল বটে ; কিন্তু বিচলিত বা হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই। লণ্ডনের ব্যাঙ্কার মহলে জার্ম্মাণির জন্য টাকা ধার লইবার আয়োজন চলিতেছে।" লণ্ডনের টাকার বাজার যাচাই করিবার জন্য ষ্টিন্নেস্‌ বাহাল আছেন।

প্যারিসের 'ল্যিম্যানিতে' বোল্‌শেভিকপন্থী কমিউনিষ্ট দলের কাগজ। জার্ম্মাণির তারিফ করিয়া সম্পাদক লিখিতেছেন,—"ফরাসীরা বেয়াকুব। জার্ম্মাণিকে লড়াইয়ে হারাইয়া ফ্রান্স ভাবিয়াছিল জার্ম্মাণির বাজারগুলা তাহার দখলে আসিবে। অথচ ফল হইল উল্টা। ফ্রান্সেই আজকাল ফ্যাক্টরির দুয়ার বন্ধ। কিন্তু জার্ম্মাণি নবীন তেজে স্বদেশী আন্দোলন চালাইতেছে। ইতালী, স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা এবং বল্কান অঞ্চলে জার্ম্মাণ মাল হুহু করিয়া প্রবেশ করিতেছে। এমন কি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং ইংল্যাণ্ডের বাজারেও জার্ম্মাণ মালই বিক্রী হইতেছে।"

এই অবস্থার আলোচনা করিয়া 'ল্যিম্যানিতে' বলিতেছেন :— "জার্ম্মাণরা এত ফুলিয়া উঠিল কি করিয়া? জার্ম্মাণ মার্ক্‌ নেহাৎ শস্তা। এই জন্য বিদেশীরা জার্ম্মাণিতে সওদা করিতে ঝুঁকিয়াছে। এ কথা সত্য। কিন্তু ইহাই জার্ম্মাণির রপ্তানি-বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। পোল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রীয়ার মুদ্রাও যারপর নাই শস্তা। অথচ পোল্যাণ্ড

নয়। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, জগতে মাথা তুলিতে হইলে নানা প্রকার সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক। সেই সকল সদ্‌গুণের প্রভাবে জার্ম্মাণরা লড়াইয়ের পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সেই সকল সদ্‌গুণের জোরেই আজ জার্ম্মাণি লড়াইয়ে হারিয়াও বিজেতাদিগকে হঠাইতে চলিল।

চতুর্থ অধ্যায়

দুনিয়ার জার্ম্মাণ-সমস্যা

মার্ক্, পাউণ্ড ও ডলার

জার্ম্মাণিকে লড়াইয়ে হারাইয়া বিজেতারা জিতিয়াছে কি হারিয়াছে এখনো পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। "একস্য সর্ব্বনাশঃ, অন্যস্য তু পৌষমাসঃ"—এই বয়েৎ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে খাটে না।

বিলাতে আজকাল ত্রিশ লাখ মজুর বেকার বসিয়া আছে। ভারতীয় বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলন ইহার এক মস্ত কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু জার্ম্মাণির আর্থিক দুরবস্থাও বিলাতী দৈন্যের এক জনক। জার্ম্মাণ মার্ক্ বিলাতী পাউণ্ডের তুলনায় নেহাৎ নামিয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণদের চিন্তায় বিলাতী মাল খুব মাগ্‌গি। কাজেই জার্ম্মাণিতে বিলাতী মাল বিক্রী হওয়া কঠিন। আমেরিকায় বেকার মজুরদের সংখ্যা ষাট সত্তর লাখ। এখানেও জার্ম্মাণির উপর নজর পড়িতেছে। এমন কি, ফ্রান্সের আর্থিক দুর্গতিও জার্ম্মাণ দুর্গতির সঙ্গেই সংলগ্ন।

নিউইয়র্কের গারান্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী নামক ব্যাঙ্কের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট সিম্মন শিকাগো শহরের চেম্বার অব কমার্সে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তা বলিতেছেন:—"আমেরিকায় আজ এত লোক বেকার বসিয়া আছে কেন? ইয়োরোপের আর্থিক দুরবস্থাই মার্কিন সমাজের দুরবস্থার প্রধান কারণ। ইয়োরোপের টাকাকড়ি মার্কিন ডলারের তুলনায় এত নামিয়া গিয়াছে যে, কোনো ইয়োরোপীয় ব্যব-

যুক্তরাষ্ট্রের অগণিত ফ্যাক্টরিতে এখন কোনো কারবার চলিতেছে না। ইয়োরোপীয়ানদের মার্কিন মাল কিনিবার ক্ষমতা না বাড়িলে আমেরিকার দুরবস্থা ঘুচিবে না। কাজেই ইয়োরোপকে ধনে প্রাণে বাঁচানো আমেরিকার স্বার্থ।"

বর্ত্তমান কালে দুনিয়া এত ছোট ও পরস্পর-সম্বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, কোনো এক সমাজের ক্ষতি করিয়া অপর কোনো সমাজ উন্নত বা সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না। জগতের সকল দেশের লোককেই আর্থিক হিসাবে মজবুত রাখা প্রত্যেক জাতিরই স্বার্থ।

যুদ্ধে কোনো জাতিকে হারাইতে পারিলেই শেষ কিস্তী মাত হয় না। জার্মাণিকে হারাইয়া আবার জার্মাণিকে মজবুদ করিয়া তুলিবার জন্যও পুরাণা শত্রুরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। জার্মাণ মার্ক্‌কে পাউণ্ড ও ডলারের তুলনায় চড়াইয়া দিতে পারিলেই ইংরেজ ও ইয়াঙ্কিরা খুসী।

জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান বাণিজ্য-সন্ধি

ইতালীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীপ্রধান নিত্তি জার্ম্মাণির মুরুব্বি দাঁড়াইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন:—"জার্ম্মাণিকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। দেখিতেছ না ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণির গণ্ডগোলে গোটা ইয়োরোপই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে?" ইংল্যাণ্ডের 'উদারপন্থী' দলের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েন' কাগজ অনেক দিন হইতেই এই কথা বলিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ, এমন কি ফ্রান্সও এখন আর অবুঝ নন।

মাস দেড়েক হইল ইতালীয় গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণির সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধি পাতাইয়াছেন। আমদানি-রপ্তানি লইয়া উভয় দেশের মধ্যে কতকগুলি সুযোগ-বিনিময়ের ব্যবস্থা হইল।

এই সন্ধিতে বুঝিতে হইবে যে জার্ম্মাণি ...

মাত্র কাগজে কলমে পর্য্যবসিত। ইতালী ভার্সাইকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিলেন। ফ্রান্সের এবং ইংল্যাণ্ডের মত না লইয়াই ইতালীর গবর্মেণ্ট পুরাণা শত্রুর সঙ্গে দোস্তি পাতাইলেন।

ইতালীর বিরুদ্ধে ইংরেজরা কোনো হৈ চৈ চালাইতেছে না; কারণ, ইংল্যণ্ড নিজেই জার্ম্মাণির সঙ্গে বাণিজ্য প্রবর্ত্তন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। জার্ম্মাণ সমাজকে শত্রু বিবেচনা করিয়া চলিলে ইংরেজ শ্রমী আর ধনীদেরই স্বার্থহানি ঘটিবে।

এমন কি, ফ্রান্সও জার্ম্মাণিকে আর শত্রু বিবেচনা করিতে চাহেন না। এতদিন ফরাসী গবর্মেণ্ট কথায় কথায় লাঠির আওয়াজ শুনাইতেছিলেন। ক্রমশঃ ফ্রান্স বুঝিয়াছেন যে, নগদ সোনার টাকা দেওয়া জার্ম্মাণির ক্ষমতার অতীত। টাকার বদলে মাল দেওয়াই জার্ম্মাণির এক মাত্র উপায়। লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের কিছু অংশ স্বরূপ ফ্রান্স জার্ম্মাণির নিকট হইতে মাল লইতে রাজি হইয়াছেন।

হ্বীজবাডেন বনাম ভার্সাই

মে ও আগষ্ট মাসে (১৯২১) হ্বীজবাডেন শহরে যে ফরাসী-জার্ম্মাণ (লুশুর-রাটেনাও) সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই ধরণের বুঝা-পড়াই দেখা যায়। ফলতঃ, বলিতে পারি যে, ফরাসীরা নিজেই ভার্সাই সন্ধির কড়ারগুলা 'ধামা চাপা' দিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা না ভাবিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকার দিকে ফরাসী রাষ্ট্রনায়কদের ঝোঁক দেখা যাইতেছে। 'জুর্নাল,' 'পেতি পারিসিয়াঁ,' 'দেবা' ইত্যাদি কট্টর সমরপন্থী এবং 'ঘোরতর স্বদেশী' কাগজগুলাও লুশুরের 'যথা লভ্যম্' নীতিই মানিতে রাজি।

হ্বীজবাডেন সম্মেলনের শর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মাণ মজুরেরা উত্তর-

পারিবে। মোটের উপর প্রায় তিন লাখ বাড়ী তৈয়ারী করা দরকার। এই জন্য লোহালক্কড় আসবাব-পত্র যন্ত্র হাতিয়ার সবই জার্ম্মাণি হইতে চালান করা হইবে।

ভার্সাইয়ের কড়ার অনুসারে জার্ম্মাণির যত টাকা দিবার কথা আছে হ্বীজবাডেনের ফলে তাহার অনেক হিস্যা আপনা আপনিই রেহাই হইবার কথা। অধিকন্তু নগদ (সোনার) টাকা দিতে না হইলে জার্ম্মাণির মুদ্রা-সমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে। তাহাতে ইয়োরামেরিকার আমদানি-রপ্তানির বাজারও উন্নতির পথে উঠিতে থাকিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমরবিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের ভাঙ্গা-গড়া যত সহজ বিবেচনা করা হয়, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। শেষ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞানে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ইয়োরোপের হ্বীজবাডেন-নীতির ইহাই ভাবার্থ।

বিলাতী উদারপন্থীরা আরও চরম কথা বলিতেছেন। তাঁহাদের মতে জার্ম্মাণির নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী না করাই যুক্তিসঙ্গত। বেলজিয়ামের এবং ফ্রান্সের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর বাড়ী, পল্লী শহর, রাস্তা ঘাট আর খাল রেল-পথগুলা জার্ম্মাণরা যদি নয়া গড়িয়া অথবা মেরামত করিয়া দেয়, তাহাতেই ইয়োরোপের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যত শীঘ্র জার্ম্মাণির সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, জগতের পক্ষে ততই মঙ্গল। কেননা বেশী চাপাচাপি করিতে গেলে জার্ম্মাণি দেউলিয়া হইয়া রুশিয়ার অবস্থায় দাঁড়াইবে। তখন 'ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জ্জন!' কাজেই "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজন্তি পণ্ডিতাঃ"—শাস্ত্রের এই বচন অনুসারে ইংরেজ ধনবিজ্ঞানবিদেরা জার্ম্মাণির দেনা তামাদি ঘোষণা করিবার পক্ষপাতী।

১১ নবেম্বর ১৯২১

রাস্তায় আজ কাল দেখিতে পাই কেবল কালো বিকট মূর্ত্তি। শীত পড়িল। বারান্দায় সময় কাটানো কিছুকাল হইতেই বন্ধ হইয়াছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা এত বেশী যে সকালে উঠিয়া দেখি যে, ছাদ, মাঠ, রাস্তা, গাছ, সবই বরফে ঢাকা। নবেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বরফ পড়া বার্লিনে বিরল। শহরটা দেখাইতেছে মন্দ-না। অনেক দিন পরে আবার বরফের উপর কচ্‌কচাইয়া হাঁটা গেল।

আজ ১১ নবেম্বর (১৯২১)। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে আর্মিষ্টিস জারি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে জার্ম্মাণির সঙ্গে অন্যান্য শত্রুদের সন্ধি সহি করা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র ভার্সাইয়ের সন্ধিতে একমত হইতে পারেন নাই। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, ইত্যাদি মিত্ররাষ্ট্রের পথে না চলিয়া—মার্কিন সরকার এতদিন পরে একাকী (অর্থাৎ দলের ভিতর না ঢুকিয়া) জার্ম্মাণির সঙ্গে নয়া সন্ধি সহি করিলেন। কাগজে কলমে আজ জগৎ ভরিয়া মহালড়াইয়ের 'শান্তি' স্থাপিত হইল।

আজ আবার ইয়াঙ্কিস্থানের ফেডার্যাল-কেন্দ্র ওয়াশিংটন নগরে এক বিরাট আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন বসিল। এই সম্মেলনটাকে প্রকারান্তরে ভার্সাইয়ের সম্মেলন অপেক্ষা কোনো অংশে ছোট দরের বিবেচনা করিবার কারণ নাই।

দুনিয়ায় লড়াইয়ের আয়োজন এবং লড়াইয়ের খর্চা কমাইবার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনে এই আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক ডাকা হইয়াছে। কাজেই প্রত্যেক বড় দেশের হোমরা চোমরা রাষ্ট্রনায়কগণ কংগ্রেসে উপস্থিত। অধিকন্তু, প্রশান্ত মহাসাগরের চীনা-জাপানী-সমস্যা, মার্কিন-সমস্যা এবং ফরাসী-সমস্যা—এই চার পাঁচ প্রকার সমস্যার মীমাংসা

ওয়াশিংটনে ভার্সাইয়ের জের

বলিতে হইবে যে, ওয়াশিংটনের এই সম্মেলন ভার্সাইয়ের সন্ধিসম্মেলনেরই একখণ্ড ফাও বা জের-বিশেষ। গোটা দুনিয়ার কথাই প্রকারান্তরে এই কংগ্রেসে আলোচিত হইতে চলিল।

এশিয়ার অনেক কথা,—বিশেষতঃ চীনের কথা—ভার্সাইয়ে পরিষ্কার করা হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্র তথাকথিত 'লীগ অব নেশুন্‌স'কে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেছেন,—অধিকন্তু ভার্সাই সন্ধিকেও বেইজ্জদ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কাজেই দুনিয়ার অনেক কথাই যুক্তরাষ্ট্রের মতের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সেই সব কথাই অনেকটা খোলাখুলি আলোচিত হইবার সুযোগ ওয়াশিংটনে জুটিবার সম্ভাবনা।

আরও এক কথা। ভার্সাইয়ের পর পুরাণা আঁতাতের ভিতর গোলযোগ বাধিয়াছে। ইতালী, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড প্রায় কোনো বিষয়েই এখন একমত নন। এদিকে জার্ম্মাণিও আজকাল কোনো রাষ্ট্র-বিশেষের শত্রু নন। কাজেই রাষ্ট্রমণ্ডলে নয়া দলগঠনের সময় আসিয়াছে।

এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপে রুমেণিয়া, জুগোস্লাভিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়া,—এই তিন রাষ্ট্রের এক 'ছোট আঁতাত' চলিতেছে। পোল্যাণ্ডে ও চেকোস্লোভাকিয়ায় বাণিজ্য-সন্ধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের প্রভাব এড়াইয়া বনিয়াদি রাষ্ট্রসমূহ স্থির থাকিতে অসমর্থ। ওয়াশিংটনের কংগ্রেসে এই সমুদয়ের ছায়াও পড়িতে বাধ্য।

তুরস্ক ও গ্রীসের লড়াইয়ে ত ইতিমধ্যে ফ্রান্সে, ইংল্যাণ্ডে খোলাখুলিই মনোমালিন্য দেখা দিয়াছে। কাজেই ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জ চিত্ত স্থির রাখিবে কি করিয়া? রুশিয়াকে ইয়োরোপ ও আমেরিকা কোন্ ঠাঁইয়ে রাখিবেন, তাহার একটা আলোচনাও আবশ্যক।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের জাপানী-মিত্রতা কাগজে কলমে বজায় আছে বটে, কিন্তু এটা কতখানি টেঁকসই ? সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের আইরিশ, মিশরীয় ও ভারতীয় সমস্যাগুলা বিশ্ব-সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। লড়াইয়ের আয়োজন কমাইবার কংগ্রেসে বৃটিশসাম্রাজ্যের এই সব প্রশ্ন কোনো না কোনো আকারে দেখা দিবে নিশ্চয়।

মার্ক্-সমস্যা

এক মার্কিন ডলারে আজ পাওয়া যাইতেছে তিন শত জার্ম্মাণ মার্ক্, এক বিলাতী পাউণ্ডে এগার শত মার্ক। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যমণ্ডলে এই মার্ক্-সমস্যা অতি ভীষণ অবস্থায় আসিয়া পড়িতেছে। বলা বাহুল্য ওয়াশিংটনের কংগ্রেসে সমবেত ইংরেজ, জাপানী, ফরাসী, ইতালিয়ান এবং মার্কিন রাষ্ট্রনায়কগণ শয়নে, স্বপনে, নিশিজাগরণে এই জার্ম্মাণ-সমস্যাটা ভাবিবেনই ভাবিবেন। বস্তুতঃ মার্ক্-সমস্যা লইয়া শীঘ্রই একটা আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-সম্মেলন ডাকিবার কথা আমেরিকা হইতেই উঠিয়াছে।

ওয়াশিংটনে এক কথায় জগতের ছোট বড় সকল প্রশ্নই তোলা-পাড়া হইবে। রক্তারক্তির পর ভার্সাইয়ে ধরাতল ঠাণ্ডা করিবার প্রয়াস হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে চোখরাঙানি আর মেজাজ গরম করার প্রকোপই বেশী ছিল। আজ তিন বৎসর পরে অনেকটা ঠাণ্ডা মাথায় ধরাখানাকে যুক্তিতর্কের অধীনে আনিবার ব্যবস্থা হইল। পৃথিবী স্বর্গে উঠিলেন এরূপ ভাবিবার অবশ্য কারণ নাই।

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির গোড়ার কথা

ওয়াশিংটনের বাদানুবাদে নয়া নয়া আন্তর্জ্জাতিক দল গঠনের

গুপ্তভাবে এই অদল-বদল গড়িয়া উঠিবে। এই ভাঙ্গাগড়ার কর্ম্মকেন্দ্রে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎও গৌণভাবে কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে সন্দেহ নাই।

জগতের যেখানেই যখন একটা বড় গোছের হৈ চৈ চলুক না কেন, সেইখানেই তখন ভারত-সন্তানের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু-না-কিছু ঘটিবেই ঘটিবে। যুবক ভারত এই কথাটা স্বতঃসিদ্ধের মতন ধরিয়া লইলে সহজেই স্বকীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। যুবক-ভারতের স্থায়ী পররাষ্ট্র-নীতি গড়িয়া তুলিবার জন্য যাঁহারা অগ্রসর এই তত্ত্বই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম স্বীকার্য্য। বিদেশী হুজুগ ও হযবরল'র ভিতর নাক গুঁজিয়া রাখা ভারতবর্ষের পক্ষে বাজে কাজ করা নয়—সময় নষ্ট করা নয়—শক্তির অপব্যয় করা নয়। এই সমুদয় আন্তর্জ্জাতিক 'মহোচ্ছবের' 'গোলে হরিবোলে'র ভিতর ভারতীয় স্বরাজেরই অনেক স্রোত বহিয়া যাইতেছে।

পরাজয় কাহাকে বলে?

(১)

জার্ম্মাণিকে এখনো তাহার পুরাণা শত্রুরা বিশ্বাস করিতেছে না। অনেক সময়েই ইহাঁরা খোলাখুলি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন যে, জার্ম্মাণরা ভার্সাই সন্ধির শর্ত্ত মানিয়া চলিতেছে না।

ভার্সাইয়ের বিধানে জার্ম্মাণিকে যুদ্ধ-সামগ্রী এবং লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম তৈয়ারি করিবার কারখানাগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। সেই হুকুম না কি জার্ম্মাণরা আজও পূরাপূরি তামিল করে নাই। এমন কি শুনা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণরা অস্ত্র-শস্ত্রের ফ্যাক্টরিগুলাকে কৌশলে এক শহর হইতে আর এক শহরে সরাইয়া ফেলিতেছে। অধিকন্তু অনেক মামুলি ফ্যাক্টরিতে নাকি আজকাল লড়াইয়ের যন্ত্রপাতিই তৈয়ারি হইতেছে।

ওয়াশিংটনের বিশ্ব-মেলায় ফরাসী মন্ত্রী ব্রিআঁ স্পষ্টভাবেই এই সকল সন্দেহ রটাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, বার্লিনের কাগজে-কাগজে পড়িতেছি, ইংরেজ ও ফরাসী সমর-বিভাগের কর্ত্তারা আজ জার্ম্মাণির অমুক শহরের অমুক কারখানায় খানাতল্লাসি করিল; কাল আর এক শহরে যাইয়া ফ্যাক্টরির উপর তদারক বসাইল; ইত্যাদি।

খানাতল্লাসির কায়দাও বিচিত্র। কোনো ফ্যাক্টরির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দেখা হইতেছে, তাহার ভিতর কোনো মাল লুকানো আছে কি না। হাম্বুর্গ অঞ্চলের কোনো ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করিয়া জার্ম্মাণির ইংরেজ প্রভুরা বিনা বাক্যব্যয়ে কতকগুলা বড়-বড় কাচের আলোক-যন্ত্র হাতুড়ি পিটাইয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। কর্ত্তাদের মত:—"এই সকল বৃহদাকার আসবাব বড়-বড় মানোয়ারি জাহাজে কাজে লাগে। জার্ম্মাণির ত আজকাল রণতরী নাই। এই যন্ত্রগুলা জার্ম্মাণিতে আজও রহিয়াছে কেন?"

এই ধরণের সরকারী খানাতল্লাসি চলিতেছে হরদম। মিউনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টকে একবার জবাবদিহি হইতে হইয়াছে। তাঁহার আফিসে আসিয়া উপস্থিত ইংরেজ-ফরাসী কর্ম্মচারীর নিম্নরূপ কৈফিয়ৎ তলব:—"তোমার অধীনস্থ কলেজের ছাত্রেরা আজকাল অত্যধিক অনুশীলন-সমিতি গড়িয়া তুলিতেছে কেন? ব্যাভেরিয়ার লোকেরা গোপনে পল্টন তৈয়ারি করিতেছে বুঝি?" বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা-পত্র, ছাত্রদের নাম-ধাম ইত্যাদি লইয়া তোলাপাড়া চলিতেছে। ছোকরাদের ক্লাবের উপর বিজেতাদের নজর কড়া।

(২)

সরকারী খানাতল্লাসির উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া জার্ম্মাণ মজুরেরা আত্মরক্ষার এক নতুন পথ ধরিয়াছে। কিছুদিন হইল হ্বাইট্‌স্তার্ন্‌ গাণ্ডের

হইতেও প্রতিনিধি গিয়াছিল। তাহাদের অনুরোধে ইয়োরামেরিকার মজুর-প্রতিনিধিরা জার্ম্মাণির ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছে।

ব্যাভেরিয়ার বিভিন্ন শহরে এই সকল বিদেশী মজুরেরা কারখানা দেখিয়া বেড়াইতেছে। কলকব্জা, লোহা-লক্কড় ইত্যাদির পরীক্ষা চলিতেছে। যুদ্ধের সময়ে যে সকল কারখানায় লড়াইয়ের আসবাব তৈয়ারি হইত, সেই সকল কারখানাই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

পরীক্ষক মহাশয়েরা বুঝিতেছেন,—অথবা তাহাদিগকে বুঝানো হইতেছে যে, ভার্সাই সন্ধির শর্ত্ত সকল ক্ষেত্রেই মানিয়া চলা হইতেছে। পুরাণা লড়াইয়ের ফ্যাক্টরিগুলাকে ভাঙ্গিয়া শান্তির কারখানায় পরিণত করা হইয়াছে। আর, এই পুনর্গঠিত ফ্যাক্টরিতে লড়াইয়ের মাল একরত্তিও তৈয়ারি হয় না।

বিদেশী মজুররা দেখিয়া-শুনিয়া খুসী। জার্ম্মাণ মজুররা বলিতেছেঃ—"আমাদের ফ্যাক্টরিগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ফরাসী ও ইংরেজ সমর-নায়কেরা এত লালায়িত কেন জান, ভায়া? শিল্প-বাণিজ্যের বাজারে জার্ম্মাণিকে ঠুঁটা করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই বিজেতারা এই বে-আইনি চালাইতেছে। ইহারা জানে যে, জার্ম্মাণিতে লড়াইয়ের মাল আজকাল একদম তৈয়ারি হয় না। তথাপি গায়ের জোরে একটা সন্দেহ রটাইয়া—একটা যে-সে অছিলা দেখাইয়া, ইহারা আমাদের শিল্প-কেন্দ্রগুলাকে গুঁড়া করিয়া দিতে চায়।"

লণ্ডনের টাকার বাজার

জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট লণ্ডনের বাজারে ব্যাঙ্কারদের নিকট টাকা কর্জ্জ লইবার চেষ্টায় আছেন। কয়েক দিন হইল বিলাতী মহাজনরা জার্ম্মাণ রিপাব্লিককে জানাইয়াছেন:—"জার্ম্মাণ সরকার যদি জার্ম্মাণ জাতির ধন-সম্পত্তির [illegible]

জার্ম্মাণিকে টাকা ধার দিতে অগ্রসর হইতাম। কিন্তু জার্ম্মাণ নর-নারীর টাকা-কড়ির আসল মালিক জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট ন'ন। ভার্সাই-য়ের সন্ধির বিধানে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের খাজাঞ্চিখানা প্রকৃতপক্ষে বিজেতা রাষ্ট্রগুলার অধীন; অর্থাৎ বৃটিশ, ফরাসী, বেল্‌জিয়ান, ইতালিয়ান (এবং খানিকটা জাপানীও) গবর্মেণ্ট একত্রে জার্ম্মাণ রাজস্বের অনেকটা হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। যত দিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির রাজস্ব এইরূপে পরের অধীন থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত ইংরেজ ব্যাঙ্কারের দল জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টকে টাকা ধার দিবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবেন না।"

বুঝা যাইতেছে, ইংরেজ মহাজনরা বৃটিশ গবর্মেণ্টকেই আংশিকভাবে জার্ম্মাণির বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ বিবেচনা করিতেছেন। ভার্সাই সন্ধির কড়ারগুলা ইংরেজ সরকার যদি খানিকটা নরম করিতে রাজি না হ'ন, তাহা হইলে লণ্ডনের টাকার বাজারে জার্ম্মাণ রিপাব্লিককে বিশ্বাস করা চলিবে না।

জার্ম্মাণ কারখানায় আঁতাঙ্কের হামলা

ইংরেজ ও ফরাসী সমর-বিভাগের কর্ত্তারা জার্ম্মাণির ফ্যাক্টরিগুলা যখন-তখন খানাতল্লাসি করিয়া ফিরিতেছেন। রাইখ্‌ষ্টাগের বক্তৃতায় জার্ম্মাণ মন্ত্রী-প্রধান হ্বির্ট খানাতল্লাসির অভিযানগুলাকে খাঁটি লুট-পাটের তাণ্ডবরূপে বর্ণনা করিলেন। বহু সংখ্যক বড়-বড় কারখানা কর্ত্তাদের খেয়াল মাফিক ধূলিসাৎ হইতেছে। অগণিত মূল্যবান্ যন্ত্র, হাতিয়ার, কলকব্জা ইত্যাদিও এই সমুদায় 'নাদিরশাহী' দৌরাত্ম্যে চূরমার হইয়া গিয়াছে।

রাসায়নিক কারখানাগুলার দিকেই ইংরেজ ও ফরাসী সেনাপতিদের নজর বেশী। এই ধরণের লুটের অভিযানের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ

রাসায়নিক, কর্ম্মকর্ত্তারা এবং মজুরেরাও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মাইন দরিয়ার উপর অবস্থিত ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে মজুরদের এক বিরাট সভা বসিয়াছিল। এই সভায় মিত্রশক্তির অত্যাচার কাহিনী এবং জুলুমের প্রতিবাদ অতি তীব্র ভাষায় করা হইয়াছে। ফ্যাক্টরিগুলার সর্ব্বনাশ হইলে, প্রায় এক লাখ জার্ম্মাণ মজুর বহু দিন ধরিয়া 'ভাতে কাপড়ে' মরিবে। ইহাতে ইংল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের সুখী হইবারই কথা; কেন না, লাখ-লাখ লোক এই দুই দেশে কর্ম্মাভাবে বেকার বসিয়া আছে। অধিকন্তু এই দুই দেশের ধনী মহাজনরা জার্ম্মাণিকে শিল্পে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, খোঁড়া করিয়া রাখিতে সচেষ্ট। ইহার নাম সামরিক লুট-পাটের 'আর্থিক ব্যাখ্যা'। অর্থাৎ লড়াইয়ের পেছনে টাকার ধাক্কা।

অবাধ বাণিজ্য নীতি

জার্ম্মাণির সাম্রাজ্য-পিপাসা এখনো মিটে নাই। অনেক রাষ্ট্রনায়ক আজও পুরাণা জার্ম্মাণ উপনিবেশগুলা ফিরাইয়া পাইবার আশা রাখে। অন্ততঃ পক্ষে এশিয়াকে ইয়োরোপ ও আমেরিকার কব্জায় রাখিবার জন্য বহু জার্ম্মাণ নর-নারী আজও বিশেষ উদ্যোগী।

কিছুদিন হইল ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে জার্ম্মাণরা এক 'অবাধবাণিজ্য'-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছে। বিলাতী কবডেন-প্রবর্ত্তিত মত অনুসারে ইহারা শুল্ক-বিহীন আমদানি-রপ্তানির ব্যবস্থা করিবেন। জার্ম্মাণির প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক লুজো ব্রেণ্টানো এই সঙ্ঘের প্রথম সভায় বলিয়াছেন:—"বিদেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য আমদানি না করিলে, জার্ম্মাণ মজুর-চাষীরা স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে পারিবে না। আবার জার্ম্মাণির কারখানাগুলির জন্যও বিদেশ হইতে কুদরতি (কাঁচা) মাল প্রভৃ

শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়ানো আমাদের নেহাৎ দরকার। কাজেই যথাসম্ভব বিনা শুল্কে ব্যবসা চালাইবার ব্যবস্থা করা আমাদের সর্ব্বপ্রধান স্বার্থ বিবেচিত হওয়া উচিত।"

ব্রেন্টানোর এই যুক্তিতে কিছু নূতনত্ব নাই। কিন্তু তাঁহার পেটের ভিতর কতকগুলা জবর কথা বিরাজ করিতেছে। সেই সমুদায়ের সার মর্ম্ম এই :—"অবাধ-বাণিজ্য স্থাপিত হইলে ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান শাদা চামড়াওয়ালা নর-নারীর ভিতর বন্ধুত্ব গজাইতে থাকিবে। এই বন্ধুত্বের আসরে জার্ম্মাণির ডাক পড়া চাই। তাহা না হইলে দুনিয়ায় শ্বেতাঙ্গ নর-নারীর প্রভুত্ব বজায় থাকিবে না।"

আঁতাঁতের সন্দেহ

বিজেতা গবর্মেণ্টগুলার হুকুম তামিল করিয়া জার্ম্মাণ রিপাব্লিক ডাক-মাশুল বাড়াইয়াছে। রেল ভাড়া, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের মাশুল এবং সাধারণ ট্যাক্স বাড়াইয়াছে। মাল আমদানি-রপ্তানির উপর চড়া কর চাপাইয়াছে। চীনের গবর্মেণ্ট যেমন দুনিয়ার প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অধীনে এবং তত্ত্বাবধানে শাসন-কার্য্য চালাইয়া থাকে, জার্ম্মাণ সরকারকেও অবিকল সেইরূপ পরাধীনতায় ভুগিতে হইতেছে। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের প্রত্যেক সরকারী বহি, প্রত্যক হিসাব-নিকাশের খাতা, প্রত্যেক ডায়েরী যে-কোনো মুহূর্ত্তে ইংরেজ বা ফরাসী কর্ম্মচারী তলব করিবার অধিকারী।

জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট আমদানি-রপ্তানির মাসিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বা তথ্য-তালিকা ছাপাইয়া থাকে। এই তালিকা পাঠ করিয়া ফরাসী কর্ম্মচারীরা বলিতেছেন :—"জার্ম্মাণ রিপাব্লিক সকল তথ্য সত্য ভাবে প্রকাশ করেন নাই।" জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীদিগকে মিথ্যাবাদী, শঠ ও প্রবঞ্চক বলিয়া ফরাসী কাগজে গালাগালি করা হইতেছে।

ফরাসীরা প্রায়ই বলিয়া থাকে—"জার্ম্মাণরা আছে সুখে; ফরাসী জাতি কষ্টে দিন কাটাইতেছে।" তাহার উত্তরে জার্ম্মাণ কাগজওয়ালারা বলিতেছেন :—"বার্লিনের বড় বড় থিয়েটারে, রেষ্টরাণ্টে, কাফেতে, হোটেলে এবং দোকান-ঘরে যে সকল বিলাসী নর-নারী দেখা যায়, তাহার শতকরা ৭৫ জন বিদেশী। খাঁটি জার্ম্মাণ মধ্যবিত্ত লোক আলু ও রুটিমাত্র খাইয়া কালাতিপাত করে।"

ইংরেজের খোসামোদ

(১)

ইংরেজের খোসামোদ করা প্রত্যেক জার্ম্মাণ কাগজেরই স্বধর্ম্ম দেখিতেছি। যে-কোনো জার্ম্মাণ সভা-সমিতিতেও ইংরেজকে 'হাতে' রাখিবার আন্দোলন দেখিতে পাই। একমাত্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণির নর-নারী আজ-কাল "কায়েন মনসা বাচা" প্রতিহিংসা পুষিতেছে। ইংল্যাণ্ডকে মিত্র বিবেচনা করা জার্ম্মাণ সমাজের প্রায় প্রত্যেক জাতেরই সাধারণ লক্ষণ বলা যাইতে পারে। এমন কি, যে দু-একটা রাষ্ট্রীয় দল ইংরেজ-বিরোধী তাহাদের ভিতরও অনেক লোক ব্যক্তিগত ভাবে ইংরেজের স্বপক্ষেই মত গড়িয়া তুলিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প।

বস্তুতঃ, যত দিন পর্য্যন্ত রাইন জনপদ বিজেতাদের অধীনে—বিশেষতঃ ফ্রান্সের তাঁবে—থাকিবে, তত দিন জার্ম্মাণরা ইংরেজের খোসামোদ করিয়া কোনো মতে জগতে মাথা খাড়া করিবার চেষ্টা করিবে। ইংল্যাণ্ডের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া জার্ম্মাণির "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেয়নায়।" যে ইংল্যাণ্ডের বিশ্ব-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ফোন্ টির্পিট্স্ জার্ম্মাণিকে সাধের লড়াই-তরণী উপহার দিয়াছিলেন, যে ইংল্যাণ্ডের অতি-বৃদ্ধি সহিতে না পারিয়া গোটা জার্ম্মাণি একদিন দুনিয়াখানাকে উত্তম-পুস্তম করিবার জন্য নিঃশব্দে এবং সশব্দে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল,

সেই ইংল্যাণ্ডেরই চরণ-সেবা করিয়া কম-সে-কম পনর বৎসর কাল জার্ম্মাণি জীবন ধারণ করিতে বাধ্য।

দলে-দলে বিলাতের লোক জার্ম্মাণির ভিন্ন-ভিন্ন শহরে আসিতেছে। পর্য্যটকদিগকে জার্ম্মাণ-সমাজের সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। জার্ম্মাণ কাগজে ইংরেজি-সাহিত্য সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা ছাপা হইতেছে। ইংরেজের খাতির যেখানে-সেখানে চোখে পড়ে।

(২)

বিলাতী ধনবিজ্ঞানবিদেরা অনেকেই জার্ম্মাণির বন্ধু সাজিয়াছেন। জার্ম্মাণিকে পুনরায় দুনিয়ার বাজারে-বাজারে কেনা-বেচা করিবার সুযোগ দিবার জন্য বহু ইংরেজ পণ্ডিত তুমুল আন্দোলন চালাইতেছেন। ইঁহারা জার্ম্মাণ মার্কের দর আন্তর্জাতিক টাকার বাজারে বাড়াইয়া দিতে সচেষ্ট।

হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম শহরে অবাধ-বাণিজ্য-সঙ্ঘের এক সভা বসিয়াছিল। তাহাতে এক ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"লড়াইয়ের ক্ষতি-পূরণের বাবদ জার্ম্মাণির নিকট টাকা চাওয়া বেয়াকুবি। ইহাতে জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা দিন-দিন অধোগতির দিকে যাইতেছে।

"মার্কের দর এত কম যে, জার্ম্মাণরা এখন আর বিলাতী মাল খরিদ করিতে পারে না। অতএব লড়াইয়ের দেনাপাওনা তামাদি বিবেচনা না করিলে দুনিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইবে না।"

এই সকল মত প্রচার করিবার জন্য যাঁহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন—তাঁহাদের ভিতর অনেকেই অবাধ-বাণিজ্যপন্থী। অর্থাৎ অবাধ-বাণিজ্য মতের পশ্চাতে কাজ করিতেছে বিলাতী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ। জগতের অধিকাংশ তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত মতগুলা এই ধরণের কোনো না কোনো স্বর্থের দ্বারা গঠিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

জার্ম্মাণি ১৯২২

কান সম্মেলন

বিগত নবেম্বর মাসে ওয়াশিংটন সম্মেলনের সম-সমকালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জার্ম্মাণির সন্ধি কাগজে-কলমে সহি হইয়াছে। দুই দেশে প্রতিনিধি-বিনিময়ের ব্যবস্থা হইতেছে। ১ জানুয়ারি (১৯২২) বার্লিনে বিদেশী রাষ্ট্রদূতেরা জার্ম্মাণ রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট এবার্টের সঙ্গে এক জোটে আসিয়া মোলাকাৎ করিলেন। মুখপাত্র ছিলেন রোমান ক্যাথলিক্ সমাজের কর্ত্তা পোপের প্রতিনিধি।

ফ্রান্সের কান নগরে এক আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসিল। সেখানে জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপ রাটেনাও হাজির হইবার এক্তিয়ার পাইয়াছেন। অধিকন্তু সাব্যস্ত হইল, ইতালীর জেনোআ নগরে যে বিপুল আর্থিক সম্মেলন বসিবে, সেই সভায় দরবারী কায়দায় জার্ম্মাণি, এবং অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারি, বুলগেরিয়া, আর রুশিয়াও নিমন্ত্রিত হইবেন। পরাজিত জার্ম্মাণি আর বেশী দিন জগতে 'এক-ঘরে' থাকিবে না।

জার্ম্মাণিকে জাতে তুলিবার জন্য ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স দায়ে পড়িয়াছেন। ইংল্যাণ্ডে প্রায় আঠারো লাখ মজুর বেকার বসিয়া আছে। এই মজুরদিগকে বৃটিশ গবর্মেণ্ট প্রতিদিন টাকা সাহায্য করিতে আইনতঃ বাধ্য। এই খরচের পরিমাণ এত বেশী যে, ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইংল্যাণ্ড জার্ম্মাণির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য যত টাকা পাইবে, তাহাতেও এখনকার এক বৎসরের

অপর দিকে ফ্রান্সের দুরবস্থাও অসীম। ফরাসী ফ্যাক্টরিতে যে সমুদায় মাল উৎপন্ন হয়, সেই সমুদায় মাল জার্ম্মাণি না কিনিলে, ফ্রান্সের উদ্ধার নাই। অথচ জার্ম্মাণ মার্ক এত নামিয়া গিয়াছে যে, জার্ম্মাণির পক্ষে ফরাসী মাল খরিদ করা অসাধ্য। কাজেই ফ্রান্সে আর ফ্যাক্টরিতে কাজ চলিতেছে না। ফরাসী মজুরেরা বেকার।

কিন্তু ফ্রান্সে বেকারের সংখ্যা কাগজে-কলমে বেশী দেখা যায় না কেন? ফরাসী-সমাজে বেশী লোকে বেকার থাকিলে শীঘ্রই ফ্রান্সে 'গদ্দর' দেখা দিবে। সেই বিপ্লবের ভয়ে ফরাসী-গবর্মেণ্ট দশ লাখ লোককে পণ্টনে চাকুরি দিয়া ভরণপোষণ করিতেছেন।

জার্ম্মান থিয়েটার

জার্ম্মাণির থিয়েটারে-থিয়েটারে সঙ্গীতের মারফৎ "অতীত গৌরব-বাহিনী বাণী" প্রচারিত হইতেছে। যে সকল নাটকে পুরাণা জার্ম্মান নরনারীর বীরত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, বার্লিন এবং অন্যান্য শহরের রঙ্গালয়ের কর্ম্মকর্ত্তারা প্রায়ই সেই সমুদায়ের পালা সাজাইয়া থাকেন। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি ফুটাইয়া তুলিবার দিকে ম্যানেজারদের লক্ষ্য দেখিতে পাই।

এই প্রকার নাটকে প্রাচীন জার্ম্মাণির বীরপুরুষগণের কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব প্রকটিত হয়। আর এক প্রকার নাটকে নেপোলিয়ান ইত্যাদি যথেচ্ছাচারী "সয়তান"-নরপতির পতন দেখানো হয়। দাঁতোঁ ইত্যাদি ফরাসী বিপ্লবনায়কগণের জীবনের তারিফ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলা অভিনয় চলিতেছে। অধিকন্তু, জার্ম্মাণির মোটা-মোটা ঐতিহাসিক ঘটনাগুলাও রঙ্গমঞ্চে ফুটাইয়া তোলা হইতেছে।

[illegible] স্থাপিত থিয়েটারের পালাগুলা জার্ম্মাণ

আমোদ-প্রমোদের ভবন বিবেচনা না করিয়া, একপ্রকার দর্শন-বিদ্যালয় বা ধর্ম্ম-গৃহ বলা চলে।

এখানে কোনো রাত্রে প্রাচীন গ্রীক নাটক অভিনীত হয়। তাহাতে জার্ম্মাণরা 'দৈব', ঐশ্বরিক শক্তি ইত্যাদি অতিমানব ক্ষমতার সংস্পর্শে আসিতে পায়। বাধা-বিঘ্ন ও বেদনার দরিয়ায় স্নান করিয়া দর্শকমণ্ডলী চিত্ত দৃঢ় করিতে অভ্যস্ত হইতেছে।

গ্যেটের 'ফাউষ্ট' চিরকালই জার্ম্মাণদের আদরের বস্তু। 'ফাউষ্টে'র গণ্ডা-গণ্ডা নয়া সংস্করণ যখন-তখন বাহির হইতেছে। আজও জার্ম্মাণ নরনারী গ্যেটের পালা দেখিয়া মানব-জীবনে 'অসৎ' প্রবৃত্তির দাম যাচাই করিয়া লইতেছে।

শক্তি,—সংগ্রামের শক্তি—সুশক্তি—কুশক্তি—এক কথায় শক্তি-যোগ যে-যে চরিত্রে পূরামাত্রায় পরিস্ফুট, সেই সব চরিত্র পরাজিত জার্ম্মাণির রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বদাই হাজির হইয়া থাকে। শেক্সপীয়ারের শক্তিধরগণ—লিয়ার, সীজার, ম্যাকবেথ, ক্লিওপেট্রা ইত্যাদিও—জার্ম্মাণ থিয়েটারে প্রায়ই দেখা দিতেছে।

ইবসেন, ষ্ট্রিণ্ডব্যার্গ ইত্যাদি স্কাণ্ডিনাভিয় নাট্যকারের রচনা জার্ম্মাণ সমাজে খুব চলে। এই সকল রচনায় জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ মানব-চিত্তের স্বাধীনতা এবং সময়ে সময়ে সমাজবিদ্রোহী ভাবুকতার স্বাদ পাইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, বিদেশী নাট্যকারের রচনাই হউক, অথবা বিদেশী সমাজের চরিত্রাঙ্কনই হউক,—জার্ম্মাণরা সবই জার্ম্মাণ ভাষায় পায়। থিয়েটারে গোটা দুনিয়া আসিয়া হাজির হয়—মায় ভারতের 'ঠাকুর' পর্য্যন্ত। সবই আসে অবশ্য খাঁটি আপনার জন ভাবে,—বিদেশী 'অতিথি' মাত্র রূপে নয়। জার্ম্মাণরা চিরকালই এই ধরণে 'বাহির'কে 'ঘরে' ঠাঁই দিয়া আসিতেছে। ইহাতে জার্ম্মাণির স্বদেশী

ভাঙিয়া যায় নাই,—বরং নিরেট ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া মজবুদই হইয়াছে।

জার্ম্মাণ মজুরদের 'স্বরাজ'-বিধি

বোলশেভিকদের 'ধনসাম্য' মত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে কবে, তাহা কেহই জানে না। কিন্তু জার্ম্মাণির মজুর-সম্প্রদায় এখনই, অর্থাৎ 'বুর্জোআ' ধনিক মহাজনদের আমলেই,—অনেক আর্থিক অধিকার ভোগ করিতেছে।

১৯১৮ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে জার্ম্মাণির মজুর ও মহাজন সম্প্রদায় একত্র মিলিয়া এক পরিষৎ গঠন করিয়াছেন। সেই পরিষৎ পরিশ্রম-সংক্রান্ত সকল নিয়ম জারি করিয়া থাকেন।

এই পরিশ্রম-পরিষদের বিধানে শ্রমীদের এক্তিয়ার ধনীদের এক্তিয়ারেরই সমান। প্রত্যেক ফ্যাক্টরির কাজ এক-একটা সমিতির অধীনে পরিচালিত হয়। সেই সকল সমিতিতে মজুর এবং ধনী উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকে;—গুণ্‌তিতে তাহারা সমানও বটে। মজুরের ভোট-সংখ্যা ধনীদের ভোট-সংখ্যারই সমান। কাজেই বলা যাইতে পারে,—পরাজিত জার্ম্মাণির আবহাওয়ায় ইতিমধ্যেই 'মজুর-স্বরাজ' অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

পরিশ্রম-পরিষদের প্রবর্ত্তিত মজুর-স্বরাজগুলা জার্ম্মাণ রিপাব্লিক কর্ত্তৃক আইন-সঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমগ্র জার্ম্মাণির জন্য এক বিপুল পরিষৎ স্থাপিত হইল। এই 'ফেডার্যাল' বা সর্ব্ব-জার্ম্মাণ পরিষদেও মজুরের ক্ষমতা ধনীদের ক্ষমতার সমান। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য,—আর্থিক জীবনের কোনো বিভাগই এই ফেডার্যাল

রাইন-জার্ম্মাণদের গোলামী

জার্ম্মাণির রাইন-প্রদেশ আর্মিষ্টিসের সময় হইতে বিজেতাদের অধীনে শাসিত হইতেছে। এই অঞ্চলে আর বৃটিশ-শাসিত ভারতে এক প্রকার কোনো প্রভেদ নাই বলা যাইতে পারে।

এই পরাধীন জার্ম্মাণিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিবার জন্য ইংরেজ এখানে ৪০০০ ফৌজ রাখিয়াছেন। আমেরিকার ফৌজ সংখ্যা ১২,০০০। বেলজিয়ামের ফৌজ খাটিতেছে ১৫,০০০। ফ্রান্সের ফৌজ সংখ্যা ৮৫,০০০। ফরাসী পল্টনের ভিতর ২০,০০০ আল্‌জিরিয়ান, টুনিসবাসী, মরক্কান, মাডাগাস্কার দ্বীপের লোক এবং আনামী,—অর্থাৎ আফ্রিকান এবং এশিয়ান,—দেখিতে পাওয়া যায়।

রাইনজনপদের জার্ম্মাণদিগকে অস্ত্রহীন করা ত হইয়াছেই,—তাহাদের বড় বড় হোটেল, থিয়েটার, সিনেমা, টেনিস খেলার মাঠ, ইস্কুল এবং বসতবাড়ীও বিজেতাদের হুকুমে বিদেশী ফৌজের আরামের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

ডিস্‌সেলডর্ফ শহরের পাঠশালাগুলা বিদেশী পল্টনের বারাকে পরিণত হইয়াছে। হ্বীজবাডেন শহরেও প্রত্যেক দশটার ভিতর সাতটা ইস্কুলে বিজেতাদের পল্টন অথবা আফিস অবস্থিত। অয়স-কির্খেন নামক এক ক্ষুদ্র শহরে ১৪,৫০০ জার্ম্মাণের বাস। এই শহরের লোকেরা প্রায় ৩,০০০ সৈন্যকে ঘর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।

জার্ম্মাণরা নিজ নিজ খবরের কাগজে স্বাধীনভাবে কোনো খবর ছাপিতে পারে না। বিজেতারা তাহাদের নিজ নিজ হুকুম ছাপিবার জন্য বড় বড় জগৎপ্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্রকে বাধ্য করিয়া থাকে। 'ফ্রাঙ্কফুর্টার ৎসাইটুং'

জার্ম্মাণির ভিতর আসিতে দেওয়া হয় না। এই অঞ্চলের জার্ম্মাণরা স্বাধীনভাবে গান পর্য্যন্ত গাহিতে পারে না। সভাসমিতি করা অথবা রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনায় যোগ দেওয়া কাহাকে বলে জার্ম্মাণরা ভুলিয়া গিয়াছে। উঠিতে বসিতে বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের হুকুম তামিল না করিয়া জার্ম্মাণদের উপায় নাই। বড় বড় শহরের পুরাণা জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীরা বিনা বিচারে বরখাস্ত হইতেছে। কোনো ব্যক্তিই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস করে না।

ইংল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণি

(১)

লয়েড জর্জ্জ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"অনেক ইংরেজ জার্ম্মাণির বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছেন যে, জার্ম্মাণদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবার দরকার নাই। আমি এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। যুদ্ধে যে সকল ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য জার্ম্মাণি দায়ী। জার্ম্মাণরা স্বেচ্ছায় ঐরূপ পাপ কার্য্য করিয়াছে। সেই পাপের ফল জার্ম্মাণিকে ভুগিতেই হইবে!"

এই কারণে ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম যে-যে বিষয়ে জার্ম্মাণিকে জব্দ করিতে চাহেন ইংল্যাণ্ডও সেই সেই বিষয়ে মিত্ররাষ্ট্রদের সঙ্গে এক-মত। জার্ম্মাণির সামরিক শক্তি বিশ পঁচিশ বৎসরের জন্য সমূলে ধ্বংস করা এবং জার্ম্মাণদের শিল্পকারখানাগুলাকে খানিকটা ঠুঁটা করা—এই দুই কাজে ইংরেজ মন্ত্রিপ্রধান যারপর নাই অগ্রসর। এই জন্যই শিল্পপ্রধান সিলেশিয়া প্রদেশ জার্ম্মাণদের অধিকার হইতে কাড়িয়া লইয়া পোল্যাণ্ডের হাতে দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই রাইন জনপদে জার্ম্মাণিকে গোলাম রাখিবার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড পুরাপুরি

এদিকে ইংল্যাণ্ডে লয়েড জর্জ্জের বিরুদ্ধে গ্রে দল পাকাইতেছেন। গ্রে প্রধান সচিব হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জার্ম্মাণি সম্বন্ধে গ্রের নীতি লয়েড জর্জ্জের নীতিরই মাসতুত ভাই। গ্রে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের একটা দীর্ঘকালব্যাপী বন্ধুত্বের পক্ষপাতী। ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স মিলিয়া যাহাতে জার্ম্মাণিকে শিল্পে ও সমরে কাবু করিতে পারে, তাহার জন্য গ্রে মাথা ঘামাইয়া থাকেন। যুদ্ধের সময়ে গ্রে ছিলেন বিলাতী পর-রাষ্ট্রসচিব।

ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক নীতি খোলাখুলি জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যাইতেছে। তাহা সত্ত্বেও জার্ম্মাণ সমাজের অনেক লোককে আজকাল ইংরেজ জাতির বন্ধু দেখিতেছি। ইহারা বিবেচনা করে যে, ইংরেজেরা জার্ম্মাণির হিতৈষী। ইংরেজের বিরুদ্ধেই যে জার্ম্মাণরা লড়িয়াছিল এবং ইংরেজের নৌবলে এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতায় অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের দরুণই যে জার্ম্মাণির সর্ব্বনাশ হইয়াছে—একথা বহু জার্ম্মাণ নরনারী দুই তিন বৎসরের ভিতর ভুলিয়া গিয়াছে।

(২)

এই অদ্ভুত চরিত্র-পরিবর্ত্তনের কারণ কি? প্রথমতঃ, বৃটিশ সাম্রাজ্যের শিল্প, বাণিজ্য, জাহাজ এবং উপনিবেশ বিপুল। এই গুলার সাহায্য না পাইলে জার্ম্মাণি কোনো দিনই জগতে খাড়া হইতে পারিবে না। এই জন্য ইংরেজের পায়ে তেল দেওয়া এবং ইংরেজের খোসামোদ করা বিচক্ষণ জার্ম্মাণরা বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করিতেছে। ইংরেজেরা জার্ম্মাণিকে বন্ধু বলুক বা না বলুক, জার্ম্মাণরা গায়ে পড়িয়া ইংরেজের খোসামোদ করিবেই করিবে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনো কারণ দেখি না।

দ্বিতীয় কথা,—ইংল্যাণ্ড যেমন ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণিতে শত্রুতা বাধাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট, জার্ম্মাণিও সেইরূপ ফ্রান্সে ও ইংল্যাণ্ডে শত্রুতা

সৃষ্টি করিতে প্রাণপণ করিতেছে। ইহা মামুলি কৌটিল্য-নীতি। কোনো দুই বড় দেশে বন্ধুত্ব থাকা কোন বড় তৃতীয় দেশের স্বার্থ নয়। জার্ম্মাণি জানে ফ্রান্স কোনো মতেই জার্ম্মাণির মিত্র হইতে পারে না। ফ্রান্স জার্ম্মাণির সংলগ্ন দেশ। রাইন জনপদ লইয়া ফ্রান্সে জার্ম্মাণিতে হাজার বৎসর ধরিয়া ঝগড়া চলিতেছে। কাজেই ফরাসীতে আর ইংরেজে ঝগড়া অথবা আড়াআড়ি কায়েম করিয়া রাখা জার্ম্মাণির প্রবল স্বার্থ। এই জন্যই জার্ম্মাণরা ইংরেজকে তোয়াজ করিতে ছুটিয়াছে,—ইংরেজ যদিও জার্ম্মাণকে বিশেষ সম্মান করিতেছে না।

তৃতীয় কথা,—আজকাল ইংল্যণ্ডের আর্থিক অবস্থা খানিকটা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। মিশর এবং ভারতবর্ষের বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ইংরেজ সওদাগরকে বিশেষ কাবু করিয়াছে। শহরে শহরে আজকাল ইংরেজ মজুর বেকার বসিয়া আছে। অধিকন্তু, বিলাতী পাউণ্ডের দর ইংরেজের পক্ষে যারপরনাই অনিষ্টকারক। তাহাতে ইংরেজের ব্যবসা একদম মারা যাইবার সম্ভাবনা। বিলাতী মজুর-সমস্যা এবং পাউণ্ড-সমস্যা অর্থাৎ শিল্প-সমস্যা এবং বাণিজ্য-সমস্যা—দুইই ইংরেজকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। এই দুই সমস্যার কিনারায় আসিতে হইলে ইংরেজকে এমন কতকগুলা কাজ করিতে হইবে যাহাতে জার্ম্মাণের অনেক সুবিধা ও লাভ হয়। ইংরেজ নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য দায়ে পড়িয়া জার্ম্মাণির স্বপক্ষে এক আর্থিক নীতি অবলম্বন করিতেছেন। এই জন্যই জার্ম্মাণরা ইংরেজকে জার্ম্মাণ-বন্ধুরূপে প্রশংসা করিতেছে। ইতালীর জেনোআনগরে যে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন বসিবে তাহাতে ষোল আনা ইংরেজের লাভ। অথচ তাহাতে জার্ম্মাণের কথঞ্চিৎ উপকার হইবে আশা করা যায়। কাজেই ইংরেজের নীতিকে প্রশংসা করা জার্ম্মাণির পক্ষে অতি স্বাভাবিক।

শিল্প-সঙ্ঘের বিরাট বপু

জার্ম্মাণিতে শিল্প-কারখানার প্রভাব এক নব্য আকারে দেখা দিতেছে। ছোট ছোট ফ্যাক্টরির মালিকেরা দল বাঁধিয়া বড় বড় ফ্যাক্টরি-সঙ্ঘ গড়িতেছে। এই ধরণের বৃহদাকার শিল্প-পরিষৎ বা ব্যবসায়-মণ্ডলীকে 'ট্রাষ্ট' বলে।

জার্ম্মাণ সমাজে যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত 'ট্রাষ্ট' জাতীয় যৌথ কারবার অল্প পরিমাণে ছিল। জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ ছোট ছোট স্ব-স্ব-প্রধান ব্যক্তিগত কারবার পছন্দ করিত। কিন্তু সম্প্রতি নানা কারণে জার্ম্মাণ ব্যাপারীরা দল বাঁধা সুরু করিয়াছে। জার্ম্মাণ কারখানাগুলার সঙ্ঘ-গড়ার ঝোঁক দেখিয়া ইংল্যণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের ধনী মহাজনেরা ভীত হইয়া উঠিতেছে।

এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে জার্ম্মাণ রাষ্ট্র এক্ষণে নির্ব্বাসিত। জার্ম্মাণির অধীনে আজ কাল কোনো উপনিবেশ শাসিত ও শোষিত হইতেছে না। কাজেই 'কুদ্‌রত্তি মাল' সম্বন্ধে জার্ম্মাণিকে এখন অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। অধিকন্তু রাইন প্রদেশ এবং সিলেশিয়া—এই দুই অঞ্চলে জার্ম্মাণির কোনো এক্তিয়ার নাই। তাহার ফলে এই সকল স্থানের শিল্প-সম্পদ জার্ম্মাণদের হাতছাড়া হইয়াছে। এই অবস্থায় জার্ম্মাণ মহাজনরা ঘরোআ কামড়া কামড়ি বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহারা বুঝিয়াছে যে, ক্ষুদ্র দলাদলি ছাড়িয়া বিপুল সঙ্ঘ গড়িয়া না তুলিলে জার্ম্মাণ সমাজ টিকিতে পারিবে না।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মাণি প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী।

হারে নয়া নয়া ট্যাক্স বসাইয়া জার্ম্মাণি টাকা তুলিতেছে। বলা বাহুল্য, এই ট্যাক্সের চাপ প্রধানতঃ শিল্পী, মহাজন, ব্যবসায়ী এক কথায় ধনী-সম্প্রদায়ের ঘাড়ে পড়িতেছে। ছোট খাটো কারখানার মালিকেরা এত বেশী খাজনা দিতে অসমর্থ। সকলে একত্রভাবে কোম্পানী খাড়া করিলে ব্যবসায়ে লাভ বেশী হয়, সঙ্গে সঙ্গে গবর্মেণ্টকে বেশী খাজনা দিবার ক্ষমতাও জন্মে। তাই দায়ে পড়িয়া জার্ম্মাণরা ট্রাষ্ট গড়িতে বাধ্য হইয়াছে।

একটা দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই চোখে পড়িতেছে। ভার্সাই-কাণ্ডের পর হইতে জার্ম্মাণিতে কয়লার খুব টানাটানি। কিন্তু প্রত্যেক কারখানায়ই কয়লার দরকার। কাজেই সকল ফ্যাক্টরীর মালিকই কয়লার বাজারে নিজ নিজ সুবিধা ঢুঁড়িতে লাগিয়া যায়। সুযোগ বুঝিয়া কয়লার খনির মালিকেরাও আপোষে আড়াআাড় সুরু করে। দুই চার মাসের ভিতরই, এই দর কষাকষির কুফল দেখা যায়। শেষ পর্য্যন্ত সকলেই বুঝিয়াছে যে, খাদের মালিকেরা একদল বাঁধিলে এবং কারখানার মালিকেরা আরেক দল বাঁধিলে দুই দলে অতি সহজে দরদস্তুর চলিতে পারিবে। বিপুলবিস্তৃত সঙ্ঘের অনেক সুবিধা। ঝগড়াঝাটি কম হয়, অনেক বাজে খরচ বাঁচিয়া যায়। শস্তায় মাল বাজারে হাজির করা চলে, এদিকে কোম্পানীর লাভও বৃদ্ধি পায়।

শস্তায় মাল বাজারে হাজির করিতে না পারিলে জার্ম্মাণি অন্যান্য দেশের সঙ্গে শিল্প-সংগ্রামে হারিয়া যাইবে। বৃহদাকার কারখানা ছাড়া শস্তায় মাল তৈয়ারী হইতে পারে না। ইহা অতি মামুলি কথা। কাজেই জার্ম্মাণরা আজকাল কুদরত্তি মাল হইতে সুরু করিয়া ফ্যাক্টরীতে মাল তৈয়ারী করা এবং জাহাজে চাপাইয়া দক্ষিণ আমেরিকার পল্লীশহরে পৌছানো পর্য্যন্ত সবই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সঙ্ঘের তাঁবে আনিয়া ফেলিয়াছে। মোটরের উপর ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার পক্ষে

জার্ম্মাণির সঙ্গে শিল্পের বাজারে টক্কর দেওয়া যারপরনাই কঠিন হইবে।

তড়িতের কারবারে ট্রাষ্ট গড়িয়া উঠিয়াছে। চিনির কারখানায়, রাসায়নিক ফ্যাক্টরীতে, লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ে,—সর্ব্বত্রই দেখিতেছি বিপুল সঙ্ঘ।

ভারতের সঙ্গে জার্ম্মাণির গ্রন্থ-বিনিময়

(১)

জার্ম্মাণরা আজকাল বিদেশী কেতাব খরিদ করিতে অসমর্থ। ভারতবর্ষে এক টাকায় পাওয়া যায় ৫০।৬০ মার্ক। কাজেই দুই টাকা বা আড়াই টাকা দামের বই কিনেতে হইলে জার্ম্মাণ মার্ক্ দিতে হয় ১২০ বা ১৫০। এত দামে বই কিনিয়া বিদ্যাচর্চ্চা করা ক্রোড়পতিদের শোভা পায়। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই পণ্ডিতেরা গরীব বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। জার্ম্মাণ অধ্যাপকেরা সাধারণত অল্প বেতনে শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। বেশী দামে কেতাব কেনা কাজেই ইঁহাদের পক্ষে অসাধ্য।

অনেক জার্ম্মাণ পণ্ডিত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—"মহাশয় জার্ম্মাণিতে অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট, কয়লা-কষ্ট, ঘর-কষ্ট ত সকলেই চোখে দেখিতেছেন। কিন্তু আমাদের কেতাব-কষ্ট অন্যান্য কষ্ট অপেক্ষা কম শোচনীয় নয়। কেতাবের দুর্ভিক্ষে জার্ম্মাণ পণ্ডিত-সংসার বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।"

ভারতবর্ষে প্রকাশিত বহু গ্রন্থ ও পত্রিকা জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের কাজে লাগে। ইঁহারা ভারতীয় লেখকগণের রচনাবলী পড়িবার জন্য যারপরনাই উৎসুক। কিন্তু পয়সা দিয়া ভারতীয় কেতাব কিনিবার ক্ষমতা জার্ম্মাণির নাই।

একটা প্রস্তাব উঠিয়াছে। জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের লিখিত

জার্ম্মাণ বই ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণের নিকট পাঠাইতে চাহেন। এই জার্ম্মাণ বইএর বদলে ইঁহারা ভারতসন্তানের প্রণীত গ্রন্থাদি পাইতে ইচ্ছা করেন। গ্রন্থ-বিনিময়ের প্রস্তাব ভারতবর্ষের জননায়কগণ পছন্দ করিবেন না কি? এই বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য বার্লিনের প্রসিদ্ধ 'ষ্ট্যাট্স্‌বিব্লিওটেক' অর্থাৎ ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী নামক গ্রন্থশালার কর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করা চলিতে পারে।

(২)

জার্ম্মাণরা ভারতবর্ষ হইতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ চাহেন? সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবী, ফার্সী ইত্যাদি ভাষায় লিখিত পুরাণা অথবা নূতন যে কোন গ্রন্থ ইহাদের কাজে লাগিবে। হিন্দী, উর্দ্দু, বাংলা, মারাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু, উড়িয়া ইত্যাদি ভাষায় লিখিত মধ্যযুগের সাহিত্য ইহাঁরা বাদ দিবেন না। আর এই সকল ভাষায় বর্ত্তমানকালে যে সমুদয় ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক বা অন্যবিধ গ্রন্থ রচিত হইতেছে সেই সমুদায় গ্রন্থও জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত। অধিকন্তু, ইংরেজী ভাষায় ভারতসন্তানেরা যে সমুদয় রচনা প্রকাশ করিতেছেন সেগুলাও জার্ম্মাণি পাইতে ইচ্ছা করে।

প্রয়াগের হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন অথবা কাশীর নাগরী-প্রচারিণী-সভা যে সমুদয় পত্রিকা বা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সে সমুদয় জার্ম্মাণির 'প্রাচ্য বিদ্যাপরিষদের' সভ্যেরা আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। সেইরূপ, মারাঠী-সাহিত্য-পরিষৎ, গুজরাতী-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইত্যাদি 'জ্ঞানমণ্ডলে'র পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী ইঁহারা স্বকীয় গ্রন্থশালায় রাখিতে ইচ্ছা করেন।

বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক অথবা আরবী অধ্যাপকের নিকট পত্র লিখিলে জার্ম্মাণির অভাব সম্বন্ধে সকল কথা জানা যাইবে। অপরদিকে ভারতীয় পণ্ডিতেরা জার্ম্মাণি হইতে

বিনিময় স্বরূপ পাইতে ইচ্ছা করেন তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখিলে শীঘ্রই কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে।

(৩)

আজকাল ডাকমাশুল বড় চড়া। কাজেই ডাকে কেতাব বা পত্রিকা একদেশ হইতে আর একদেশে রপ্তানি করা সহজ নয়। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য জার্ম্মাণি ও আমেরিকা এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রন্থ-বিনিময় কার্য্যেও জার্ম্মাণরা সেই কৌশল খাটাইতে ইচ্ছা করেন।

ভারতবর্ষের কোনো এক বা দুই স্থানে—যথা বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কাশী, কলিকাতা ইত্যাদি—সাহিত্য-পরিষদ্ বা অন্য কোনো 'জ্ঞান-মণ্ডল' সকল প্রকার কেতাব সংগ্রহের কেন্দ্র হইবে। জার্ম্মাণি হইতে যে সকল কেতাব ভারতবর্ষে পৌছিবে সেইগুলা সোজাসোজি বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কাশী বা কলিকাতার কেন্দ্রে জমা হইবে। এই কেন্দ্র হইতে পরে আবশ্যক মত ভারতবর্ষের শহরে শহরে জার্ম্মাণ গ্রন্থ বা পত্রিকা পাঠানো হইবে।

অপর দিকে জার্ম্মাণির কেন্দ্র থাকিবে বার্লিন। ভারতীয় কেন্দ্র হইতে কেতাব আসিয়া পৌছিবে বার্লিনে। পরে বার্লিন হইতে জার্ম্মাণির শহরে শহরে পণ্ডিতগণের দরকার অনুসারে হিন্দী, বাংলা, উর্দ্দু, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্য বিতরিত হইবে।

এই আয়োজনে আমদানি-রপ্তানির খরচ কম হইবার সম্ভাবনা। ভারতের পণ্ডিতগণ শীঘ্রই জার্ম্মাণির পণ্ডিতগণের সঙ্গে বিদ্যার আদান-প্রদান সুরু করিতে অগ্রসর হউন। জার্ম্মাণ ভাষায় ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত না হইলে যুবক-ভারত বর্ত্তমান জগতে জীবিত থাকিতে পারিবে না।

ভারতবর্ষের নানা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে এই গ্রন্থ-বিনিময় সম্বন্ধে চিঠি ঝাড়া গেল। দেখা যাউক, ভারতের সাড়া পাওয়া যায় কিনা।

স্যাক্‌সনি প্রদেশ

জার্ম্মাণির স্যাক্‌সনি প্রদেশকে শিল্প হিসাবে ভারতবর্ষের গুজরাতের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এই অঞ্চলে তুলার সূতা, চরকা এবং কাপড় বুনার কলকারখানা গুনতিতে অনেক। এখানকার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ শিল্পবহুল কারখানায় ভরা নগরের নাম কেম্‌নিট্‌স্। এই শহরকে বলিব আহমদাবাদ অথবা ম্যাঞ্চেষ্টার অথবা ওসাকা।

স্যাক্‌সনি প্রদেশে আজকাল প্রায় দেড়হাজার সূতার কারখানায় কাজ চলিতেছে। এই সমুদায় ফ্যাক্টরিতে পঁচিশ লাখ চরকা খাটিতেছে। সূতা কাটা হয় প্রায় চারিশত ফ্যাক্টরিতে আর কাপড় বুনা হয় প্রায় নয়শত কারখানায়। কমসে কম ষাট হাজার মজুর এই সকল সূতার কলে কাজ করিয়া থাকে।

কেম্‌নিট্‌স্ শহরের ভিতর এবং ইহার আশে পাশে বহুসংখ্যক কারখানা চলিতেছে। পাঁচটা বড় বড় কলে সর্ব্বসমেত পাঁচলাখ চরকা খাটিয়া থাকে। অন্যান্য শহরে জগৎপ্রসিদ্ধ ফ্যাক্টরি দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাক্টরিতে ভিন্ন ভিন্ন মাল তৈয়ারি করা হয়। কোথাও মোজা, কোথাও ফিতা, কোথাও পরদা, কোথাও থান কাপড় ইত্যাদি। বেলজিয়াম এবং সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের সূক্ষ্ম সূতার কারবারের সঙ্গে টক্কর দিয়া স্যাক্সনির অনেক ফ্যাক্টরি বিদেশে নাম কিনিয়া আসিতেছে। ভারতীয় বেপারীরা স্যাক্সনির কারখানায় কারখানায় দর যাচাই করিলে হয়ত লাভ উঠাইতে পারিবেন।

কেম্‌নিট্‌স্‌কে জার্ম্মাণির আহমদাবাদ বলিতেছি। কিন্তু কেম্‌নিট্‌স্

অনেক বিষয়ে আহমদাবাদ হইতে পৃথক্। আহমদাবাদে কাপড় ও সূতার কল আছে সত্য,—কিন্তু এই সকল বয়ন-কারখানার জন্য কল-কব্জা যন্ত্র-হাতিয়ার আহমদাবাদে তৈয়ারি হয় না। কেম্‌নিট্‌সে কাপড়ের কলের জন্য কল যন্ত্রও তৈয়ারি হয়। এই ধরণের এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ফ্যাক্টরি কেম্‌নিট্‌সে অনেক। এখানে সর্ব্বদাই নয়া নয়া উন্নত ধরণের যন্ত্র কায়েম হইতেছে। এই সকল নয়া যন্ত্রের সাহায্যে শস্তায় এবং অল্প সময়ে সূতা কাটা এবং কাপড় বুনা সাধিত হইতেছে। যন্ত্র তৈয়ারি করিবার কারখানা না থাকিলে কেম্‌নিট্‌সের তাঁতীরা সহজে দুনিয়ায় জার্ম্মাণ বস্ত্র দাঁড় করাইতে পারিত না। কেম্‌নিট্‌সে আসিলে হিন্দুস্থানের শিল্পী, এঞ্জিনিয়ার এবং ব্যবসাদারেরা অনেক নূতন দিকে মাথা খেলাইতে এবং টাকা খাটাইতে শিখিবেন।

মেলা ও ব্যবসায়

রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মাণির কারবার ক্রমে জাঁকিয়া উঠিতেছে। ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যোনিগ্‌সব্যর্গ বন্দরে একটা জার্ম্মাণ মেলা বসিয়াছিল। এই বন্দর বাল্‌টিক সাগরের কূলে অবস্থিত,—জার্ম্মাণির একদম উত্তর-পূর্ব্ব কিনারায়,—রুশিয়ার প্রায় লাগাও। প্রায় দুই হাজার কোম্পানী এই মেলায় মাল পাঠাইয়াছে। বিদেশী খরিদ্দারের সংখ্যা কম নয়। কাপড় চোপড়, চামড়ার জিনিষ, আসবাব পত্র, লোহা লক্কড়, রান্নাবাড়ির সরঞ্জাম, চীনামাটির বাসন, রাসায়নিক দ্রব্য, বিদ্যুতের যন্ত্র, কাগজ, খেলনা, টেবিল চেয়ার ইত্যাদি কোন দ্রব্যই এই মেলায় বাদ পড়ে নাই।

লাইপৎসিগ শহরে জার্ম্মাণদের শিল্পমেলা সুরু হইয়াছে। এই মেলায় ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যার ছাত্রেরা নানা তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইতেছেন।

বার্লিনের 'হিন্দুস্থান-পরিষৎ' কয়েক মাস ধরিয়া জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভারতীয় বেপারীদের সংযোগ সাধনে সাহায্য করিতেছেন। ভারতবর্ষের অনেক ব্যবসাদার এই পরিষদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিয়া নানা সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। ভারতীয় পর্য্যটক মাত্রেই বার্লিনে আসিলে এই পরিষদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দক্ষিণ জার্ম্মাণির ব্যাভেরিয়া প্রদেশের প্রধান নগর মিউনিক। এই শহরের স্কুমার শিল্প বিষয়ক ব্যবসায় ইয়োরোপে নামজাদা। ধাতুনির্ম্মিত বাসনকোসন, আসবাবপত্র, রেকাবি, বাতিদান ইত্যাদি নানাবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের উপর সুন্দর সুন্দর নক্সা করার কার্য্যে মিউনিকের কারিগরেরা নামজাদা। অধিকন্তু এই শহরে পুরাণা শিল্পের নিদর্শনসমূহের কেনা-বেচা খুব বেশী হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কর্ণেলিউস নামক জার্ম্মাণির এক অতি প্রসিদ্ধ চিত্রকর এই নগরের "রাজ-শিল্পী" ছিলেন। বস্তুতঃ ব্যাভেরিয়ার নরপতি লুড্‌ভিক কর্ণেলিউসকে জনগণের এবং আকাডেমীর শিল্প-গুরুর পদে বসাইয়াছিলেন। সেই রাজার আমলে মিউনিকে বাস্তু এবং স্থাপত্যশিল্পও যারপর নাই উৎকর্ষ লাভ করে। পরবর্ত্তী যুগে জোসেফ ষ্টীলার ছিলেন "রাজশিল্পী"। তাঁহার যশ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সুদূর রুশিয়ার রাজ-দরবার পর্য্যন্ত।

মিউনিকে আগামী মে মাসে বিরাট শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইবে। হাট বাজার মেলা বসানো জার্ম্মাণদের এক মামুলি রীতি। এক কথায় বলিব, জার্ম্মাণিতে বৎসরে গণ্ডাগণ্ডা "হরিহর ছত্রের মেলা" বসিয়া থাকে।

জার্ম্মাণ বিত্তালয়ে বিদেশীর দান

পরিদর্শন করিতে আসিয়া-

ছিলেন। এই সঙ্গে জাপানীরা জার্ম্মাণিকে বিশ লাখ মার্কের এক দান দিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে বৈজ্ঞানিক খোঁজের জন্য জার্ম্মাণ ছাত্র প্রতিপালিত হইবে। এক লাখ মার্ক দেওয়া হইয়াছে লোক-শিক্ষায় সাহায্য করিবার জন্য। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রভাণ্ডারে আসিয়াছে বিশ হাজার মার্ক।

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনা দেশ হইতে জার্ম্মাণ নরনারীগণ জার্ম্মাণির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতরূপে চাঁদা পাঠাইয়া থাকেন। এই টাকায় ছাত্রদের খাওয়া দাওয়ার খরচে সাহায্য করা হয়।

নয়া জার্ম্মাণির পররাষ্ট্রনীতি

(১)

ইংরেজকে জার্ম্মাণরা আজকাল পরম মিত্র বিবেচনা করিতেছে। কাজেই ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো মত অথবা সংবাদ কোনো জার্ম্মাণ কাগজে এক প্রকার দেখিতে পাই না বলিলেই চলে। জার্ম্মাণদের চিন্তায় তাহাদের একমাত্র শত্রু ফ্রান্স। ফরাসী জাতিকে পাঁচ সাত বৎসরের ভিতর ঘাল করিবার মতলব ছাড়া জার্ম্মাণ সমাজে আর কোন লক্ষ্য নাই। ইংরেজ-প্রীতি এবং ফরাসী-বিদ্বেষ এই দুই কথাই আজ কালকার জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-নীতির গোড়ার কথা।

মিশরে, আয়ালর্যাণ্ডে, ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বরাজ ও স্বাধীনতার আন্দোলন চলিতেছে। এই সকল খবর কিছু কিছু অনেক জার্ম্মাণ কাগজেই ছাপা হয়। কিন্তু এই সব বিপ্লবের কথায় জার্ম্মাণরা কান দিতে প্রস্তুত নয়। 'ডায়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ' নামক দৈনিক পত্র ছাড়া অন্য কোনো কাগজে এই সকল বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ বাহির হয় না।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা কমিয়া গেলে জার্ম্মাণির ক্ষতি হইবে এই

ধরণের মত বহু জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনায়ক পোষণ করিয়া থাকেন। বার্লিনের ক্লাবে ক্লাবে এবং সংবাদ-পত্রে এই মত ছড়ানো হইয়াছে। বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা অনেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া থাকেন। ভারতীয় স্বরাজের কথা শুনিয়া, মহাত্মা গান্ধীর নেপোলিয়ানীর খবর পাইয়া, আলি-চিত্তরঞ্জন-লাজপতের অপূর্ব্ব স্বার্থ-ত্যাগের ও কর্ম্মতৎপরতার কাহিনী জানিতে পারিয়া উচ্চপদস্থ জার্ম্মাণরা ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। মিশর ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলে বৃটিশ জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই ভাবিয়া জার্ম্মাণ জননায়কগণের অনেকেই দুঃখিত।

(২)

এবার্ট-ও ভির্ট-শাসিত বর্ত্তমান জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট প্রায় আগাগোড়া ইংরেজ-ভক্ত। ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ জার্ম্মাণির কাগজে যাহাতে ছাপা না হয় সেদিকে এ গবর্মেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি।

জার্ম্মাণিতে, বলা বাহুল্য, অনেকগুলা রাষ্ট্রীয় দল আছে। কোনো কোনো দল ভির্ট গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিপক্ষীয় দলের ভিতরেও ছোট ছোট অনেক সমিতি আছে যাহারা ঘোরতর ইংরেজ-প্রেমিক।

এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, 'ড্যয়েচ নাট্সিওনাল' (জাতীয়তাপন্থী) দল মোটের উপর ইংরেজবিরোধী। কিন্তু এই দলের লোকেরাও খোলাখুলি ইংরেজের বিরুদ্ধে সংবাদ ছাপে না এবং মত প্রকাশ করে না। অধিকন্তু এই দলের ভিতরই বহু নামজাদা লোক ইংরেজের স্বপক্ষে জার্ম্মাণির মত গড়িয়া তুলিতেছে।

সহজে বুঝিয়া রাখা উচিত যে, এশিয়াবাসীদের বিদ্রোহ নিবারণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্য জার্ম্মাণির সাহায্য পাইবে।

করিয়া, ইংরেজের সেবা করিয়া, ইংরেজের উপনিবেশ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্য পাতাইবার জন্য জার্ম্মাণরা ভারত ও মিশরকে ইংরেজের চিরগোলাম দেখিতে প্রস্তুত আছে। জার্ম্মাণিতে ভারত ও মিশরের স্বরাজ-আন্দোলনের স্বপক্ষে কোনো বড় আন্দোলন টিকিবে না।

রাইণ প্রদেশের উপর ফ্রান্সের একতিয়ার থাকিবার কথা পনর বৎসর। যতদিন জার্ম্মাণির এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদ ফরাসীদের তাঁবে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণরা ইংরেজের শরণাপন্ন বিপদ-গ্রস্ত দুঃস্থ বন্ধুভাবে চলিতে বাধ্য। ইংরেজকে খুসী না রাখিলে জার্ম্মাণির উদ্ধার নাই। জার্ম্মাণ স্বদেশসেবকেরা এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে।

(৩)

অনেক জার্ম্মাণ বিশ্বাস করে যে, ইংরেজের অনুগ্রহে ইহারা তাহাদের আফ্রিকাস্থিত উপনিবেশগুলা ফিরাইয়া পাইবে। অধিকন্তু ইংরেজের অনুগ্রহে ইহারা জগতের সকল দেশে ক্রমশঃ যাওয়া-আসার এবং ব্যবসায়ের সুযোগ লাভ করিতে পারিবে।

বিশেষতঃ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে টাকার বাজার লইয়া জার্ম্মাণি ইংরেজের নিকট অনেক উপকার লাভ করিবে সন্দেহ নাই। জেনোআতে যে সম্মেলন বসিবে তাহাতে জার্ম্মাণ মার্কের দাম বাড়াইবার বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। কারণ ইহাতে ইংরেজের স্বার্থ পূরা মাত্রায় বিদ্যমান। জার্ম্মাণ মার্কের দাম বাড়িলে জার্ম্মাণরা বিলাতী মাল কিনিতে পারিবে। তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডের মজুর-সমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে।

জার্ম্মাণির প্রায় সকল দল এবং সকল জননায়ক (কমিউনিষ্ট ছাড়া) পূরাপূরি ফ্রান্সের বিপক্ষে চলিতেছে এবং চলিবে। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডকে শত্রু বিবেচনা করিলে জার্ম্মাণির কোনো লাভ হইবে না। বরং ইংরেজ যদি জার্ম্মাণির আসল বন্ধু না হইয়া মৌখিক বন্ধুত্ব মাত্রও

দেখায় তাহাতেও জার্ম্মাণির লাভ আছে। কাজেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের শত্রু বা বিরোধী জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করা জার্ম্মাণ নরনারীর স্বার্থ নয়।

বিগত যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যই জার্ম্মাণির সর্ব্বপ্রধান এবং একমাত্র শত্রু ছিল। এই কথা যাঁহারা ভারতে আজও স্মরণে আনিতেছেন, তাঁহারা সমসাময়িক ঘটনা বুঝিতে একদম অসমর্থ। ১৯১৪ সালের পুরাণা ইতিহাস ভুলিয়া ১৯২২ সালের নয়া আবহাওয়ায় বাঁচিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

জার্ম্মাণির সংবাদপত্র

জার্ম্মাণিতে সর্ব্বসমেত প্রায় দুই হাজার সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। অবশ্য নানা মুনির নানা মত। কোনো কোনো কাগজের কাট্‌তি মাত্র এক হাজার। কোনো কোনোটার কাট্‌তি প্রায় আড়াই লাখ।

রাইন জনপদের এক ছোট শহরে মাত্র ছয় হাজার নরনারীর বাস। কিন্তু সেখানে প্রতিদিন পাঁচটা স্বতন্ত্র কাগজ বাহির হয়। জার্ম্মাণিতে দলাদলি এতই বেশী।

বার্লিনের সর্ব্ববিখ্যাত কাগজের নাম 'টাগেব্লাট'। এইটার কাট্‌তি প্রায় আড়াই লাখ। স্বত্বাধিকারী এবং পরিচালক ইত্যাদি সকলেই ইহুদি। এই কাগজে ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের স্বার্থ প্রচার করা হয়। রাষ্ট্রনীতিতে টাগেব্লাট গণতান্ত্রিক অর্থাৎ রিপাব্লিকপন্থী। বর্ত্তমান গবর্মেণ্ট এই কাগজের প্রিয়।

ঠিক এই আদর্শেরই রাজতন্ত্র-বিরোধী এবং ইহুদি-পরিচালিত আর একটা দৈনিক জার্ম্মাণির বাহিরেও সুপ্রসিদ্ধ। এইটা 'ফ্রাঙ্কফুর্টার ৎসাইটুঙ্' নামে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর হইতে প্রকাশিত হয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট

সোশ্যালিষ্টপন্থীদের কাগজের নাম 'ফোরভ্যর্টস্'। এইটার কাট্‌তি প্রায় দুই লাখ। এই দলেও ইহুদিদের প্রাধান্য বেশী।

ইহুদি-জার্ম্মাণদের উপর খ্রীষ্টান-জার্ম্মাণরা বড় চটা,—বিদ্যা, চিকিৎসা, সঙ্গীত, শিল্প, ব্যবসায় এবং সংবাদপত্র ইত্যাদি জীবনের নানা বিভাগে ইহুদিরা আগে আগে চলে বলিয়া। খ্রীষ্টান-পরিচালিত কোনো জার্ম্মাণ সংবাদপত্রের কাট্‌তি এক লাখের বেশী নয়। অধিকন্তু খাঁটি খ্রীষ্টান-জার্ম্মাণদের ভিতর খুব কম লোকই গণতান্ত্রিক বা রিপাব্লিক-পন্থী।

'জার্ম্মাণরা' প্রায় সকলেই রাজভক্ত। ইহারা বর্ত্তমান রিপাব্লিকের শাসন পছন্দ করে না। কাইজারকে ফিরাইয়া পাইতে ইহারা সচেষ্ট—অন্ততঃ পক্ষে রিপাব্লিকের স্থানে রাজতন্ত্র পুনরায় কায়েম করিবার জন্য ইহাদের আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতেছে, যদিও খোলাখুলি নয়। ক্যো'লনের 'ৎসাইটুঙ্' এবং বার্লিনের 'ৎসাইটুঙ' ইত্যাদি কাগজের সুর এইরূপ। এই সকল কাগজের কাট্‌তি প্রত্যেকটার প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

ওবার্-ওমার্গাওয়ের খ্রীষ্ট-লীলা

জার্ম্মাণির ব্যাভেরিয়া প্রদেশের ওবার্-ওমার্গাও পল্লী দুনিয়ার খ্রীষ্টান মহলে সুপ্রসিদ্ধ। এই পল্লীতে যীশু খ্রীষ্টের আত্ম-বলিদানের ঘটনাবলী নাটকের আকারে দেখানো হইয়া থাকে। এই উৎসব দেখিবার জন্য এই বৎসর কম-সে-কম দশ লাখ লোক জগতের সকল দেশ হইতে আসিতেছে।

ভারতের রামলীলা মহরম ভরত-বিলাপ জন্মাষ্টমী ইত্যাদি সংক্রান্ত উৎসবের কথা মনে রাখিলে ওবার্-ওমার্গাওয়ের খ্রীষ্ট-তিথি বুঝিতে পারা যাইবে। প্রত্যেক দশ বৎসরে একবার করিয়া এই আন্তর্জ্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত

প্রধানতঃ খোলা মাঠে খ্রীষ্টলীলা দেখানো হয়। গান বাজনা কথোপকথন দস্তুর মতনই থাকে। বেশভূষা ইত্যাদি যথাসম্ভব সাবেক কালের জেরুজেলেম দেশীয় রীতিতে কায়েম করা হয়। কোনো কোনো পরিবার আড়াই শ' বৎসর ধরিয়া যীশু সাজিবার লোক দিয়া আসিতেছে,—কোনো পরিবার হইতে সেণ্টপিটার সাজিবার লোক এযাবৎকাল আসিয়াছে, ইত্যাদি।

দর্শকেরা লীলা দেখিয়া যারপর নাই মুগ্ধ রোমাঞ্চিত এবং ভক্তিপ্লুত হয়। হিন্দুমাত্রেই জার্ম্মাণদের অনুষ্ঠিত খ্রীষ্টোৎসব দেখিলে খ্রীষ্টান নরনারীর হৃদয়ে হিন্দুত্ব দেখিতে পারিবেন।

ভাগ্নারের অপেরা

বার্লিনে আজকাল ভাগ্নারের 'অপেরা' গীত হইতেছে (মে ১৯২২)। থিয়েটারে লোক উপস্থিত হয় অনেক। ভাগ্নার পুরাণা জার্ম্মাণির গল্প-কথা লইয়া সঙ্গীত-নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জীগ্‌ফ্রিড' চরিত্রে ভারতবাসীরা কিয়ৎপরিমাণে 'কুমার-সম্ভবে'র পালা অনুমান করিতে পারেন। যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে প্রকৃতির আওয়াজগুলাকে রূপ প্রদান করিয়া ভাগ্নার অমর হইয়াছেন।

জার্ম্মাণ সমাজে নবীনের ভয়

জার্ম্মাণির ধনী ব্যবসায়ীদের চিত্তে ভয় ঢুকিয়াছে। ইঁহারা বোল্‌শেভিক্ মতের ক্রমিক প্রসার বৃদ্ধি দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিতেছেন। কয়েকজন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরীর মালিকের সঙ্গে সম্প্রতি কথাবার্ত্তা হইয়াছে। ইঁহাদের কারখানায় পাঁচ শত, সাত শত, হাজার অথবা আরো বেশী লোক কাজ করে।

কোনো কোনো মালিক বলিতেছেন,—"আমরা আমাদের মোটর কারে চড়িয়া আমাদের নিজ ফ্যাক্টরীর দুয়ারে যাইতে সাহস করি না। মজুরেরা আমাদের সম্পত্তি বা বিলাসের লক্ষণগুলি দেখিলে আমাদের উপর চটিয়া বিরক্ত হয়। তাহাদিগকে খুসী রাখিবার জন্য ফ্যাক্টরীর ফটক হইতে কিছু দূরে সদর রাস্তার উপর মোটর গাড়ী রাখিয়া পরে পায়ে হাঁটিয়া আমরা কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হই।" অর্থাৎ মজুরেরাই আজকাল মনিবদিগকে শাসন করিতেছে।

জার্ম্মাণ বিজ্ঞানবীর আইনষ্টাইন আজ নয়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে বিস্মিত করিতেছেন। দুনিয়া ভরিয়া আজ তাঁহাকে গুরুরূপে পূজা করা হইতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণ সমাজের ভিতর এমন অনেক মহল আছে যেখানে আইনষ্টাইনকে মানব-শত্রু, সমাজদ্রোহী, শয়তানরূপে ঘোরতর নিন্দা করা হইয়া থাকে। কোনো কোনো বনিয়াদি ঘরের জার্ম্মাণ জননায়ক বলিতেছেন:—"এতদিন জগৎ সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া জানা ছিল, সেইগুলাকে উল্টাইয়া দিয়া আইনষ্টাইন এক বিপ্লব সুরু করিতে চাহে। এই জন্য আমরা আইনষ্টাইনকে পছন্দ করি না। একটা নতুন-কিছুর প্রবর্ত্তন আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।"

গতানুগতিক ভাবে পুরাণা পথে থাকিবার অভ্যাস একমাত্র হিন্দু-জাতিরই বিশেষত্ব নয়। নয়া ইয়োরোপে নয়া বিজ্ঞানের বিরোধী, পরিবর্ত্তন মাত্রের শত্রু, পুরাতন তন্ত্রের উপাসক এবং সমাজ-সংস্কারের যম হাজার হাজার নরনারী দেখা যায়।

কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে যে পণ্ডিত প্রচার করিয়াছিল যে "পৃথিবী ঘুরিতেছে, সূর্য্য ঘুরে না" তাঁহার অশেষ দুর্গতি ঘটিয়াছিল। আজ সেইরূপ আইনষ্টাইনের দুর্গতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। চিকিৎসা বিদ্যার রাজ্যেও ইয়োরোপীয়েরা নূতন চিকিৎসার বিরুদ্ধে

বহুকাল খড়্গহস্ত ছিল। কুসংস্কার ইয়োরোপেও খুব জবর ভাবেই দেখা দিয়াছে।

ভারতীয় ছাত্র

জার্ম্মাণিতে দুই চার জন করিয়া ভারতসন্তান প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। যাঁহারা ছাত্রভাবে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য আসিতেছেন তাঁহাদিগকে ঘরভাড়া ও খাওয়াদাওয়ার জন্য মাসে প্রায় ছয় হাজার মার্ক্ খরচ করিতে হয়।

দেশে বসিয়া টাকা ভাঙ্গাইয়া মার্ক খরিদ করিলে অনেক ক্ষতি হয়। টাকা ভাঙ্গাইয়া পাউণ্ড খরিদ করিয়া পরে জার্ম্মাণিতে আসিয়া মার্ক্ কেনাই যুক্তিসঙ্গত। ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কে টাকার বদলে মার্ক্ চাহিলে অনেক পরিমাণ বাটা দিতে হয়। কিন্তু জার্ম্মাণিতে পাউণ্ড ভাঙ্গাইতে গেলে অনেক সময় লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা আছে।

জার্ম্মাণিতে পৌঁছিবার পর প্রথম ছয় মাস কোনো বিদ্যায় বিশেষ অগ্রসর হইবার আশা করা অন্যায়। এই ছয় মাস প্রতিদিন চার পাঁচ ঘণ্টা করিয়া জার্ম্মাণ ভাষা দখল করিতে চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। ছয় মাসের চেষ্টায় জার্ম্মাণ ভাষায় যতখানি একতিয়ার জন্মে তাহাতে পরে কোন মতে কাজ চালানো যাইতে পারে। জার্ম্মাণ অতি কঠিন ভাষা। কম সময়ে কম মেহনতে জার্ম্মাণে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করা অসম্ভব।

জার্ম্মাণির ফ্যাক্টরীতে ভারতবাসীর শিখিবার অনেক বিদ্যা আছে। সেইসব শিখিবার জন্য ভারত-সন্তানকে মেহনত করিতেই হইবে। চার পাঁচ বৎসরকাল না কাটাইলে কোনো ভারতীয় এম্ এ, এম্ এস্-সি জার্ম্মাণির কারখানা বা সমাজ হইতে যথোচিত লাভ উঠাইতে পারিবেন না। এইজন্য উপযুক্তরূপে টাকা খরচ করিবার ব্যবস্থাও চাই।

জার্ম্মাণ জাতির সুখ-দুঃখ

জার্ম্মাণির জমিদার বংশীয় অথবা ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের নর-নারীরা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন :—"মহাশয়! আমরা আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না। ১৯১৪—১৯১৮ সালের পূর্ব্বে আমরা যে জার্ম্মাণ সমাজ দেখিয়াছি, সেই জার্ম্মাণির আজ যে দুরবস্থা তাহা ব্যক্ত করা আমাদের অসাধ্য। আমরা বিসমার্কের সেই গৌরব-যুগকেই চিনি। বর্ত্তমানের শোচনীয় দশা আমাদিগকে আধ-মরা করিয়া রাখিয়াছে।"

বস্তুতঃ এই কারণে ভদ্রঘরের প্রতিপত্তিশালী স্ত্রী-পুরুষেরা আজকাল বিদেশী লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে নারাজ। লজ্জা, দুঃখ, নৈরাশ্য এবং দারিদ্র্য এই সব জার্ম্মাণ সমাজকে এত কাবু করিয়া ফেলিয়াছে যে, বিদেশীদের সঙ্গে আত্মীয়তা করা একদম উঠিয়া গিয়াছে। 'সামাজিক' নামক কোনো বস্তু জার্ম্মাণিতে আর নাই বলিলেই চলে। অবশ্য ইহুদি-জার্ম্মাণদের কথা স্বতন্ত্র।

কোনো কোনো জার্ম্মাণ মহিলা বলিতেছেন :—"ইচ্ছা হয় জার্ম্মাণি পরিত্যাগ করিয়া কোনো দূর বিদেশে যাইয়া বাস করি। আমার স্বামী পিতা এবং পুত্রকন্যারা সোনার জার্ম্মাণিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন কি আমার পৌত্রপৌত্রীরা ইহুদি-শাসিত ইংরেজ-ফরাসীর গোলাম জার্ম্মাণির আবহাওয়ায় বাস করিবে?"

উল্টা গাহিয়া জার্ম্মাণ যুবক বলিতেছে—"ছিঃ মা! নৈরাশ্যে অধীর হইও না। বিদেশে যাইয়া অজ্ঞাত বাস করা অপেক্ষা স্বদেশের উন্নতির জন্য খাটিয়া স্বদেশে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। তোমার পৌত্রপৌত্রীরা শিখিবে একমাত্র জপমন্ত্র,—সে হইতেছে ইংরেজ-বিদ্বেষ আর ফরাসী-বিদ্বেষ। জার্ম্মাণিকে আবার 'সকল দেশের সেরা' করিয়া ছাড়িবে। কিছুকাল ধৈর্য্য ধর।"

নয়া জার্ম্মাণির ভাবভঙ্গী

খেলাধূলা, শারীরিক ব্যায়াম ও কসরত জার্ম্মাণিতে অতিশয় প্রবলরূপে দেখা দিয়াছে। সাঁতারকাটা, দৌড়, হকি, টেনিস্, নৌচালন, কুস্তী, পালোয়ানী ইত্যাদি সকল দিকেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ঝোঁক দেখিতেছি। স্বাস্থ্যোন্নতি এবং শক্তিবৃদ্ধি জার্ম্মাণ সমাজে আজকাল এক নয়া ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

বার্লিনে এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। এই মেলায় খেলা-ধূলা, ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদি সম্বন্ধীয় সকল প্রকার আসবাব দেখান হইতেছে। এই সব আসবাব প্রস্তুত করিবার জন্য বহুবিধ জার্ম্মাণ কারখানা চলিতেছে। জার্ম্মাণরা শারীরিক ব্যায়াম সম্বন্ধীয় আসবাব পত্রের ব্যবসায়ে অনেক দিনই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দারিদ্র্যের দরুণ উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর জার্ম্মাণরা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের স্থানে উঠিতেছে মজুর চাষী ইত্যাদি শ্রমজীবীরা। জার্ম্মাণিতে আজকাল ঝি চাকর পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, শ্রমজীবীদের ভিতর 'সভ্যতা-ভব্যতা' ইত্যাদির অভাব। কিন্তু ইহারা টাকা রোজকার করে অনেক, কাজেই আছে সুখে। জগতের সর্ব্বত্রই এই উপায়ে আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়াছে। শ্রেণী-বিপ্লবের নানা লক্ষণ জার্ম্মাণ সমাজে বেশ স্পষ্ট।

রাইন জনপদ ও ভারতের স্বদেশী আন্দোলন

(১)

ভারত-সন্তানেরা জার্ম্মাণিতে বেড়াইতে আসিতেছেন। জার্ম্মাণির শিল্প-প্রধান নগরগুলি দেখা বহু মোসাফিরেরই মতলব। রাইন জনপদের প্রসিদ্ধ কারখানা সমূহ দেখিয়া আসিয়া কয়েকজন ভারতীয় বেপারী বার্লিনে উপস্থিত হইয়াছেন।

ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কয়েকদিন হইল রাইন অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়াছেন। বার্লিনে ইনি ইণ্ডো-ইয়োরোপা ট্রেডিং কোম্পানী নামক আমদানী-রপ্তানী অফিসের পরিচালক। জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন জেলার বড় বড় ফ্যাক্টরীর সঙ্গে ইহাঁর কারবার চলে।

বীরেন বলিতেছেন:—"ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ তিশি জার্ম্মাণিতে আমদানি করা হয়, তাহার প্রায় সমস্তটাই রাইন অঞ্চলের কারখানায় কাজে লাগে। মোটের উপর দেড়-কোটি টাকা দামের তিশি প্রতিবৎসর রাইন প্রদেশে বিক্রী হয়। এই ব্যবসার সকল লভ্যাংশই বিদেশীর পকেটে আসে। কোনো ভারত-সন্তানের হাতে এই ব্যবসার কোনো হিস্‌সাই নাই।"

ভারতবাসীর পক্ষে এই কথাটা বিশেষ করিয়া দেখিবার বিষয়। ভারতবর্ষ হইতে নানা প্রকার তৈলবীজ লাক্ষা মাঙ্গানিজ এবং অন্যান্য কৃষিজাত ও খনিজ 'কুদ্‌রত্তি'মাল রাইন অঞ্চলে রপ্তানি হয়। এই বাণিজ্যের খানিক হিস্‌সা ভারতীয় বেপারীদের কব্জায় আসা বাঞ্ছনীয় নয় কি? ভারতের যে সকল জননায়ক স্বদেশী চালাইবার ভার লইয়াছেন বহির্ব্বাণিজ্যের এই বিভাগটা তাঁহাদের বিশেষরূপে তদবির করা কর্ত্তব্য।

(২)

রাইন দরিয়ার দুইধারের প্রত্যেক পল্লী ও শহরই বাষ্পচালিত অথবা বিদ্যুৎ-চালিত ফ্যাক্টরিতে সর্ব্বদা মসগুল রহিয়াছে। এই ধরণের এক পল্লীগ্রামে বীরেন দাশগুপ্ত একটা চরকার কারখানা দেখিয়াছেন। এই চরকাটা ভারতবর্ষে কাজে লাগিতে পারে। ইহা দেখিতে এক অতি সাধারণ সেলাইয়ের কলের মতন। হাতে এবং পায়ে চালানো যায়। ভারতের যে কোন কুটীরে এইটা ব্যবহার করা যাইতে পারে

বলিয়া বিশ্বাস হয়। রুমেণিয়া বুলগেরিয়া তুর্কী ইত্যাদি দেশে এই চরকায় সূতা কাটা হইত। ইহার দাম বেশী নয়।”

ভারতবর্ষে আজকাল নানা প্রকার জিনিষ তৈয়ারি করিবার দিকে চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বীরেনের বিবেচনায় “রাইন জনপদের জেলায় জেলায় ভারতীয় কারিগরদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। জুতার ফিতা, কাপড়ের পাড়, রেশমের সূতা ইত্যাদি বস্তু তৈয়ার করিবার কল এই সব অঞ্চলে তৈয়ারী হয়। ভারতীয় পর্য্যটকদিগের পক্ষে সেই সব কল-কব্জা দেখিবার সুযোগ জুটা কঠিন নয়।”

রাইন জনপদের এস্‌সেন শহর লোহালক্কড়ের যন্ত্রপাতির জন্য প্রসিদ্ধ। এই কেন্দ্রে শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী প্রায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ফ্যাক্টরী বা ঘরবাড়ী হইতে যে সমুদয় বস্তু অব্যবহার্য্য অথবা অনাবশ্যক বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, সেই সমুদয় কাজে লাগাইবার জন্য অনেক প্রকার শিল্প আছে। সেই সকল শিল্পের প্রদর্শনী এস্‌সেনে কয়েকদিন হইল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আজকালকার দিনে ইস্কুলে, পাঠশালায়, বিদ্যাপীঠে আলোক চিত্রের ব্যবহার করা নেহাৎ দরকারী। সিনেমা, ম্যাজিকলণ্ঠন ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার কল এবং অন্যান্য শিক্ষা-সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি এস্‌সেনের নানা কারখানায় প্রস্তুত করা হয়। এই শহরে বেড়াইতে আসিলে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-দক্ষেরা অনেক নয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

(৩)

রাইন জনপদের বার্মেন শহরে সূতা কাটার কল তৈয়ারী করিবার অনেকগুলি ফ্যাক্টরী আছে। এখান হইতে অমৃতসরের কারখানায় কল রপ্তানি করা হইয়া থাকে। তাঁতের কারবারও এই কেন্দ্রে অনেক

রেশমের ফিতা ও সূতা তৈয়ারী করিবার জন্য অনেক প্রকার যন্ত্র আবশ্যক হয়। ফ্রান্সের লিঅঁ শহরের রেশম ব্যবসায়ীরা বার্মেন হইতে সকল প্রকার কল কব্জা আমদানি করে। পরে লিঅঁ হইতে রেশমী ফিতা ইত্যাদি বস্তু ভারতবর্ষে রপ্তানি হয়। বার্মেন শহরের যন্ত্রপাতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও চালান হইয়া থাকে।

এল্‌বার্ফেল্ড শহরও যন্ত্র তৈয়ারী করিবার কারখানার জন্য বিখ্যাত। জুতার ফিতা প্রস্তুত করিতে যেসব কল কাজে লাগে, সেই সব কল আমেরিকা ও ফ্রান্সের বেপারীরা এই কেন্দ্র হইতে আমদানি করিয়া থাকে।

চিঠিপত্রের জন্য এন্‌ভেলপ তৈয়ারী করিতে যে সমুদয় যন্ত্র দরকার হয় সেই সব যন্ত্রের ফ্যাক্টরীও এল্‌বার্ফেল্ড শহরে একাধিক আছে।

মোটের উপর, বীরেন বলিতেছেন:—"ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য বহুসংখ্যক শিল্পজ্ঞ এবং বিজ্ঞান-সেবক ভারত-সন্তানকে রাইন জনপদে আসিয়া বসবাস করিতে হইবে। জার্ম্মাণ ভাষা শিখিতে ছয় মাস বা এক বৎসর লাগে। তাহার পর অন্ততঃ তিন বৎসর কাল এই অঞ্চলের পল্লীতে ভ্রমণ করিলে উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসী স্বদেশের জন্য বহুবিধ শিল্প-কৌশল সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন।"

খেলাধূলায় যুবক জার্ম্মাণি

সেদিন বার্লিনে এক জবরদস্ত ফুটবল ম্যাচ হইয়া গেল। ন্যুরন্‌বুর্গ এবং হাম্বুর্গ শহরের দুই নামজাদা দলে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। চার ঘণ্টা ধরিয়া দুইদলে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিল। কিন্তু তথাপি শেষ পর্য্যন্ত একদল অপর দলকে হারাইতে পারিল না। খেলোয়াড় এবং

এবং ধৈর্য্য রক্ষা করার পরীক্ষা হইল মাত্র। জার্ম্মাণ সমাজে এই ফুটবল-প্রতিযোগিতার কথা সর্ব্বত্র আলোচিত হইতেছে।

জার্ম্মাণরা খেলাধূলার দিকে খুব বেশী মনোযোগী। হকি, রাগ্‌বি বল, টেনিস্ এবং গল্‌ফ্ এই চারপ্রকার খেলার ব্যবস্থা জার্ম্মাণির প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই দেখিতেছি। অধিকন্তু গোটা জার্ম্মাণির উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল অঞ্চলের খেলোয়াড়েরা মাঝে মাঝে প্রতি-যোগিতার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বার্লিনে এই ধরণের নিখিল-জার্ম্মাণ-প্রতিযোগিতার আয়োজন আছে। এই আয়োজনকে 'অলিম্পিয়াড্' বলে।

বার্লিনের অলিম্পিয়াডে সকল প্রকার শারীরিক কছরতের পরীক্ষা চলিয়া থাকে। সাঁতার কাটা, নৌকা চালানো ইত্যাদিও বাদ পড়ে না। ঘুঁসাঘুঁসি, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, জিম্‌নাষ্টিক্‌স্ এবং অন্যান্য খেলার উৎসবও অনুষ্ঠিত হইতেছে। দৌড়াদৌড়ি, লাফানো, কুস্তী, মল্লযুদ্ধ এবং এই ধরণের অন্যান্য ব্যায়াম জার্ম্মাণির মাঠে মাঠে আজকাল সুপ্রচলিত। এগুলা 'য়ুগেণ্ড্-বভেগুঙ' বা যৌবন-আন্দোলনেরই আনুষঙ্গিক সন্দেহ নাই।

অধিকন্তু মোটরকারের দৌড়-প্রতিযোগিতা বেশ চলিতেছে। অপরদিকে বাই-সাইকেল চালাইবার পরিশ্রমেও বহু নরনারীর পরস্পর পরীক্ষা দেখিতে পাই। এক কথায় "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" এই মন্ত্র অনুসারে জার্ম্মাণির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জীবন গঠন করিতেছে।

কাইজারি আমলে একুশ বৎসরের যুবারা সামরিক জীবনযাপন করিতে বাধ্য ছিল। এখন রিপাব্লিকের আমলে, ভার্সাইয়ের ধাক্কায় সে নিয়ম আর নাই। কাজেই সমরশিক্ষার ঠাঁইয়ে দাঁড়াইতেছে খেলাধূলা।

বার্লিনে রুশশিল্প

রুশিয়ার এক ধনী জমিদার-পত্নী কয়েক বৎসর ধরিয়া বার্লিনে বসবাস করিতেছেন। ইনি রুশ জাতীয় নরনারীকে অন্ন-সংস্থানের পথ দেখাইবার জন্য এই শহরে একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়াছেন।

রুশিয়া হইতে পলাইয়া আসিয়া হাজার হাজার লোক জার্ম্মাণিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বার্লিন এই ধরণের রুশ পলাতকদের এক অতি বিশাল কেন্দ্র। বলা বাহুল্য, ইহাদের অনেকরই অন্ন-বস্ত্রের অভাব যথেষ্ট। এই সকল বিপন্ন নরনারীর সাহায্য করাই জমিদার-পত্নীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অনেক লোকের অন্ন-সংস্থান সাধিত হইতেছে। অধিকন্তু জার্ম্মাণিতে একটা নয়া শিল্প প্রবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। রুশিয়ার কিষাণরা স্বদেশে যে ধরণের স্থকুমার শিল্প ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে যথেষ্ট কারিগরি এবং কায়দা দেখা যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইয়োরোপীয়েরা বিশেষতঃ জার্ম্মাণরা সেই সমুদয় বস্তুর সমাদর করিত।

বৈঠকখানা সাজাইবার জন্য, খানাঘরের আসবাবপত্রের জন্য, বারান্দার পরদার জন্য নানাপ্রকার সৌখীন জিনিষ রুশ কিষাণেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এইগুলা ইয়োরোপের বাজারে বাজারে বিক্রীও হয় বিস্তর। কিন্তু এক্ষণে খাস রুশ মুল্লুকে এই শিল্পের রেওয়াজ খুব কম। রুশিয়া হইতে এই সকল মাল অন্য কোন দেশে আমদানি করা সম্ভব নয়।

কাজেই জার্ম্মাণরা স্বদেশেই এক্ষণে রুশ-শিল্পের বাজার বসাইয়াছে। জার্ম্মাণির ঘরে ঘরে নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের ভিতর রুশ কিষাণদের হাতের তৈয়ারী মাল সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতেছে। অধিকন্তু জার্ম্মাণি

হইতে এই রুশ শিল্প ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায়ও রপ্তানি হইতেছে।

অর্থাৎ জার্ম্মাণিই এক্ষণে রুশ সভ্যতার এবং রুশ উৎকর্ষের এক মস্ত সংরক্ষক। জার্ম্মাণিতে আসিলে রুশিয়াকে স্পর্শ করা অতি সহজ। রুশ সাহিত্যের কাটতি জার্ম্মাণিতে প্রচুর। রুশ সাহিত্যের জার্ম্মাণ অনুবাদও প্রচুর। রুশ ভাষার একাধিক দৈনিক কাগজও বার্লিনে সম্পাদিত হইয়া থাকে। রুশ হোটেল, রুশ দোকান, রুশ থিয়েটার ইত্যাদিও দিন দিন গুনতিতে বাড়িয়া যাইতেছে।

জার্ম্মাণির মহিলা সমাজ

(১)

জার্ম্মাণির মহিলারা আমেরিকার মহিলাদের সমান দুনিয়ার বাজারে নাম করিতে পারে নাই। কিন্তু জার্ম্মাণ নারীসমাজ কোনো হিসাবেই পশ্চাৎপদ নয়। বার্লিনের বহু ভদ্র পরিবারেই তাহার পরিচয় পাইতেছি।

মধ্যবিত্ত জার্ম্মাণ ঘরের নারীরা সকলেই প্রায় সুশিক্ষিত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি অনেক মহিলারই নাই সত্য, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য, কলা, দর্শন ইত্যাদি বিভাগের গ্রন্থ পাঠ করিবার এবং সমালোচনা করিবার ক্ষমতা অনেকেরই দেখিয়াছি। অধিকন্তু সঙ্গীতে ওস্তাদ নারী জার্ম্মাণির বোধ হয় প্রত্যেক ভদ্রঘরেই লক্ষ্য করা যায়। কেহ বা কণ্ঠসঙ্গীতে কেহ বা যন্ত্রসঙ্গীতে আবার কেহ বা দুই সঙ্গীতেই পারদর্শী। একটা বিশেষ কথা এই যে, এই সমুদয় বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও জার্ম্মাণ মহিলা ভারতীয় মহিলাদের মতনই গৃহস্থালীকে নারীজাতির স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

আজকাল জার্ম্মাণির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বিদেশীয় নরনারীর সঙ্গে লেনদেন বা সৌজন্য শিষ্টাচার পছন্দ করে না। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই অর্থকষ্ট অত্যধিক। একটি বিলাতী পাউণ্ডে আজ পাওয়া যাইতেছে প্রায় ২৫০০ মার্ক, একটি মার্কিন ডলারে প্রায় ৬৫০ মার্ক্। কাজেই বিদেশীরা জার্ম্মাণিতে নবাবী চালে জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণির নরনারীরা দুইবেলা টেবিলে বসিয়া পূরা পেট খাইতে পায় না। এই অবস্থায় ইহারা বিদেশীয় বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে আনিতে চাহে না। নিজ পারিবারিক দৈন্য ও দুঃখ বিদেশীয়দিগকে দেখাইতে জার্ম্মাণরা কুন্ঠিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

এই কারণে ভারতীয় ছাত্র, পর্য্যটক অথবা ব্যবসায়ীরা জার্ম্মাণির খাঁটি গৃহস্থালী এবং সামাজিক জীবন বুঝিবার সুযোগ পাইতেছে না। ইহারা কেবল মাত্র বাহিরের ইট, কাঠ, দোকানের আসবাবপত্র, রেষ্টরাণ্ট, হোটেল, নাচঘরের বিলাস ইত্যাদি দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য। তবে যখনই কোন ভারত-সন্তান বিশেষ বন্ধুত্বের খাতিরে কোনো জার্ম্মাণ পরিবারে প্রবেশ করিতে পাইয়াছে, তখনই সে জার্ম্মাণ নরনারীর সুমার্জ্জিত রুচি এবং নম্রতা ও উদারতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে।

(২)

জার্ম্মাণির সুশিক্ষিতা এবং বিদুষী মহিলারা গৃহস্থালীকেই স্বধর্ম্ম-বিবেচনা করে বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের ভিতর স্বদেশের নানাবিধ লোকহিতকর কাজে যোগদান করার উৎসাহ এবং কর্ম্মতৎপরতাও লক্ষ্য করিতেছি। আমেরিকায় যতগুলা মহিলা-সমিতি আছে জার্ম্মাণিতে বোধ হয় গুন্‌তিতে তাহা অপেক্ষা কম মহিলা-সমিতি নাই।

ইতিমধ্যে কয়েকজন নামজাদা মহিলা-সমিতির

কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কয়েকটা মহিলা-সমিতির কর্ত্রীর সঙ্গে এবং মহিলা লেখক ও লেখিকার সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছি।

জার্ম্মাণিতে প্রধানতঃ তিনপ্রকার মহিলা-পরিষৎ আছে। প্রথম,—নিখিল জার্ম্মাণ মহিলা-পরিষৎ। দ্বিতীয়,—জার্ম্মাণ জাতির অধিকার রক্ষাকারিণী পরিষদের মহিলা বিভাগ। তৃতীয়,—জার্ম্মাণ সীমান্ত প্রদেশের মহিলা-পরিষৎ। প্রত্যেক পরিষদের উদ্দেশ্য এবং কার্য্য-তালিকা বিভিন্ন।

জার্ম্মাণির বিভিন্ন নগরে এবং পল্লীতে মহিলাদের ছোটোখাটো অসংখ্য সমিতি আছে। কোনো সমিতির উদ্দেশ্য সাহিত্য-চর্চ্চা, কোনো সমিতির উদ্দেশ্য সমাজ-সেবা, কোনো সমিতির উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় অধিকার দাবী করা। কোনো সমিতি একমাত্র ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যাপৃত, কোনো সমিতি অন্য কোনো ধর্ম্মাবলম্বীদের সেবায় নিরত। কোনো সমিতি বিজ্ঞানসেবী বা পত্রিকা-সম্পাদকদের ক্লাব-স্বরূপ। সকল প্রকার মহিলা-সমিতি একত্রে কাজ করিবার জন্যও এক সমগ্র জার্ম্মাণিব্যাপী নারী-কংগ্রেস কায়েম করিয়াছে। সেই কংগ্রেসের নাম 'বুণ্ড্ ড্যয়চার ফ্রাওয়েন-ফারাইনে' অর্থাৎ নিখিল জার্ম্মাণ মহিলা-পরিষৎ।

এই পরিষদের সভানেত্রী শ্রীযুক্ত মারিয়ানা ভেবার। ইনি রাইন জনপদের সন্নিকটে হায়ডেলব্যর্গ শহরে বাস করেন। ইঁহাকে জার্ম্মাণিতে দার্শনিক লেখকগণের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে সম্মান করা হইয়া থাকে।

(৩)

দ্বিতীয় পরিষদের নাম 'ড্যয়চার শুটস্-বুণ্ড্' অর্থাৎ জার্ম্মাণি-রক্ষা-কারিণী পরিষৎ। এই পরিষদের এক বিভাগে নারীজাতির অধিকার ও স্বত্ব রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে।

যুদ্ধের পর জার্ম্মাণির নানা বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রাইন জনপদ, রুমেণিয়া, জুগোস্লোভিয়া ইত্যাদি নানাদেশে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ নরনারী 'পরাধীন' হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল পরাধীন জার্ম্মাণদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য বার্লিন শহরে এক বড় পরিষৎ কায়েম করা হইয়াছে। পরাধীন জার্ম্মাণদের জন্য 'স্বরাজ', স্বায়ত্ত শাসন, আত্মনির্ব্বাচন ইত্যাদি দাবী করা এই পরিষদের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য যতদিন টিকিয়াছিল ততদিন এই ধরণের 'স্বরাজ' আন্দোলন জার্ম্মাণ সমাজে দরকার হয় নাই। তখন জার্ম্মাণির বিরুদ্ধেই পোল, চেক ইত্যাদি জাতি স্বরাজ আন্দোলন চালাইত। কালের কি বিচিত্র গতি!

জার্ম্মাণির তৃতীয় প্রকার মহিলা-পরিষৎ জার্ম্মাণসীমান্ত প্রদেশের মহিলা-সমাজের অনুষ্ঠান। আজকাল কোল্‌ন শহর ইংরেজ, ফরাসী ও বেলজিয়ানদের তাঁবে শাসিত হইতেছে। ড্যান্‌ৎসিগ শহর (বাল্টিক সাগরের উপকূলে) জার্ম্মাণির হাতছাড়া। পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের তাঁবে এই শহর চলিতেছে। অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরের দুর্দ্দশা কাহারও অজানা নাই। এই সকল দেশের জার্ম্মাণ মহিলারা স্ব স্ব কেন্দ্রে সমিতি স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের সমবেত কর্ম্মকেন্দ্র স্বরূপ বার্লিনে এক 'বুণ্ড্' গঠিত হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে এই পরিষদ্‌ও জার্ম্মাণ সমাজের দুঃখ দৈন্য দুর্গতির এক সাক্ষী।

বার্লিনে এশিয়ান

জেরুজেলেম প্রদেশের মুসলমানেরা বিলাতী মাল বয়কট রুজু করিয়াছে। বহিষ্কার চলিতেছে দ্রুতবেগে। জেরুজেলেমের কয়েকজন প্রসিদ্ধ জননায়ক ব্যবসা উপলক্ষে জার্ম্মাণিতে আসিয়াছেন। ইঁহারা জার্ম্মাণ সওদাগরের সঙ্গে কারবার বাড়াইবার আয়োজন করিতেছেন।

মিশরের মুসলমান নেতারা ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণকে বলিতেছেন —"ভারতবর্ষের পরাধীনতাই এশিয়ার পরাধীনতার কারণ। এশিয়া-বাসীর দুর্দ্দশার জন্য ভারত-সন্তানেরাই দায়ী। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষ কি করিতেছে?"

আর্ম্মিণিয়া পারস্য ও রুশিয়ার মধ্যবর্ত্তী জনপদে আজেরবেজান নামক দেশে আজকাল রিপাব্লিক বা গণতন্ত্র শাসন চলিতেছে। এই রাষ্ট্রের কায়েম হইয়াছে যুদ্ধের ফলে। আজেরবেজানের একজন নায়ক বার্লিনের এক সভায় বক্তৃতা করিলেন। শুনিলাম,—"আজেরবেজানের ইস্কুল-পাঠশালায় নারীজাতির কৃতিত্ব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেও যোগ দিতে সুরু করিয়াছে।"

বার্লিনের আফগান রাষ্ট্রদূত 'গুর্ব্বান' উৎসবে বহুলোক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বড় হোটেলে জনতা হইয়াছিল। উচ্চপদস্থ জার্ম্মাণ পুরুষ ও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। এশিয়ার হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় অনেক নরনারী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পার্শী, ফরাসী, আরবী, জার্ম্মাণ ইত্যাদি ভাষায় বক্তৃতা হইল। দশ বার বৎসর বয়সের আফগান বালকেরা স্বদেশী আফগান পোষাকে জাতীয় গীত গাহিল।

ওবার-আমার-গাওয়ে হিন্দুমহিলা

ওবার-আমার-গাও পল্লীর যীশুলীলা দেখিবার জন্য এক ভারতীয় মহিলা জার্ম্মাণিতে আসিয়াছিলেন। ইনি ইন্দোরের শ্রীমতী ইন্দিরা ভাগবৎ। ওবার-আমার-গাও হইতে ইনি সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা বলিতেছেন,—'ওবার-আমার-গাও পল্লীতে এক সূত্রধরের ঘরে আমি অতিথি ছিলাম। সেই বাড়ীতে নরওয়ে, সুইডেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের আরও কয়েকজন পুরুষ নারী রাত্রিযাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে একত্র খৃষ্ট-জীবনের চরম

অবস্থা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। সকলেই এই অভিনয় দেখিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছি।”

প্রায় ছয় হাজার লোক একসঙ্গে অভিনয় দেখিতে পারে। ইন্দিরা যে ছুতারের ঘরে অতিথি ছিলেন, তিনি এক নামজাদা অভিনেতা। পল্লীর অন্যান্য কিষাণ, মেষপালক এবং মজুরেরা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করিয়া থাকে।

ইন্দিরা বলিতেছেন,—“এই পল্লীর দরিদ্র লোকজনকে পয়সার লোভ দেখাইয়া কোনো কাজ করানো যায় না। ইহারা খৃষ্টলীলার জন্য যে অভিনয় করিতেছে তাহা মামুলি অভিনয় মাত্র নয়। প্রতিদিনকার জীবনে প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম্মে ইহারা খাঁটি খৃষ্ট ধর্ম্মের নিয়ম পালন করিয়া থাকে। এই সকল লোকের সংস্পর্শে আসিলে যথার্থ ভগবদ্ভক্ত সত্যপ্রিয় সরলপ্রাণ নরনারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহাদের চেহারার ভিতর দিয়াও সরলতা, সংযম এবং সত্যপ্রিয়তা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে বোধ হইতেছিল। এই হিসাবে ওবার-আমার-গাওর মতন পল্লী জগতে আর একটা আছে কিনা সন্দেহ।”

‘মার্ক্-বিপ্লব’

গত সপ্তাহে জার্ম্মাণির টাকার বাজারে এক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। কয়েকমাস ধরিয়া এক বিলাতী পাউণ্ডে এক হাজার বা দেড় হাজার মার্ক্ পাওয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একদিন চার হাজারে আসিয়া ঠেকিল। তাহার পরের দিনই ছয় হাজার, দুই দিনের ভিতর সাড়ে আট হাজার। তাহার পর একদিন সকালে এগারটার সময় ব্যাঙ্ক পাড়ায় হৈ চৈ চলিয়াছিল ‘এক পাউণ্ডে দশ হাজার মার্ক্’।

টাকার বাজারের সঙ্গে সঙ্গেই জিনিষপত্রের দর রাতারাতি বাড়িয়া চলিয়াছে। যে সকল

অথবা এমন কি হাজার মার্কে পাউণ্ড ভাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা আজ জার্ম্মাণিতে বসিয়া হাহাকার করিতেছে। তাহাদের প্রতিদিনকার খরচ কুলাইয়া উঠা এখন অসম্ভব। যে ব্যক্তি আড়াইশ' পাউণ্ডে একলাখ মার্ক্ কিনিয়াছিল আজ তাহার মার্কের দাম মাত্র দশ বার পাউণ্ড। ঘরভাড়া, জিনিষপত্রের দাম, পোষাকের দর, সবই বাড়িয়াছে পাঁচ ছয় গুণ।

বলা বাহুল্য, বিপদে পড়িয়াছে জার্ম্মাণ নরনারীরা। ইহাদের ত আর বিদেশী টাকা আমদানি হয় না। অথচ চড়া দরে জীবন নির্ব্বাহ করিতে হয়। রোজ রোজ মার্কের পতন দেখিয়া গৃহস্থেরা দিশেহারা হইয়া পড়িতেছে। কোনো পরিবারই ঘরে অথবা ব্যাঙ্কে আর মার্ক্ পুঁজি করিয়া রাখিতে চাহে না। সকলেই ছুটিয়াছে দোকানের দিকে মাল কিনিয়া আনিতে।

এই সপ্তাহে দেখিতেছি বার্লিনে ছোট বড় মাঝারি সকল দোকানেরই মাল উজাড় হইয়া গেল। প্রত্যেক দোকানেই লোকের ভিড়। কোন দোকানেই আর মাল দেখা যায় না। যে যেমন পারিতেছে ঘরে আনিয়া সওদা মজুত রাখিতেছে। সকলেই ভাবিতেছে,—কাগজের মার্ক্ ঘরে রাখা অপেক্ষা মালপত্র জমাইয়া রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

বড় বড় ফ্যাক্টরির মলিকেরাও সকল প্রকার কুদ্রতি মাল কিনিয়া ফেলিতেছে। সকলেই মার্ক্ যেন তেন প্রকারেণ বেচিয়া ফেলিতেছে। বিনিময়-ভবনে বস্তা বস্তা মার্ক্ পড়িয়া রহিতেছে। দেশী বিদেশী পর্য্যটক ব্যবসাদার সকলেই মার্ক্ ফিরাইয়া দিতেছে। সকলেই পাউণ্ড অথবা ডলার চাহিতেছে। অথবা সকলেই মাল খরিদ করিতেছে। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে পাউণ্ড ডলার এবং মালের দামও যারপরনাই ফুলিয়া

লাইপৎসিগের 'সিংহ-পরিবার'

লাইপৎসিগ শহরের পশুশালায় জীবজন্তু বিষয়ক বিদ্যা সম্বন্ধে অতি উচ্চ অঙ্গের পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে। এই পশুশালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গেবিং জার্ম্মাণির একজন প্রসিদ্ধ জুঅলজিষ্ট বা জীবতত্ত্ববিৎ। গেবিংএর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভারতীয় যুবকেরা পশুবিদ্যায় অনেক কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

সিংহ-শাবকের লালনপালনে গেবিং জগতে একজন প্রধান ওস্তাদ। লাইপৎসিগের পশুশালা হইতে পৃথিবীর নানা দেশের বিজ্ঞানবিদেরা তাঁদের নিজ নিজ জুঅলজিক্যাল বাগিচার জন্য সিংহ খরিদ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে গেবিংএর পোষা সিংহের বদলে অন্য দেশের পশুতত্ত্ববিদেরা তাঁহাদের নিজের হাতে গড়া অন্য কোনো জানোয়ার দিয়াছেন। জগতের পশুশালায় পশুশালায় এইরূপ বিনিময় অহরহ চলিয়া থাকে।

সিংহ-পুষিবার কায়দা উদ্ভাবন করিবার জন্য গেবিং বহু বৎসর মেহনৎ করিয়াছেন। আফ্রিকা দেশের বনে জঙ্গলে ইনি এই নিমিত্ত ছয়বার পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন। লাইপৎসিগের পশুশালায় দেখা যায় যে, গেবিং তাঁহার সিংহ সিংহী ও সিংহশাবকগুলাকে পোষা কুকুর বিড়ালের মত আদর করেন। সিংহ-পরিবারও গেবিং এবং গেবিং-পত্নীকে জনক-জননীর মতন ভালবাসে।

ভারতবর্ষে অনেক শিক্ষিত ও ধনী লোকের জীবজন্তু পুষিবার ও কিনিবার সখ আছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে লাইপৎসিগ হইতে গেবিং-এর 'শিক্ষিত' জানোয়ার খরিদ করিতে পারেন। অথবা ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা হাতী বাঘ বা অন্য কোনো জীবজন্তুর বাচ্চা লাইপৎসিগের পশুশালায় পাঠাইয়া তাহার বদলে অন্য কোনো পশু লইতে পারেন।

আর যাঁহারা ভারতে পশু-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহারা জার্ম্মাণিতে বেড়াইতে আসিলে গেবিংএর সংস্পর্শে নানা বিস্ময়বিজড়িত আবিষ্কারের কাহিনী শুনিতে পাইবেন। পশু-বিদ্যায় নয়া নয়া আবিষ্কার সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করা যাঁহারা জীবনের লক্ষ্য বিবেচনা করিতেছেন, সেই সকল ভারতীয় যুবকের পক্ষে লাইপৎসিগের পশুশালা এক উৎকৃষ্ট পরীক্ষালয়।

যুবক ভারতের জীবন নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসরে প্রসার লাভ করিতেছে। ভরত-সন্তান একসঙ্গে বহুবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু পশুবিদ্যার বিভাগে মাত্র দুই চারিজন শিক্ষিত ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আশা করা যায়, ভারতীয় ধনী ও জ্ঞানী লোকেরা এই বিদ্যার রাজ্যে শীঘ্রই নানা প্রকার কীর্ত্তিলাভ করিয়া দুনিয়ায় ভারতের ইজ্জদ বাড়াইতে চেষ্টা করিবেন। ভারতের চিত্রকর, ভাস্কর ইত্যাদি সুকুমার-শিল্পীরাও পশুজীবন সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে সুরু করিলে হিন্দুস্থানের নব্য সভ্যতায় এক নূতন উৎকর্ষ ও আনন্দ সৃষ্ট হইতে পারিবে।

মধ্যবিত্তের দুরবস্থা

মধ্যবিত্ত জার্ম্মাণ পরিবারের আর্থিক অবস্থা যারপরনাই শোচনীয়। ইহার ফলে তাহাদের চিত্তে অবসাদ আসিয়াছে। উচ্চ অঙ্গের জীবন বা সৌজন্য শিষ্টাচার ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দিবার সুযোগ আজকাল ইহাদের নেহাৎ কম।

এক সম্ভ্রান্ত জার্ম্মাণ মহিলা বলিতেছেন,—"যৌবনে আমি ফরাসী, ইতালিয়ান, রুষ ও ইংরেজি ভাষা শিখিতেছিলাম। সঙ্গীতের জন্য আমার শিক্ষক ছিল। আমার ভগ্নী চিত্রকর। সুকুমার শিল্পে ইঁহার যশ বাড়িতেছিল। বার্লিনের উচ্চপদস্থ সমাজে আমাদের কুটুম্বজন।

বলা বাহুল্য, ঝী চাকরেরও আমাদের অভাব ছিল না।" এইরূপ বলিতে বলিতে মহিলা কাঁদিতে সুরু করিয়া দিলেন।

পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "এখন আমাদের কি অবস্থা? আমরা বিদেশী লোকদের জন্য বসত-বাড়ী খুলিয়া রাখিয়াছি। তাহাদের সেবা করা আমাদের একমাত্র কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইহাদিগকে ঘরে জায়গা দিয়া যে টাকা রোজগার করিতেছি, সেই টাকা না পাইলে আমরা সংসার চালাইতে অসমর্থ। কাজেই এই সকল লোকের মর্জ্জিমাফিক আমরা উঠিতেছি বসিতেছি। এক মুহূর্ত্তও আমরা স্বাধীন নই। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বদেশসেবা, সামাজিকতা সবই ভুলিয়া গিয়াছি। আর এই সব বিদেশী লোকের অধিকাংশই চোর, জোচ্চোর, বাটপাড়, বদমায়েস। বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে এই ধরণের লোকজনের ছায়া মাড়ানো পর্য্যন্ত আমরা নিন্দনীয় বিবেচনা করিতাম।"

বাস্তবিক পক্ষে বার্লিনের প্রায় প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবারই আজ বিদেশী অতিথিদের ঝী চাকর স্বরূপ জীবনযাপন করিতেছে।

ভারতীয় পর্য্যটক

(১)

বিদেশীরা কয়েক বৎসর ধরিয়া যুবক-ভারতের এক নয়া স্বভাব লক্ষ্য করিতেছে। ভারতবাসীকে বিদেশীরা 'ঘর-কুনো' অথবা কূপমণ্ডুক বলিয়া জানিত। তাহাদের ধারণা ছিল যে, "গৃহে চ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ?"—এই সূত্র ভারত-সন্তানের মজ্জাগত। কিন্তু আজকাল বিদেশীদের এই মত ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। কারণ বিদেশে ভারতীয় নরনারীকে এখন নানা কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যায়।

পূর্ব্বে ভারতবাসীরা 'বিদেশ' বলিলে প্রধানতঃ ইয়োরোপকেই বুঝিত। আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলা ভারতসন্তানের চিন্তার বহির্ভূত থাকিত। আবার ইয়োরোপ শব্দেও আমরা একমাত্র ইংল্যণ্ডকেই বুঝিতাম।

এইরূপ সঙ্কীর্ণতা ভারতবাসীর চিত্ত হইতে এক্ষণে দূরীভূত হইয়াছে। ভারতীয় পর্য্যটক আজকাল জাপানে তুরস্কে মরক্কোয় ভ্রমণ করিতেছেন। নরওয়ে, সুইডেন, রুশিয়া, স্পেন, গ্রীস ভারতবাসীর পর্য্যটন-তালিকায় ঠাঁই পাইতেছে। উত্তর আমেরিকার ত কথাই নাই, ব্রেজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি জনপদেও ভারতীয় নরনারীর মোসাফিরি চলিতেছে।

আর এক কথা। এতদিন ভারতের যাঁহারা বিদেশে আসিতেন তাঁহারা প্রধানতঃ লেখাপড়া শিখিবার জন্য আসিতেন। সাহিত্যই হউক, আইনই হউক, চিকিৎসাই হউক, এঞ্জিনিয়ারিংই হউক,—কোনো না কোনো বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরা বিদেশগামী হইতেন। বিদেশী ইস্কুল-কলেজের আবহাওয়াই তাঁহাদের প্রবাস-জীবনের বিশেষত্ব ছিল। ইস্কুল-মাষ্টার এবং তাঁহাদের পরিবার ছাড়া ভারতীয় প্রবাসীদের পক্ষে বিদেশী সমাজের অন্য কোনো অংশ সহজে নজরে পড়িত কি না সন্দেহ।

আজকাল পরীক্ষায় পাশ করা এবং ডিগ্রিলাভ করাই ভারতীয় প্রবাসীদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। 'দেশ দেখা', ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা, নানা শ্রেণীর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসা অথবা বিদেশে ভারতবাসীর জন্য কর্ম্মক্ষেত্র ঢুঁড়িয়া বাহির করা—এই সব আজকালকার পর্য্যটকদের অনেকেরই লক্ষ্য। প্রত্যেক বিদেশী সমাজের জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ ইত্যাদি সামাজিক

আগেকার দিনের ভারতীয় পর্য্যটকেরা বার্লিন, প্যারিস, রোম ইত্যাদি শহরগুলার বাড়ীঘর বোধ হয় অনেকটা রাস্তা হইতে দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। আজকাল ভারত-সন্তানেরা মিউজিয়াম, চিত্রশালা, গ্রন্থালয় ইত্যাদির ভিতর ত প্রবেশ করেনই; অধিকন্তু কেহ কেহ ডিরেক্টার অথবা বিভাগীয় ওস্তাদগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া ভাব-বিনিময় পর্য্যন্ত করিতে প্রয়াসী। ল্যাবরেটরীতে, শিল্পভবনে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে সর্ব্বত্রই দুএকজন ভারতীয় মোসাফির নামজাদা পরিচালকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুনিয়ার কর্ম্মবীর এবং চিন্তাবীরগণ এক্ষণে যুবক-ভারতের ধারণায় নেহাৎ অতি-মানুষ অপূর্ব্ব-কিছু বিবেচিত হয় না।

নয়া নয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য বহু ভারত-সন্তান আজকাল বিদেশে বেড়াইতে আসিতেছে। যুবক-ভারতের জীবন এই উপায়ে প্রসারে বাড়িয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্মপ্রণালীতে এবং চিন্তাপ্রণালীতেও গভীরতা সৃষ্ট হইতেছে। ভারতবাসীর নিত্য-নৈমিত্তিক গৃহস্থালী তাহার ফলে বৃহত্তর এবং গভীরতর হইয়া উঠিতেছে।

(২)

বিগত দেড় দুই বৎসরে (১৯২০-২২) এক জার্ম্মাণিতেই অন্ততঃ এক হাজার ভারতীয় নরনারী যাওয়া আসা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আসল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশই পর্য্যটক, মোসাফির। যাঁহারা খাটি ছাত্রছাত্রী, তাঁহাদেরও অনেকেই প্রধানতঃ জার্ম্মাণি দেখিবার জন্যই জার্ম্মাণিতে আসিয়াছেন।

ব্যবসার উপলক্ষ্যে অনেকেই জার্ম্মাণির নানা জেলায় বেড়াইয়া গিয়াছেন। শিল্পকারখানা দেখিয়াছেন বহু লোক। কেহ কেহ

হইয়া কাজ শিখিতেছেন অনেকে। আর বাণিজ্য সম্বন্ধ পাতাইয়াছেনও বিস্তর বেপারী।

জার্ম্মাণরা দেখিতেছে এক নতুন দৃশ্য। লড়াইয়ের পূর্ব্বে জার্ম্মাণরাই ভারতবর্ষে হাজির হইয়া ভারতবাসীর সঙ্গে কারবার খুলিত। আজকাল ভারত-সন্তান স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া জার্ম্মাণির নগরে-নগরে পল্লীতে-পল্লীতে নিজ নিজ মতলব হাঁসিল করিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই বুঝিতেছে, ভারতবর্ষ সত্যসত্যই জাগিয়াছে।

(৩)

জার্ম্মাণির বড় বড় হাঁসপাতালে ভারতীয় চিকিৎসকের দেখিবার শুনিবার অনেক জিনিষ আছে। সেই দিকে ভারতবাসীর নজর পড়িয়াছেও।

বোম্বাই গ্রাণ্ট কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মারাঠা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নাদ্‌গির বার্লিনে এবং অন্যান্য নগরে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন। ইনি অস্থিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। এই বিদ্যাবিষয়ক নানা প্রকার যন্ত্রপাতি খরিদ করাও ইঁহার জার্ম্মাণি-ভ্রমণের এক উদ্দেশ্য ছিল। পাঞ্জাবের ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভাল্লা মহাশয়ও এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণি আসিয়াছিলেন।

শিশুপালন, শিশু-চিকিৎসা, জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ক লোকহিতকর কাজের জন্য ইয়োরোপের সকল দেশেই বহুবিধ প্রতিষ্ঠান আছে। বড়োদার ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুমন্ত মেহতা এবং জিবরাজ মেহতা ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণিতে এই সকল প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছেন। ছবি, ছাপা, পুস্তিকা, পত্রিকা ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহারা দুই জনেই গুজরাতী।

কলিকাতার ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অমূল্যচন্দ্র

চালাইয়াছেন। পরে সেই লাইনেই আরও বেশী কাজ করিবার জন্য একজন বার্লিনের কক ইন্‌ষ্টিটিউটের এবং অপর জন ফির্খোভ্ হাসপাতালের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। জার্ম্মাণিতে ইঁহারা 'সিরাম' ইত্যাদি 'রস' তৈয়ারি করিবার যন্ত্রপাতি খরিদ করিতে প্রয়াসী। এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণির নানা কেন্দ্রে ঔষধ প্রস্তুত করিবার কারখানা পরিদর্শনও ইঁহাদের জার্ম্মাণি-প্রবাসের অন্তর্গত।

(৪)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ইয়োরোপে প্রেরিত হইয়াছিলেন শিল্প-কারখানার পরিচালনা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য। ইনি নিজে পদার্থবিদ্যায় পণ্ডিত, আলোক-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। বিলাতী বৈজ্ঞানিকপত্রে ইঁহার মৌলিক অনুসন্ধানের ফল একাধিক ছাপা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের কলকারখানা এবং শিল্প-বিকাশের অবস্থা ইঁহার জানা আছে। ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণিতে বৎসর দেড় দুই কাটাইয়া ফণীবাবু নবীনতম ফ্যাক্টরিগুলার ধরণধারণ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লোহালক্কড়, ধাতুর খনি, কাঁচের কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকেই ইঁহার দৃষ্টি ছিল।

শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস ফলিত রসায়নের নানা বিভাগে ওস্তাদ। যুক্তরাষ্ট্রের এডিসন কোম্পানী ইত্যাদি নামজাদা কোম্পানীর অধীনে ইনি কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রধান রাসায়নিকের কাজ করিয়াছেন। জার্ম্মাণির হাম্বুর্গ, ব্রেমেন, ল্যিবেক ইত্যাদি শহরের অনেক রসায়নঘটিত ফ্যাক্টরিতে মাল অর্ডার দেওয়া এবং মাল প্রস্তুত করিবার প্রণালী তদারক করা আজকাল ইঁহার প্রধান কাজ।

মৌলিক গবেষণায়ও বাণেশ্বরের হাত আছে। খাদ্যদ্রব্যের ভিতরকার 'ভিটামিন' শক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে ইনি কতকগুলা নূতন তত্ত্ব

উদ্ধার করিয়াছেন। ইঁহার পরীক্ষালব্ধ ফলগুলা আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ রাসায়নিক শ্রীযুক্ত এলিসের ভিটামিন বিষয়ক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

গোআলিয়র হইতে আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র মজুমদার। ইনি এই রাজ্যের পটারি কারখানার ডিরেক্টার। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে ইনি জাপানে যাইয়া 'চীনে বাসন' তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বিদ্যায় নয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য জার্ম্মাণির ফ্যাক্টরিতে কিছুকাল কাটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

ইঁহাদের কেহই ডিগ্রি পাইবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। এই ধরণের আরও ভারত-সন্তান জার্ম্মাণির নানা কেন্দ্রে নানা কাজে লিপ্ত আছেন। যুক্তপ্রদেশের আর বিহার অঞ্চলের লোক বোধ হয় একজনও নাই। মান্দ্রাজ ও দক্ষিণভারতের লোক দুএক জন আসিতে সুরু করিয়াছেন।

(৫)

মহারাষ্ট্রপ্রদেশের আউঁধ-ষ্টেট নবীন ভারতের এক অতি উন্নত এবং বৰ্দ্ধিষ্ণু রাজ্য। এই রাজ্যের আয় মাত্র সাড়ে তিন লাখ টাকা এবং লোক-সংখ্যা মাত্র সত্তর হাজার। কিন্তু শিল্প ও শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়া এই রাজ্যের নরপতি ভারতবর্ষে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতে-ছেন। ভারতবর্ষে বোধ হয় আউঁধ রাজ্য সাতারার সন্নিকটে।

এই ষ্টেটের শিক্ষা ও শিল্পবিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ইনামদার ইয়োরোপে প্রচলিত নিম্ন শিক্ষার ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে আসিয়া-ছিলেন। ডেন্‌মার্কের যুটলাণ্ড দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ দেখিয়া ইনামদার বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। কিষাণ ও কারিগরদের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার ভার এই বিদ্যাপীঠের উপর রহিয়াছে। ডেন্মার্কের শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত আপেল এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

হল্যাণ্ড এবং জার্ম্মাণির নানা পল্লী এবং নগর দেখাও ইনামদারের

উদ্দেশ্য ছিল। বড় বড় ফ্যাক্‌টরি অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর সংস্পর্শে আসা ইহার মতলব ছিল না। 'লোকশিক্ষা' এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরের কুটিরশিল্প এবং পল্লী-কৃষির ব্যবস্থা ইত্যাদি বুঝিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক ছিল বেশী।

আউঁধ-রাজ সরকারী সাহায্য দান করিয়া কাচের এবং লোহার কারখানা কায়েম করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্প বিষয়ক নানা গ্রন্থ ষ্টেট-লাইব্রেরির জন্য খরিদ করা হইয়াছে। পুরাণা ভারতের সুকুমার শিল্প এইখানে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

প্রতিবৎসর আউঁধে পশু-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তড়িতের আলো গোটা নগরে বসানো হইয়াছে। ফ্যাক্টরী-মহাল্লাটাকে একটা নব্য স্বাস্থ্যকর শহরে পরিণত করিয়া ষ্টেট আধুনিকতার এক নয়া পরিচয় দিতেছে।

রাজার নাম শ্রীযুক্ত ভবন রাও। ইনি নিজে গায়ক। প্রতিবৎসর ইনি কীর্ত্তনমেলায় জনগণের সঙ্গে একতান গাহিয়া থাকেন। চিত্রশিল্পেও ইহার হাত আছে। রামায়ণ-বর্ণিত দৃশ্যাবলীর ছবি আঁকিয়া ইনি রাজবাড়ীর মন্দির অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

পুনা শহরে 'ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট' নামে এক পরিষৎ আছে। এই পরিষদের ধন-ভাণ্ডারে আউঁধরাজ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতে এবং ইয়োরোপেও আজকাল প্রচারিত যে, মহাভারতের এক নয়া সুবিচারিত সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য এই পরিষৎ খাটিতেছেন। সেই প্রয়াসে ভবন রাও অগ্রণী।

কি নয়া জ্ঞান বিজ্ঞান, কি আধুনিক শিক্ষা, কি পুরাণা শিল্প-সাহিত্য সকল দিকেই আউঁধ ষ্টেট এক সঙ্গে দৃষ্টি দিয়াছে। গ্যেটের আমলে ভাইমার ষ্টেট যেরূপ জীবন-কেন্দ্র ছিল, আজ বোম্বাই অঞ্চলে আউঁধ সেইরূপ।

(৬)

জার্ম্মাণি হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ভারতীয় মহিলারাও এদেশে আসিয়াছেন। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময়ে অনেক ছাত্রী জার্ম্মাণিতে কাটাইয়া যান। কেহ কেহ পরীক্ষায় ডিগ্রি পাইবার পর জার্ম্মাণিতে কিছুকাল বসবাস করিয়াছেন। পার্শী, বাঙালী ও মারাঠা,—প্রধানতঃ এই তিনজাতীয় বিদুষীকে জার্ম্মাণ-সমাজে দেখা গিয়াছে।

বিরার প্রদেশের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী দ্বারকাবাই ভালচন্দ্র বার্লিনে শিশুশিক্ষালয়ের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়াছেন। ইনি বলিতেছেনঃ— 'য়ুগেণ্ডহাইম্' (যৌবন-ভবন) নামক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় দরিদ্র পরিবারদের সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যই প্রধানভাবে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিদ্যাপীঠ আগাগোড়া প্রায় সরকারী খরচেই চালানো হয়।

পেষ্টালোট্‌সি-ফ্রেবেল হাউস নামক পাঠশালায় ছয় বৎসরের ছোট শিশুদের জন্য ব্যবস্থা আছে। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করাও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। দ্বারকাবাই এই সকল প্রতিষ্ঠানে ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক কথা উপলব্ধি করিয়াছেন।

জার্ম্মাণির পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছেন ইন্দোরের রাজকুমারী শ্রীমতী ইন্দিরা ভাগবৎ। বার্লিন, লাইৎপসিগ, ন্যুর্ণবার্গ, মিউনিক, ভিয়েনা, কোলোন ইত্যাদি নানা শহরে ইনি ভ্রমণ করিয়াছেন। 'দেশ দেখাই' ইহার উদ্দেশ্য ছিল। কোন কোন শহরে জার্ম্মাণ পরিবারে বসবাস করিয়া ইনি জার্ম্মাণ নরনারীর আভ্যন্তরিক কথা অনেক বুঝিতে পারিয়াছেন। ওবার-ওমার্গাও নামক পল্লীতে যীশু-লীলা বিষয়ক সঙ্গীত-নাট্য দেখিয়া ইন্দিরা খ্রীষ্টান সমাজের ভক্তিধারাও স্পর্শ করিয়াছেন।

(৭)

ভারতের উচ্চশিক্ষায় থিয়েটার এবং নাট্যকলা একদম বাদ পড়ে। কাজেই বিদেশে আসিয়া কোন ভারত-সন্তান রঙ্গালয়ের শিল্প বুঝে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না।

কিন্তু কলিকাতার শ্রীযুক্ত সহিদ সুহ্রাবর্দ্দি অক্‌সফোর্ডে ডিগ্রি পাইবার পর রুশিয়ার মস্কো নগরে থিয়েটার পরিচালনার বিদ্যায় হাতে খড়ি দিয়াছেন। স্তানিস্‌লাব্‌সকি নামক প্রসিদ্ধ রুশ ওস্তাদ ইঁহার গুরু ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সহকারী-ম্যানেজার (রেজিস্টর)রূপে সুহ্রাবর্দ্দি বুল্‌গেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্ম্মাণি, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি দেশে থিয়েটার দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। যুবক-ভারতের পক্ষে এ এক নতুন জীবন। রুশ, ফরাসী এবং জার্ম্মাণ ভাষায় সুহ্রাবর্দ্দির দখল আছে।

শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় আসিয়াছিলেন সঙ্গীত শিক্ষা করিতে। পিয়ানো বাজানো এবং গলা-সাধা,—এই দুই দিকে ইনি জার্ম্মাণি এবং ইতালীতে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছেন। বিলাতী কেম্ব্রিজের ইনি গ্রাজুয়েট,—অঙ্কের লাইনে। ফরাসী ভাষায়ও ইঁহার দখল আছে। ইয়োরোপীয় সঙ্গীত কঠিন শিল্প। অতি সহজে অথবা কম সময়ে এবং 'বুড়া বয়সে' ভারত-সন্তানের পক্ষে সে শিল্প তাঁবে আনা অসম্ভব।

রুশ জাতীয় নরনারীর জীবন, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে দিলীপকুমার অনুরাগী হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। সাম্য, মৈত্রী, আন্তর্জ্জাতিকতা ইত্যাদি আদর্শের চিন্তাধারা পশ্চিমা মুল্লুকের কোনো কোনো দলে আজকাল কম্‌বেশী দেখা যায়। সেই ধারাটা ইঁহার প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে। ফরাসী রম্যাঁ রলাঁ, ইংরেজ বার্ট্রাণ্ড রাসেল ইত্যাদি লেখক এই অভিনব জগতের প্রতিনিধি।

ইয়োরোপীয় নারী-জীবন সম্বন্ধে ভারত-সন্তানের জ্ঞান নেহাৎ কম।

দিলীপকুমার এই দিকটায়ও নজর দিয়াছেন। অধিকন্তু ইহুদি স্ত্রী-পুরুষকেও ইনি বন্ধুরূপে চিনিয়াছেন। ইহুদিরা অবশ্য ইয়োরোপীয়ান-দের চিন্তায় 'সমাজিক' হিসাবে 'অস্পৃশ্য', 'পেরিয়া'।

এই ধরণের বহুপ্রকার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে যুবক ভারতের চিন্তামণ্ডল বহুত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

(৮)

জার্ম্মাণির নগরে-নগরে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ চৌধুরীর সবিশেষ অভ্যর্থনা হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সমাজের নানা মহলে এই চৌধুরী-সংবর্দ্ধনার ফলে ভারতীয় শিক্ষা ও শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা জার্ম্মাণিতে প্রচারিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণির সংবাদপত্রে বিদেশী মেসোফিরদের ছবি বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের ছবি ছাপা হইয়াছে একাধিক বার। তাহা ছাড়া বহু কাগজেই ইঁহার পর্য্যটন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

'কাইজার ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ইন্‌ষ্টিটুটের' জগৎ-প্রসিদ্ধ রাসায়নিক শ্রীযুক্ত হাবার বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষের কোন কথা জার্ম্মাণিতে জানিবার উপায় নাই। তাহার ব্যবস্থা করা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।" 'রাইখ্‌স্‌ ফার্ব্বাণ্ড ড্যর ড্যয়েচন ইণ্ডুষ্ট্রী' নামক ফ্যাক্টরি-সঙ্ঘের কর্ত্তারা চৌধুরীর সঙ্গে ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। বড় বড় এঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক এবং পণ্ডিতের সঙ্গেও ইঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। বার্লিনের শিক্ষা-সচিব কার্লবেকার ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া টেক্‌নিক্যাল বিভাগের নামজাদা লোক জনের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন।

লাইপৎসিগ এবং বার্লিনের বিপুল শিল্প-সঙ্ঘের মালিক ও পরি-চালকগণ ভারতীয় ছাত্রগণের জন্য সুযোগ কায়েম করিতে প্রতিশ্রুত

লোহালক্কড়ের কারখানায়ও চৌধুরী মহাশয় শিল্পশিক্ষার্থীদের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। জার্ম্মাণরা ভারত-সন্তানকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত,—এই অভিজ্ঞতা লাভ ইঁহার পক্ষে অশেষ উৎসাহের কারণ হইয়াছে।

ইনি বহুবার বিলাতে যাওয়া-আসা করিয়াছেন। জার্ম্মাণিতে এই প্রথম। বিলাত ছাড়াও যে বিদেশ আছে, আর সেই সকল বিদেশেও যে বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ হইয়া থাকে, এই জ্ঞান প্রবীণ ভারতবাসীদের একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। চৌধুরী মহাশয় 'বৃদ্ধ বয়সে' এই জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া বোধ হয় এক নব-জীবন লাভ করিয়া থাকিবেন। প্রবীণ জননায়কগণের এইরূপ নব-জীবন লাভ যুবক ভারতের জীবন-স্পন্দনেরই অন্যতম লক্ষণ।

(৯)

এক মারাঠা যুবক মাধবরাও যাধব বিলাতে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গ্রামার স্কুল' নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে মাষ্টারি করিয়াছেন। ইংরেজ ছাত্রদিগকে ইনি পড়াইতেন জার্ম্মাণ এবং ফরাসী। অষ্ট্রিয়ার গ্যেটে স্বরূপ নাট্যকার গ্রিলপার্ৎসার সম্বন্ধে যাধব একজন বিশেষজ্ঞ।

ইনি বিলাতী বয়স্কাউট আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত স্কাউট-মাষ্টার। পঁচিশ ত্রিশ জন ইংরেজ স্কাউটদের দলপতিরূপে ইনি ফ্রান্সের নানা অঞ্চলে ফরাসী এবং বেলজিয়ান ও মার্কিন স্কাউটদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। কেম্ব্রিজের দু'একজন ইংরেজ গ্রাজুয়েট ইঁহার অধীনে হুকুম তামিল করিয়াছে। যুবক ভারতের জীবনে এ এক বিচিত্র ঘটনা।

যাধব জার্ম্মাণির বড় বড় শিক্ষা ও শিল্প-কেন্দ্রে মোসাফিরি করিয়াছেন। ভারতবাসীর সঙ্গে জার্ম্মাণদের সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন

পণ্ডিতগণের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়াছেন। পরে ইঁহার তত্ত্বাবধানে বোধ হয় পুনায় এই উদ্দেশ্যে এক কর্ম্ম-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ আইনে নারীজাতি

জার্ম্মাণিতে এতদিন কোন স্ত্রীলোক উকিল, অ্যাটর্ণি বা জজ হইতে পারিত না। সম্প্রতি নয়া এক আইন জারি হইয়াছে। এখন হইতে জার্ম্মাণ মহিলারা জজিয়তি করিতে পারিবেন, ওকালতি করিতে পারিবেন এবং আইন সম্পর্কিত সকল দলিলপত্রের সাক্ষী হইতে পারিবেন।

জার্ম্মাণ নারীদের এইরূপ ক্ষমতা ভোগ করার বিরুদ্ধে নানাকথা উঠিয়াছিল। অনেক জার্ম্মাণ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন—"স্ত্রীজাতি এই ধরণের পুরুষোচিত কাজের উপযুক্ত নয়। স্ত্রীলোকের শরীর ও চিত্ত পুরুষের দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র।" কিন্তু উল্টা পক্ষ বলিয়াছেন—"তাহা হইলে লড়াইয়ের সময়ে জগতের নারী জাতি ঠিক পুরুষের মতন পুরুষের কাজ করিয়াছিল কি করিয়া?"

অধ্যাপক কেইন্‌সের জার্ম্মাণ-প্রীতি

ইংল্যাণ্ডের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেইন্‌স্ ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে আর একখানা কেতাব লিখিয়াছেন। এই কেতাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এবং জার্ম্মাণির স্বপক্ষে মতপ্রচার করা হইয়াছে। কেইন্‌সের মত দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে সুপরিচিত। বিশ্ববাসী কেইন্‌স্‌কে 'ধন্য ধন্য' করিয়া প্রশংসা করিতেছে। সকলেই বলিতেছে—"আহা, ইংরেজ 'পণ্ডিতটী কি মানব-সেবক। ইংরেজ জাত কি পরোপকারী।"

মিত্রও নন। তিনি আগা-গোড়া কট্টর 'স্বদেশী'। তিনি তাঁহার দুই কেতাবে একমাত্র কথা প্রচার করিয়াছেন। সেই কথার সারমর্ম্ম :— "জগতে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য বিস্তার।" দুনিয়ায় বৃটিশ বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যকে যথোচিত স্থির ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার জন্যই কেইন্‌স্ জার্ম্মাণির বন্ধু সাজিয়াছেন এবং ভার্সাই সন্ধি রদ করিবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছেন। ইনি ইংরেজ জাতিকে সর্ব্বদা শিখাইতেছেন —"চাচা, আপন বাঁচা।"

কেইন্‌স্ বলিতেছেন—"ধরা যাউক যেন ভার্সাইয়ের শর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মাণি ইংল্যাণ্ডকে কোটি কোটি সোনার মোহর বুঝাইয়া দিবে। কিন্তু এই টাকা পাইয়াও ইংল্যাণ্ডের লাভ আছে কি? বিলকুল নাই। ইহাতে ইংরেজ জাতের আগা-গোড়া লোকসান দেখিতেছি।"

সকল লোকে এই লোকসানটা বুঝিতে পারিতেছে না। তাহাদিগকে কেইন্‌স্ বুঝাইতেছেন—"জার্ম্মাণি ইংল্যাণ্ডকে সোনার টাকা দিবে কোথা হইতে? এই টাকা আসিবে জার্ম্মাণির বহির্ব্বাণিজ্যের আয় হইতে। তাহা হইলে জার্ম্মাণ মাল বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে। জার্ম্মাণ মালের রপ্তানি বিদেশে বাড়িতে থাকিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বেপারীদের বাজার ইংরেজের হাত হইতে জার্ম্মাণদের হাতে আসিয়া পড়িবে। ইহাই ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যার-পর-নাই শোচনীয় অবস্থা। সেই দুরবস্থা এড়াইবার জন্য ইংল্যাণ্ডকে এক নয়া পথে চলিতে হইবে। সেই নয়া পথের নাম ভার্সাই সন্ধি ভাঙ্গিয়া ফেলা।"

এই ধরণের যুক্তি দেখাইয়া কেইন্‌স্ বলিতেছেন—"জার্ম্মাণির নিকট হইতে ইংল্যাণ্ড যত টাকা পাইবে, সেই সব টাকা তামাদি বিবেচনা করাই ইংরেজ জাতের পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য।" ভারতবাসী কেইন্‌সের ধড়িবাজি বুঝিতে পারিবেন কি?

জর্ম্মাণির শিল্প-মেলা

জার্ম্মাণিতে শিল্পমেলা লাগিয়াই আছে। এই সেদিন লাইপৎসিগে, ব্রেসলাওয়ে, ফ্রাঙ্কফোর্টে বিপুল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। শীঘ্রই অন্যান্য শহরে নানা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে।

মিউনিক শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় মেলা বসিবে। এই মেলা চলিবে তিন মাস ধরিয়া। গোটা জার্ম্মাণির শিল্প, উদ্যোগ 'ধান্ধা' মিউনিকে প্রদর্শিত হইবে।

রাইন প্রদেশের শিল্প-নগর ডিস্‌সেল-ডোর্ফে এক মেলা বসিবে। সেখানে নগর-শাসন সম্পর্কিত সকল প্রকার অনুষ্ঠান দেখানো হইবে। রাস্তা ঘাট পরিষ্কার করিবার কল-যন্ত্র এবং কার্য্য-প্রণালী এই প্রদর্শনীর প্রধান জিনিষ।

ড্রেস্‌ডেন শহরে যে মেলা বসিবে তাহাতে জার্ম্মাণির সকল প্রকার মাটি দেখানো হইবে। কোন্ মাটি ব্যবহার করিয়া কোন্ কোন্ বাসন প্রস্তুত করা যায়, তাহার আলোচনা করাই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। রাসায়নিক ওস্তাদরা এই প্রদর্শনীতে অনেক নয়া জিনিষ শিখিতে পারিবেন।

জার্ম্মাণ সাহিত্যের নয়া ক্লাসিক

হাউপ্‌ট্‌মান

জার্ম্মাণ সাহিত্যের গ্যেটে এবং শিলার ভারতবর্ষে সুপরিচিত। কিন্তু এসব সাহিত্য ১৮৩০ সালের আগেকার কথা। অর্থাৎ এই-সকল কাব্য-নাট্য-উপন্যাসে জার্ম্মাণির 'সত্য যুগের' বাণী শুনিতে পাই। এইগুলিকে বলে জার্ম্মাণ 'ক্লাসিক'।

ভারতবাসী আর-কোনো জার্ম্মাণ সাহিত্য-বীরের নাম শুনিয়াছেন

কি ? বোধ হয় হাউপ্‌ট্‌মানের নাম ভারতে অপরিচিত নয়। ইঁহার 'ভেবার' (তাঁতী) নামক নাট্য জগৎ-প্রসিদ্ধ। রচনায় ঝাঁজ আছে। ১৮৯২ সালের লেখা। বর্ত্তমান জগৎ, বর্ত্তমান সমাজ, সমসাময়িক সওয়াল—এই সবই কবিবরের নাট্যে প্রধান স্থান পাইয়াছে। 'রোজে ব্রাণ্ড্‌' নামক নাটকে সিলেশিয়া জেলার এক কিষাণ-কন্যার 'সামাজিক সমস্যা' আলোচিত দেখিতে পাই। হাউপ্‌ট্‌মানের বয়স ষাট পার হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমগ্র জার্ম্মাণি ভরিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

নীট্‌শে

আর একজন জার্ম্মাণ সাহিত্যসেবীর নাম লড়াইয়ের যুগে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শক্তি-যোগের প্রচারক নীট্‌শে (১৮৪৪-১৯০০) ছিলেন সন্দর্ভ-লেখক। ইঁহাকে জোর-জবরদস্তি করিয়া 'কবি' অথবা দার্শনিক বলা হয়। কিন্তু দুঃখবাদী দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের রচনার মতন নীট্‌শের রচনাও জার্ম্মাণ গদ্য সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ্‌। 'ষ্টাইল' বা লিখিবার কায়দার জন্য দুই জনই জার্ম্মাণিতে বহুকাল বাঁচিয়া যাইবেন। নীট্‌শের 'আল্‌জ্‌ স্প্রাখ্‌ ৎসারাথুষ্ট্রা' (জরথুস্ত্রের বাণী) জার্ম্মাণ ভাষার এক ক্লাসিকরূপে ভারবর্ষেও সুপরিচিত থাকিবে। আজকাল এটা অবশ্য ইংরেজি তর্জ্জমায় মাত্র জানা আছে। কিন্তু মূল জার্ম্মাণ গ্রন্থটার দিকেও শীঘ্রই ঝোঁক পড়িবে।

গ্রিলপাৎ‌সার

জার্ম্মাণ-ভাষা আমাদের জানা ছিল না। কাজেই এতদিন

সঙ্গে পরিচয় সাধিত হইত। কিন্তু বিশাল জার্ম্মাণ এবং অষ্ট্রিয়ান সাহিত্যের অতি সামান্য অংশই ইংরেজিতে অনূদিত।

অষ্ট্রিয়ার গ্যেটে-স্বরূপ কবিবর গ্রিল্‌পার্ৎসার এই কারণে আজও উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় সমাজে অপরিচিত। ইহার গল্পগুলা অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মাণ সাহিত্যের রত্ন-বিশেষ। 'ড্যর আর্মে স্পীল্‌মান' নামক আখ্যায়িকায় গ্রিল্‌-পার্ৎসার এক দরিদ্র সঙ্গীত-শিল্পীর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রীক্ এবং রোমান কথাবস্তু লইয়া তাঁহার কতকগুলা নাটক রচিত।

জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ায় বহুকাল ধরিয়া রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক আড়া-আড়ি চলিয়াছিল বলিয়া গ্রিল্‌পার্ৎসার্‌কে 'জার্ম্মাণ' সাহিত্যে ঠাঁই দেওয়া হইত না। এইরূপ বিদ্বেষ বহুদিন পর্য্যন্ত ইংরেজ-মার্কিনেও দেখা গিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যকে 'ইংরেজি' সাহিত্যের আসরে ঠাঁই দেওয়া বৃটিশ জাতির অভিপ্রেত নয়।

লিলিয়েনক্রোন্

ভাষায় দখল থাকিলে এতদিনে ভারতবাসী লিলিয়েনক্রোন্‌কে (১৮৪৪-১৯০৯) আপনার করিয়া ফেলিতে পারিত। কবিহিসাবে জার্ম্মাণরা ইহাকে বর্ত্তমান জার্ম্মাণির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকে। শব্দলালিত্য ইহার কাব্যের বিশেষত্ব নয়। সোজাসুজি জোরের সহিত স্পষ্ট কথা বলিয়া ফেলা লিলিয়েনক্রোনের স্বভাব। হয়ত কালে ইনি জার্ম্মাণির হুইটম্যান্-রূপে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইতে পারিবেন। শক্তিপূজার যুগে ইহার তলব পড়া অতি স্বাভাবিক।

নিবেলুঙ্‌গাথা

নিবেলুঙ-গাথা জার্ম্মাণ 'পুরাণ' সাহিত্যের নিজস্ব। এই গাথায়

আমলের জীবনরূপে আদর করিয়া থাকে। তখন জার্ম্মাণির লোকেরা প্রকৃতিপূজক দেবদেবীপূজক শক্তিসাধক নরনারীর আদর্শ প্রচারিত করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনেক যুগ পূর্ব্বেকার কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ সাহিত্যে সেই 'প্রাগ-ঐতিহাসিক' যুগের 'খাঁটি স্বদেশী' জার্ম্মাণ আদর্শের আলোচনা প্রবলভাবে দেখা দেয়। প্রাচীনে প্রীতি, ইতিহাস-নিষ্ঠা ইত্যাদি ধরণ-ধারণ রোমান্টিক সাহিত্য-শিল্পের এক বিশেষ লক্ষণ।

ভাগ্নার

নিবেলুঙ্ দিগের বীরত্বকাহিনী সঙ্গীত-নাট্যে প্রচার করিবার ভার লইয়াছিলেন ভাগ্নার (১৮১৩-৮৩)। নাট্যকারের জীগ্ ফ্রীড্ ('বিজিগীষু') চরিত্র জার্ম্মাণ সাহিত্যে অমরতা লাভ করিবে। যাঁহারা অপেরায় বসিয়া গানগুলি শুনিবার সুযোগ পাইবেন না তাঁহারা কাব্যহিসাবে ভাগ্নারের রচনাগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

হেব্বেল

এই-সকল গাথাই আর-এক সাহিত্য-বীরের রচনায় বিশেষ স্থান পাইয়াছে। তাঁহার নাম হেব্বেল (১৮১৩-৬৩)। কাব্য-সাহিত্যে লিলিয়েনক্রোনের যে ঠাঁই, নাট্য-সাহিত্যে জার্ম্মাণরা হেব্বেলকে সেই ঠাঁই দিয়া থাকে। অর্থাৎ গ্যেটে-শিলারের পরবর্ত্তী যুগে এই দুই কবি জার্ম্মাণির দুই নয়া 'ক্লাসিক'।

ফ্রাইটাগ ও ফোন্‌টানে

ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ

সন্ধান পাইতেছি। কিন্তু ইঁহাদিগকে জার্ম্মাণির বাহিরে কেহ জানে না। একজনের নাম ফ্রাইটাগ (১৮১৬-৯৫), অপর জনের নাম ফোন্‌টানে (১৮১৯-৯৮)। ফ্রাইটাগ্‌কে জার্ম্মাণ সাহিত্যের ডিকেন্‌স্‌ বলা যাইতে পারে। জার্ম্মাণির সমাজ-কথা নানা চরিত্রের ও ঘটনার ভিতর দিয়া বর্ণনা করিয়া যাওয়া ইঁহার রচনার বিশেষত্ব। উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস, রোমান্টিকতা, ভাবুকতা ইত্যাদির ধার ইনি ধারেন না। ভাষা প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। জার্ম্মাণে হাতে-খড়ি হইবার পরই ফ্রাইটাগের গল্পগুচ্ছ ধরা যাইতে পারে।

কোনো গল্পে আছে ব্যবসায়ীর ধরণ-ধারণ বিবৃত। কোন গল্পে পণ্ডিত লোকজনের জীবন-কথা আলোচিত দেখিতে পাই। 'জোল উণ্ড্‌ হাবেন' (অর্থাৎ দেনা-পাওনা) গল্প বেশ সরস।

ফ্রাইটাগের 'আনেন' (বা পূর্ব্ব-পুরুষ) নামক গল্প-ধারায় জার্ম্মা নর-নারীর যুগ-পরম্পরা বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থ পাঁচ-সাত খণ্ডে বিভক্ত। এই কেতাবে গ্রন্থকার তাঁহার স্বজাতিকে তাহাদের স্বদেশী আদর্শ পুরুষানুক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিলাতী কার্লাইলের 'হিরো-ওয়ার্শিপ্‌' বা বীরপূজার ধর্ম্ম ফ্রাইটাগের গল্প-সাহিত্যে মূর্ত্তি পাইয়াছে।

ফোন্‌টানের আখ্যায়িকা উপন্যাসগুলি আর ফ্রাইটাগ-পন্থী অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ। উদ্দীপনা-উন্মাদনার ছড়াছড়ি এই সাহিত্যে নাই। ইনি ভ্রমণ-কাহিনীও লিখিয়াছেন। নাট্যসমালোচনায়, চিঠি-সাহিত্যে এবং আত্মকাহিনীর সাহিত্যেও ফোন্‌টানের কলম চলিয়াছে।

বার্লিনের অনতিদূর উত্তরে মেখ্‌লেনবুর্গ জেলার প্রাকৃতিক আবেষ্টনে জার্ম্মাণরা গ্রীষ্ম-শফর করিতে ভালবাসে। এই অঞ্চলের 'সাগরদীঘি'গুলা ফোন্‌টানে সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মেথ্‌লেনবুর্গ প্রদেশ প্রায় তাই। ফোন্‌টানের গদ্য রচনা হ্রদগুলাকে এই ইজ্জদ দিয়াছে।

ষ্টিফ্‌টার

জার্ম্মাণ সাহিত্যের নয়া ক্লাসিকগুলির ভিতরও নানা রসেরই স্বাদ পাওয়া যায়। 'প্রকৃতি-পূজা'র ভক্তিরসটা বাদ পড়ে নাই।

প্রকৃতির বাণী—পাহাড়ের বাণী—বন-উপবনের বাণী জার্ম্মাণ শিল্পে প্রচুর। বস্তুতঃ জার্ম্মাণ নরনারী নিজেকে খোলা মাঠের ভক্ত প্রকৃতি-সেবক পল্লীপ্রিয়রূপে বর্ণনা করিতে ভালবাসে। ইহাদের বিবেচনায় ইহাদের সমান প্রকৃতি-নিষ্ঠ জাতি দুনিয়ায় আর নাই।

এই দাবী পরখ করিবার মতলবে ভারতবাসী ষ্টিফ্‌টারের রচনা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে পারেন। ইঁহার 'হোখ্‌ভাল্ড্‌' (পাহাড়ী বন) নামক গল্পে এই ধরণের অনেক কিছু পাওয়া যাইবে।

কার্ল্‌ ষ্টীলার

কিন্তু এই হিসাবে বোধ হয় জগতের এক শ্রেষ্ঠ কবি ব্যাভেরিয়ার কার্ল্‌ ষ্টীলার (১৮৪২-৮৫)। ব্যাভেরিয়ার পাহাড়ী পল্লীর কিষাণ মেষপালকেরা যে উপভাষায় কথা বলে সেই উপভাষায় গান রচনা করিয়া ষ্টীলার অশেষ যশ লাভ করিয়াছিলেন।

তাহা ছাড়া সাহিত্যের ভাষায়ও বহু উচ্চ শ্রেণীর কবিতা ইঁহার সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিতেছে। সরল সুললিত জার্ম্মাণ কবিতা উপভোগ করিবার জন্য ষ্টীলারের রচনা ঘাঁটিতে হইবে। জীবনের আদর্শে, রচনার আদর্শে ইঁহাকে হাইনে-শিলার ইত্যাদির সমকক্ষ অথবা এক-গোষ্ঠীভুক্ত বলা যাইতে পারে। হাইনের প্রভাব ষ্টীলার-কাব্যে

অনেক। ইহার 'ভিণ্টার-ইডিল' (শীতের গান) জার্ম্মাণদের মুখে মুখে চলিতেছে।

কার্ল ষ্টীলারের গদ্য-সাহিত্যে পল্লী-মাহাত্ম্য ও কিষাণ-মাহাত্ম্য লেখকের নিবিড় 'ভক্তিযোগের' সাক্ষ্য দিতেছে। প্রকৃতি-পরায়ণতা, পর্ব্বত-প্রভাব ইত্যাদির ছাপ এই সাহিত্যবীরের জীবনে ও রচনায় বিশেষ পরিস্ফুট। স্বাধীনতা এবং জনসাধারণ ষ্টীলারের পরম প্রিয় বস্তু ছিল।

তখনকার দিনে প্রুশিয়ায় এবং ব্যাভেরিয়ায় আড়াআড়ি আর পরস্পর-হিংসা যার-পর-নাই প্রবল ছিল। ব্যাভেরিয়াকে 'জার্ম্মাণ সমাজে' প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রপাগাণ্ডার অর্থাৎ প্রচার-কার্য্যের দরকার হইত। এই কাজে প্রপাগাণ্ডিষ্ট ছিলেন ষ্টীলার। ব্যাভেরিয়ার সমাজ, সভ্যতা, শিল্প ইত্যাদি বস্তু উত্তর-জার্ম্মাণিতে সুপরিচিত করিবার জন্য ষ্টীলার বক্তৃতা করিয়াছেন এবং প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেইগুলি 'হোখ-লাণ্ড্স্ বিল্ডার' বা পর্ব্বত-চিত্র নামে একত্র প্রচারিত। এই-সকল লেখায় ব্যাভেরিয়ার গৌরব-কথা অতি সহজ জার্ম্মাণে জানিতে পারা যায়।

হোফেনস্ঠাল

'পাহাড়ী গীতাবলীর' প্রণেতাহিসাবে জার্ম্মাণির ষ্টিফ্টার এবং ষ্টীলারের মতন অষ্ট্রিয়ার হোফেন্স্ঠাল্ এবং পিথ্লার্ও জার্ম্মাণ সাহিত্যের ক্লাসিক। এই দুই অষ্ট্রিয়ান লেখকই টিরোলের লোক।

বলা বাহুল্য, টিরোলের প্রত্যেক কবি এবং গল্পলেখকই আল্প্স্-প্রেমিক, প্রকৃতি-পূজক, বন-ভক্ত। হোফেন্স্ঠালের গল্পে টিরোলের পল্লীগুলি জার্ম্মাণ সমাজে অমর হইয়া রহিয়াছে।

পিথ্লার

পিথ্লার (১৮১৯-১৯০০) ছিলেন ষ্টীলারের মতন স্বাধীনতার কবি, জনসাধারণের কবি। জার্ম্মাণ-ভাষী যে কোন জনপদের জন্য

লড়াই করিবার উদ্দেশ্য ইনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। 'য়ুঙ-টিরোল' (যুবক টিরোল) নামক সঙ্ঘ কায়েম করিয়া পিথ্‌লার আল্প্‌স্‌ পাহাড়ের জার্ম্মাণ সমাজে 'বৃহত্তর জার্ম্মাণি'র রাজপথ তৈয়ারি করিতে প্রবৃত্ত হন। আজ কালকার জার্ম্মাণিতে এবং অষ্ট্রিয়ায় বিস্‌মার্ক-পন্থী 'ডয়েচ নাট্‌সিওনাল' দল যে রাষ্ট্রীয় মত পোষণ করিয়া থাকে, ষ্টীলার এবং পিথ্‌লার উভয়েই সেই মতের প্রচারক ছিলেন।

পিথ্‌লারের কাব্য 'মার্ক্‌ষ্টাইনে' নামে প্রচারিত। ষ্টীলারের 'ভিণ্টার ইডিল' (শীতের গান) অথবা 'হোখ্‌লাণ্ড্‌স্‌-লীডার' (পাহাড়ী গান) ইত্যাদির সঙ্গে এই-সকল কবিতা প্রকৃতি-প্রেমিকের সমাদর পাইবার যোগ্য। পিথ্‌লারের 'ৎস্থ মাইনার ৎসাইট্‌' নামক জীবন-স্মৃতি বিষয়ক গন্থ-রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ (অষ্ট্রিয়ান) জীবন-প্রথা-চিত্রিত রহিয়াছে।

ষ্টীলার ছিলেন ঐতিহাসিক গ্রন্থশালার রক্ষক। তাঁহার পিতা জোসেফ ষ্টীলার জার্ম্মাণির এক অতি প্রসিদ্ধ চিত্রকর। ব্যাভেরিয়ার রাজ-দরবারে ইনি ছিলেন সরকারী শিল্পী। রাজরাজড়াদের ছবি আঁকিবার জন্য ইঁহার ডাক পড়িয়াছিল সুদূর রুশিয়ায়ও। ইঁহার আঁকা গ্যেটে চিত্র নামজাদা। পিথ্‌লার ছিলেন চিকিৎসক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের সেবক, ভূতাত্ত্বিক। পিথ্‌লারকে টিরোলের স্বদেশ-সেবক মাত্রেই আজও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

জীমেন্স-শুকার্ট তড়িতের কারখানা

বার্লিনে যে সকল ভারতবাসী বেড়াইতে আসিয়াছে তাহাদের অনেকেই জীমেন্স-শুকার্ট কোম্পানীর তড়িতের কারখানার নাম শুনিয়াছে। কেহ কেহ কারখানার কোনো কোনো বিভাগ

দেখিবার সুযোগও পাইয়াছে। বর্ত্তমানে দু একজন ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার এই কারখানায় কাজ করিতেছেন।

বিদ্যুতের সাহায্যে যে-সব শিল্প ও ব্যবসা চলে, তাহার সকলগুলাই এই কারখানার সামিল। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, অটোমোবিল, আলোক, ডাইনামো ইত্যাদি কোনো বিভাগের যন্ত্রপাতি তৈয়ার করাই এখানে বাদ পড়ে না। কারখানার বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে সর্ব্বসমেত প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী।

মস্ত মস্ত ইমারত,—অনেকগুলা,—কারখানার সম্পত্তি, বলাই বাহুল্য। বার্লিনের যে অঞ্চলে জীমেন্সের ফ্যাক্টরি সমূহ অবস্থিত সেই অঞ্চলকে জীমেন্সষ্টাট বা জীমেন্স-নগর বলে।

জীমেন্স শুকার্ট কোম্পানীর মজুরদের মধ্যে বহু সংখ্যক কানা খোঁড়া হাতভাঙ্গা লোক দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ইহারা সকলেই অন্যান্য সুস্থ সবল মানুষের মতই কাজ কর্ম্ম করে। ইহাদিগকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিবার দিকে কোম্পানীর বিশেষ দৃষ্টি।

(২)

লড়াইয়ের ফলে জগতের সর্ব্বত্র বহু লোকের অঙ্গহানি হইয়াছে। কেহ দেখিতে পায় না, কেহ হাঁটিতে পারে না, কেহ হাতে ধরিতে পারে না। এই সকল লোকের জীবন ধারণ করিবার উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা পণ্ডিত গবেষণা করিতেছেন। জীমেন্স-নগরের এঞ্জিনিয়ারেরা জার্ম্মাণ মজুরদের জন্য যে সকল পথ বাহির করিয়াছেন, সেগুলা লোকহিতবিধায়ক অনুষ্ঠানের মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য।

আহত লোকজনকে সকল প্রকারে পুনরায় কর্ম্মক্ষম করিয়া তোলাকে ইংরাজিতে বলে 'রি-এডুকেশন'। জীমেন্স কারখানার পুনর্জীবনপ্রাপ্ত মজুরেরা অতিশয় জটিল যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে।

কোনো কোনো মজুর এক সঙ্গে দুইটা যন্ত্রের সেবা করিয়া থাকে। সূক্ষ্মতম মাপজোকের কাজেও ইহাদিগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অধিকন্তু কাটা চাঁছা পালিশ করা ইত্যাদি মামুলি হাতের কাজে ইহারা ত বাহাল হইয়া থাকেই।

বর্ত্তমানে ৭৭ জন অন্ধ মজুর এই সকল ফ্যাক্টরিতে কাজ করিতেছে। মোটের উপর ১৮০ জন জীমেন্স-কারখানায় পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সংখ্যার অর্দ্ধেক এক্ষণে নিজ নিজ পল্লী-শহরে পুরাণা কাজ সামলাইতেছে। হাত পা-ভাঙ্গা অন্ধের সংখ্যা ইহাদের ভিতর অনেক ছিল। এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত প্যলস্ এই সকল হতভাগ্য লোকের পুনর্জ্জীবনলাভের জন্য প্রাণপণ যত্ন লইয়াছেন।

(৩)

জীমেন্স-শুকার্ট কোম্পানীর কারখানাগুলা নিজেই অতি বৃহৎ। এই বৃহদাকার কারখানার সঙ্গে আর এক বৃহদাকার কারখানার যোগ আছে। তাহার নাম জীমেন্স উণ্ড হাল্‌সকে। এই কোম্পানীর নামও ভারতে সুবিদিত। জীমেন্স উণ্ড হাল্‌সকের যন্ত্রপাতি জগতের সকল বিজ্ঞানশালায় এবং ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোটের উপর এই দুই জীমেন্স কোম্পানীতে এক লাখ মজুর ও এঞ্জিনিয়ার কাজ করে।

সম্প্রতি—লড়াইয়ের পর—জার্ম্মাণির প্রত্যেক কারবারে বিপুল সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নগরের বিদ্যুতের কারবারগুলাও এক দল বাঁধিয়াছে। জীমেন্স-কারখানাগুলার সঙ্গে ক্রোরপতি ষ্টিন্নেসের অধীনস্থ গেল্‌জেনকির্খেন এবং অন্যান্য শহরের কারখানা সম্মিলিত হইয়াছে। এই বিশাল 'ট্রাষ্ট' (পরিষৎ) আশী বৎসরের জন্য চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরস্পর আড়াআড়ি কমাইয়া বিদেশী বিদ্যুৎ-ট্রাষ্টের সঙ্গে টক্কর দেওয়া এই চুক্তির উদ্দেশ্য। রুর অঞ্চলের

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলাকে নিজের সামিল করিয়া লওয়া ১৯০২ সাল হইতে এই ব্যাঙ্কের ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

১৯০৩ সাল হইতে 'ড্রেস্ড্নার ব্যাঙ্ক'ও এই পথের পথিক।

(২)

ব্যাঙ্কগুলার আকার বাড়িয়া যাইবার ফলে জার্ম্মাণির সকল প্রকার কৃষি শিল্প ও ব্যবসা টাকার বাজারে বিশেষ সাহায্য পাইতেছে। প্রত্যেক বড় ব্যাঙ্কই রুর অঞ্চলের লোহা ও কয়লার কারখানায় হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। সিলেশিয়ার লোহা এবং কয়লার ফ্যাক্টরি-গুলাও প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই তাঁবে রহিয়াছে।

হানোভার প্রদেশে কৃষির জন্য সার তৈয়ারি হয়। ব্যাঙ্কগুলা এই সারের ব্যবসায়ও সাহায্য করিতেছে। স্যাক্সনি প্রদেশে জার্ম্মাণদের কারখানা অনেক। খাদ্যদ্রব্যের ফ্যাক্টরিও স্যাক্সনির এক বিশেষত্ব। ব্যাঙ্কের সাহায্য এই সকল দিকেও যথেষ্ট। রাইন দরিয়ার উপর মাল-যাতায়াতের ব্যবসা বিপুল। সেই ব্যবসায়ও ব্যাঙ্কগুলার হিস্সা অনেক।

জার্ম্মাণির আর্থিক ক্রমবিকাশের একটা কথা ভারতবাসীর বিশেষ মনোযোগের বিষয়। ১৮৭০ সালে যখন জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠিত হয়, তখন ব্যাঙ্কগুলা অতি সামান্য অবস্থায় ছিল। সেই সময়ে ছয়টা সর্ব্ব-প্রধান ব্যাঙ্কের সমবেত তহবিল ১৬২,৮০০,০০০ মার্কের বেশী ছিল না। এক মার্কের দাম প্রায় বার আনা।

ব্যাঙ্কগুলা পঁচিশ বৎসরেও বশী ফুলিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৮৯৫ সনের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির টাকার বাজারে কোনো চটকদার ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী দশ বৎসরে জার্ম্মাণির ব্যাঙ্কগুলা আশ্চর্য[redacted]ক রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। ১৮৯৫ হইতে ১৯০৫ সনের ভিতর জার্ম্মাণি বর্ত্তমানের বিপুল সম্পদ-সৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াছে।

ভাস্কর-শিল্পে জার্ম্মাণি

(১)

দেবদেবীর প্রতিমা গড়া ছাড়া বর্ত্তমান ভারতে ভাস্কর-শিল্পের পরিচয় একদম পাই না বলিলেই চলে। আজকাল কয়েকজন মারাঠা এবং বাঙালী শিল্পী ভাস্কর্য্যে হাত দেখাইতে সুরু করিয়াছেন মাত্র।

এমন কি মধ্যযুগের ভারতেও মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রের আওতার বাহিরে কোনো স্থপতি তাঁহার শিল্পক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। মহারাষ্ট্র দেশের মালবার নগরে সম্রাট্ শিবাজীর এক প্রস্তরমূর্ত্তি সাবেক কাল হইতেই দাঁড়াইয়া আছে শুনিয়াছি। কিন্তু এই ধরণের কাজে বোধ হয় এইটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আরও প্রাচীনতর যুগের সাক্ষী স্বরূপ মহারাজ কণিষ্কের মূর্ত্তি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরার সরকারী সংগ্রহালয়ে অনেকেই এটা দেখিয়া থাকিবেন।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার যে-কোনো দেশেই যাই, দেখিতে পাই যে, ভাস্কর্য্য একমাত্র মন্দির, গির্জ্জা বা ধর্ম্মগৃহেরই একচেটিয়া শিল্প নয়। কিন্তু সেকালে অবশ্য ভারতের মত পশ্চিমেও এইরূপই ছিল। ভাস্কর-শিল্পীকে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বাহন বিবেচনা করা চলিত। একালে প্রত্যেক বড় বড় শহরের রাস্তায় বাগিচায় পৌরভবনে নানাপ্রকার মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এইগুলা গড়িবার জন্য শিল্পীও সকল দেশে বিস্তর।

মূর্ত্তিগড়া শিল্পীর একটা সখ মাত্র নয়। ইহা একটা ব্যবসাও বটে। মূর্ত্তি গড়িয়া শিল্পীরা অন্নসংস্থান করিয়া থাকেন। কবি, লেখক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি শ্রেণীর সুধীদের মতন স্থপতিরাও

(২)

বর্ত্তমান ভারতের বাগ-বাগিচা, সরকারী বাড়ী, পাঠশালা, সংগ্রহালয় প্রায় সবই বিদেশীর হাতে। কাজেই এইগুলাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য যে-সকল শিল্প আবশ্যক, সবই বিদেশীরা স্বজাতীয় ওস্তাদগণের হাতে গড়াইয়া থাকেন। কি নগর-নির্ম্মাণ, কি রাস্তা-নির্ম্মাণ, বর্ত্তমান ভারতের প্রত্যেক বাস্তু কার্য্যেই বিদেশীয় শিল্পী ও কারিগরেরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছেন। ভারতীয় দেবদেবী এবং মন্দিরগুলা যদি ভারতবাসীর হাতে না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মসংক্রান্ত ভাস্কর-শিল্পও এতদিনে ভারতীয় শিল্পীর আওতা হইতে বাহিরে চলিয়া যাইত।

পরাধীনতার ফলে ভারতবাসী যতগুলি ক্ষমতা হারাইয়া বসিয়াছে, তাহার ভিতর ভাস্কর্য্যের শিল্পক্ষমতা অন্যতম। স্বাধীন দেশে বেড়াইতে আসিলে ভারতীয় পর্য্যটক মাত্রেই শিল্পের তরফ হইতে স্বদেশের দুর্গতি প্রতি পদবিক্ষেপে বুঝিতে পারেন। স্বরাজ স্থাপিত না হইলে ভারতে স্থপতি-বিদ্যা উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

শিল্পের উন্নতি ও প্রসার পয়সা-সাপেক্ষ। গরীব লোকেরা কুঁড়ে ঘরে প্রিয়তম বস্তুও আনিয়া মজুদ করিয়া রাখিতে পারে না। নগর-পল্লীর কর্ত্তারা, পৌরভবনের কর্ত্তারা, সংগ্রহালয়ের কর্ত্তারা সরকারী টাকা খরচ করিতে রাজি থাকিলেই দেশের পল্লীশহরের শিল্পীরা নিজ নিজ ওস্তাদি দেখাইবার জন্য ঝুঁকিতে পারে। ইয়োরামেরিকায় ভাস্করশিল্প এইরূপ সরকারী অর্ডারের সাহায্যেই নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিয়াছে।

(৩)

পশ্চিম মুল্লুকের লোকেরা জার্ম্মাণদিগকে মূর্ত্তিশিল্পে পাকা কারিগর

বিবেচনা করে না। জার্ম্মাণেরা বিজ্ঞানে ওস্তাদ, দর্শনে ওস্তাদ, ব্যবসায় ওস্তাদ, লড়াইয়ে ওস্তাদ এবং সঙ্গীতে ওস্তাদ। এই-সকল দিকে জার্ম্মাণির খ্যাতি ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই রটিয়াছে। কিন্তু সুকুমার শিল্পের আসরে জার্ম্মাণ জাতিকে পশ্চিমারা আজও সম্মান করে না। পশ্চিমাদের এই বিচার যুক্তিসঙ্গত নয়। কি মধ্যযুগে, কি বর্ত্তমানকালে জার্ম্মাণরা সুকুমার শিল্পে অনেক উঁচুদরের সৃষ্টি সাধন করিয়াছে। সেইগুলা কোন হিসাবেই অন্যান্য পশ্চিমা শিল্পের তুলনায় খাটো নয়। ভারতীয় পর্য্যটকেরা জার্ম্মাণিতে আসিলে ফ্যাক্টরিগুলা দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ স্থাপত্যের সংগ্রহগুলা দেখিতে ভুলিলে অনেক বিষয়ে দরিদ্র থাকিয়া যাইবেন।

ভারতীয় শিল্পীদের সংসারে ইতালীর নাম আছে এবং ফ্রান্সেরও নাম আছে। কিন্তু আমাদের বিদেশ-প্রীতি বা 'বিদেশী-আন্দোলন'কে এই দুই দেশের সুকুমার কলায় অথবা প্রাচীন গ্রীসের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতেই আটক রাখা ঠিক নয়। রূপের রসে জার্ম্মাণরা কোনো দিনই বঞ্চিত ছিল না। আজও ইহারা এই রসে বঞ্চিত নয়—এই ধারণা ভারতের জ্ঞানমণ্ডলে প্রচারিত হওয়া উচিত।

(৪)

ফরাসী স্থপতি রদ্যাঁর সমসাময়িক জার্ম্মাণ ওস্তাদের নাম হিল্‌-ডেব্রাণ্ড্। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিক শহরে ইহাঁর কাজের এক বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে রদ্যাঁর প্রভাব কমিতে থাকে। বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণির ভাস্করেরা অনেকেই কিছু না কিছু হিল্‌ডেব্রাণ্ডের শিল্প হইতে শক্তি লাভ করিয়াছেন। সাহিত্যে হাউপ্‌ট্‌মানের যে স্থান, ভাস্কর্য্যে হিল্‌ডেব্রাণ্ডের সেই স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই শহরে 'মাক্‌সিমিলিয়ান-প্লাট্‌স' নামক চৌরাস্তার উপর এক ঝরণা আছে। ন্যুর্ণ্‌ব্যার্গ্‌ ইত্যাদি শহরের মধ্যযুগের ঝরণাগুলি জার্ম্মাণিতে এবং ইয়োরোপে প্রসিদ্ধ। এই পৌর-ঝরণাসমূহ একসঙ্গে বাস্তুশিল্প এবং ভাস্করশিল্পের কেন্দ্র-স্বরূপ। মাক্‌সিমিলিয়ান প্লাট্‌সের পৌর-ঝরণার আবেষ্টনকে ভাস্কর্য্যে অলঙ্কৃত করিবার ভার হিল্‌ডেব্রাণ্ডের হাতে পড়িয়াছিল। জার্ম্মাণরা তাঁহার হাতে গড়া বাস্তুর তারিফ করিয়া থাকে। ফ্রান্সেও বহু স্থপতি শড়কের চৌমাথায় স্থিত জলের ফোয়ারায় মূর্ত্তি বসাইয়া নামজাদা হইয়াছেন।

ঘরবাড়ী তৈয়ারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিগড়ার কাজ চালাইতে হয়। কাজেই স্থপতির পক্ষে মূর্ত্তিটার রূপ-কল্পনায় আশেপাশের আস্‌বাব সরঞ্জামগুলা বিশেষভাবেই বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। রূপ-রসের সৃষ্টিতে শিল্পীর হাত কিরূপ তাহা এই আবেষ্টনের ও আকাশের চতুঃসীমার সদ্ব্যবহার করিবার কৌশলে ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, এই কৌশল সম্বন্ধে নানা স্থপতি নানাপ্রকার রূপ-বৈচিত্র্যের পথ বাছিয়া লইয়াছেন।

অনেক সময়ে খোলামাঠে—আকাশের তলে—বাগানে—অথবা শড়কের ধারে মূর্ত্তি গড়িবার ফর্‌মায়েস আসে। শিল্পীকে তখন আবার এক নয়া সমস্যায় পড়িতে হয়। মূর্ত্তিটা খাড়া করিয়া তোলাই স্থপতির একমাত্র কাজ নয়। রূপের সঙ্গে আকাশের বা আবেষ্টনের কি সম্বন্ধ তাহা তলাইয়া মজাইয়া বুঝাই প্রত্যেক ভাস্কর-শিল্পের ওস্তাদপদবাচ্য গুণীর প্রধান কৃতিত্ব।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া হিল্‌ডেব্রাণ্ড্‌ 'ডাস্‌ প্রোব্‌লেম্‌ ডার ফর্ম্ম্‌' অর্থাৎ 'রূপ-সমস্যা' নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ফরাসী ওস্তাদ রদ্যাঁর চিন্তাও ভাস্কর্য-সাহিত্যে আদৃত হইয়াছে।

(৫)

বার্লিনের 'নাট্সিওনাল গালারী'র ময়দানে একটা সিংহমূর্ত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইটা গড়িয়াছিলেন গাউল। গত বৎসর (১৯২২) এই শিল্পীর মৃত্যু হইয়াছে। জানোয়ার গড়িয়া তিনি প্রসিদ্ধ

এক-একটা জানোয়ার আল্‌গা-আল্‌গাভাবে গড়িবার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। পশুগুলাকে বন্য দুর্দ্দান্ত অবস্থায় দেখানো তাঁহার শিল্পের লক্ষ্য নয়। উন্মাদনা, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদির প্রভাব গাউলের জানোয়ারে দেখা যায় না।

আবার পশুচিত্ত, জানোয়ার-হৃদয় ইত্যাদি বিশ্লেষণের দিকেও গাউল মাথা খেলান নাই। জীবজন্তুর যথাসম্ভব প্রাকৃতিক আকৃতি রক্ষা করাই ছিল তাঁহার স্থাপত্যের বিশেষত্ব। জুঅলজি বিদ্যার পণ্ডিতেরা গাউলের হাতের সাফাই প্রশংসা করিবেন। জ্যান্ত জানোয়ার স্থির-ধীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে,—এই দৃশ্য প্রস্তর বা ধাতু শিল্পে দেখিতে হইলে গাউলের চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিতে হইবে।

এই হিসাবে তাঁহার বনমানুষ বা মানুষ-বানর জীবটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। এইটাই গাউলের জীবনের শেষ কাজ। বার্লিনে 'আকাডেমী ডার কিন্‌ষ্টে' ভবনে এই মূর্ত্তি দেখানো হইয়াছিল। দর্শকেরা একটা জ্যান্ত নর-বানরের হাত পা মুখভঙ্গী পাথরের শিল্পে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া গাউল এইটার জন্য খাটিয়াছিলেন।

(৬)

প্যারিসের মতন বার্লিনেও বে-সরকারী প্রদর্শনী-ভবন অনেক আছে। এই-সকল ঘরে শিল্পদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা চিত্রকর ও ভাস্করদের কাজ দেখাইয়া থাকে। কেনা বেচার ব্যবস্থাও থাকে, বলাই বাহুল্য।

ভালার্ষ্টাইন্, কুর্লিট্ ইত্যাদি নানা কোম্পানীর আশ্রয়ে এইরূপ শিল্প-বাজার বসে।

এই-সকল বাজারে দুই মহিলা-শিল্পীর কাজ দেখা গিয়াছে। ইঁহারা দুই জনেই নারীমূর্ত্তি গড়িয়াছেন। মূর্ত্তিগুলা সবই দুঃখ-দারিদ্র্যও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। কোনো গড়নেই প্রাণ নাই, শক্তি বা স্বাস্থ্যও নাই। চোখমুখের ভিতর দিয়া হাহুতাশ বাহির হইতেছে। কতকগুলা শিশু লইয়া এক জননী বিব্রত,—দুর্ভিক্ষ এবং নৈরাশ্যের আবহাওয়া। আর-এক মূর্ত্তির লম্বা লম্বা মোচ্ড়ানো হাত-পার আবেষ্টনে অশান্তি উদ্বেগ এবং ব্যাধির উৎপীড়ন পরিস্ফুট

জীবনে আনন্দের অভাব দেখাইবার জন্যও জার্ম্মাণ শিল্পীরা বাটালি ধরে! দেখিবামাত্র মনে পড়িবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অনাহার-প্রপীড়িত হাস্যবিহীন মরণ-মাত্র-প্রত্যাশী ভারতীয় নরনারীর জীবন। এইগুলা কি জার্ম্মাণির বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় দৈন্যের সাক্ষী? না বোল্‌শেভিক বিপ্লবের অশান্তি কল্পনা করিয়া মহিলা স্থপতি উদ্ভট সৃষ্টি করিয়াছেন?

চিত্রশিল্পেও জার্ম্মাণরা এই ধরণের দৈন্য এবং অশান্তিকে রূপ দিতেছে। 'ডায়চে কুণ্‌শ্‌টাও' মাসিকে এক সমজ্‌দার বলিতেছেন—"এই ধরণের দুঃখ-কষ্টের মূর্ত্তিতে রুশ সাহিত্যবীর দস্তয়েব্‌স্কির প্রভাব বিরাজ করিতেছে।"

ভারতীয় দর্শক সহজেই অনুমান করিবেন,—জার্ম্মাণিতে কোনো এক গড়ন-রীতি অথবা শিল্পাদর্শ প্রভাবশালী নয়। এখানকার শিল্প-সংসারে একসঙ্গে বহুবিধ রসের, রূপের ও রীতির সৃষ্টি এবং প্রচার চলিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্‌প্‌স পাহাড়

(অক্টোবর-নবেম্বর ১৯২২)

ব্যাভেরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল

ব্যাভেরিয়ার বড় শহর ম্যিন্‌খেন (মিউনিক)। বিস্‌মার্কের যুক্তরাষ্ট্র-জার্ম্মাণসাম্রাজ্য যখন গড়িয়া উঠে নাই সেই যুগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিউনিককে জার্ম্মাণ সমাজের এথেন্স বলা চলিত। ব্যাভেরিয়ার 'বিক্রমাদিত্যরা' মিউনিকে নবরত্নের সভা বসাইয়াছিলেন। ১৮২০ হইতে ১৮৭০ সালের জার্ম্মাণ সভ্যতায় মিউনিক ছিল জ্ঞান-নেত্র। এই কারণে জার্ম্মাণ শিল্প, সাহিত্য ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে ম্যিন্‌খেনের ইজ্জৎ,—অনেক আজ্ঞায়,—এমন কি বার্লিনের চেয়েও বেশী। মিউনিকের পথে অষ্ট্রিয়ায় চলিতেছি।

সকাল হইয়াছে। রেলে বসিয়া দেখিতেছি দুইধারের জমিতে শরৎকালের শস্যকাটার চিহ্ন। কোথাও-কোথাও বলদের বা ঘোড়ার লাঙ্গলে ভূমি চষা হইতেছে। সর্ব্বত্র সবুজ পাইনের আবেষ্টন। পাইনকে বোধ হয় সংস্কৃতে বলা হয় "সরল"দ্রুম,—বর্ত্তমানে হিন্দীনাম 'চীড় কা পেঁড়'। পল্লীগ্রামের ঘরগুলার ছাদে লাল ইটের টালি। কুঁড়ে ঘর সব ছোট-ছোট। দেওয়ালগুলা শাদা।

রেল-যাত্রীদের মধ্যে ইতালিয়ান নর-নারীর ভিড় অনেক। জার্ম্মাণ সহযাত্রীদের অনেকেই ইতালীয় ভাষায় কথা কহিতে পারে। গাড়ীর ভিতরকার আসবাব বেশ আরামদায়ক। রাত্রিকালের

শয়ন-কামরা ইয়াঙ্কিদের পুলম্যান-কারের চেয়েও সন্তোষজনক। জার্ম্মাণরা সুখে-স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করিতে অভ্যস্ত।

গরু-বলদের গলায় ঘণ্টার আওয়াজ ভারতীয় পল্লীর কথা মনে করাইয়া দিতেছে। ক্ষেতে-ক্ষেতে যিশুখ্রীষ্টের অথবা 'মা-মেরী'র অথবা ঋষি-সাধু-'সেইণ্টে'র মূর্ত্তি খুঁটার উপর আঁকা। ঘর-বাড়ীর দেওয়ালেও এই সব চেহারা অঙ্কিত।

দক্ষিণ জার্ম্মাণির (ব্যাভেরিয়ার) লোকেরা ক্যাথলিক মতাবলম্বী খ্রীষ্টান। এই জনপদের নর-নারী অনেকটা হিন্দুদের মতনই মূর্ত্তি-পূজার অনুষ্ঠান করে। বার মাসে তের পার্ব্বন, দেবতার 'মানত', সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, উপোস, তীর্থভ্রমণ, কথায়-কথায় মা-মেরীর আরাধনা, কম্‌-সে-কম 'বোধিসত্ত্ব' স্বরূপ সেইণ্ট-মহাপ্রভুদের নাম স্মরণ করা ক্যাথলিকদের নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতি। অথচ ক্যাথলিকরা বলে, হিন্দুরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মূর্ত্তি পূজক, ধর্ম্মহীন, 'হীদেন'; আর হিন্দুমতে দুনিয়ার অহিন্দু সবলোক ত পশু, ম্লেচ্ছ, কদাচারী বটেই!

ক্রমশঃ অদূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। পাহাড়ী সবুজ পাইনের আওতায় মাঝে-মাঝে 'লালায়মান' লিণ্ডেন ও কাষ্টানিয়েন গাছের সোণালী বাহার চোখ দুটো টানিয়া রাখিতেছে। শীঘ্রই এই সব গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িবে। কিন্তু শীতেও পাইনগুলা সবুজই থাকে।

পাহাড়ের পায়ে-পায়ে রেলপথ। জার্ম্মাণির সীমানা পার হইয়া অষ্ট্রিয়ার ভিতর প্রবেশ করিলাম। অষ্ট্রিয়ার এই জনপদের নাম টিরোল।

টিরোল

টিরোল পাহাড়ী দেশ। যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই পাইন-ঢাকা পাহাড় দেখিতেছি। কোথাও-কোথাও ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বহিয়া যাইতেছে। আল্‌স পর্ব্বতের আবেষ্টনে রহিয়াছি।

লোকজনের কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি যে, টিরোলবাসীরা জার্ম্মাণ ভাষাই ব্যবহার করে। কিন্তু ইহা বুঝিয়া উঠা বোধ হয় জার্ম্মাণদের পক্ষেও সুকঠিন। যুক্তপ্রদেশ বা বিহারের লোকেরা যে-হিন্দীতে কথা বলে ঠিক সেই হিন্দীতেই হিমালয়ের নর-নারীরা কথা বলে কি? কুমায়ুন-গাঢ়ওয়ালের হিন্দী হইতে কাশী-প্রয়াগের হিন্দী যত ফারাক, টিরোলের পাহাড়ী-জার্ম্মাণ হইতে বার্লিন-মিউনিক-ভিয়েনার জার্ম্মাণও তত ফারাক।

'কথ্য' ভাষার কথাই বলিতেছি। কেতাবের ভাষা সর্ব্বত্রই এক প্রকার। বার্লিন-মিউনিক-ভিয়েনার বালক-বালিকারা ইস্কুলে যে সকল জার্ম্মাণ বই ব্যবহার করিয়া থাকে, টিরোলের পাঠশালায়-পাঠশালায়ও সেই সব বই-ই চলে। এই সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, মিউনিকে অর্থাৎ ব্যাভেরিয়ায় যে ভাষার বা উপভাষার রেওআজ সেটা বার্লিনের অর্থাৎ প্রুশিয়ার ভাষা বা উপভাষা হইতে অনেক পৃথক। ব্যাভেরিয়ার উপভাষায় গান, গল্প ও ছড়া লিখিয়া মিউনিকের কবি কার্ল ষ্টীলার জার্ম্মাণ সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন। ষ্টীলার-প্রণীত কাব্য এবং গদ্য গ্রন্থ জার্ম্মাণির সর্ব্বত্র আজও সুপ্রচলিত।

টিরোল একটা প্রদেশ বা জেলার নাম। এই মুল্লুকের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ শহর ইন্‌স্‌ব্রুক্‌। এই শহরের তিনদিকে ইন্‌ দরিয়া প্রবাহিত। 'ব্রুক' শব্দে পুল বুঝায়। ইনের দুই ধারে শহরটা গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীর উপর কতকগুলা পুল আছে, বলাই বাহুল্য।

চারিদিকেই পাহাড়ের দেওয়াল। চূড়াগুলি পাঁচ-ছয় হাজার ফিট উঁচু। কোনো-কোনো শৃঙ্গে একটু বরফ দেখা যাইতেছে। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ,—এখনো শীত জমে নাই। নদীর এক পার হইতে অপর পারে প্রায় আড়াই হাজার ফিট উঁচ পাহাড়ে যাইবার

গাড়ী উঠে আর একটা গাড়ী নামে একই টানার জোরে। পাহাড়ের নাম হুঙ্গারবুর্গ।

পাহাড়গুলার পায়ে ও কোমরে সরল পাইনের বন দেখিতেছি। কিন্তু মাথাগুলা সবই একদম ন্যাড়া। শুক্‌না পাথরের চাপ ছাড়া আল্পসের ঘাড়ে ও শিরে আর কিছু দেখা যায় না। ইন্‌স্‌ব্রুকের বালক-বালিকারা গ্রীষ্মকালে এই সব পাথরের চূড়ায়-চূড়ায় দিনরাত কাটাইতে ভালবাসে।

টিরোলী সাহিত্যে প্রকৃতিপূজা স্বভাবসিদ্ধ। ইস্কুল-পাঠশালায়ও পাহাড়ী কবিতা আওড়াইতে শিখানো হয়। ছোট-বড়-মাঝারি সকল কবিই পাহাড় সম্বন্ধে কবিতা ও গল্প লিখিয়াছেন।

আল্পসের অতি উচ্চদেশের বিষম বিপদ্‌জনক ঠাঁইয়ে একপ্রকার পাহাড়ী ফুল ফুটে। সেই ফুল লুঠিতে যাওয়া টিরোলী নর-নারীর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। ফুলের নাম এডেলভাইস। দেখিতে তারার মতন। শাদা বা ধূসর মখমলের মতন নরম ও মোলায়েম। এই ফুলের নিশানাই টিরোলী পল্টনের গৌরব চিহ্ন। সাহস, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, অধ্যবসায় এবং মৃত্যুকে 'কলা দেখানো' ইত্যাদির পরিচয় স্বরূপ এডেলভাইস 'যুবক টিরোলের' বহু সমিতি কর্তৃক সমাদৃত হইয়া থাকে।

বীর হোফার

চারিদিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, মধ্যে সুবিস্তৃত সমতল ভূমি। দরিয়ার কোথাও ঝোরা বা জলপ্রপাত নাই,—ঠিক এই ধরণের প্রাকৃতিক আবেষ্টনে কোনো বৃহদায়তন ভারতীয় নগর আছে কি না জানি না। হিমালয়ের আলমোড়া, নৈনিতাল, শিমলা, দার্জ্জিলিং ইত্যাদি শহর এইরূপ নয়। কারণ, এইগুলা সবই খাঁটি 'পাহাড়ী শহর'। এক্

কিন্তু ইন্‌স্‌ব্রুক প্রায় আগাগোড়াই ময়দানের উপর অবস্থিত। ইন নদী যতখানি এই শহরে দেখিতেছি, সবটাই শোয়া গড়ানো। সবুজ রংয়ের স্বচ্ছ জলে তেজ পাইতেছি, কিন্তু কোথাও উন্মাদ গর্জ্জন ও লাফালাফি নাই।

ইন্‌স্‌ব্রুকের লোকেরা ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বীর নেপোলিয়নকে লড়াইয়ে হারাইয়াছিল। সেই বিজয়ের কাহিনী শতাধিক বৎসর ধরিয়া টিরোলীদের গৌরব রহিয়াছে। বস্তুতঃ, গোটা ইয়োরোপেই তখনকার দিনে টিরোলের পাহাড়ীদের যশ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, নেপোলিয়ন টিরোলে ধাক্কা খাইবার পূর্ব্বে কখনো কাহারো নিকট পরাজিত হন নাই।

যে টিরোল-বীর ইয়োরোপীয়ানদিগকে নেপোলিয়নকে হারাইবার পথ দেখাইয়াছেন, তাঁহার নাম আণ্ড্রেয়াস হোফার। হোফার এক সামান্য সরাইওয়ালা চাষীর সন্তান মাত্র ছিলেন। অষ্ট্রিয়ার সরকার হোফারকে সাহায্য করেন নাই। হোফারের অনুগত স্বদেশ-ভক্ত 'যুবক টিরোল' দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের পথ রুখিয়াছিল। একমাত্র ভাবুকতার দ্বারাই অনেক সময়ে কেল্লা মাত করা যায়। বর্ত্তমান জগতেও ইহা অসম্ভব নয়।

অল্পকালের ভিতরেই হোফার নেপোলিয়নের হাতে ধরা পড়েন। ধরাইয়া দিয়াছিল এক স্বদেশদ্রোহী, অর্থ-পিশাচ টিরোলী অষ্ট্রিয়ান! নেপোলিয়নের বিচারে হোফারের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ইতালীর মাণ্টুয়া নগরে হোফারকে গুলি করিয়া মারা হয়।

বীর হোফার টিরোলীদের স্বদেশ-সেবার প্রতিমূর্ত্তিরূপে চিরকাল পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ইন্‌স্‌ব্রুকের লাগাও অনুচ্চ 'ব্যর্গ-ইজেল' পাহাড়ের মাথায় হোফারের বিরাট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম।

করে, তখনই ইহারা ব্যর্গ-ইজেলের হোফার-মূর্ত্তির সম্মুখীন হয়। হোফারের নাম স্মরণ করা ইহাদের 'বন্দেমাতরম্‌' স্বরূপ। বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সময়ে টিরোলের নানা শহরে ও গ্রামে 'আণ্ড্রেয়াস হোফার বুণ্ড' নামক পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার অন্যান্য জেলায়, জার্ম্মাণিতে এবং আমেরিকায়ও এই পরিষদের শাখা-সমিতি কায়েম হইয়াছে।

হোফারের সমগ্র জীবনলীলা চিত্রশিল্পী ডেফ্রেগারের রচনায় অঙ্কিত রহিয়াছে। ইন্‌স্‌ব্রুকের সরকারী সংগ্রহালয়ে এই চিত্রাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। বৎসর দুএক হইল ডেফ্রেগারের মৃত্যু হইয়াছে। রূপ-স্রষ্টা হিসাবে এই চিত্রকরের নাম আছে মন্দ নয়।

ইন্‌স্‌ব্রুক প্রাচীন কালেও প্রসিদ্ধ ছিল। রোমান সম্রাটেরা ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে রোম পর্য্যন্ত শড়ক তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। সেই রোমান শড়ক আজও পাহাড়ের গায়ে নিরেট রহিয়াছে। হোফারের আমলে টিরোল প্রধানতঃ চাষী, মেষপালক ইত্যাদি জাতীয় নর-নারীর সামান্য জনপদ মাত্র বিবেচিত হইত। আজও ইন্‌স্‌ব্রুককে জার্ম্মাণরা অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে জীবনের কেন্দ্র সমঝিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের ফ্যাক্টরি, চিমনি, মোটরগাড়ী ইত্যাদি চোখে পড়িতেছে না। ভারতীয় মফস্বলের একটা ছোট-খাটো শহরে আমরা যে-ধরণের জীবন যাপন করি, ইন্‌স্‌ব্রুকের টিরোলীরাও সেইরূপ উদ্বেগবিহীন, শান্তিপূর্ণ, পাড়াগেঁয়ে চালে চলিয়া থাকে।

ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের জীবনযাত্রা

দক্ষিণ জার্ম্মাণির গ্রামে-গ্রামে ক্যাথলিক ধর্ম্মের আওতা পাইয়াছি। সেই আওতা পাইতেছি চরম মাত্রায় ইন্‌স্‌ব্রুকে। বস্তুতঃ, ইন্‌স্‌ব্রুক রোমান ক্যাথলিক সমাজের এক বড় আড্ডা। রোমের ধর্ম্ম-গুরু পোপ এই শহরকে জার্ম্মাণ মুল্লুকের অন্তর্গত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্যাথলিক কেন্দ্র বিবেচনা

করিয়া থাকেন। রাইন প্রদেশের ক্যেল্‌ন্‌ শহর আর আল্প্‌স পাহাড়ের এই ইন্‌স্‌ব্রুক জার্ম্মাণ ভাষা-ভাষীদের সমাজে বিদেশী পোপের প্রতাপ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

এই কারণেই উত্তর জার্ম্মাণির (প্রুশিয়ার) প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টানদের হিসাবে ইন্‌স্‌ব্রুক 'কু-সংস্কারের' বাথান। প্রুশিয়ানদের চিন্তায় টিরোল ও অষ্ট্রিয়ার অন্যান্য জনপদ, ব্যাভেরিয়া ও রাইন প্রদেশ সবই জার্ম্মাণ সমাজে অধোগতির ও দুর্ব্বলতার কারণ। তথাকথিত ধর্ম্মের দৌরাত্ম্য যেখানে বেশী, বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ক্ষমতার শত্রু সেখানে প্রচুর। রাষ্ট্রীয় উন্নতির পাণ্ডারা এই জন্য 'আধ্যাত্মিকতা'র পাণ্ডাদিগকে চক্ষুঃশূল জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত।

ব্যর্গ-ইজেল হইতে সমতল ভূমির দিকে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলাম, ইন্‌স্‌ব্রুকের সর্ব্বত্রই মন্দির, গির্জ্জা, মঠ বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি দস্তুর মাফিক যথাসময়ে শহরের নর-নারীকে তাহাদের নিত্য কর্ত্তব্য জানাইয়া দেয়। কেনো কোনো মঠ বিরাট জমিদারীর মালিক। কোনো কোনো মঠ-জমিদারী এত বড় যে, শহরের প্রায় চার আনা ইহার তাঁবে শাসিত হয়। ভারতীয় মঠ, মোহন্ত, দেবোত্তর ইত্যাদি যে বস্তু, টিরোলের 'ক্লোষ্টার'-জমিদারীও সেই বস্তু।

কোনো মঠে সন্ন্যাসী পুরোহিতরা জীবন যাপন করেন। ক্যাথলিক মতে পুরোহিত মাত্রেই অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য। হিন্দু সমাজে ক্যাথলিক সমাজে এইখানে প্রভেদ। কোনো কোনো মঠ সন্ন্যাসিনীদের জন্য গঠিত। ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিয়মে বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের মত চির-কুমারী মঠ-বাসিনীদের জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা আছে। ক্যাথলিকরা স্ত্রীজাতিকে পুরোহিতের কার্য্য করিতে দেয় না।

মঠ হইতে লোকালয়ে বাহির হইয়া আসা,—এমন কি কয়েক ঘণ্টার জন্যও, নেহাৎ সোজা নয়। মঠের জীবন অতি কঠোর নিয়মে

শাসিত হয়। শাস্ত্র-পাঠ, পূজা, আরাধনা, প্রার্থনা ইত্যাদি এই জীবনের একমাত্র কার্য্য। কোনো কোনো মঠে চব্বিশ ঘণ্টা-ব্যাপী উপাসনা-প্রার্থনার রেওয়াজ আছে। প্রহরে-প্রহরে পূজারী অথবা পূজারিণী বদল হইয়া থাকে। প্রত্যেক দলে দশজন করিয়া বাহাল হন। এক দল পূজা শেষ করিতে না করিতে, আর এক দল হাজির হইতে বাধ্য।

খ্রীষ্টানরা আধ্যাত্মিকতায় বড় কি হিন্দুরা বড়? কেহ কেহ হয় ত' বলিবেন, এই তুলনায় সময় নষ্ট করাটাই আহাম্মুকি! কিন্তু যাঁহারা সমাজ সম্বন্ধে 'বিজ্ঞান' রচিতে,—অন্ততঃ বুঝিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে প্রশ্নটা উঠিবা মাত্রই মাথা না চুলকাইয়া উপায় নাই। কারণ, কোনো একদিকে ঝুঁকিয়া 'রায়' দিলে, অন্যায় বিচার করিবারই সম্ভাবনা।

মঠ, মন্দির, মোহন্ত, দেবোত্তর ইত্যাদির সুফল-কুফল ভারতেও যেমন, টিরোলেও সেইরূপ। কাশী, মথুরা, পুরীর আবহাওয়ায় যে সকল হিন্দুর জীবন গঠিত হইয়াছে, তাহারা ইন্‌স্‌ব্রুকে আসিলে, একটা "নতুন কিছু" পাইবে না। এখানকার সকল কাহিনীই আমাদের সুপরিচিত।

ইন্‌স্‌ব্রুক

(১)

লড়াইয়ের ফলে অষ্ট্রিয়ার দুর্দ্দশা অত্যধিক। অষ্ট্রিয়া দেশটাকে ভাঙিয়া পাঁচ-পাঁচটা নয়া স্বাধীন দেশ কায়েম করা হইয়াছে। ইন্‌স্‌ব্রুকের লোকেরও কষ্টের শেষ নাই। বার্লিনে যে জিনিষ কিনিতে একশ' মার্ক্‌ লাগে, ঠিক সেই জিনিষ ইন্‌স্‌ব্রুকে খরিদ করিতে লাগে সাতশ' ক্রাউন।

তবে এক মজার কথা। লক্ষপতি হইবার সাধ জীবনে একবার মিটাইয়া লইলাম। ট্যাঁকে দুই চারখানা লাখ ক্রোণের নোট লইয়া সদর্পে ঘুরিতেছি। এক পিঠ, দুই পিঠ, তিন পিঠ ঘুরাইয়া নোটগুলা

দেখিতেছি, আর তলাইয়া-মজাইয়া বুঝিতেছি, সত্যিই লাখ ক্রোণ বটে! রেষ্টরাণ্টে খাইতে বসিয়া দেখি, দুইবেলা এক পেট খাইতেই একলাখ প্রায় উজাড় হইয়া যায়। সমস্যায় পড়া গেল। ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া সাব্যস্ত করিলাম, লাখ ক্রোণের দাম পৌণে-পাঁচ ভারতীয় সিক্কা। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম!

ইন্‌স্‌ব্রুকে অনেক বিদ্যার্থী ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করে। এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি আইনবিদ্যায় 'ডক্টর' উপাধি পাইবেন। এক মঠে ইহাঁকে বিনা ভাড়ায় ঘর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুইবেলা আহার করিবার জন্য শহরের ভিন্ন-ভিন্ন গৃহস্থের ঘরে ইনি অতিথি হইয়া থাকেন। এই ধরণের ছাত্র শহরে অনেক। ইন্‌স্‌ব্রুক হাজার হইলেও তীর্থক্ষেত্র। কাশীর কথা আবার মনে পড়িতেছে।

কতকগুলা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করা গেল। দেখিলাম, অতি সুন্দর সোনার মূর্ত্তি অথবা চিত্র। এই সমুদায়ের ফটোগ্রাফ লইতে গেলে, পুরোহিতেরা আসিয়া মাথা ফাটাইয়া দিবে। কিন্তু হিন্দু মন্দিরাদির অভ্যন্তরে ফটো তোলায় বাধা দিলে, ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমাদের নজরে নেহাৎ পৌত্তলিক, অজ্ঞ ও কুসংস্কার-পূর্ণ বিবেচিত হয়! অট্টালিকাগুলা অতুল ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

'মারিয়া থেরেজিয়েন ষ্ট্রাসে' ইন্‌স্‌ব্রুকের নামজাদা বড় রাস্তা। দ্বিপ্রহরের সময়ে এই শড়কে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দলে-দলে মিছিল করিয়া পায়চারি করে। ভিন্ন-ভিন্ন দলের ভিন্ন-ভিন্ন টুপি ও গোষ্ঠীচিহ্ন। এই বৎসর না কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রায় হাজার দুই ছাত্র। শহরের লোক-সংখ্যা সত্তর-আশী হাজার।

(২)

ইন্‌স্‌ব্রুকে লোকের বস্তি বেশী নয়। কিন্তু এখানে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, শিল্প ও শিক্ষার কেন্দ্রের সংখ্যা গুণ্‌তিতে অনেক।

বাদশাহী আমলে সম্রাট্ বাহাদুর মাঝে মাঝে ইন্‌সব্রুকে আসিয়া বাস করিতেন। কাজেই নগরের এক ধারে 'হোফ-বুর্গ' বা প্রাসাদ-নগর দেখিতেছি। প্রাসাদের বাগিচা নয়নরঞ্জক বটে। সম্মুখেই থিয়েটার। শহরের অন্যান্য মহাল্লায় আরও দু'একটা রঙ্গালয় আছে। সেই সব মঞ্চে প্রধানতঃ টিরোলীদের পল্লী-নাট্য অভিনীত হয়। টিরোলী পোষাক এবং টিরোলী উপভাষার ব্যবহার সেথায় অনিবার্য্য।

মিউজিয়ামটা এই ক্ষুদ্র নগরের এক গৌরব। অন্ততঃপক্ষে ডেফ্রেগারের আঁকা আণ্ড্রেয়াস হোফারের জীবন-ঘটিত দৃশ্যাবলী দেখিবার জন্য পর্য্যটক মাত্রেই এই সংগ্রহালয়ে উপস্থিত হয়। এই চিত্র-শিল্পী স্বদেশকে সুকুমার শিল্পে যেরূপ খুঁটিনাটি সহ অমর করিয়াছেন, জগতের অন্য কোনো চিত্রকর সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। ইন্‌সব্রুকের ব্যবসায়-কলেজে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যা বিতরণ করা হইয়া থাকে। চিত্র, সঙ্গীত, রন্ধন ইত্যাদি শিখাইবার জন্যও নানা বিদ্যাপীঠ আছে।

'মারিয়া থেরেজিয়েন ষ্ট্রাসে'র দুইধারকার বাড়ী-ঘরগুলা কথঞ্চিৎ পুরাণা আমলের কথা মনে করাইয়া দেয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি,—নয়া অঞ্চলে ত' বটেই। রেষ্টরাণ্ট, কাফে ইত্যাদির অভাব নাই। পাদ্রী, পুরোহিত, সন্ন্যাসী, মোহন্তদের সঙ্গে গলি-ঘোঁচের মোড়ে যেখানে-সেখানে দেখা হয়। শহরের যে কোনোও ঠাঁইয়ে দাঁড়াইলেই অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গের ঢেউ নজরে আসে।

পার্ব্বত্য পথে কয়েক মাইল হাঁটিয়া একটা পুরাণা 'শ্লস' (দুর্গ) দেখিয়া আসিলাম। নাম 'শ্লস আম্রাস'। প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে এই শ্লস প্রথম তৈয়ারী হয়। দুর্গের এক অংশে লড়াইয়ের অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ দেখিলাম। সবগুলাই মান্ধাতার আমলের জিনিষ। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ম্ম, কিরীচ, তলোয়ার, বন্দুক দেখিয়া 'প্রাগৈতি-

হাসিক' যুগটার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলা রোমান শড়কের কিনারায় গাঁথা দূরত্বজ্ঞাপক পাথরের খুঁটাও এক স্থানে দেখিতে পাওয়া গেল। 'শ্লস আম্রাসে'র সংগ্রহ অষ্ট্রিয়ায় বিখ্যাত।

ইন্‌স্‌ব্রুকের হোফ-কির্খে বা রাজ-মন্দিরকেও এক প্রকার মিউজিয়াম বলা চলে। এখানে পুরাণা রাজ-রাজড়াদের সমাধি আছে। তাহাদের ধাতু-মূর্ত্তিগুলা প্রধান দ্রষ্টব্য। খানিকটা প্যারিসের নিকটবর্ত্তী সাঁদেনি পল্লীর গথিক মন্দিরের আবহাওয়া পাওয়া গেল।

চিমনীর ধোঁয়া ইন্‌স্‌ব্রুকে একদম নাই। দুই দিককার পাহাড়ের দেওয়ালের ভিতর শহর অবস্থিত। সমতল ক্ষেত্র বিস্তারে বোধ হয় কোথাও এক মাইলের বেশী হইবে না।

(৩)

সেনাপতি হট্‌স্‌ডর্ফ বলিতেছেন:—"টিরোল, বস্তুতঃ সমগ্র অষ্ট্রিয়াই জার্ম্মাণির সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে, অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মাণদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় থাকিবে।" হট্‌স্‌ডর্ফ ছিলেন কাইজারি আমলে অষ্ট্রিয়ানদের হিণ্ডেনবুর্গ বা লুডেনডর্ফ।

টিরোলে চাষ-আবাদ অতি সামান্য দেখিতেছি। ভাত খাওয়া এখানকার কোথাও-কোথাও অভ্যাস। চাউল আসে এশিয়া হইতে—হয় ত' খানিকটা ভারত হইতেও। ভূট্টার ক্ষেতই অনেক ঠাঁইয়ে চোখে পড়িয়াছে। সাধারণ শাকশব্জী ছাড়া প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যই নয়া অষ্ট্রিয়াকে ইতালী হইতে অথবা জার্ম্মাণি হইতে আমদানি করিতে হয়। বাদশাহী অষ্ট্রিয়ার যে-যে অঞ্চলে চাষ-বাস চলিত, তাহার প্রায় সমস্তটাই এক্ষণে ভিন্ন-ভিন্ন স্বাধীন দেশের অন্তর্গত। খাওয়া-পরার সমস্যাই নয়া অষ্ট্রিয়ার প্রায় এক মাত্র সমস্যা।

এক বিলাতী পাউণ্ডে পাওয়া যাইতেছে প্রায় তিন লাখ ত্রিশ হাজার

মুদ্রা-সমস্যার মীমাংসা হইবে না। অথচ ভার্সাইয়ের সন্ধির বিধানে অষ্ট্রিয়ার চতুঃসীমা এত সঙ্কীর্ণ যে, এদেশের শিল্প-সুযোগ নিতান্ত কম। আর দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা চলিবে কোথা হইতে? বিদেশে পাঠাইবার উপযোগী কোনও মাল স্বদেশে উৎপন্ন হইলে ত'!

অষ্ট্রিয়ান্‌ ইতালিয়ান সমস্যা

অষ্ট্রিয়ার উপর ইতালীর জুলুম লাগিয়াই আছে। দক্ষিণ টিরোলের অধিকাংশই ইতালীর অধীন হইয়াছে। এই জনপদের শতকরা নব্বই জন লোক জার্ম্মাণ ভাষায় কথা কহে। মাত্র দশজন ইতালীয় ভাষা ব্যবহার করে। তাহা সত্ত্বেও ভার্সাই সন্ধির কর্ত্তারা দক্ষিণ টিরোলকে ইতালীর হাতে সঁপিয়া দিয়াছে। ইতালীকে জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামাইবার জন্য ইংল্যাণ্ডের-রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা ইতালীয় ডিপ্লোম্যাট-গণের সঙ্গে দক্ষিণ টিরোল সম্বন্ধে এইরূপই একটা গুপ্ত সমঝৌতা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই পরাধীন টিরোলের কাহিনী প্রতিদিনই 'ইন্‌স্‌ব্রুকার নাখ্‌রিখ্‌টেন' কাগজে পড়িতেছি। 'আণ্ড্রেয়াস হোফার বুণ্ডের' স্বদেশ-সেবকগণ দক্ষিণ টিরোলের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট। এই জন্য এই বুণ্ডের গন্ধ মাত্র পাইলে ইতালিয়ানরা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে।

দক্ষিণ টিরোলের এক বড় শহরের নাম বোৎসেন। অতি সৌন্দর্য্য-ময় গোলাপী গিরির আভা-মণ্ডলে এই নগরের অবস্থান। অধিকন্তু অঞ্চলটা "ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা"। এতদিন ধরিয়া একজন জার্ম্মাণের হাতে এই নগরের শাসনভার ছিল। ইতালিয়ানরা জোর-জবরদস্তি করিয়া বুড়া বিচক্ষণ জার্ম্মাণকে বরখাস্ত করিয়াছে। তাঁহার স্থানে বসিয়াছে এক ইতালিয়ান।

এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় বর্ণহীন চামড়াওয়ালা জাতিরা স্থানীয়

নর-নারীর উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। ইহা দুনিয়ার সর্ব্বত্রই জানা কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাদা চামড়াওয়ালা খ্রীষ্টান জাতি ইয়োরোপের বুকের উপর সাদা চামড়াওয়ালা অন্য এক খ্রীষ্টান সুসভ্য সুশিক্ষিত এবং অনেকটা গুরু-স্থানীয় জাতির উপর অবিকল সেইরূপ অত্যাচার করিতেছে। মনিবে-গোলামে সম্বন্ধ দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এক। পরাধীনতার বাজারে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, শিক্ষাভেদ নাই। জগতের সকল স্বাধীনতাহীন জাতিই তাহাদের প্রভু-জাতির নিকট এই প্রকার লাঞ্ছনা সহিয়া থাকে।

ইতালীর 'ফাশিস্ত্' দল

ইতালীতে এক নয়া আন্দোলন দেখা দিয়াছে। ইয়োরোপে যখন লড়াই থামে, তখন ইতালীয় সমাজে ছোট, বড়, মাঝারি কতকগুলা 'ফাশি' অর্থাৎ সমিতি বা দল ছিল। এই ফাশিসমূহের সাহায্য পাইয়াই কবি-সেনাপতি দানুন্‌ৎসিও জুগো-স্লাভিয়ায় ফিউমে বন্দরের উপর হামলা করিতে উৎসাহী হন। কয়েক বৎসরের ভিতর ফাশি-ওয়ালারা প্রবল শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ফাশিস্ত দিগকে সংক্ষেপে ন্যাশন্যালিষ্ট ভলাণ্টিয়ার বলিতে পারি।

ফিউমেতে যে কাণ্ড সুরু হইয়াছিল, সেই কাণ্ড ফাশিস্ত্‌রা আজকাল ইতালীর প্রত্যেক সীমান্ত-প্রদেশে চালাইবার ফিকির ঢুঁড়িতেছে। এ এক উৎপাত্‌-বিশেষ। ইতালীর প্রসার-বৃদ্ধি ইহাদের মূল-মন্ত্র স্বরূপ। ইতালীকে 'জননী' বলিয়া সম্বোধন করা ফাশিস্ত্‌দের এক লক্ষণ।

টিরোলের ইতালীয় জেলাগুলা ফাশিস্ত্‌দের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত! আণ্ডেয়াস হোফার বুণ্ডের সভ্যেরা সর্ব্বত্র নির্য্যাতিত হইতেছে। এই নির্য্যাতন বহু ক্ষেত্রেই অমানুষিক আকার ধারণ করিয়াছে। কোনো বিদেশী কাগজে সেই সংবাদ প্রকাশ করা ইতালীর মিত্র ইংলাণ্ড ও

ফ্রান্সের স্বার্থ নয়। নীরবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করা আজ দক্ষিণ টিরোলের জার্ম্মাণদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইতেছে। রাইন প্রদেশের ফরাসী-ইংরেজ-শাসনেও জার্ম্মাণদের এরূপ দুর্গতি ঘটে নাই।

পরাধীন টিরোলের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য বার্লিনে, মিউনিকে এবং জার্ম্মাণির অন্যান্য শহরে কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। অষ্ট্রিয়ার টিরোল-সমস্যা একদিন ইয়োরোপে বড় রকমের আগুন জ্বালাইয়া ছাড়িবে। আল্‌সাস-লোরেণ লইয়া ফরাসীদের হিংসা-প্রবৃত্তি জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে যতটা জাগিত, দক্ষিণ টিরোলের জেলাগুলা সম্বন্ধে জার্ম্মাণ জাতির ইতালি-বিদ্বেষ তাহা অপেক্ষা বেশী জাগিবার কারণ স্বাভাবিক।

জুগোস্লাভিয়ার আদ্রিয়াতিক জেলাগুলায়ও ফাশিস্ত্‌রা হাত বাড়াইতেছে। ইতালীর বিরুদ্ধে জুগোস্লাভিয়া প্রথম হইতেই ক্ষেপিয়া আছে। এখন আবার কাটার উপর নূনের ছিটা। ইতালীকে একবার একা পাইলে স্লাভরা ইতালিয়ানদিগকে বেশ উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দিবে। ইতালীর সমর-পিপাসা মিটাইবার জন্য যুবক স্লাভের হাত সুর্‌সুর করিতেছে। তবে এখনো ইতালীর পশ্চাতে আছেন 'আঁতাঁত্‌'।

ইতালিয়ানদের বাড়াবাড়ি দেখিতেছি অন্যত্রও। এমন কি সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের লোকেরাও ফাশিস্ত্‌দের উৎপাতে বিব্রত। কোনো কোনো সুইস ক্যান্টনে ইতালীয় ভাষার ব্যবহার হইয়া থাকে। এই জেলাগুলাকে ইতালি নিজের পকেটস্থ করিতে উদ্‌গ্রীব। ফাশিস্ত্‌ বাহাদুরেরা 'জয় ইতালী মায়ী কী জয়!' বলিয়া সীমানায় আসিয়া হাজির। সুইস্‌ গবর্মেণ্টকে বাধ্য হইয়া এই ইতালীয় প্রচেষ্টায় বাধা দিবার জন্য ফৌজ তৈয়ারি রাখিতে হইতেছে।

আল্‌প্‌স্‌ পাহাড়ে পল্লীজীবন

একটা পাহাড়ী পল্লীতে প্রায় আড়াই হাজার ফিট উঁচু ঠাঁইয়ে উঠিয়া

আসিয়াছি। 'পায়দল' নয়, রেলে। দুইধার কেবল পাইন-ঢাকা,—অদূরে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ। প্রায় সর্ব্বত্র দরিয়ার জল-স্রোতের ডাক। আকাশ কখনো-কখনো সাদা কুয়াশায় ঢাকা।

কোথাও-কোথাও দুএকটা কুমড়ার মত ফলের ক্ষেত দেখা গেল। চাষ-আবাদের জমিন একপ্রকার নাই বলা চলে। গরু ছাগল গলার ঘণ্টা বাজাইয়া ঘাস খাইতেছে। যে দুচারটা চষা জমির টুকরা দেখিলাম, তাহার সকলগুলায়ই কাটা ভূট্টার স্তূপ।

টিরোলীরা খোসা-ছাড়ানো ভূট্টাগুলা ঘরের বাহিরে দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখে। ভূট্টাগুলা শুকাইবার এই রীতি রেলপথের দুইধারে ত দেখিয়াছিই,—ইন্‌স্‌ব্রুক শহরেও চোখে পড়িয়াছে। সাধারণতঃ ভূট্টাগুলা হল্‌দে রংয়ের। কিন্তু তাহার ভিতর লাল ভূট্টা এমন ভাবে সাজানো থাকে, যাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের সুপরিচিত 'ক্রশ' তৈয়ারি হয়। টিরোলের যেখানে-সেখানে ক্রস-তীর্থ প্রতিষ্ঠিত। জাপানী পল্লীপথেও সেইরূপ হয় শিন্তো দেউল না হয় বৌদ্ধমূর্ত্তি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গ্রামের পোষ্ট-মাষ্টারের ঘরে অতিথি হইয়াছি। ডাকঘরের এক কামরায় আমার ডেরা। প্রত্যেক গ্রীষ্মে এই গ্রামে সত্তর-আশীজন বিদেশী পর্য্যটক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আসিয়া থাকে। সরাই-জাতীয় ঘরবাড়ী পাওয়া যায়। জার্ম্মাণ ভাষায় 'গাষ্ট-হোফ' বা অতিথিশালা বলে। হোটেল-রেষ্টরাণ্টের প্রায় সকল আরামই অতিথিরা এই সকল 'হোফে' পাইয়া থাকে। জাপানেও সরাইয়ের আরাম আছে। কিন্তু চীনে ও ভারতে মোসাফিরি করা খাঁটি কর্ম্মভোগ।

গ্রামে লোকজন বোধ হয় গুণতিতে দেড়শ' বা দুশ'। কিন্তু একটা সরকারী ইস্কুল আছে। ছয় বৎসরে পড়িবামাত্র প্রত্যেক শিশু এই ইস্কুলে যাইতে বাধ্য। গির্জ্জা ত আছেই। পাড়ার লোকেরা সবাই চাষী বা মেষপালক। সরকারী ডাক্তার গ্রামের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য বাহাল

আছেন। ইঁহার উপরওয়ালা বড় ডাক্তার মাইল বিশেক দূরের এক গ্রামে মোতায়েন। এখানকার ডাকঘর হইতে আশে-পাশের দশ বার গ্রামের ডাক জোগানো হয়।

আমার ঘরের দুয়ারে খাঁচার ভিতর মুরগী পোষা হইতেছে। পাশের বাড়ীতে গরুর বাথান দেখিতেছি। অনতিদূরে ঘোড়ার আস্তাবল। জানালার নিকট দিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে একটা ঝরণা লাফাইয়া পড়িতেছে।

পোষ্ট-মাষ্টারের পত্নী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। রান্না-বাড়ার বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট। রন্ধন-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। এক এক বেলা এক-এক প্রকার নয়া টিরোলী রান্না খাওয়া যাইতেছে। ডাকঘরের কাজে স্বামীকে প্রতিদিন ঘণ্টা তিনেক সাহায্য করাও পত্নীর কাজ। এই জন্য ইনিও বেতন পান।

টিরোলীদের পারিবারিক গ্রন্থশালায় কবি পিথ্‌লার সর্ব্বোচ্চ ঠাঁই পান। ইঁহার রচনায় নৈসর্গিক কবিত্বের ক্ষমতা পরিস্ফুট। গল্প এবং গান লিখিয়াছেন বিস্তর। রচনাগুলা টিরোলী উপভাষায় নয়, সাধু জার্ম্মাণে। ইনি পাহাড় সম্বন্ধে ভৌগোলিক এবং ভূতাত্ত্বিক গবেষণাও করিয়াছেন।

একজন অষ্ট্রিয়ান ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের নিকট শুনিলাম, এই গ্রামের পাশ দিয়া যে ঝরণা বহিয়া যাইতেছে, সেইটাকে বিদ্যুতের কাজে লাগাইবার জন্য জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, মার্কিন ও অষ্ট্রিয়ান মহাজনেরা মোসাবিদা করিতেছেন। আজ বার্লিনের সুপ্রসিদ্ধ জীমেন্‌স্‌-শুকার্ট তড়িৎ-ফ্যাক্টরির এক প্রতিনিধি আবেষ্টনটা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন।

টিরোলের নানা পাহাড়ে নানা ধাতুর খনি আছে। এ যাবৎ কাল খনিতে কোনো প্রকার কাজ সুরু করা হয় নাই। যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত

অষ্টিয়া-হাঙ্গারির অন্যান্য প্রদেশে শিল্পকর্ম্ম সুবিস্তৃত হইয়াছিল। টিরোল ছিল 'হাতের পাঁচ' স্বরূপ। এক্ষণে সেই সকল শিল্পপ্রধান জনপদ অষ্টিয়ার জার্ম্মাণদের হাতছাড়া হইয়াছে। কাজেই অষ্টিয়াকে তাহার 'স্বদেশী' জেলাগুলা হইতে ধন-সম্পদের নয়া সুযোগ বাহির করিতে হইবে। এই কারণে টিরোলের আল্প্‌স্ পাহাড়-শ্রেণীকে শিল্পের তরফ হইতে যাচাই করিয়া দেখিবার দিকে ধনবান্ ও বৈজ্ঞানিক লোকজনের ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

শ' পাঁচেক ফিট পাহাড় ভাঙিয়া এক পল্লীতে দেখিলাম, প্রায় সাতশ' বৎসরের পুরাণা এক পাথরের বাড়ীতে লোহার মিস্ত্রীরা কাজ করিতেছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মোকামেই কর্ম্মকার-'শ্রেণী'র পঞ্চায়ৎ বসিত। এক যুবা চিত্রকর নিকটবর্ত্তী ঝরণার কিনারা হইতে বাড়ীটার ছবি আঁকিতেছে। খানিক দূরে আর একটা বাড়ী দেখাইয়া প্রদর্শক বলিলেন—"এইটা ছিল টিরোলের শেষ জমিদারের গ্রীষ্মভবন।"

আল্প্‌সের পল্লীতে-পল্লীতে যেন হিমালয়েরই নানা দৃশ্য দেখিতেছি। শিমলা-আলমোড়ার লোকেরা টিরোলের গিরি-শৃঙ্গে অথবা গিরি-গাত্রে কোনো নয়া জন-সমাজ অথবা কোনো নয়া প্রাকৃতিক গড়ন পাইবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা ভারতীয় পাহাড়ের গোয়ালা, চাষী, ছাগপালক ইত্যাদির ধরণ-ধারণ, আদব-কায়দা এবং দৈনিক জীবনের সঙ্গে সুপরিচিত তাঁহারা খ্রীষ্ট-ভক্ত টিরোলী আল্প্‌সের চূড়ায় ও উপত্যকায় হিন্দু নর-নারীর সংস্কার-কুসংস্কার, এক কথায় ভারতের সনাতন জীবন-ধারাই অহরহঃ স্পর্শ করিবেন।

পাহাড়-প্রীতি

(১)

পাহাড়ে উঠা, পাহাড়ে বেড়ানো, পাহাড়ের শির টপ্‌কাইতে চেষ্টা

করা আজকাল ইয়োরামেরিকায় অতি মামুলি কথা। ভারতেও এই খেয়াল অল্পে-অল্পে দেখা দিতেছে। কিন্তু এই সব ঝোঁক জগতে মাত্র একশ'-দেড়শ' বৎসরের বেশী পুরাণা মাল নয়। বর্ত্তমান জগৎ বাস্তবিকই, সকল ক্ষেত্রেই—নেহাৎ কচি শিশু।

এত বড় আল্প্‌স পাহাড় ইয়োরোপের বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কি প্রাচীনকালে, কি মধ্য-যুগে পশ্চিমারা আল্প্‌সের শিখরে-শিখরে টো-টো করিতে প্রয়াসী হয় নাই। লড়াইয়ের সময় মাঝে-মাঝে কোনো দুর্গম পাহাড়ী-পথে ফৌজ চলা-ফিরা করিয়াছে সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাহাড়-'দেখা' সখ, খেয়াল, বাতিক বা ঝোঁক নিতান্তই কালকার কথা।

ইয়োরোপের কাব্য-সাহিত্য বিশাল। নানা কণ্ঠে পশ্চিমারা বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া আসিতেছে। মস্ত-মস্ত দিগ্‌গজ মহাকবি ইয়োরোপে জন্মিয়াছেন। কিন্তু ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইয়োরোপের কোনো ভাষায় আল্প্‌স সম্বন্ধে কোনো কবিতা লেখা হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বিশেষ কষ্ট-কল্পনা করিয়া প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা সুরু করিলে হয় ত' বাহির হইবে যে, ইতালীর কবিবর দান্তে দুই এক ছত্র ঝাড়িয়াছিলেন। ইতালীর চিত্রকর দাভিঞ্চিও বোধ হয় শিল্পে আল্প্‌স সম্বন্ধে এক আধ আঁচড় মারিয়াছিলেন। ঐ পর্য্যন্তই। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে দুই ভাই সুইস পর্য্যটক পাহাড়ে 'বেড়াইতে' আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণকাহিনী 'আল্প্‌স' নামে কবিতার আকারে জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত।

ফরাসী সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক রুসো মানব-জীবনকে প্রকৃতির আদর্শে গড়িতে চাহিয়াছিলেন। প্রকৃতির পথে ফিরিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা তাঁহার রচনার প্রাণ। রুসোর খেয়াল পশ্চিমা মুল্লুকে ঘটনা-চক্রে এক 'প্রোপাগাণ্ডা'য় পরিণত হয়। শিক্ষিত নর-নারীরা রুসোকে বগলদাবা করিয়া পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সেই প্রপাগাণ্ডা, উন্মাদনা, আন্দোলন বা উৎসাহের ফলে আল্প্‌সের শ্রী ও

বিভূতি লুটিবার জন্য 'রোমান্টিক' রসরাজেরা ফ্রান্স হইতে, সুইট্জার-ল্যাণ্ড হইতে, ইতালী হইতে, ইংল্যণ্ড হইতে, জার্ম্মাণি হইতে শিখরে-শিখরে অভিযান পাঠাইয়াছে। মহাকবি গ্যেটেও এই হিড়িকেই আল্প্সে মোসাফিরি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গদ্যসাহিত্যে তাহার পরিচয় আছে, 'ফাউস্টে'ও ঢুঁড়িলে পাওয়া যায়।

'প্রকৃতি-পূজা' ইংরেজি, ফরাসী, মার্কিন এবং ইতালীয় সাহিত্যে এ যুগে আর একটা নতুন-কিছু নয়। তবে বাড়াবাড়ির দিন আর নাই। জার্ম্মাণ সাহিত্যে গদ্য-লেখক ষ্টিফ্টার জার্ম্মাণির বন-উপবনকে আদরের সামগ্রী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ব্যাভেরিয়ার ষ্টীলার এবং এবং পিথ্লারও প্রকৃতি-পূজার পুরোহিত।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনীভার সুইস্ বৈজ্ঞানিক দ' সোস্যির আল্পসের উচ্চতম শিখর ডিঙাইতে সমর্থ হন। মাউণ্ট ব্লাঙ্কের নাম পাঠশালায় শুনিয়াছি। এই সময় হইতেই আল্প্স-'নেশা' ইয়োরোপে যথার্থ-রূপে দেখা দেয় বলিতে পারি। পরে সেই ঝোঁক ইয়োরোপের বাহিরের পাহাড়গুলায় আসিয়া ঠেকে। রকি, আণ্ডিজ্, আমাদের হিমালয়, আফ্রিকার শৈলশ্রেণী, একে-একে সবই পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক টুরিষ্ট পাহাড়-'প্রেমিক'দের আওতায় আসিয়া পড়িয়াছে।

গৌরী-শৃঙ্গ আক্রমণের যে প্রয়াস আজ দেখা যাইতেছে, তাহা এই 'আল্পিনিস্মুস্' অর্থাৎ আল্পস-বিজ্ঞানেরই এক শেষ নিদর্শন। ভারতের শিমলা-দার্জ্জিলিঙও পশ্চিমাদের আল্প্সে-প্রেমেরই অন্যতম ফল। আর আজ যে যুবক-ভারতে পাহাড়ী নেশা মালুম হইতেছে, তাহাও নব্য ইয়োরামেকিান 'আধ্যাত্মিকতা'রই জের। বস্তুতঃ গোটা যুবক-এশিয়ার সকল প্রকার প্রাণ-স্পন্দনের অন্তরেই বিদেশী অথবা বিজাতীয় দস্তুল বিরাজ করিতেছে। এমন কি প্রাচ্যের 'স্বদেশী ও স্বরাজ'

(২)

ইয়োরোপের নানা ভাষায় আল্‌প্‌স সম্বন্ধে পত্রিকা আছে। আল্‌প্‌স লইয়া ইয়োরামেরিকার নামজাদা চিত্র-শিল্পীরা বহুবিধ ছবি আঁকিয়াছেন। আল্‌প্‌স-ভ্রমণ-ঘটিত নানা প্রকার তথ্য ও তত্ত্ব জানিবার জন্য ও জানাইবার জন্য পশ্চিমারা দেশে-দেশে নানা ক্লাব, 'ফারাইন' বা পরিষৎ কায়েম করিয়াছে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সবই পাহাড়-গুলাকে নর-নারীর ঘরের কোণে আনিয়া ধরিতেছে।

ফটোগ্রাফের ত অন্তই নাই। যতবার পাহাড়ে-পাহাড়ে অভিযান গিয়াছে, ততবারই শত-শত ফটো লওয়া হইয়াছে। ফটোগুলায় প্রকৃতির অসীম রূপ-গরিমা হাতে-হাতে পাকড়াও করিতে পারি। অপর দিকে পর্য্যটকের সাহস, অধ্যবসায়, শারীরিক শক্তি, মরণাভিযানের ভাবুকতা এবং অসাধ্য-সাধন-প্রয়াসের সংস্পর্শে আসিয়া চিত্ত ফুলিয়া উঠে।

ইয়োরামেরিকার লোকেরা হিমালয়ে অভিযান পাঠাইতেছে। ভারত-সন্তান চুপ করিয়া বসিয়া আছে কেন? ভারতবাসী বর্ত্তমান জগতের নয়া-নয়া বিজ্ঞানে নয়া-নয়া খেয়ালে একে-একে কিছু-কিছু হাত দেখাইতেছে। পাহাড়-বিজ্ঞানের দিকে যুবক ভারত ঝুঁকিবে না কি?

হিমালয়-বিন্ধ্যের নানা নিভৃত অঞ্চলে ভারতীয় সাহস, শক্তি ও পরিশ্রমের যাচাই হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা যুবক-ভারতের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়া-নয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্র ঢুঁড়িতেছেন, তাঁহারা ভারতীয় শৈল-শ্রেণীর চূড়ায়-উপত্যকায় ভারতীয় নর-নারীর নয়া-নয়া কর্ত্তব্য-পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হউন।

মান্ধাতার আমলের বাল্মীকি-কালিদাস "হিমাচলো নাম নগাধিরাজঃ" সম্বন্ধে যে কাব্য রচিয়া গিয়াছেন, একমাত্র সেইগুলা

তাহাতে আমাদের দারিদ্র্য, অকর্ম্মণ্যতা, আলস্য ও দেউলিয়া অবস্থাই প্রমাণিত হইবে।

বর্ত্তমান ভারতের নর-নারীকে বিন্ধ্য-হিমালয়ের প্রস্তর-স্তূপে, বরফ-স্তূপে, 'লাভা'-স্তূপে দিন-রাত কাটাইতে অভ্যস্ত হইতে হইবে ;—খন্তা হাতে, শাবল হাতে, বোমা হাতে ;—গাছ-পাথর চুরমার করিবার জন্য, লুকানো ঐশ্বর্য্য খুলিয়া দিবার জন্য, উপনিবেশ গড়িবার জন্য, মানুষের ঐশী সৃষ্টি-শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য। এই মূর্ত্তিতেই মধুচ্ছন্দা অগস্ত্য বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অমর ঋষি-কাব্য গড়িয়াছিলেন।

আর আজও,—এইরূপ পাহাড়ী-জীবনেই যে অভিজ্ঞতা পায়দা হইবে, সেই অভিজ্ঞতার চিত্র-শিল্প, সেই অভিজ্ঞতার স্থাপত্য, সেই অভিজ্ঞতার কাব্য বিশ্ব-শক্তির হাটে-বাজারে জাহির করিতে পারিলেই যুবক-ভারত দুনিয়ার আসরে পান-সুপারী ও কল্কে পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে। পাহাড়ের ডাক যুবক-ভারতের সাড়া অপেক্ষা করিতেছে।

জার্ম্মাণ-অষ্ট্রিয়ান রাষ্ট্রীয় ধাত্

জার্ম্মাণিতে দেখিয়াছি, অষ্ট্রিয়াতেও দেখিতেছি, জার্ম্মাণরা সর্ব্বদাই বলে,—"জার্ম্মাণ জাতের ধাতে রিপাব্লিক বা গণতন্ত্র সহিবে না। আমরা রাজ-ভক্ত জাত,—রাজতন্ত্র আমাদের মজ্জাগত। রাজ-রাজাড়ার শাসন, ফৌজ-পল্টনের জাঁক-জমক, পুলিশের এক্তিয়ার ইত্যাদি লুপ্ত হইলে জার্ম্মাণরা রসাতলে যাইবে। ইতিমধ্যেই বুঝিতেছেন না, জার্ম্মাণ মুল্লুকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, যথেচ্ছাচার, মাৎস্য-ন্যায় দেখা দিয়াছে?"

সোশ্যালিষ্টরা বিশেষতঃ ইহুদিরা জার্ম্মাণিতে এবং অষ্ট্রিয়াতে শান্তি-প্রিয়তা এবং গণতন্ত্র আনিতেছে। ইহাদের প্রপাগাণ্ডার ফলে পুরাণা শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লইবার প্রবৃত্তি জার্ম্মাণ-সমাজে পুষ্ট হইতে পারিতেছে না। ইহাদের উপর "খাঁটি স্বদেশী" জার্ম্মাণরা মহা খাপ্পা।

অষ্ট্রিয়ান যুবক বলিতেছেন,—"আরে মশায়! সোশ্যালিষ্টগুলার পাল্লায় পড়িয়া জার্ম্মাণ নর-নারী মুস্‌ড়িয়া রহিয়াছে। ইহারা বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজ ও ফরাসীদেরই নুন-খাওয়া স্বদেশ-দ্রোহী গুপ্তচর। ইহাদের বিরুদ্ধে আমরা এক্ষণে কিছুই করিতেছি না। কিছু করিলেই অমনি আঁতাঁত আসিয়া বার্লিন-মিউনিকের উপর দাঙ্গা করিবে। বিদেশী ও দেশী শত্রুদের অত্যাচার নীরবে হজম করিতে করিতে জার্ম্মাণরা সৎ-সাহস ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান, স্বাভাবিক কর্ম্মতৎপরতা, সমাজ-সেবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি গুণগুলা একে-একে খোয়াইয়া বসিতেছে। নৈতিক অধোগতির চরম-সীমায় আসিয়া আমরা ঠেকিতেছি।" ইহাকে বলে পরাধীনতার প্রথম যুগ।

টিরোলের জাতীয় কবি পিথ্‌লালরের নাম শুনিতে পাইতেছি যেখানে-সেখানে। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর কবি। মারা পড়িয়াছেন আজ বিশবাইশ্ বৎসর। কিছু কিছু পাঠ করাও গেল।

কামালপাশার জয়-গান চলিতেছে জার্ম্মাণ-সমাজে বেশ আন্তরিক ভাবে। লোকেরা বলাবলি করিতেছে—"স্বাধীনতা লাভ বক্তৃতা, পরামর্শ, কন্‌ফারেন্সের কাজ নয়। সেই জন্য চাই লড়াই, পল্টন, প্রাণ দিবার আন্দোলন। সেভর্ সন্ধি রদ্ করাইবার জন্য গণ্ডা-গণ্ডা সভা-সমিতি ডাকিলে শক্তির অপব্যয় হইত মাত্র। পরন্তু দুই মাসের লড়াইয়ের ফলে কাজ হাঁসিল হইল অতি সহজে। কামাল পাশা এশিয়াকে তাঁহার কর্ত্তব্যের সোজা পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।"

বাস্তবিক পক্ষে জার্ম্মাণরা নিজেই কামাল পাশার সফলতায় অনেকটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। আশার রেখা ও প্রফুল্লতা ইহাদের চিন্তায় দেখা যাইতেছে। কামালপাশার পক্ষে যদি সেভর্ সন্ধি উল্টাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল, তাহা হইলে জার্ম্মাণদের পক্ষেই বা ভার্সাই সন্ধি রদ করা সম্ভব হইবে না কেন? "অতএব লাগাও ধাক্কা—যা থাকে কপালে"

—এইরূপ ধারণা যুবক জার্ম্মাণি ও যুবকঅষ্ট্রিয়ার মহলে-মহলে প্রসার লাভ করিতেছে।

অষ্ট্রিয়ায় গিন্নীপনা

আল্প্‌সের একাধিক 'তাল' দেখা হইল। কখনো রেলে, কখনো হাঁটিয়া। তাল শব্দে জার্ম্মাণরা নদী বা ঝোরার দুই-ধারকার পাহাড়ী উপত্যকা বা সমতল-ভূমি বুঝিয়া থাকে। ভীমতাল, নৈনিতাল ইত্যাদি শব্দের 'তাল'-অংশে আমরা বুঝি হ্রদ বা সাগর। কিন্তু সাধারণ হিসাবে আল্প্‌সের তালগুলাকে হিমালয়ের তালই ধরিয়া লইলাম। ফিললজিষ্ট মহাশয়রা যেন না চটেন!

পোষ্ট-মাষ্টারের পত্নী চব্বিশ-ঘণ্টাই খাটিতেছেন। ছোট-ছোট দুই কন্যা ও এক শিশু-পুত্রের জননী-রূপে ইঁহাকে গৃহস্থালী চালাইতে হয়। দিনের অর্দ্ধেক অংশ স্বামীর সঙ্গে ইনি ডাকঘরে কেরাণীর কাজ করেন। জার্ম্মাণ সমাজে শিক্ষিতা মহিলারা যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার্লিনের বহু ভদ্রঘরের আর উঁচুদরের পরিবারেও এইরূপ লক্ষ্য করিয়াছি।

আঙিনা-মেজে পরিষ্কার করা, রান্নাবাড়ী সমস্ত সামলানো, কাপড় কাচা, বাগানের কাজ করা, তাহার উপর তিন শিশুর তদবির করা,—সবই এক ঘাড়ে বহিতে হইতেছে। পোষাক শেলাই ও মেরামত ত' আছেই। তাহার উপর শীতকালের জন্য নানা-প্রকার শাক-সব্জী, ফল-মূল, কাঁচের গ্লাসের ভিতর তাজা ভাবে পুঁজি করিয়া রাখা এক মস্ত মেহানৎ।

এই মহিলাই আবার লেখা-পড়ায় গ্র্যাজুয়েট, নাচে-গানে ওস্তাদ। উচ্চ শিক্ষায় স্ত্রীজাতির পরকাল ঝর-ঝরে' হয় না দেখিতেছি! সংসার

হইতেছে। অথচ বয়সে ইনি নেহাৎ মুরুব্বিও নন। ভারতবর্ষের মেয়েরা ইস্কুল-কলেজের বিদ্যাকে গৃহস্থালীর শত্রু বিবেচনা করেন কি?

ইতালীর জুলুম

দক্ষিণ টিরোল হইতে খবর আসিয়াছে,—দলে-দলে ইতালীয় ফাশিস্ত্‌রা বোৎসেন নগরে আসিয়া জুলুম করিতেছে। প্রায় দশ হাজার ফাশিস্ত্‌ সেখানে মোতায়েন। ফাশিস্ত্‌রা মুখোসে মাথা ঢাকিয়া বেড়ায়। গায়ে কালো কুর্ত্তা। কুর্ত্তার উপর মড়ার মাথার নিশানা আঁকা। কোমরে ছোরা। ফাশিস্ত্‌রা ইতালীর সনাতন গুপ্ত-সমিতির সকল ধরণ-ধারণ, আদব-কায়দা, আদর্শ ও লক্ষ্য বজায় রাখিয়া চলিতেছে। ইহারা স্বদেশবৎসল, 'মাতৃভক্ত,' মৃত্যুবরণকারী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ডাকাইত-বিশেষ।

'স্বদেশী' আন্দোলনের পাকা কারিগররূপে ইতালিয়ানরা এই সকল ডাকাইত-বীরগণের তারিফ করিতেছে। কিন্তু বিদেশী লোক-জনের নজরে ইহারা নৃশংস বর্ব্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। কালো-কুর্ত্তা-পরা ফাশিস্ত্‌রা বোৎসেনের জার্ম্মাণ পরিবারের ভিতর প্রবেশ করে। বাড়ীওয়ালা অথবা বাড়ীওয়ালীকে ছোরার ভয় দেখাইয়া ঘরের খাদ্য-দ্রব্য ছিনিয়া লয়। ইস্কুল-পাঠশালা হইতে ইহারা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে খেদাইয়া দিয়া, সেখানে নিজেদের বস-বাসের আড্ডা গাড়ে।

ইতালীর গবর্মেণ্ট এই ন্যাশন্যালিষ্ট ভলাণ্টিয়ারদের উপদ্রব রুখিবার কোনো চেষ্টা করিতেছেন না। বরং শুনা যাইতেছে, ফাশিস্ত্‌রা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে জনপ্রতি দৈনিক ত্রিশ লিয়ার আদায় করিতেছে। ত্রিশ লিয়ার আজ-কালকার বিনিময়ের বাজারে প্রায় পাঁচ টাকা। দেখিতেছি, গবর্মেণ্ট স্বয়ংই ভলাণ্টিয়ারদের ভয়ে জড়সড়। অথবা ফাশিস্ত্‌দিগকে ইতালীর গুপ্ত সেনাবিভাগ বলিব কি?

দক্ষিণ টিরোল আজকাল ইতালীর অধীনস্থ এক প্রদেশ মাত্র। ইতালীর গবমেণ্ট এই অঞ্চলে জোরজবরদস্তি করিয়া ইতালীয় ভাষা বসাইতেছে। জার্ম্মাণ ভুলাইয়া দেওয়া হইতেছে। মাতৃভাষা উপিয়া ফেলিবার প্রয়াস ইয়োরোপে যেখানে-সেখানে যখন-তখন দেখা গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কখনো বোধ হয় জুলুম জিনিষটা এই আকারে প্রকটিত হয় নাই।

ইতালী হুকুম করিয়াছেন, হোটেলগুলার বিজ্ঞাপনে 'আলবের্গ' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। 'হোটেল' শব্দটা বিদেশী, জার্ম্মাণ! বিদ্যাপীঠে-বিদ্যাপীঠে ইতালীয় রাজভক্তির সঙ্গীত মুখস্থ করানো হইতেছে। ফাশিস্ত্ মহাশয়রা মাঝে-মাঝে পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া শিশু-দিগকে জিজ্ঞাসা করে ;—"তুমি ইতালীর জাতীয় গীত গাহিতে পার ?" এক শিশু জবাব দিয়াছিল :—"আজ্ঞে না।" শুনা যায়, তৎক্ষণাৎ ফাশিস্তের চপেটাঘাতে শিশুর দাঁত ভাঙিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

একজন বিচক্ষণ জার্ম্মাণ শিক্ষয়িত্রীকে বিনা বাক্যব্যয়ে ডিসমিস করা হইয়াছে। তাঁহার দোষ,—তিনি জার্ম্মাণ বালক-বালিকাদিগকে ইতালীর ইতিহাস ও সাহিত্য শিখাইতে নারাজ ছিলেন।

সাঙ্ক্ট্ আণ্টনের আবহাওয়ায়

ইন্-তাল, এ্যট্স্-তাল, ত্রিজানা-তাল ইত্যাদি ছাড়াইয়া রোজানা-তালে পৌঁছিয়াছি। আসিয়াছি আর্লব্যর্গ পাহাড়ের পায়ে। এইখানে অষ্ট্রিয়ান আল্পসের উচ্চতম রেল-ষ্টেশন। পল্লীর নাম সাঙ্ক্ট্ আণ্টন। বিলাতী সেইণ্ট আর ফরাসী সাঁ মহাপ্রভুরা জার্ম্মাণদের সাঙ্ক্ট্। আণ্টন, অণ্টনি বা আণ্টনিও ঋষি খ্রীষ্টান শিশুদের 'মা মঙ্গলচণ্ডী'। ছেলেপিলেদের অসুখ-বিসুখ হইলে, ক্যাথলিক নারীরা এই ঋষির শরণাপন্ন হয়। ঋষি মহোদয় মা-মেরীর নিকট আর্জিটা পেশ করিয়া

জননীর মুখ রক্ষা করেন। শুনা যায়, অনেক সময়ে না কি সাঙ্কট্ আণ্টনের কাছে মানত করিয়া খ্রীষ্টানরা সুফললাভও করিয়াছে। খ্রীষ্টানদের আণ্টন জাপানী বৌদ্ধদের জিজোদেব। পল্লীটা চার হাজার ফিটের চেয়ে কিছু বেশী উঁচু,—বাংলার কার্সিয়াঙের সমান।

সাঙ্কট্ আণ্টন যে উপত্যকায় অবস্থিত, সেটা অন্যান্য উপত্যকার চেয়ে প্রশস্ত। চারিধার হইতে পাহাড়গুলা শির খাড়া করিয়া পল্লী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। এক প্রকার নয়া পাইন কয়েকদিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি। জার্ম্মাণে বলে 'ল্যার্খেন'। ইহার পাতাগুলা শরতে লিণ্ডনের মত লাল, গোলাপী বা সোনালী রংয়ে রঞ্জিত হয়। শীতকালেও পাতাগুলা গাছেই থাকে। কিন্তু লিণ্ডেন, মেপ্‌ল, কাষ্টানিয়েন ইত্যাদির পাতা লাল হইয়া শীতের প্রারম্ভেই ঝরিয়া পড়ে।

সবুজ পাইনের আবেষ্টনে লাল পাইন অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। ভারতে সাধারণতঃ চির-সবুজ পাইনই নজরে পড়িয়াছে। হয় ত কোথাও-কোথাও বা ল্যার্খেনও দেখা যায়। বসন্তে ও গ্রীষ্মে লাল পাইন আবার সবুজ হয়।

টিরোলীদের একপ্রকার খাস পাহাড়ী সুর আছে। তাহার নাম 'য়্যেড্‌ল্'। অন্যান্য সাধারণ সুরের ফাঁকে-ফাঁকে য়্যেড্‌ল্ ব্যবহৃত হয়। শুনায় বিচিত্র, মন্দ নয়। যেন কোনো আওয়াজ এক পাহাড়ের ধাক্কা খাইয়া অপর এক পাহাড়ে গিয়া ঠেকিতেছে। ধ্বনিটা আবার সেই পাহাড়ে পথ না পাইয়া তৃতীয় কোনো পাহাড়ের আশ্রয় মাগিতেছে। আবার সেইখানেও হতাশ হইয়া দিশেহারাভাবে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অথবা গলিঘোঁচে পথ ঢুঁড়িতে-ঢুঁড়িতে চুপ মারিতেছে। প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি পার্ব্বত্য উপত্যকায় লহর তুলিতেছে, এই দৃশ্য কানে দেখিতে পারিলে য়্যেডল শুনা যাইবে।

তড়িতের রেল

সাঙ্ক্‌ট্‌ আণ্টন ষ্টেশনে এক লম্বা পাহাড়ী সুড়ঙ্গ সুরু হইয়াছে। টানেলটা রেলে ফুঁড়িয়া বাহির হইতে লাগে ষোল মিনিট। গোটা আর্লব্যর্গ পাহাড় ভেদ করিয়া যাইতে হয়। জীমেন্‌স্‌-শুকার্ট কোম্পানীর এক অষ্ট্রিয়ান এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে এইখানে দেখা হইল। ইনি তড়িতের রেলপথ নির্ম্মাণে বাহাল আছেন। এঞ্জিনিয়ার মহাশয় বলিতেছেন :—"কয়লার ধোঁয়ায় মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া আসিতেছে। শীঘ্রই ইহাদের দুঃখ ঘুচিবে। অষ্ট্রিয়ায় আজকাল কয়লার অভাব। রেল-কোম্পানী বাধ্য হইয়া সমস্ত পথেই তড়িতের এঞ্জিন ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। বিদ্যুতের গাড়ী বৎসর দু-একের ভিতরই আল্পসের সর্ব্বত্র চলিতে থাকিবে।"

বাষ্পে আর তড়িতে হাজার তফাৎ আছে। তাহার ভিতর জন-গণের স্বাস্থ্যের তরফ একটা মস্ত বিষয়। বাষ্প আনিয়াছিল শিল্প-বিপ্লব, নয়া ধনি-সমাজ, পল্লী-নগরের বিচিত্র সমাবেশ, অভিনব জাতিভেদ,—এক কথায়, 'বর্ত্তমান জগৎ' এবং তাহার উপযোগী ধর্ম্ম ও দর্শন। বিদ্যুতে আনিবে আর এক বিপ্লব,—কিন্তু কোন্‌ আকারের বিপ্লব? কিরূপ নয়া জগৎ? তাহা 'ফিউচারিষ্ট' বা ভবিষ্যপন্থী সমাজ-বিপ্লবী আদর্শবাদীদের ভাবুকতায় একটু-আধটু কল্পনা করা হয় ত সম্ভব।

তবে এশিয়ার ভাবুকদের এখন হইতেই সমঝিয়া রাখা আবশ্যক যে, সেই ভবিষ্য জগৎও আসিতেছে তথাকথিত ভোগপরায়ণ, আধ্যাত্মিকতা-হীন, মেটিরিয়্যালিষ্ট জড়বাদী পশ্চিমাদেরই সাধনার ফলে। ইয়োরামেরিকান জীবনের ক্রমবিকাশে এক নয়া স্তর, এক নয়া আদর্শ প্রকটিত হইতে চলিয়াছে,—নানারূপে নানা ভঙ্গীতে। তাহাতে এশিয়ার

একটা তথাকথিত 'প্রাচ্যামী' আবিষ্কার করিতে বসিলে নিজেকে ঠকানো হইবে মাত্র। নয়া দুনিয়া চলিতেছে প্রায় একমাত্র পশ্চিম' আধ্যাত্মিকতার জোরে। এই আধ্যাত্মিকতাকে হাজার উপায়ে দখল করিয়া তাহার নয়া-নয়া হাজার রূপ খুলিয়া দিতে পারিলেই যুবক এশিয়া জগতে টিকিতে পারিবে।

'পায়দলে' পাহাড় দেখা

(১)

এক বুড়ীর ঘরে অতিথি হইয়াছি। বৃদ্ধার বয়স ষাট্ বৎসর। ইনি একজন নামজাদা শিক্ষয়িত্রী। পুরাণা বাদসাহী আমলে ইনি টিরোলের শিক্ষাবিভাগে অত্যুচ্চ সরকারী সম্মান পাইয়াছিলেন। রিপাব্লিকের আমলে পেন্সন ভোগ করিতেছেন। টিরোলের জনসাধারণ ইঁহাকে 'মাসী' বলিয়া ডাকে। ইনি চির-কুমারী, বলেন :—"আমার বিবাহ হইয়াছে ভগবানের সঙ্গে।"

বুড়ীর আসল নাম প্রায় কেহই জানে না। নিষ্কর্ম্মা ভাবে পেন্সন ভোগ করিতে ইনি অনিচ্ছুক। এই জন্য ঘরে একটা বে-সরকারী বিদ্যাপীঠ খুলিয়াছেন। সাঙ্ক্ট্ আণ্টনের রেল-মজুরেরা তাহাদের পুত্র-কন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষার ভার 'মাসীর' হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

শিশুদের নিকট কয়েকবার "ইন্‌স্‌পেক্টর"রূপে দেখা দিলাম। প্রায় পঞ্চাশজন শিশুর জন্য কিণ্ডারগার্টেন চলিতেছে। পাঠশালার এক ঘরেই আমার ঠাঁই।

আর্লবার্গ পাহাড়ের পিঠের উপর দিয়া হাঁটিতেছি। সোজা বাঁধানো শড়ক আছে। বিশেষ কোনো অভিযানের সমস্যায় পড়িতে হইতেছে না। যতদূর নজর যায়, দেখিতেছি কেবল পর্ব্বতের লহর। পাহাড়ের বুক ও ঘাড়ে সবুজ ও সোনালী পাইনের বন। শিরে তুষারের মুকুটমালা।

টিরোলী আল্প্‌সের সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি, মাঝে-মাঝে একচালা কেঠো ঘর। এই সকল কুঁড়ে ঘরে পর্য্যটকেরা বেড়াইতে আসিয়া রান্না-বাড়া করে। পাহাড়ের এদিক-ওদিক হইতে কাঠ কুড়াইয়া আনিতে হয়। গ্রীষ্মকালে এই ধরণের কুঁড়েতে বহু লোকই কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া যায়।

একদল পর্য্যটক কুঁড়ের কাঠগুলা ব্যবহার করিবার পর পাহাড়ের এপাশ-ওপাশ হইতে নয়া কাঠ কুড়াইয়া ঘরের ভিতর মজুদ করিয়া রাখে। পরবর্ত্তী মোসাফিরেরা এইরূপে বিনা কষ্টে শুক্‌না কাঠ পাইতে পারে। এই সমবায়-নীতি পাহাড়ী-পঞ্চায়তের রেওয়াজ। খাওয়া-দাওয়ার জিনিষ ঘাড়ে বোঁচকা-বাঁধিয়া আনা আল্প্‌স্‌-পর্য্যটকদের দস্তুর।

'আল্পেন-ফারাইন' বা পাহাড়-পর্য্যটক-ক্লাব অথবা পর্ব্বত-সৌন্দর্য্য-বিধায়িনী সমিতি এই সব কুটীর নির্ম্মাণ ও তদ্‌বির করেন। পর্য্যটকেরা কখনো বেশীক্ষণ কুঁড়েতে কাটায় না। সকলেই যার-যার প্রিয় শিখরে উঠিবার জন্য ব্যগ্র। কখনো-কখনো সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য রাত কাটানো হইয়া থাকে।

(২)

সাঙ্ক্‌ট্‌ আণ্টন পল্লী টুরিষ্টদের সুপরিচিত। বড়-বড় হোটেল আছে। ইয়োরামেরিকার সকল দেশ হইতে পর্য্যটকের আমদানি হয়। অন্ততঃ হাজার বিদেশী ঠাঁই পাইতে পারে। শীতকালেই টুরিষ্টদের ভিড় বেশী। তখন গোটা জনপদ বরফে সাদা হইয়া যায়। পাহাড়ের মাথায় তখন শ্লেজ গাড়ীতে বসিয়া নীচে গড়াইয়া নামা এক প্রধান আমোদ। এই খেলাটা বিপজ্জনকও বটে। প্রতি বৎসরই দু-এক-জনের প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে।

আর্লব্যার্গ পাহাড়ের উপর দিয়া ঘণ্টা-দেড়েক হাঁটিয়া এক 'পাস' পাইলাম। এই সঙ্কীর্ণ পথ প্রায় ছয় হাজার ফিট উঁচু। কন্‌কনে,

ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে,—বরফের উপর দিয়া মশ্‌মশ্‌ করিয়া কচ-কচাইয়া হাঁটিতেছি। এক পুরাণা মন্দিরে হাজির হইলাম। জনপদের নাম সাঙ্ক্‌ট্‌ ক্রিষ্টোফ্‌।

মন্দিরে ক্রিষ্টোফ ঋষির সমাধি আছে। মন্দিরটার ভিতরে দেখিলাম, মহাপ্রভুর মূর্ত্তির হাতে লাঠি। ভাবার্থ ঃ—মোসাফিরেরা লাঠি হাতে দেশভ্রমণে বাহির হইয়া থাকে। লাঠি পর্য্যটনের চিহ্ন। ক্রিষ্টোফ্‌ পর্য্যটকদের দেবতা ও রক্ষাকর্ত্তা। আপদ্‌-বিপদের সময়ে মোসাফিররা "দোহাই ক্রিষ্টোফ্‌ অবতার!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলে, ইনি শরণাগতের জন্য ভগবানের নিকট সুপারিশ পাঠাইয়া থাকেন। বঙ্গোপসাগরে চীনা মোসাফির ফাহিয়ানের আর্ত্তনাদ মা-কোআন্নিন শুনিয়াছিলেন।

মান্ধাতার আমলে অর্থাৎ রেলগাড়ীর যুগের পূর্ব্বে এই পার্ব্বত্য গলিতে যে সকল বেপারী সওদা লইয়া চলাফেরা করিত, তাহাদের অনেক সময়ে বরফের চাপে মারা পড়িবার আশঙ্কা ছিল। মুনি-ঋষি বা সাধু-সন্ন্যাসীরা এইরূপ পথিকদের জন্য একটা আশ্রয়ের ডেরা অথবা সেবাশ্রম কায়েম করিয়াছিলেন। এই ধরণের আশ্রয়স্থলকে জার্ম্মাণে বলে 'হোস্‌পিট্‌স্‌'। সাঙ্ক্‌ট্‌ ক্রিষ্টোফ্‌ হোস্‌পিটস্‌ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রথম গড়া হয়।

'বর্‌ফানে'র সাধুরা বাঘা-কুকুর পুষিতেন। কুকুরের গলায় গরম দুধ, রুটি, মদ, মাংস ইত্যাদি বাঁধিয়া পার্ব্বত্য পথে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কুকুরেরা বরফে ঢাকা-পড়া আধমরা পথিকদিগকে ঢুঁড়িয়া বাহির করিত। এই ধরণের কাহিনী সুইস্‌ বর্‌ফানের সেইণ্ট বার্ণার্ড হোস্‌পিটস্‌ সম্বন্ধেও শুনা যায়। "শান্তমিদমাশ্রমপদম্‌" দেখিতেছি ভারতাত্মারই একচেটিয়া নয়!

হোস্‌পিট্‌সে একটা সরাই আছে। প্রায় ত্রিশজন অতিথি একসঙ্গে

বসবাস করিতে পারে। চারিদিক্ বরফ-পড়ায় অন্ধকার দেখিতেছি। ঘরের পাথরের দেওয়ালের ভিতর দ্বিতীয় এক কাঠের দেওয়াল। নেহাৎ নিরিবিলি। নিকটে কোনো পল্লী নাই। 'পাসে' বাহির হইয়া দেখি, তুষার-বালুর মরু তৈয়ারি হইয়া রহিয়াছে। অক্টোবর মাসের চতুর্থ সপ্তাহ,—শীত আসিতেছে।

টিরোলীদের ধরণ-ধারণ

(১)

পাইনবনের ভিতর—অথবা রাস্তার কিনারায় কোথাও-কোথাও মন্দিরজাতীয় একচালা ঘর দেখিতেছি। সেখানে পথিকেরা খ্রীষ্ট, মা-মেরী অথবা কোনো সেণ্টকে পূজা করিবার অবসর পায়। মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে,—হয় কাঠের গড়া অথবা চিত্রে আঁকা। সম্মুখেই একটা বাক্স। বাক্সের ছেঁদার ভিতর দক্ষিণা রাখিয়া যাইবার দস্তুর দেখিতেছি। 'ফুল-বেলপাতা' চড়াইবার রেওয়াজও আছে। অন্ততঃ "নমো বিষ্ণবে" উচ্চারণ করিয়া হাঁটিতে-হাঁটিতে হাঁটু বাঁকাইয়া মাথা নোওয়ানো ক্যাথলিক মাত্রেরই রীতি।

বৃষ্টি পড়িতেছে দিনরাত। রাস্তায় অকথ্য কাদা। পথে গরু চলিয়া-চলিয়া মানুষের পক্ষে হাঁটা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আল্প্সের সকল পল্লীতেই এই দৃশ্য। জল-বৃষ্টির দিনে আল্প্সে মোসাফিরি করা ঝকমারি। তবে আমরা গরুর গাড়ী পাশ-করা লোক। আমাদের পথ আটক্ কোথায়?

আমার কুঠুরির এক কোণে হাঁড়ির ভিতর কাগজে ঢাকা ঈষৎ হল্‌দে রংয়ের কি একটা দেখিলাম। 'মাসী' বলিলেন,—"এই সামান্য আউসগেলাসেনে বুট্টার বা গলানো মাখন।" জার্ম্মাণে ইহাকে এক কথায় বলে 'শ্মাল্‌ৎস'। রান্নাঘরে খাইতে বসিয়া দেখিতেছি, উনুনে

খোলা চাপাইয়া বুড়ী শ্মাল্‌ৎস ঢালিতেছেন। শ্মাল্‌ৎসের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া হইল এক বস্তু। নাম 'গ্রীজ্‌' ওরফে সুজী!

লাফাইয়া উঠিয়া ভাবিলাম, এতদিন পরে ভারত-প্রসিদ্ধ, দুনিয়া-দুর্লভ ঘী আবিষ্কার করিয়াছি। গল্প সুরু হইয়া গেল। বুঝা গেল,—টিরোলী আল্প্‌সের প্রত্যেক পল্লী-শহরে ঘী চলিয়া থাকে। মাখনের রেওয়াজ পাহাড়ে অতি অল্প। অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মাণ সমাজের অন্যান্য কেন্দ্রেও কম-বেশী ঘী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মিশর, চীন, জাপান, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি এই সকল দেশের কোথাও ঘী মিলে নাই। ঘীর স্বরূপ বুঝাইতে হইলে এই সকল দেশের লোকের সম্মুখে একটা ছোট-খাটো বক্তৃতা করা দরকার হয়।

ঘীয়ে সুজী ভাজা হইতেছে। ভাবিতেছি ইয়োরোপ,—একটা নতুন কিছুই বা তৈয়ারি হইতেছে বোধ হয়। রাধামাধব! খাইয়া দেখি, এ যে নিখিল-ভারত-মহামণ্ডলব্যাপী মোহনভোগ বা হালুয়া। বিলকুল হালুয়াই বটে। একদিনে দুইটা বড়-গোছের আবিষ্কার সাধিত হইল। কথাবার্ত্তায় বুঝা যাইতেছে, টিরোলীরা হালুয়াকে আল্প্‌সের "খাঁটি স্বদেশী" বস্তু বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

টিরোলের লোকেরা এক প্রকার নয়া বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। বার্লিনের কোনো-কোনো দোকানে দু'একটা দেখিয়াছি। নাম 'ৎসিথার'। আমাদের সেতার নয়! চ্যাপ্টা পাতলা টেবিলের মতন কাঠের উপর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশটা তারের সন্নাবেশে এই যন্ত্র গঠিত। শোয়াইয়া বাজাইতে হয়।

একজন টিরোলী ওস্তাদের সঙ্গে কথা হইল। বীণাকে প্রচার করিলাম খাশ ভারতীয় যন্ত্র ভাবে। তৎক্ষণাৎ ওস্তাদ মহাশয় সঙ্গীতের একটা বড় জার্ম্মাণ বিশ্বকোষ বাহির করিয়া আনিলেন। ইনি বর্ণনাটা পড়িতে লাগিলেন। আমি ছোট অক্ষরের নোটটা পড়িয়াই স্তম্ভিত

হইলাম। লেখা আছে :—"বীণা প্রাচীন মিশরের আবিষ্কার। মিশর হইতে হিন্দুরা এই যন্ত্র আমদানি করিয়া থাকিবে।"

সাঙ্ক্‌ট্‌ আণ্টনের মাসী

'মাসী'কে সাঙ্ক্‌ট্‌ আণ্টনের লোকেরা খাতির করে খুব। ইঁহার কিণ্ডারগার্টেনে বালক-বালিকারা প্রতিদিন পাঁচঘণ্টা করিয়া কাটাইয়া থাকে। ইস্কুল বসে দুই বেলা। গান, গল্প, ছবি-দেখা, কাদা-মাটি দিয়া অথবা কাগজ ভাঁজ করিয়া খেলানা তৈয়ারি করা, নানা প্রকার আমোদ-জনক চলা-ফেরা করা বুড়ীর শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রাণ স্বরূপ।

সবচেয়ে ছোট শিশুর বয়স মাত্র দুই বৎসর। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের বয়স পাঁচ। লিখিতে অথবা বই পড়িতে শিখানো হয় না। 'মাসী' বলিলেন :—"ছয় বৎসর বয়সে পড়িবা মাত্র শিশুরা গবর্মেণ্টের সরকারী পাঠশালায় ভর্ত্তি হইতে বাধ্য। সেই ইস্কুলে ইহাদের হাতে-খড়ি হইবে। আমার পাঠশালায় সদভ্যাস তৈয়ারি করা, বিদ্যার্জ্জনে আনন্দ গজানো, ইত্যাদি উপায়ে জীবনের গোড়াপত্তন হইয়া থাকে মাত্র।" টিরোলের বহু গণ্যমান্য, প্রসিদ্ধ লোক বুড়ীর হাতে মানুষ হইয়াছেন।

বুড়ীকে গ্রামের লোকেরা মাসিক বেতন দেয় অতি সামান্য। কিন্তু কোনো পরিবার হইতে আসে ফলমূল, কেহ পাঠাইয়া দেয় রুটি-দুধ-মাখন, কেহ দেয় পশম বা কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। মধ্যাহ্ন-ভোজন আসে এক হোটেল হইতে। 'সিধা' দেওয়ার রীতি পাশ্চাত্য সমাজেও চলিত্।

ষাট বৎসরের বৃদ্ধাকে যেরূপ কর্ম্মঠ, উৎসাহী, শিশুপ্রিয় এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ দেখিতেছি,—তাহাতে টিরোলের জন-সাধারণ কেন ইঁহাকে মাসী বলিয়া ডাকে,—বিনা 'বিস্মার্কই' তাহা বুঝিতে পারিলাম।

অষ্ট্রিয়ায় স্বদেশী আন্দোলন

মাঝে-মাঝে প্রায়ই বরফ পড়িতেছে। শীত আসে-আসে। কাজেই কাব্য-প্রসিদ্ধ 'আল্‌প্‌-গোলাপ' এ যাত্রায় দেখিতে পাইলাম না। 'আল্‌প্‌-রোজ'কে ইংরাজিতে বলে রোডোডেণ্ড্রন। হিমালয়েও প্রচুর।

আল্‌প্‌সের পা ও বুক নানা শ্রেণীর পাইনে ঢাকা। তাহার ঊর্দ্ধে দেখিতে পাই ঝোঁপ জাতীয় ছোট-খাটো গাছ-গাছড়া। কোনো প্রকার উদ্ভিদ্ সেখানে আছে কিনা সন্দেহ হইতেছে। বসন্তে ও গ্রীষ্মে ঐ অঞ্চলেই আল্‌প-রোজের লাল বাগান তৈয়ারি হয়। পাহাড়ের শিরগুলা একদম ন্যাড়া,—শক্ত পাথরের চাপ। নেহাৎ উঁচু না হইলে—অর্থাৎ হাজার দশেক ফিট না ছুঁইলে—শিখরগুলা গ্রীষ্মে তুষারশুভ্র দেখায় না।

অষ্ট্রিয়াতে খোলাখুলি ভাবে রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে একটা নয়া রাষ্ট্রীয় দল গঠিত হইল। এই দলে ইতিমধ্যে দুই লাখের বেশী মেম্বর দাখিল হইয়াছে। ইহারা পুরাণা হাব্‌সবুর্গ বংশকে রাজতক্তে বসাইতে চায়।

ইন্‌স্‌ব্রুকে একটা বিপুল 'স্বদেশী' সভা হইয়া গেল। ব্যর্গ-ইজেলের হোফার মূর্ত্তির সম্মুখে এক বিরাট্ জন-সমাগম হইয়াছিল। টিরোলের 'স্বদেশ-রক্ষক' সমিতি এই মিছিলের উদ্যোগকর্ত্তা। প্রায় দশ হাজার লোক সশস্ত্রে এই স্বেচ্ছাসেবকের দলে উপস্থিত ছিল।

এই দলে হাজির ছিল দক্ষিণ জার্ম্মাণি অর্থাৎ ব্যাভেরিয়া জনপদের বহু প্রতিনিধি। এমন কি, গোটা জার্ম্মাণির 'স্বেচ্ছাসেবক-পরিষদে'র ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত এশেরিকও আসিয়াছিলেন! এশেরিক যুবক জার্ম্মাণির সমর-প্রাণ। অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মাণির নরনারী ক্রমেই তাতিয়া উঠিতেছে।

পল্লী-শিশুর মৃত্যু

আল্‌প্‌সের কোনো পল্লীতে এক শিশুর মৃত্যু হইল। মৃত্যু সন্নিকট

বুঝিয়া চিকিৎসক মাতাকে বলিলেন:—"বালিকার হাতে ক্ষুদ্র গৃহ-ক্রুশটি পরাইয়া দিন।" পরে ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ভাঁড় হইতে তীর্থ-জল আনিয়া শিশুর কপালে চোখে ও বুকে বুলাইয়া দেওয়া হইল। শিশুর 'জীবন-বাতি'ও জ্বালাইয়া রাখা হইল।

পুরোহিত আসিলেন। মৃত্যুকালে পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ না পাওয়ার সমান দুঃখ ও পাপ কোনো ক্যাথলিকের চিন্তায় আর নাই। স্তব, প্রার্থনা, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি সবই পুরোহিত কর্ত্তৃক ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইল। অনেক পূর্ব্বেই বালিকার বাক্‌রোধ ও দৃষ্টি-লোপ হইয়াছে।

শিশুর কানে পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন:—"শীঘ্রই তুমি মা-মেরীর কোলে যাইতেছ। প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমায় সাদরে গ্রহণ করেন।" একবার মাত্র তৎক্ষণাৎ সে চোখ খুলিয়া ঘরের লোক-জনের দিকে তাকাইল। তাহার পরই শ্বাসরোধ।

জনক-জননী বহুকাল গির্জ্জায় যাওয়া-আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের ফলে শিশু-কন্যা মৃত্যুর মুহূর্ত্তে একবার চোখ খুলিয়া চাহিয়াছে, এই ঘটনায় তাঁহাদের গির্জ্জা-ভক্তি জাগিয়া উঠিল। সন্তান স্বর্গে গেল,—এই আশ্বাসে এখন ইহাঁদের চিত্ত অনেকটা দৃঢ় হইল।

পাড়ায় মাত্র শ' দেড়েক লোক। বাড়ীর লাগাওই গির্জ্জা। গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিতে থাকিল। গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া মৃত্যু-গৃহে শিশুর জন্য প্রার্থনা করিল। শিশুর বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। এই জন্য বহু প্রবীণ-প্রবীণা শিশুর জনক-জননীকে আনন্দ জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করিল না!

কচি শিশুর মৃত্যুকে পাড়াগাঁয়ের লোকেরা—বিশেষতঃ আল্‌সের ক্যাথলিকরা সাধারণ মানুষের মৃত্যু বিবেচনা করে না। শিশু ত

'এঞ্জেল'—স্বর্গের জীব,—মরিয়া সে ত স্বর্গে যাইবেই। তাহার স্বর্গ-যাত্রায় সকলের আনন্দিত হওয়াই উচিত। এইরূপ বুঝিয়া বহুদূরের উপত্যকা হইতে চাষী, মেষ-পালকেরা মৃত-শিশুর শব দেখিতে আসে। অনেক সময়ে তাহারা মৃত্যু-শয্যার সম্মুখে নাচ-গান পর্য্যন্ত করে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অতদূর গড়ায় নাই।

এক প্রতিবেশিনী আসিয়া শব ধোয়াইয়া নতুন পোষাক পরাইতে জননীকে সাহায্য করিল। ঘরের ভিতর বিছানা উঁচু করিয়া তাহার উপর শব শোয়াইয়া রাখা হইল। শব ও বিছানা ফুলের মালায় সাজানো হইল। ক্রশ হাতেই আছে,—জপমালাও তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল। বাতি জ্বলিতেছে। শিশুর জন্মের সময় যে মোম-বাতিটা জ্বালানো হইয়াছিল, সেই মোমবাতিটাই মৃত্যুর সম-সমকালে আবার জ্বালানো হইয়াছে। আবেষ্টনটায় মন্দিরের বেদির আকার যেন দেখিতেছি।

সকালে-বিকালে, দুপুর-রাতে দলে-দলে পাড়ার লোক আসিয়া মৃতের জন্য প্রার্থনা করিল। ইস্কুলের বালক-বালিকারা স্তোত্র আওড়া-ইল। গির্জ্জাতেও যথারীতি পল্লীবাসীদের সমবেত ভজন-পূজন অনুষ্ঠিত হইল। চারজন যুবক রাত্রিকালে শবগৃহে পাহারা দিল। দুপুররাতে দলে ভিড়িয়া প্রার্থনা করা ইহাদের কাজ। অন্যান্য সময় উহারা কাটাইল চুরুট খাইয়া, তাস খেলিয়া, আর মদ টানিয়া। 'কোজা-গরের' ব্যবস্থায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

দুই রাত এই ধরণে শবের পরিচর্য্যা চলিবার পর, কেওড়াতলায় যাইবার ব্যবস্থা। গ্রামের প্রত্যেক নরনারীই মিছিলে যোগ দিয়াছিল। বালক-বালিকারা ফুলে সাজিয়া আসিয়াছিল। স্বর্গের জীবের স্বর্গ-যাত্রায় শিশুরা যথাসম্ভব নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, শুভ্র পুষ্প-পোষাক পরিধান করে। শোভাযাত্রার পথে এক মুহূর্ত্তও প্রার্থনা থামে নাই। যে চার

যুবা রাত্রিকালে পাহারা দিয়াছে, তাহারাই ঘাড়ে করিয়া শব বহিয়াছে।

গির্জ্জার দুয়ারে পুরোহিত কেতাব হইতে স্তোত্রপাঠ করিয়া শবের বাক্স 'শোধন' করিলেন। ধূপধূনার ব্যবহার দেখিলাম। তীর্থ-জলের ছিটা দেওয়াও হইল। কবরের জন্য গর্ত্ত ইতিপূর্ব্বেই খুঁড়িয়া রাখা হইয়াছে। সেই যুবা-চতুষ্টয়ই এই কাজের 'অধিকারী'। কবর-শোধনের পর শব তাহার ভিতর নামাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর গির্জ্জায় উপাসনা,—পরে আবার কবর-শোধন। আগন্তুক বুড়াবুড়ি, ছোঁড়া-ছুঁড়ীরা শিশুর জনক-জননীর চোখের দিকে দেখিতেছে। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন ঃ—"মা-বাপরা কাঁদিতেছে কি ?"

খ্রীষ্টান বিধবার জীবন

পল্লীগ্রামে সংকার-সমিতি কায়েম করিতে হয় না। পাড়ার প্রত্যেক লোক—ধনী, দরিদ্র, মজুর, বা আপামর সকলেই লোকজনের মৃত্যুর সময়ে গৃহস্থের সেবা করিতে বাধ্য। এই সনাতন রীতি আল্প্সের খ্রীষ্টান-সমাজে যেরূপ দেখিতেছি, বোধ হয় কোনো-না কোনো আকারে জগতের সকল জনপদেই সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এটা খ্রীষ্টানি, মুসলমানি, হিন্দুয়ানি, প্রাচ্যামি, পাশ্চাত্যামি নয়। এটা পল্লীমাত্রেব স্বধর্ম্ম।

শহরের জটিল জীবনে ইয়েরোশিয়ায় তথা ইয়োরামেরিকায়,—এইরূপ সহযোগিতা দুর্ল্ভ। তবে বিংশ শতাব্দীতেও যাঁহারা,—অন্ততঃ কাগজে-কলমে, কবিতায়, কেতাব এবং বক্তৃতার কসরতে—পল্লী-সভ্যতা পছন্দ করেন, তাঁহারা পশ্চিম মুল্লুকের প্রত্যেক দেশেই সমবায়পন্থী হামদর্দ্দিওয়ালা আধ্যাত্মিকতাবহুল গণ্ডা-গণ্ডা পল্লী-স্বরাজ পাইবেন। সেইগুলা আবিষ্কার করাও যুবক এশিয়ার রিসার্চ্চ-"ডক্‌টর"-

এশিয়ায় একটা কথার প্রচার আছে যে, পশ্চিম দেশের বিধবারা বিবাহ করে। আইনে এবং সমাজে বিধবা-বিবাহ নিন্দিত হয় না। তাহা সত্ত্বেও এত দিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, খ্রীষ্টান-মুল্লুকের বহু বিধবাই পুনর্ব্বার বিবাহ করেন না। তাঁহাদের অনেকেই আবার মৃত স্বামীর স্মৃতিকেই জীবনের একমাত্র সহায় বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। এই সকল বিধবাদের চিত্ত নাড়িয়া-চাড়িয়া, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া, চুলচেরা করিয়া বিশ্লেষণ করিলে, পরীক্ষা-সিদ্ধ চিত্তবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ হয় ত কোনো দিন দেখিতে পাইবেন যে, ভারতের সতীসাধ্বী বিধবা নারীরা আর এই পশ্চিমা বিধবা নারীরা, 'সু-কু'র যে কোনো মাপ-কাঠিতে অভিন্ন।

ইতিমধ্যে একটা বস্তু-তন্ত্রের পরখ করা যাউক। একটুকু ভিতর-কার কথা জানিতে পারিলেই দেখা যায় যে, মধ্যবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত ভদ্রঘরের বিধবারা জার্ম্মাণিতে গৃহস্থালীর এক প্রধান স্তম্ভ। পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ইত্যাদির 'সেবা' করাই খ্রীষ্টান বিধবাদের যেন প্রায় একমাত্র কার্য্য। লেখাপড়ার কাজে, সামাজিক লেন-দেনে, রাষ্ট্রনৈতিক প্রপাগাণ্ডায়, অথবা আফিসী জীবনে হিস্‌সা লওয়া ইহাদের কোষ্ঠীতে লেখা নাই। এই জন্যই নারী-স্বাধীনতা-পরিষদের পাণ্ডা-স্থানীয় স্ত্রীপুরুষগণ ইয়োরামেরিকান বিধবাদিগকে মোটের উপর পরিবারের 'স্লেভ' অর্থাৎ ঝী-দাসী ছাড়া আর কিছু বিবেচনা করেন না।

চীন, জাপান ও ভারতের মামুলিপন্থী বিধবারা অন্য কোনো কিম্ভূত-কিমাকার জীবন যাপন করে কি? দফায়-দফায় তথ্যগুলার তুলনা সুরু হউক। সমাজ-বিজ্ঞান-বিদ্যাটা এই ধরণের সমালোচনায় একটা নয়া ভিতের উপর দাঁড়াইতে পারিবে। সেই সকল ভিত্ত আবিষ্কার-

ফাশিস্ত্‌দের স্বধর্ম্ম

জনরবে প্রকাশ, ইতালীর ফাশিস্ত্‌রা টিরোলের দিকে ধাওয়া করিতেছে। শুনা যাইতেছে, ইহারা না কি অষ্ট্রিয়ান কমিউনিষ্ট বোলশেভিকদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। শীঘ্রই ইন্‌স্‌ব্রুকে রক্তারক্তির সম্ভাবনা। ব্যর্গইজেলের হোফার-মূর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য যুবক-টিরোল প্রাণ হাতে করিয়া দিনরাত পাহারায় লাগিয়া গিয়াছে। অথচ ফাশিস্ত্‌রা ইতালীতে কমিউনিষ্ট, বোল্‌শেভিক, সোশ্যালিষ্ট ইত্যাদি জাতীয় সকল প্রকার সাম্যবাদী মজুর-দলের যম-বিশেষ। ইহারা মজুরদেরকে নিজের দলে আনিতে চায়, কিন্তু রুশ-মতে নয়। রুশরা 'আন্তর্জ্জাতিক'। রুশদের চিন্তায় রুশ ধনীরা রুশ নির্দ্ধনদের শত্রু। কিন্তু বিদেশী নির্দ্ধনরা রুশ নির্দ্ধনদের মিত্র। অতএব ইহাদের খেয়ালে রুশিয়া নামক কোনো বস্তু নাই। রুশিয়ার মজুর-চাষী ইত্যাদি নির্দ্ধন জাত জগতের যে-কোনো নির্দ্ধন জাতকে আপনার বিবেচনা করিয়া রুশিয়ার এবং দুনিয়ার যে-কোনো ধনী মহাজন জাতের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করুক। এ এক নূতন বেদ।

কিন্তু ফাশিস্ত্‌রা 'স্বদেশ' বলিয়া একটা সত্তা স্বীকার করে। ইহাদের চিন্তায় ইতালী একটা নিরেট সমষ্টি। ধনী-নির্দ্ধন, মজুর-মহাজন, কিষাণ-জমিদার ইত্যাদি জাত বা শ্রেণী-বিভাগ আছে সত্য। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থও বিভিন্ন, সত্য। কিন্তু গোটা দেশের কল্যাণ এবং গোটা দেশের অকল্যাণ নামক দুইটা বস্তু ফাশিস্ত্‌রা জাতিনির্ব্বিশেষে, রোজগার-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ইতালিয়ানের নজরে আনিয়া ধরিতেছে। আন্তর্জ্জাতিকতা ইহাদের চোখে মহাবিষ। ইহারা কট্টর স্বদেশী, ন্যাশনালিষ্ট, ইতালী-জননীর

টিরোলী আল্‌প্‌সের পল্লী-কুটীরের সাদা দেওয়ালগুলা যে-কোনো লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সবুজ বনের ফাঁকে-ফাঁকে ধব্‌ধবে ঘর সব চিত্তাকর্ষক। কিন্তু গির্জ্জার গড়নে কোনো বিশেষত্ব বা রূপ-লাবণ্য পাইতেছি না।

শুনিতাম, আল্‌প্‌সের রেলপথের নমুনাই হিমালয়ের রেলপথে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু হিমালয়ে রেলের রাস্তা ধাপে-ধাপে সিঁড়ির মত উঠিয়াছে। টিরোলে আল্‌প্‌সের যতখানি দেখিলাম, ততখানিতে সেরূপ সিঁড়ির ধাপ পাইলাম না। এখানে আঁকা-বাঁকা—ক্রমশঃ উঁচিয়ে যাওয়া রেলপথ নাই।

তাহার কারণ, পাহাড়ের মাথায় উঠাই এই জনপদে রেল-এঞ্জিনিয়ারদের উদ্দেশ্য ছিল না। শিমলা-দার্জ্জিলিঙে সেই উদ্দেশ্য। টিরোলী রেলের উদ্দেশ্য অন্যান্য মামুলি রেলের উদ্দেশ্যের অনুরূপ,—এক স্থান হইতে অন্য এক দূরবর্ত্তী স্থানে যাওয়া। পথের মধ্যে পাহাড় পড়িয়াছে, যেমন ভারতের বিন্ধ্য,—সেইগুলা কোনো মতে পার হইতে পারিলেই হইল। কাজেই যেখানে-যেখানে উঁচু পথ ভাঙিতে হইয়াছে, সেখানে রেলের রাস্তা আস্তে-আস্তে গড়াইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাই।

যুবক টিরোল

দক্ষিণ টিরোলের এক যুবা চিকিৎসক বলিতেছেন,—"জাতে আমি জার্ম্মাণ,—চৌদ্দপুরুষ আমার জার্ম্মাণ। অথচ লড়াই হারার ফলে এখন আমি ইতালির প্রজা,—ইতালিয়ান। কাজেই দেশ-ত্যাগী হইয়া যে-কোনো মুল্লুকে প্রবাসী হইতে প্রস্তুত আছি। পারশ্য, আফগানিস্থান, চীন ইত্যাদি দেশের হাসপাতাল গড়ার কাজে চাকুরি ঢুঁড়িতেছি।"

যে সকল লোক টাট্‌কা "নিজবাসভূমে পরবাসী" হইয়াছে, তাহাদের মেজাজ 'ঘাগী'-গোলাম ভারত-সন্তানেরা সহজে বুঝিতে পারিবে কি? চিত্তপ্রবৃত্তিতেও মরুচে ধরে যে!

ইন্‌স্‌ব্রুকের একজন প্রসিদ্ধ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের নিকট শুনিলাম, ইতালিয়ানরা যে-কোনো মুহূর্ত্তে ইন্‌স্‌ব্রুক দখল করিতে পারে। দক্ষিণ টিরোলের এতখানি আজ ইতালির পকেটস্থ যে ইতালিয়ান সীমানা হইতে ইন্‌স্‌ব্রুকে আসিতে পথে কোনো বাধাই পড়ে না। ইনি অষ্ট্রিয়ার প্রত্যেক পাহাড়ের খুঁটিনাটি সবিশেষ অবগত আছেন।

এক অষ্ট্রিয়ান যুবার মত—"ইতালিয়ানরা একদম 'ভেতো' জাত। লড়াইয়ের ধাত ইহাদের নাই। বাদশাহী আমলে অষ্ট্রিয়ানদের চেহারা দেখিলেই ইতালিয়ানরা ভয়ে জড়সড় হইত। এমন কি, আজও একবার যদি ইহাদিগকে একা পাই, তাহা হইলে ইহাদের লড়াইয়ের সাধ মিটাইয়া ছাড়িব।"

যুবার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, অষ্ট্রিয়ানরা যুগো-স্লাভিয়ার লোকদিগকে বেশ শক্ত, কর্ম্মক্ষম, সাহসী এবং যুদ্ধ-নিপুণ বিবেচনা করে। ইহার মতে স্লাভেদের সঙ্গে লড়াই বাধিলে, যদি ইতালিয়ানরা ফাঁরাসীদের সাহায্য না পায়, ইতালিয়ানদের হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে। আর ইতালিয়ানদের অতিবৃদ্ধি এইবার তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইতে চলিল।

পাহাড়ের 'তাল'

গাড়ীর ভিতর কয়েকজন 'পাহাড়ী' যুবা ও স্ত্রীলোক কথাবার্ত্তা বলিতেছে। বুঝে সাধ্য কার? ভাষাটা যে জার্ম্মাণ, তাহাই আন্দাজ করা কঠিন। অধিকন্তু ইহারা আল্পসের ভিন্ন ভিন্ন তালের

বুলি লইয়া হাসিঠাট্টা করিতেছে। ৎসিল্লার তালের লোক, এৎস তালের লোক আলব্যর্গের লোককে "বাঙাল" বলে। অথচ এক তাল হইতে অপর তালে পৌছিতে হাঁটিয়া লাগে ঘণ্টা কয়েক মাত্র।

পোষাক-পরিচ্ছদও উপত্যকায়-উপত্যকায় বিভিন্ন। টিরোল ও স্বইট্‌সাল্যাণ্ডের আল্পস-পল্লীর বিভিন্ন পোষাকগুলা পশ্চিমা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা আকৃষ্ট করিয়াছে। পাহাড়ী ছড়া, পাহাড়ী রুচি, পাহাড়ী সংস্কার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া টিরোলের অনেক লেখক প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। জার্ম্মাণদের 'ক্যেল্‌কারকুণ্ডে' বিত্থার মিউজিয়ামে এবং পরিষদে এই সকল অনুসন্ধানের কদর অনেক।

টিরোলের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর নাম ডেফ্রেগার। ইনি প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক দৃশ্য সুকুমার শিল্পে স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহার হাতের কাজ ইন্‌স্‌ব্রুকের মিউজিয়ামে রক্ষিত হইতেছে। জার্ম্মাণ সমাজে ডেফ্রেগারের শিল্প সমাদৃত হইয়া থাকে।

পাহাড়ী লোকেরা সমুদ্র দেখে নাই। কেমন করিয়া বুঝান যায়? বলিলাম—"পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া অগণিত উঁচু-নিচু গিরি-শৃঙ্গের লহর দেখিয়াছ? আর সেই সব লহরের কোথাও সবুজ, কোথাও নীল, কোথাও সাদা রংএর লুকাচুরি দেখিয়াছ? সমুদ্রে জলের তরল তালগুলা এই সকল নিরেট পাথুরি ঢেউয়েরই জুড়িদার।" কিন্তু যাহারা সাগরও দেখে নাই, পাহাড়ও দেখে নাই, তাহাদিগকে রূপ-রংয়ের খেলা বুঝান যায় কি করিয়া?

ফাশিস্ত্‌-বীরের দিগ্‌বিজয়

ফাশিস্ত্‌রা ইতালীর মালিক হইতে চলিল। ফ্লোরেন্স, ক্রেমনা, পিসা ইত্যাদি বড়-বড় শহর ইহাদের হাতে আসিয়াছে। রোম

পর্য্যন্ত ইহাদের তাঁবে। যেখানে যায় সেইখানেই ইহারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ফাশিস্ত্-ধর্ম্মে দীক্ষিত দেখিতে পাইতেছে। সরকারী পুলিশ ও ফৌজ ইহাদের গতি রুধিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ অনেকেই ইহাদের দলে। শেষ পর্য্যন্ত ফাশিস্ত্‌দের সর্দ্দার শ্রীযুক্ত মুসলিনি রাজ-নিমন্ত্রণে রাজার মোলাকাৎ লাভ করিলেন। ইনি এখন ইতালী-রাষ্ট্রের কর্ণধার (অক্টোবর ১৯২২)।

বর্ত্তমান জগতে এই ধরণের ঘরোয়া লড়াই বড় বেশী দেখা যায় নাই। ফাশিস্ত্‌দল সশস্ত্র আন্দোলন চালাইয়া গবর্মেণ্টকে শাসাইল! এ যে মধ্যযুগের ইতিহাস! অথচ বৎসর তিনেক আগে ফাশিস্তরা নেহাৎ নগণ্য, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দল মাত্র ছিল। মাৎসিনি-গারিবাল্‌দির যুগের কার্ব্বনারী আর দান্নুনৎসিও-মুসলিনির যুগের এই 'ফাশি'-সভ্য মাসতুত ভাই। ইতালীয় সমাজে এই ধরণের গুপ্ত (পরে প্রকাশ্য) সমিতির কর্ত্তৃত্বেই বিপ্লব সাধিত হইয়া আসিতেছে।

মুসলিনির জীবন-কথাও রগড়ের। ইহাঁকে বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইতালী এবং সুইট্‌সাল্যাণ্ডের পুলিশ 'আনার্কিষ্ট' অর্থাৎ গবর্মেণ্ট-মাত্রের মুগুর বলিয়া জানিত। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইতালী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার পর তাঁহাকে সুইট্‌সাল্যাণ্ডের নানা নগরে কোনমতে কায়ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত অনেকবার ইহাঁকে সুইট্‌সাল্যাণ্ডের জেলে-জেলে পচিতে হইয়াছে। ইতালীয় গবর্মেণ্টের সরকারী 'হুলিয়া' ইহাঁর বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই প্রচারিত ছিল। এদিকে সুইস গবর্মেণ্টও ইহাঁকে একাধিকবার সুইট্‌সাল্যাণ্ড হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করিয়া ছলে-বলে-কৌশলে ইনি এদেশ হইতে ওদেশে—অধিকাংশ সময়েই

আজ 'গুণ্ডার দল' অথবা ডাকাইতের 'ফাশি'গুলা সফলতা লাভ করিয়াছে। ইতালীর সর্ব্বত্র চলিতেছে ফাশি-ধর্ম্মের জয়-জয়কার। কাজেই ডাকাইতের সর্দ্দার ফাশি-বীর মুসলিনি সাহেবকে এখন 'ফেরার' বলে সাধ্য কার? তাই সুইস্ গবর্মেণ্ট রাতারাতি, বিনা বিলম্বে, মুসলিনির বিরুদ্ধে যে হুলিয়া বিশ বৎসর ধরিয়া জারি ছিল, সেইটা তুলিয়া লইলেন। এখন মুসলিনির সঙ্গে সুইস্ গবর্মেণ্টের টেলিগ্রামে-টেলিগ্রামে কোলাকুলি চলিতেছে।

রেলপথে পূর্ব্ব-আল্পস

(১)

সকালে ইন্‌স্‌ব্রুক ছাড়িলাম। উত্তর-পূর্ব্বে যাত্রা করিয়াছি। কয়েক মিনিটের ভিতর পথে পড়িল, ইন-দরিয়ার উপর এক পল্লী। এখানে সাবেক কাল হইতে নূন তৈয়ারি করা হইয়া আসিতেছে। হ্রদের জল শুকাইয়া নূন প্রস্তুত করা হয়। নোনা জলে স্নান করিবার জন্য স্বাস্থ্যান্বেষীরা এই গ্রামে বেড়াইতে আসে।

পাহাড়ে-পাহাড়ে তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। মন্দির বিরাজ করিতেছে। প্রায় চল্লিশ মাইল ধরিয়া ইনের পাশে-পাশে রেল চলিল। মাঝে-মাঝে পুরাণা দুর্গের বাড়ী-ঘর। ইন্‌তাল এবং ৎসিল্লার তাল ছাড়াইবা মাত্র অপূর্ব্ব পাহাড়ী দৃশ্য নজরে পড়িতেছে। গাড়ী উঠিতেছে গড়াইয়া সোজা, অতএব কষ্টে। বিন্ধ্যপর্ব্বত অথবা মহারাষ্ট্রের 'ঘাট'গুলা ভেদ করিয়া যেন চলিতেছি।

উত্তরে বাভেরিয়ার 'কাইজার-গেবির্গে' (বা রাজ-গিরি)। পাহাড়ের ল্যাখের্ন তরুমালা দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়ী সুড়ঙ্গ জুটিল গণ্ডা কয়েক। এপাশে ওপাশে চাষবাসের কোনো সম্ভাবনা নাই। দুই-একটা গরু ছাগল চরিবার ঠাঁইও নাই। কেবল

পাহাড়ের পর পাহাড়। উত্তর-জার্ম্মাণির হান্নোফার প্রদেশে দেখিয়াছি—সেইরূপ কেবল বনের পর বন। অতি দুর্গম পথে অষ্ট্রিয়ার এই রেল-পথ নির্ম্মিত।

নূনের ভাটি আর নোনা জলের স্নানাগার,—এই অঞ্চলের পাহাড়ী পল্লীর বিশেষত্ব। ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে প্রায় আশী মাইল আসিবার পর টিরোলের সীমানা শেষ হইল। এইখানে পূর্ব্ব-আল্‌প্‌সের সর্ব্বোচ্চ রেলষ্টেশন হোথফিল্‌ৎসেন অবস্থিত। প্রায় ৩২০০ ফিট উঁচু। টিরোলী রেলে পশ্চিম-আল্‌প্‌সের সর্ব্বোচ্চ খুঁটা সাঙ্কট্‌ আণ্টন।

(১)

টিরোল ফুরাইয়াছে,—কিন্তু এখনো আল্‌প্‌স-মণ্ডলেই নামিয়া চলিতেছি। চারিদিককার দৃশ্যগুলা চিত্রকরদিগকে নয়া নয়া রূপ-সৃষ্টির ইঙ্গিত দিতে পারে। দেখিতেছি আর মনে হইতেছে, "আশ্চর্য্যের কথা! অষ্ট্রিয়ার প্রাকৃতিক গৌরব সম্বন্ধে দুনিয়ার লোক এক-প্রকার অজ্ঞ বলিলেই চলে।"

কিন্তু এইখানেই আবার অষ্ট্রিয়ার দুর্দ্দশার খনি। পাহাড়ী ভূমিতে সৌন্দর্য্য-লাবণ্য উপভোগ করা যায় সত্য; কিন্তু চাষ-আবাদের জমিন ত ঢুঁড়িয়া পাইতেছি না কোথাও। এই হিসাবে,—দুই তরফ হইতেই অনেকটা জাপানের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

'ষ্টাইন গেবির্গে' (বা প্রস্তর-গিরি) নামক পাহাড়-শ্রেণী একদম 'অন্বর্থনামা'। অর্থাৎ খাঁটি পাথরের চাপ ছাড়া এই শৈলে আর কিছু মিলে না। নিকটবর্ত্তী পল্লীগুলায় টুরিষ্টদের আনাগোনা যথেষ্ট। পাহাড়ে উঠা, বনে-জঙ্গলে ঘুরা, আর নোনা জলে নাওয়া,—কাজ এখানে এই তিন। সর্ব্বত্রই সরাই আছে।

মাইল তিনেক লম্বা একটা হ্রদ দেখাইল মনোরম। নাম—ৎসেল, এইটা জাপানী হাকোনে হ্রদের মত প্রায় আড়াই হাজার ফিট উঁচু।

ভারতীয় ভীমতালও এইরূপ। আশে-পাশের পাহাড়গুলা উঁকি মারিয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে।

যুবক ভারতের বিদেশ-পরিচয়

(১)

আল্‌প্‌সের আবেষ্টনগুলা আজকাল ভারত-সন্তানের অপরিচিত নয়। ইতালির পথে, জার্ম্মাণির পথে, ভিয়েনার পথে, স্বইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পথে,—কোনো-না-কোনো পথে এই সকল দৃশ্য বহু ভারতীয় পর্য্যটকের চোখে পড়িয়াছে। আগেকার দিনে কালে-ভদ্রে হয় ত দু-একজন ভারত-সন্তান এই সকল পথে মোসাফিরি করিয়াছেন। ঘটনাচক্রে আজকাল গণ্ডায়-গণ্ডায় ভারতীয় আল্‌প্‌স-পর্য্যটক দেখা যায়।

অধিকন্তু, এই কয় বৎসর ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ান টাকাগুলা নেহাৎ শস্তা। কাজেই ভারতীয় ব্যবসাদার, উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক, ছাত্র, রিসার্চ্চ স্কলার,—স্ত্রী এবং পুরুষ—ডজনে-ডজনে ইয়োরোপ দেখিতেছেন। এবারকার গ্রীষ্ম-কালে বোধ হয় পাঁচশ' ভারতীয় মোসাফির একবার করিয়া বার্লিনে ঢুঁ মারিয়া গিয়াছেন। "বৃহত্তর ভারতে"র দিকে স্রোত জোরের সহিতই বহিতেছে।

এইরূপে বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভারত-সন্তানের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় লাভ ভারতের পক্ষে মঙ্গলের কথা। কিন্তু এই সূত্রে দু'একটা জনরব রটিয়াছে। বিদেশী,—ফরাসী, মার্কিন, ইতালিয়ান, জার্ম্মাণ—নরনারীদের সঙ্গে এই সকল ভারতীয় পর্য্যটকের মধ্যে কাহারো কাহারো মোলাকাৎ হইয়াছে। অনেকেই নাকি বিদেশীদের সম্মুখে নিজের ইজ্জৎ বজায় রাখিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতে পারেন নাই। কেহ ব্যবসায়ের স্বার্থে, কেহ কেনো ব্যক্তি-বিশেষের অনুগ্রহ লাভের স্বার্থে,

কেহ পয়সা রোজগারের স্বার্থে, কেহ আর কিছুর স্বার্থে নিজেকে পশ্চিমাদের নিকট 'খেলো', নীচাশয়, অথবা 'ছোট লোক', কিম্বা পর-নিন্দাকারী, খোসামোদপ্রিয় এবং স্বদেশদ্রোহী সপ্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন। ভবিষ্যতের পর্য্যটকগণ একটু সতর্ক ভাবে চলিলে, দেশের সম্মান ত' বাড়িবেই, নিজেরও আত্মবৃদ্ধি হইবে।

(২)

ভারতে সাদা-চামড়াওয়ালা লোকজনের সংস্পর্শে আসা আমাদের অভ্যাস নয়। কাজেই ইয়োরামেরিকায় আসিয়া আমরা অনেকটা "কাঁচা" কাজ করিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অ্যাপ্রেন্টিসি বা শিক্ষানবিশী করা সকল ক্ষেত্রেই দরকার হয়। নিজস্ব, ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, দেশের ইজ্জদ ও জাতির সম্মান বিশ্বের আসরে রক্ষা করিয়া চলার কারবারেও খানিকটা পাকিয়া উঠা আবশ্যক। বিদেশী লোকেরা ভারত-সন্তানের গোলামী স্বভাব ও হাতযোড় করিবার অভ্যাস ভারতের বাহিরেও লক্ষ্য করিয়া মনে-মনে বেশ হাসিতেছে।

বিদেশের নর-নারী ভারত-সন্তানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া গোটা ভারতের অবস্থা বুঝুক বা না বুঝুক, সেই ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রটা বেশ সহজেই পাকড়াও করিয়া ফেলে। তোমার-আমার সঙ্গে কোনো লোক যখন কথা বলে, তখন তোমার-আমার চোদ্দ-পুরুষের এবং জ্ঞাতি-কুটুম্বের খবর লইতে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হয় না। সকলেই তোমাকে-আমাকে বাজাইয়া দেখিতেছে,—তুমি-আমি ব্যক্তি হিসাবে মানুষ কি মেষ, তোমার-আমার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে কতখানি।

যেন তেন প্রকারেণ একটা সওদা, একটা কলকব্জা, একটা চাপরাশ, একটা প্রশংসা, একটা চিঠি বা কতকগুলা ঠিকানা বোচকায় বাঁধিয়া লইয়া দেশে ফিরিলেই স্বদেশকে বৃহত্তর করা সম্ভব নয়। শির খাড়া করিয়া, মানুষের সঙ্গে মানুষের মত সমানভাবে হাতাহাতি করিয়া,

দুই ঘা খাইয়া এবং দুই ঘা মারিয়া, পশ্চিমাদের মুল্লুকে চলা-ফেরা করিবার ক্ষমতা যুবক ভারতে এখনো বেশী দেখা দেয় নাই। এই কথাটাও আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। "বৃহত্তর ভারতে"র কেহ কেহ সাদা-চামড়াওয়ালা নামজাদা লোকের সঙ্গে "আম্‌তা আম্‌তা" না করিয়া "আজ্ঞে যো হুকুম" না বলিয়া, ভারত-মাতাকে বেয়াকুব প্রমাণিত না করিয়া, কথা বলিতে অভ্যস্ত হইতেছে।

সাল্‌ৎসাক তালের দৃশ্য-গৌরব

(১)

সেল হ্রদের পর সাল্‌ৎসাক দরিয়ার পাশে পাশে রেল ছুটিয়া নামিতেছে। দেখিতেছি কেবল সুড়ঙ্গ ও পার্ব্বত্য পাস, আর শুনিতেছি মাত্র ঝোরার ঝর্‌ঝর্‌। পাহাড়ী দরিয়াগুলা প্রায় কোথাও শোওয়া নদী নয়। ইন্‌স্‌ব্রুকের নিকট অবশ্য ইন অনেকটা সমতলে গড়াইয়া চলে।

এক-একটা বিস্ময়জনক দৃশ্য ছাড়াইয়া যাইতেছি, আর ভাবিতেছি,—বোধ হয় ইহার পর ইহার জুড়িদার আর কিছু জুটিবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আর একটা নয়া সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনে আসিয়া পড়িতেছি। আল্‌সের গরিমা জীবনে ভুলিবার জিনিষ নয়।

বিশফস্‌হাফেন পল্লীর নিকট উচ্চ শির খাড়া দেখিলাম হোফক্যোনিগ। এইটা 'এভিগশ্নে গেবির্গের' (অর্থাৎ চির তুষার শৈল-মালার) সর্ব্বোচ্চ শিখর। প্রায় দশ হাজার ফিট উঁচু। কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে প্রস্তরময় পাহাড়ের মাথায় বরফের পোঁছ দেখিলাম।

(২)

গাড়ীতে গল্প চলিতেছে জার্ম্মাণ মার্ক্‌ সম্বন্ধে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় মার্ক নামিয়া আসিতেছে। পাউণ্ডে পনর হাজার বিশ হাজার। অর্থাৎ এক

টাকায় বারশ'র চেয়েও বেশী। লড়াইয়ের পূর্ব্বে এক মার্কের দাম ছিল মাত্র বার আনা।

অপর দিকে সকলেই পড়িতেছে ফাশিস্ত্‌দের রাতারাতি রাজ্য লাভের কথা। কালো কুর্ত্তা পরিয়া ইতালীর ভদ্রঘরের মেয়েরাও নাকি ফাশিস্ত্‌দলের সঙ্গে ভিড়িয়া যাইতেছে।

এক জার্ম্মাণ সংবাদদাতা খবর পাঠাইয়াছেন,— ফাশিস্ত্‌রা অতি উচ্চ আদর্শ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। ইহারা যুবক ইতালিকে স্বার্থত্যাগী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, সংযমী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া তুলিতে চায়। প্রাচীন রোমের যুগে ইতালীতে যে সকল দেশ-হিতকর অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, সেইগুলা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করা হইতেছে।

মাৎসিনির আমলেও ঠিক এই ধরণেই মধ্য যুগের দান্তে এবং আদি যুগের ভার্জ্জিলের আদর্শ ইতালির স্বদেশ-সেবক-মহলে প্রচারিত হইয়াছিল।

(৩)

সাল্‌ৎসাক ভালই চলিতেছে। এখনো সমতল ভূমি দেখিতেছি না। লুয়েগ পাস নামক পার্ব্বত্য পথের দৃশ্য বহুকাল মনে থাকিবে। বিকালে সাত ঘণ্টায় সাল্‌ৎসবুর্গ শহরে পৌঁছিলাম। এই শহরটা অষ্ট্রিয়ার নামজাদা,—ইন্‌সব্রুকের চেয়ে ছোট। দেখিবার শুনিবার অনেক বস্তুই আছে। চারি দিককার আবেষ্টন মনোরম। ব্যাভেরিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সীমানার সন্নিকটে এই শহর অবস্থিত।

অষ্ট্রিয়ার সমতল ভূমি

এইখানে আল্‌প্‌স পাহাড় হইতে বিদায় লইলাম বলিতে পারি। ক্রমশঃ সমতল কৃষিযোগ্য ভূমি চোখে পড়িল। প্রায় আশী মাইল পরে পড়িল লিন্‌ৎস শহর। লিৎন্‌স ডানিউবের ধারে। এই নদীর

জার্ম্মাণ নাম ডোনাও। ইতিমধ্যে সোডা অ্যাসিড ইত্যাদি তৈয়ার করিবার ছোট খাট দু' একটা কারখানা চোখে পড়িয়াছে।

সাল্‌ৎসবুর্গ লিন্‌ৎস ইত্যাদি শহরে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইমারৎ অল্প-বিস্তর আছে। কিন্তু রেলপথে কোথাও নয়া জীবনের চটকদার কোনো লক্ষণ পাইলাম না। ঐশ্বর্য্য ধন-সম্পদ ইত্যাদির নিশানা এক প্রকার বিরল।

রাত্রি দশটার সময় চোদ্দ ঘণ্টায় হ্বীন শহরে পৌছিলাম। এই শহরকে আমরা জানি ভিয়েনা বলিয়া। ফরাসীরা বলে ভিয়েন। বাদশাহী শহর বটে।

সপ্তম অধ্যায়

ভিয়েনায়

(নবেম্বর ১৯২২)

অষ্ট্রিয়ার পরিণাম

(১)

ভিয়েনা শহরটা অনেকটা প্যারিসের মতন ; এখানে বার্লিন বা অন্যান্য জার্ম্মাণ শহরের বাস্তু-রীতি দেখিতেছি না। বড় বড় ইমারতগুলার গড়নে ফরাসী কায়দা প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

বাদশাহী আমলে এই শহর সত্যসত্যই ইয়োরোপের একটা দিল্লী বা লক্ষ্ণৌ-বিশেষ ছিল। প্রাসাদ, মিউজিয়াম, গির্জ্জা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ভবনের জাঁকজমক অত্যুচ্চ স্বকুমার শিল্পের পরিচয় দিতেছে। ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পদের বহু চিহ্নও সর্ব্বত্রই চোখে পড়িতেছে।

বর্ত্তমানে ভিয়েনার মতন শোচনীয় অবস্থা বোধ হয় কোনো ইয়োরোপীয় নগরেরই নয়। অষ্ট্রিয়া দেশটার অস্তিত্বই লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। জেনেভার 'লীগ অব নেশ্যন্সে'র তদ্‌বিরে অষ্ট্রিয়ার ধনসম্পত্তি ও খাজাঞ্চিখানা পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু কোনো প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত এখনো কায়েম হয় নাই। যদি কায়েম হয়, তাহা হইলে অষ্ট্রিয়ান রিপাব্‌লিকের শাসনভার একজন বিদেশী কর্ম্মকর্ত্তার হাতে দেওয়া হইবে। সেই কর্ম্মকর্ত্তার উপরওয়ালা থাকিবেন আবার ইংরেজ। প্রবল পরাক্রান্ত অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের এই পরিণাম!

(২)

এদিকে ইতালির "পপল" কাগজের জার্ম্মাণ তর্জ্জমায় পড়িতেছি, ফাশিস্ত মুসলিনির মুখলিপি লিখিয়াছেন, "অষ্ট্রিয়া স্বাধীন ভাবে বাঁচিয়া

থাকিতে অসমর্থ। এই দেশকে পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলার ভিতর ভাগ-বাটোয়ারা করিলে ক্রমে সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে।"

শুনা যাইতেছে,—চেকোস্লোভাকিয়ার প্রধান মন্ত্রী ইতিমধ্যে ইতালিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে একটা গুপ্ত পরামর্শ করিয়াছেন। সেই পরামর্শে অষ্ট্রিয়াকে দুই টুকরা করিবার কথা উঠিয়াছে। উত্তর ও পূর্ব্ব টুকরা থাকিবে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রভাব-মণ্ডলে। দক্ষিণ ও পশ্চিম মণ্ডল অর্থাৎ গোটা টিরোল এবং অন্যান্য পাহাড়ী জনপদ ইতালির প্রভাব-মণ্ডলে আসিবে।

এই ধরণের 'প্রভাব-মণ্ডল' চীনের রাজ্যশাসনে বিদেশী শক্তিরা ভোগ করিয়া আসিতেছে। প্রভাব-মণ্ডলকে পরাধীন মুল্লুক বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত।

শিল্প-বাণিজ্যে অষ্ট্রিয়া

(১)

রাষ্ট্রনৈতিক পাঁয়তারায় অষ্ট্রিয়া আজকাল চিৎ হইয়া পড়িয়াছে বটে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ানদের ফ্যাক্টরি-সম্পদ্ আজও নিন্দনীয় নয়। ঝড়্‌তি পড়্‌তি যা-কিছু এই দিকে অষ্ট্রিয়ান মুল্লুকের কপালে রহিয়া গিয়াছে সেগুলির কিস্মৎ খুব বেশী।

লড়াই খতম হইবার পর হইতে বৎসর বৎসর ভিয়েনায় দুইবার করিয়া মেস্‌সে বা মেলা বসিতেছে। এই মেলায় দুনিয়ার সকল জাতিরই হাট বাজার চলিয়া থাকে। বিপুল সৌধের ভিতর বিশ্ব-মেলার আয়োজন করা হয়। মেস্‌সে সংক্রান্ত অনেক কথা আফিসের এক বড় বাবুর নিকট শুনা গেল।

অষ্ট্রিয়ার শিল্পকর্ম্ম জার্ম্মাণ কাজের সঙ্গে চিরকালই টক্কর দিয়াছে। বহু অষ্ট্রিয়ান মাল ভারতে জার্ম্মাণ চিজ নামে লড়াইয়ের পূর্ব্বে পরিচিত

ছিল। লোহালক্কর, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাচ, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়ার জিনিষ ইত্যাদি বহু দিকে অষ্ট্রিয়ান কারখানাগুলা ইয়োরামেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ। সেই সব মাল যোগাইবার ক্ষমতা অষ্ট্রিয়ার আজও আছে। ভিয়েনার বিশ্ব-মেলায় তাহাই জোরের সহিত প্রচারিত করা হইতেছে।

(২)

'ভীনার বাঙ্ক্ ফারাইন' নামক ব্যাঙ্ক্-সঙ্ঘের বাড়ীটা দেখিবা মাত্র বার্লিনের 'ড্যয়চে' ব্যাঙ্কই যেন দেখিতেছি বোধ হইল। ভিতরে এলাহি কারখান। এক বিভাগের দুই একজন কর্ত্তার সঙ্গে আলোচনা করা গেল। শুনিলাম :—"আর দুই তিন বৎসরের ভিতর ভিয়েনা পুনরায় তাহার পুরাণা বাণিজ্যকীর্ত্তি ও শিল্প-যশ অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। প্রত্যেক 'মেস্‌সে'তেই অষ্ট্রিয়ান জীবনের পুনর্গঠনের নয়া নয়া পরিচয় দিতেছে।

কি ইয়োরোপে কি এশিয়ায়, মেলা ছিল মধ্যযুগের সওদা কেনা-বেচার প্রধান প্রতিষ্ঠান। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাশ্চাত্য জগতে মেলার আদর আবার বাড়িয়াছে। জার্ম্মাণরা আর অষ্ট্রিয়ানরা মেলার কদর খুব বেশী করে।

ডানিউব বা ডোনাও দরিয়ার ঘাটে ঘাটে বিপুল বন্দরের চিহ্ন দেখিতেছি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপের প্রায় দশ আনা বাণিজ্য ডোনাওয়ের বুকে ভাসিয়া ভিয়েনায় আসিয়া ঠেকে। চেকোস্লোভাকিয়া হাঙ্গারি, রুমেণিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি সকল দেশেরই রুধির ডোনাওয়ে প্রবাহিত।

ভিয়েনার সঙ্গে ভারতবাসীর লেন-দেন বাড়িলে গোটা মধ্য-ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই ভারত-সন্তানের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকিবে। চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশের সঙ্গে কারবার চালাইবার জন্য

ভারতবাসীকে বিলাতের মারফৎ অথবা জার্ম্মাণির মারফৎ কথাবার্ত্তা চালাইবার দরকার নাই। ভারত-সন্তান সোজাসুজি ভিয়েনার ব্যাঙ্কগুলা অথবা ফ্যাক্টরি এবং ফ্যাক্টরির আফিসগুলা স্পর্শ করিলেই সুফল লাভ করিতে পারিবেন।

(৩)

সাবেক কালের অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। কাজেই বাদশাহী গৌরব ভিয়েনার ভাগ্যে আর নাই। কিন্তু মধ্য-ইয়োরোপের সর্ব্ববৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে নবীন অষ্ট্রিয়ান রিপাব্লিকের রাষ্ট্রকেন্দ্র আজও দুনিয়ার ব্যবসায়ী মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

শহরের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলা মিলিয়া একখানা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাপ্তাহিক চালাইতেছেন। কাগজটার নাম 'বেরিষ্টে আউস ডেন নয়েন ষ্টাটেন'। 'নয়া দেশগুলার খবর' কয়েক সংখ্যা পড়িয়া বাল্টিকসাগর হইতে কৃষ্ণসাগর, ঈজিয়ান সাগর আর আদ্রিয়াতিক সাগর পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, মুদ্রা, রাজস্ব ইত্যাদির সহিত পরিচিত হওয়া গেল। নয়া দেশ গড়িয়া তুলিতে কতখানি 'কাঠখড়' খরচ হয়, তাহা বুঝিবার জন্য ভিয়েনার ব্যাঙ্ক-পাড়ায় দু' চার জন ওস্তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া মন্দ নয়।

মরা হাতী লাখ টাকা! আজ কালকার অষ্ট্রিয়ায় লোক-সংখ্যা মাত্র ষাট লাখ। অর্থাৎ বাংলা দেশের চার পাঁচটা জেলায় যতগুলা লোক বাস করে গোটা অষ্ট্রিয়ান রিপাব্লিকে তাহার চেয়ে বেশী নরনারী বাস করে না। কিন্তু এই 'কয়টা' লোকেই প্রায় ৭০০০ কাখানার মালিক। কারখানাগুলা গুনতিতে বাড়িয়া যাইতেছেও। একমাত্র যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিবার জন্যই ২০০ ফ্যাক্টরি আছে। সেইগুলায় মজুর খাটে ৩০,০০০।

অষ্ট্রিয়ার আর্থিক সমস্যা

(১)

এক যুবা রাসায়নিক ফটোগ্রাফির ব্যবসা করেন। ইনি বলিতে-ছেন ঃ—অষ্ট্রিয়ান রিপাব্লিক ভিয়েনার আর্সেনালটা ভাঙিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে। বিজেতারা এইরূপ কড়ারেই সন্ধি করিয়াছেন। লড়াইয়ের সময়ে এইটাই ছিল অষ্ট্রিয়ার কামান বারুদ ইত্যাদির কারখানা।

বহু সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত রাসায়নিক ও এঞ্জিনিয়ার অষ্ট্রিয়ায় আজকাল বেকার। আর্সেনালে ইহাদের কাজ ছিল। লড়াইয়ের শিল্প আর নাই। কিন্তু শান্তির শিল্পে অতগুলা বিজ্ঞানসেবীর নক্‌রি জুটা সহজে সম্ভব নয়। কাজেই মধ্যবিত্তের অন্ন-সমস্যা ভারতের মতন অষ্ট্রিয়ায়ও খুব কঠোররূপে দেখা দিয়াছে।

'আর্সেনাল'টা ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ঠাঁইয়ে গড়িয়া তোলা হইয়াছে এ্যষ্টার-রাইখিশে ভের্কে (অষ্ট্রিয়ান কারখানা)। কৃষিশিল্প-সম্পর্কিত সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, লোহালক্কড় এইখানে প্রস্তুত হইতেছে। এই কারখানার মালই স্বইস্ এবং জার্ম্মাণ মালের বিরুদ্ধে বিদেশী বাজারে লড়িতে সুরু করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, ল্যাবরেটারির সরঞ্জাম ইত্যাদি যে-সকল বস্তুতে সূক্ষ্ম হাত সাফাই এবং উচ্চ অঙ্গের পারিপাট্য দরকার, সেই সকল দিকে অষ্ট্রিয়ান কারিগরদের খ্যাতি আছে অনেক দিন ধরিয়াই। সেই খ্যাতি দুনিয়ার সমঝ্‌দার মহলে আবার রটিয়া যাইতেছে। মাত্র ষাট লাখ লোকের দেশ বলিয়া অষ্ট্রিয়াকে ভারতে তুচ্ছ করা আহাম্মুকি।

(২)

'নয়ে ফ্রাইয়ে প্রেস্‌সে' নামক দৈনিক কাগজটা বার্লিনের 'টাগেব্লাট' অথবা ফ্রাঙ্কফুর্টের 'ৎসাইটুঙ' ইত্যাদি দরের কাগজের সমকক্ষ। ব্যাঙ্ক ও

ফ্যাক্টরির বিষয়ক তথ্যের তরফ হইতে বার্লিনের 'ডায়চে আলগে মাইনে ৎসাইটুঙ'টা ভিয়েনার এই দৈনিককে হারাইতে পারিবে না।

সংবাদে, সমালোচনায় এবং প্রবন্ধে রোজই কিছুনা কিছু অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে 'নয়া দেশ'গুলার বাণিজ্য-নিয়মের পরিচয় পাইতেছি। চেকোস্লাভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, জুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি প্রত্যেক দেশেই অষ্ট্রিয়ান মালের উপর কড়া হারে শুল্ক বসানো হইতেছে। ইতালিতেও 'স্বদেশী' আন্দোলনের প্রকোপ খুব বেশী। অষ্ট্রিয়ান ফ্যাক্টরি-গুলাকে কুপোকৎ করিয়া মারিবার জন্য এই সকল দেশের গবর্মেন্ট নয়া নয়া বাণিজ্য-বিধি কায়েম করিতেছেন। বিদেশে মাল রপ্তানি করা অষ্ট্রিয়ার পক্ষে আজ নেহাৎ কষ্টসাধ্য।

তাহার উপর, জার্ম্মাণিতে মার্ক্ প্রতিদিনই দরে নামিতেছে। অষ্ট্রিয়ান ক্রাউন জার্ম্মাণ মুদ্রার তুলনায় খুব মাগ্‌গি। জার্ম্মাণদের মাল অষ্ট্রিয়ার বাজারে অতি শস্তায় চলা সম্ভব। বিদেশেও অষ্ট্রিয়ান মাল জার্ম্মাণির মালের সঙ্গে দরে টক্কর দিতে অসমর্থ। কাজেই বহির্ব্বাণিজ্যে অষ্ট্রিয়া যারপরনাই ভুগিতেছে।

সকল দিক হইতেই অষ্ট্রিয়ার উপর ঘোরতর আর্থিক সমস্যা আসিয়া জুটিয়াছে। তামার তারের এক কারখানা দেখিতে গিয়া মালিকের সঙ্গে সুখদুঃখের অনেক কথা হইল। ছেলে পুলেরা লেখা পড়া শিখিয়া 'মানুষ' হইয়াছে। বাপ এখনো কারখানায়ই হাতে পায়ে খাটিয়া মজুরি করে। আলগা মজুর বহালও দেখিলাম। সন্ধ্যার পর গান-বাজনা শুনা গেল। ভিয়েনার প্রত্যেক পরিবারেই সঙ্গীত-গুরু ষ্ট্রাউসের গৎ নরনারীর কণ্ঠ ও যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করে।

বিলাসপুরী

কাগজে-কলমে, ষ্টাটিষ্টিকসের তথ্য তালিকায় আর লোক-জনের

সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বুঝিতেছি বটে,—অষ্ট্রিয়ানরা কয়েক বৎসর ধরিয়া দারিদ্র্য ভোগ করিতেছে। কিন্তু ভারতীয় দারিদ্র্যের মাপকাঠি এদেশে চালাইবার দরকার হয় না।

আমাদের কৃষক মজুর ঝী চাকর ইত্যাদির দৈন্য দুনিয়ার সব-সে সেরা। বোধ হয় এক চীনারা আমাদিগকে এই বিষয়ে হারাইতে পারে। এমন কি, ভারতীয় মধ্যবিত্তের তথাকথিত ভদ্রলোকের অবস্থা কিরূপ? বসতবাড়ীর দুরবস্থা, তালি দেওয়া জামা, ছেঁড়া জুতা, ময়লা ধুতি,—মোটের উপর এই দৃশ্য যে কোনো লোকের নজরে পড়ে। ভিয়েনার রাস্তা-ঘাটে এসব দারিদ্র্য মালুম হয় না।

বিকাল বেলায় গ্রাবেন চৌরাস্তায় লোকের সারি দেখিতেছি। পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য যৎপরোনাস্তি। সড়কের দুই ধারকার দোকান ঘরগুলা বহুমূল্য দ্রব্যের মিউজিয়াম-বিশেষ। শোটেন রিঙ্ নামক ব্যাঙ্ক পাড়ার বড় রাস্তায় ঐশ্বর্য্য ছাড়া আর কিছু নজরে আসে না। সন্ধ্যাকালে ক্যের্ণটনার রিঙের হোটেল-কাফেগুলা গুলজার। এই গেল খোদ শহরের ভিতরকার দৃশ্য।

শহরের অন্দর মহল ছাড়াইয়া একটুকু বাহিরের দিকে পায়চারী করিতে গেলেই সড়কগুলায় ধন-দৌলতের ছাপ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। 'রিঙ' সড়কগুলায় যে-সকল সড়ক আসিয়া ঠেকিয়াছে, সেগুলার প্রাসাদতুল্য ভবনে দোকান-গৌরব চোখ ঝল্‌সিয়া দিতেছে। 'মারিয়া হিলফষ্ট্রাসে'র ঐশ্বর্য্য ভুলিবার নয়।

দোকানগুলায়, রেষ্টরাণ্টে, হোটেলে লোকের হুড়াহুড়ি কম কি? ইহাদের অধিকাংশই খাটি স্বদেশী অষ্ট্রিয়ান। বিদেশী পর্য্যটকেরা অষ্ট্রিয়ায় আজ কাল বেশী নাই। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে ভিয়েনা বিদেশী-প্লাবিত নগর নয়। খাওয়া-থাকার খরচপত্র খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বিদেশীদের চলা ফেরার উপর ট্যাক্‌স বসানোও হইয়াছে। অতএব

বলিতে হইবে ভিয়েনা আজও পূর্ব্বেকার মতনই অষ্ট্রিয়ানদের বিলাস-নগরই রহিয়াছে।

বাস্তুগৌরবে ভিয়েনা

'রিঙ' সড়কগুলা ভিয়েনার অন্যতম বিশেষত্ব। সাবেককালে এইখানে ছিল দুর্গের দেওয়াল। আজকাল তাহার ঠাঁইয়ে দেখিতেছি,—ভিতরকার শহর ঘিরিয়া রহিয়াছে গোলাকার রাজপথ। ভিতরকার শহরের দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ আর প্রাসাদের বাগিচা ভিয়েনাবাসীর দর্পের বস্তু। পার্ল্যামেন্ট-ভবন, অপেরা, সুকুমার শিল্পের মিউজিয়াম ইত্যাদি ইমারত সমূহে অঞ্চলটা গম্‌গম্‌ করিতেছে।

শহরের এই অন্দর মহলেই 'ষ্টেফান্‌স্‌ কির্খে' অত্যুচ্চ শিখর আকাশে তুলিয়া গথিক রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। কোলোনের "ডোম" দেখিবার পর এমন মন্দির আর চোখে পড়ে নাই। মন্দিরের ভিতরকার খিলানগুলা জাঁকজমকপূর্ণ।

বাস্তুরীতির সাহায্যে মানব-চিত্তে অধ্যাত্মের জিজ্ঞাসা অথবা 'অনন্ত পিপাসা' জাগাইবার পক্ষে এই সকল ডোম যারপরনাই প্রভাবশীল। কি ভিতর কি বাহির দুইই অপূর্ব্ব বিস্ময় ও সৌন্দর্য্য বোধের জন্ম দিতেছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মন্দির গড়া সুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাস্তু রচনা খতম হইয়াছে।

মন্দিরের ভিতর বহুসংখ্যক স্থাপত্য রক্ষিত হইতেছে। মূর্ত্তিগুলায় একমাত্র কর্ম্ম-কথাই প্রচারিত হইতেছে এমন নয়। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের নানা গৌরবপূর্ণ ইতিহাস-কথা এই সকল পাথরের খোদাই হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

তুর্কীরা ছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের বিপুল রাষ্ট্রশক্তি। ভিয়েনা দুইবার তুর্কীদের দখলে আসে। ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ানরা

ভিয়েনা হইতে তুর্কীদিগকে খেদাইয়া দিতে সমর্থ হয়। সেই বিজয়-কাহিনী ষ্টেফান্‌স্ কির্খের অন্যতম মর্ম্মর-কথা।

ভিয়েনার সরকারী দপ্তরখানাগুলার বাহির যেমন জাঁকালো ভিতরও তেমনি চিত্তাকর্ষক। এই হিসাবে বার্লিনে-ভিয়েনায় সমানে-সমানে টক্কর চলিতে পারে। কাচের চিত্রশিল্প ডোমের মতন এই সকল কার্য্যালয়েরও গৌরব সন্দেহ নাই। নয়া রাটহাউস বা টাউন হল গথিক বাস্তরীতি অনুসারে গড়া; দূর হইতে বারান্দার খিলান-গুলা দেখিলে বোধ হইবে যেন পাথরে ফিলিগ্রি বা জালি বুনা হইয়াছে। ইয়োরোপের 'টাউন হল'গুলা নগরশাসনের আফিস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদ দেখিয়াও পুলকিত হইতে হয়। রেনেসাঁসের গড়ন এই সৌধের নির্ম্মাণে কায়েম করা হইয়াছে। বাড়ীটার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে। ভিয়েনায় যা-কিছু দেখিতেছি তার অনেকই পঞ্চাশ-ষাট্ বৎসরের কীর্ত্তি। পুরাণা ঘরবাড়ী বড় একটা চোখে পড়ে না।

অষ্ট্রিয়ানদের মেজাজ

(১)

একজন ডাক্তারের সঙ্গে ভিয়েনার গলিঘোঁচ দেখা যাইতেছে। ইহাকে সম্প্রতি ভিয়েনা-সমাজের গাইড বাছিয়া লইয়াছি। ডাক্তার বাবু পরীক্ষায় ডিগ্রি পাইবার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া হাসপাতালে কাজ শিখিতেছেন। নাক-কান-গলার চিকিৎসায় ইনি বিশেষজ্ঞ।

ডোনাওয়ের ধারে বাগান। সড়কের বাড়ীগুলা মনোরম। খানিকটা প্যারিসের সেইন-দৃশ্য মনে পড়িবে। তবে ডোনাও সেইনের তিনচার গুণ চওড়া। তা ছাড়া ডোনাওয়ের অপর পারে ভিয়েনার কোনো অংশ অবস্থিত নয়। কিন্তু সেইন প্যারিসের মধ্যবর্ত্তী নাড়ী-বিশেষ।

প্রথমেই মনে আনিতে হইবে। ডাক্তারবাবু বলিতেছেন:—"জার্ম্মাণির দৌরাত্ম্যে অষ্ট্রিয়ার কোনো লোক বিশ্বসাহিত্যে নামজাদা হইতে পারে নাই। অধিকন্তু দুনিয়ার লোকে অষ্ট্রিয়ার বিজ্ঞানবীর, শিল্পবীর, সঙ্গীতগুরু, সাহিত্যরথী ইত্যাদি শ্রেণীর সুধীগণকে সোজাসুজি জার্ম্মাণ বলিয়া জানে।"

গ্রিল্‌পাৎসারের কোনো কোনো নাটকের দৃশ্যগুলা মর্ম্মরে খোদিত দেখিলাম ফোল্ক্‌স্‌গার্টেন নামক বাগানের এক স্মৃতি-সৌধে। কবিবরের মূর্ত্তি উপবিষ্ট ভাবে গড়া। রাটহাসের এক প্রকোষ্ঠেও গ্রিল্পাৎসারকে স্মরণ করা যায়।

(২)

এক মধ্যবিত্ত পরিবারে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। দুএকজন বাহিরের লোকও অতিথি। এক যুবা জার্ম্মাণি হইতে ফিরিয়া আসিয়া জার্ম্মাণ চরিত্র বর্ণনা করিতেছে। শুনিলাম:—'অষ্ট্রিয়ানদের পক্ষে জার্ম্মাণদের সঙ্গে লেন-দেন চালানো অসম্ভব। বার্লিনের লোকেরা একদম কাঠ বা পাথরের মতন নীরস। প্রশিয়ানদের চিত্তে কোনো প্রকার হৃদয়বত্তা ঢুঁড়িয়া পাই নাই। বড় জোর মিউনিকে অষ্ট্রিয়ানরা লোকজনকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারে। ব্যাভেরিয়ার নরনারী হৃদয়শীল। সুকুমার শিল্পের দরদ হাসিঠাট্টা, রং-তামাসার আনন্দ ব্যাভেরিয়ান সমাজে আছে। কিন্তু বার্লিনে যে কয়দিন আমি ছিলাম, সে কয়দিন যেন একটা জেলখানার কয়েদিরূপে জীবন ধারণ করিয়াছি।"

গান-বাজনায় ওস্তাদ শুনিতেছি ভিয়েনার নরনারী সকলেই। খাওয়া-দাওয়ার পর কোনো মেয়ে বাজাইল বেহালা, কেহ গিটার। নিমন্ত্রিতের এক জন বাজাইল পিয়োনো। 'ভীন, ডু ষ্টাট্ ড্যর লীডার' (ভিয়েনা, তুই গানের শহর) এই গানটা লইয়াই মজলিশ সুরু হইল।

ক্রাইস্‌লার আর সুরের স্রষ্টা ষ্ট্রাউস এই দুই জন আজকাল অষ্ট্রিয়ান সঙ্গীত-মুল্লুকের রাজা।

একজন বলিলেন:—"ষ্ট্রাউসের বয়স যখন চোদ্দ পনর বৎসর, জার্ম্মাণিতে তখন ভাগ্নার অপেরা সঙ্গীতে ভবিষ্যনিষ্ঠা চালাইতেছিলেন। ভাগ্নারের নাম-ডাকও খুব বেশী। কিন্তু বালক ষ্ট্রাউস্ ভাগ্নারের রচনাগুলাকে একদম অসুর বা বেসুর রূপে নিন্দা করিত। "ট্রিষ্টান" শুনিয়া ষ্ট্রাউস্ ভাগ্নারের নবীন সঙ্গীতকে অকথ্য কথায় গালাগালি করিয়াছিল। ষ্ট্রাউসের মতে "জিগফ্রিড্"ও ছিল একদম তাল-মান-লয়ের শ্রাদ্ধ-বিশেষ।

পরবর্ত্তী কালে কিন্তু ষ্ট্রাউস ভাগ্নার সম্বন্ধে মত বদলাইয়াছেন। একবার দুইবার তিনবার দশবার এক একটা পালা শুনিবার পর ভাগ্নারের কৃতিত্ব ষ্ট্রাউসের কানে ও মরমে পশিয়াছে। সঙ্গীতের জগতে ভাগ্নার যে কি বিপ্লব ঘটাইয়াছেন এই তথ্য হইতেই আন্দাজ করা চলে। এমন কি ষ্ট্রাউসকেও কষ্টকল্পনা করিয়া ভাগ্নারের ওস্তাদি বুঝিয়া উঠিতে হইয়াছে।

মুসলমান-বিভীষিকা

অষ্ট্রিয়ানরা অধিকাংশই ক্যাথলিক। এই পরিবারেও মা মেরীর প্রভাব বেশ দেখিতেছি। পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে এশিয়ার কথা উঠিল। ইহারা এশিয়া বলিলে বুঝে তুর্কী। এশিয়ার লোক আর মুসলমান ইহাদের চিন্তায় একার্থক।

শুনিলাম:—"ছেলে বেলায় ইস্কুলে আমরা কি অদ্ভুত কথাই না শিখিয়াছি? খ্রীষ্টান জগৎটা তুর্কীরা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। শেষের সেই দিন খ্রীষ্টান নরনারীরা মুসলমানদের অত্যাচারে প্রাণ দিতে বাধ্য হইবে। ইস্‌লামের নির্য্যাতন সহিয়াও আমরা খ্রীষ্টভক্ত থাকিতে যেন

ছুঁড়িয়া মারিবে, হাজার রকমের অত্যাচার আমাদের শরীরের উপর ঘটিতে থাকিবে। তাহা সত্ত্বেও যেন আমরা খ্রীষ্টানি বর্জ্জন করিতে না ঝুঁকি। এই ছিল মুসলমান জগৎ, তুর্কী অথবা এশিয়া সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র শিক্ষণীয় বস্তু।"

সেকালের বাংলায় 'বর্গী এল দেশে' যে চিত্র, বুঝিতেছি,—অষ্ট্রিয়ার তুর্কী-বিভীষিকাও যেন অনেকটা সেই চিত্র। অষ্ট্রিয়ানরা ভিয়েনার অনতিদূরে যে লড়াই করিয়া তুর্কীকে পরাস্ত করিয়াছিল, সেই লড়াইয়ের ইতিহাস এদেশের নরনারী ভুলিতে পারে নাই। ভিয়েনা ছিল তখনকার দিনে তুরস্কের সীমানা। আজ সে তুর্কীও নাই, সে অষ্ট্রিয়াও নাই।

তুরস্ক হটিতে হটিতে তিনশ' বৎসরে ইয়োরোপের কোণে আসিয়া ঠেকিয়াছে। অষ্ট্রিয়া হইতে বহুদূরে আজ তুর্কী ও ইসলাম। কিন্তু মুসলমান-বিদ্বেষ খ্রীষ্টান নরনারীর হৃদয়ে শিকড় গাড়িয়া রহিয়াছে। প্রাচীন রোমের নেরোকে খ্রীষ্টানরা যে চোখে দেখিতে অভ্যস্ত, অষ্ট্রিয়ায় মুসলমান জাতিকে সেই চোখে দেখাই দস্তুর। রাষ্ট্রনীতি আগাগোড়া সবই বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু পরজাতি-বিদ্বেষ মানুষের রক্তের মধ্যে ঘর করিয়া ফেলিয়াছে।

ভিয়েনার দাবী

ভিয়েনাকে দ্বিতীয় প্যারিস বলিয়াছি। বাস্তগৌরবে ডোনোওয়ের এই নগর সেইন-দরিয়ার উপরকার নগরেরই সমকক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হিসাবে এই শহর প্যারিসকে কাণা করিয়া দেয় মনে হইতেছে। যে-সকল ভারত-সন্তান জার্ম্মাণজাতির গৌরব চাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বার্লিনে যাইবেনই বলা বাহুল্য। কিন্তু ভিয়েনায়ও তাঁহাদিগের পক্ষে কিছুদিন আড্ডা গাড়া আবশ্যক।

ভিয়েনার সঙ্গীত, সুকুমার শিল্প, রঙ্গমঞ্চ, প্রাসাদ—সবই ভিতরে-

বাহিরে জার্ম্মাণ কুল্টুরের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। অধিকন্তু শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের তরফ হইতে ভিয়েনা ইয়োরামেরিকায় অতি প্রসিদ্ধ। ভিয়েনার চিকিৎসা-বিদ্যালয় পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর যশ পাইয়া আসিতেছে। কি পদার্থ-বিজ্ঞান, কি চিকিৎসা-বিজ্ঞান, কি সমাজ-বিজ্ঞান সকল বিভাগের গবেষণায়ই ভিয়েনার পত্রিকাগুলা অনুসন্ধিৎসু মাত্রের পক্ষে মূল্যবান্।

ভিয়েনায় যাঁহারা কোনো উপলক্ষ্যে কিছু সময় কাটাইবেন, তাঁহারা জার্ম্মাণ-সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে থাকিবার সকল সুযোগই পাইবেন বিবেচনা করি। অষ্ট্রিয়া রাষ্ট্রীয় হিসাবে নেহাৎ নগণ্য বটে, কিন্তু ভিয়েনাকে কোন মতেই 'মফঃস্বল' বিবেচনা করা চলে না। সেকালের মতন একালেও ভিয়েনার দাবী সর্ব্বথা সম্মানযোগ্য। ভারতীয় মোসাফিরেরা বার্লিনের মায়ায় ভিয়েনাকে ভুলিলে অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

অষ্টম অধ্যায়

ব্যাভেরিয়ায় মোসাফিরি

জার্ম্মাণির মফঃস্বল

জার্ম্মাণদের শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য ও সমাজের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ভারতীয় পর্য্যটকগণ দলে দলে জার্ম্মাণিতে ও অষ্ট্রিয়ায় বেড়াইতে আসিতেছেন। এই সকল পর্য্যটকের মধ্যে ব্যবসায়ী, এঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক ও উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্র প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ভারত-সন্তানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বার্লিন অথবা ভিয়েনা দেখিলেই জার্ম্মাণ সভ্যতা ও সমাজ দেখা হয় না। এই সকল অতি-বিশাল শহরে জার্ম্মাণ নর-নারীর প্রকৃত জীবনধারা বুঝিয়া উঠা যারপরনাই কঠিন। জার্ম্মাণ জাতিকে যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার মফঃস্বলে কিছুকাল কাটানো প্রয়োজন।

পাস্‌সাও

(১)

ব্যাভেরিয়া প্রদেশের সীমান্তে একটা ছোট শহর আছে। সেইটা পার হইয়া অষ্ট্রিয়ায় যাইতে হয়। শহরের নাম পাস্‌সাও। ইহার লোক-সংখ্যা বিশ হাজারের অধিক হইবে না। এই স্থানে ইন নদীর বিস্তার খুব অধিক, কিন্তু ডোনাও বা ডানিউব নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। দুই নদীর সঙ্গমস্থলে আর একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আসিয়া মিশিয়াছে। এই

নদীর জল কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাভ, অধিকন্তু ডানিউবের সবুজ জলে ইনের ধূসর জল মিশিয়াছে। দুই পার্শ্বে অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

এই সুরম্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনে পাস্‌সাও অবস্থিত। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদিগের মন্দির, মঠ, মোহান্ত এই স্থানে প্রতাপশালী। ভারতবর্ষে, চীনে ও জাপানে সকল সৌন্দর্য্যময় জনপদেই তীর্থক্ষেত্র ও ধর্ম্মকেন্দ্র দেখা যায়। জার্ম্মাণির খ্রীষ্টানরাও সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রায় প্রত্যেক লীলাস্থলেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছেন।

পল্লীগ্রামের কৃষকরা আজও পুরাতন কালের লাঙ্গল ও অন্যান্য যন্ত্রই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো হইয়া থাকে। প্রায় সকল কৃষিক্ষেত্রেই সারের ব্যবহার প্রচলিত।

(২)

পাস্‌সাওয়ের 'রাট্ হাউসে' অর্থাৎ নগর-শাসকের কার্য্যালয়ে একটি মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা আছে। বাড়ীটা বহুকালের পুরাতন। সংগ্রহালয়ে এই জনপদের নানাপ্রকার পুরাতন দ্রব্য রক্ষিত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণির পল্লীবাসীরা জমিদার, নবাব বা নরপতিদিগের নিকট হইতে কিরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহার সাক্ষিস্বরূপ একখানি লিপি সংগ্রহশালায় বিদ্যমান। এই লিপির সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন তামিল-জনগণের স্বরাজ-প্রথা তুলনা করা চলে।

জার্ম্মাণির পুরাতন পাল্কী, বজরা প্রভৃতি দেখিলেও মধ্যযুগের ভারতের কথা মনে পড়ে। গৃহস্থালীর আস্‌বাবপত্র, রন্ধনশালার সরঞ্জাম, দোকানদারীর অনুষ্ঠান, ধান, গম প্রভৃতি মাপিবার পাত্র ও ওজন করিবার বাটখারা এ সকল বিষয়েও নব্য ইয়োরোপের পল্লীজীবন

ভারতীয় পল্লীজীবন হইতে বিভিন্নরূপ ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে ইয়োরোপের বড় বড় শহরে চিরকাল যে সব নূতন বিলাস, নূতন আরামের সরঞ্জাম দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলা ৫০।৭৫।১০০ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপে ছিলই না। এই শত বৎসরের পরিবর্ত্তন বা উন্নতি ও বিপ্লবগুলা বাদ দিলে হিন্দু-সভ্যতায় ও প্রতীচ্য সভ্যতায় বিশেষ প্রভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পাস্‌সাওর সংগ্রহশালার মত মিউজিয়ম জার্ম্মাণির প্রায় প্রত্যেক ছোট শহরে বা পল্লীতে আছে। এই মিউজিয়মগুলার মধ্যে অর্দ্ধঘন্টাকাল যাপন করিলেও ভারতীয় পর্য্যটকগণ অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। জার্ম্মাণির ঘরের কথা, জার্ম্মাণদের নারী-জীবন, জার্ম্মাণ-সমাজের পারিবারিক অবস্থা, জার্ম্মাণ-চাষীদিগের ধরণ-ধারণ, জার্ম্মাণজাতির আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মজ্ঞান ও কুসংস্কার—এই সকল না বুঝিলে জার্ম্মাণিকে বুঝা হয় না। এই সকল বুঝিবার একমাত্র বা প্রধান উপায়—জার্ম্মাণির ছোট ছোট মিউজিয়মগুলি দেখা।

বার্লিন শহরে এই ধরণের একটি মিউজিয়ম আছে। সাধারণতঃ পর্য্যটকরা এই মিউজিয়মের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। ইহাকে 'ডায়চেস্ ফোলক্‌স মুজেউম' বলে। এই সংগ্রহশালার মধ্যে জার্ম্মাণির প্রত্যেক জিলার অশন-বসনের রীতি, বিবাহ-প্রথা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, চাষবাসের বৈশিষ্ট্য—এক কথায় জার্ম্মাণ-গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি সবই চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়। যে সকল ভারতীয় পর্য্যটক নৃতত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সংগ্রহশালা বিশেষ মূল্যবান্।

ন্যুর্ণবার্গ

ব্যাভেরিয়ার মধ্যস্থলে ন্যুর্ণব্যর্গ প্রসিদ্ধ শহর। মিউনিকের পরেই ইহার স্থান নির্ণীত হইতে পারে। আজকাল এই শহরে প্রায় পাঁচ লক্ষ

নর-নারীর বাস। নানা প্রকার শিল্প-কারখানার চিমনীর ধূমে শহরটি সর্ব্বদাই কেমন মলিন বোধ হয়। দেখিলে বিলাতের লীডস্ কিংবা আমেরিকার পিটস্‌বার্গ বা ক্লিভল্যাণ্ড শহরের কথা মনে পড়ে। রাস্তাগুলা ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার।

ভারতবর্ষে ফেবার কোম্পানীর পেন্সিল বিখ্যাত। সেই কোম্পানীর কারখানা এই শহরে। অবশ্য পেন্সিল প্রস্তুত করাই এ শহরের একমাত্র বা প্রধান কারখানা নহে। বেপারী, ব্যবসাদার, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক প্রভৃতি শ্রেণীর প্রত্যেক ভারতবাসীর একবার ন্যুর্ণব্যর্গ দেখিলে ভাল হয়।

জার্ম্মাণির কারিগরেরা ইয়োরোপের ও আমেরিকার সকল দেশের ছেলেদের খেলানা যোগাইয়া থাকে। ন্যুর্ণব্যর্গ সেই খেলানা-শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংল্যাণ্ডের ও আমেরিকার বালক-বালিকারা ন্যুর্ণব্যর্গের খেলানা পাইত না বলিয়া কান্নাকাটি করিয়াছে।

মধ্যযুগের জার্ম্মাণ-সভ্যতায় ন্যুর্ণব্যর্গ অতি প্রসিদ্ধ স্থান অধিকার করিতেছে। অন্যূন ত্রিশটি গির্জ্জা শহরে বিদ্যমান এবং সেগুলির গঠন-রীতিও যারপরনাই চিত্তাকর্ষক। এই শহরের সাধারণ বসতবাটীগুলির গঠনে একটা বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যুর্ণব্যর্গের বাস্তু-রীতি জার্ম্মাণির অন্যান্য শহরের বাস্তুরীতি হইতে স্বতন্ত্র। আরকিটেক্ট বা বাস্তুশিল্পীরা ন্যুর্ণব্যর্গ শহরে এক নূতন গৃহ-নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। বাড়ীর ছাদগুলা খাড়া ও উচ্চকোণগুলা অতিশয় তীক্ষ্ণ।

ন্যুর্ণব্যর্গের বাজারের চারিদিকের বাড়ীগুলা বহু চিত্রে সুকুমারশিল্প-প্রেমিকগণের নিকট সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। এই শহরের ফোয়ারা

কারুকার্য্য জগতে অদ্বিতীয়। শহরের চারিদিকের প্রাচীরে ও প্রাচীরের পার্শ্বস্থ খালে দিল্লীর মত ভারতীয় শহরের কায়দা দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে রক্তাভ প্রস্তরের ব্যবহার-বাহুল্য লক্ষিত হয়। 'গথিক' গড়নরীতির ছড়াছড়ি।

শিল্পগুরু ড্যুরের

প্রাচীন ভারতে এক প্রকার সুকুমার শিল্প কোন দিন প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। ইংরেজীতে তাহাকে এচিং বলে। তামার পাতের উপর লোহার সূচে ক্ষোদাই করিয়া চিত্র আঁকা হয়। পরে কালির সাহায্যে কাগজের উপর তাহার ছাপ লওয়া হয়। কাগজের উপর যে ছাপ উঠে, তাহা দেখিলে মনে হয়, যেন শিল্পী সূক্ষ্ম তুলি বা কলম দিয়া চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই শিল্পের এক জন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ন্যুর্ণব্যার্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম—আল্‌ব্রেষ্ট ড্যুরের। শহরের কেল্লা বা রাজবাড়ীর অনতিদূরে ড্যুরেরের বাসভবন। তিনি যে ঘরে কায করিতেন এবং যে ঘরে খাওয়া-দাওয়া করিতেন, সবই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। ইয়োরোপের ও আমেরিকার শিল্পীদিগের পক্ষে ড্যুরেরের বাস্তুভিটা তীর্থক্ষেত্র। কয়েকটি ঘরে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র ও এচিং সাজনো রহিয়াছে।

ড্যুরেরের শিল্পে চিড়িয়ার নক্সা দেখিতে পাই। ঘরবাড়ীর চিত্র অনেক। শহর, পল্লী, দুর্গ ইত্যাদিও আছে। লোকজনের মূর্ত্তি বাদ পড়ে নাই। বাইবেলসংক্রান্ত ধর্ম্মচিত্র ত আছেই। জার্ম্মাণিতে ও অষ্ট্রিয়ায় ধর্ম্মোপদেশের জন্য যে সব কেতাব প্রচলিত আছে, সেই সকলে ড্যুরেরের এচিংএর সাহায্যে বাইবেলের গল্প বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য জার্ম্মাণ-সমাজে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট ড্যুরের সুপরিচিত।

ন্যুর্ণব্যার্গ আর একজন জার্ম্মাণ সুধীর জন্মস্থান বলিয়া পরিচিত। তাঁহার নাম হান্স সাক্স্। তিনি ব্যবসায়ে মুচি ছিলেন; কিন্তু কবিরূপে যশোলাভ করেন। সাক্স্ বহু গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। আজও জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার বালক-বালিকারা সেই সকল গল্প জননীর নিকট বা পাঠশালায় শিখিয়া থাকে। সাক্স্ ও ড্যুরের সমসাময়িক। ইঁহারা একটা রেষ্টরাণ্ট-ভোজনশালায় আসিয়া খাওয়া-দাওয়া ও খোসগল্প করিতেন। সেই ভোজনশালা আজও পুরাতন কায়দায় চলিতেছে। তাহার উনন ভারতবর্ষের উননের মত খোলা। অর্থাৎ ধূম বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য চিমনি নাই। কাজেই ঘরের ভিতর ছাদ ধূমমলিন।

'পল্লীগ্রামে'র জ্ঞান-মণ্ডল

ন্যুর্ণব্যার্গের অল্প দূরে—রেলে প্রায় এক ঘণ্টার পথে আর্লাঙ্গেন নামক একটা 'পল্লীগ্রাম' বা ছোট শহর অবস্থিত। এই পল্লীগ্রামে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ব্যাভেরিয়া প্রদেশে অর্থাৎ গোটা দক্ষিণ-জার্ম্মাণিতে মাত্র দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়—একটি মিউনিক শহরে আর একটি আর্লাঙ্গেন গ্রামে।

জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উঠিলেই একটা বিষয় সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার। বার্লিন, মিউনিক ও লাইপ্ৎসিগ ছাড়া জার্ম্মাণির আর সব বিশ্ববিদ্যালয়ই ছোট ছোট শহরে, এমন কি, পল্লীগ্রামে অবস্থিত। আর্লাঙ্গেন একটা নগণ্য পল্লীগ্রাম। এই গ্রামের নাম উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভুৎর্সবুর্গ এইরূপ ছোট শহর। য়েনা এই ধরণেরই একটি নগণ্য নগর। অথচ এই সকল গ্রাম ও ক্ষুদ্র শহরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহই জার্ম্মাণির দর্শন-

সকল জনপদের বিদ্যাপীঠ হইতে জার্ম্মাণির জ্ঞানমণ্ডল জগতে সভ্যতা বিকীর্ণ করিতেছে। জার্ম্মাণ-সমাজের জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানাচার্য্যগণ এই সকল কেন্দ্রেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছেন। এই কারণে জার্ম্মাণির পল্লীগ্রামগুলির দিকে ভারতীয় পর্য্যটকদিগের দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। অবশ্য, পল্লী শব্দে নেহাৎ ভারতীয় পাড়া-গাঁ বুঝিতে হইবে না।

ইয়োরোপের নির্য্যাতন-যন্ত্র

ন্যুর্ণব্যর্গের কেল্লায় ব্যাভেরিয়ার রাজা অনেক সময়ে বসবাস করিয়াছেন। রিপাবলিক বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার কয় বৎসর পূর্ব্বেও এই দেশের শেষ নরপতি ন্যুর্ণব্যর্গের 'বুর্গ' বা দুর্গে কয়েক রাত্রি কাটাইয়া গিয়াছেন। জার্ম্মাণ সম্রাট্‌ও এই দুর্গে সময় কাটাইয়াছেন। দুর্গাভ্যন্তরস্থ ঘরগুলি আড়ম্বরহীন—আরাম বা বিলাসের আসবাব একেবারেই নাই।

দুর্গের একাংশে কতকগুলি ঘরে এক অদ্ভুত সংগ্রহ দেখিলাম। ঘরগুলার নাম 'ফোল্‌টার-কাম্মার' বা নির্য্যাতন-ভবন। কয়েদী বা আসামীদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সে সকল এই জেলখানায় সংগৃহীত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড সচিত্র গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। দোকানদাররা রুটী-মাংস বা আর কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবার সময় ওজনে জুয়াচুরি করিলে মধ্যযুগের ইয়োরোপে তাহাদের জন্য বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তাহাদিগকে পাল্লার একদিকে ঝুলাইয়া জলে চুবানো হইত। যে ওজনে যত চুরি করিয়াছে, ঠিক ততটা ভার তাহার ঘাড়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ শাস্তির যন্ত্র এই কারাগারে দেখা যায়।

শহরে ও পল্লীগ্রামে রমণীদিগের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত কলহপ্রিয়া,

তাহাদের দুর্গতির সীমা ছিল না। হাতে ও গলায় বেড়ী দিয়া তাহাদিগকে রাস্তায় ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই অবস্থায় তাহারা লোকের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিত।

মাতলামী করিয়া অথবা রাত্রিকালে ডাকাইতি করিয়া যাহারা শান্তিপ্রিয় গৃহস্থদের উত্যক্ত করিত, তাহাদিগকে সাজা দিবার জন্য এক-প্রকার প্রকাণ্ড গলবন্ধ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সেই গলবন্ধ গলায় পরিয়া কয়েদীদিগকে রাস্তায় হাঁটিতে হইত। রাস্তার লোকেরা আসিয়া গলবন্ধটা চরকার মত ঘুরাইত এবং তাহাতে কয়েদীর শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইত। ইহা আমাদের দেশের 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা' অপেক্ষা ভীষণ। তারই মাসতুতো ভাই আর কি!

নানাপ্রকার জানোয়ারের মুখোস পরাইয়া কয়েদীদিগকে রাস্তায় হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। সড়কের নরনারী, বালকবালিকা তাহা-দিগকে লইয়া যার যেরূপ খুসী হাসি-ঠাট্টা করিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে সামাজিক নির্য্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ক্লেশভোগও যথেষ্ট হইত।

লৌহময়ী যুবতীমূর্ত্তি

এই সব শাস্তির সঙ্গে দৈহিক যন্ত্রণা অল্পবিস্তর জড়িত থাকিত। আর কতকগুলি দণ্ডের যন্ত্র দেখিলে বীভৎস ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। চিমটা দিয়া জিহ্বা টানিয়া আনা, চক্ষুতে ছিদ্র করিয়া দেওয়া, উলঙ্গ করিয়া কণ্টকপূর্ণ কাষ্ঠের বা লৌহের বাক্সে গড়াগড়ি দেওয়ানো—এ সব আদালতের দণ্ড ছিল।

আর একরূপ শাস্তির উল্লেখ করিব। একটি প্রকাণ্ড শূন্যগর্ভ লৌহময়ী যুবতীমূর্ত্তির দ্বার খুলিয়া তাহার ভিতর কয়েদীকে দাঁড় করান হইত। তাহার পর দ্বার বন্ধ করা হইত। মূর্ত্তির মধ্যে বহু কীলক এমন ভাবে সজ্জিত থাকিত যে, দ্বার রুদ্ধ করিবামাত্র সেগুলি কয়েদীর

চক্ষু, মুখ, গলা, বক্ষ, উদর ইত্যাদি ছিদ্র করিয়া দিত। এই উপায়ে অনেক কয়েদীকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

ইয়োরামেরিকার পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিচারপ্রণালী ও দণ্ডব্যবস্থার আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়া থাকেন, এসিয়ার জাতিসমূহ বর্ব্বরোচিত অমানুষিক দণ্ডপ্রদানে অভ্যস্ত ছিল। ভারতবর্ষের আর এসিয়ার অন্যান্য দেশের সমাজবিজ্ঞান বিদ্যার অনুশীলনকারীরা ন্যুর্ণব্যর্গের এই নির্য্যাতন-গৃহ সম্বন্ধে গবেষণা করিলে সহজে জগদ্‌বাসীকে বুঝাইতে পারেন যে, পশ্চিম মুল্লুকের খ্রীষ্টান সমাজেও মধ্যযুগে যে সব দণ্ডব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সে সব নিষ্ঠুরতায় অনেক প্রাচ্যপদ্ধতিকে পরাভূত করিতে পারে। এই নির্য্যাতন-গৃহে যে সকল নির্য্যাতন-যন্ত্র দেখিলাম, তাহার অনেকগুলি শতবর্ষ পূর্ব্বেও ইয়োরোপে ব্যবহৃত ছিল।

ন্যুর্ণব্যর্গ-মাহাত্ম্য

ন্যুর্ণব্যর্গের অনেক বাড়ীই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর বাসভবন বলিয়া বিখ্যাত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অনেক বাস্তু এখনও বিদ্যমান—সেকালের সৌধে ও গির্জ্জায় গথিক স্থাপত্যরীতি গুলজার।

কাঠক্ষোদাইয়ের শিল্প ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে প্রচলিত। কিন্তু ক্ষোদাই-করা কাঠের উপর চাপ দিয়া যে ছবি হয়, সেই চিত্রশিল্প ভারতে প্রচলিত ছিল না। 'এচিং' ও 'উডকাট' দুই-ই ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী-করা শিল্প। এই দুই দুই শিল্পের জন্যই ন্যুর্ণব্যর্গ বিখ্যাত। ষ্টোস নামক শিল্পী ড্যিরেরের আমলের লোক। তাঁহার হাতের বহু চিত্র গির্জ্জায়-গির্জ্জায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ন্যুর্ণব্যর্গের একজন অধিবাসী পকেট-ঘড়ী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আর একজন ন্যুর্ণব্যর্গবাসী লোহার তার প্রস্তুত করিয়া জার্ম্মাণিতে

বিখ্যাত হয়েন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যিনি সর্ব্বপ্রথম ভূমণ্ডলের 'গ্লোব' বা গোলক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিও এই শহরের লোক। এই সকল আবিষ্কারকের মূর্ত্তি শহরের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত।

ন্যুর্ণব্যর্গের 'গার্মানিষে মুজেয়ুম' বিদেশীর অবশ্য-দ্রষ্টব্য। সেকালের ও একালের জার্ম্মাণ-সভ্যতার নানা উপকরণ এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইতেছে। এই ধরণের জার্ম্মাণ মিউজিয়ম জার্ম্মাণির অন্য কোন শহরে আছে কিনা সন্দেহ। বার্লিনে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ সম্বন্ধে নানরূপ সংগ্রহশালা আছে; কিন্তু কেবল জার্ম্মাণি-সম্বন্ধীয় কোন মিউজিয়ম জার্ম্মাণিতে, বোধ হয়, আর কোথাও নাই।

জার্ম্মাণির সুকুমার শিল্প

'গার্মানিষে মুজেয়ুমের' বিপুল সংগ্রহ দেখিতে দর্শকদিগের অনেক সময় লাগে। দুই একটি বিভাগে প্রদর্শিত বস্তু সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব।

জার্ম্মাণ ভাস্করদিগের হাতের কাজ জগতের কোন নগরের মিউজিয়মে প্রায় একরূপ নাই। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সংগ্রহালয়ে পুরাতন গ্রীসের পর প্রধানতঃ বর্ত্তমান ফ্রান্সের স্থাপত্য প্রদর্শিত হয়। কিন্তু ন্যুর্ণব্যর্গের এই 'মুজেয়ুমে' যে স্থাপত্য-সম্পদ দেখিলাম, তাহা বাস্তবিকই জগতের শিল্পীদিগের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য। এ হিসাবে বার্লিনের 'কাইজার ফ্রিডরিষ মুজেয়ুম'ও দ্রষ্টব্য।

নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি শহরের সংগ্রহালয় দেখিলে জার্ম্মাণ-চিত্রশিল্প সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। কেন না সে সব চিত্রশালায় ইতালীয়, ওলন্দাজ ও ফরাসী শিল্পীদিগের চিত্র ব্যতীত অন্য কোন দেশীয় শিল্পীদিগের চিত্র বেশী দৃষ্টি আকৃষ্ট করে না। ন্যুর্ণব্যর্গের এই

আর এক কথা। সাধারণতঃ ফটোগ্রাফে জার্ম্মাণ চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের যে সকল প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, সে সকলের ভিতর তেজ ও পরাক্রমের পরিচয় থাকিলেও সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের কমনীয়তা লক্ষিত হয় না। কিন্তু জার্ম্মাণ-শিল্পের ওস্তাদরা এ সকল সৃষ্টি করিতেও অসমর্থ ছিলেন না। ন্যুর্ণবার্গে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই কথাগুলি মনে রাখিলে শিল্প-রসিকরা একটা নূতন শিল্পজগতের সন্ধান পাইবেন। বার্লিনের 'নাটসিওনাল গালারী'তে ঊনংবিশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ চিত্রশিল্প দেখিলেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইবে।

ন্যুর্ণবার্গের সংগ্রহালয়ে একটি কাঠের ম্যাডোনা (মাতৃমূর্ত্তি) দেখাইয়া ডিরেক্টর হাম্পে বলিলেন, "এইটা জার্ম্মাণ শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিখ্যাত।" কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যে মধ্যযুগের জার্ম্মাণ-শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। বার্লিনের 'কাইজার ফ্রিডরিষ মুজেয়ুমে' তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ন্যুর্ণবার্গের 'মুজেয়ুমে' ড্যুরেরের অঙ্কিত যে কার্ল ড্যর গ্রোসে চিত্র দেখিলাম, সংগ্রহশালার পক্ষে তাহা যে অত্যন্ত মূল্যবান্, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

নবম অধ্যায়

গ্যেটে-শিলারের কর্ম্মভূমি

ট্যুরিঙ্গেন প্রদেশ

প্রুশিয়াকে এক কথায় উত্তর-জার্ম্মাণি বলা হয়। এই হিসাবে দক্ষিণ-জার্ম্মাণি বলিলে সহজে ব্যাভেরিয়া বুঝি। এই দুয়ের মাঝামাঝি ট্যুরিঙ্গেন (টুরিঙ্গিয়া) প্রদেশ। এ এক পাহাড়ী মুল্লুক। ট্যুরিঙ্গেনের বনভূমি ও পাহাড় সম্বন্ধে ভারতে ও পাঠশালায় কিছু কিছু, অন্ততঃ পক্ষে নামতঃ জানা হইয়া থাকে।

জার্ম্মাণদের চিন্তায় ট্যুরিঙ্গেনের বন-পাহাড় স্বাস্থ্যকর জনপদ হিসাবে মূল্যবান্। প্রুশিয়ার লোকেরা গরমের ছুটিতে এই প্রদেশের পল্লীতে পল্লীতে শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আরাধনা করিতে অভ্যস্ত।

অঞ্চলটাকে পাহাড়ী ভূমি না বলিয়া উচ্চ সমতল টেব্‌ল্‌ল্যাণ্ড বলাই যেন যুক্তিসঙ্গত। উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের মাঝামাঝি ডেক্কান প্রদেশের কথা মনে পড়িতেছে। তবে এখানে ওখানে ছোট-খাটো পাহাড়ের শিরও নজরে পড়ে।

ট্যুরিঙ্গেন অঞ্চল একমাত্র জার্ম্মাণ জাতির গৌরবকেন্দ্র নয়। দুনিয়ার সকল দেশেই ট্যুরিঙ্গেন প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কবিবর গ্যেটে আর শিলার তাঁহাদের জীবনের প্রধান ভাগ এই প্রদেশেই কাটাইয়াছিলেন। সাহিত্য-রসিকদের নিকট গ্যেটে-শিলারের কর্ম্মক্ষেত্র যে-সে দূরের তীর্থক্ষেত্র নয় বলাই বাহুল্য।

ভারতে গ্যেটে-কথা

গ্যেটে আর শিলারের নাম ভারতে সুপরিচিত বটে। কিন্তু গ্যেটে ও শিলারের কোনো রচনা কোনো ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমাদের যাঁহারা এই দুই সাহিত্য-বীরের কথা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই একমাত্র ইংরেজি তর্জ্জমার দাস। জার্ম্মাণ ভাষায় পণ্ডিত হইবার পর কয়জন ভারতবাসী গ্যেটে-সাহিত্যে এবং শিলার-কাব্যে ডুব দিয়াছেন জানি না। আর, বাংলা বা হিন্দী সাহিত্যে গ্যেটে-শিলার আজও বোধ হয় দুইটা লোকের নাম মাত্র। যুবক ভারত এই লজ্জা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইবে না কি?

কয়েক বৎসরের ভিতরই গ্যেটের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। সে সময়ে জার্ম্মাণরা মহা ঘটা করিয়া গ্যেটেতিথি পালন করিবে নিশ্চয়। জগতের ছোট বড় 'সভ্য' দেশ হইতে জার্ম্মাণ জাতির নিকট গ্যেটে-অর্ঘ্য আসিবে। ভারত-সন্তান কি তখন বলিবেন:—"বড়ই দুঃখের কথা, আমরা আজও কোনো স্বদেশী ভাষায় গ্যেটের এক কাঁচ্চাও পাই না?" যুবক ভারত, তখন তোমরা তোমাদের জার্ম্মাণ বন্ধুদের নিকট মুখ দেখাইতে পারিবে কি?

ভাইমারের জ্ঞান-মণ্ডল

জার্ম্মাণ 'কুল্টুর' বলিলে যে সাহিত্য, সভ্যতা, দর্শন ও শিল্প সাধারণতঃ পণ্ডিত মহলে আলোচিত হয়, তাহার জন্মকাল ১৭৮০ হইতে ১৮৩০ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসর। সেই পঞ্চাশ বৎসরের জার্ম্মাণ-কীর্ত্তি এই ট্যুরিঙ্গেনের এক নগণ্য নগরে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। নাম তাহার ভাইমার।

ভাইমারের এক মামুলি নবাব, জমিদার বা রাজা কার্ল আউগুষ্ট ভারতীয় বিক্রমাদিত্যের মতন এক 'নবরত্ন' কায়েম করিয়াছিলেন। এই জার্ম্মাণ বিক্রমাদিত্য তখনকার দিনের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ কবি, নাটককার, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, চিত্রকর, বাস্তুশিল্পী, সঙ্গীতাচার্য্য ইত্যাদি সুধীকে বৃত্তি দিয়া 'সংরক্ষণ' করিতেন। কোনো শ্রেণীর পণ্ডিত বাদ পড়িত না।

এই নবরত্নের জ্ঞানমণ্ডলে জার্ম্মাণি এক অপূর্ব্ব আন্দোলন লাভ করে। দুনিয়ার পণ্ডিতেরা তাহাকে 'রোমাণ্টিক' বা ভাবুকতার আন্দোলন বলিয়া থাকেন। ভাইমারের ফোয়ারায়ই উনবিংশ শতাব্দীর এই বিপুল চিন্তাধারা ইয়োরোপের সমাজকে প্লাবিত করিবার পথে ছুটিতে থাকে। ভাইমারের কল্যাণেই পাশ্চাত্য নরনারী একটা বড় গোছের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

কাজেই ভাইমার ভারতবাসীর পক্ষেও সমাদৃত হইবারই কথা। ভাইমারে এক সঙ্গে জার্ম্মাণ কুল্টুরের গোড়াটা আর বর্ত্তমান জগতের মূল প্রস্রবণ—দুইই হাতে হাতে পাকড়াও করা সম্ভব। বিশ্বশক্তির উপাসকেরা ভাইমার-তীর্থে ঐতিহাসিক আনন্দ পাইবেনই পাইবেন। বহু ভারতীয় পর্য্যটকই ইতিপূর্ব্বে ভাইমারে 'গঙ্গা-স্নান' করিয়া গিয়া থাকিবেন।

নাট্যকার শিলার

ভাইমারের লাগাও একটা ছোট শহরের নাম য়েনা। রেলে তফাৎ মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সেই নবরত্নের যুগে য়েনাও প্রসিদ্ধ ছিল। গ্যেটের ভাষায় য়েনা ছিল 'নেষ্ট্খেন' বা ছোট্ট একখানা নীড়-বিশেষ। সহজে বলা যাউক য়েনা ছিল ভাইমারের মফঃস্বল। এই

খাশ য়েনায় আর আশেপাশের গাঁয়ে গাঁয়ে গ্যেটে-শিলার যুগের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতেছি। কোন্ কোন্ ঘরে, কোন্ কোন্ বাগানে, কোন্ কোন্ দরিয়ার কোণে, কোন্ টেবিলে বসিয়া কোন্ লেখক কোন্ রচনাটা তৈয়ারি করিয়াছিলেন, ভাইমার-য়েনার বন্ধুরা সেসব দেখাইতেছেন। এই ধরণের বীরপূজায় বাস্তুভিটাতত্ত্বের সকল অনুষ্ঠানই আছে। জার্ম্মাণিতে যাহা দেখিতেছি ফ্রান্সে, ইংল্যাণ্ডে, এমন কি আমেরিকায়ও তাহা দেখিয়াছি। ভারতবাসীর নিকটও এই সব কায়দা অজানা-কিছু নয়।

আজকালকার মালিকেরা অবশ্য ঘরগুলাকে বিশেষ কোনো সম্মানযোগ্য চিজ বিবেচনা করে না। কোনো বাড়ীতে প্রবেশ করাই দুর্ঘট। তবে কোনো কোনো মালিক বিদেশী পর্য্যটকের ইজ্জদ রক্ষা করিতে রাজি।

য়েনায় শিলারের আবহাওয়া পাইতেছি দস্তর মতন। 'শিলার-টিশ্' নামে শিলারের টেবিল রক্ষিত হইতেছে। খোলা-কলারওয়ালা জামা পরিয়া এই টেবিলে বসিলেই অবশ্য গল্‌গলিয়া কবিতা বাহির হয় না!

শিলারকে প্রধানতঃ নাট্যকাররূপে ইজ্জদ দেওয়া হয়। গীতি-কবিতায়ও শিলারের হাত সরসভাবে খেলিত। তবে নাটকগুলাই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি সন্দেহ নাই। 'ভিল্‌হেল্‌ম্ টেল' নাটক গল্পাকারে ভারতীয় পাঠশালায়ও সুবিদিত। স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল শিলারের প্রত্যেক নাটক রচনায় 'ধুয়া' বা 'মুদ্দা'।

কোনো নাটকের কথাবস্তু সুইস্, কোনো নাটক স্পেনের ঘটনা লইয়া লিখিত। এক নাটকের রসদ জোগাইয়াছে স্কটল্যাণ্ড। ফরাসী বীরাঙ্গনার কীর্ত্তিও শিলারের প্রাণকে তাতাইয়া তুলিয়াছিল। মধ্যযুগ আর পুরাণা কথা লইয়া ঘাঁটাঘাটি করা শিলার-সাহিত্যের বিশেষত্ব। প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ রোমাণ্টিকতার অন্যতম লক্ষণ। এই সকল তরফ হইতে বাংলার দ্বিজেন্দ্রলাল বিংশ শতাব্দীর শিলার।

আমাদের 'শকুন্তলা'র ধাঁচে শিলার 'থালিয়া' নাটক রচনা করেন। ভাইমারের যুগে গ্যেটে-মণ্ডল কালিদাসের 'শকন্তলা' লইয়া তুমুল লাফালাফি করিত। গ্যেটে 'শকুন্তলা-ময়' হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবিদের ত কথাই নাই, দার্শনিকরাও ভারতবর্ষের নামে ভূমানন্দ অনুভব করিত। জার্ম্মাণ কুল্টুরের গোড়াটা, জার্ম্মাণ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ, ইয়োরোপীয় জীবনের রোমাণ্টিক বিপ্লব, বর্ত্তমান জগতের জন্মকথা,—এই সব লইয়া যে কোনো পণ্ডিতই ঘাঁটাঘাঁটি করুন না কেন, তাঁহাকে ডাইনে বাঁয়ে পাঁয়তারা করিতে করিতে একবার না একবার গুপ্ত ভারতের সাম্রাজ্য-মণ্ডলকে সেলাম ঠুকিতেই হইবে।

য়েনা

য়েনা নেহাৎ ছোট শহর,—বড় রকমের একটা পল্লী বলা যাউক। আজ-কাল লাখ লাখ লোকের বস্তি না দেখিলে কোনো জীবনকেন্দ্রকে সহজে শহর বলিতে ইচ্ছা হয় না। দুনিয়ায় হাঁটিতে হাঁটিতে নজর বড় হইয়া গিয়াছে! ভাইমার বোধ হয় য়েনার চেয়েও ছোট। লোক-সংখ্যা প্রত্যেকটায়ই ত্রিশ চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি।

'বুর্গ্‌-কেলার' নামক সেকেলে দুর্গের নীচের তলায় অবস্থিত রেষ্টরাণ্টে খাইতে না গেলে য়েনা দেখা হয় না। এই ধরণের 'কেলার' জাতীয় ভোজনালয় জার্ম্মাণির বোধ হয় প্রত্যেক শহরেই আছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা জার্ম্মাণিতে এই সকল ব্যবস্থাকে 'ব্যির্গার্লিখ্‌' (বা 'গেরস্থ'-সুলভ) বলিতে অভ্যস্ত। তবে নীচের তলায় —খানিকটা আধ্যাত্মিক অন্ধকারময় আবহাওয়ায় বসিয়া পেটপূজা করা অনেকের পক্ষে বোধ হয় একবারের বেশী পোষায় না। দেশ দেখিতে আসা গিয়াছে যখন, তখন সবই করা চাই। এই নীতি অনুসারে বুর্গকেলারকে বাদ দেওয়া চলে না।

যে হোটেলে আড্ডা গাড়া গিয়াছে তাহার নাম 'ডায়চেস হাউস' বা জার্ম্মাণ ভবন। এটাও 'ব্যির্গার্লিখ'ই বটে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ধরণের লোক বলিলে যে জীব বুঝা যায়, সেই জীবের আনাগোনা এখানে বেশী।

ধর্ম্মসংস্কারক লুথারের মূর্ত্তি এখানকার এক গির্জ্জার বিশেষত্ব। বাড়ী-ঘরের বিশেষত্ব কোথায়ও নজরে পড়ে না। জার্ম্মাণিসুলভ 'গথিকের' ছায়া এখানে ওখানে লক্ষ্য করিতে হইবে মাত্র।

জীবতত্ত্ববিৎ হেকেল

বৎসর কয়েক হইল য়েনার জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ হেকেলের মৃত্যু হইয়াছে। ইংরেজ ডারুইন আর ফরাসী লামার্কের মতন জার্ম্মাণ হেকেল ক্রমবিকাশতত্ত্বের অন্যতম জন্মদাতা। জার্ম্মাণির বাহিরে হেকেলের নাম-ডাক যত অন্য কোনো জার্ম্মাণ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের নাম-ডাক ততটা কিনা বলা কঠিন। এই সকল তুলনা-কার্য্যে জরীপ করার মাপকাঠি লইয়া গোলযোগ উঠিতে পারে। কাজেই এ সম্বন্ধে বেশী নাড়াচাড়া না করাই সঙ্গত। তবে আসল কথা এই যে, প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করিতে গিয়া সকলকেই হেকেলের মতামত পরখ করিয়া দেখিতে হয়।

হেকেলের একাধিক গ্রন্থ ইংরেজিতে পাওয়া যায়। 'দুনিয়ার হেঁয়ালি' নামক কেতাব ভারতীয় ইংরেজি-পাঠকদের অপরিচিত নয়। মানুষ, আত্মা, সংসার আর দেবতা এই চার বিষয়ের আলোচনায় ভারতবাসী যে সকল বুখ্‌নি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত, তাহার অনেকগুলাই হেকেলের নিকট হইতে চুরি-করা মাল। জগতের সকল ভাষায়ই,—এমন কি 'অসভ্য জাপান' ও চীনের ভাষায়ও এই গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে। কে জানে কোনো ভারতীয়

ভাষায় আছে কিনা ? বাংলায় বোধ হয় নাই,—বাংলা সাহিত্য ভারতের সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য কিনা ! উর্দ্দূতে থাকা অসম্ভব নয়। শুনিয়াছি হিন্দীতে আছে।

'ড্যয়চেস হাউস'-হোটেলের অনতিদূরেই হেক্কেলের বাড়ী। সেই বাড়ীটা এক্ষণে মিউজিয়ামে পরিণত হইয়াছে। পঁচাশী বৎসর বয়সে হেক্কেলের মৃত্যু হয়। মরবার দিন পর্য্যন্ত ইনি কর্ম্মক্ষম ছিলেন। টেবিলের উপর শেষ লেখাগুলা সাজানো রহিয়াছে। কলমটাও সেই অবস্থায়ই রক্ষিত হইতেছে ।

অধ্যাপক শ্‌মিড্‌ হেক্কেলের এক চেলা। মিউজিয়ামের কাগজপত্র দেখা শুনা করা শ্‌মিডের কাজ। হেক্কেলের অনেক লেখা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সেই সব সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিবার জন্যও শ্‌মিড্‌ বাহাল আছেন।

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, হেক্কেল একজন অসাধারণ চিত্রকর ছিলেন। বৈজ্ঞানিক অভিযান উপলক্ষ্যে হেক্কেলকে দেশ-বিদেশের বনে জঙ্গলে পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষও বাদ যায় নাই। সেই সকল দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য হেক্কেল ছবি আঁকিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রায় দুই হাজার চিত্রের সংগ্রহ দেখিলাম। ছবিগুলার ভিতর উদ্ভিদ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, আকরতত্ত্ব, পাহাড়তত্ত্ব, নদনদীতত্ত্ব সবই বৈজ্ঞানিক যাথর্থ্যের সহিত বাঁচিয়া রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন অংশগুলাকে সাজাইবার ক্ষমতা এবং নানা বর্ণের সাহায্যে বৈচিত্র্যের ভিতর সামঞ্জস্য ফুটাইবার দক্ষতা দেখিতেছি। এই হিসাবেই হেক্কেল সুকুমারশিল্পী। বৈজ্ঞানিক না হইয়া একমাত্র-চিত্রকর ভাবে জীবন কাটাইলেও হেক্কেল দুনিয়ায় যশস্বী হইতে পারিতেন বোধ হয়।

কার্ল ৎসাইস

জার্ম্মাণির নগরে নগরে 'ফোল্‌ক্‌স্‌-বাড' বা সার্ব্বজনিক স্নানাগার নামক বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। য়েনায়ও দেখিতেছি নিজ নিজ বসত বাড়ীতে নাওয়ার ব্যবস্থা করা জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব। নাওয়া এই সকল দেশে নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতির অন্তর্গত নয়। কালেভদ্রে,—মাসে একবার বা দুইবার,—জনসাধারণ স্নানারামের বিলাস ভোগ করিতে অভ্যস্ত।

য়েনার নাম আজকাল প্রধান ভাবে গ্যেটে-শিলারের স্মৃতিজড়িত কি হেক্কেলের বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তিসংশ্লিষ্ট বলা কঠিন। তবে এখানকার একটা কারখানা জগতে অদ্বিতীয় যশ ভোগ করিয়া থাকে। এমন কি ভারতের উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও ৎসাইসের কাচ দেখুন বা না দেখুন সেই বিষয়ে গল্প শুনিয়া থাকেন। দূরবীণ, অণুবীণ ইত্যাদি যন্ত্রের জন্য যে সব কাচ ব্যবহার করা হয়, তাহা তৈয়ারি করিয়াই কার্ল ৎসাইস প্রসিদ্ধ। কারখানাটা য়েনা শহরের মধ্যস্থানে অবস্থিত।

কারখানার বাবুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল। প্রায় চার হাজার লোক কাজ করে। কয়েক গণ্ডা বিজ্ঞানসেবী এখানকার বিজ্ঞানশালায় 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ' বা শিল্প-গবেষণার কাজে মোতায়েন আছেন। পুরাণার বর্জ্জন আর নয়ার উদ্ভাবন চোপর দিনরাত চলিতেছে।

য়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাধ্যাপক আবে ছিলেন ৎসাইসের কারখানার বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠাতা। মজুরদিগকে সকলপ্রকারে সুখী রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আবে জার্ম্মাণ সমাজে অমর হইয়াছেন। কারখানার পরিচালনায় মজুরদের হাত আছে। উচ্চহারে মজুরিও জুটে। মজুর-সমস্যা লইয়া যে সকল জননায়ক,

কার্ল্ ৎসাইস ও আবে-প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলা খুঁটিয়া খুঁটিয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। সোশ্যালিজম, কমিউনিজম ইত্যাদির অনেক গন্ধ এই জগৎপ্রসিদ্ধ 'বুর্জোআ' কারবারের আবহাওয়ায় পাওয়া যাইবে।

তথাপি মজুর-সমস্যা য়েনায়ও দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ গোটা ট্যুরিঙ্গেন প্রদেশটাই জার্ম্মাণির বোল্‌শেভিক বাথান। এই প্রদেশের মজুরেরা রুশ-ভাবাপন্ন লেনিন-ভক্ত লোক। রুশিয়ার সোভিয়েট সরকার জার্ম্মাণির এই জেলাগুলাকে রুশ সাম্রাজ্যের মফঃস্বল বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। গ্যেটে-শিলারের কর্ম্মক্ষেত্র আজ ধনসাম্যপন্থী সমাজ-বিপ্লবধর্ম্মী নরনারীর জীবন-কেন্দ্র। ইহারই নাম 'ৎসাইট্‌-গাইষ্ট্‌' বা যুগধর্ম্ম। বিংশ শতাব্দীতে গ্যেটে-শিলার মহাত্মারা বড় বেশী 'কল্কে' পান না। মজা বটে!

দার্শনিক অয়কেন

য়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অয়কেন দুনিয়ার জ্ঞানমণ্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত। নোবেল প্রাইজ পাওয়া লোক। অয়কেনের রচনাবলী ইংরেজিতে ভারতেও আলোচিত হইয়া থাকে। বুড়া লোক ভাল।

ভারতবাসী আজকালকার দিনে যখনই অধ্যাত্মতত্ত্ব, আদর্শবাদ, ভাবুকতা ইত্যাদির ফোঁড়ন ঝাড়েন, তখনই ইঁহারা হয় জার্ম্মাণ অয়কেন, না হয় ইতালিয়ান ক্রচে, না হয় হেগেলপন্থী ইংরেজ ব্রাড্‌লে ইত্যাদির মতগুলা বাংলায় বা অন্য কোনো স্বদেশী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া দেন। তবে কথাগুলাকে 'খাঁটি স্বদেশী' এবং ভারতীয় আদর্শের প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রচারিত করিবার জন্য ইঁহারা নিজ রচনা বা বক্তৃতার এখানে-সেখানে দেড় লাইন গীতার শ্লোক এবং গোটা আড়াই উপনিষদের শব্দ ছড়াইয়া দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ভারতের মাথার দাম কতটুকু খতাইয়া দেখা আবশ্যক। সম্প্রতি থাক সে কথা।

অয়কেনের জার্ম্মাণ শিষ্যেরা 'অয়কেন-বুণ্ড' বা অয়কেন-পরিষৎ কায়েম করিতেছেন। নানাদেশে এই বুণ্ডের শাখা স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। অয়েকেনের পত্নী হইয়াছেন সম্পাদক। ভারতের জন্য কতকগুলা ঠিকানা চাহিলেন। য়েনার নানা লোকহিতকর কাজে অয়কেন-পত্নীর যোগাযোগ আছে।

দুনিয়ার অন্যান্য বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের মতন অয়কেনও ভারতবর্ষ, ভারতীয় সভ্যতা, ভারতবাসীর স্বধর্ম্ম ইত্যাদি বলিলে একমাত্র আদর্শবাদ, পরলোকতত্ত্ব, বৌদ্ধদর্শন, উপনিষৎ ইত্যাদি বুঝিতে অভ্যস্ত। ভারত সম্বন্ধে এইরূপ একদেশদর্শিতা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট হইতে এসিয়ার পণ্ডিতেরা নকল করিয়াছেন।

অয়কেন নিজে যখন আদর্শবাদী তখন দুনিয়ায় আদর্শবাদীর সংখ্যা যত বাড়ে ততই ইঁহার পক্ষে সুখের কথা। কাজেই ভারত বা চীন সত্যসত্যই পূরাপূরি আদর্শবাদী কিনা, তাহা নিক্তির ওজনে বিচার করিবার মতন ধৈর্য্য অয়কেনের নাই। এই ধৈর্য্যের অভাব বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রমাঁ রলাঁ ইত্যাদি আদর্শবাদীদের স্বভাবগত।

ভারতবাসীর পক্ষে এইটুকু বুঝিয়া রাখা উচিত যে, প্রাচীন গ্রীসের প্লেটো, গ্রেকো-রোমাণ যুগের প্লটিনুস, ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ঋষি ইতালিয়ান টমাস আকিনাস, জার্ম্মাণ য়্যাকোব ব্যেমে ইত্যাদি চিন্তাবীরগণ তথাকথিত হিন্দু-চীনা-সুফী বা প্রাচ্য আদর্শবাদে ও ভাবুকতায় ভরপূর। পাশ্চাত্যেরা উপনিষৎ, তাও-তে-চিঙ্ আর রুমির উপাসনা না করিয়াও স্বদেশেই নিজ নিজ ভাবুকতার খোরাক পাইতে পারেন। তবে আজকালকার ইয়োরামেরিকান সুধীমহলে পাশ্চাত্য আদর্শবাদের কথা অনেক সময়েই মনে থাকে না। এই জন্যই তুলনামূলক দর্শনের

গ্যেটে-ভবন

গ্যেটে ভাইমারের এক বাড়ীতে বৎসর সাতেক ভাড়াটিয়ারূপে বসবাস করেন। পরে বাড়ীটা নিজের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ১৭৯২ হইতে ১৮৩২ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কবিবর এই ভবনে ছিলেন। এই কারণে 'গ্যেটে-হাউস' সাহিত্য-প্রেমিকদের নিকট আদরের বস্তু।

১৮৮৬ সালে 'গ্যেটে-ভবন' ভাইমার নগরের সম্পত্তি হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থায় দেখিতেছি, আজকাল এখানে এক বিরাট মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয়। গ্যেটে-জীবনের আর গ্যেটে-সাহিত্যের নানা তথ্য কামরায় কামরায় সাজানো রহিয়াছে।

'গ্যেটে-নাটুসিওনাল-মুজেয়ুমে'র ভিতর প্রবেশ করিলে সাহিত্য ছাড়া আরও অনেক চিজ চোখে পড়ে। ছবি, মূর্ত্তি, কেতাব, গাছ, পাথর, জীবজন্তু ইত্যাদির সংগ্রহ বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এইগুলা সবই গ্যেটের নিজের হাতে সংগ্রহ করা জিনিষ।

এই সংগ্রহগুলাকে কেবলমাত্র 'বাতিক' বলা চলে না। নানাদিকে গ্যেটের বাতিক যে ছিল না তা নয়। কিন্তু আসল কথা,— গ্যেটের মাথাটা একসঙ্গে বহুক্ষেত্রে সজাগভাবে খেলিত।

লোকেরা সাধারণতঃ গ্যেটেকে একমাত্র কবিরূপে চিনে। গ্যেটের গীতিকাব্য, গ্যেটের নাটক, গ্যেটের উপন্যাস, গ্যেটের কথোপকথন এই সবই সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞানের মহলেও গ্যেটের কীর্ত্তি অতি উঁচু দরের। গ্যেটেকে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান এবং জীব-বিজ্ঞানের অন্যতম জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। ডারুইন, লামার্ক আর হেকেল ইত্যাদির যে ইজ্জৎ, জীবন বিষয়ক ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের ইতিহাসে গ্যেটেরও সেই ইজ্জৎ।

অধিকন্তু পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন এই দুই লাইনেও গ্যেটের 'রিসার্চ্চ' বা অনুসন্ধান চলিত। সে যুগের অন্যান্য বিজ্ঞানসেবীরা যেরূপ ল্যাবরেটরিতে বসিয়া মাপিয়া জুকিয়া বস্তুপরীক্ষা করিতেন, গ্যেটে ও নিজ ভবনের কয়েক কামরায় ঠিক সেইরূপ পরীক্ষা কার্য্যে মোতায়েন থাকিতেন। বিজ্ঞানালোচনাটা গ্যেটের পক্ষে নেহাৎ বাতিক মাত্র ছিল না,—জীবনের এক প্রচণ্ড সাধনায় পরিণত হইয়াছিল। রংয়ের বিশ্লেষণ করিয়া কবিবর বৈজ্ঞানিক মহলে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় লোক জন্মিয়াছেন। কিন্তু একসঙ্গে বহুবিধ চিন্তাক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ যশের অধিকারী বড় বেশী নাই। গ্যেটের কৃতিত্ব বোধ হয় এই হিসাবে সবসে সেরা। তাহার উপর মনে রাখিতে হইবে,—গ্যেটে একজন মহা কর্ম্মবীরও বটে। ভাইমার-রাষ্ট্রের কর্ণধারই ছিলেন তিনি। অবশ্য ভাইমার এমন কিছু বড় দেশ ছিল না। তবে সে যুগের জার্ম্মাণ মুল্লুকে ঝগড়া, চুকলি, মারামারি, কোঁদল, ষড়যন্ত্র এত বেশী চলিত যে একজন ভাবুক-প্রেমিক-কবি-বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একটা দেশের শাসনভার লইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত সেই কাজে মোতায়েন থাকা একটা মুখের কথা নয়।

ভীলাণ্ড ও হার্ডার

কার্ল্ আউগুষ্ট্ (১৭৭৫-১৮২৮) একসঙ্গে বহুবীরের সম্মান করিতে শিখিয়াছিলেন। গ্যেটেকেই তিনি গুরুদেব বিবেচনা করিতেন সন্দেহ নাই।

গ্যেটে-মণ্ডলের ভিতর শিলার ছাড়া আরও অনেক জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সভ্যতায় তাঁহারা সকলেই অমর। দুনিয়ার-

ভাইমারের ‘শ্লস’ বা প্রাসাদ-দুর্গের ভিতর সেই গ্যেটে-মণ্ডল বা নব-রত্নের জ্যোতি কিছু কিছু মালুম হয়। গ্যেটের নামে আর শিলারের নামে দুইটা কামরা অভিহিত হইতেছে। দুইয়ের রচনাবলী চিত্রাকারে এই দুই কামরায় দেখিতে পাই।

সে যুগের এক বড় কবি ভীলাণ্ড জার্ম্মাণ বিক্রমাদিত্যের ‘সংরক্ষণ’ ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে এক কামরা দেখিতেছি। উদ্দীপনামূলক কবিতা রচনা ছিল তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। প্রাচীন গ্রীক এবং অন্যান্য পুরাণের গল্প অবলম্বন করিয়া ভীলাণ্ড নবযুগ গড়িতেন।

এক কামরা দেখিতেছি হার্ডারের নামে। হার্ডার ছিলেন দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ। প্রাচীন আর মধ্যযুগের মানবজীবন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা ছিল হার্ডারের এক বড় কাজ। নৃ-তত্ত্বের আসরে এই কারণে হার্ডারের পানসুপারি মিলে। বিদেশী সাহিত্য স্বদেশী ভাষায় প্রচার করা ছিল হার্ডারের আর এক বড় কাজ। জার্ম্মাণ জাতিকে হার্ডার বিশ্বমুখী করিয়া তুলিতেছিলেন। এই সূত্রে ভারতীয় কাব্য ও দর্শনের দিকেও হার্ডারের দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

হার্ডারের নাম আজকালকার দিনে বড় বেশী শুনা যায় না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে হার্ডারের চিন্তাধারা ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানমণ্ডলে এক বিপুল শক্তি। কি সুকুমার-শিল্প, কি কাব্যসাহিত্য, কি লোকাচারতত্ত্ব, কি ধর্ম্মকর্ম্ম, কি দর্শন বা রীতিনীতি,—সকল ক্ষেত্রেই আজকাল তুলনামূলক আলোচনা প্রণালীর রেওয়াজ দেখিতে পাই। এই রেওয়াজের অন্যতম জন্মদাতাই হইতেছেন হার্ডার।

জার্ম্মাণরা হার্ডারের প্রভাবে একসঙ্গে স্বজাতিনিষ্ঠ, অতীতপ্রিয় এবং স্বদেশবৎসল হইতে শিখে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিবার

হার্ডারের প্রচেষ্টায় গভীরতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্ম্মাণদের রোমাণ্টিকতায় শিলার যে আগুন ছুটাইতেছিলেন, সেই আগুনই হার্ডারের সাহিত্যসাধনার ফলে জনসাধারণকে দৃঢ়তা ও সঙ্ঘবদ্ধতার দিকে লইয়া যাইতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে 'জাতীয়তা'র আন্দোলন হার্ডারের রোমাণ্টিকতায় পুষ্ট হইয়াছে। ইতালিয়ান ভাবুক-প্রবর জাতীয়তার ঋষি মাৎসিনি হার্ডারের অন্যতম ভক্ত ছিলেন।

মফঃস্বলের আর্থিক অবস্থা

জার্ম্মাণির মফঃস্বলে মফঃস্বলে টো টো করিলে বেশ বুঝা যায় যে, লড়াইয়ে হারিয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণরা নেহাৎ দরিদ্র হইয়া পড়ে নাই। বড় বড় শহরের থিয়েটারে, হোটেলে, নাচগানের মজলিশে আর জিনিষপত্রের দোকানে অনেক ক্ষেত্রেই লোকের ভিড়ের ভিতর বিদেশীদের সংখ্যা অনেক। কাজেই সেই সব কেনাবেচা, আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ভোগ ইত্যাদি দেখিয়া খাঁটি জার্ম্মাণ নরনারীর আর্থিক অবস্থা বুঝা সহজ নয়।

কিন্তু ছোট ছোট শহরে এবং পল্লীতে বিদেশীদের চলাফেরা কম। ভাইমার য়েনা ইত্যাদি অঞ্চলে 'নেটিভ'দের সংখ্যাই বেশী। এখানকার সড়কে যে সব নরনারী চোখে পড়ে তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদে দারিদ্র্যের লক্ষণ নাই। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়া পোষাক পরা ইয়োরামেরিকানদের দস্তুর। জার্ম্মাণরা সেই দস্তুর রক্ষা করিয়াই চলিতেছে।

রেষ্টরাণ্টে কাফেতে রোজই দর বাড়িতেছে। কিন্তু চড়া হারে চর্ব্ব্যচোষ্য উপভোগ করিবার লোক কমিতেছে না। সিনেমায় আর রঙ্গালয়েও জার্ম্মাণ নরনারী যথাপূর্ব্বং তথাপরম্।

জিনিষপত্রের দর বাড়িতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু জার্ম্মাণির

কেরাণী, কর্ম্মচারী, কুলী, মজুর, ঝী ইত্যাদির মাহিয়ানা বা সাপ্তাহিক বেতনও তেমন তেমন বাড়ানো হইতেছে। কষ্ট কাহাকে বলে বেতনভোগী কোনো লোকই জানে না। কাজেই দুঃখ-দারিদ্র্য চোখে পড়িতেছে না। লড়াইয়ের পূর্ব্বে জার্ম্মাণদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি কিরূপ ছিল জানি না। তবে আজ তাহার চেয়ে সেই মাপকাঠি অনেক খাটো—এ কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

ভারতীয় দারিদ্র্যের মাপকাঠি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলে অন্যায় করা হইবে। আমাদের চেয়ে জার্ম্মাণরা আজ বেশী সুখে আছে কি বেশী কষ্টে আছে, তাহা আলোচনা করিতে বসা সম্প্রতি নিষ্প্রয়োজন। ১৯১৪ সালের তুলনায় ১৯২২ সালে ইহাদের অবস্থা কি, তাহাই বিচার করা সঙ্গত।

মধ্যবিত্তের দশা

তবে জার্ম্মাণির কোনো সমাজে আজ দুঃখ নাই এ কথা বলা চলে না। মধ্যবিত্ত এবং বিশেষতঃ মস্তিষ্কজীবীদের শ্রেণীতে আর্থিক কষ্ট অনেক স্থলেই দেখিয়াছি,—কি বার্লিনে কি মফঃস্বলে। ইস্কুল-মাষ্টার, চিকিৎসক, উকীল, সাহিত্যসেবী, সংবাদপত্রের লেখক, চিত্রকর স্থপতি, গায়ক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে। এই ধরণের লোকের কষ্ট আজ ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে আর ইতালিতেই বা কম কি?

ভারতে আমরা কি নিম্নশ্রেণী কি মধ্যবিত্ত সকলেই সারাজীবন আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে অভ্যস্ত। না খাইতে পাইয়া মরা, পোষাকের অভাবে শীতে বর্ষায় কষ্ট পাওয়া আমাদের সনাতন

আমাদের দেশে হাজার লোকে ভুগে, কি দশ লাখ লোক ভুগে, তাহা বিচার-বিশ্লেষণ করা আমরা আবশ্যকই বিবেচনা করি না। কেননা দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-ব্যাধি-প্রপীড়িত ভারতবাসীর সংখ্যা অগণিত।

কিন্তু জার্ম্মাণরা এবং ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিণ ইত্যাদি জাতিরা দারিদ্র্য-দুঃখকে সনাতন স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত নয়। ইহাদের দেশে যদি কোনো শহরে এমন কি দশটা মাত্র পরিবারে সপ্তাহের প্রতিদিন মাখন বা দুধ বা চিনি বা মাংস না জুটে, তাহা হইলে ইহারা তাহা লইয়া সরকারকে, সমাজকে উস্তম পুস্তম করিয়া ছাড়ে। কাজেই আজকাল ছয়কোটী জার্ম্মাণ নরনারীর দেশে 'মধ্যবিত্ত' পরিবারের হাজার চল্লিশ-পঞ্চাশেক লোক খাওয়া-পরার কোনো কোনো অনুষ্ঠানে কমবেশী কষ্ট পাইতেছে—এই দৃশ্য ইহাদের পক্ষে সহনীয় নয়। এই কথাটা মনে না রাখিলে ভারতবাসীরা জার্ম্মাণির সুবিচার করিতে পারিবে না।

বিষয়টা আরও তলাইয়া বুঝা আবশ্যক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনো কোনো লোক কষ্ট পাইতেছে বটে। কিন্তু তাহা বলিয়া গোটা জার্ম্মাণ সমাজ আর্থিক হিসাবে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে কি? বোধ হয় না। যদি গোটা জার্ম্মাণির ছয় কোটি লোক দারিদ্র্যে ভুগিত তাহা হইলে জার্ম্মাণ পল্লীশহরের দোকানে, থিয়েটারে, রেষ্টরাণ্টে কোনো জার্ম্মাণেরই টিকি দেখা যাইত না। কিন্তু সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণদের টিকি দেখিতেছি।

শ্রেণী-বিপ্লব

আসল কথা, লড়াইয়ের ফলে অন্যান্য দেশের মতন জার্ম্মাণিতেও একটা সমাজ-বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। আগে যাহারা ধনী লোক ছিল তাহাদের অনেকেরই সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মার্কের পতনের

সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিটাকার কিম্মৎ আর কিছুই নাই। লক্ষপতিরা আজ সত্যসত্যই পথের ভিখারী। সুদের টাকা গুনিয়া যে সব বিধবারা জীবনযাপন করিত তাহারা অনাহারে মরিতেছে। এই সব শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছি। অতি সুশিক্ষিত সুমার্জ্জিত ভদ্র ঘরে এমন কি এক বেলাও পূরা পেটে খাওয়াদাওয়া ঘটে না। এই ধরণের দৃষ্টান্ত বোধ হয় প্রত্যেক বিদেশী পর্য্যটকের অভিজ্ঞতায় দু' চারটা পড়িয়াছে।

পুরাণা ধনীরা লুপ্ত হইতেছে। তাহাদের ঠাঁইয়ে উঠিতেছে 'নয়া ধনী'। ইহারা অনেকেই ইহুদি। কিন্তু সকলেই ইহুদি, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। খাঁটি খ্রীষ্টান জার্ম্মাণ নরনারীরা নতুন নতুন শিল্প-ব্যবসায়ে লক্ষপতি হইতেছে। পুরাণাদের জায়গায় আসিয়া বসিতেছে নয়ারা। এক শ্রেণীর ঠাঁইয়ে দেখিতেছি অপর শ্রেণী।

শ্রেণী-বিপ্লব জগতের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। প্রত্যেক লড়াই এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাণা ধনীরা ধূলিসাৎ হয় আবার নয়া একজাত সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যাহারা ধনীলোক নামে পরিচিত, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষরা সকলেই ধনী ছিল কি? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে যে 'রাষ্ট্র-বিপ্লব' ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে "রামার ধন শ্যামা পাইয়াছে, পদার ধন পাইয়াছে যদু।"

জার্ম্মাণিতেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে অনেক বার। ১৯১৮-২২ সালেও আবার তাহাই ঘটিতেছে। তথাকথিত বোল্‌শেভিক-নীতি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা জাতি-বিশেষের একচেটিয়া আবিষ্কার নয়। ধনদৌলতের ওলটপালট, ধনীর দরিদ্র হওয়া আর দরিদ্রের ধনী হওয়া ঐতিহাসিক যুগ-পরম্পরার সনাতন ও মামুলি তথ্য।

এই উপায়েই জগতে সুখের সীমানা বাড়িয়া যাইতেছে।

শ্রেণীর লোক ঐশ্বর্য্য চাখিবার সুযোগ পাইতেছে। ঐশ্বর্য্য ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নয়া ধনীরা অর্থাৎ 'হঠাৎ বাবুরা' ক্রমে ক্রমে সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা-ভব্যতা, এক কথায় 'কুল্‌টুর' উপভোগ করিবার পথে অগ্রসর হইতেছে। জার্ম্মাণিতে সভ্যতা-বিকাশের ধারাটা হাতে হাতে পাকড়াও করা সম্ভব। পুরাণা ধনীরা অর্থাৎ আজকালকার কুল্‌টুরওয়ালারা অবশ্য কথায় কথায় 'নয়া ধনীদের' বর্ত্তমান কুল্টুর-হীনতা দেখিয়া স্বদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হা-হুতাশ করিতেছে। এইরূপ হা-হুতাশ করা ঠিক নয়। কেন না আজকালকার কুল্টুরওয়ালাদের ঠাকুরদাদারা হয়ত সে যুগে নির্ধন এবং কুল্টুরহীন ছিলেন,—আবার আজকালকার কুল্টুরহীন নয়া ধনীদের নাতী নাত্‌নীরা হয় ত বা এক গভীরতর কুল্টুরের স্তম্ভে পরিণত হইবে। তবে জীবনে যাহারা কখনো কষ্ট পায় নাই অথচ বর্ত্তমানে যাহাদিগকে দারিদ্র্য ভুগিতে হইতেছে, তাহারা ভবিষ্যনিষ্ঠার ভাবুকতায় কখনও মাতোয়ারা হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

য়েনা-মাহাত্ম্য

য়েনার মাঠে নেপোলিয়ান জার্ম্মাণ জাতির হাড় গুঁড়া করিয়া দিয়াছিলেন। সে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তাহার সাত বৎসর পরে—১৮১৩ সালে জার্ম্মাণরা ফরাসীদের দাসত্ব হইতে মুক্তি পায়। সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম উপলক্ষ্যে য়েনা যুবক জার্ম্মাণির কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। দার্শনিক-প্রবর ফিথ্‌টে ছিলেন যুবক জার্ম্মাণির আধ্যাত্মিক গুরু। য়েনার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা ছিল তখন ফিথ্‌টের কাজ।

জার্ম্মাণিতে আজকাল যৌবন-আন্দোলন চলিতেছে তুমুলভাবে। সেই সূত্রে ফিথ্‌টে আবার যুবক জার্ম্মাণির গুরুদেবে পরিণত হইয়াছেন। য়েনাকে যুবক জার্ম্মাণি আবার তীর্থক্ষেত্র সমঝিতেছে।

য়েনাকে ভুলিয়া থাকা জার্মাণ ভাবুকদের পক্ষে অসম্ভব। য়েনার আবহাওয়ায় বিদেশী পর্য্যটকরা জার্মাণ জাতির ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সবই এক সঙ্গে স্পর্শ করিবার সুযোগ পায়।

এইখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা উচিত। ১৯১৮-১৯ সালে নবীন জার্মাণ গণতন্ত্রের শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জার্মাণরা লড়াইয়ে হারিয়া যাওয়ার পর যখন স্বদেশের পুনর্গঠনের কথা ভাবিতে বাধ্য হয়, তখন ইহারা সদলবলে ছয় মাস ধরিয়া ভাইমারে আসিয়া আড্ডা গাড়ে। ভাইমারের প্রসিদ্ধ থিয়েটার-ভবনে দিনরাত সভার বৈঠক বসিত। সেই সকল বৈঠকেই বর্ত্তমানে জার্মাণির শাসনপ্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছে। 'ভাইমারার ফার্ফাস্সুঙ্' অর্থাৎ ভাইমারের শাসন-প্রণালী' নামে এই ব্যবস্থা জার্মাণ সমাজে প্রচারিত। গ্যেটে-শিলারের কর্ম্মক্ষেত্র আজও জার্মাণদের জীবনবত্তা পুষ্ট করিতেছে।

দশম অধ্যায়

সত্যাগ্রহের যুগে

(জানুয়ারি—সেপ্টেম্বর ১৯২৩)

ফরাসী-বেলজিয়ানদের রুর দখল

(১)

ফরাসীরা 'রুর' জনপদ দখল করিল। এসেন্‌ শহর এখন ইহাদের হাতে। প্রসিদ্ধ ক্রুপ কোম্পানীর লোহা ইস্পাতাদি সংক্রান্ত কারখানাগুলা এসেন্‌নে অবস্থিত। গোটা রুর অঞ্চলই জার্ম্মাণির সর্ব্ববৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। রুর, শহরের নাম নয়, দরিয়ার নাম।

জার্ম্মাণরা ফরাসীদের এই উৎপাত রুখিবার জন্য কি করিতেছে? কিছুই না। কিছুই করিবার ক্ষমতাও নাই। করিতেছে কেবল সভা-সমিতি, বাদ-প্রতিবাদ, বক্তৃতা, রাস্তায়-সড়কে মিছিল।

জার্ম্মাণ সরকার ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ইংল্যাণ্ডে টেলিগ্রাফ পাঠাইলেন। আমেরিকাতেও জার্ম্মাণির প্রতিবাদ জানানো হইল। ঐ পর্য্যন্তই! সভাসমিতিতে জার্ম্মাণ জননায়কগণ কিরূপ বক্তৃতা করিতেছেন? একটু নমুনা দিতেছি। ইহাঁদের স্বর এইরূপ—"দেশে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগকে তাড়াইব কি করিয়া? শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা কর্ম্ম করিবার জন্য প্রস্তুত হইব কি করিয়া? কামান গোলা বারুদ লইয়া নয়,—আত্মিকবল, নৈতিক শক্তি এবং অত্যাচার সহিবার ক্ষমতাই আমাদের একমাত্র অস্ত্রশস্ত্র। বন্দুক, তোপ, খাঁড়া, তলোয়ার লইয়া নয়—জাতীয় ঐক্যবুদ্ধি এবং স্বজাতি-প্রেমের সাহায্যেই আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হইব।"

(২)

জার্ম্মাণির আজকালকার অবস্থা দেখিয়া ভারতবর্ষের দুর্দ্দশাই হাজার বার মনে পড়িতেছে। যখন অমৃতসরের অত্যাচার ঘটিতেছিল, যখন সশস্ত্র ফৌজ ও পুলিশের দৌরাত্ম্যে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্য্যাতিত হইতেছিল, তখন ভারতের জননায়কগণ ঠিক আজকালকার জার্ম্মাণদের মতনই নৈরাশ্যসূচক আত্মিক বল এবং আধ্যাত্মিক শক্তির দোহাই দিতেছিলেন। তখন আমাদের জননায়কগণও ভারত-সন্তানকে ঐক্যবদ্ধ হইবার উপদেশ দিতেছিলেন মাত্র।

অর্থাৎ জার্ম্মাণ চরিত্রে আর ভারতীয় চরিত্রে—পশ্চিমে ও পূর্ব্বে—সাদা চামড়ায় ও কাল চামড়ায় কোনো প্রভেদ নাই। জার্ম্মাণি আজ নিরস্ত্র, জার্ম্মাণদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র নাই; কাজেই লড়াইএর কথা মুখে আনিলে দুনিয়ার লোক জার্ম্মাণিকে পাগল বলিবে। এই জন্যই জার্ম্মাণির একমাত্র সম্বল প্রতিবাদসভা, বক্তৃতা, ধর্ম্মোপদেশ, নৈতিক উন্নতি এবং গান্ধিপ্রচারিত অধ্যাত্ম-তত্ত্বের মাসতুত ভাই!

শক্তিমান্ পুরুষ কখনো এইরূপ আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেয় না। জার্ম্মাণদের যতদিন শক্তি ছিল তখন তাহারা এইরূপ ধর্ম্মের গর্ত্তে পড়িয়া হা-হুতাশ করে নাই। আজ দায়ে পড়িয়া কাহিনীর শিয়ালের মতন আঙ্গুরফলকে খাট্টা না বলিয়া জার্ম্মাণদের উপায় নাই।

(৩)

জার্ম্মাণরা যতই নিরস্ত্র হউক না কেন, আজ যদি ফ্রান্স অথবা বেলজিয়ামকে একা পায়, তাহা হইলে ইহারা এই দুই জাতের লড়াইএর সাধ মিটাইয়া দিতে পারে। কিন্তু জার্ম্মাণি ইংল্যণ্ডকে এখনও ফ্রান্স

ইতালী এখনও এই দুই দেশের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। কাজেই জার্ম্মাণি অতি শীঘ্র তাহার হাত দেখাইতে রাজী নয়।

জার্ম্মাণরা এখনি যদি লড়াইয়ের একটা উদ্যোগ করিয়া বসে তাহা হইলে ইংল্যণ্ড, ইতালী, আমেরিকা, এবং জাপান (লড়াইয়ের মিত্র রাষ্ট্রগুলা) জার্ম্মাণির উপর চাপিয়া বসিবে। এই জন্য জার্ম্মাণিকে অতি সাবধানে চলিতে হইতেছে।

তবে একটা মজার কথা। যুদ্ধের সময় কাহারও কাহারও টাকা খাইয়া পৃথিবীর সকল জাতিই জার্ম্মাণ জাতির বিরুদ্ধে লোকমত তৈরী করিয়াছিল। সেই প্রপাগাণ্ডার প্রভাবে জার্ম্মাণজাতি অসভ্য, বর্ব্বর, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ইত্যাদিরূপে সর্ব্বত্র চিত্রিত হইয়াছিল। সেই দুর্ণাম কাটাইয়া উঠিতে জার্ম্মাণির অনেক দিন লাগিবে।

কিন্তু লড়াই থামিবার পর হইতে লড়াইয়ের সময়কার জার্ম্মাণির শত্রুরাই ফরাসী জাতির বিরুদ্ধে জগতের সর্ব্বত্র লোকমত তৈরী করিতেছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণি-সংক্রান্ত কাজকর্ম্মে দুনিয়ার লোক ফ্রান্সকে নেহাৎ অত্যাচারী, জুলুমপ্রিয় এবং লড়াইপ্রেমিক বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। ফলতঃ জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যে দুর্ণাম রটিয়াছিল, সেই দুর্ণাম বৎসর দু'এক ধরিয়া ফ্রান্সের নামে রটিতে সুরু করিয়াছে। ইহাতে দুনিয়ায় জার্ম্মাণির ইজ্জত কিছু কিছু বাড়িতেছে।

(৪)

বস্তুতঃ রুর অঞ্চলকে কব্জায় রাখিয়া ফ্রান্স কোন দিকেই লাভবান্ হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এই জনপদে কয়লার খনি এবং শিল্প-কারখানার সংখ্যা এত বেশী যে, এইগুলা তদারক করিতে অনেক এঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। সেই সব এঞ্জিনিয়ার ফ্রান্সকে আনিতে হইবে স্বদেশ হইতে। তাহার ফলে ফ্রান্সের স্বদেশী রেলকোম্পানী, খনি

অধিকন্তু, মার্কের দর হুহু করিয়া নামিতেছে। এক পাউণ্ডে আজ পঞ্চাশ হাজার মার্ক্। ইহাতে ফ্রান্সের লাভ কিছুই নাই। বরং ক্ষতি। কেন না ফরাসীরা জার্ম্মাণিতে সস্তায় মাল কিনিতে ছুটিতেছে। ফলতঃ ফরাসী কারখানার কাজ কমিবে।

মার্কের দর কমিয়া যাওয়ায় জার্ম্মাণির একটা মস্ত লাভ আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণ নরনারীর নিকট যত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল, সেগুলির দাম আজকাল নিতান্ত নগণ্য। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট একে একে সেই সকল দেনা শুধিয়া ফেলিতেছে। অল্পকালের ভিতর জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের আর কোনো আভ্যন্তরীণ ঋণ থাকিবে না। তাহার ফলে ভবিষ্যতের লড়াইয়ের পক্ষে জার্ম্মাণির অনেক স্থবিধা জুটিবে।

(৫)

ফরাসী গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণিকে জানাইয়াছেন :—"তোমাদের নিকট গত বৎসর আমরা যত কয়লা ও যত কাঠ পাইব আশা করিয়াছিলাম তত কয়লা ও কাঠ পাই নাই। এই জন্য রুর দখল করিতেছি।"

জার্ম্মাণরা বলিতেছে :—"ভার্সাইয়ের সন্ধি অনুসারে এই জন্য রুর দখল করার এক্তিয়ার নাই। রুর দখল করিয়া ফ্রান্স বাস্তবিক পক্ষে ভার্সাই সন্ধিটা ছিঁড়িয়া ফেলিল।"

সাধারণ সময়ে কোনো জাতি এইরূপে একটা দেশ দখল করিলে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই করা হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে জার্ম্মাণি ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া চলিতেছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ

জার্ম্মাণদের সত্যাগ্রহ

(১)

রুর অঞ্চলে ফরাসী ফৌজ লড়াই-এর সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ফ্রান্সের সরকারী হিসাবে ফৌজসংখ্যা পঁয়তাল্লিশ হাজার। কিন্তু মার্কিন কাগজে প্রকাশ যে, ফরাসীরা দুই লাখ শিপাহী লইয়া আসিয়াছে। নিরেট সংখ্যা জানিবার জো নাই।

জার্ম্মাণরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে এখনো কোন প্রকার সশস্ত্র বিরোধ দেখাইতেছে না। ইহারা চালাইতেছে 'সত্যাগ্রহ'। সারা জার্ম্মাণি জুড়িয়া সত্যাগ্রহের আন্দোলন চলিতেছে। অস্ত্রহীন জাতির পক্ষে সর্ব্ব প্রথমে সত্যাগ্রহের লড়াই সুরু করাই যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে আর কোনো লাভ হউক বা না হউক, শত্রুর বিরুদ্ধে দেশের লোক ক্ষেপিয়া উঠে। জার্ম্মাণ কারখানার মালিক, এঞ্জিনিয়ার, পরিচালকগণের নিকট উপস্থিত হইয়া ফরাসী সেনাপতিরা বলিলেন—"কারখানার টাকা-পয়সা কাগজ-পত্র সব আমাদের হাতে বুঝাইয়া দাও"। জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে জবাব, "রুর অঞ্চল জার্ম্মাণির এক প্রদেশ। আমরা জার্ম্মাণ সরকারের হুকুম তামিল করিতে বাধ্য। ফরাসী ফৌজের শাসন আমরা স্বীকার করি না।"

এই ধরণের জবাব পাইতেছে ফরাসীরা রুর প্রদেশের প্রত্যেক শহরে ও পল্লীতে। জার্ম্মাণরা ফরাসীদিগকে রাস্তা দেখাইয়া দেয় না, কারখানার কাজ বুঝাইয়া দেয় না। ফরাসীদের হুকুমে মজুরেরা কাজ করে না, ফরাসী পল্টনের চোখ রাঙানীতে রুর অঞ্চলের জার্ম্মাণরা বিচলিত হইতেছে না। কাজেই ফরাসী গবর্মেণ্ট বিব্রত।

(২)

ফরাসী সেনাপতি এক বড় নগরের কর্ত্তাকে হুকুম করিয়াছিলেন :—

"অমুক সময়ে তুমি আমার সঙ্গে অমুক স্থানে মোলাকাত করিতে আসিও।" শাসনকর্ত্তা জবাব পাঠাইলেন:—"আমি আমার নিজ আফিসের বাহিরে কোনো লোকের সহিত দেখা করিতে অভ্যস্ত নই। দরকার হইলে তুমি আমার এজলাসে আসিয়া দেখা করিও।"

জার্ম্মাণরা কয়লা দেয় নাই বলিয়া ফ্রান্স রুর অঞ্চলে অভিযান পাঠাইয়াছে। কাজেই কয়লার কারখানার এঞ্জিনিয়ার ও পরি-পরিচালকদের উপর ফরাসী ফৌজের জুলুম বেশী।

কারখানার পরিচালকেরা বলিতেছেন:—"কারখানাগুলা জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের সম্পত্তি নয়। এই সব সাধারণ জার্ম্মাণ প্রজাদের যৌথ কারবার। আমরা জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টকে কয়লা বেচিতাম। সেই কয়লা ফ্রান্সে পাঠানো হইত। কিন্তু রুর অঞ্চল দখল করিয়া ফ্রান্স ভার্সাই সন্ধি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। কাজেই জার্ম্মাণি ফ্রান্সকে আর কয়লা দিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট আমাদিগকে তাহাদের নয়া হুকুম না জানান, ততদিন আমরা কারখানা হইতে এক বস্তা কয়লাও ফ্রান্সে পাঠাইব না।"

ফরাসীরা প্রত্যেক কারখানার প্রত্যেক পরিচালকের নিকট এইরূপ অপমানিত হইতেছে। গোটা জার্ম্মাণির নরনারী রুর অঞ্চলের কারখানা-পরিচালকদের স্বদেশভক্তি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার তারিফ করিতেছে।

(৩)

ফরাসীরা কর্ত্তব্য ঠাওর করিতে পারিতেছে না। ইহারা একে একে কয়লার খনিগুলা ফৌজ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিতেছে। কারখানার পরিচালকগণকে জেলে পাঠানো হইয়াছে। জার্ম্মাণির কয়েকজন লক্ষপতি এঞ্জিনিয়ার কয়েদ হইয়াছে। তাহাদের আপন বাড়ী ঘর এবং পরিবারের উপরও পাহারা ও জুলুম চলিতেছে।

রুর অঞ্চলে বড় বড় ব্যাঙ্কগুলার ভিতর প্রবেশ করিয়া ফরাসী ফৌজ টাকাকড়ি বাজেয়াপ্ত করিতেছে। কর্ম্মচারীরা সবাই নজরবন্দী বা কয়েদী।

টাকা লুটিলে অথবা কারখানার পরিচালকদিগকে জেলে দিলে কি হইবে? খনিতে কাজ পরিদর্শন করিবে কাহারা? জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ারেরা খনির নক্‌সা, মানচিত্র ইত্যাদি কিছুই ফরাসীদের হাতে দিতেছে না। মজুরেরাও ধর্ম্মঘট সুরু করিতেছে, ফলতঃ যে কয়লার লোভে ফরাসীরা রুরে আসিয়াছে, সেই কয়লালাভের পথ মারা গিয়াছে।

এ দিকে কোনো কোনো শহরে দু'একজন জার্ম্মাণ যুবার উপর ফরাসীরা গুলি চালাইয়াছে। তাহাতে প্রাণনাশও হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহু লোক জখম হইয়াছে। জার্ম্মাণ-গবর্মেণ্ট এবং জার্ম্মাণির অন্যান্য শহরের লোকেরা এক্ষণে রুর প্রদেশের নির্য্যাতিত স্বদেশ-সেবকগণকে দৃঢ়ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করিতেছে না। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিলাতে ও আমেরিকায় প্রতিবাদ অবশ্য যথারীতি পাঠান হইতেছে।

(৪)

জার্ম্মাণির বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়দলগুলা ঐক্যবদ্ধ হইতেছে। মজুর ও ধনী দুই সম্প্রদায়ই ফ্রান্সের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে। এই ঐক্য ইংল্যণ্ড এবং ফ্রান্স আশা করে নাই।

ফরাসীরা ভাবিয়াছিল:—"ভার্সাই সন্ধির পর প্রথম চার বৎসর জার্ম্মাণি আঁতাতের প্রত্যেক হুকুম তামিল করিয়া চলিয়াছে। বিশেষতঃ মন্ত্রী ভির্ট সর্ব্বদা ইংল্যণ্ড ও ফ্রান্সের সকল কথায় সায় দিয়াছেন। কাজেই জার্ম্মাণরা নেহাৎ কাবু হইয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে চাপিয়া ধরিলে এখনো অনেক কিছু করানো সম্ভব।"

কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে মন্ত্রী

চাঙ্গা করিয়া তুলিতেছেন। কথায় কথায় আঁতাঁতকে 'যো হুকুম' বলিয়া সেলাম করার বিরুদ্ধে কুনোর গবর্মেণ্ট সচেষ্ট আছেন। ফ্রান্সের বেআইনী রুর-দখল কাণ্ডকে ইঁহারা লড়াইয়ের সূত্রপাত বিবেচনা করিতেছেন। ভার্সাই সন্ধি রদ হইয়া গিয়াছে—এইরূপ মত পর্য্যন্ত ইঁহারা জোরের সহিত দুনিয়াকে জানাইতেছেন।

কুনোর দলের ভরসা পাইয়াই রুর প্রদেশের নগরশাসক, ব্যাঙ্কার, কারখানা-পরিচালক, এঞ্জিনিয়ার এবং মজুরেরা ফ্রান্সকে ডরাইতেছে না। সত্যাগ্রহের লড়াই চালাইবার জন্য কুনো স্বয়ংই সম্প্রতি জার্ম্মাণির গান্ধিস্বরূপ জার্ম্মাণসমাজে আত্মবিশ্বাস এবং সৎসাহস ছড়াইতেছেন।

জার্ম্মাণির কাগজে কাগজে শক্তির কথা, সাহসের কথা, আশার কথা আলোচিত হইতেছে। বিগত চার বৎসরের নৈরাশ্য, দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা সমাজ হইতে লোপ পাইয়াছে। ১৯২৩ সালে যুবক জার্ম্মাণি জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া ছাড়িবে মনে হইতেছে। ইংল্যাণ্ড আবার দুর্ভাবনায় পড়িল।

(৫)

জার্ম্মাণিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পুরাদমে সত্যাগ্রহের লড়াই চলিতেছে। ফরাসীরা রুর অঞ্চলের সকল প্রকার নামজাদা লোককে জেলে দিতেছে। কয়েদখানায় অনেক নির্য্যাতন করা হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও জার্ম্মাণরা কোন মতেই ফরাসীদের হুকুম তামিল করিতেছে না।

গোটা জার্ম্মাণির নরনারী রুরের জার্ম্মাণদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কোটি কোটি মার্ক্ সংগ্রহ করিয়াছে। রুর অঞ্চলের মজুরেরা হরতাল চালাইতেছে। তাহাদের পরিবারদিগকে প্রতিপালন করাই এই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য। জার্ম্মাণির প্রত্যেক নগরের মজুরসঙ্ঘ নিজ নিজ আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ চাঁদা দিতেছে।

ধনী, মহাজন, ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরাও সাহায্য পাঠাইতেছে। খবরের কাগজের সম্পাদকগণ রুর সাহায্যের জন্য ফাণ্ড খুলিয়াছেন। জার্ম্মাণ রিপাব্লিকের পররাষ্ট্র-সচিব কুনো স্বয়ং এই সকল রিলীফ ফাণ্ডের প্রধান উদ্‌যোগী।

অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মাণরা টাকা পাঠাইতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার জার্ম্মাণদের নিকট হইতে টাকা আসিতেছে। সুইডেন, হল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের 'নিরপেক্ষ' ধনী মহাজনেরাও টাকা দিতেছে।

ফরাসীদের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণরা এখনও অস্ত্রধারণ করে নাই। কিন্তু জার্ম্মাণ-সমাজের সর্ব্বত্র লড়াইয়ের মেজাজ তৈরী হইয়া রহিয়াছে। জার্ম্মাণিতে নয়া জীবনের উৎসাহ, কর্ম্মতৎপরতা দেখা যাইতেছে। চার বৎসর পর জার্ম্মাণরা মানুষের মতন কথাবার্ত্তা বলিতেছে। খবরের কাগজের সুর আজকাল বেশ গরম। মন্ত্রী কুনোর আমলে এই নবযুগ সুরু হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণরা কুনোকে বিশেষ খাতির করিতেছে।

ইংরেজের লাভালাভ

(১)

আমেরিকা হইতে খবর আসিয়াছে যে, ফরাসীদের বিরুদ্ধে মার্কিন জাতির লোকমত আজকাল বেশ পাকাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণির সপক্ষে মার্কিন নরনারী এখনো খোলাখুলিভাবে বেশী হৃদ্যতা দেখাইতেছে না। জার্ম্মাণিকে নিন্দা করিবার জন্য বহুদল এখনো আমেরিকায় মজুত আছে। এই সকল দল প্রধানতঃ বিদেশীদের টাকায় প্রতিপালিত হয়। মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে আমেরিকাকে এতদূর ক্ষেপান হইয়াছিল যে, মার্কিনদের মাথা ঠাণ্ডা হইতে এখনও অনেক দেরী আছে।

জার্ম্মাণরা এই জন্য এখনো অনেক দিন ফরাসীদের নির্য্যাতন সহ্য করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিতেছে। এখনই সশস্ত্র লড়াই সুরু করিলে জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে পুনরায় মার্কিন মত প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিবে।

অধিকন্তু ইংরেজ এখনো ফরাসীর সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করিয়াই চলিতেছে। জার্ম্মাণিকে সাহায্য করিবার কথা অথবা ফ্রান্সকে বাধা দিবার কথা কোনো ইংরেজদলেই দেখা যাইতেছে না।

বিশেষতঃ রুর অঞ্চল জার্ম্মাণির হাত ছাড়া হওয়াতে ইংরেজের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। জার্ম্মাণরা বিলাতী কয়লা কিনিতে বাধ্য হইতেছে। জার্ম্মাণদের লোহার কারখানা এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরিগুলা ফরাসীরা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। তাহাতে জার্ম্মাণির শিল্পসম্পদ্ কমিবে।

কাজেই জার্ম্মাণরা দুনিয়ার বাজারে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে না। বরং জার্ম্মাণিই কোনো কোনো জিনিষ বিলাতে খরিদ করিতে বাধ্য হইবে। এই সব বুঝিয়া শুনিয়াই ইংরেজরা ফরাসীকে স্বাধীনভাবে রুর দখল করিবার অধিকার দিয়াছে।

অপর দিকে ফরাসীরাও ইংরেজকে আঙ্গোরার তুর্কের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ চালাইবার এক্তিয়ার দিয়াছে। তুরস্ককে হঠাইতে পারিলে ইংরেজ এসিয়াকে কিছু দিনের জন্য জব্দ করিতে পারিবে। এসিয়াকে নিজের তাঁবে রাখিবার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড ইয়োরোপকে কিছুকালের জন্য ফ্রান্সের এক্তিয়ারে ছাড়িয়া দিতে রাজী। রুর-কাণ্ডে আঙ্গোরার কথাটা মনে রাখা আবশ্যক।

(২)

ইংরেজ বেশ জানে যে, ফ্রান্স একাকী জার্ম্মাণিকে জব্দ করিতে পারিবে না. রুর হাঙ্গামায় ফ্রান্সের ক্ষতি হইবে যথেষ্ট, টাকা লোকসান

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জগতের সকল জাতির লোকমত তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

তাহার ফলে জার্ম্মাণির উপকার হউক বা না হউক, ফরাসী জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এবং গৌণভাবে জগতে ইংরেজের সুযোগ বাড়িতে থাকিবে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের 'জুর্ণাল দ' জেনেভ' কাগজ চিরকাল ফ্রান্সের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সের রুর-কাণ্ড উপলক্ষে এই কাগজেও ফ্রান্সের বিপক্ষে কথা বলা হইয়াছে।

সম্পাদক লিখিয়াছেন:—"যুদ্ধের সময়েও শত্রুপক্ষীয় সরকারী সম্পত্তি ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা উচিত নয়। ফরাসী গবর্মেণ্ট সর্ব্বদা এই মত প্রচার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ফরাসী পল্টন বেসরকারী জার্ম্মাণ কারখানাগুলা দখল করিল কোন্ আইন অনুসারে?"

সুইডেনের 'ষ্টকহলম্ ডাস্ ব্লাডেট' অতি কড়াভাবে বলিতেছেন:— "জগতে সকল সভ্য জাতিই ফরাসীদের পাশবিক কাণ্ডে শিহরিয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীতে কি এমন কোন লোক নাই, যাহারা ফ্রান্সের এই রক্তপিপাসা মিটাইয়া দিতে পারে? ফ্রান্সের নৃশংস বর্ব্বর গবর্মেণ্টকে ধ্বংস করিয়া ফরাসী নরনারীকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবার জন্য জগতের লোক দলবদ্ধ হউক। ভার্সাই সন্ধিটা পুড়াইয়া না ফেলিলে ফরাসী-সমাজের চিত্তশুদ্ধি সম্ভব হইবে না।"

জার্ম্মাণির জাগরণ

(১)

হল্যাণ্ডের কাগজে কাগজে জার্ম্মাণ সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। রটার্ডামের 'নিউভে রটার্ডামশে কুরাণ্ট' দৈনিকের সংবাদদাতা বার্লিন হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। তিনি জার্ম্মাণ

রিপাব্লিকের পররাষ্ট্রসচিব শ্রীযুক্ত কুনোর সহিত সম্প্রতি এক মোলাকাতের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

কুনোর বক্তব্য বার্লিনের কাগজে কাগজে ছাপা হইয়াছে। সচিব মহাশয়ের কথার ভিতর ভারতীয় সত্যাগ্রহের সকল তত্ত্বই মজুত দেখিতে পাই। প্রকৃত পক্ষে জার্ম্মাণির সকল লেখক, কর্ম্মচারী, সেনাপতি, কারখানা-পরিচালকের মুখেই এই কথা,—প্রাণপণে সত্যাগ্রহ।

সেদিন নিউইয়র্কে 'নেশুন' সাপ্তাহিকের সম্পাদক লিখিয়াছেন—"জার্ম্মাণিতে এক্ষণে একজন জার্ম্মাণ গান্ধির দরকার।" বস্তুতঃ জার্ম্মাণির সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই আজকাল গান্ধি-প্রণালী বিরাজ করিতেছে। লোকেরা বুঝিতেছে যে, পরাধীন ও নিরস্ত্রদেশ সমূহে সত্যাগ্রহই প্রধান অস্ত্র সন্দেহ নাই,—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য।

(২)

ভির্টের আমলে জার্ম্মাণ নরনারী নেহাৎ মরিয়া রহিয়াছিল। ভির্ট আঁতাঁতের প্রত্যেক হুকুম তামিল করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। আঁতাঁতের চোখরাঙ্গানী দেখিবামাত্র, জার্ম্মাণরা কাবু হইয়া পড়িত। জার্ম্মাণ গবর্মেন্টের ভীরুতার জন্যই জার্ম্মাণ জাতি পদে পদে অপমানিত হইতেছিল।

ইতিমধ্যে গতবৎসরের শেষার্দ্ধে যুবক তুর্কের বিজয়লাভে ইংল্যাণ্ড ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেভর্ সন্ধি কাগজ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। দুনিয়ায় নব যুগ আসিয়াছে। এশিয়ার জাগরণ দেখিয়া জার্ম্মাণরা কামাল পাশাকে তারিফ করিতেছিল আর ভাবিতেছিল:—"আঙ্গোরার মুসলমানরা যদি আঁতাঁতকে জব্দ করিতে সমর্থ হইল, তাহা হইলে জার্ম্মাণরাই বা ভার্সাইসন্ধিকে পুড়াইয়া ফেলিতে পারিবে না কেন?"

এইরূপ চিন্তা মাস চারপাঁচেক ধরিয়া জার্ম্মাণির স্বদেশ-সেবক

মহলে, বিশেষতঃ যুবক জার্ম্মাণির কেন্দ্রে কেন্দ্রে দেখা দিয়াছিল। আঁতাঁতের হুকুম অগ্রাহ্য করিবার জন্য যুবক জার্ম্মাণি চিত্ত প্রস্তুত করিতেছিল। এই আবহাওয়ায় ভির্টকে পররাষ্ট্রসচিবের পদ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং কুনোকে এক নয়া মন্ত্রী-পরিষদ কায়েম করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

মন্ত্রী কুনোর কার্য্যপ্রণালী

(১)

'ড্যয়চে আলগেমাইনে ৎসাইটুঙ' কাগজে পড়িতেছি, কুনো রটার্ডামের সংবাদদাতাকে বলিয়াছেনঃ—"আমি মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিবার সময়েই জার্ম্মাণির সকল প্রকার কঠিন সমস্যার বিষয় অবগত ছিলাম। ফ্রান্সের সঙ্গে সমঝৌতা কায়েম করিবার জন্য জার্ম্মাণি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। ব্যবসার তরফ হইতে যাহাতে ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণি এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।"

"জার্ম্মাণির সকল বড় বড় কারখানার মালিকেরা আমার কার্য্য প্রণালী পছন্দ করিয়াছেন। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট আমার মত স্বীকার করিয়া লইয়া ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণের টাকা বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই সকল কথা আমি শ্রীযুক্ত পঁয়কারেকে নানা উপায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।"

"কিন্তু সমঝৌতার পথ ছাড়িয়া দিয়া ফ্রান্স লাঠালাঠি ও অস্ত্র-শস্ত্রের পথ বাছিয়া লইল। যে মুহূর্ত্তে ফরাসীরা রুর মুলুকে পল্টন বসাইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই জার্ম্মাণির কার্য্যপ্রণালী নয়া পথে চলিতে বাধ্য হইয়াছে। আমরা অস্ত্রহীন বিরোধ-নীতি অবলম্বন করিয়াছি। এই সত্যাগ্রহের পথে জার্ম্মাণির গবর্মেণ্ট এবং সমগ্র জার্ম্মাণ সমাজ

চলিবার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে মত প্রকাশ করিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমরা ফরাসী পল্টনের দৌরাত্ম্যে ও অত্যাচারে যারপর-নাই পীড়িত হইতেছি। কিন্তু তাহার ফলে আমাদের নিরস্ত্র লড়াইয়ের আন্দোলন বিশেষরূপেই বাড়িয়া যাইতেছে।"

(২)

"জার্ম্মাণরা এইরূপ পাশবিক অত্যাচার ও নিদারুণ যন্ত্রণা সহিবার জন্য কেন এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল ?"

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া কুনো বলিতেছেন যে, "জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট সমঝোতার পথে চলিবার জন্য ফ্রান্সকে হাজার বার অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। ফ্রান্স সেই পথে চলিতে একদম নারাজ। কাজেই জার্ম্মাণদের পক্ষে অন্য কোন পথ খোলা নাই। জার্ম্মাণরা ফ্রান্সের নৃশংস অত্যাচার মাথায় বহিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে! ফরাসীদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আমরা আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও স্বার্থত্যাগের সাধনা লোহার মত শক্ত করিয়াছি।"

"আমরা কোন মতেই সশস্ত্র বিরোধ করিব না। অস্ত্রশস্ত্র আমাদের একরকম নাই। যদি সামান্য মাত্র সশস্ত্র বিরোধ করিবার চিহ্ন দেখাই, তাহা হইলে ফ্রান্স তাহার গোলাগুলি, বন্দুক, কামান ইত্যাদি লড়াইয়ের সরঞ্জাম ষোল আনা ব্যবহার করিবে। কিন্তু পুরাপুরি লড়াই চালাইবার ক্ষমতা এখন আমাদের নাই। তাহা হইলে অতি সহজেই ফ্রান্স জার্ম্মাণিকে পিষিয়া ফেলিতে পারিবে। সুতরাং আমাদের পক্ষে লড়াইয়ের একমাত্র পথ খোলা আছে,—সেই পথ নিরস্ত্র সত্যাগ্রহ।"

(৩)

"সত্যাগ্রহ লড়াই চালাইবার জন্য জার্ম্মাণিতে কোন্ কোন্ উপায়

অবলম্বন করে তাহার উপর জার্ম্মাণ সত্যাগ্রহীদের কলকৌশল নির্ভর করিবে। প্রত্যেক আত্মরক্ষার লড়াইয়েই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আগে শত্রুদের কার্য্যপ্রণালী দেখা হয়। তাহার পর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

কুনো বলিয়াছেন ঃ—"আমরা এই আত্মরক্ষার লড়াই কোন মতেই ছাড়িয়া দিব না। 'যায় প্রাণ থাকে মান' এই বুঝিয়া আমরা স্বদেশের ইজ্জত রাখিতে লাগিয়া গিয়াছি। ফরাসীরা যত বেশী তাহাদের কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা বাড়াইবে, তত বেশী আমরা আমাদের সত্যাগ্রহের সীমানা বাড়াইয়া চলিব। ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করাই যদি বাস্তবিক পক্ষে ফরাসীদের উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে আমাদের নিরস্ত্র লড়াইয়ের ফলে ইহারা কখনো ইহাদের মতলব হাসিল করিতে পারিবে না।"

(৪)

ফরাসীরা রুর দখল করিয়া ফ্রান্সের শাসনে আনিলে জার্ম্মাণির যথেষ্ট ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জার্ম্মাণরা যদি এখন বিনা বিরোধে রুর মুল্লুকটা ফ্রান্সের হাতে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণির ক্ষতি কিছু কম হইবে কি? ক্ষতি দুই ক্ষেত্রেই সমান (সত্যাগ্রহে লোকসান বেশী নয়)। কাজেই জার্ম্মাণেরা বিনা বাক্যব্যয়ে রুর জনপদকে ফরাসীদের গোলাম হইতে দিবে না।

কুনো বলিতেছেন ঃ—"নিরস্ত্র লড়ায়ের দ্বারা আমরা রুর প্রদেশকে ফ্রান্সের গোলামী হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছি। জার্ম্মাণরা বেশ বুঝিয়াছে যে, সত্যাগ্রহের শেষ সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া সশস্ত্র শত্রুদিগকে কাবু করিতে অগ্রসর হওয়া প্রত্যেক জার্ম্মাণের স্বধর্ম্ম।

"আমরা বিশেষ সাবধানে এই লড়াই চালাইব। পয়কারেকে" অতি সহজে এই

কারখানার পরিচালক এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা স্বার্থত্যাগের দ্বারা যে লড়াই সুরু করিয়াছে, সেই লড়াই যাহাতে নিষ্ফল না হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক জার্ম্মাণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবে।”

সিনেমা-শিল্পে লোক-শিক্ষা

(১)

জার্ম্মাণির সিনেমা (কিনো)-থিয়েটারগুলায় আজ-কাল অতি উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ‘ফিল্ম্’ দেখানো হইতেছে। ভিয়েনার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ষ্টাইনাক মানুষের যৌবন বাড়াইয়া দিবার এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। বহুদিন হইতে তাঁহার ল্যাবরেটারিতে এইদিকে পরীক্ষা চলিতেছিল। এই পরীক্ষাগুলা আলোক-চিত্রের সাহায্যে জনসাধারণের গোচর করা হইতেছে।

অস্ত্রচিকিৎসা, শরীরবিদ্যা, অস্থিতত্ত্ব এবং পশুবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরীক্ষাগৃহের ভিতরকার জটিলতাগুলা বেশ বিশেষরূপেই অবগত আছেন। সেইগুলার ছবি তোলা এবং ছবি তুলিয়া নাটকের আকারে প্রচার করা যার-পর-নাই বাহাদুরির কথা সন্দেহ নাই।

ষ্টাইনাকের যৌবন-বৃদ্ধি-প্রণালী দেখিতে আসিয়া জার্ম্মাণ নরনারীরা জীবজন্তুর জীবন-গঠনরীতি সহজেই বুঝিতে পারিতেছে। বুড়া পশুগুলাকে নেহাৎ অকর্ম্মণ্য অবস্থা হইতে কেমন করিয়া চাঙ্গা করিয়া তোলা হইয়াছে, তাহার সচিত্র বিবরণ অতি সরলভাবে বুঝানো হইতেছে। কয়েকজন মানুষও ষ্টাইনাকের অস্ত্রচিকিৎসার প্রভাবে সুফল লাভ করিয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা কিরূপে আবার যৌবনের শক্তি ও স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে ফিরিয়া পাইয়াছে তাহাও

ফিল্‌ম-শিল্পের আলোকচিত্রের সাহায্যে এতদিন জগতের সর্ব্বত্র নানাদেশের প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক এবং সামাজিক দৃশ্য দেখানো হইতেছিল। জনসাধারণের ভিতর শিক্ষাপ্রচারের কাজে সিনেমা-থিয়েটার অনেক সাহায্য করিয়াছে। এক্ষণে উচ্চতম এবং দুরূহতম বিজ্ঞানের অনুসন্ধানগুলাও 'রাস্তার লোকের' সেবায় লাগিতে চলিল। অধিকন্তু ইস্কুল-কলেজের ল্যাবরেটারিতে যে-সকল ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান শিখিতেছে, তাহাদের পক্ষে সিনেমার চিত্রগুলা পরম সুহৃৎ বিবেচিত হইবে।

(২)

রাইন-জনপদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ একে একে জার্ম্মাণদের হাতছাড়া হইতেছে। রুর অঞ্চল জার্ম্মাণরা কবে ফিরাইয়া পাইবে কে বলিতে পারে? এদিকে সম্প্রতি আবার দক্ষিণ রাইনের উপরকার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ শিল্প-নগর এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র মান্‌হাইম্‌ ইত্যাদি শহরও বিজেতাদের দখলে আসিল।

কাজেই জার্ম্মাণ-সমাজে রাইন-প্রেম জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সিনেমা-শিল্পের সাহায্যে আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে সেই আগুন আরও জ্বালাইয়া তোলা হইতেছে। আলোক-চিত্রে জার্ম্মাণরা জার্ম্মাণির পুরাণা ইতিহাস দেখিতেছে। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে জার্ম্মাণরা কোথায় কিরূপ ভাবে বাস করিতেছিল, তাহার চিত্রও প্রদত্ত হইতেছে। তাহার পর, যুগে যুগে রাইন-দরিয়ার আশেপাশে জার্ম্মাণ ও বিদেশী সভ্যতার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। সেই সংঘর্ষগুলাও দেখানো হইতেছে।

গ্যেটের সামসময়িক, বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক আর্ণ্‌ট্‌ শিখাইয়া গিয়াছিলেন—"রাইন্‌ জার্ম্মাণির একটা সীমানামাত্র নয়। এই দরিয়া জার্ম্মাণ সভ্যতার এক নাড়ী-বিশেষ। ইহার দুইধারকার

সুদূর-বিস্তৃত জনপদগুলি সবই জার্ম্মাণ জাতির জীবন-কেন্দ্র।" এই-সকল দৃশ্য দেখাইবার সময় 'স্বদেশী গান' গাওয়া হইয়া থাকে।

রাইন-ফিল্‌মে ঐতিহাসিক তথ্যই একমাত্র দৃশ্য বস্তু নয়। আল্পস্ পাহাড়ে রাইনের উৎপত্তি, পরে জার্ম্মাণিতে পতন এবং হল্যাণ্ডে মোহনা ইত্যাদি ভূগোল এবং ভূতত্ত্বের অনেক কথাই আলোকচিত্রে আলোচিত হইতেছে। অধিকন্তু রাইনের উপরকার প্রত্যেক শহরের ফ্যাক্‌টরি, বন্দর, শিল্পসম্পদ্, বিদ্যাগৌরব সবই চক্ষুগোচর হইতেছে। স্বদেশপ্রীতি জাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা-শিল্পীরা জনগণের জ্ঞানের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন।

(৩)

কিনো-থিয়েটারগুলায় একসঙ্গে বহুবিধ সুকুমার শিল্পের সমাবেশ আবশ্যক। ভেনীস্ শহরের ইহুদি শাইলকের গল্প সিনেমায় দেখাইবার জন্য এক জার্ম্মাণ ফিল্‌ম্-কোম্পানী আয়োজন করিতেছে।

শাইলক সম্বন্ধে ইতালীতে, ফ্রান্সে এবং ইংল্যণ্ডে যে-সমুদয় কাহিনী অথবা নাটক আছে, সেইগুলা হইতে মিলাইয়া মিশাইয়া একটা নাটক খাড়া করিবার জন্য কবি ও নাট্যকার বাহাল হইয়াছেন। এই গেল সাহিত্য-শিল্পের কাণ্ড।

পরে এই নাটকটাকে থিয়েটারে অভিনয় করা হইবে। তাহার জন্য একটা রঙ্গমঞ্চ চাই। সেই রঙ্গমঞ্চে নট-নটীরা যথারীতি পালাটা অভিনয় করিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য এ এক দস্তুর-মতন নাট্য-শিল্পের ফরমায়েস। অবশ্য অন্যান্য নাটকের মতন এই নাটক জন-সাধারণের সম্মুখে অভিনীত হইবে না। নাটকের দৃশ্যের পর দৃশ্যগুলার ফটোগ্রাফ তোলার জন্যই এই নাটকের ব্যবস্থা হয়। নাটক এ ক্ষেত্রে সিনেমা-শিল্পের মসালা-বিশেষ। অন্যান্য থিয়েটারের মতন ফিল্‌ম্-

থিয়েটারও নটনটীদের পক্ষে প্রতিভা দেখাইবার এবং পয়সা রোজগার করিবার এক কর্ম্মক্ষেত্র।

বুঝা যাইতেছে, ফটোগ্রাফী-শিল্পটাই ফিল্‌ম্‌-নাট্যের অতি প্রধান শিল্প। যে-সকল যন্ত্রের সাহায্যে আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হয় সেই যন্ত্রসমূহ তৈয়ারী করিবার কারখানাগুলার কথাও এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। রুর জনপদের নামজাদা ক্রুপ্‌ কোম্পানী স্যাক্‌সনির ড্রেস্‌ডেন্‌ শহরে সেই সকল যন্ত্র তৈয়ারি করিবার বিরাট্‌ ফ্যাক্‌টরি কায়েম করিয়াছে। জার্ম্মাণির অনেক স্থানেই সিনেমা-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি তৈয়ারি হইয়া থাকে।

শাইলকের কাহিনীর জন্য ইতালীয় আবহাওয়া আবশ্যক। ফিল্‌ম্‌-কোম্পানীর ফটোগ্রাফারগণ ভেনীস ইত্যাদি শহরের নানা দৃশ্য ফটোতে তুলিবার জন্য মোতায়েন আছে। অনেক সময়ে দূর বিদেশের অথবা দূর অতীতকালের ঘরবাড়ী রাস্তাঘাটগুলা মিউনিকে বা বার্লিনেই তৈয়ারি করিয়া লওয়া হয়। এই জন্য প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব এবং ভূগোলবিদ্যার পণ্ডিতগণের সাহায্য লইয়া বাস্তু-শিল্পী এঞ্জিনিয়ারেরা ইমারত-পথ-শড়ক প্রস্তুত করিয়া দেন। ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শহর এবং ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টন গড়িয়া তোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সামসময়িক পোষাক-আসবারের দিকেও নজর থাকে। কাহিনীগুলার ফটো তোলা হইয়া গেলে পর ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট ভাঙিয়া ফেলা হয়। জার্ম্মাণির বড় বড় ফিল্‌ম-কোম্পানীর কারখানাগুলা বিপুল বিস্তৃত। ইহাদের তাঁবে মূলধনও খাটে অনেক। মিউনিক শহরে ফিল্‌ম-কোম্পানীর জন্য একটা স্বতন্ত্র ব্যাঙ্কই স্থাপিত হইয়াছে।

(৪)

এতগুলা শিল্পের একত্র সমবায়ে কিনো-থিয়েটারের সৌষ্ঠব সাধিত হইতেছে। ভারতবর্ষের সিনেমায় 'স্বরাজ' কায়েম করিতে হইলে

এই ধরণের বহুবিধ বিজ্ঞানে এবং সুকুমার শিল্পে বহুসংখ্যক ওস্তাদ নরনারীর দেখা পাওয়া চাই। দূর হইতে মনে হইতেছে যে, ভারতে আজকাল (১৯২২-২৩) যে-সমুদয় আলোক-চিত্রের থিয়েটার চলিতেছে, তাহাতে ভারতীয় নরনারীর অকর্ম্মণ্যতা এবং শিল্পকর্ম্মে দেউলিয়া অবস্থাই প্রমাণিত হয়। কথাটা ঠিক কি না ভাবিয়া দেখা উচিত।

প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও হয়ত গোটা ভারতের নটনটী, চিত্রকর, ফটোগ্রাফার, বাস্তশিল্পী, এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক একটা ষোল আনা 'স্বদেশী' সিনেমা জগতে হাজির করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। ভারতে যাঁহারা স্বরাজ প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তাঁহারা 'জাতীয় শিক্ষা'র সহায় স্বরূপ এই কিনো-শিল্পকে পূরাপূরি স্বদেশী করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইবেন কবে? বলা বাহুল্য, এই কাজের জন্য পুঁজি চাই প্রচুর।

বোধ হয় এই জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু একটা সোজা কথা এখনও আমাদের দেশের লোকের মাথায় বসিতেছে না কেন? শুনিতেছি, ভারতের নানা শহরে পার্শী মহাজনদের তাঁবে কতকগুলা কিনো-থিয়েটার চলিতেছে। লোকও নাকি হয় খুব বেশী, হইবারই কথা। কিন্তু আলোকচিত্রের পর্দায় যে-সকল কথা লেখা থাকে সেগুলা মারাঠা, গুজরাতী, বাঙ্গালী, যুক্তপ্রদেশবাসীরা পাঠ করে ইংরেজিতে! ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বিদেশী-বয়কটের অ আ ক খ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে এখনও সুরু হয় নাই।

(৫)

কিনো-শিল্পের ব্যবসায়ীরা জার্ম্মাণিতে এক নয়া আন্দোলন সুরু করিয়াছে। প্রাচীন এবং আধুনিক জার্ম্মাণ-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ নাটক-গুলা ফিল্‌মে দেখানো হইতেছে। এই উপায়ে জার্ম্মাণির সাহিত্য-বীরগণের সকল রচনাই আলোক-চিত্রের অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া

ইতিমধ্যে ফিল্‌মে স্থান পাইয়াছে। শিলারের 'ভিল্‌হেল্‌ম্‌ টেল'কে ফিল্‌ম্‌ করিবার জন্য ওস্তাদ্‌রা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। স্বয়ং শিলারের জীবন-কাহিনীও ফিল্‌মে দেখা দিয়াছে। ইহাতে কবিবরের যৌবন-কথাই চিত্রিত হইতেছে।

এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রসিদ্ধ কিনো-নাটকের নাম 'নাথান্‌ ড্যর্‌ ভাইজে' (অর্থাৎ 'মহাত্মা নাথান')। নাট্যকারের নাম লেস্‌সিঙ্‌। জার্ম্মাণ নাট্য-সাহিত্যের প্রপিতামহ স্বরূপ লেস্‌সিঙ জার্ম্মাণিতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

'নাথান'-নাটকে লেস্‌সিঙ্‌ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কলম ধরিয়াছিলেন। ইহুদি নাথানকে জ্ঞানী এবং ধর্ম্মসমন্বয়-সাধকরূপে দেখানো হইয়াছে। মুসলমান (তুর্ক্‌) সুল্‌তানকেও নাট্যকার পরধর্ম্মসহিষ্ণু করিয়া আঁকিয়াছেন। জেরুজেলেমের এক লঙ্কাকাণ্ড এই নাটকের ঐতিহাসিক ভিত্তি।

সিনেমা-শিল্পের ওস্তাদেরা দৃশ্যগুলাকে যার-পর-নাই চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছেন। দেড়শ' বৎসর পূর্ব্বেকার রচিত মধ্যযুগসম্বন্ধীয় এই নাটকটা বিংশ শতাব্দীর নয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব নবজীবন লাভ করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মাণরা সাহিত্য ও শিল্পের সকল বিভাগেই ফরাসী সভ্যতার গোলামী করিতেছিল। তখন ইয়োরোপে চলিতেছিল ভল্‌তেয়ারের যুগ। সেই গোলামীর বিরুদ্ধে যে-কয়জন শিল্পী প্রতিবাদ সুরু করেন তাঁহাদের মধ্যে লেস্‌সিঙ্‌ অন্যতম এবং জার্ম্মাণ স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতে লেস্‌সিঙের সাহিত্যসেবা সকল যুগেই স্মরণীয় বস্তু।

লেস্‌সিঙ্‌ জার্ম্মাণ জাতিকে 'ঘর-মুখো' করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে জার্ম্মাণ্‌ রোমাণ্টিকতার এবং স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার যে শক্তি শিলারে

মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছিল সেই শক্তির মূল ফোয়ারা ছিল লেস্‌সিঙ্‌,—সমগ্র লেস্‌সিঙ্‌-সাহিত্য। এক হিসাবে লেস্‌সিঙ্‌কে জার্ম্মাণির রামমোহন রায় বলা যাইতে পারে। জার্ম্মাণ সমালোচনায় শিলার স্বাধীনতার যীশুখ্রীষ্ট, আর লেস্‌সিঙ্‌ যীশুর অগ্রদূত সেইণ্ট জন।

মানহাইম শহর

(১)

মানহইম শহরের নাম ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত মহলেও বোধ হয় বেশী শুনা যায় না। কিন্তু গোটা জার্ম্মাণ মুল্লুকে মানহাইম অতি নামজাদা। ইয়োরোপে শিল্প ও ব্যবসার বাজারে মানহাইমকে লিভার-পুল, গ্লাসগো, লিওঁ, হাম্বুর্গ ইত্যাদি শহরের সমান ইজ্জদ দেওয়া হইয়া থাকে।

শহরটা ফ্যাক্‌টরির চিমনিগুলার এক বিপুল জঙ্গল-বিশেষ। কারখানার পর কারখানা মানহাইমকে ইট-লোহার শিকলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। রাইন দরিয়ার দুই কিনারায় অন্ততঃ পনেরো মাইল ধরিয়া লোহালক্কড়ের রাজত্ব বিস্তৃত।

মানহাইমে নেকার দরিয়া রাইনের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। নেকারের কিনারায়ও শহরের বিশাল ফ্যাকটরিগুলার আওতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ জার্ম্মাণির বাণিজ্য এই সঙ্গমেই আসিয়া ঠেকে। দরিয়ার উপরকার বন্দর হিসাবে এত বড় ব্যবসা-কেন্দ্র বোধ হয় ইয়োরোপে আর নাই।

রেলপথের জটিলতাও মানহাইমে খুব বেশী। ব্যাভেরিয়াকে তাঁবে রাখিতে হইলে মানহাইমের কেন্দ্রে একতিয়ার কায়েম করা চাই। বিগত দশ বৎসরের ভিতর সকল তরফ হইতে মানহাইম মধ্য-ইয়ো-

(২)

লড়াইয়ের পরবর্ত্তী কালেও মানহাইমের বিস্তার কোনো মতে কমে নাই। কোটি কোটি টাকার কেনাবেচা এই বন্দরে সাধিত হইয়া আসিতেছে।

শস্য আমদানি-রপ্তানি হয় এখানে প্রচুর। বীজের ব্যবসায়ও মানহাইমের ঠাঁই উঁচু। কাঠ এবং চামড়ার তেজারতি মানহাইমের এক বিশেষত্ব। তামাকের কেনাবেচাও হয় অনেক। সকল প্রকার কুদরতি মালেরই বিশাল আড়ত মানহাইমে। কাজেই ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে এই শহর এক বড় বাজার।

কয়লার কারবারে মানহাইম জার্ম্মাণ বেপারী মহলে সুপ্রসিদ্ধ। এই হিসাবে উত্তর রাইনের ডুইসবুর্গ শহর জার্ম্মাণিতে সর্ব্বপ্রধান। ডুইসবুর্গের পরেই মানহাইমের ঠাঁই। কাজেই মানহাইমের নাম জার্ম্মাণির আবালবৃদ্ধবনিতা জানে। কারণ কয়লার খবর রাখা একমাত্র ব্যবসায়ী ও ফ্যাকটরির মালিকদের স্বার্থ নয়। শীতের সময় মামুলি গৃহস্থরাও কয়লার চলাচলের কথা জানিতে ও বুঝিতে বাধ্য হয়।

'আঁতাঁত' অনেক বুঝিয়া সুঝিয়াই মানহাইম দখল করিয়াছে। রুর অঞ্চল আর দক্ষিণ রাইনের শহরগুলা আঁতাঁতের হাতে থাকিলে উত্তর ও দক্ষিণ জার্ম্মাণির শিল্প-বাণিজ্যকে কুপোকষা করিয়া মারিয়া ফেলা সম্ভব হইবে। ফরাসীরা এই জার্ম্মাণি-ধ্বংস ব্যাপারে খোলাখুলি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইংরেজেরা ইহাতে দুঃখিত নয়। জার্ম্মাণিকে শিল্প-বাণিজ্যে খোঁড়া করিয়া ফেলা শিল্পী-বণিক্ জাতি মাত্রের মহাস্বার্থ।

(৩)

যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিবার কারখানা জার্ম্মাণিতে অনেক। এই হিসাবে জার্ম্মাণি ইংল্যাণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমান। এই সকল কারখানার

এক প্রধান আড্ডা মানহাইম শহর। তড়িতের কলকারখানা তৈয়ারি করিবার ফ্যাক্টরিও মানহাইমে অনেক।

সকল প্রকার কলকজ্জা যন্ত্র হাতিয়ারের এঞ্জিনিয়ারেরা মানহাইমকে জার্ম্মাণির অন্যতম শ্রেষ্ঠনগর বিবেচনা করিয়া থাকে। ভারতীয় ছাত্র এবং অধ্যাপকগণের পক্ষে এই শহর এক মস্ত শিক্ষাকেন্দ্র।

কলকারখানার লোহালক্কড় তৈয়ারি করাই মানহাইমের এক মাত্র বিশেষত্ব নয়। জার্ম্মাণির রাসায়নিক কারখানাগুলার অধিকাংশই রাইন জনপদে অবস্থিত। তাহার ভিতরে অনেকগুলা মানহাইমের গৌরব।

রাসায়নিক শিল্প বলিলে বর্ত্তমান জগতের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রায় সকল জিনিষই তাহার ভিতর আসিয়া পড়ে। রং তৈয়ারি করিবার কারখানা এই শিল্পের অন্তর্গত। জার্ম্মাণির রংয়ের নাম শুনে নাই জগতে এমন কোনো লোক নাই। সেই রং-শিল্পের বিপুল ফ্যাক্টরিগুলা মানহাইমে অবস্থিত।

(৪)

কোন কোন জার্ম্মাণ রাসায়নিক-কারখানার নাম ভারতবর্ষেও সুপরিচিত। সেই গুলার অনেকের ঠাঁই মানহাইমে।

'বাডিশে আনিলিন-উণ্ড সোডা-ফাবৃক' জার্ম্মাণির গৌরব-বিশেষ। সেলুলোজ তৈয়ার করিবার কারবার 'সেলষ্টোফ ফাবৃক ভালড্‌হোফ' প্রসিদ্ধ। সাবান তৈয়ারি করিবার কারবার 'শুন্‌লিষ্ট জাইফে ফাবৃক'ও জার্ম্মাণির বাহিরে নামজাদা। তেলের কল, তামাকের কারখানা ইত্যাদির সংখ্যা অগণিত।

রাইন জনপদ দখল করার ফলে জার্ম্মাণির রাসায়নিক কারবার যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বিদেশে রপ্তানি একদম বন্ধ হইতে চলিয়াছে। তাহার ফলে বিদেশী রাসায়নিক কারবারগুলা ফুলিয়া

রংয়ের কারবারটাই ধরা যাউক। লড়াইয়ের সময় জার্ম্মাণির রং বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে নাই। এই সুযোগে ইংরেজ এবং মার্কিণ গবর্মেণ্ট প্রাণপণ করিয়া নিজ নিজ দেশে রংয়ের শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধ থামিবার পর জার্ম্মাণ রং বিদেশে রপ্তানি হইতে সুরু হয়। ফলে ইংরেজ এবং মার্কিণ কোম্পানী জার্ম্মাণ রংয়ের সঙ্গে টক্কর দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই টক্করে জার্ম্মাণ কোম্পানীকে বিদেশীরা হারাইতে পারে নাই।

আজকাল রাইন দখল করার পর ইংরেজ ও মার্কিণ রং-ব্যবসায়ীরা আবার এক নয়া সুযোগ পাইয়াছে। যত দিন জার্ম্মাণ রং বিদেশে রপ্তানি না হইতে পারে ততদিন ইহারা স্বদেশী রংয়ের ফ্যাকটরিগুলাকে চাঙ্গা করিয়া রাখিতে পারিবে। বলা বাহুল্য এই কারণে ইংরেজ এবং মার্কিণ গবর্মেণ্ট ফরাসীদের রুর-মানহাইম দখল কাণ্ডে বিশেষ সুখী আছে।

(৫)

মানহাইম এক দরিয়া-বন্দর। এই বন্দরের পরিমাণ সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। মাল উঠা নামার জন্য দরিয়ার কিনারায় জেটি আছে বলাই বাহুল্য। জেটিগুলা লম্বা কম সে কম বার মাইল।

বন্দরের ভিতর মাল চলাচলের জন্য রেলপথই ৬৬ মাইল লম্বা। সাধারণ পথ প্রায় বার মাইল হইবে। লড়াইএর পূর্ব্ব বৎসর এই সকল পথে প্রায় ৬০ কোটি টন মালের আমদানি রপ্তানি হইয়াছে।

এইগুলা গেল সরকারী বন্দরের মাপজোক। তাহা ছাড়া বেসরকারী জেটি আছে, সেইগুলা লম্বায় প্রায় নয় মাইল। প্রায় বিশ কোটি টন মালের চলাচল এই সকল জেটিতে সাধিত হইয়া থাকে।

রুর অঞ্চল হইতে কয়লা আসে দক্ষিণ জার্ম্মাণির জন্য। কোন মাল আসে দরিয়া বহিয়া, কোন মাল আসে রেলে। সবই মানহাইমে মজুত হয়। এইখান হইতে পরে ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে চালান হয়।

কাজেই মানহাইম একমাত্র দরিয়া-বন্দরই নয়। রেল বন্দর হিসাবেও মানহাইম যারপরনাই সজীব।

কুদরত্তি মাল শহরেই অনেক কাজে লাগে। অধিকন্তু জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন শহরে এইগুলা চালান করাও হয় মানহাইমের পথে। রেলের যাতায়াত এই কারণে খুব বেশী।

(৬)

মানহাইম বাডেন জেলার অন্তর্গত। এই শহরের মতন অনেক শহর জার্ম্মাণির শিল্প, বাণিজ্য এবং শিক্ষা সংস্কারে প্রচুর পরিমাণে প্রতাপশালী। সেইগুলার নাম ভারতবর্ষে এক প্রকার জানা নাই বলিলেই চলে।

কিন্তু মানহাইমের যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এই ধরণের শহরে ভারত-সন্তানের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ অনেক 'চিজ' আছে। ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বার্লিন, মিউনিক ইত্যাদি নামজাদা শহরের মোহ ছাড়াইয়া মফঃস্বলের এই সকল শহরের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করুন।

ভারতীয় পর্য্যটকেরাও মানহাইমের মতন শহরকেই দেখিতে শুনিতে প্রবৃত্ত হউন। ভারতবর্ষকে বর্ত্তমান জগতের এক কর্ম্মঠ অঙ্গরূপে গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত এই সকল শহরের জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতিই বিশেষ দরকারী। এই ধরণের নগরে যে জীবন প্রবাহিত হইতেছে, সেই জীবন দখলে আনিতে পারিলেই যুবক ভারতের দ্বারা বর্ত্তমান [illegible] হইতে পারিবে।

জার্ম্মাণ সাহিত্যে যৌবন-পূজা

(১)

জার্ম্মাণ নাট্যকার গ্যারহার্ট হাউপ্‌ট্‌মান ষাট বৎসর পার হইয়াছেন। এই উপলক্ষে জার্ম্মাণ নরনারী কবিবরকে নানাপ্রকারে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেঁ। ১৯২২-২৩ সালের সাহিত্য-মজলিসে, থিয়েটারে, বক্তৃতা-মঞ্চে তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু তাই বলিয়া হাউপ্‌ট্‌মানকে নয়া জার্ম্মাণির প্রতিনিধি বলিলে ভুল করা হইবে। কবিবর তাঁহার কাব্যে অনেকবার অনেক নয়া কথা লিখিয়াছেন। জার্ম্মাণির ছোট-বড়-মাঝারি সমাজ হাউপ্‌ট্‌মানের নাট্য-সাহিত্যে নয়া নয়া আদর্শ পাইয়াছে। বিগত মহা লড়াইয়ের সময়েও হাউপ্‌ট্‌মান জার্ম্মাণ যুবাকে তাতাইবার ভার লইয়াছিলেন। তথাপি যুবক জার্ম্মাণি আজ তাহাদের সাহিত্য-সম্রাটকে 'সেকেলে' এবং খানিকটা বাতিল বিবেচনা করিয়া থাকে।

হাউপ্‌ট্‌মানের সাহিত্যে মানুষ একটা সংশয়, একটা প্রশ্ন, একটা সমস্যা পায়। কিন্তু এই সংশয় বা সমস্যার মীমাংসা পাওয়া যায় না। প্রশ্নগুলির সোজা কথায় জবাব পাওয়া যায় না বলিয়াই যুবক জার্ম্মাণি হাউপ্‌ট্‌মানকে আলমারির ভিতর সাজাইয়া রাখিতেছে। তাঁহার স্থানে জ্যান্ত দরিয়ার তাজা স্রোতের ভগীরথকে টানিয়া বাহির করা নয়া সমজদারের কাজ দাঁড়াইয়াছে।

হাউপ্‌ট্‌মান বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী সাহিত্য-খোরাকও জোগাইতেছেন। মেক্সিকো দেশের ঘটনা লইয়া দুইটা নাটক রচনা করিয়াছেন। এই দুইটায় গোঁজামিলহীন সুস্পষ্ট নবীন আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যুবক জার্ম্মাণির পেট ভরিবার উপযুক্ত রসদ মোটের উপর হাউপ্‌ট্‌মান-সাহিত্যে আর জুটিতেছে না।

(২)

যে মহলেই ঘুরি না কেন—কি চিত্রকর, কি চিকিৎসক, কি ইস্কুল-মাষ্টার, কি সমাজ-সেবা-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম-কর্ত্রী—সকলের মুখেই একজনের নাম শুনিতে পাই। ষ্টেফান গেওর্গে (ইংরেজী উচ্চারণ জর্জ্জ) যুবক জার্ম্মাণির চিত্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। পছন্দ করুন বা না করুন, বুড়া-বুড়ীরাও সাহিত্য-সংসারের এই নয়া ঘটনা লক্ষ্য করিতেছে।

গেওর্গে রাশি-রাশি লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। কিন্তু তাঁহার রচনায় একটা দৃঢ়তা আছে। পাঠকমাত্রেই এগুলার সংস্পর্শে আসিয়া ইতিকর্ত্তব্য সহজে বুঝিয়া লইতে পারে। 'এটাও ভাল, ওটাও ভাল, কিন্তু কোন্ পথে চলি'—এইরূপ সন্দেহের পাল্লায় পড়িয়া কেহই দিশাহারা হয় না।

তর্কপ্রশ্নের গর্ত্ত হইতে যুবক জার্ম্মাণিকে উদ্ধার করিবার পথে আলব্রেষ্ট শেফার একজন পাকা কবি। ইনি গেওর্গের আদর্শে নিজের কাব্যশিল্প গড়িতেছেন। লিখিয়াছেনও বিস্তর। এই জন্য ইঁহার প্রভাব সুবিস্তৃত।

কাব্যের কথা নানাপ্রকার,—বলাই বাহুল্য। মান্ধাতার আমলের হোমার ঋষির 'ওডিসি' শেফারের গল্প জোগাইয়াছে। মধ্যযুগের 'পার্সিফাল' ও তাঁহার 'কুদ্‌রত্তি মালে'র অন্তর্গত। বর্ত্তমান যুগের সুখ-দুঃখ ত আছেই।

গল্প যাই হউক না কেন,—কবি গড়িতেছেন নয়া সংসার। এই নবীন জগতের নরনারী বিনা সন্দেহে সাহসের সহিত নিজ নিজ কর্ত্তব্য বাছিয়া লয়। ভাল-মন্দ বিচার করিতে বসিয়া গোটা জীবন কাটাইয়া দেয় না। জীবনটা চাখিতে-চাখিতেই, জীবনের সুখ পরখ করিতে-করিতেই ইহারা জীবনের স্রোত বাড়াইয়া চলে।

জীবনটাকে বিচার করিতে লাগিয়া যাওয়া যৌবনের স্বধর্ম্ম নয়। বাঁচিয়া থাকাটাই, জীবনের সুখ-দুঃখ ভোগ করাই,—যৌবনের ধর্ম্ম। এই জন্যই যুবক-দুনিয়া এবং যৌবন-পূজক নরনারী শেফারের কাব্য ভালবাসে।

(৩)

অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি,—জার্ম্মাণ কাব্যে এক নয়া ধরণের ভাবুকতা দেখা দিয়াছে। এই ভাবুকতা অধ্যাত্ম-জগতের, পরকালের, দেবতত্ত্বের, ভগবদ্ভক্তির মুল্লুকে পরিস্ফুট।

খ্রীষ্টান সমাজে আধ্যাত্মিকতাময় ভাবুকতা বাস্তবিক পক্ষে একটা নতুন-কিছু নয়। মধ্যযুগের ইয়োরোপে ভগবদ্ভক্তি এবং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ ছিল। বর্ত্তমানকালেও রোমান ক্যাথলিক সমাজের সর্ব্বত্রই অধ্যাত্ম-তত্ত্বই শিল্পী ও কবির জীবন-কথায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

খ্রীষ্টান সমাজে ঋষি ফ্রান্সিস আমাদের ভারতীয় বোধিসত্ত্বের অনুরূপ। করুণা, দয়া, দাক্ষিণ্য, মানব-প্রীতি, সহানুভূতি, পরোপকার ইত্যাদি রসে ভরপূর জীবন, এই আদর্শ ফুটিয়াছিল সেইণ্ট ফ্রান্সিসের এবং বোধিসত্ত্বের কল্পনায়। সংসার ছাড়িয়া ভগবানে লিপ্ত হইতে হইবে এই ধরণের কথা ফ্রান্সিস-বোধিসত্ত্বনিষ্ঠার গোড়ার কথা।

দর্শন ও সাহিত্য এবং শিল্পের এই ধারা কি ইয়োরোপে, কি এশিয়ায় কোথাও একদম কোন দিনই পূরাপূরি লুপ্ত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পশ্চিমাদের 'রোমাণ্টিক' জাগরণে এই 'প্রবুদ্ধ' ফ্রান্সিসের জাগরণ-কথা অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আজ-কালকার ইয়োরোপীয় চিন্তায়ও তাহার পরিচয় পাইতেছি। অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ভাবুকতা, মিষ্টিসিজম ইত্যাদি রস ভারতবর্ষের অথবা এশিয়ার একচেটিয়া মাল নয়!

মিষ্টিক সাহিত্যের প্রতিনিধিদের ভিতর ফ্রান্ৎস্ ভেৰ্ফেল বিলকুল সন্ন্যাসের আদর্শ আনিয়াছেন। ডিট্‌সেন শ্মিডও একদম সংসার ত্যাগের চিত্র ফুটাইতেছেন। এই সকল কবিরা প্রায়ই এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন। য়াকব ভাস্‌সারমান এবং অন্যান্য অনেকে এই ধরণের মিষ্টিসিজমে মস্‌গুল। কেহ কেহ পুরাণা ও মধ্যযুগের ভারতে তাঁহাদের আখ্যানবস্তু সাজাইয়াছেন। ভের্ফেলের 'স্পীগেল-মেন্‌শ্' (আয়নার মানুষ) ভারতীয় কাঠামোয় মোড়া।

(৪)

পৃথিবীর কোন দেশেই এবং কোন যুগেই কবিরা সকলে মিলিয়া কোন একটা কথা প্রকাশ করে না। সর্ব্বত্রই এবং সকল যুগেই একসঙ্গে নানা কথা প্রচারিত হয়। সেই নানা স্বরের বৈচিত্র্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কানে বিভিন্ন রসের সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দেশের সাহিত্য ও শিল্প বুঝা হইতেছে এরূপ ভাবা উচিত নয়।

জার্ম্মাণিতে একসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ চলিতেছে। কোন কবি বলিতেছেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। ঠিক উল্টা গাহিতেছেন আর কেহ। তাঁহাদের-রসে প্রকাশ 'জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা' ইত্যাদি।

যুবক জার্ম্মাণির কোন কোন কবি বলিতেছেন—"বর্ত্তমান জগৎটা দুঃখের সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া বনবাসই শ্রেয় এরূপ বিবেচনা করিব কেন? সংসার ছাড়িয়া পলাইতে হইবে কেন? এই জগৎটাকেই, এই সংসারটাকেই নয়া আকার দেওয়া যায় না কি?"

জীবন, সংসার, জগৎ, পুরুষ, স্ত্রী—ইত্যাদি সবই নবরূপে দেখা দিতেছে ফ্রিট্‌স্ ফোন উনরু কবির সাহিত্যে। ফোন উনরু দুনিয়াখানাকে বলিতেছেন—"ওহে বাপু, আমি তোমাকে বর্জ্জন করিব না। এই রূপরসময় ধরাতলের যে মানবজীবন, তাহা জ্যান্ত ভাবে বাঁচিয়া থাকিয়াই ভোগ করিব। কোনো স্বর্গ হইতে তাহার ফটোগ্রাফ মাত্র

দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিব না। তবে তুমি যেমনটি আছ, তোমাকে তেমনটি থাকিতে দিব না। তোমাকে ভাঙ্গিব, তোমার বিভিন্ন অংশগুলা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিব,—নয়া কোনো গড়ন সম্ভব কিনা। সেই গড়নে সাজাইয়া তোমার শক্তিগুলিকে আবার জিয়াইয়া তুলিব।"

(৫)

ফোন উনরুর কাব্যে 'পুনর্গঠনের' তেজ প্রচুর। সাবেক কালের কর্ত্তব্যের সঙ্গে নয়া যুগের কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব,—কাজেই এই সাহিত্যের বিশেষত্ব। একখানা গ্রন্থের নাম 'ষ্টার্মে' (ঝড় বা তাণ্ডব)। নামেই প্রকাশ এ কি চীজ। মজার কথা স্বয়ং কবির নামের অর্থও তাই। 'উনরু' মানে অশান্তি।

এই "অন্বর্থ-নামা" কবির রচনায় কেহ কেহ ভাঙ্গার শক্তি অত্যধিক মাত্রায় দেখিতে পান। তাঁহাদের বিবেচনায় উন্‌রু বিপ্লবের প্রতিমূর্ত্তি, গড়ার ক্ষমতা ইঁহার বেশী নাই।

আসল কথা, যুবক দুনিয়ার মেজাজে যাকে বলে ভাঙ্গা, তারই নাম গড়া। 'ষ্টার্মে'র কবি কেবল কালবৈশাখীই বহাইতেছেন এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। আর যদি তাহাই সত্য হয়,—মন্দ কি? কালবৈশাখীর মাহাত্ম্যেই জগতে ধনধান্য-প্রসূতি বরষার সমাগম হয় যে!

ফোন ডার গোল্‌ট্‌স্ নামক আর একজন কবি এই ভাঙ্গা-গড়ার সমস্যায় হাত দেখাইতেছেন। তিনি যুবক জার্ম্মাণিকে বলিতেছেন:—"আবার তোরা মানুষ হ। তোদের বাপদাদারা যে আদর্শে সোনার জার্ম্মাণি গড়িয়াছিল, সেই আদর্শের পূজা কর্। সেই আদর্শেই নয়া জার্ম্মাণি গড়িয়া উঠিবে।"

নবীন ভারতীয় চিত্রশিল্পের জার্ম্মাণ শক্ত

(১)

বার্লিনের 'ক্রোণপ্রিন্সেন-প্যালে' ভবনে—পুরাণা যুবরাজের প্রাসাদে

—নব্য ভারতীয় চিত্র-শিল্পের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। জার্ম্মাণিতে যতগুলি প্রদর্শনী-ভবন আছে, তাহার মধ্যে এই ভবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান লেখককে এই প্রদর্শনীর জন্য প্রথম হইতেই জুতার সুখতলা ক্ষয়াইতে হইতেছে।

গবর্মেণ্টের অধীনে শিল্পশিক্ষাবিজ্ঞান-সচিবের আজ্ঞায় এই 'প্যালে'র বাজার বসানো হইয়া থাকে। গবর্মেণ্টের ওস্তাদগণের পরীক্ষায় পাশ না হইলে কোনো শিল্পীর কাজ এই ভবনে প্রদর্শিত হয় না। অধিকন্তু প্রথমেই গবর্মেণ্টের অনুমতিও চাই।

ক্রোণপ্রিন্সেন-প্যালে বার্লিনের 'ন্যাশন্যাল গ্যালারির' এক অংশ। বিশ্ববিদ্যালয়-মহাল্লায় উণ্টার ডেন লিণ্ডেন সড়কের উপর এই ভবনের অবস্থান। একমাত্র বর্ত্তমান এবং সামসময়িক যুগের চিত্রকর ও ভাস্করদিগের শিল্প প্রদর্শন করা এই গ্যালারির উদ্দেশ্য। বৎসরে অনেকগুলা মেলা এইখানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বার্লিনের 'ইণ্ডো-ইয়োরোপা ট্রেডিং' কোম্পানীর উদ্যোগে এই গ্যালারিতে ভারতীয় শিল্পের প্রচার হইতেছে। চিত্রকর, সমজদার, সংগ্রহালয়ের পরিচালক, সুকুমার-শিল্প-পত্রিকার সম্পাদক, অধ্যাপক, ছাত্র এবং অন্যান্য পরিদর্শক আগ্রহের সহিত নব্যভারতের চিত্রাবলীর সঙ্গে পরিচিত হইতেছেন। শহরের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় দৈনিক কাগজে নামজাদা চিত্রসমালোচকেরা মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। শিল্প এবং কারুকার্য্যের ব্যবসায়ীরাও এই হিড়িকে ভারতের সঙ্গে এক নয়া ব্যবসায়ের সন্ধান পাইতেছে।

(২)

'নব্য ভারত' বস্তুটা কেটা নয় সৃষ্টি। বাস্তবিক পক্ষে বার্লিনের

ভারতবর্ষে আজকাল নানা ধরণের সুকুমার শিল্প চলিতেছে। তাহার ভিতর কোনো কোনো শিল্পরীতিকে 'ভারতীয়' চিত্রকলা নামে প্রচারিত করা হইয়া থাকে। সেই চিত্রকলার মেলাই ন্যাশন্যাল গ্যালারির এই বাজারে জার্ম্মাণ নরনারীরা দলে দলে দেখিতে আসিতেছে।

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই 'ভারতীয় চিত্রশিল্প' নব্যভারতে প্রথম দেখা দেয়। তাহার পর আজ পর্য্যন্ত তের চৌদ্দ বার কলিকাতায় এই শিল্পের বার্ষিক বাজার বসিয়াছে। লড়াইয়ের সময় বোধ হয় দুএক বৎসর শিল্প-মেলাটা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

এই শিল্প জার্ম্মাণরা আজ প্রথম দেখিতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত ইহারা এই শিল্পের বিশেষ কোনো সংবাদ পায় নাই বলা যাইতে পারে। নেহাৎ যাঁহারা ভারত-বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের কেহ কেহ হয়ত জার্ম্মাণিতে বসিয়াও এই নয়া শিল্পের কথা জানিতেন। কিন্তু জার্ম্মাণ সমাজে নব্য ভারতের শিল্পকথা একদম অজ্ঞাত ছিল।

ফ্রান্সের জনসাধারণ ১৯১৪ সালে—লড়াই বাধিবার পূর্ব্বে—এই শিল্পের নমুনা দেখিয়াছে। প্যারিসের 'গ্রাঁ প্যালে'তে মেলা বসিয়াছিল। তাহার পর লণ্ডনের 'ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম'-ভবনে সেই মেলা চালান করা হয়। ফ্রান্সের এবং বিলাতের শিল্পী, সমজদার এবং পত্রিকা-সম্পাদকেরা নয়া ভারতের শিল্প-কথা নিজ নিজ মহলে কম-বেশী প্রচারিত করেন।

প্যারিসের 'আর দেকরাতিফ্', লণ্ডনের 'জার্ণ্যাল অব ইণ্ডিয়ান আর্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি' ইত্যাদি কাগজে এই শিল্পের পরিচয় বাহির হইয়াছে। জাপানের 'কোক্কা' নামক সুকুমার শিল্পের ত্রৈমাসিকে জাপানীরা নয়া ভারতশিল্পের খবর পাইয়াছে। নিউইয়র্কের 'আর্ট ইন্ আমেরিকা' কাগজেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

(৩)

শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির বিজ্ঞাপন বা প্রচার সুরু হওয়ার অন্যতম অর্থ এই যে, শিল্পী এবং সাহিত্যসেবকগণের রচনা ব্যবসায়ের সামগ্রীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ ছবি ও কেতাব বিক্রী হইতে সুরু হয়। বিদেশে ভারত-প্রচারের ফলে ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের হাতের কাজ বিদেশী মহলে দুএকখানা বিক্রী হইতেছে। ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্পকর্ম্মের নানা বিভাগে একটা কারবার গড়িয়া উঠিতে পারে।

ইয়োরোপে যখন কুরুক্ষেত্র বাধে-বাধে, প্রায় সেই সময়ে নব্য ভারতীয় শিল্প বিদেশে পর্য্যটন করিতে বাহির হয়। কাজেই জার্ম্মাণ মুল্লুকে প্রবেশ করিবার সুযোগ তখন ইহার কপালে জুটে নাই। লড়াই থামিবার পর জার্ম্মাণ সমাজে পুনর্গঠন সুরু হইতে সময় লাগিয়াছে। কাজেই এতদিন পর জার্ম্মাণরা একটা নয়া ভারত আবিষ্কার করিবার সুযোগ পাইল।

জার্ম্মাণিতে পুরাণা ভারতের চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে অনেক কথা জানা আছে বহুদিন হইতেই। জার্ম্মাণ পত্রিকায় সেই সম্বন্ধে সুচিন্তিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী ত আছেই। জার্ম্মাণ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা-মূলক গ্রন্থ ও দুনিয়ার শিল্প-রসজ্ঞের রস জোগাইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে 'লেখা-পড়া', গবেষণা, অনুসন্ধান, তর্ক, সমালোচনা ১৯২৩ সালে সুরু হইতে চলিল।

(৪)

প্রায় একশ'টা ছবি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট' এইগুলা পাঠাইয়াছেন। কলিকাতার লোকেরা পূর্ব্বেই এই সমুদয় দেখিয়াছে। 'মডার্ণ রিভিউ'র সাহায্যে গোটা ভারতের ইংরেজী-জানা নরনারীও কতকগুলা ছবির ছাপা দেখিয়াছে। অধিকন্তু এই পত্রিকার প্রকাশকগণ ছবিগুলা

একত্র করিয়া গ্রন্থ ছাপিয়াছেন। সেই গ্রন্থ সাত আট খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

ছবিগুলার আলোচ্য বিষয় বহুবিধ। দেখিলেই বুঝা যায় চিত্রকরগণ দুনিয়ার বহু তথ্যই স্ববশে আনিয়াছেন। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের কোনো কথাই ইঁহাদের তুলিতে যেন বাদ পড়ে নাই। এই বিষয়-বৈচিত্র্য প্রত্যেক দর্শকেরই নজরে পড়িবে।

শিল্পকর্মটা সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে কিনা, সে সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিবেন ইহা স্বাভাবিক। এই চিত্রগুলাকে খাটি 'স্বদেশী' অর্থাৎ 'ভারতীয় শিল্প'রূপে বাজারে জাহির করা যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহাও বিচারের বস্তু। এই সকল গভীরতর শিল্প-সমালোচনায়, রূপরস সম্বন্ধে যাঁহার যেমন জ্ঞান, রুচি, খেয়াল, বাতিক বা মর্জ্জি তিনি সেইরূপ টীপ্পনী ঝাড়িতে অধিকারী। অধিকন্তু এই সূত্রে 'ভারতীয়' শব্দটারই রকমওয়ারি ব্যাখ্যা বাহির হইয়া পড়া আশ্চর্য্যের কিছু নয়।

(৫)

কতকগুলা কথা কিন্তু পাঠশালার নেহাৎ কচি শিশুরাও এখনই বুঝিতেছে। সকলেই দেখিতেছে যে, শিল্পীরা ভারতের নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিয়াছেন। মেঘ, আকাশ, বৃষ্টি, গাছপাতা, জানোয়ার—সবই ইঁহাদের হাতে ধরা পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ এই চিত্রশিল্পে মূর্ত্তি লাভ করিতেছে।

বর্ত্তমান ভারতের জীবন-কথা এবং সমাজ-কথা এই চিত্রশিল্পের একটা প্রধান রসদ। শিল্পীরা শিশুজীবন আঁকিয়াছেন,—গৃহস্থালী আঁকিয়াছেন। ইঁহাদের মেজাজে কিষাণ-বধূ এবং মজুর-মূর্ত্তিও ঠাঁই পাইয়াছে। পূজাপার্ব্বণ, খেলাধূলা, পল্লীব্রত, ধর্ম্মানুষ্ঠান,—ইত্যাদি সামাজিক রীতিনীতির বিভিন্ন দিকে ইঁহাদের তুলি খেলিয়াছে। এই চিত্রশিল্পের মেলায় কয়েক মিনিট কাটাইলে যে-কোনো লোক ভারতীয়

পল্লীনগরের জ্যান্ত নরনারীর স্থ-কু, হর্ষ-শোক সবই সজীবভাবে স্পর্শ করিতে প্যারে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা চরিত্র ও ঘটনা এই শিল্পীদিগকে চিত্রাঙ্কনে পথ দেখাইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক হইতে কেহ শিল্পের বিষয় বাছিয়াছেন। কেহ বা রবীন্দ্রনাথের গীতাবলীকে রূপ প্রদান করিতেছেন।

(৬)

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতীয় জীবনকাহিনী এই চিত্রকরদিগের সুপরিচিত। মেলার দর্শকেরা পুরাণা ভারতকে চোখের সম্মুখেই হাজির পায়।

রামায়ণ এবং মহাভারতের প্রধান প্রধান গল্পগুলা আঁকা হইয়া গিয়াছে। মৃচ্ছকটিক, শকুন্তলা ইত্যাদি নাট্যসাহিত্য হইতে শিল্পীরা মসালা সংগ্রহ করিয়াছেন। বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থমালার আখ্যায়িকা ইঁহাদের প্রিয় বস্তু।

রাধাকৃষ্ণের পদাবলী-সাহিত্যে এই চিত্রকরগণ সবিশেষ অনুরাগী। তন্ত্রসাধনার কালীমূর্ত্তিও নব্যভারতীয় চিত্র-শিল্পকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

মুসলমানী সাহিত্যের গল্প হিন্দু চিত্রকলায় আদৃত হইতেছে। ওমার খৈয়মের বয়েৎ এই ছবির বাজারে কম রটে নাই। লয়লা মজনুনকে হিন্দু শিল্পীরা ভালবাসেন।

মোগল আমলের বাদশা-বেগমকে বর্ত্তমান ভারতের 'স্বরাজ'-শিল্পীরা বয়কট করেন নাই। তাঁহাদের সঙ্গে এই চিত্রকলার 'সহযোগ' অতি গভীর।

(৭)

পুরাণা ভারতের মরা ও বাসি কথাগুলা যুবক ভারতের তাজা শিল্পে

বেশ উঁচু ঠাই-ই লাভ করিয়াছে। যে-কোনো দর্শকই এইরূপ বলিবেন।

কারণ ঢুঁড়িবার জন্য বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। ভারতের নানা প্রদেশে আজকাল প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা, পুথির খোঁজ, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তুমুল ভাবে চলিতেছে না কি? সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাহিত্য-সম্মেলন নামক প্রতিষ্ঠান আজ গুজরাটে, মাদ্রাজে, বাঙ্গালায়, যুক্তপ্রদেশে সর্ব্বত্রই প্রবল। পুরাণা ভারতকে পুনরায় দেখিবার অর্থাৎ আবিষ্কার করিবার সাধ যুবক ভারতের মহলে মহলে সুবিস্তৃত।

যুবক ভারতের পণ্ডিতেরা—ঐতিহাসিকেরা, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা—সাহিত্যের রাজ্যে যাহা করিতেছেন, সেই কার্য্যেই এই চিত্রকরেরা শিল্পের মণ্ডলে হাত দিয়াছেন। ভারতাত্মার এবং ভারত-কলেবরের পুনরুদ্ধার নব্যভারতীয় জ্ঞান-মণ্ডলের নানা বিভাগে এক সঙ্গে সাধিত হইতেছে।

জগতের ইতিহাসে এই ধরণের 'অতীত-প্রীতি' এবং অতীতকে কথা বলাইবার জন্য শিল্প-সাহিত্যের সমবেত প্রয়াস নূতন নয়। জার্ম্মাণির লোকেরা এইরূপ 'অতীত'-সাধনার মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্ম্মাণ সমাজে এই অতীত-নিষ্ঠার আন্দোলন দেখা দিয়াছিল।

সেই যুগের জ্ঞান-মণ্ডলে গ্যেটে-শিলার-ফিথ্‌টে-শ্লেগেল গ্রহনক্ষত্ররূপে বিরাজ করিতেছিলেন। দার্শনিক হার্ডার এবং গল্প-প্রচারক গ্রিম ইত্যাদি সুধীগণের চেষ্টায় তখনকার জার্ম্মাণরা প্রাচীন এবং মধ্য যুগের জার্ম্মাণ জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে উৎসাহী হয়। কবি, চিত্রকর, পণ্ডিত,—সকল শ্রেণীর জার্ম্মাণ গুণীরা 'স্বদেশী আদর্শ' আবিষ্কার করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল গবেষণা, সাহিত্য-চর্চ্চা,

'পুনরুদ্ধার' ইত্যাদির ফলে গোটা সমাজে এক নবযুগের আবির্ভাব হয়। তাহাকে ইয়োরোপীয় সভ্যতায় 'রোমাণ্টিক' আন্দোলনের যুগ বলে।

নব্যভারতের চিত্রশিল্পীদের প্রাচীনভারত-বিষয়ক শিল্পকর্ম্মে সেই রোমাণ্টিক ভাবুকতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। জার্ম্মাণির স্বদেশী আন্দোলনের মতন ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনও অতীত-প্রীতি এবং রোমাণ্টিকতার সঙ্গে গাঁথা।

(৮)

এই 'স্বদেশী'-'রোমাণ্টিক' চিত্রশিল্পের কারিগরগণের মধ্যে মান্দ্রাজীর নাম দেখিতে পাই। যুক্তপ্রদেশ এবং উড়িষ্যার শিল্পীও এই দলের অন্তর্গত। মুসলমান চিত্রকরগণের কেহ কেহ এই স্রোতে গা ভাসাইয়াছেন। মহিলাশিল্পীও কয়েকজন এই মণ্ডলের অধিবাসী।

ভারতের কোন্ কোন্ শহরে এই শিল্পের কেন্দ্র আছে বলিতে পারি না। সম্প্রতি কলিকাতাই ইহার উৎস ও বিদ্যাপীঠ। 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট' কলিকাতায় অবস্থিত। সোসাইটির সম্পাদক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী 'রূপম্' নামে একটা ত্রৈমাসিক শিল্প-পত্রিকা ইংরেজি ভাষায় চালাইয়া থাকেন। সেই পত্রিকায় বর্ত্তমান লেখকেরও দুচার আঁচড় আছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শিল্পের জন্মদাতা এবং দীক্ষাগুরু,—একথা বাঙ্গালীর অজানা নাই।

বার্লিনের মেলায় বুঝা গেল, এই বাজারের সকল শিল্পীই কোনো মার্কা-মারা পথ ধরিয়া চলিতেছেন না। কয়েকজনকে নয়া নয়া পথের প্রবর্ত্তকরূপে বর্ত্তমান দেখিতেছি। ক্রমেই বৈচিত্র্য সৃষ্ট হইতেছে। সুলক্ষণ।

(৯)

ছবিগুলা দেখিলে মনে হইবে যে, চিত্রকরগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া

পুরাণা ভারতের সুপ্রচলিত শিল্প-রীতির ব্যবহার করিয়াছেন। মোগ্‌লাই আমলের ফার্শী প্রভাবান্বিত ছবির কায়দা, পঞ্জাবের কাংড়া জনপদের তথাকথিত 'রাজপুত' চিত্রাঙ্কন, এবং বোম্বাইয়ের অজন্তাশিল্প ইহাদের চোখ ও হাত বেশ জোরের সহিত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

কিন্তু এক মাত্র মধ্য যুগ এবং প্রাচীন আমলের ভারতীয় রচনা-কৌশল এই বাজারে জুটিয়াছে এইরূপ বিবেচনা করা ভুল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিলাতে একটা নয়া শিল্পের আন্দোলন রুজু হইয়াছিল। তাহার নাম 'প্রি-রাফায়েলিটিজ্‌ম্'। রাফয়েল নামক প্রসিদ্ধ ইতালীয় চিত্রকরের পূর্ব্ববর্ত্তী মধ্যযুগে ইয়োরোপে যে ধরণের ছবি আঁকা হইত সেই পুরাণা রীতি ফিরাইয়া আনিবার জন্য ইংরেজ সমাজে ব্যর্ন্‌-জোন্‌স্‌, রোজেটি, মিলেস ইত্যাদি কয়েকজন ক্ষমতাবান্‌ শিল্পী সচেষ্ট হন। সেই প্রচেষ্টা নব্যভারতের এই শিল্প-বিকাশের কথঞ্চিৎ সহায় হইয়াছে বলিতে পারি।

বিগত দশ-পনর বৎসরের ভিতর প্রাচীন জাপানী এবং চীনা শিল্প ইয়োরোপে, আমেরিকায় এবং ভারতেও প্রচারিত হইয়াছে। এই এশিয়া-শিল্পের প্রভাবও কলিকাতার শিল্প-মণ্ডলে বিরাজ করিতেছে। অধিকন্তু ফরাসী শিল্পী সেজান বর্ত্তমান জগতে এক বিলকুল অভিনব রচনা-কৌশলের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে পশ্চিমা শিল্পীরা রূপরঙের অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ সাজাইতে সুরু করিয়াছে। এই নবীনতম ওস্তাদিও নব্যভারতীয় চিত্র শিল্পে প্রচুর।

এই সকল বিষয়ে লিখিতে সুরু করিলে একটা ছোট খাটো শিল্পরসের প্রবন্ধ লেখা হইয়া পড়িবে। কিন্তু এদিকে বীরেন দাশ গুপ্ত তাগিদ দিতেছেন, "কমার্শ্যাল নিউজের প্রুফ হাজির"। অতএব ব্যবসাবিজ্ঞানের সাধনায় মন লাগানো যাক্‌।

রুরমুল্লুকে বোল্‌শেভিকী

(১)

রুর অঞ্চলে আবার জার্ম্মাণ বোলশেভিকী দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু করিয়াছে। ডোর্টমুণ্ড, বোখুম ইত্যাদি শহরে মজুরেরা রক্তারক্তি চালাইতেছে। কারখানার মালিকেরা শশব্যস্ত। জার্ম্মাণ পুলিশও মজুরদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

অত্যধিক মারকাট ঘটিয়াছে গেল্‌জেনকির্খেন শহরে। মজুরেরা দোকান লুটপাট করিয়াছে। কোনো কোনো দোকানের মালিকেরা কমিউনিষ্ট নেতাদের হুকুম অনুসারে জিনিষ পত্রের দর কমাইতে বাধ্য হইয়াছে।

গেল্‌জেনকির্খেন শহরের সদরথানায় একটা ছোটখাট লড়াই হইয়া গিয়াছে। পুলিশেরা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। মজুরের দল সকল প্রকার সরকারী কাগজপত্র পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। সারারাত লাঠালাঠির ফলে লোক মরিয়াছে সাতজন! আহতের সংখ্যা প্রায় পঁচাত্তর। বাড়ীটাতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সরকারের পক্ষ হইতে ইহাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় কোনো ফল লাভ হয় নাই।

ফরাসী এবং তাহাদের বন্ধুরা জার্ম্মাণদের ঘরোয়া লড়াইয়ে সুখীই আছে। জার্ম্মাণ সত্যাগ্রহের আন্দোলন বেশী দিন টিকিবে না—এইরূপ চিন্তা করা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। জার্ম্মাণির মজুরেরা বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ধনী মহাজনদের বিরুদ্ধে চলিতেছে। অনেকটা এই কারণেই বিদেশীরা রুর-রাইণ অঞ্চলে জার্ম্মাণির উপর জুলুম চালাইতে পারিতেছে।

(২)

পূর্ব্বে—এপ্রিলমাসেও একবার একটা বড় রকমের মজুর-মহাজন লড়াই ঘটিয়া গিয়াছে। ম্যিলহাইম এবং এসেস্‌ন ছিল সেই লড়াইয়ের কেন্দ্র।

জার্ম্মাণ ন্যাশন্যালিষ্টদের পক্ষ হইতে এই লড়াইগুলা যারপরনাই শোচনীয় বিবেচিত হইতেছে। হইবারই কথা। বিদেশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণরা এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না—এই সংবাদ জগতের সর্ব্বত্রই রটিতেছে।

অধিকন্তু বিদেশীরা জার্ম্মাণির দুর্ব্বলতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। জার্ম্মাণ স্বদেশসেবকেরা বলিতেছেন:—"জার্ম্মাণির কমিউনিষ্টদিগকে টাকা ঘুষ দিয়া আঁতাঁতের লোকেরা নিজের মতলব হাঁসিল করিতেছে। মজুরপন্থীরা স্বদেশদ্রোহী হইতেছে।" অবশ্য বোল্‌শেভিকদের মতে 'স্বদেশ' নামক কোনো বস্তু নাই।

রুর অঞ্চলে মজুর-বিপ্লব সর্ব্বদাই কিছুনা-কিছু চলিতেছে। এই মুল্লুকে জার্ম্মাণরা কোনো মতেই পূরাপূরি "ভাই ভাই একঠাঁই" নয়। যেখানে যত শিল্পকারখানার প্রভাব, সেই খানেই তত মজুরে-মহাজনে বিদ্বেষ।

কাজেই জার্ম্মাণির শত্রুরা সর্ব্বদাই রুর-মুল্লুকে জার্ম্মাণ মজুরদিগকে জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে তাতাইয়া রাখিবার সুযোগ পাইতেছে। সুতরাং জার্ম্মাণ সত্যাগ্রহের এক প্রবল শত্রু জার্ম্মাণরা নিজেই। বোল্‌শেভিক যুগধর্ম্মের আমলে এইরূপ ঘটনা জগতের সর্ব্বত্রই ঘটিতেছে ও ঘটিবে। মজুরদিগকে মধ্যবিত্ত ও মস্তিষ্কজীবীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইবার জন্য সকল দেশের বিদেশী শত্রুরা আজকাল ফন্দি পাকাইতে শিখিয়াছে।

(৩)

রাইণ-রুর অঞ্চলের অনেক জার্ম্মাণ নরনারী প্রুশিয়াকে ঘৃণা করে। তাহারা প্রুশিয়ার সঙ্গে এক হইয়া জার্ম্মাণ রিপাব্লিকে থাকিতে চায় না।

দুঃখিত হইবে না। বলা বাহুল্য তাহারা বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো আন্দোলন চালায় না। বরং জার্ম্মাণদের কোনো কোনো দল খোলাখুলি 'স্বাধীন রাইণল্যাণ্ড' কায়েম করিতে প্রস্তুত।

এই ধরণের জার্ম্মাণরাও জার্ম্মাণ ন্যাশন্যালিষ্টদের মতে স্বদেশদ্রোহী ত বটেই। ইহারাও জার্ম্মাণ সত্যাগ্রহের প্রবল শত্রু। কিন্তু সম্প্রতি দুনিয়ার লোক বোল্‌শেভিকীদের মহাজন-বিদ্বেষটার কথাই বেশী শুনিতেছে। কেন না বোল্‌শেভিকরা জার্ম্মণিতে মহাজনদিগকে কাবু করিতে পারিলে সোভিয়েট রুশিয়ার মত ও পথ জগতে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। তাহার ফলে জার্ম্মাণির বাহিরেও রুরকাণ্ডের ঢেউ গিয়া ঠেকিবে।

রুর অঞ্চলের বোল্‌শেভিক মজুরেরা ফরাসী গবর্মেণ্টকে অথবা আঁতাঁতের গবর্মেণ্টগুলাকে জার্ম্মাণির শত্রু বিবেচনা করে কিনা এই বিষয়ে জটিল আলোচনা আবশ্যক। তাহাদের মতে জার্ম্মাণির শত্রু জার্ম্মাণ মহাজন, ফরাসী মহাজন, ইংরেজ মহাজন, বেলজিয়ান মহাজন ইত্যাদি। 'বিদেশীরা' রুর দখল করিয়াছে এজন্য তাহারা দুঃখিত,—এইরূপ বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। বস্তুতঃ দেশী-বিদেশী সকল প্রকার মহাজনকে কাবু করিতে পারাই তাহাদের সাধ।

জার্ম্মাণ ন্যাশন্যালিষ্টরা মজুরদিগকে সমঝাইতেছে—"স্বদেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ কায়েম কর।" মজুররা বলিতেছে:—"দেশের শত্রু ত তোমরাও বটে, বাবা! তোমাদের ধনী লোকগুলা বিদেশীদিগকে যদি লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের টাকা বুঝাইয়া দিত, তাহা হইলে বিদেশীরা রুর হাঙ্গামায় মাতিত কি? তোমরা মজুরদিগকে দুহিয়া টাকা রোজগার করিতেছ দেদার। এই রোজগারের অধিকাংশই তোমরা নিজ নিজ পুঁজিতে যোগ করিতেছ। ক্ষতিপূরণের টাকার জন্য এই পুঁজি ব্যবহার করিতেছ না কেন?"

(৪)

যেখানেই মজুর-সমস্যা সেইখানেই "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই।" মজুরেরা 'বুর্জ্জোআ' মহাজনের স্বপক্ষে লড়িতে প্রস্তুত নয়। কাজেই জার্ম্মাণদের সত্যাগ্রহ জার্ম্মাণজাতির সত্যাগ্রহ হইতে পারে নাই। জার্ম্মাণির কোনো কোনো দল মাত্র এই সত্যাগ্রহ চালাইতেছে। অনেক দল এই সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে উদাসীন এবং এমন কি অন্তরায়।

অনেক মজুর প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে বুর্জ্জোআদের স্বপক্ষে চলিতেছে। তাহার কারণ কি? জার্ম্মাণিতে আজকাল সৈন্য-সামন্তের ধুমধাম নাই। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট একপ্রকার অস্ত্রহীন কিন্তু ফ্রান্স এবং আঁতাঁত সশস্ত্র। কাজেই আঁতাঁতের বাড়াবাড়ি কমাইতে চেষ্টা করা মজুর এবং মজুর-পন্থীদের কর্ত্তব্য—এই বুঝিয়া জার্ম্মাণ জাতির কোনো কোনো মজুর-দল সত্যাগ্রহে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছে।

আর এক কথা। রুর অঞ্চলে জার্ম্মাণদের একতিয়ার না থাকিলে সেখানকার কারখানাগুলায় কাজ বন্ধ থাকিবে। তাহাতে মজুরদেরই ক্ষতি। ফরাসী বা বেলজিয়ান কোনো বিদেশী এঞ্জিনিয়ার হাজার চেষ্টা করিলেও কারখানাগুলা চালাইতে পরিবে না। রুরের কারখানা-গুলা এতই জটিল। কাজেই আঁতাঁতকে বাধা দেওয়া জার্ম্মাণ মজুরেরা নিজ নিজ ডাল-রুটির স্বার্থ বিবেচনা করিতেছে।

যাহা হউক, খাঁটি 'স্বদেশ-প্রেমের' নামে জার্ম্মাণ মজুরেরা আঁতাঁতের বিরুদ্ধে অথবা জার্ম্মাণির স্বপক্ষে দাঁড়াইতেছে না! স্বদেশ-প্রেমের নেশায় মজুরগণকে মশ্‌গুল করিয়া তোলা দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিতেছে। দুনিয়ায় এক নয়া আবহাওয়া মালুম হইতেছে।

(৫)

'দেশের স্বার্থে' রুর মজুরেরা মজুক বা না মজুক, দেখা যাইতেছে যে, কোনো কোনো জার্ম্মাণ মজুর প্রকারান্তরে আঁতাঁতকেই সাহায্য

করিতেছে। কেহ কেহ বা খোলাখুলি ফ্রান্সের পক্ষ গ্রহণ করিতেছে। এই সকল দলের প্রভাবেই জার্ম্মাণ সত্যাগ্রহ জাঁকিয়া উঠিতেছে না।

তবে সত্যাগ্রহ চালাইতেছে কাহারা? রুর অঞ্চলের সকল মজুরই বোল্‌শেভিক বা কমিউনিষ্ট নয়। ন্যাশন্যালিষ্ট-পন্থী মজুরদের সংখ্যাই বেশী। কমিউনিষ্টরা বাস্তবিক পক্ষে গুন্‌তিতে নেহাৎ কম।

রুরের খনিতে যত লোক কাজ করে, তাহাদের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লাখ। ইহাদের মধ্যে মাত্র বিশ হাজার বোলশেভিক। লোহা-ইস্পাতের কারবারে মজুর-সংখ্যা দুই লাখ। তাহাদের মধ্যে মাত্র হাজার পাঁচেক বোলশেভিক। রেল মজুরদের ভিতর অল্পসংখ্যক লোকই এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

মজুরদের ভিতর অনেকেই কোনো দলের লোক নয়। যাহারা দলের লোক তাহাদের দলাদলি বিষম। অধিকন্তু কমিউনিষ্ট দলও আবার নানা রঙে বিভক্ত। কেহ 'লাল' অর্থাৎ সোভিয়েট রুশ মতের, কেহ বা 'হল্‌দে' অর্থাৎ ওলন্দাজ মজুর-সঙ্ঘের লোক। এই সকল রং-বেরঙের জাতিভেদ সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাহার জন্য কেতাব লেখা আবশ্যক।

মজুরেরা যতদিন নানা দলে বিভক্ত থাকিবে, ততদিন তাহারা জার্ম্মাণিতে বোলশেভিক স্বরাজ কায়েম করিতে পারিবে না। ন্যাশন্যালিষ্ট এবং মামুলি সোশ্যালিষ্টরা ততদিন ধন-সাম্যের ব্যবস্থায় অনেক বাধা দিতে পারিবে।

অপর দিকে রুর-রাইন অঞ্চলে এবং জার্ম্মাণির অন্যান্য জনপদে যতদিন বোলশেভিক-পন্থী দু-চার-দশ-বিশ হাজার মজুর থাকিবে, ততদিন আঁতাঁতের রাষ্ট্রবীরগণ জার্ম্মাণির সমরপ্রয়াসের এবং প্রতি-[illegible] বাধা দিতে পারিবে। বোলশেভিক

মত জগতে এক নয়া 'হযবরল' সৃষ্টি করিয়াছে। সেই হযবরলটা বুঝিতে চেষ্টা করাও প্রত্যেক বিচক্ষণ ভারত-সন্তানের কর্ত্তব্য।

রুর-লড়াইয়ের তত্ত্ব-কথা

(১)

মানহাইম রাইন দরিয়ার দক্ষিণ অংশের এক বড় শহর। কেবল বড় শহর মাত্র নয়, এটা জার্ম্মাণির এক প্রকাণ্ড শিল্পকেন্দ্র। ব্যাভেরিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ জার্ম্মাণির বাণিজ্যের অনেক হিস্সাই আবার মানহাইমের পথে আসিয়া ঠেকে। কাজেই মানহাইম ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে জগতের এক নামজাদা শহর।

এই মানহাইমও কয়েক মাস ধরিয়া ফ্রান্সের দখলে আসিয়াছে। মানহাইমের আশেপাশের আরও কতকগুলা বড় বড় শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রশহরও আজ ফরাসীদের তাঁবে। এই শহরগুলা বাডেন এবং হেস্‌সে জেলার অন্তর্গত। ভৌগোলিক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ রাইন আজ ফরাসীর হস্তগত।

লড়াইয়ের সন্ধির ফলে (১৯১৯) ফরাসীদের তাঁবে আসিয়াছে (১) সার দরিয়ার দুইধারকার জনপদ এবং (২) রাইন দরিয়ার পশ্চিমের জার্ম্মাণ জেলাগুলা। এই বৎসর (১৯২২ সালে) ফরাসীরা দখল করিয়াছে রাইনের পূর্ব্ব সীমানার শিল্প-জেলাগুলা। ইহাদের ভিতর (১) রুর অঞ্চল উত্তর দিকে ভেষ্ট্‌ফালেন জেলায় অবস্থিত এবং (২) বাডেন ইত্যাদি জেলার শহরগুলা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

সকলগুলাকে একত্র করিলে রাইন জনপদ নাম দেওয়া যাইতে পারে। কখনো কখনো রাইন-রুর বলা হইয়া থাকে। কিন্তু রাইন-রুরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সমস্যাগুলা সর্ব্বদা ভিন্ন ভিন্ন। সার, রাইন, রুর ও মানহাইম —এই চার অঞ্চল আলাদা আলাদারূপে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(২)

সাধারণতঃ কাগজওয়ালারা খবর ছাপিতেছে যে, ফরাসীরা অথবা ফরাসী এবং বেলজিয়ানরা দুইয়ে মিলিয়া এই সকল জনপদে একতিয়ার কায়েম করিতেছে। দুনিয়ায় রটিয়াছে যে, জার্ম্মাণরা একমাত্র ফরাসীদের বিরুদ্ধে অথবা ফ্রান্স এবং বেল্‌জিয়ামের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের লড়াই চালাইতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে রাইন-রুরের লড়াইটা নেহাৎ জার্ম্মাণ-ফরাসীর লড়াইমাত্র নয়। এখানে একসঙ্গে অনেকগুলা লড়াই চলিতেছে। ফ্রান্স একমাত্র বেল্‌জিয়ামের সাহায্যে এই রুর-কাণ্ডে হাত দেয় নাই। ফ্রান্সের পশ্চাতে গোটা আঁতাঁত খাড়া আছে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডকে অনেকে 'নিউট্রাল', নিরপেক্ষ বা উদাসীন সমঝিতেছে। ইহা এক মস্ত ভুল ধারণা। জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে লেলাইয়া দিয়া ইংল্যাণ্ড আগাগোড়া নিজের মতলবই হাসিল করিতেছে। ফরাসীদের রুর-মানহাইম অভিযানে ইংল্যাণ্ডের লাভ জুটিয়াছে, জুটিতেছে ও জুটিবে ষোল আনা।

ফ্রান্সকে রুর-কাণ্ডে বাধা দেওয়া ইংরেজের স্বার্থ নয়। বাধা দিলে ইংরেজের ক্ষতি অনেক। ইংরেজ এবং ফরাসী এই ক্ষেত্রে "চোরে চোরে মাসতুত ভাই"। দুইয়ে একই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিবার মতলবে একই ষড়যন্ত্র চালাইতেছে।

সেই ষড়যন্ত্রটা নতুন কিছু নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের এ একটা জের মাত্র। মহা-লড়াইয়ের আয়ুটা এই উপায়ে খানিকটা বাড়িয়া যাইতেছে।

(৩)

ইংরেজ এবং ফরাসী একমাত্র রুরের কথা ভাবিতেছে না। এই

এবং রুর,—অর্থাৎ তুরস্ক এবং জার্ম্মাণী—দুই মুল্লুককে শাসানো হইতেছে একই চাবুকে।

যুবক-তুর্কের বীরবর কামালপাশা গ্রীসকে 'পাঁচজুতা' লাগাইয়া দিয়াছে। গ্রীসের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে এশিয়ার ইজ্জদ বাড়িয়াছে। মানিলা হইতে মরক্কো পর্য্যন্ত প্রাচ্যের নরনারীরা শাদা-চামড়াওয়ালা জাতিগুলাকে 'কলা দেখাইতে' সুরু করিয়াছে। ১৯০৫ সালে জাপানীর হাতে রুশিয়াকে হারিবার পরও এশিয়ার এই মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল।

কিন্তু কামালপাশা গ্রীসকে হারাইল কি করিয়া? সকলেই জানে গ্রীসের মুরুব্বি ছিল ইংল্যাণ্ড, তুর্কের মুরব্বি ছিল ফ্রান্স। গ্রীক-তুর্ক লড়াইয়ে একটা খাঁটি ইংরেজ-ফরাসী লড়াই ঘটিয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের সাহায্যেই কামালপাশা এশিয়ায় এক নবশক্তি পয়দা করিতে পারিয়াছেন।

তুর্ক লড়াইয়ে জিতিয়াছে বটে,—কিন্তু সন্ধির বেলায় কামালপাশা হারিতে বসিয়াছে কেন? লোজানের বৈঠকে যুবক তুর্ক নিজের স্বর চড়া রাখিতে পারিতেছে না কেন? তাহার কারণ, ফ্রান্স আর তুর্ককে বেশীদূর সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয়।

ফরাসীরা তুর্ককে অনেক উঁচুতে ঠেলিয়া তুলিয়াছে। এখন ফ্রান্স বলিতেছে,—"তুর্ক ভায়া, এই বার চ'রে খাও"। তুর্ক এখন তাই বোলশেভিক রুশিয়ার শরণাপন্ন। রুশের ক্ষমতা এইবার দুনিয়ায় যাচাই হইবে।

(৪)

ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে বলিতেছে,—"দেখ, তুমি যদি যুবক তুর্ককে আর বেশী বাড়াবাড়ি করিতে দাও, তাহা হইলে খোলাখুলি আমি তোমার প্রেম ছাড়িয়া জার্ম্মাণ-প্রেমে মজিব।" ফ্রান্স বুঝিতেছে, "তাইত!

জন্য। তুরস্ককে একটা প্রবল রাষ্ট্রশক্তি করিয়া তোলা আমার স্বার্থ কোনো মতেই নয়। ইংরেজ এখন খানিকটা জব্দ হইয়াছে। কাজেই এখন হইতে আবার ইংরেজের তোয়াজ করা যাউক।”

সুতরাং আবার ইংরেজে-ফরাসীতে সমঝোতা দেখা দিয়াছে। এশিয়ায় তুরস্ককে ঢিট করিবার ভার লইয়াছে ইংরেজ। ইয়োরোপে জার্ম্মাণিকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে ফরাসী। ইংরেজ বলিতেছে—“ফরাসী, আমি তুরস্ক সম্বন্ধে যে সকল ফিকির চালাইতেছি, সে সম্বন্ধে তুমি উচ্চবাচ্য করিও না। অপরদিকে তুমি জার্ম্মাণি সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতেছ, সে সম্বন্ধে আমি থাকিব বিলকুল উদাসীন।” ফরাসী জবাব দিতেছে—“তথাস্তু”।

জার্ম্মাণিকে জব্দ করিলে ফ্রান্সেরও লাভ, ইংরেজেরও লাভ। আবার তুরস্ককে জব্দ করিলে ইংরেজেরও লাভ, ফ্রান্সেরও লাভ। জার্ম্মাণির অতিবৃদ্ধি একমাত্র ফ্রান্সেরই ভয়ের কারণ নয়, ইংল্যাণ্ডেরও ভয়ের কারণ বটে। অপর দিকে তুরস্কের অতিবৃদ্ধিও,—সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার জাগরণও,—একমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই ভয়ের কারণ নয়, ফরাসী সাম্রাজ্যেরও বিপদের কারণ সন্দেহ নাই।

(৫)

ফ্রান্সের রুর-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই লাভ হইয়াছে অনেক। এই লড়াইয়ে একটা শিল্প ও বাণিজ্যের লড়াই চলিতেছে।

জার্ম্মাণ সত্যাগ্রহের ফলে রুরের খনিতে কয়লা উঠিতেছে কম। কাজেই জার্ম্মাণরা বিদেশ হইতে কয়লা আমদানি করিতেছে। রুর অঞ্চলের লোহার কারখানা হইতে জার্ম্মাণিতে এবং ইয়োরোপে নানা দেশে লোহার মাল রপ্তানি হইত। এই রপ্তানির পথ এখন অনেকটা আটক। কাজেই বিদেশ হইতে জার্ম্মাণিতে এবং ইয়োরোপের নানা দেশে আমদানি অনিবার্য্য।

এই সকল দেশের অর্ডার পৌঁছিতেছে প্রধানতঃ বিলাতে। কাজেই রুরের 'সর্ব্বনাশে', বিলাতের কপালে জুটিতেছে 'পৌষমাস'।

বিগত তিন চার মাসের কারবারের ফলে ইংরেজ খাদের মালিকেরা ফুলিয়া উঠিয়াছে। বন্দরে বন্দরে, জাহাজে জাহাজে মাল চালান হইতেছে অবিরত। বৎসর দুই ধরিয়া বিলাতী মজুররা বেকার বসিয়াছিল লাখে লাখে। সেই মজুর-সমস্যা আজ অনেকটা কমিয়াছে। এখন আর বিলাতে কাজের অভাব নাই।

অধিকন্তু বিলাতী টাকার বাজারও আজ বেশ সচ্ছল। ইংরেজরা মার্কিন গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছে—"তোমাদের নিকট যত টাকা কর্জ্জ লইয়াছি, তাহার সুদ এখনই বুঝাইয়া দিতে সুরু করিব। আমরা ফ্রান্স ইতালী ইত্যাদি দেশের নিকট যে সকল টাকা পাইব, তাহা ফিরাইয়া পাই বা না পাই, আমরা আমাদের ধার শোধ করিতে রাজি আছি।"

ফলতঃ বিলাতী পাউণ্ড ধাঁ করিয়া মার্কিন ডলারের তুলনায় চড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাউণ্ডে-ডলারে যে দর ছিল, এতদিন পরে প্রায় সেই দর আসিয়া ঠেকিল। সকল দিক্ হইতেই ইংরেজের লাভ।

রুর-কাণ্ডে ইংরেজ ফ্রান্সকে বাধা দিবে কেন? জার্ম্মাণ শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতিতে বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি। এই সামান্য কথাটা কি ইংরেজ বুঝে না?

(৬)

জার্ম্মাণির শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস করা মহা-লড়াইয়ের এক উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যই রুর-কাণ্ডে আরও গভীর ভাবে সাধিত হইতেছে। কাজেই এই ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের মস্ত সহায়।

জার্ম্মাণিকে লোক-সংখ্যার এবং ভূমির পরিমাণে খাটো করিয়া

ফেলাও মহা-লড়াইয়ের এক উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যের খানিকটা সন্ধির ফলে সাধিত হইয়াছে। কিন্তু সেইদিকে আরও বেশী অগ্রসর হইবার জন্যই আঁতাঁত রুর-কাণ্ডে হাত দিয়াছে।

সার, রাইন, রুর ও মানহাইম—এই চার অংশ একত্র করিলে একটা বেশ চলনসই মাঝারি গোছের নয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে। লোক-সংখ্যা হইবে দুই কোটী। তাহাকে রাইন-রিপাব্লিক বলা যাইবে। এই রিপাব্লিককে জার্ম্মাণ-রিপাব্লিক হইতে পুরাপুরি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিলে জার্ম্মাণিকে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করা হইবে। এই মতলবেই আঁতাঁত ভার্সাইয়ের পর হইতে জার্ম্মাণির সঙ্গে লড়িতেছেন।

জার্ম্মাণিকে ভাঙ্গিয়া তিন চারটা ছোট ছোট স্বাধীন রিপাব্লিক কায়েম করা ফ্রান্সের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডও ফ্রান্সেরই বন্ধু এবং সহায়ক। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারিকে যেমন টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হইয়াছে, জার্ম্মাণিকেও সেইরূপ টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা বৃটিশ সাম্রাজ্য-নীতির অন্তর্গত। অন্ততঃ পক্ষে রাইন জনপদে যাহাতে জার্ম্মাণির একতিয়ার আর না আসে, সেদিকে ইংরেজ রাষ্ট্রবীরগণের বিশেষ দৃষ্টি।

জার্ম্মাণ সমাজে যুবক ভারত

(১)

জার্ম্মাণ সমাজের মহলে-মহলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভারত-সন্তানেরাও জার্ম্মাণদিগকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইতেছে। এই মেলামেশা মোটের উপর বিগত দেড় দুই বৎসরের (১৯২১-২৩) কার্য্যফল।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত সহিদ সুহ্রভর্দি জার্ম্মাণির থিয়েটারমণ্ডলে পরিচিত। ইনি প্রধানতঃ রুশজাতীয় রঙ্গালয়ের সম্পর্কেই জার্ম্মাণ

নরনারীকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপ কুমার রায় বার্লিনের পরিবারে-পরিবারে হিন্দী ও বাঙ্গলা গান শুনাইয়া গিয়াছেন। মহীশূরের শ্রীমতী কনকলক্ষ্মী জার্ম্মাণিতে বেড়াইতে আসিয়া কোনো কোনো বৈঠকে বীণা বাজাইয়াছেন।

ইণ্ডোইয়োরোপা-ট্রেডিং কোম্পানীর উদ্যোগে বার্লিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে দুই মাস ধরিয়া ভারতীয় নবীন চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী খোলা রহিয়াছে (জানুয়ারি-মার্চ ১৯২৩)। জার্ম্মাণির নানা শহরে এই সকল ছবি সম্বন্ধে সংবাদপত্রে মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে। বার্লিনের বহু নরনারী এই প্রদর্শনী দেখিয়া যুবক ভারতকে এক নতুন চোখে দেখিতে সুরু করিয়াছে। গ্যালারির কর্ত্তা শ্রীযুক্ত জুষ্টি বলিতেছেন—"প্রদর্শনীটা এতদূর সফলতা লাভ করিবে পূর্ব্বে আমরা তাহা ভাবিতে পারি নাই"। শিল্প ও শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী এবং কর্ম্মকর্ত্তারা এই সফলতায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

লড়াইয়ের পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা ভারত-সন্তানের চেহারা পর্য্যন্ত দেখে নাই বলা যাইতে পারে। আজ ইহারা ভারতবাসীর গান-বাজনা, সুকুমার শিল্প পর্য্যন্ত একটু আধটু দেখিতে শুনিতে পাইতেছে। পূর্ব্বে ভারতবাসী—দু'একজন ছাড়া—জার্ম্মাণদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত ছিল না। আজ অন্ততঃ কয়েক শ' জার্ম্মাণ নর-নারীকে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নিত্য-নৈমিত্তিক 'আটপৌরে' জীবনে চিনিতে পারিতেছে।

(২)

লড়াইয়ের পূর্ব্বে গোটা জার্ম্মাণিতে বোধ হয় মাত্র দুইটা বা তিনটা ভারতীয় ব্যবসাদারের আফিস ছিল। আজ এক বার্লিনেই অন্ততঃ দেড় গণ্ডা বেপারীর কারবার চলিতেছে। অধিকন্তু হাম্বুর্গবন্দরে দশ-বারটা ভারতীয় আমদানি-রপ্তানির আফিস রহিয়াছে।

এই সকল ব্যবসায়ীর ভিতর গুজরাতীরা প্রধান। পাঞ্জাবী ও

বাঙ্গালীও দুই এক ঘর আছে। মারাঠারাও আফিস খুলিতেছে। কোনো মান্দ্রাজী বোধ হয় এখনও জার্ম্মাণির কোথাও কারবার স্থরু করে নাই। কিন্তু ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই ব্যবসায়ীরা জার্ম্মাণির নানা শিল্প-নগর দেখিয়া শুনিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মাণির কারখানাগুলা ভারতবাসীর পক্ষে আজ নেহাৎ অ-জানা জুজুমাত্র নয়।

কারবার উপলক্ষ্যে ভারত-সন্তানেরা বড় বড় জার্ম্মাণ মহাজনদের সঙ্গে দেখা শুনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন। অধিকন্তু যাঁহারা বেশীদিন ধরিয়া জার্ম্মাণিতে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ শিল্পনায়কগণকে বেশ একটু ভালরূপেই জানেন।

কথায় বলে 'এলে-গেলে কুটুম্ব'। জার্ম্মাণে-ভারতসন্তানে এইরূপ কুটুম্বিতা বাড়িয়া যাইতেছে। জার্ম্মাণি সম্বন্ধে ভারতবাসীরা আর বেশী দিন আনাড়ি থাকিবে না।

(৩)

ভারতীয় পর্য্যটক ও ছাত্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বার্লিনে একটা ভারতীয় সঙ্ঘ আছে। তাহার নাম 'ইণ্ডিশে নাখরিখটেন ব্যিরো'। ইহার সম্পর্কে আসিয়া বহু ভারতবাসীর অনেক উপকার হইয়াছে। জার্ম্মাণি সম্বন্ধে সকল প্রকার খবর এইখানে পাওয়া যায়। 'ব্যিরো' ভারতীয় ছাত্রগণকে জার্ম্মাণির নানা ফ্যাক্টরিতে ঢুকাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই 'ব্যিরো'র কাজে বিশেষ অনুরাগী। 'যুগান্তরে'র ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'বুড়া বয়সে' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে পি-এইচ-ডি উপাধির জন্য খাটিতেছেন। কিন্তু ইনিও 'ব্যিরো'তে কাজ করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্রের ব্যবসায়ী যুবা তল্‌বল্‌-'কার এবং গনপুলে 'ব্যিরো'র ব্যবসা-বিভাগের তদবির করেন।

সেই সঙ্গে সামাজিক লেন-দেন ও জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

মুসলমান সমাজে আজকাল ভারতে নানা ধর্ম্মমত দেখা দিয়াছে। সেই দলাদলির জের ইয়োরোপে এবং আমেরিকায়ও আসিয়া ঠেকিয়াছে। 'আহমদীয়' সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসংস্কারকেরা বার্লিনে এক মসজিদ গড়িবার ব্যবস্থা করিতেছেন। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত মোবারক আলি এই জন্য মোতায়েন আছেন।

ইঁহাদের বিরুদ্ধে দল পাকাইবার জন্য হাজির আছেন 'গোঁড়া' মুসলমানেরা। তাঁহাদের চাঁই দিল্লীর দুই ভাই। নাম তাঁদের সাত্তার। শুনা যাইতেছে, বার্লিনে নাকি তিন তিনটা স্বস্ব-প্রধান মসজিদ কায়েম করা হইবে।

(৪)

জার্ম্মাণ ভাষায় যে কয়জন ভারত-সন্তান ওস্তাদ তাঁহাদের মধ্যে ইলেক্‌ট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অন্যতম। জার্ম্মাণির বড় বড় শিল্প-নায়কগণের সঙ্গে ইঁহার লেন-দেন আছে।

ত্রিবাঙ্কুরের শ্রীযুক্ত চম্পকরাম পিল্‌লেই জার্ম্মাণে অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। জার্ম্মাণির ন্যাশন্যালিষ্ট-পন্থী রাষ্ট্রীয় দলে ইঁহার গতিবিধি। মিশর, পারশ্য, তুরস্ক ইত্যাদি দেশীয় লোকগণও ইঁহার এক গেলাসের ইয়ার।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও জার্ম্মাণ ভাষায় পাকা লোক। কিন্তু ইনি গলাবাজি করেন না। ইঁহার নাম জার্ম্মাণ-মহলে জাতি-ধর্ম্ম-ব্যবসা-নির্ব্বিশেষে সুপরিচিত।

দিল্লীর সাত্তার ভাইয়েরা মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারের পাণ্ডা। এই ধর্ম্মের কথা জানিবার জন্য যে-সকল জার্ম্মাণ মাথা ঘামাইয়া থাকেন, তাঁহারা ইঁহাদিগকে জানেন। বৃন্দাবনের মহেন্দ্রপ্রতাপ এ দেশে সজ্জ

গড়িয়া 'প্রেমধর্ম্ম' বিলাইয়া গিয়াছেন। আমেরিকার মতন ইয়োরোপেও ধর্ম্মবক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক নরনারী হাজির হয়।

যে সকল ছাত্র অথবা রিসার্চ্চ স্কলার জার্ম্মাণিতে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে পাঞ্জাবের শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ রায় জার্ম্মাণ ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি এ দেশে বহুকাল যাবৎ আছেন। অন্যান্য সকলে প্রায়ই নূতন। তাঁহারা কোনো মতে কাজ চালাইয়া লইতেছেন। জার্ম্মাণ ভাষা দখল করা কঠিন।

তাহা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ভারতীয় ছাত্রগণের ভাষাজ্ঞানের তারিফ করিয়া থাকেন। কোনো কোনো অধ্যাপকের নিকট শুনা গিয়াছে—"ভারতবাসীরা অতি শীঘ্র জার্ম্মাণ ভাষা আয়ত্ত করিতেছে। ইহাদের জার্ম্মাণ উচ্চারণ অন্যান্য বিদেশীদের উচ্চারণ হইতে বেশী স্পষ্ট এবং নির্ভুল।"

(৫)

ভারত-সন্তানদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনো বিদ্বেষ জন্মে নাই। তবে ভারতবাসীদের একটা দোষ ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণদের নজরে পড়িয়াছে। কোনো কোনো প্রবীণ জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"ভারতবাসীরা পরস্পরকে অত্যধিক হিংসা করে। একজন আর একজনের উন্নতি অথবা সুনাম সহ্য করিতে পারে না। বিদেশীর নিকট একজন ভারত-সন্তান অপর একজন ভারত-সন্তানের বিরুদ্ধে, এমন কি মিথ্যা নিন্দা রটাইতেও লজ্জা বোধ করে না।"

এই পরশ্রীকাতরতা যে ভারতবাসীর এক মস্ত দোষ, তাহা বোধ হয়, প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীই বেশ ভাল রকম জানেন। ছেলে-ছোকরাদের ত কথাই নাই, আমাদের নামজাদা জননায়ক মহাপ্রভুরাও এই পাপে কম কলুষিত নন। চরিত্র-সংস্কার কিরূপে সাধিত হইতে

ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে যত দলাদলি তাহার গোড়ার কথা কোনো তথাকথিত মতবাদ বা কর্ম্মপ্রণালী নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মত এবং কর্ম্মকৌশল সম্বন্ধে দলে দলে বিভিন্নতা সাধিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই ঝগড়ার আসল কারণ নাম লইয়া মারামারি, ক্ষমতা এবং অধিকার লইয়া কামড়াকামড়ি। কি বৈজ্ঞানিক, কি সাহিত্যিক, কি রাষ্ট্রিক, কি সন্ন্যাসী, কি সংসারী—আমাদের কেহই এই পাপ এড়াইতে পারেন নাই। কথাটার ভিতর অত্যুক্তি বেশী নাই। সকলেই নিজের বুকে হাত দিয়া বিচার করিতে বসুন।

আমাদের এক জন কোনো কাজ করিয়া বড় হইতেছে—এই দৃশ্য দেখিবা মাত্র ভারতে আমরা দুঃখিত হইয়া পড়ি। সেই লোকটা কিছু নয়, উহার ক্ষমতা অথবা প্রভাব বাড়া উচিত নয়, উহাকে যেন তেন প্রকারেণ 'সবংশে নিধন' করিতেই হইবে—এই চিন্তায় ও চেষ্টায় আমরা দল পাকাইতে লাগিয়া যাই।

'হাজার লোকে একই সময়ে হাজারটা ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিয়া হাজার উপায়ে যশস্বী হউক,' অথবা 'অমুক লোকের কাজে যদিও আমি সাহায্য করি না, তথাপি সেও একটা করিৎ-কর্ম্মা লোকই বটে',—এইরূপ চিন্তা যুবক ভারতে সুবিস্তৃত না হইলে চরিত্র-সংস্কারের গোড়াপত্তন হইবে না। হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা যুবক ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেছে। যথাসময়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। একটা অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলা গেল।

(৬)

জার্ম্মাণি-প্রবাসী সকল ভারত-সন্তান একত্র হইয়া একটা ক্লাব গড়িতেছেন। হাম্বুর্গের ব্যবসায়ীরা, বার্লিনের ব্যবসায়ীরা—হিন্দু-মুসলমান, পাঞ্জাবী, মারাঠা, বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী—সকলেই এই উদ্দেশ্যে টাকা সাহায্য করিতেছে। হয়ত এই গ্রীষ্মে একটা 'ভারতীয় ভবন' ভাড়া লইবার ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন নগরের শিল্প-কারখানা এবং ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষে সবিশেষ খবর পৌঁছিত না। বৎসর খানেক হইল সেই অভাব মোচন করিবার জন্য ভারতবাসীর অধীনে একটা পত্রিকা সুরু করা হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় সম্পাদিত হয়। কাগজের নাম 'কমার্শ্যাল নিউজ'। বর্ত্তমান লেখক তাহার সম্পাদক।

(৭)

লড়াইয়ের পূর্ব্বে জার্ম্মাণির বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবং শিল্প-কারখানায় অতি অল্পসংখ্যক ভারতীয় ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছে। বার্লিনের 'টেখ্‌নিশে হোখশুলে'তে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত এঞ্জিনিয়ারিং চর্চ্চা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি পাঁইয়াছেন বো..ইয়ের বিষ্ণু সীতারাম সুখ্‌থাঙ্কার এবং যুক্তপ্রদেশের অবাদুল মন্সুর। ইঁহারা দুই জনেই ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী আকরতত্ত্বে ডিগ্রিলাভ করিয়াছেন। রসায়নবিভাগে পি-এইচ-ডি পাইয়াছেন লাহোরের আবদুল হাকিম এবং অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ইত্যাদি। উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানে 'ডক্টর' হইয়াছেন শ্রীযুক্ত আগরকার। পদার্থবিদ্যার ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু ইত্যাদি এইরূপ আরও দু'একজনের নাম করা যায়।

আজকাল জার্ম্মাণির প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারতীয় ছাত্র বিদ্যা লাভ করিতেছে। বার্লিনে মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ জনের বেশী ছাত্র নাই। কিন্তু মফঃস্বলের বিশ্ববিদ্যালয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। সর্ব্বত্রই দু' একজন করিয়া ফ্যাক্‌টরিতে কাজ শিখিবার সুযোগ পাইতেছে।

যে সকল ছাত্র মফঃস্বলে লেখাপড়া করিতেছে, তাহারা সকলেই অল্প সময়ে জার্ম্মাণ ভাষায় পাকা হইয়া উঠিতেছে। অধিকন্তু তাহারা জার্ম্মাণির পারিবারিক জীবন ও সামাজিক প্রথা অতি সহজেই

ঝিতে পারিতেছে। এই সূত্রে জার্ম্মাণ সমাজে তাহারা অনেকেই ার্থ বন্ধুলাভ করিতেও পারিয়াছে।

বার্লিন অতি বড় শহর। এখানে জার্ম্মাণ সমাজকে স্পর্শ করা কঠিন; একপ্রকার অসম্ভব। কোনো কোনো রাস্তায় এবং মহাল্লায় বিদেশীর সংখ্যা এতবেশী যে জার্ম্মাণ ভাষা শুনিতেই পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার ভিতর রুশ যেখানে-সেখানে কানে আসে।

তাহা ছাড়া বার্লিনে ইহুদি অনেক। কিন্তু জার্ম্মাণরা ইহুদি লোকজনকে খাঁটি স্বদেশী বিবেচনা করে না। যে সকল ছাত্র মফঃস্বলে বসবাস করে, তাহারা ইহুদির আওতা হইতে দূরে থাকিতে পায়। কাজেই তাহারা জার্ম্মাণির মধ্যবিত্ত সুশিক্ষিত ভদ্রলোকদের ধরণধারণগুলা বিনা কষ্টে ধরিতে পারে। জার্ম্মাণ আদর্শ, জার্ম্মাণ স্বধর্ম্ম, জার্ম্মাণ 'কুল্‌টুর' আয়ত্ত করিতে হইলে ভারতবাসীকে মফঃস্বলেই আড্ডা গাড়িতে হইবে।

রাইন-ছাড়া জার্ম্মাণি

(১)

রুর-রাইন সমস্যা ক্রমশই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। এই জনপদের জার্ম্মাণ নরনারীরা সকলেই ফ্রান্সের শত্রু নয়। বরং অনেকেই প্রুশিয়ার অর্থাৎ উত্তর জার্ম্মাণির উপর চটা।

আখেন শহর রাইন জনপদের উত্তর অঞ্চলে নামজাদা। বেল্‌জিয়ামের সীমানায় এই শহর অবস্থিত। যুদ্ধ থামিবার পর হইতেই এই জার্ম্মাণ নগর আঁতাঁতের দখলে আছে।

আখেনের কোনো কোনো জার্ম্মাণ বার্লিনে বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝা যায়—"রাইনের জার্ম্মাণরা ফরাসীদের ব্যবহারে সন্তুষ্টই আছে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো আন্দোলন

রাইন অঞ্চলে নাই। তবে রুর অঞ্চলের প্রুশিয়ানরা ফ্রান্সের সঙ্গে কোনো প্রকার লেন-দেন চায় না। ইহারাই জার্ম্মাণিতে আজকাল অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে।”

এই ধরণের মত নানা স্থানেই শুনা যায়। বুঝা যাইতেছে যে, রুরের জার্ম্মাণ আর রাইনের জার্ম্মাণ দুই স্বতন্ত্র বস্তু। রাইনের জার্ম্মাণরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বেশী লড়িতেছে না। রুরের জার্ম্মাণরাই ফ্রান্সের শত্রু।

(২)

কিন্তু রুরের সকল জার্ম্মাণই ফ্রান্সের শত্রু, একথাও বলা চলে না। মজুর-পন্থীদের কথাবার্ত্তায় বুঝা যায় যে, মাত্র সোশ্যালিষ্ট মতের মজুরেরা জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের দলে আছে। কিন্তু কমিউনিষ্ট এবং সিণ্ডিকালিষ্ট-পন্থী মজুরেরা জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টকে সাহায্য করিতেছে না। ইহারা চরম মতের লোক।

চরম মজুর-নায়কেরা বলিতেছেন—“রুর জার্ম্মাণির জেলাই থাকুক আর অন্য কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের জেলায় পরিণতই হউক, তাহাতে জার্ম্মাণ মজুরদের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। মজুরদের শত্রু ফ্রান্স নয়। ফরাসী মহাজন এবং সমরনায়কেরা জার্ম্মাণ মজুরদের শত্রু। বিলকুল এই ধরণের শত্রুই আবার জার্ম্মাণ মহাজন এবং সমরনায়কেরা।”

কমিউনিষ্ট এবং সিণ্ডিকালিষ্ট মজুরেরা ফরাসী মজুরদের সঙ্গে হামদর্দ্দি করিয়া জার্ম্মাণ এবং ফরাসী দুই গবর্মেণ্টকেই লোপাট করিতে চাহে। এই জন্যই জার্ম্মাণির ন্যাশন্যালিষ্ট-পন্থী স্বদেশসেবকেরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পরিতেছে না।

(৩)

এদিকে রাইন অঞ্চলের বড় বড় ব্যবসা ও ব্যাঙ্কগুলা ফ্রান্সের

মহাজনদের সঙ্গে বন্ধুভাবে কারবার চালাইতেছে। ক্যোলন শহরটাকে ইংল্যাণ্ডের অধীনস্থ এক বিপুল বাণিজ্য-বন্দর বলা চলে। বিদেশী বয়কট নামক কোনো বস্তু রাইন জনপদে একপ্রকার নাই বলিলে ভুল হইবে না।

বিদেশী পর্য্যটকরা বলিতেছে—"রাইন জনপদে কোনো প্রকার অশান্তি নাই। তেজারতের লেন-দেন চলিতেছে, হামেশা যেরূপ চলিয়া থাকে। একতিয়ার দেখা যায়, হয় ফরাসীদের না হয় ইংরেজদের। জার্ম্মাণ অধিবাসীরা বিদেশী প্রভুত্ব সহিয়া লইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের কোনো তীব্র লক্ষণ লক্ষ্য করা কঠিন।"

রুর সম্বন্ধে পর্য্যটকরা বলিয়া থাকে—"কাজ চলিতেছে প্রায় সকল ফ্যাক্টরিতেই। যে সকল ফ্যাক্টরি ফরাসীরা দখল করিয়াছে, সেই সকল ফ্যাক্টরির জার্ম্মাণ মজুরেরা হরতাল করিতেছে। কিন্তু তাহাদের ঠাঁইয়ে ফরাসীরা বসাইয়াছে পোল এবং চেকোশ্লোভাক মজুর। ইহারা জার্ম্মাণ ভাষায় কথা বলিতে পারে।

"অধিকন্তু রেলপথগুলা আগাগোড়া ফ্রান্সের দখলে। গোটা রুর জনপদকে জার্ম্মাণি হইতে ফারাক করিয়া ফেলা হইয়াছে। পর্য্যটকরা সুখে-স্বচ্ছন্দে বার্লিন হইতে প্যারিস অথবা প্যারিস হইতে বার্লিন চলাফেরা করিতে পারে না। উঠা-নামা, মাল-পরীক্ষা, পাসপোর্ট ইত্যাদির ঝঞ্ঝাট অনেক।"

(৪)

এই সব দেখিয়া শুনিয়া চতুর লোকেরা অনুমান করিতেছে, রাইন এবং রুর দুই-ই জার্ম্মাণির হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। আঁতাঁতের আওতা হইতে এই দুই মুল্লুক বাহির করিয়া আনা জার্ম্মাণির পক্ষে সহজ নয়।

বিচক্ষণ জার্ম্মাণ ন্যাশন্যালিষ্টরাও কানা ভাবে দিন কাটাইতেছে না।

ইহারা বেশ বুঝিয়াছে এবং খোলাখুলি বলিতেছে—"রাইন এবং রুর আমরা হারাইয়াছি। আমাদিগকে হয়ত আরও অনেক ক্ষতি সহিতে হইবে। পোল্যাণ্ড আমাদের সিলেসিয়া অঞ্চলের শিল্প-বহুল মুল্লুকটা পুরাপুরি দখল না করিয়া ছাড়িবে না।"

কাজেই ৫ মে তারিখে সেনাপতি লুডেনডোর্ফ ছাত্রসম্মেলনের ভুৎসর্বুর্গ অধিবেশনে এক স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। ইঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম এই :—"খোল তরবার।"

সত্যাগ্রহের লড়াইয়ে অনেক সুফল ফলিয়াছে—একথা লুডেনডোর্ফ অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহার মতে,—অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব জার্ম্মাণির বর্ত্তমান দুরবস্থার একমাত্র কারণ।

তিনি প্রচার করিয়াছেন—"সত্যাগ্রহ গোলামজাতির রণ-নীতি। যতদিন আমরা সত্যাগ্রহের লড়াই চালাইতে থাকিব, ততদিন আমরা আমাদের গোলামীর এবং কাপুরুষতার এবং অস্ত্রহীনতার পরিচয় দিব মাত্র। সত্যাগ্রহ কোনো দিনই আমাদিগকে স্বাধীনতা আনিয়া দিতে পারিবে না। এই কথাটা বিনা গোঁজামিলে যুবক জার্ম্মাণির মরমে পশা আবশ্যক।"

মধ্য-জার্ম্মাণির শিল্প-কেন্দ্র

(১)

লড়াই আসিতেছে,—আজ কিংবা কাল। তাহার জন্য জার্ম্মাণিকে প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে। লড়াইয়ের প্রধান সহায় শিল্প। রুর এবং রাইন ছিল জার্ম্মাণির শিল্প-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলি জার্ম্মাণির হাতছাড়া হইয়া গেলে জার্ম্মাণি লড়িবে কিসের জোরে?

জার্ম্মাণরা এজন্য পূর্ব্ব হইতেই পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। মধ্য-জার্ম্মাণির জেলায়-জেলায় নয়া-নয়া কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের সুযোগে এই সকল অঞ্চলে শিল্প-কেন্দ্রের গোড়াপত্তন হয়। লড়াই থামিবার পর হইতে এইগুলা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর মধ্য-জার্ম্মাণিতে একটা নয়া রাইন-রুর দাঁড়াইয়া যাইবে, বিশ্বাস করা সম্ভব।

স্যাক্সনির উত্তর অঞ্চল বহুদিন হইতেই জার্ম্মাণির শিল্পকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ। ট্যিরিঙ্গেন জনপদের উত্তরাংশেও ফ্যাক্টরির প্রভাব অনেক। হার্ৎস্ পাহাড়ের দক্ষিণ এবং পূব অঞ্চলটাও এই হিসাবে জার্ম্মাণ সমাজে সুপরিচিত। এই সকল জেলা বার্লিন হইতে বেশী দূরে নয়।

হালে শহরটাকে এই 'নয়া রাইন জনপদের' কোলন স্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। আর্ফুর্ট, ভাইমার, ড্রেসডেন, মাগ্-ডেবুর্গ ইত্যাদি নামাজাদা শহর এই শিল্প-মুল্লুকেরই অন্তর্গত। এই সকল অঞ্চলের পল্লীতে নয়া-নয়া কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে। সেগুলা কালে এসসেন ড্যিস্‌সেলডোর্ফ ইত্যাদি রুর-শহরগুলার সঙ্গে টক্কর দিতে থাকিবে।

(২)

মধ্য-জার্ম্মাণির বহু বিরাট শহরের নাম জার্ম্মাণির বাহিরে এখনো বেশী লোক জানে না। তাহাদের একটার নাম মেসের্বুর্গ। ১৯১৩ সালে এখানে ছিল প্রায় ৪৭০০ ফ্যাক্টরি। ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে ফ্যাক্টরির সংখ্যা ৫৮০০। এই কয় বৎসরে মজুর-সংখ্যা বাড়িয়াছে এক লাখ হইতে ১৬০,০০০ পর্যন্ত।

মেসের্বুর্গের আশে-পাশে ব্রাউনকোল, ইগনিট বা 'নরম কয়লার' খাদ আছে বিস্তর। এই কয়লার লোভে নানা প্রকার শিল্পধুরন্ধরেরা এই অঞ্চলে আড্ডা গাড়িতেছে।

মানহাইমের 'বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডা ফাব্রিক্' জগদ্বিখ্যাত। সেই কোম্পানীও মেসের্বুর্গ শহরে এক বিরাট শাখা-

ফ্যাক্টরি কায়েম করিয়াছে। নাম লয়না ভের্ক। এখানে লোক খাটে দশ হাজার।

মধ্য-জার্ম্মাণি এতদিন প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু দেখিতে-দেখিতে চাষ আবাদ গোচারণের মাঠ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহার ঠাঁইয়ে দেখা দিতেছে চিমনির ধোঁয়া আর ফ্যাক্টরির সারি।

কয়লার খনিতে কাজ চলিতেছে অহরহ। পাহাড়-প্রমাণ কয়লার স্তূপ রেলে বসিয়া দেখা যায়। তামার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাসায়নিক কারখানা গণ্ডায়-গণ্ডায় মাথা তুলিতেছে।

পল্লীগুলা লোপ পাইতেছে। শহরের কোলাহল অশান্তি এবং আবর্জ্জনা গুলজার হইতেছে। কাজেই গবর্মেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে নগর-নির্ম্মাণ-কমিটি জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তদবির করিবার জন্য বহাল হইয়াছে। সকল দিকেই নয়া জীবনের এবং নয়া শক্তির সূত্রপাত।

জার্ম্মাণির সঙ্গীত ও অভিনয়-শিল্প

(১)

জার্ম্মাণরা সঙ্গীতপ্রিয় জাতি। এই কথা ভারতেও জানা আছে। বার্লিনের অনেকগুলা 'কোনৎস্যার্ট' বা সঙ্গীত-ভবন বহু ভারতীয় পর্য্যটকই দেখিয়া গিয়াছেন। 'ফিলহার্ম্মোণি' এবং 'বেঠোফেন-সাল' নামক ভবন দুইটা প্রসিদ্ধ।

অধিকন্তু সাধারণ থিয়েটার-গৃহ এবং সিনেমা-গৃহ ভাড়া লইয়া কোনো কোনো সঙ্গীত-সঙ্ঘ বাজনা শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাত আটটার সময় অন্ততঃ তিন চারটা আসরে 'কোন্‌ৎস্যার্ট' বসে। জার্ম্মাণ নরনারী যন্ত্র-সঙ্গীত শুনিবার জন্য পয়সা

কণ্ঠ-সঙ্গীতের কথা বলিতেছি না। বাজনার কথা বলিতেছি। এই বাজনাটাও একটা স্বতন্ত্র শিল্প। এই শিল্পে পশ্চিমারা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে আন্দাজ করিয়া উঠাও সুকঠিন। সুরের লহর—আওয়াজের মূর্ত্তি অথবা তাল-মান-লয়ের রূপ,—ভাষায় প্রকাশ করিতে বসিলে মস্ত এক প্রবন্ধ লেখা হইয়া পড়িতে পারে, অথচ তাহাতে সুরের লহর ধরা পড়িবে কিনা সন্দেহ।

যে-সমুদয় সঙ্গীত-শিল্পীরা নামজাদা সুরের লহর যন্ত্রের ধ্বনির ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগক জার্ম্মাণরা কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাষ্ট্রবীরদের অপেক্ষা কম সম্মান করে না। বোধ হয়, বেশী সম্মান করে বলিলেই ঠিক বলা হইবে। তাঁহাদের নাম আপামর জনসাধারণের মুখে-মুখে বিরাজ করিতেছে। বেঠোফেন, বাখ, মোৎসার্ট, ব্রামস, হাণ্ডেল ইত্যাদির নাম গ্যেটে, হেল্ম্‌হোলৎস্‌, কাণ্ট, বিস্মার্কের নামকে ডুবাইয়া দিয়াছে।

জগতের সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষেও আমরা দেখিনা কি যে, জনসাধারণ গায়ক, বেহালাবাদক, খোলবাজনায় ওস্তাদ ইত্যাদি শিল্পীর নাম যত আদর করে, কোনো কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত, রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি গুণীকে তত বেশী ঠাঁই দেয় না? মানুষের সমাজে সঙ্গীতের কিম্মৎ এত বেশী।

কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে সঙ্গীতের শিল্পে নয়া-নয়া আবিষ্কার সাধিত হইতেছে না। যুবক ভারতের স্বরাজ-প্রয়াসীরা আর কতদিন সঙ্গীত কলায় দরিদ্র থাকিতে ইচ্ছা করেন? সাবেক কালের কালিদাস, রুমি এবং বরাহমিহির, আলবেরুণিকে ছিকায় তুলিয়া আমরা নব যুগের নয়া কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন গড়িয়া তুলিতেছি। সঙ্গীত-শিল্পে কি আজও ভরতমুনির আর মিঞা তানসেনের বুলি আওড়াইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব?

(২)

বার্লিনে বড় বড় 'ওপার্ণ' বা অপেরা-ভবন আছে তিনটা। অপেরাকে বলিতে পারি গান-বাজনা-সম্বলিত অথবা গান-বাজনা-সর্ব্বস্ব নাটক-বিশেষ। প্রত্যেক কথোপকথনই অপেরায় গানের ভিতর দিয়া নিষ্পন্ন হয়। অপেরায় দুই আড়াই বা তিন ঘণ্টা কাটাইলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র গান শুনিতে পাওয়া যায়।

এই ধরণের গীত-নাট্য ভারতে কখনও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? মনসার গান ইত্যাদি গানগুলাকে হয়ত অপেরা বলা চলে। আমাদের চিরপ্রচলিত—অধুনা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত?—যাত্রাকে অপেরা বলা চলে না। কেন না, যাত্রা-শিল্পে গানের সংখ্যা অনেক বটে। কিন্তু গানই যাত্রার একমাত্র বাহন নয়। যাত্রার ভিতর মামুলি কথাবার্ত্তার ঠাঁই প্রচুর। যাত্রাকে সাধারণ নাটক না বলিয়া গীত-বহুল নাটক বলাই যুক্তিসঙ্গত।

অপেরা-শিল্পে জার্ম্মাণির গ্যেটে-স্বরূপ ভাগ্নার আজও পূজা পাইতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ 'ওপার্ণ হাউসে' অথবা 'ফোল্‌কস্ ওপার' ভবনে ভাগ্নারের পালাগুলা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। নীবেলুঙ-বীরদিগের কাহিনী বিষয়ক অপেরাগুলা ভাগ্নারকে অমর করিয়াছে। এই কাহিনীগুলায় প্রাচীনতম জার্ম্মাণদের 'খাঁটি স্বদেশী' আদর্শ গুলজার।

জার্ম্মাণরা অন্ততঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। এই কারণে জাতীয় স্বাধীনতার মন্ত্রে যুবক জার্ম্মাণিকে মাতাইবার জন্য অপেরা-গৃহের ম্যানেজারগণ নীবেলুঙ-পালাগুলা মাঝে মাঝে চালাইয়া একসঙ্গে টাকা রোজগার এবং স্বদেশ-সেবা দুই কুল-ই রক্ষা করিতেছেন। লোকের ভিড়ে বসিবার জায়গা পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

তার পরদিন পর্য্যন্ত আওয়াজগুলা কানে বাজে। জার্ম্মাণ গায়ক-গায়িকাদের আওয়াজ বাজখাই বটে।

(৩)

সাধারণ থিয়েটার-ঘরের সংখ্যা বার্লিনে অনেক। বোধ হয় অন্ততঃ ত্রিশটা বড় বড় রঙ্গমঞ্চে নামজাদা নাট্যকারদের প্রণীত নাটক-গুলা অভিনীত হইতেছে। থিয়েটারগুলা শহরের ভিন্ন ভিন্ন মহল্লায় অবস্থিত। নয় দশটা থিয়েটার রোঁজই খোলা থাকে।

পুরাণা নাট্যকারদের ভিতর লেস্‌সিঙ এবং শিলারের নামে দুইটী থিয়েটার আছে। গ্যেটের নামে কোন থিয়েটার নাই। রুশ নাট্য-শিল্পের অনুকরণে রাইনহার্ট বার্লিনে একটা রঙ্গমঞ্চ কায়েম করিয়াছেন। জার্ম্মাণ সমাজে 'ক্যিন্‌ষ্টলার ঠেআটার' নামক এই রঙ্গালয়ের প্রতিপত্তি আছে।

নয়া-পুরাণা সকল প্রকার পালাই বার্লিনে অভিনীত হইতেছে। দেশী-বিদেশী সকল প্রকার নাটকই দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী পালার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণদের মত তীব্র হইয়া উঠিতেছে। তবে এখনো একমাত্র কট্টর ন্যাশন্যালিষ্টরা ছাড়া অন্যান্য সকলেই ফরাসী নাটকে বিশেষ আপত্তি করে না।

আজকাল বার্লিনে প্রায় তিন লাখ রুশ নরনারী বসবাস করিতেছে। বলা বাহুল্য, রুশজাতীয় লোকের জন্যও কতকগুলা থিয়েটার চলিতেছে। সেই সমুদয় বিল্‌কুল রুশভাষায় প্রণীত নাটকের বাজার।

'শাওস্পীল-হাউস' নামক থিয়েটার জার্ম্মাণ সমাজে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। এখানে ছ্যাবলামির প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। সবই গুরুগম্ভীর, ক্লাসিক, উচ্চ অঙ্গের বস্তু। কিছুদিন হইতে এখানে চলিতেছে শিলারের 'ভিল্‌হেল্ম টেল'। ফ্রান্সের রুর দখলের জবাব স্বরূপই যেন জার্ম্মাণরা 'ভিল্‌হেল্ম টেলকে' নয়া আসরে দাঁড় করাইতেছে। লোকে লোকারণ্য।

শিলার ছিলেন স্বাধীনতার নাট্যকার, নির্য্যাতিত-পদদলিত গোলামদের কবি, লড়াইয়ের, রক্তারক্তির, সশস্ত্র প্রতিরোধের, প্রাণ-দানের উদ্দীপক। বঙ্গীয় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র-লাল রায় রঙ্গমঞ্চের আবহাওয়ায় এই শিলার-শিল্পের ভাবুকতাই ছড়াইয়া গিয়াছেন। শিলারকে ভারতবাসী বেশ বুঝে।

(৪)

যুবক জার্ম্মাণি শিলারকে আবার নূতন করিয়া পাইতে চায়। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে জার্ম্মাণ সমাজের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, সেই দুর্গতি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কাজেই সেই সংগ্রাম-যুগের ভাবে মাতোয়ারা কবিবর বর্ত্তমান কালের কর্ম্মক্ষেত্রেও সহায় দাঁড়াইয়াছেন। 'ভিলহেল্ম টেল' নাটকের কোনো কোনো অংশ যার-পর-নাই উদ্দীপনা-মূলক। সেই সকল দৃশ্য দেখিলে পাথরও গরম হইয়া যায়, কাঠ ও জ্বলিয়া উঠে, মানুষের ত কথাই নাই। থিয়েটারে সমবেত নরনারী একসঙ্গে জার্ম্মাণ স্বদেশী গান সুরু করিয়া দেয়।

রঙ্গমঞ্চে এবং গ্যালারিতে তখন একাকার হইয়া যায়। ঘর ভরা আওয়াজ কেবল "ড্যয়েচলাণ্ড, ড্যয়েচলাণ্ড, য়্যি-বার আল্লেস্।" কলিকাতার থিয়েটারেও দিন ছিল যখন সময়ে শ্রোতা অভিনেতা মশগুল হইয়া একসঙ্গে আওয়াজ উঠাইত—"মেবার পাহাড় শিখরে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির।"

বর্ত্তমান ভারতে আধ্যাত্মিকতা যে-যে আকারে দেখা দিতেছে, অবিকল সেই সকল আকারই আজকালকার জার্ম্মাণিতে দেখিতেছি। তবে ইহাদের কব্জার ভিতর টেক্নিক্যাল কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং এই দুই বস্তুর আনুষঙ্গিক আরও কতকগুলা 'চীজ়'

নাই। এই যা প্রভেদ। এইগুলা ভারতবাসীর তাঁবে আসিলে ভারতের নামেও ত্রিভুবন ফাটিবে।

শিলার-নাট্যে দেখিতেছি জার্ম্মাণ 'কুল্‌টুরের' একধারা। আর এক ধারা দেখানো হইতেছে 'ড্যয়চেস্ ঠেআটার' ভবনে। এই থিয়েটারে 'আল্‌ট্‌-হায়ডেলব্যর্গ' নামক এক পুরাণা পালা অভিনীত হইতেছে। যুবক জার্ম্মাণির ভাবুকতায় সাহায্য করাই এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ভাবুকতার গতি শিলারী ভাবুকতার গতি হইতে স্বতন্ত্র।

সাবেক কালের হায়ডেলব্যর্গ শহর আমাদের কাশী, নবদ্বীপ ইত্যাদির মতন শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র ছিল। এই কেন্দ্রে যুবারা, ছাত্রেরা, কিরূপ সরল-স্বাধীন, উদ্দাম, বাধাহীন জীবন যাপন করিত, তাহার চিত্র এই নাটকে প্রদর্শিত। তখনকার দিনের স্যাক্‌সনির রাজকুমার এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে আসিয়া হায়ডেলব্যর্গে কিছুকাল কাটাইয়া ছিলেন। প্রাসাদ-কারাগারের বাহিরে মানুষের সমাজে স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। "ইস্কুল,—সেত স্বর্গ"—যৌবন-পূজায় নিরত বর্ত্তমান জার্ম্মাণ নরনারী 'আল্‌ট্‌-হায়ডেলব্যর্গ' নাটকের আবহাওয়ায় এই ভাবুকতা উপভোগ করিতেছে।

(৫)

সাহিত্য-সমালোচনা একবস্তু, থিয়েটার-সমালোচনা আর এক বস্তু। নাটক, সাহিত্য মাত্র নয়। নাট্য-শিল্প সাহিত্য-শিল্প হইতে পৃথক্। এই প্রভেদ মনে রাখিয়া জার্ম্মাণির সমালোচকেরা রঙ্গালয়ের অভিনয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

নাটকের ভিতরকার গল্পগুলা ভাল কি মন্দ, স্বদেশী কি বিদেশী, ভোগ-প্রধান কি ত্যাগ-প্রধান—এই সকল বিষয় বিশ্লেষণ করিবার জন্য

সমালোচকগণ সময় কাটান না। তাঁহারা নটনটীদের অভিনয়-কৌশলটাই প্রধান এবং একমাত্র আলোচ্য বস্তু বিবেচনা করেন। অধিকন্তু রঙ্গমঞ্চটা সাজাইবার জন্য রঙ্গালয়ের কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়েরা কিরূপ ওস্তাদি দেখাইয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করাও নাট্য-সমালোচকগণ নিজ কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন।

ঘরে বসিয়া যখন কেতাব পড়িতে হইবে, তখন সাহিত্য হিসাবে নাটকটার কিম্মৎ যাচাই করা যাইবে। কিন্তু যখন থিয়েটারে প্রবেশ করিয়াছ, তখন সে দিকে নজর দিও না! তখন দেখ নটনটীদের মুখভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী। হাত পা নাড়িবার শিল্পটাও একটা সুকুমার শিল্প। তাহারই নাম অভিনয়। অভিনয় দেখিতে আসিয়া যে-কবি নাটকটা লিখিয়াছেন, তাঁহার কথা মনে আনিও না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কর্ম্মকৌশলটাই এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চকে সাজাইবার ভার যাঁহারা লইয়াছেন, সেই সকল শিল্পীদের কর্ম্মকৌশলও বুঝিবার জিনিষ। সেই শিল্পের সাহায্যেই নটনটীদের শিল্প সুষ্ঠুরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই সকল কথা জার্ম্মাণিতে,—ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্রই,—আজকাল থিয়েটার-সমালোচনার গোড়ার কথা। নাট্য-সাহিত্য হইতে ফারাক করিয়া নাট্যাভিনয়কে স্বাতন্ত্র্য বা স্বরাজ প্রদান করা হইয়াছে। সুকুমার-শিল্পে এ এক নবীন স্বাধীনতা।

জার্ম্মাণির জ্ঞান-মণ্ডল

(১)

বৎসর দশেক পূর্ব্বেও জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের নাম ভারতীয় পণ্ডিত মহলে অতি অল্পই জানা ছিল। ভারতবর্ষের ইস্কুল-কলেজে কোনো

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, জার্ম্মাণির নাম আমাদের বিদ্যাপীঠের আবহাওয়ায় বড় একটা স্থান পাইত না।

আজকাল আর সে কথা বলা চলেনা। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই জার্ম্মাণ-জানা অধ্যাপক ও লেখক বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছেন। জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের প্রণীত কেতাব হিন্দু-মুসলমান মহলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

অধিকন্তু আমাদের কোনো কোনো সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সেবী নিজ-নিজ জমিনে বিদ্যার সীমানা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সূত্রে তাঁহাদিগকে জার্ম্মাণির বিভিন্ন পরিষৎ-পত্রিকা নিয়মিতরূপে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে হয়।

ফলতঃ জার্ম্মাণ পণ্ডিত-মণ্ডলের নূতন-নূতন অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত-গুলা অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতীয় জ্ঞান-মণ্ডলের গবেষকদিগের গোচর হইতেছে। ভারতবর্ষে বসিয়াই ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক বহু জার্ম্মাণ পণ্ডিতের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইতেছেন।

তাহা ছাড়া আজকাল জার্ম্মাণির প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে ভারতীয় অধ্যাপক ও ছাত্রেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। তাহার ফলে সর্ব্বোচ্চ জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভারতবাসীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লেন-দেন সুরু হইয়াছে। ক্রমে তাঁহাদের নাম-ধাম ও কাজকর্ম্ম ভারতের শহরে-শহরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

(২)

জার্ম্মাণদিগের এঞ্জিনিয়ারিং-পরিষৎ এক বিপুল বৈজ্ঞানিক-সঙ্ঘ। সভ্য-সংখ্যা ২৭ হাজার। এই পরিষৎ ৭ খানি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পূর্ত্ততত্ত্ব-বিষয়ক পত্রিকা চালাইয়া থাকে। সঙ্ঘের ডিরেক্টর এবং কাগজগুলার প্রধান সম্পাদকের নাম শ্রীযুক্ত মাট্শোস। কোনো কোনো পত্রিকার কাটতি ৩৫ হাজার।

মাট্‌শোস ষ্টীম এঞ্জিনের যন্ত্রপাতি-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। জার্ম্মাণির নানা কারখানার কাজে, শিল্প-বিভাগের নানা মোসাবিদায় মাট্‌শোসের ডাক পড়ে। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক বিদ্যার ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানেও ইনি সময় দিয়াছেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য ইহার আগ্রহ দেখা যায়।

মাট্‌শোস বলিতেছেন—"রাইনল্যাণ্ডের কোন কোনো ফ্যাক্টরিতে মজুরদিগের কাজ আনন্দময় করিয়া তুলিবার জন্য পরীক্ষা চলিতেছে। মজুরেরা যখন কলযন্ত্র সেবা করিতে-করিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেই সময়ে কারখানার ভিতর সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গীত শুনিতে-শুনিতে মজুরেরা নিজ-নিজ কাজ মনোযোগের সহিত নিষ্পন্ন করে।

ক্রুপ, টিস্‌সেন, জীমেন্স ইত্যাদি শিল্পপতি ধনকুবেরগণ জার্ম্মাণির আর্থিক জীবনে যুগান্তর আনিয়াছেন। এই সকল যুগপ্রবর্ত্তক সম্বন্ধে মাট্‌শোস জীবনী রচনা করিয়া বর্ত্তমান জগতের ক্রমবিকাশ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(৩)

ভারতবর্ষে যাঁহারা রাসয়নিক গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অধ্যাপক ন্যর্ণষ্টের, ফ্রয়গুলিশের এবং হাবারের নাম শুনিয়াছেন। কাইজার ভিলহেল্ম ইনষ্টিটিউট্ অথবা বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঁহারা কাজ করেন। অধ্যাপক টোম্‌স্ ফার্ম্মেসি অর্থাৎ ঔষধ তৈয়ারী সংক্রান্ত রসায়নের প্রধান অধ্যাপক। ইঁহারা সকলেই ভারতীয় গবেষক বা ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আইনষ্টাইনও উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় বিজ্ঞানসেবীদের নাম শুনিয়াছেন।

উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডীলস্ এলাহাবাদের পাণিনি কার্য্যালয়

হইতে প্রকাশিত ভারতীয় ভেষজ-উদ্ভিদ্ বিষয়ক গ্রন্থ নিজ মিউজিয়ামে আনাইয়া রাখিয়াছেন। ইঁহার সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র কাজ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হাবার্লাণ্ড শারীরবিদ্যার অধ্যাপক। ইঁহার 'ফিজিওলোগিশেস ইন্‌ষ্টিটুটে' জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের চেতনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।

লাইপ্‌ৎসিগের পশুশালার ডিরেক্টর গেবিং সিংহ-শাবকের লালন-পালনে ওস্তাদ। ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানাদেশের পশুশালায় ইঁহার 'তৈয়ারি' সিংহ বিক্রী হয়। গেবিং ভারতীয় ছাত্রদিগকে জুঅলজি বিদ্যায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

(৪)

খাঁটি দর্শন বিষয়ক গবেষণায় যে সকল জার্ম্মাণ পণ্ডিত নামজাদা, তাঁহাদের সঙ্গে কোনো ভারত-সন্তান উচ্চ অঙ্গের কাজ করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। তবে জার্ম্মাণিতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিদ্যাগুলির সকল ছাত্রকেই কিছু-কিছু দর্শন আলোচনা করিতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-ফ্যাকল্‌টিই এই সকল বিদ্যাবিষয়ক অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কর্ত্তা। দর্শন এই সকল বিদ্যা-শিক্ষার্থীর পক্ষে অবশ্য-পাঠ্য। কাজেই জার্ম্মাণির প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রই জার্ম্মাণ দার্শনিকদের এবং দর্শনের অধ্যাপকদের ধরণ-ধারণ জানে।

জার্ম্মাণির ভিতরে কাণ্ট্, ফিখ্‌টে এবং হেগেল জগদ্‌গুরুবিশেষ। আজকালকার দার্শনিকগণের মধ্যে ভুণ্ট বিশ্ববিশ্রুত। ইঁহাকে শারীরবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত চিত্তবিজ্ঞানের অন্যতম জনকরূপে সম্মান করা হয়। লজিক বা তর্কশাস্ত্রে

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিদ্যার অধ্যাপকরা ভারতীয় ছাত্রদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের বিভাগে অধ্যাপক শুমাখারের সঙ্গে কোনো কোনো ভারতীয় ছাত্র কাজ করিয়াছে। বিলাতের ভারতীয় ছাত্রেরা ইংরেজ ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণের সুপারিস লইয়া শুমাখারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। তিনি ইংল্যাণ্ড-প্রেমিক।

সাহিত্যের ইতিহাস বা সমালোচনা সম্বন্ধে যে সকল পণ্ডিত নামজাদা, তাঁহাদের সঙ্গে ভারত-সন্তানের কাজকর্ম্ম বড় বেশী চলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ব্রাণ্ড্‌লকে ভারতীয় ছাত্ররা জানে। ইনি জার্ম্মাণিতে শেক্‌স্‌-পিয়ার-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ।

(৫)

বিদেশী ছাত্ররা বার্লিনে আসিলে প্রথমেই ভাষা লইয়া মহা গণ্ড-গোলে পড়ে। অধিকন্তু জার্ম্মাণির ইস্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইলে বিদেশীর পক্ষে অনেক সরকারী আফিসের ভিতর দিয়া যাওয়া-আসা করিতে হয়। শিক্ষাসচিবের অধীনে এই সকল আফিসের কাজ পরিচালিত হইয়া থাকে।

অধ্যাপক রেম্মে শিক্ষাসচিবের আফিসের একজন বড় কর্ম্মচারী। ইঁহাকে বিদেশী ছাত্রদের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বাহাল করা হইয়াছে। এই সূত্রে প্রত্যেক ভারত-সন্তানকেই দুই একবার রেম্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়। রেম্মে ভাষা-বিজ্ঞানের লোক।

শিক্ষা-বিভাগের উপ-মন্ত্রী কার্ল্ বেকারের সঙ্গে কোনো-কোনো ভারতবাসীর দেখাশুনা হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী ইত্যাদি ভারতীয় পর্য্যটক অধ্যাপক বেকারের নিমন্ত্রণে শিক্ষা-

বিশ্ববিস্থালয়ের অধীনে বিদেশী অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা আছে। বার্লিনের এই বিদেশী বিভাগের কর্ত্তা অধ্যাপক ফোগেল। ইনি ভূগোলবিস্থার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ফোগেলের বক্তৃতালয়ে ভারত-সন্তানেরও ডাক পড়িয়াছে। বর্ত্তমান লেখককে সেখানে গলা জাহির করিবার জন্য হাজির হইতে হইয়াছিল।

(৬)

ভারতবর্ষে কিছুকাল ধরিয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা জোরের সহিত চলিতেছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের ভিতর জার্ম্মাণ-জানা লোক দিন-দিন বাড়িতেছে। কাজেই জার্ম্মাণির প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান-কার্য্য ভারতে আজকাল সুবিদিত।

জার্ম্মাণির প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারতীয় ভাষা—অন্ততঃপক্ষে সংস্কৃত এবং পালি শিখাইবার আয়োজন আছে। ভুর্ৎসবুর্গের জোলি, বন্‌-এর য়াকোবি, ব্রেসলাওয়ের হিল্লেব্রাণ্ট্, গ্যোটিঙ্গেনের ফিক্, বার্লিনের লিয়ডার্স ইত্যাদির সঙ্গে ভারতীয় ছাত্র বা অধ্যাপক কাজকর্ম্ম করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের পরিষৎকে 'ড্যয়চে মর্গেনল্যেণ্ডিশে গেজেলশাফ্‌ট্' বলে। এই পরিষদের ভারতীয় সভ্য এক প্রকার ছিলই না বলা চলে। কিন্তু বৎসর খানেকের চেষ্টায় কয়েক জন ভারতবাসী সভ্য হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। বোম্বাই, কাশী ইত্যাদি নগর হইতে কেহ কেহ অর্থ সাহায্যও পাঠাইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইত্যাদি সঙ্ঘ হইতে গ্রন্থ-পত্রিকাদিও আসিয়াছে।

গেজেলশাফটের কর্ম্মকর্ত্তার নাম লিয়্যট্‌কে। ইনি নিজে প্রাচ্যতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ নহেন। সাধারণ ফিললজিতে ইঁহার ডক্টর উপাধি আছে। কতকগুলা বড় বড় প্রকাশ-ভবনের ইনি ম্যানেজার। বার্লিনের প্রবাসী ভারত-সন্তানদের কাহারও কাহারও সঙ্গে লিয়্যট্‌কের লেন-দেন আছে।

(৭)

বার্লিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে নব্যভারতীয় চিত্রাবলীর বাজার বসায় জার্ম্মাণির চিত্রকর, চিত্রসমালোচক, মিউজিয়াম-পরিচালক এবং শিল্প-ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে বহু ভারতীয় শিল্পীর নাম জানিতে পারিয়াছে। গ্যালারির ডিরেক্টর জুষ্টি এবং শিল্প-সচিব ভেটৎসোল্ড এই সূত্রে এক নয়া ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন বলিতে পারি।

লাইপৎসিগের 'ড্যর সিসেরোণে', বার্লিনের 'কুনষ্টক্রোণিক' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শিল্প-পত্রিকায় ভারতীয় প্রদর্শনীর সমালোচনা বাহির হইয়াছে। জার্ম্মাণির শিল্প-সমালোচকদের মধ্যে 'টাগেব্লাট' কাগজের লেখক ষ্টাল, 'ফোসিসে ৎসাইটুঙে'র অস্বর্ণ এবং 'ড্যয়চে আলগে-মাইনে ৎসাইটুঙে'র ফেক্‌টার জার্ম্মাণ-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহারা সকলেই জার্ম্মাণ শিল্প-প্রেমিকগণকে তরুণ ভারতের শিল্প-সাধনার কথা জানাইয়া দিয়াছেন। পেখেল-সম্পাদিত বার্লিনের 'ড্যয়চে রুণ্ডশাও' নামক মাসিক পত্রিকায়ও এই বিষয়ে আলোচনা বাহির হইয়াছে।

বইয়ের ব্যবসা

(১)

কেতাব ছাপা হয় জার্ম্মাণিতে বিস্তর। প্রকাশকের সংখ্যা অগণিত। কিন্তু বার্লিনকেই গ্রন্থ-ব্যবসায়ের কেন্দ্র বিবেচনা করিবার কোনো কারণ নাই। নেহাৎ নগণ্য নগরের প্রকাশকরাও অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের রচনা প্রকাশ করিয়া থাকে। জার্ম্মাণ সমাজের জ্ঞান-মণ্ডলে কোনো দুই চারজন প্রকাশকের একচেটিয়া প্রভাব নাই। অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসায়ের মত কেতাবের ব্যবসায়েও জার্ম্মাণি বহুত্বের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছে।

প্যারিসের 'লানুভেল রেভ্যি ফ্রাঁসেজ' মাসিকে এক ফরাসী সমালোচক লিখিয়াছেন—"১৯১১ সালে জার্ম্মাণিতে কেতাব প্রকাশিত

হইয়াছিল সংখ্যায় ৩১ হাজার। সেই বৎসর ফ্রান্সে হইয়াছিল মাত্র ১১ হাজার আর বিলাতে ১০ হাজার। লড়াইয়ের ফলে জার্ম্মাণ-সমাজে গ্রন্থ-ব্যবসায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; বিলাত, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণির তুলনা করিলে দেখি আজও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অনুপাতই প্রায় রহিয়া গিয়াছে।"

জার্ম্মাণিতে পুস্তকের দোকান মাত্রেই ছবি বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই আবার পুরাতন শিল্পের বাজার। বার্লিন, লাইপৎসিগ, মিউনিক ইত্যাদি যে কোনো শহরের বইয়ের দোকানেই এই দস্তর। অবশ্য ছবি এবং পুরাতন শিল্পদ্রব্যের জন্য স্বতন্ত্র দোকানও আছে অনেক।

বইয়ের দোকানে ছবি বিক্রয়ের ব্যবস্থা ভারতবর্ষে স্থরু করা মন্দ নহে। আজকাল ভারতবর্ষে কেতাব কেনার ঝোঁক দেখা যাইতেছে। বইয়ের দোকানে যাওয়া-আসা করা শিক্ষিত লোক জনের স্বভাবে দাঁড়াইতেছে। এইরূপ যাওয়া-আসা করিতে করিতে দেশী-বিদেশী আধুনিক-প্রাচীন ছবি দেখিতে পাইলে ভারতবাসীর মেজাজে এক নয়া খেয়াল গজিতে পারিবে।

পুস্তক-বিক্রেতাদের ভিতর কেহ কেহ প্রদর্শনের জন্য স্থকুমার শিল্পের নমুনা কতকগুলা দোকানে রাখিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা আমাদের যুবা-বুড়ার চোখ তৈয়ারী করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে কালে তাঁহারা নিজেই ব্যবসায়ে লাভবান্‌ও হইতে পারিবেন। স্থকুমার শিল্পের ব্যবসায় ভারতে অল্পকালের ভিতরই জাঁকিয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

(২)

দর্শন, বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রকাশকগণ জার্ম্মাণ-সমাজে স্থপরিচিত সন্দেহ নাই।

কিন্তু জগতের সর্ব্বত্রই কাব্য, নাটক, উপন্যাস, সঙ্গীত ইত্যাদির রচয়িতারাই আবালবৃদ্ধবনিতার অতি প্রিয়। খবরের কাগজের মাহাত্ম্যে রাষ্ট্রনীতিক নামজাদা পাণ্ডারা প্রতিদিনই ঘরে ঘরে বিরাজ করেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রধুরন্ধরদের যশ ক্ষণস্থায়ী। কবি, গল্পলেখক, নাটককার, ঔপন্যাসিক, গায়ক, বাদক ইত্যাদির নামই সাধারণ্যের বহুকাল পর্য্যন্ত পূজা পাইয়া থাকে। কাজেই এই সকল সাহিত্য ও শিল্পরচয়িতাদের প্রকাশকেরাই সমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠিত। জার্ম্মাণিতেও এইরূপই দেখিতেছি।

বার্লিনের ফিশার কোম্পানী জার্ম্মাণির বড় বড় সাহিত্যস্রষ্টাদের প্রকাশক। হাউপ্‌ট্‌মান, টমাস্‌মান, ডেহমেল ইত্যাদি নাটককার ও কবির রচনা এই কোম্পানীর আয়োজনে প্রচারিত হইয়াছে। ফিশার প্রধানতঃ জার্ম্মাণ লেখকগণের বাজার সাজাইয়াছে। বিদেশী গ্রন্থকারদিগের ভিতর ইয়োরোপের টিউটনজাতীয় লেখকরা এই বাজারে ঠাঁই পাইয়াছেন। স্কাণ্ডিনাভিয়ান সাহিত্যের জার্ম্মাণ অনুবাদ ফিশারের বিদেশী-প্রচারের বৈশিষ্ট্য। ফরাসী সাহিত্য বয়কট করা ফিশারের এক রোগ বোধ হইতেছে।

(৩)

ফিশারের 'গোঁড়া স্বদেশী' গোটা জার্ম্মাণিকে একঘরে্য করিয়া রাখে নাই। বিদেশী-প্রচারের জন্যও অনেক প্রকাশক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

য়েনার ডিড্‌রিশ কোম্পানী টিউটনিক জাতির সীমানা ছাড়াইয়াছে। ইহার এক হাত ঠেকিয়াছে রুশ-সাহিত্যে, অপর হাত ফরাসী-সাহিত্যে।

বিশ্ব-সাহিত্যের বিপুল বাজার বসাইয়াছে লাইপৎসিগের ইন্‌সেল

দেখিতে পাই। ফ্রান্সের জিদ, বেলজিয়ামের ভ্যরহেরেন, বিলাতী ব্রাউনিঙ, রুশ গোগোল, মার্কিন হুইটম্যান ইত্যাদি অনেকের সঙ্গে ইন্‌সেল জার্ম্মাণদিগকে পরিচিত করাইয়া দিয়াছে। ভারতীয় জয়দেব এবং কালিদাস আর গ্রীক ইস্কীল্‌স এবং সোফোক্লেস ইত্যাদির সঙ্গেও এই বিশ্বশক্তির বাজারে মোলাকাৎ হয়।

টমাস্ মান রাজপন্থী কাইজারতন্ত্রী সাম্রাজ্যধর্ম্মী লেখক। কিন্তু তাঁহার ভাই হাইনরিখ মান রিপাব্লিকপন্থী—গণতন্ত্রী মানব-সেবক। ইঁহার লেখাও বিক্রী হয় ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার। মিউনিকের কুর্ট ভোল্‌ফ্ হাইনরিখ মানের প্রকাশক। কবি উন্‌রু, নাটককার ভের্ফেল ইত্যাদির প্রচার করিয়াছে ভোল্‌ফ্। নয়া জার্ম্মাণির এই আসরেই রবীন্দ্রনাথের ঠাঁই।

ইন্‌সেল এবং ভোল্‌ফ্ দুই কোম্পানীই আর একটা নয়া পথের পথিক। বিদেশী সাহিত্যের তর্জ্জমা মাত্র নহে,—বিদেশী ভাষায় বিদেশী মূলগ্রন্থগুলার প্রচার করিয়া ইহারা জার্ম্মাণির ভিতর দুনিয়াখানা আনিয়া ধরিতেছে। ইহাদের আয়োজনে জার্ম্মাণরা শস্তায় ফরাসী মোলিয়্যার, মুসে, বাল্‌জাক ইত্যাদি কিনিয়া ঘর সাজাইতে পারিতেছে।

(৪)

জার্ম্মাণির প্রত্যেক দৈনিক কাগজের এক জন করিয়া সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতের সম্পাদক দেখিতে পাই। কোনো কাগজেই কবিতা, থিয়েটার, চিত্রকলা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা বাদ পড়ে না। ফলতঃ আপামর সকলেই কিছু-না-কিছু এই সকল বিষয়ে রসলাভ করিতে পারে।

ভারতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদনে এখনও এই রীতি দেখা দেয় নাই। এমন কি, আমাদের মাসিক পত্রিকাসমূহেও সুকুমার শিল্প, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় দায়িত্ব দেখিতে পাই না। এই দিকে পত্রিকা-প্রকাশকগণের যথোচিত দৃষ্টি পড়া উচিত।

একমাত্র চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং বাস্তুশিল্পের জন্যই জার্ম্মাণিতে বহুসংখ্যক পত্রিকা চলিতেছে। এইগুলার গঠন-পারিপাট্য এবং ফটোসম্পদ্ অতিশয় উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। এতগুলা বড় শিল্প-পত্রিকা ফ্রান্সেও নাই। অন্যান্য বিভাগের মত, শিল্প-পত্রিকার বিভাগেও জার্ম্মাণি বহুত্বপন্থী। কোনো একখানা কাগজ পড়িয়া গোটা জার্ম্মাণির শিল্প-মত অথবা শিল্প-নীতি বুঝা সম্ভব নহে।

বার্লিনের 'কুন্ষ্ট-ক্রোণিক' আর লাইপৎসিগের 'ড্যর সিসেরাণে'—এই দুই কাগজেই শিল্প-প্রেমিকরা দুনিয়ার শিল্প-সংবাদ পাইয়া থাকে। জগতের কোথায় কবে কিরূপ প্রদর্শনী বসিতেছে, ঘরে বসিয়া পাঠকরা জানিতে পারে। অধিকন্তু শিল্পের 'বাজার' অর্থাৎ ছবি-মূর্ত্তির কেনা-বেচা সম্বন্ধেও খবর থাকে। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, প্রদর্শনী-সমালোচনা, পুস্তক-পরিচয় ইত্যাদিও কাগজ দুইটার কলেবর পুষ্ট করে। মিউনিকের মাসিক 'কুন্ষ্ট' এই হিসাবে একখানা উৎকৃষ্ট সচিত্র পত্রিকা।

(৫)

দুই জার্ম্মাণ যুবক একত্রে একটা প্রকাশক-কোম্পানী ('ফার্লাগ্') গড়িবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইঁহারা লেখকরূপে নিজ পরিচয় দিয়া থাকেন। শিল্প-সমজদারি ইঁহাদের রচনাবলীর বিশেষত্ব।

ফার্লাগ্ খোলা হইবে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য। মূর্ত্তি, চিত্র ইত্যাদির দোকানও থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাও চলিবে। পত্রিকার উদ্দেশ্য থাকিবে—সাহিত্য ও শিল্পের আলোচনা।

গৌরচন্দ্রিকার ভিতর শুনিতে পাইলাম, এক জন বলিতেছে:—"রুশজাতি আজকালকার জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। ইহাদের মত সরলপ্রাণ, ধর্ম্মভীরু, ভগবদ্ভক্ত এবং আধ্যাত্মিক নরনারী আর নাই। রুশিয়ার পল্লীগ্রামের কিষাণদের ঘরে ঘরে অনেক পুরাতন ছবি

প্রভৃতি রহিয়াছে। নেহাৎ কম-দামে ইহাদের নিকট এইগুলা সংগ্রহ করিতে পারিব। ইহারা ব্যবসার মারপ্যাঁচ বুঝে সুঝে না। পরে জার্ম্মাণিতে আনিয়া জার্ম্মাণদের নিকট অথবা তুনিয়ার শিল্প-বেপারীদের নিকট এইগুলা চড়া দামে বেচিতে পারিব।”

ইহার জন্যই আধ্যাত্মিক রুশজাতির সংবর্দ্ধনা! ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানকে সরলচিত্ত এবং আধ্যাত্মিকতাময়রূপে জাহির করিবার পশ্চাতে অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরণের একটা কেনা-বেচার ফিকির আছে। ফিকিরওয়ালা বেপারীদের মধ্যে অনেকেই আবার শিল্প-দর্শনাদির সমজদার বলিয়া বাজারে পরিচিত। আর, যে সকল ব্যবসায়ী নিজে সমজদার বা লেখক নহেন—তাঁহারা ছোট বড় মাঝারি সাহিত্য-সেবী বাহাল করিয়া করিয়া নিজ নিজ মালের বাজার কায়েম করিয়া থাকেন। ভারতে এখনো অনেক শিক্ষিত লোকও আনাড়ি। এই জন্য তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক বলিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তাঁহারা নাচিতে থাকেন!

কোনো একটা জাতিকে কোনো-কিছু তথাকথিত সদ্‌গুণের অধিকারী বলিয়া প্রশংসা সুরু করিলে ব্যবসায়ীরা কালে একটা বড় গোছের বাজার গড়িয়া ফেলিতে পারে। যাহারা হিন্দু-মুসলমানের প্রাচীন শিল্পকে অধ্যাত্মরসের প্রতিমূর্ত্তিরূপে জাহির করিতে অভ্যস্ত, তাহাদের অনেকেরই এই দিকে পয়সা রোজগারের ফন্দি খেলিয়া থাকে।

(৬)

জার্ম্মাণিতে, ফ্রান্সে, ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায় কোনো কোনো কেতাবের কাট্‌তি লক্ষের উপর গিয়া উঠে। যে যে কেতাবের, চার পাঁচ হাজারের কম কাটতি সম্ভাবনা, প্রকাশকেরা সাধারণতঃ সেই সব কেতাব নিজ খরচে প্রচার করিতে ঝুঁকে না। কেতাব প্রকাশ একটা

ব্যবসা। লেখক মহাশয় নিজের কবিত্বের, বিজ্ঞানসেবার, দার্শনিকতার বা রসজ্ঞানের যত ইচ্ছা তত বাড়াইতে থাকুন; তাহাতে লোকের বেশী কিছু যায় আসে না। প্রকাশক দেখিতেছে একমাত্র—কয় মাসে কত কেতাব বিক্রয় হইবে।

যাঁহারা স্বকুমার শিল্পের স্রষ্টা, তাঁহাদের 'সৃষ্টি' সম্বন্ধেও দুনিয়া এইরূপ নির্ম্মম কঠোর বিচার করিতেই অভ্যস্ত। শিল্পী মহাশয়রা ধ্যানস্থ, ঋষি, যোগী, স্রষ্টা কত কি হইতে পারেন; হউন। দোকানদাররা বুঝে কেবল এক কথা,—লোকটার গড়া জিনিষগুলা কিনিয়া গৃহস্থরা টেবিল-দেওয়াল বা তাক সাজাইতে রাজি কিনা।

মাছের ব্যবসা, আলু-পটলের ব্যবসা অথবা ধুতী-চাদরের ব্যবসা যেমন ব্যবসা মাত্র, কেতাবের ব্যবসা, পত্রিকার ব্যবসা, ধাতুমূর্ত্তির ব্যবসা, চিত্রশিল্পের ব্যবসা ইত্যাদিও ঠিক সেই রকম ব্যবসাই বটে। মাছের বাজারে আর স্বকুমার শিল্পের অথবা কাব্য-সাহিত্যের বাজারে এক কাঁচ্চাও তফাৎ নাই।

ব্যবসার প্রাণ বিজ্ঞাপন। মাল বাজারে উপস্থিত হইয়াছে, অথবা হইবার সম্ভাবনা আছে—এই খবরটা খরিদ্দারদের কানে 'যেন তেন প্রকারেণ' পৌছান বেপারীদের প্রথম কথা। এই জন্য দরকার হয় দালাল, এজেন্ট, সংবাদপত্রের জানানী-শুনানী।

শিল্প-সাহিত্যের বাজারেও দস্তর তাহাই। সমালোচক, সমজদার, রসের ওস্তাদ মহাশয়রা এই জগতের দালাল বা এজেন্ট-বিশেষ। কোনো মালের প্রশংসা কাগজে কাগজে ছাপা হইবে কিনা তাহা কাগজ-ওয়ালাদের স্বার্থের উপর নির্ভর করে। কাগজ-ওয়ালাদের সঙ্গে প্রকাশকদের দেনা-পাওনার সম্বন্ধ না থাকিলে কেতাবাদির প্রশংসা ছাপা হওয়া দুর্ঘট।

করিবার জন্য ইয়োরামেরিকার শিল্প-সাহিত্যের বেপারীরা টাকা খরচ করিতে অভ্যস্ত। ভারতবর্ষেও এই রীতি সুরু হইয়াছে, তবে এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। বড় বড় প্রকাশক মাত্রই নিজের তাঁবে কতকগুলা কাগজ ও লেখক 'বাঁধা মাহিয়ানা' দিয়া কিনিয়া রাখিয়াছে—এই দৃশ্য শীঘ্রই ভারতে দেখা দিবে।

সত্যাগ্রহের ছয় মাস

(১)

১১ই জুলাই তারিখে জার্ম্মাণ-ফরাসীদের রুর লড়াই ছয় মাস পূর্ণ করিল (১৯২৩)। এই ছয় মাসে জার্ম্মাণরা কত ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, জার্ম্মাণির কাগজে কাগজে তাহার আলোচনা চলিতেছে।

রুর অঞ্চলে ফরাসীরা আমদানি করিয়াছে ৮৭,০০০ ফৌজ। তাহার ভিতরে ৭,০০০ বেলজিয়ান। পল্টনে আছে পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, হাওয়ার জাহাজ ইত্যাদি সকল বিভাগই।

এই সঙ্গে রাইনল্যাণ্ডেও বিদেশী ফৌজের নয়া ছাউনি বসিয়াছে। তাহার ভিতর ফরাসীদের সংখ্যা ৯৬,০০০ বেলজিয়ানদের সংখ্যা ১৭,০০০।

একটা পুলের মাথায় বসানো হইয়াছে ১,০০০ ফরাসী সিপাহী।

রেলওয়ের কাজে বিদেশী মজুর এবং এঞ্জিনিয়ার বাহাল হইয়াছে বিস্তর। তাহার ভিতর ফরাসীরা গুন্‌তিতে ১০,০০০, বেলজিয়ানরা ১০০।

এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা একমাত্র সত্যাগ্রহের দ্বারা সম্ভব নয়। পূরাদস্তর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত না হইলে জার্ম্মাণরা বিদেশী জুলুমকে লাথি মারিয়া তাড়াইতে সমর্থ হইবে না।

(২)

খাঁটি জুলুম চলিয়াছে এই ছয় মাসে অনেক। জার্ম্মাণরা প্রত্যেক অত্যাচারের হিসাব রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে।

জুলুম দেখা দিয়াছে অনেক রূপে। ফরাসী এবং বেলজিয়ান ফৌজেরা রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে বহু নিরস্ত্র জার্ম্মাণের প্রাণ হরণ করিয়াছে। এই উপায়ে ৯৩ জন জার্ম্মাণের প্রাণ গিয়াছে।

কয়েকজন জার্ম্মাণ ফরাসী আদালতের বিচারে প্রাণ হারাইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ৯।

বহুসংখ্যক লোকের জেল হইয়াছে। তাহাদের কয়েদের 'ম্যাদ' একত্র করিলে প্রায় এক হাজার বৎসর হয়। দুইজনের উপর আজীবন সশ্রম কারাবাসের রায় পড়িয়াছে।

অর্থদণ্ড হইয়াছে প্রচুর। সব গুলা একত্র করিলে হয় এক লাখ আট হাজার ফরাসী ফ্রাঁ। তাহার উপর জার্ম্মাণ মার্ক্ ১৬৪০ কোটি।

ঘরবাড়ী হইতে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ নরনারী বিতাড়িত হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ৭৫,৭১৪।

(৩)

ফরাসীরা জার্ম্মাণদিগকে জেলে পাঠাইবার সময় অনেক মাথা খাটাইয়া কাজে নামিয়াছে। যাহাকে তাহাকে ধরিয়া জেলে পাঠাইলে অথবা টাকার সাজা দিলে বেকুবি করা হইত মাত্র। ফরাসীরা নেহাৎ বেকুব নয়।

জার্ম্মাণ রেল বিভাগের উপর ফরাসীদের আক্রোশ ছিল বেশী। এই বিভাগের কর্ম্মচারী বাছিয়া বাছিয়া অনেক লোককে জেলে পাঠানো

উপর টাকার সাজা ১৭৭,৮১৮,০০০ মার্ক্ এবং ২৫০ ফ্রাঁ। ২৭,৪৫১ লোককে ঘরবাড়ী হইতে খেদানো হইয়াছে।

জার্ম্মাণ ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীরা জেল খাটিতেছে ৭৫ বৎসর ৮ মাস ২৩ দিন; ইহারা জরিমানা দিয়াছে নগদ ১৪০,৫৮১,০০০ মার্ক্ এবং ২,১৫০ ফ্রাঁ। ইহাদের ভিতর ৫৫২ জন বাস্তুভিটা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে।

জার্ম্মাণ খাজাঞ্চি বিভাগের যত লোকের কয়েদ হইয়াছে, তাহাদের কারাবাস ঘটিবে একত্রে ৭৬ বৎসর ৬ মাস ৭ দিন। এই বিভাগের কর্ম্মচারীদের জরিমানা হইয়াছে ২১৫,৯৯০,০০০ মার্ক্ এবং ১০০ ফ্রাঁ। ৫৪৯৩ জন নরনারী ঘরবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

(৪)

এই তিন বিভাগ গেল জার্ম্মাণ ফেডারেশনের ব 'সাম্রাজ্যে'র শাসন বিভাগ। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলার শাসন বিভাগকেও ফরাসীরা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত মোটের উপর পাঁচটা প্রদেশরাষ্ট্র ফরাসী জুলুম ভোগ করিয়াছে।

প্রুশিয়ার শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীরা একত্রে ২৪৮ বৎসর ৮ মাস ২৭ দিন জেল খাটিবে এবং ১,১০৬,৮৭৫,০০০ মার্ক্ জরিমানা দিয়াছে। ইহাদের ১০,৮৭৮ জন গৃহহীন।

ব্যাভেরিয়ার শাসন বিভাগে কয়েদ ঘটিয়াছে ২৫ বৎসর। জরিমানা ২৫,০০০,০০০ মার্ক্ এবং গৃহহীন ৩১৫ জন।

বাডেনের শাসন বিভাগ হইতে জেল খাটিতেছে সকলে মিলিয়া ৫ বৎসর ৬ মাস; এবং জরিমানা দেওয়া হইয়াছে ৩৭,০০০,০০০ মার্ক্। ১২৯ জন নরনারীকে বাস্তুভিটা হইতে তাড়ান হইয়াছে।

হেস্‌সে প্রদেশের কর্ম্মচারীরা জেল খাটিতেছে ৫ বৎসর ৩ মাস।

টাকা সাজা দিয়াছে ৫৫,৮০৫,০০০ মার্ক্ এবং ৫০০ ফ্রাঁ। ২০৩ জন ঘরবাড়ীহীন।

ওলডেনবুর্গের কর্ম্মচারীদের জেল হইয়াছে ২ মাস ২১ দিন। ৩৩ জন লোককে বাস্তুভিটা হইতে খেদাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৫)

জার্ম্মাণ ফেডারেশনের এবং প্রদেশ পাঁচটার সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া জনসাধারণের উপরও ফরাসীদের নজর পড়িয়াছে। তাহাদিগকে সহজে জার্ম্মাণ 'স্বদেশ-সেবক' ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই ধরণের বে-সরকারী লোকের জেল হইয়াছে ২৭৬ বৎসর ৪ মাস ৩ দিন। টাকা সাজা হইয়াছে ১,৬৪০,৯৯৮, ৫৭৬,০০০ মার্ক্ এবং ১০৫, ০৬৯ ফ্রাঁ। এই শ্রেণীর লোক হইতে ৮,০০০ জনকে ঘরবাড়ী হইতে তাড়ান হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, বে-সরকারী লোক জনের উপর কত জায়গায় কত প্রকার অত্যাচার ঘটিয়াছে, তাহার পুরা বৃত্তান্ত বাহির করা সহজ নয়। অনেক খবর যথাসময়ে সংবাদপত্রে বাহির হইতে পারে নাই।

অধিকন্তু ইস্কুল-পাঠশালার উপর জুলুম চলিয়াছে। মোটের উপর বিগত ছয় মাসে ১৬৯ বিদ্যাপীঠ ফরাসীরা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। এই সকল পাঠশালায় ৫০,০০০ বালক-বালিকা শিক্ষা লাভ করিত।

(৬)

এইরূপ কড়ায়-ক্রান্তিতে হিসাব করিয়া কোনো ভারতীয় পরিষৎ বিগত আঠারো বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস লিখিতেছেন কি? অন্ততঃ পক্ষে ভারতীয় সত্যাগ্রহের যুগটা (১৯১৯-১৯২২) সম্বন্ধে এই ধরণের তথ্য তালিকা দুনিয়ার নানা ভাষায় প্রকাশিত

জার্ম্মাণরা এই সকল কয়েদ এবং সাজা বিনা বাক্য ব্যয়ে অম্লান বদনে সহিয়া যাইতেছে। ইহাকে বলে লড়াইয়ে হারিয়া যাওয়া।

জার্ম্মাণ স্বদেশ-সেবকদের ভিতর আজকাল দুই দল দেখা যাইতেছে। একদল বলিতেছে :—"জার্ম্মাণি নেহাৎ দুর্ব্বল নয়। অস্ত্র-শস্ত্রের পরিমাণ যদিও আমাদের বর্ত্তমানে সন্তোষজনক নয়, তথাপি এখনি রুর-রাইনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 'গারিলা' লড়াই সুরু করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। রক্তারক্তি আরম্ভ না হইলে পৃথিবী ঠাণ্ডা হইবে না। ফ্রান্সের হাড় গুঁড়া করিবার ক্ষমতা এখনো আমাদের আছে।"

ইহাদিগকে চরমপন্থী ন্যাশন্যালিষ্ট বলা হয়। আর একদল স্বদেশ-সেবক বলিতেছে :—"সবুর কর। এখনি একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু করিলে দুনিয়ার লোক জার্ম্মাণির উপর আবার চটিয়া যাইবে। দুনিয়া আমাদের উপর এত চটিয়া আছে যে, তাহার মত কোনো দিন বদলাইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আজ যদি মাথা গরম করিয়া খোলাখুলি গোলা-বন্দুকের আওয়াজ শুনাইতে লাগিয়া যাই, তাহা হইলে জগতের কোনো লোকই জার্ম্মাণিকে সুনজরে দেখিবে না। কাজেই আরো কয়েক বৎসর নীরবে স্বদেশটাকে গড়িয়া তোলা আর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীদের জুলুম সহিতে-সহিতে জাতীয় চরিত্র মজবুদ করিতে থাক।"

জার্ম্মাণ সমাজে গরমের ছুটি

(১)

গ্রীষ্মকালে শহর ছাড়িয়া বাহিরে কিছুকাল কাটানো জার্ম্মাণির মধ্যবিত্ত লোকদের একটা দস্তুর দেখিতেছি। উকিল, ডাক্তার, ব্যাঙ্কার, ইস্কুলমাষ্টার, লেখক, চিত্রকর, গায়ক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নরনারীকেই ছুটির আরাম ভোগ করিতে দেখা যায়।

এই উপলক্ষ্যে ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভিতর একটা নয়া

আন্দোলন দেখা দিয়াছে। বহু জার্ম্মাণ ছাত্রছাত্রী ফিন্‌ল্যাণ্ডে গিয়াছে, জুগোস্লাভিয়ায় গিয়াছে, সুইডেনে গিয়াছে, ইংল্যণ্ডে গিয়াছে। তাহাদের পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণিতে বেড়াইতে আসিয়াছে ফিন্‌ল্যাণ্ডের, জুগোস্লাভিয়ার, সুইডেন এবং ইংল্যণ্ডের ছাত্রছাত্রী।

ছাত্র-বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে অথবা কোন ছাত্র-পরিষৎ বা যৌবন-সম্মিলনীর তরফ হইতে। গবর্মেণ্ট, রেল-জাহাজ-কোম্পানী এবং জনসাধারণের সংগৃহীত চাঁদা তহবিল হইতে ছাত্রছাত্রীদিগকে পর্য্যটনের খরচপত্রে কিছু কিছু সাহায্য করা হইয়া থাকে।

ভারতের প্রদেশে-প্রদেশে এইরূপ ছাত্র-বিনিময়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। গুজরাটের যুবকেরা বাংলায়, যুক্তপ্রদেশের লোকেরা মহারাষ্ট্রে, বাংলার ছাত্রছাত্রীরা মাদ্রাজে, মাদ্রাজের পর্য্যটকেরা পাঞ্জাবে কয়েক সপ্তাহ কাটাইতে অভ্যস্ত হউন। পর্য্যটন-বৃত্তি স্থাপন করিবার জন্য ভারতের প্রাদেশিক জননায়কগণের পক্ষে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবার দিন আসিয়াছে।

(২)

ছুটির সময়টা—অন্ততঃ তিন চার সপ্তাহ—সুখে স্বচ্ছন্দে বিনা মানসিক পরিশ্রমে কাটানো প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত জার্ম্মাণ নরনারী শরীর চর্চ্চার অঙ্গ বিবেচনা করিয়া থাকে। স্বাস্থ্য রক্ষার এক প্রধান উপায় স্বরূপ মফঃস্বলে বাস করাটা সমাদৃত হয়। খাওয়া, বেড়ানো, ঘুমমারা, কুস্তীকসরৎ করা ছাড়া গ্রীষ্মাবকাশে অন্য কোনো কাজ ইহাদের চিন্তায় স্থান পায় না।

এই অভ্যাস ইংল্যণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই অভ্যাস একদম নাই একথা বলা চলে না।

ধুলা ইত্যাদির দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আজও প্রচুর পরিমাণে পড়ে নাই —একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্‌টেম্বর মাসের ভিতর লাখ লাখ জার্ম্মাণ নরনারী নিজেদের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া কোনো দূর পল্লীতে যাইয়া বসবাস করে। কেহ দুই সপ্তাহের জন্য, কেহ চার সপ্তাহের জন্য, কেহ ছয় সপ্তাহের জন্য, ইত্যাদি। এমন কি প্রত্যেক শনিবার-রবিবার—কি শীতে কি গ্রীষ্মে—বার্লিন শহরের অগণিত লোক নিকটবর্ত্তী মফঃস্বলে 'নিষ্কর্ম্মা'র জীবন কাটাইতে চলিয়া যায়। প্রকৃতির আবেষ্টনে খোলা মাঠে, খোলা আকাশে দশ বার ঘণ্টা কাটানো প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই জার্ম্মাণ মাত্রের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অনুসারে কাজ করা হইয়া থাকেও।

(৩)

ভারতের যুবা-বুড়াদের মধ্যে দুইচার জন হয়ত শহরের বাহিরে হাঁটিয়া নিজ নিজ জেলার দশ বিশ মাইল স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই ধরণের জেলা-পর্য্যটন, পল্লী-পর্য্যবেক্ষণ জার্ম্মাণির মধ্যবিত্ত সমাজে হরদম চলিতেছে।

জার্ম্মাণির বন, কানন, নদী, সরোবর, পাহাড়, উপত্যকা—সবই পায় হাঁটিয়া দেখিয়া বেড়াইয়াছে, এমন যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া হাজার হাজার আছে। ঘাড়ে একটা থলের ভিতর কিছু কাপড়-চোপড় আর খাদ্য দ্রব্য বহিয়া বনভ্রমণ করিতে বাহির হওয়া গ্রীষ্মে বহুলোকেরই স্বধর্ম্ম-বিশেষ।

কাজেই দেখিতে পাই উচ্চশিক্ষিত জার্ম্মাণ নরনারীরা স্বদেশের প্রত্যেক সৌন্দর্য্যময় জনপদের খবর রাখে। হ্রদ উপবন গাছগাছড়া শিকারের জানোয়ার কিছুই ইহাদের অজানা থাকে না। রেল ষ্টীমার্ ইত্যাদির যুগে পায়ে হাঁটিয়া দেশ দেখা উচ্চশিক্ষিত ভারত-সন্তানের পক্ষে একটা নতুন-কিছু মনে হইবে।

বস্তুতঃ জার্ম্মাণরা যতটুকু রেলে যাওয়া আবশ্যক সেটুকু ফুরাইলেই 'পায়দলে' হ্রদ-পরিক্রমা, বন-পরিক্রমা, পাহাড়-পরিক্রমা সুরু করে। মধ্যযুগের ভারতে এবং ইয়োরোপে তীর্থযাত্রীরা যেরূপ করিত, আজ-কালকার দিনেও জার্ম্মাণরা প্রকৃতি-প্রেমের টানে এবং স্বাস্থ্য-ধর্ম্মজ্ঞানে সেইরূপ করিতেছে। নবীন ভারতের পক্ষে এই প্রকৃতিপরায়ণতা ও স্বাস্থ্য-পূজা হাতে-পায়ে নূতন করিয়া শিখিবার আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

(৪)

জার্ম্মাণির সমুদ্রকূল অতি সামান্য মাত্র। কিন্তু তাহার প্রত্যেক পল্লীই জার্ম্মাণ নরনারীর পরিচিত। সমুদ্রে সাঁতার কাটা, সাগরের কিনারায় হাঁটিয়া হাওয়া খাওয়া ভারতেও নেহাৎ অজানা নয়। কিন্তু এদিকে ভারতীয় মধ্যবিত্তের নজর আরও বেশী পড়া দরকার।

জার্ম্মাণির পাহাড়গুলা নেহাৎ নীচু। কিন্তু কোনো পাহাড়ই জার্ম্মাণ পর্য্যটকদের চিন্তায় তুচ্ছ নয়। অধিকন্তু ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে যাইয়া আল্‌প্‌স পাহাড়ের ঘাড় মটকানো বহু জার্ম্মাণেরই সাধ। ভারতবর্ষে এই ধরণের পাহাড়-পর্য্যটন এখনো সুরু হয় নাই। সিমলা দার্জ্জিলিঙের পাহাড়ী-শহরে বেড়াইতে যাওয়া ত 'বাবুগিরি' মাত্র।

জার্ম্মাণরা তাহাদের বন-কাননের সবিশেষ তারিফ করে। বাস্তবিক পক্ষে বনসম্পদ্ জার্ম্মাণিতে বিদেশীর পক্ষে একটা অভিনব স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের খনি-বিশেষ। পাইন, লিণ্ডেন, মেপ্‌ল্ ইত্যাদির বন জার্ম্মা-ণির প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন আটদশ ঘণ্টা এই সকল বনে কাটাইয়া রাত্রিকালে নিকটবর্ত্তী কোনো কুঁড়েতে শুইয়া থাকিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা লালায়িত। এই ধরণের বনভ্রমণ ভারতে বোধ হয় আজও দেখা দেয় নাই।

বার্লিনের আশে-পাশে দেড়-দুই ঘণ্টার রেলপথের মধ্যে সাগর-

হ্রদ-কানন-বেষ্টিত নগর বলিলে কোনো অত্যুক্তি করা হইবে না। এই সকল হ্রদের চারিদিক হাঁটিয়া দেখা গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণদের এক বড় কাজ। জার্ম্মাণির নদীতে-নদীতে হ্রদে-হ্রদে খালের সাহায্যে যোগা-যোগ আছে। কাজেই একমাত্র জলপথেই গোটা জার্ম্মাণি দেখা সম্ভব।

(৫)

লড়াই থামিবার পর হইতে জার্ম্মাণিতে 'যৌবন আন্দোলন' সুরু হইয়াছে। খেলাধূলা কুস্তীকসরৎ এই আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ। বেশভূষায় আর খাওয়া দাওয়ায় সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনও এক বিশেষত্ব। পল্লীভ্রমণ, বন-পরিক্রমা, পাহাড়-পর্য্যটন ইত্যাদি প্রকৃতি পূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই যৌবন-আন্দোলনেরই সামিল।

জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট বিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মজুরদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানাপ্রকার আইন করিয়াছেন। তাহার আনুষঙ্গিক স্বরূপ জার্ম্মাণির বিভিন্ন জনপদে সানাটোরিয়ুম, হাসপাতাল, আরোগ্যশালা ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। সরকারী অথবা বে-সরকারী বীমা-সমিতির চাঁদাদাতা লোকজনেরা বিনা পয়সায় অথবা কম পয়সায় এই সমুদয় আরোগ্যশালায় অতিথি হইতে পারে।

জিমেন্স্-শুকোর্ট্ ইত্যাদি জার্ম্মাণির বড় বড় শিল্প কারখানার অধীনেও এই ধরণের আরোগ্যশালা পরিচালিত হয়। কারখানার মজুরদিগকে স্বাস্থ্যের জন্য ঐ স্থানে পাঠানো হইয়া থাকে।

অধিকন্তু একমাত্র ব্যবসায়ের জন্যও বহু আরোগ্যশালা জার্ম্মাণির সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলা হোটেল-বিশেষ। তবে চিকি-সকের অধীনে পরিচালিত হয় বলিয়া রোগীরাও এইখানে বসবাস করিলে নিজ নিজ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে। তাহা ছাড়া হাসপাতালের আসবাব যন্ত্রপাতি সবই এই সকল হোটেলে যথারীতি

রক্ষিত হয়। কাজেই বিনা উদ্বেগে রোগীরা কয়েক মাস কাটাইতে পারে।

(৬)

ট্যিরিঙ্গেন, শোআর্ট্‌স্‌ভাল্ড এবং স্যাক্‌সনি প্রদেশগুলার পাহাড়ী বন জার্ম্মাণ সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। এই সকল অঞ্চলে আরোগ্যশালা কাজেই অনেক। অধিকন্তু জার্ম্মাণির নানা অঞ্চলের জল নানা প্রকার রোগের ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। এই জল-মাহাত্ম্যে বহুসংখ্যক পল্লী স্বাস্থ্য-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। এই ধরণের জনপদকে 'বাড' বা স্নানাগার বলে। দূর বিদেশের লোকও—কেহ পেটের অসুখের জন্য, কেহ পায়ের গিঁটের ব্যথার জন্য—এই 'বাডে' স্নান করিতে আসে।

মেক্‌লেনবুর্গ প্রদেশের হ্রদ ও কাননগুলা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ফোণ্টানে নামক জার্ম্মাণির একজন আধুনিক গদ্যলেখকের রচনায় এই জনপদের প্রকৃতি-সম্পদ্ চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। বিলাতের 'লেক ডিষ্ট্রিক্ট' যেরূপ, মেকলেনবুর্গের ফ্যিষ্টেনব্যর্গ অঞ্চলও সেইরূপ। এই অঞ্চলে কয়েকটা সরকারী বে-সরকারী আরোগ্যশালা আছে। অধিকন্তু ব্যবসায়ী চিকিৎসকের অধীনেও সানাটোরিয়ুম কায়েম করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বাড়ীটা 'শ্লস' বা রাজপ্রাসাদ ছিল সেইখানে এই আরোগ্য-শালা চলিতেছে। এখানে বসবাস করিয়া বনে হরিণ শিকার করা চলে, হ্রদে মাছধরাও সম্ভব। তাহা ছাড়া, পাইনের হাওয়া ত সর্ব্বদাই বহিতেছে।

একাদশ অধ্যায়

স্যাক্‌সন-নগর ড্রেসডেন

স্যাক্‌সনির সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড

স্যাক্‌সনি পাহাড়ী দেশ। জার্ম্মাণরা এই জনপদের পাহাড়গুলাকে 'জেকজিশে শ্বোআইট্‌স্‌' অর্থাৎ স্যাক্‌সনির সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড বলিয়া থাকে। কিন্তু ড্রেসডেন শহর পাহাড়ী নয়। লাইপৎসিগের মতন ড্রেসডেনও সমতল ভূমির উপরই অবস্থিত।

তবে ড্রেসডেনের দক্ষিণেই পাহাড় সুরু হইয়াছে। শহর হইতে বিশ মিনিটে ট্রামপথে পাহাড় পাওয়া যায়। এল্‌বে দরিয়ার কিনারা হইতেই পাহাড়ী উপত্যকা উঠিয়াছে। ড্রেসডেনের এই মফঃস্বলসদৃশ পাহাড়ী পল্লীর নাম লোশুইট্‌স্‌ এবং ভাইসার হির্শ্‌। পুলে নদী পার হইয়া আবার তারে-টানা রেলে উঁচুতে উঠিতে হয়।

ড্রেসডেনের পাহাড়ী মফঃস্বল জার্ম্মাণিতে এবং জার্ম্মাণির বাহিরেও সুপ্রসিদ্ধ। ভাইসার হির্শ্‌ পল্লীর 'সানাটোরিয়ুম' বা স্বাস্থ্যনিবাস রোগী মহলে এবং চিকিৎসক মহলে নামজাদা। আজকাল বৎসরে প্রায় আটহাজার রোগী চিকিৎসা অথবা বসবাসের জন্য এই সানা-টোরিয়ুমে অতিথি হইয়া থাকে। সানাটোরিয়ুম প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠাতার নাম ডাক্তার লামান।

ভাইসার হির্শ্‌ সানাটোরিয়ুম

(১)

ভাইসার হির্শ বেশী উঁচু নয়। মাত্র সাতশ' ফিট। কাজেই শীত

কালে এখানে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডাও পড়ে না, আবার গরমের সময়েও খুব গরম নয়। বেলে মাটিতে বৃষ্টি হইলে কাদা জমে না, বরং জল শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। শুকনা খট্‌খটে জমিনের উপর চলাফেরা করার সুযোগ পাওয়া যায়।

অধিকন্তু প্রাকৃতিক অবস্থান খুবই ভাল। ভাইসার হির্শ্‌কে এক যোজনব্যাপী পাইন বনের সীমান্ত বলা চলে। এইখানে হাঁটিতে সুরু করিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিলেও পাইনের আওতা ফুরায় না। পাইনের আবহাওয়ার ভিতর স্বাস্থ্যনিবাসে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস কাটাইতে পারিলে যে কোনো লোকেরই শারীরিক উন্নতি ঘটিতে বাধ্য।

এখানকার কর্ম্মকর্ত্তারা বলিলেন :—"বিগত পঁচিশ বৎসরে আমাদের সানাটোরিয়ুমে আশী হাজার নরনারী বসবাস করিয়া গিয়াছেন। কেহ শীতে, কেহ গ্রীষ্মে, কেহ বসন্তে আমাদের অতিথি হন। গরমের দিনেই বেশী।"

বলা বাহুল্য, সকলেই নেহাৎ রুগ্ন বা মরণাপন্ন লোক নয়। বহু অতিথি গরমের ছুটিতে আরাম উপভোগ করিবার জন্য ভাইসার হির্শের আবহাওয়া ঢুঁড়িয়া থাকে।

স্বাস্থ্যনিবাসের দু'একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। বুঝিলাম—দশজন পাকা চিকিৎসক এইখানে বার মাস বাহাল আছেন। একটা প্রকাণ্ড হাসপাতালে যতপ্রকার রোগের জন্য চিকিৎসক রাখা হয়, এই সানাটোরিয়ুমেও সেইরূপ ব্যবস্থা দেখিতেছি।

(২)

এক কর্ম্মকর্ত্রীর সঙ্গে স্বাস্থ্যনিবাসের নানা মহল পর্য্যবেক্ষণ করা গেল। ছোট-বড়-মাঝারি অনেকগুলা বাড়ী এই সানাটোরিয়ুমের

বেশী পয়সা খরচ করিয়া যে-সব লোক বড় বড় শহরের নামজাদা হোটেলে বাস করিতে অভ্যস্ত একমাত্র তাহাদের পক্ষেই ভাইসার হির্শের স্বাস্থ্যনিবাসে চিকিৎসার জন্য অতিথি হওয়া সম্ভব। পল্লীটার আগাগোড়া সবই হয় স্বাস্থ্যনিবাসের বাড়ীঘর অথবা এইগুলারই আনুষঙ্গিক দোকান বাজার ইত্যাদি। তবে সাধারণ গৃহস্থদের বস্তিও আছে এবং লামান-সানাটোরিয়ুমের এলাকার বহির্ভূত ছোটখাটো হোটেলও পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যনিবাসের স্নান-ভবন এক বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরি-বিশেষ। আগুন, গ্যাস, তড়িৎ ইত্যাদির যন্ত্রপাতি যেখানে সেখানে। রোগীর ব্যাধি অনুসারে জলের প্রকৃতি এবং তাপের মাত্রা নির্দ্ধারিত করা হয়। আগ্নেয়গিরির লাভা-মাটি ফুটাইয়া একপ্রকার গরম কাদা তৈয়ারি করা হইয়াছে দেখিলাম। প্রদর্শক বলিলেন :—"এই কাদার চৌবাচ্চায় বসিলে নানাপ্রকার পেটের ব্যথা সারিয়া যায়।" কাদা-স্নানের আয়োজন জার্ম্মাণির নানা অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ।

হাত-পা মালিশ করিবার ঘরে দেখিলাম নানাপ্রকার কলকব্জা। রোগীরা নিজ শক্তি অনুসারে এইগুলা চালাইয়া ব্যায়াম করিতে উপদিষ্ট হয়। তাহা ছাড়া দরকার হইলে স্বাস্থ্যনিবাসের এক কুস্তীগির আসিয়া রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 'মাসাজ্' করিয়া দেয়! পুরুষ এবং নারীর জন্য দুই স্বতন্ত্র বিভাগ।

(৩)

লামান-স্বাস্থ্যনিবাসে স্নান নানাপ্রকার। রৌদ্র-স্নানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ঘরের ছাদের উপর রোগীকে শোয়াইয়া রাখা হয়। রৌদ্রের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এক প্রকার সিন্দুক উদ্ভাবিত হইয়াছে। দরকার হইলে রোগীকে সিন্দুকের ভিতর পূরিয়া রোদে রাখিয়া দেওয়া হয়।

তাহা ছাড়া বায়ু-স্নান। পাইন-ঘেরা মাঠের ভিতর রোগীরা ন্যাংটা হইয়া কুস্তী কছরত করে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকের শরীর ও স্বাস্থ্য অনুসারে ব্যায়ামের মাত্রা এবং খোলা হাওয়ায় চলাফেরা করিবার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই সকল রকমওয়ারি স্নানের ব্যবস্থা দেখিতেছি, আর মনে মনে আওড়াইতেছি—"আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ কৃতম্।"

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় মাপজোক দস্তর মতনই আছে। পথ্যের বিধিনিষেধ পালন করাইবার দিকে হোটেলের কর্ম্মকর্ত্তারা সবিশেষ চেষ্টিত। কোনো কোনো চিকিৎসক রোগীদের সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া আহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

একটা শোআর ঘর, একটা বসিবার ঘর, চারবার খাওয়া এবং মামুলি চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যনিবাস রোজ প্রায় ২৫৲ করিয়া লয়। ঔষধপত্রের খরচ আলাদা।

(৪)

হাসপাতালের চিকিৎসার সরঞ্জামের সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা মিলাইয়া জার্ম্মাণির এবং ইয়োরামেরিকার অন্যান্য দেশের চিকিৎসক এবং ব্যবসায়ীরা লামান-সানাটোরিয়ুমের মতন বহু স্বাস্থ্যনিবাস কায়েম করিয়াছেন। জার্ম্মাণির প্রায় প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর অঞ্চলেই এই ধরণের সানাটোরিয়ুম আছে। অধিকন্তু বার্লিন, লাইপৎসিগ, মিউনিক, ড্রেসডেন, কোলোন, ন্যুর্ণব্যর্গ ইত্যাদি শহরেও হোটেল-স্বাস্থ্যনিবাসের সংখ্যা অনেক।

এই সকল হোটেল-স্বাস্থ্যনিবাসের কার্য্যপরিচালনা বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভারতীয় চিকিৎসকেরা পয়সা রোজগারের একটা নয়া ফিকির খুঁজিয়া পাইবেন এবং দেশের একটা বড় অভাব মোচন করিতেও

পথ্যের ব্যবস্থা করাইতে সমর্থ, তাঁহাদের অনেকেই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাইলে অনেক সময়ে আত্মীয়-স্বজনকে অনর্থক বিড়ম্বনা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

বিদেশে আজকাল ভারত হইতে নানা পর্য্যটক আসিতেছেন। তাঁহাদের ভিতর শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিই অধিকাংশ। চিকিৎসাবিদ্যার প্রতিনিধি পর্য্যটকভাবে বেশী আসেন নাই। তাঁহারা আসিয়া সানাটোরিয়ুমগুলা দেখিয়া গেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিলিয়া একত্রযোগে নব্যভারতের জন্য এক নয়া আয়ের পথ খুলিয়া দিতে পারিবেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার দশ নিয়ম

ভারতে আজকাল শক্তি ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর পড়িয়াছে। লামান-স্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ রোগীদিগকে এবং সুস্থ নরনারীকেও যে সকল নিয়ম পালন করিতে উপদেশ দেন সেগুলা যুবকভারতের পক্ষে কাজে লাগিতে পারে।

আলোচনা করিয়া দেখা গেল, ডাক্তার লামান স্বাস্থ্যরক্ষার দশ নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। সেইগুলা নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

১। সকালে সন্ধ্যায় এবং খাওয়া-দাওয়ার পর দু'এক মিনিট ঘরের ভিতর খোলা হাওয়ায় ন্যাংটা থাকা বাঞ্ছনীয়।

২। বেশী খাওয়া ভাল নয়।

৩। খাইবার সময় জলপান করা নিষিদ্ধ।

৪। জানালা খুলিয়া রাত্রে ঘুমানো উচিত।

৫। মাংস ডিম ইত্যাদি কম খাওয়া উচিত। শাকশব্জী এবং ফলমূলের পরিমাণ বেশী চাই।

৬। শব্জী সিদ্ধ করিতে নাই। তরকারি ভাজিয়া খাওয়াই বিধেয়।

৭। গরম মশলা বাদ দিবে। নূনের মাত্রা কম করিবে।

৮। বিয়ার এবং মদ পরিহার্য্য।

৯। পোষাক পরিচ্ছদ যেন নেহাৎ পুরু ও গরম না হয়। হাওয়া চলার সুযোগ থাকা চাই।

১০। মাসে অন্ততঃ একবার রোদে পড়িয়া ঘামানো প্রশস্ত।

জার্মানের বিধিনিষেধগুলা শুনিয়া মনে হইবে বুঝিবা ভারতীয় নরনারী সকলেই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আবহমান কাল ধরিয়া পালন করিয়া আসিতেছে।

এল্‌বে-উপত্যকায়

বার্লিন হইতে ড্রেসডেন রেলে প্রায় তিন ঘণ্টার পথ। এল্‌বে নদীর দুই ধারে এই শহর অবস্থিত। সদর ষ্টেশনে পৌঁছিবার আগে রেলে পুল পার হইতে হয়। পুল হইতে এল্‌বের দৃশ্য কাশীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার মতন দেখায়। ঘাটের ধারে বাড়ীঘরগুলা প্রাসাদতুল্য। বস্তুতঃ এইগুলা হয় পুরাণা স্যাক্‌সন-নরপতিদিগের প্রাসাদ, রাজগির্জ্জা, অথবা মিউজিয়াম ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এল্‌বে এখানে 'উত্তরবাহিনী' বটে।

স্যাক্‌সন-নগর ড্রেসডেন দেখিয়া খানিকটা ভিয়েনার অথবা প্যারিসের বাস্তুরীতির কথা মনে পড়ে। বড় বড় রাস্তার দুই ধারে ঘর-বাড়ী-গুলায় 'রেণেসাঁস' গড়ন দেখা যায়। ন্যুর্ণবার্গের 'গথিক' এখানে একদম নাই। কিন্তু মোটের উপর ড্রেসডেন শহরে কোন প্রকার বিশেষত্বপূর্ণ সৌধ-সম্পদের প্রভাব চেখে পড়ে না। অবশ্য জার্ম্মাণরা ড্রেসডেনকে এক 'অতি-সুন্দর' শহর সমঝিতে অভ্যস্ত।

এই হিসাবে ড্রেসডেন অপর এক স্যাকসন-নগর লাইপৎসিগেরই অনুরূপ। অট্টালিকার গৌরব স্যাক্‌সনি জনপদের বিশিষ্ট কীর্ত্তি নয়।

বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতেছি। এখানকার 'লাণ্ড-গেরিষ্ট' বা আদালত এবং 'রাটহাউস' বা কোতোয়ালী দুইটায়ই জার্মাণির সুপরিচিত বিপুল পাহাড়ী চাপ পাইতেছি। জার্মাণির অন্যান্য শহরের মতন স্যাক্সনির বাজারগুলাও খোলা আঙিনায় বসিয়া থাকে।

(২)

স্যাক্সনি শিল্পপ্রধান দেশ। কিন্তু ড্রেসডেনে কলকারখানার আওতা বেশী দেখিতেছি না। ফ্যাক্টরীর চিমনী বেশী নাই। কাজেই শহরটা ধোঁয়ার অন্ধকারময় বা অপরিষ্কার নয়।

লোহা-লক্কড় ইত্যাদির কারবারে স্যাক্সনি জার্মাণির দ্বিতীয় রাইন-ল্যাণ্ড-বিশেষ। ভারতবাসী জার্মাণ শাল, আলোয়ান, কম্বল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই সব স্যাক্সনিতে তৈয়ারী হয় কেম্‌নিট্‌স্ শহরে। কেম্‌নিট্‌স্ জার্মাণদের ম্যাঞ্চেষ্টার। এই জন্য ভারতীয় তূলা ও পাট কেম্‌নিট্‌স্ ইত্যাদি স্যাক্সনির নানা শহরে আমদানি করা হয়। তাঁত এবং বয়নবিষয়ক সকল ব্যবসা এবং বিদ্যাই স্যাক্সনির বিশেষত্ব। ভারতীয় মহাজন এবং ছাত্রেরা দলে দলে স্যাক্সনির ছোট বড় নানা নগরের সন্ধান রাখিতেছে।

ড্রেসডেনের 'টেকনিশে হোখ্‌শুলে' একটা নয়া কলেজ। বার্লিনের শিল্প-কলেজের মতন ইহার নাম জগদ্‌ব্যাপী হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু ড্রেসডেনের প্রতিষ্ঠানে নবীনতম বৈজ্ঞানিক আয়োজন এবং ল্যাবরেটরীর সরঞ্জাম যত আছে, বার্লিনের বিদ্যালয়ে তত আছে কিনা সন্দেহ। বার্লিনের শিক্ষা-সচিবের সহকারী, অধ্যাপক এঞ্জিনিয়ার আওমুণ্ড এক দিন বলিতেছিলেন :—"টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলগুলার ভিতর যেটা যত নতুন সেটা তত আধুনিক ; অর্থাৎ পুরাণা সেকেলে ব্যবস্থা সেইটায় তত কম"।

(৩)

এল্‌বের ঘাটে বেড়াইতে গিয়া দেখি,—সেইনের দুইধারকার স্মৃতি-

খানিকটা জাগিয়া উঠিল। দুইধারে বাঁধা রাস্তা। নদীটাও নেহাৎ অপ্রশস্ত নয়। প্যারিসে ফরাসীরা ঘাটের ধারে যে আনন্দ উপভোগ করে, স্যাক্‌সনরাও এল্‌বের কিনারা সম্বন্ধে সেই গৌরব করিতে পারে। এই হিসাবে বার্লিনের লোকেরা নেহাৎ দরিদ্র।

রাজবাড়ীর ঘাটে বড় বড় ষ্টীমার বাঁধা দেখিলাম। এই ষ্টীমারে চড়িয়া দক্ষিণে উজাইয়া যাওয়া যায়, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ শহর পর্য্যন্ত। ভাটাইয়া যাওয়া যায় বলা বাহুল্য স্যাক্‌সনি ছাড়াইয়া প্রুশিয়ার ভিতর দিয়া সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত।

চেকোস্লোভাকিয়ার পথে পড়ে পাহাড়ের পর পাহাড়। এই পাহাড়-গুলায় গণ্ডা-গণ্ডা স্বাস্থ্যকর পল্লী ও নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞ্চল-টাকে জার্ম্মাণির এক 'শ্বোআইট্‌স্' বা স্বইট্‌সার্ল্যাণ্ড বলে।

রাইনল্যাণ্ডের মতন স্যাক্‌সনিও বোলশেভিজমের বাথান। যেখানে যত কারখানা, কল, ফ্যাক্‌টরি সেইখানে তত মজুর-সমস্যা, সোশ্যালিজম এবং কমিউনিজম। বস্তুতঃ স্যাক্‌সনিতে পূরাপূরি রুশ মতের মজুর গণতন্ত্র চলিতেছে বলা যাইতে পারে। পুলিশের সঙ্গে মজুরদের দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়াই আছে। ড্রেসডেনেও রক্তারক্তি হইয়া গেল। পুলিশের লোক মজুরদের ভয়ে রাস্তায় দেখা দেয় না।

(৪)

লাইপৎসিগে দেখিয়াছি কেতাবের ব্যবসা। ছাপাখানা, ছাপাখানার কলকারখানা, ছাপাখানার পাঠশালা এই সবই লাইপৎসিগের বিশেষত্ব। 'শেণ্টার উণ্ড গীজেকে' কোম্পানীর তৈয়ারী 'ফ্যেনিক্‌স্' যন্ত্র ভারতীয় ছাপাখানায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ড্রেসডেনে সেইরূপ একটা শিল্পের নামডাক খুব বেশী। রাজবাড়ীর নিকটে এক গলিতে সংগ্রহালয় দেখা গেল। এইখানে পোর্সলেন বা

শহরে। ড্রেসডেন হইতে ভাটাইয়া ঘণ্টা দুএকের ভিতর মাইসেনে পৌঁছানো যায়। জাপানী 'সাচুমা' বা ফরাসী 'সেভর্' চীনের বাসনে যে ইজ্জৎ পায়, জার্ম্মাণ মাইসেনেরও দুনিয়ার বাজারে সেই ঠাঁই। এইগুলায় একাধারে রাসায়নিক এবং সুকুমার শিল্পকলার সমাবেশ। রাজরাজড়া, আমির-ওমারওদের জন্য বাসন-কোসন তৈয়ারী ত হয়ই, অধিকন্তু সাধারণ গৃহস্থালীর জন্যও মাইসেনের কারিগরেরা আসবাব জোগাইয়া থাকে।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩

২৭ সেপ্টেম্বার (১৯২৩) তারিখে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট স্থির করিলেন, —"রুর অঞ্চলে আর সত্যাগ্রহের লড়াই চালানো সম্ভব নয়। ফাঁরাঁসের নিকট আক্কেল সেলামী ঠুকিতেই হইবে। জার্ম্মাণরা আট মাসের লড়াইয়ে হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছে। আগামী শীতের জন্য শান্তি চাই।"

এইরূপ অপমানসূচক বশ্যতা স্বীকারের কাণ্ড দেখিয়া ভাবিতেছি, জার্ম্মাণরা দ্বিতীয়বার লড়াইয়ে হারিল। ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাসে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইয়া জার্ম্মাণি যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিল, সেই দুর্ব্বলতাই আবার গভীরতর ভাবে জার্ম্মাণ সমাজে আত্মপ্রকাশ করিল। জার্ম্মাণ জাতের কপালে এখনো অনেক দুঃখ আছে।

ড্রেসডেনের সংগ্রহালয়

(১)

বার্লিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারির কর্ত্তা শ্রীযুক্ত জুষ্টী বলেন—"জার্ম্মাণির নানা প্রাদেশিক নগরে যতগুলা বড় বড় সুকুমার শিল্পের মিউজিয়াম্ আছে, পৃথিবীর আর কোনও এক দেশে ততগুলা নাই।" কথাটা

ড্রেসডেনের সংগ্রহালয়ের ভিতর দেখি ভিন্ন ভিন্ন ঘরে একাধিক পুরুষ ও মহিলা নামজাদা চিত্রকরদের কাজ দেখিয়া নকল করিতেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর জার্ম্মাণ চিত্রকরদের ভিতর হোলবাইন, ক্রানাক এবং ড্যিরেরের নাম জগৎপ্রসিদ্ধ। এইখানে প্রত্যেকেরই দুএকটা কাজ দেখা গেল। সেকালের শিল্পকলায় মাতৃমূর্ত্তি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বস্তু। আধুনিক ও উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ চিত্রকরদের জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইতেছে।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ চিত্রশিল্প ড্রেসডেনের মিউজিয়ামে এক বিশেষত্ব। রুইজডেল, হেডা, ভুভরমান ইত্যাদি বহু নয়া নামের সন্ধান পাওয়া গেল। সমসাময়িক ইতালীয় শিল্পের সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য। করেজিও, কারাচী ইত্যাদি অনেক শিল্পের কাজ লুভর বা অন্যান্য মিউজিয়ামে দেখিয়াছি কিনা মনে পড়িতেছে না। খ্রীষ্টানদের 'জন্মাষ্টমী' করেজিওর হাতে নেহাৎ 'অহিন্দু'-কিছু নয়।

অনেক পয়সা খরচ করিয়া শিল্পীদের মূল-চিত্রগুলা ড্রেসডেনে আনা হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি। এমন কি, রাফায়েলের আঁকা খ্রীষ্টান-গৌরব 'মাডোনা'টাও এই সংগ্রহালয়ের এক স্বতন্ত্র গৃহে বেদীর উপর সাজানো দেখিলাম। এই মূলগুলা নকল করিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে বহু শিল্পী ড্রেসডেনে তীর্থ করিয়া যায়। ড্রেসডেন এই কারণেই জগতের সভ্য-ভব্য মহলে নামজাদা।

(২)

ড্রেসডেন এমন-কিছু বড় শহর নয়। বোধ হয় মাত্র লাখ তিনেক লোক। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় নাই। কিন্তু নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক মিউজিয়াম দেখিলাম। আকর-তত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহালয়টা ছোট বটে, কিন্তু এই বিদ্যার ওস্তাদেরা বোধ হয় ইহাকে নগণ্য বিবেচনা করিতে পারিবেন না। রসায়ন এবং যন্ত্রবিদ্যার চর্চ্চায় এখানকার

টেক্‌নিক্যাল কলেজ উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। স্যাক্‌সনদের বিশ্ববিদ্যালয় লাইপৎসিগে।

রাজপ্রাসাদের কতকগুলা ঘরে 'মণি-মাণিক্যের' সংগ্রহ দেখিলাম। কোনো ঘরে চীনের বাসন, কোনো ঘরে এনামেল, হাতীর দাঁত, ঝিনুক, কাচ, প্রবাল, হীরা, মুক্তা ইত্যাদি। অর্থাৎ 'সপ্ত ধাতু' এবং 'নবরত্ন' ইত্যাদি ঘটিত অশেষ প্রকার কারুকার্য্য এই ঘরগুলার সম্পদ। ভারতীয় আমীর-ওমারওদের রত্ন-সংগ্রহকে যাঁহারা জগতে অদ্বিতীয় বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট এই 'গ্রিয়ুনেস্ গেভেলবে'র অর্থাৎ সবুজ গুম্বজের সংগ্রহ 'পশ্চিমা' নরনারী সম্বন্ধে এক নবীন বার্ত্তা আনিয়া দিবে। বিলাসের শিল্পকলায় পশ্চিম পূবের চেয়ে কোনো দিনই খাটো ছিল না।

রাইন-রুরের স্বাধীনতা

রাইন এবং রুরের জার্ম্মাণরা একটা স্বাধীন গণতন্ত্র কায়েম করিবার চেষ্টায় আছে। এদিকে ব্যাভেরিয়ার লোকেরা সত্যাগ্রহের লড়াই রদ করিবার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। দরকার হইলে ইহারা প্রুশিয়া হইতে আলাদা হইয়া যাইবে। স্যাক্‌সনি ত কয়েক মাস ধরিয়া বোলশেভিক-পন্থী রহিয়াছেই।

তাহার উপর জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট গোটা জার্ম্মাণ মুল্লুকে সামরিক আইন জারি করিলেন। সত্যাগ্রহের লড়াই রদ করিবার জন্য যে হুকুম চালানো হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার সভা, সমিতি, বক্তৃতা, মিছিল ইত্যাদি কিছুই অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না। জার্ম্মাণ সমাজের আজ ঘোরতর দুর্গতি। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষিত হইবে কিনা সন্দেহ। অধিকন্তু জার্ম্মাণ জাতির স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই আঁতাঁতের চরণতলে গড়াগড়ি যাইতেছে।

মাইসেন শহর

এল্‌বে বক্ষে শফরে বাহির হইলাম। ড্রেসডেনে এক ছোট ষ্টীমারে সওয়ারী হওয়া গেল। ভাটাইয়া চলিতেছি। জলস্রোত আছে মন্দ নয়। কিন্তু এত নোংরা যে কেহ কখনো বোধ হয় মুখে দেয় না। কাহাকেও অন্ততঃ সাঁতার কাটিতে দেখিলাম না। ষ্টীমারের ঢেউয়ের জল পায়ে ধরিবার জন্য বালকবালিকারা নদীর কিনারায় আসিয়া দলে দলে দাঁড়াইতেছে। বাঙ্গালীর পক্ষে এই দৃশ্য আটপৌরে।

খানিক দূর যেন মুর্শিদাবাদের গঙ্গার দুইধারে ঘরবাড়ী দেখিতেছি। তবে স্যাক্‌সনি কলকারখানা-বহুল। কাজেই নিকটের পল্লীতে বা ছোট শহরে ফ্যাকটরির আড্ডা। কিন্তু আজকাল কাজকর্ম্মের কোলাহল কিছু কম। সপ্তাহে তিন দিন মাত্র কাজ চলে। কয়লার অভাব। রুর ফরাসীদের কব্জায় যাওয়ায় জার্ম্মাণির শিল্পজগতে অধোগতি দেখা দিয়াছে। একথা মজুরেরা বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে। স্যাক্‌সনি জুড়িয়া মজুর মহলে 'বেকার হাজার-হাজার'। সাত আট মাসে জার্ম্মাণি বাস্তবিকই কাবু হইয়াছে। এই জন্যই শেষ পর্য্যন্ত ষ্ট্রেজে-মানের গবর্মেণ্ট সত্যাগ্রহের রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল।

ঘণ্টা দুএকের ভিতর মাইসেনে পৌঁছিলাম। পথে দুএকটা কেরোসিন তেলের জাহাজ পড়িল। অদূরে পাহাড় দেখা যাইতেছিল। মাইসেনের নিকটে পৌঁছিতে পৌঁছিতে পাহাড়ী দুর্গ এবং পাহাড়ী শহর চোখে পড়িল। ষ্টীমার হইতে, রাজবাড়ীতে এবং রাজগির্জ্জায় বিপুল সৌধের মূর্ত্তি পরিস্ফুট দেখা যায়।

চীনামাটির কারখানা

(১)

মাইসেনের নাম জানে না এমন লোক জার্ম্মাণিতে ত নাইই,

নরনারীর সকাল-বিকাল-সন্ধ্যায় উঠতে-বস্‌তে কাজে লাগে। আর সেই চীনাবাসনের আদিস্থান মাইসেন। কেবল আদিস্থান মাত্র নয়, মাইসেন আজ পর্য্যন্ত পোর্সলেন-শিল্পে জগতে অদ্বিতীয়। অন্ততঃ জার্ম্মাণদের এই মত। মাইসেনের বাসন-কোসন গৃহস্থালীতে ব্যবহার করিতে পারা প্রত্যেক জার্ম্মাণ নরনারীর পক্ষে এক চরম গৌরব ও গর্ব্বের বিষয়।

ফ্যাক্টরির বর্ত্তমান কর্ত্তার নাম ফাইফার। ইনি একাধারে শিল্পী এবং রাসায়নিক। পোর্সলেনের গড়নে সুকুমার শিল্প এবং রসায়ন দুইই সমান দরকারী। ফ্যাক্টরিটা স্যাক্‌সনির সরকারী প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমানে প্রায় ১২০০ পুরুষ-নারী কাজ করে।

ফাইফারকে জিজ্ঞাসা করিলাম:—"চীনের আসল চীনাবাসনে আর ইয়োরোপ ও আমেরিকার চীনাবাসনে কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রভেদ আছে?" উত্তর:—"কোনো বিষয়েই না। প্রাচীন চীনা পোর্সলেন যে বস্তু, বর্ত্তমান জগতের পোর্সলেনও সেই বস্তু। টেক্‌নিক্যাল তরফ হইতে আমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করিতে পারি নাই। তবে প্রাচীন চীনা ইয়োরোপীয় চীনার মত টেকসই নয়। চীনারা ১০০০ ডিগ্রির বেশী তাপ স্ববশে আনিতে পারে নাই। আমরা ১৫০০ ডিগ্রী তাপে আমাদের মাটিগুলা পুড়াইতে পারি। এই কারণে চীনা পোর্সলেন কিছু নরম আর আমাদের পোর্সলেন গ্রাণাইটের মতন শক্ত। ইস্পাতের তীক্ষ্ণতম ছুরিতেও ইহার উপর দাগ বসানো সম্ভব নয়।"

(২)

কারখানার ভিন্ন ভিন্ন ঘর দেখিতে বাহির হওয়া গেল। প্রদর্শক পোর্সলেন পুড়াইবার কৌশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। চীনের বাসন তৈয়ারী করিবার কারবারে আগুন এবং ভাটিই আসল বস্তু। মাটি পাথর ঢুঁড়িয়া আনা আর সেই সব গুঁড়াইয়া কাদা তৈয়ারি করা

অতি সহজ কথা। কিন্তু আগুন-বিদ্যায় করিৎকর্ম্মা হওয়া মুখের কথা নয়। অন্যান্য অনেক শিল্পেও ভাটি-বিজ্ঞান বিশেষ স্থান অধিকার করে।

কেতাবে ত অনেক ফর্ম্মূলাই লেখা থাকে। প্রায় সকল শিল্পেরই রসদের পরিমাণ ডিক্‌শনারিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেইগুলা পড়িয়া কারখানায় কাজ করা সম্ভব নয়। এমন কি টেক্‌নিক্যাল কলেজে পাঁচ-সাত বৎসর কাটাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানালয়ে কাজ করিয়া অথবা এমন কি অতি প্রসিদ্ধ ফ্যাক্‌টরিতে নামজাদা ওস্তাদের সাকরেতি করিয়াও পরে নিজ চেষ্টায় একটা শিল্প দাঁড় করানো অনেক সময়ে অসাধ্য। কোনো শিল্পেই 'স্বাধীন' ভাবে 'হাতে কলমে' কাজ সুরু না করিলে একটা-কিছু খাড়া করানো সম্ভব নয়। অনেকবার ফেল মারিবার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। ফেল মারিয়া-মারিয়া অনেক টাকা জলে ফেলিতে ফেলিতেই শিল্পকর্ম্মীরা সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া চলে।

চীনা মাটি পুড়াইবার কৌশল একটা গুপ্ত বিদ্যা-বিশেষ। আথাটা যাহাতে ফাটিয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করা অশেষ কষ্টকল্পনার কাজ। কাজেই প্রদর্শক মহাশয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝিয়াছি একথা বলিলে একটা খাঁটি মিথ্যা প্রচার করা হইবে। বুঝা গেল মাত্র এই যে, কোনো বাসন তিন বার, কোনো বাসন চার বার, কোনো বাসন পাঁচবার পর্য্যন্ত পুড়াইতে হয়। আগুনের তাপ ভিন্ন ভিন্ন বাসনে ভিন্ন ভিন্ন। আনাড়ি পর্য্যটক ইহার বেশী আর কিছু বুঝিতে পারে না।

ফাইফার বলিলেন :—"এমন নিরেট বাসন তৈয়ারী করিতেছি যে, তাহাতে মাংস রান্না করা পর্য্যন্ত সম্ভব।" চীনা মাটির বাসন বলিলে ভারতে আমরা সহজেই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় এইরূপ মাল বুঝি। মাইসেনের কারখানায় ডেক্‌চি কড়াই ইত্যাদি সবই তৈয়ারী হইতেছে।

পোর্সলেনের সুকুমার শিল্প

(১)

কৃষ্ণনগরের পুতুল যে হিসাবে শিল্প-সামগ্রী, পোর্সলেনের কাজকর্ম্মও সেই হিসাবে শিল্প-সামগ্রী। ছবি আঁকা হয় কাগজে, পাতায়, রেশমে, কাঠে, দেওয়ালে। এই সবগুলিই সুকুমার শিল্প। মূর্ত্তি গড়া হয় পাথরে, কাঠে, সোনায়, রূপায়, কাঁসায়, তামায়, কাদায়। এইগুলাকেও সুকুমার শিল্প বলা হয়। অধিকন্তু তামার উপর ছুঁচের দাগে যে চিত্র উঠে অথবা কাঠের উপর নরুণের কাজে যে মূর্ত্তি তৈয়ারী হয়, সেই গুলার ছাপ কাগজে তুলিলে এচিং এবং উডকাট-শিল্পের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ যেখানেই একটা রূপ গড়িয়া উঠিতেছে সেইখানেই শিল্প উৎপন্ন হইতেছে।

মাটি, পাথর, কাঠ, ধাতু, রত্ন ইত্যাদির মতন পোর্সলেন বা চীনা মাটিও একটা রূপ-সহ বস্তু। এই বস্তু লইয়া যাঁহারা রকম-রকম রূপ সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারাও সুকুমার শিল্পেরই উপাসক।

রূপ সৃষ্টির কাজে কলের সাহায্য বড় বেশী দেখিলাম না। প্রায় প্রত্যেক ঘরেই হাতের কাজের প্রাধান্যই লক্ষ্য করিলাম। মান্ধাতার আমলের কুমারেরা হাতে পায়ে যে ধরণের চাকা ঘুরাইয়া হাঁড়ী-কুঁড়ী কল্‌কে সরা গেলাস তৈয়ারী করিত, সেই ধরণের চাকার রেওয়াজ মাইসেনের এই বিরাট কারখানায় আজও চলিতেছে। তাহা ছাড়া বাসনের গায়ে রং লেপা, ছবি আঁকা ইত্যাদির অধিকাংশই কারিগরেরা নিজ হাতে, বিনা যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন করিতেছে।

(২)

থালা বাটি পেয়ালা গামলা ইত্যাদি আটপৌরে জীবনের ব্যবহারোপ-যোগী রূপ সৃষ্টি করিবার জন্য বহু কারিগরকেই এই কারখানায়

নিযুক্ত দেখিলাম। এই আটপৌরে আসবাবের রচনায় অতি সাধারণ নক্সা হইতে সুরু করিয়া অত্যুচ্চ কলাজ্ঞানের পরিচায়ক রং বিন্যাস এবং রূপভঙ্গীর সৃষ্টি হইতেছে দেখিলাম।

অধিকন্তু কোথাও দেখিলাম নারীরা পোর্সলেনের ফুল তৈয়ারী করিতেছে। কোথাও চীনামাটি দিয়া বেতের চুপড়ী তৈয়ারী হইতেছে। কোন চীনামাটির ভাস্কর মানুষের মূর্ত্তি গড়িতেছে, কেহ বা জানোআর গড়িতেছে। কোনো কোনো শিল্পী রেকাবির উপর প্রাকৃতিক দৃশ্য, অথবা পল্লী নগরের দৃশ্য, অথবা পল্লী নগরের চিত্র আঁকিতে ব্যস্ত। এক ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রদর্শক বলিলেন :—"এখানকার ওস্তাদেরা কোনো নক্সা নকল করেন না। ইঁহাদের হাতের প্রত্যেক কাজে এক একটা নতুন চিত্র অথবা বর্ণ-সমাবেশ দেখিতে পাইবেন।"

বার্লিনের নামজাদা শিল্পী শয়রিক ভবিষ্যপন্থী স্থপতিদের অন্যতম। ইঁহার তৈয়ারী গড়নগুলার নকলে মাইসেনের কারিগরেরা কতকগুলা চীনামাটির মূর্ত্তি গড়িয়াছে। বৎসর খানেক হইল জার্ম্মাণ ভাস্কর গাউলের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ছিলেন সিংহ-শিল্পী। সিংহ-সিংহী গড়িয়া ইনি জার্ম্মাণ সমাজে প্রসিদ্ধ হন। গাউলকে মাইসেনে ডাকা হইয়াছিল। তিনি কাজ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মারা পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পাথর এবং ধাতুর মূর্ত্তিগুলা চীনামাটিতে রূপ পাইয়াছে। গাউলের শিষ্য এস্‌সার মাইসেনে বাহাল আছেন। এস্‌সার চীনামাটিতে শিয়াল, বানর, কাকাতুয়া, হাঁস ইত্যাদি গড়িয়া মাইসেনে এক চিঁড়িয়াখানা বসাইতেছেন। চীনামাটির ভাস্কর্য্য এবং চিত্রকলা দুইই সুকুমার শিল্পের সম্পদ্। একথা মাইসেনের কারখানায় বার বার মনে হইতেছে।

ভারতে পোর্সলেন

পোর্সলেন ভারতে সবে স্থরু হইতেছে। ভারতবাসী নিত্যনৈমিত্তিক গৃহস্থালীতে চীনা মাটির বাসনকে এখনো যথোচিত স্থান দেন নাই। এই সবের বিরুদ্ধে আমাদের বোধ হয় একটা কুসংস্কারও আছে। এই কুসংস্কার ইয়োরোপেও ছিল।

পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও ইয়োরোপীয় পল্লীগ্রামের এবং ক্ষুদ্র নগরের নরনারীরা কাঁসা পেতল ইত্যাদি ধাতু-নির্ম্মিত থালা বাটিই পছন্দ করিত। পোর্সলেনকে একটা খরুচে পরিবারের বিলাসের সামগ্রী মাত্র বিবেচনা করা হইত। ধাতুর বাসনের সমান চীনের বাসন টেকসই নয়,—এই ছিল আপত্তি। ভারতেও এই আপত্তিটাই নানা আকারে নানা নামে প্রচলিত।

কিন্তু অধ্যবসায়ের ফলে চীনামাটির ওস্তাদেরা ইয়োরোপ হইতে ধাতুর বাসন মান্ধাতার আমলের মালে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। পোর্সলেন-শিল্পটা যদি কোনো দিন ভারতীয় কারিগরদের স্বরাজ্যে ঠাঁই পায়, সেইদিন ভারতবাসীও চীনের বাসনকে বিদেশী বা ম্লেচ্ছ বস্তু অথবা বিলাসের বস্তু বিবেচনা করিবে না।

চীনা বাসন দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপে খাঁটি বিদেশী বস্তু ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীয় পর্য্যটক মার্কোপোলো চীন-পর্য্যটনের কাহিনীতে চীনামাটির গৌরব প্রচার করেন। সেই সময় হইতে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপের নানা দেশে চীনামাটির আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতে থাকে।

বেষ্চার নামক এক জার্ম্মাণ রাসায়নিক ডাক্তার যে-সে ধাতু হইতে সোনা তৈয়ারী করিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছিলেন। তখনকার দিনে সোনার নেশা ছিল জগদ্ব্যাপী। হঠাৎ এক ভাটিতে বেষ্চার সোনা

না পাইয়া পাইলেন চীনামাটি। প্রথম আবিষ্কৃত হয় লাল পোর্সলেন,—পরে খাঁটি চীনা মাল (১৭১০)। বেঙ্গার ছিলেন স্যাক্সন-রাজের কর্ম্মচারী। তখন হইতে ড্রেসডেন-মাইসেনে পোর্সলেন চলিতেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পরাজিতের ক্রমপতন

(অক্টোবর-নবেম্বর ১৯২৩)

বেকার-ও মুদ্রা-সমস্যা

(১)

অক্টোবর মাস (১৯২৩) ধরিয়া জার্ম্মাণির ভিতর সকল ক্ষেত্রেই নানা অশান্তি ও বিপ্লব চলিতেছে। এই সকল গণ্ডগোলের কোন প্রকার কিনারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। জার্ম্মাণ নরনারীরা মহা উদ্বেগে জীবন যাপন করিতেছে।

সত্যাগ্রহের লড়াই রুর জনপদে আর চলিতেছে না। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট আইন জারি করিয়াছেন, মজুরেরা পুনরায় খনিতে এবং ফ্যাক্টরীতে কাজ সুরু করিতে পারে। অথচ খনি এবং ফ্যাক্টরীর মালিকেরা কারখানাগুলা চালাইবার মতন টাকা খরচ করিতে অসমর্থ। কাজেই মজুরদিগকে বেতন দিয়া বাহাল করা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অপরদিকে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টও সরকারী টাকা খরচ করিয়া রুর অঞ্চলের মজুরদিগকে আর অন্নবস্ত্র দিতে অপারগ। ফলতঃ সত্যাগ্রহ লড়াই বন্ধ হওয়ার পর হইতে রুরের নরনারী মহাকষ্টে পড়িয়াছে।

জার্ম্মাণির সর্ব্বত্র জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়া গিয়াছে অত্যধিক পরিমাণে। অনেক জিনিষ আজকাল বিলাতী ও মার্কিণ মালের সমান মাগ্‌গি। কাজেই

বেতন দিবার ক্ষমতা অনেক কারখানারই নাই। সুতরাং অন্যান্য শিল্প-প্রধান প্রদেশে সপ্তাহে তিন দিনের বেশী কাজ চলে না।

আজ এ-শহরে কাল ও-শহরে দোকান-বাজার লুটপাঠের কাণ্ড দেখা দিতেছে। বার্লিন শহরেও সপ্তাহে দুএকবার রুটি মাখনের দোকানে, মাংসের দোকানে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিতেছে।

(২)

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য জার্ম্মাণ পার্লামেণ্ট তাহা সাব্যস্থ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নানা দলের নানা মত। কিন্তু মতামতের আলোচনার জন্য সময় এত বেশী লাগিতেছে যে, কোনো পাকা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছান অসম্ভব।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া প্রেসিডেণ্ট এবার্ট পার্লামেণ্ট তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। পার্লামেণ্টের তর্ক-প্রশ্নের আওতা হইতে রেহাই পাইয়া মন্ত্রিপরিষৎ যাহাতে স্বাধীনভাবে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে তাহার আয়োজন করা হইল। কয়েক মাসের জন্য জার্ম্মাণিতে একচ্ছত্র ডিক্‌টেটরের শাসন চলিবে। বহুসংখ্যক পরামর্শদাতার কথা শুনিতে বাধ্য না হইয়া মন্ত্রিপরিষদের ওস্তাদ মহাশয়গণ জার্ম্মাণির সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিবেন। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশের ভিতর বহু আন্দোলন্ চলিয়াছে,—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রিপরিষৎকে ডিক্‌টেটারের ক্ষমতা ষোল আনা দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মাণ মার্ক আজ রুষ রুব্‌লের অপেক্ষাও নীচে আসিয়া পড়িয়াছে। এক এক বিলাতী পাউণ্ডে পাওয়া যায় পঞ্চাশ ষাট মিলিয়ার্ড মার্ক। এক মিলিয়ার্ড একশ কোটির সমান। অর্থাৎ এক ভারতীয় টাকায় পাওয়া যায় ৪০০ কোটি মার্কের চেয়েও বেশী। বলা বাহুল্য, মুদ্রা-সংস্কার ডিক্‌টেটারের এক প্রধান কাজ। এই দিকে শীঘ্রই যাহাতে একটা

(৩)

মুদ্রাসমস্যাই জার্ম্মাণির একমাত্র আভ্যন্তরিক সমস্যা নয়। জার্ম্মাণির মজুর মহলে আজকাল বেকারদের সংখ্যা বাড়িতেছে। এই সমস্যা বিগত চার বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণিতে একদম ছিলই না বলা চলে। কিন্তু মাস কয়েক হইল কর্ম্মাভাব সুরু হইয়াছে।

অপরদিকে বিদেশী বাজারে জার্ম্মাণদের টক্কর দেওয়া আজকাল এক প্রকার অসম্ভব। কারখানায় কারখানায় কাজের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। জার্ম্মাণিতে এতদিন রোজ আট ঘণ্টা মাত্র কাজ চলিতেছিল। শিল্পনায়কেরা বলিতেছেন, "আট ঘণ্টার বেশী করিয়া কাজ না চলিলে জার্ম্মাণির লোকেরা দুনিয়ার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে না। অতএব মজুরদের কাজের ঘণ্টা সম্বন্ধে নয়া আইন কায়েম করা দরকার।" এই মতের বিরুদ্ধে মজুরপন্থী জননায়কেরা খড়্গহস্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা রফা করা হইয়াছে। ডিক্‌টেটরের হুকুমে আইন বদলানো আজকাল আর বিশেষ কঠিন কথা নয়।

ডিক্‌টেটরের হুকুম চলিতেছে গোটা জার্ম্মাণ মুল্লুকে। কিন্তু সকল প্রদেশেই হুকুম গুলা সমানভাবে তামিল করা হইতেছে না। স্যাক্‌সনি এবং ব্যাভেরিয়া এই দুই প্রদেশে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। জার্ম্মাণি টুকরা-টুকরা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তার উপর রাইন-রুর অঞ্চলে ডিক্‌টেটরের শাসন একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। গোটা জার্ম্মাণির মুদ্রা ব্যবস্থা হইতে ফারাক করিয়া এই অঞ্চলের জন্য এক নয়া মুদ্রা চালানো হইতেছে। মুদ্রার স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতাও কায়েম হইবার

"ডিক্‌টেটর" বনাম কমিউনিষ্ট ও ব্যাভেরিয়া

(১)

স্যাক্‌সনি এবং ট্যুরিঙ্গেন প্রদেশ দুইটায় মজুরেরা যারপরনাই বল-বান। ইহারা অধিকাংশই রুষ মতাবলম্বী কমিউনিষ্টপন্থী। কমিউনিষ্ট মতের প্রতিনিধিরা শাসনকার্য্যেও বিশেষ ক্ষমতাশালী। অধিকন্তু সরকারের সঙ্গে মজুরের দাঙ্গা সর্ব্বদাই এখানে চলিতেছে।

স্যাক্‌সনি এবং ট্যুরিঙ্গেনকে ডিক্টেটরের হুকুমের অধীনে আনা বড় কঠিন। গ্রামে গ্রামে শহরে-শহরে মজুরেরা এবং মজুরপন্থী জননায়কেরা সোভিয়েট অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ কায়েম করিয়াছে। যে সকল নরনারী এই সমুদয় সোভিয়েটের নিয়ম মানিয়া চলিতে আপত্তি করে তাহাদিগের উপর মজুরেরা রাস্তায় ঘাটে জুলুম চালাইতেছে। এই সকল নরনারীকে সরকারের পক্ষ হইতে রক্ষা করা সহজ নয়।

গবর্ণমেণ্টের হুকুমে সোভিয়েটগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছে। কিন্তু মজুরেরা এবং মজুরপন্থীরা কোনো মতেই কাবু হইতেছে না। বরং ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেণ্টই মজুরসঙ্ঘের অধীনস্থ স্বেচ্ছাসেবকগণের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইতেছে। এই সকল আটকাইয়া রাখা বার্লিনের ডিক্‌টেটরদের পক্ষে সম্ভব কিনা সন্দেহ। স্যাক্‌সনি এবং ট্যুরিঙ্গেন এই দুই প্রদেশ প্রুশিয়া হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়া কমিউনিষ্ট রিপা-ব্লিক কায়েম করিতে পারে,—এইরূপ সন্দেহ বহু জার্ম্মাণ নরনারীর চিত্তেই স্থান পাইতেছে।

(২)

স্যাক্‌সনির সেনাপতি জার্ম্মাণ ডিক্‌টেটরের হুকুম অনুসারে স্যাক্‌সন মজুরসঙ্ঘকে জব্দ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু ব্যাভেরিয়ায় ঘটিতেছে আর

ব্যাভেরিয়ার সরকারের নিকট বার্লিন হইতে এক হুকুম গিয়াছিল। ব্যাভেরিয়ার সেনাপতির উপর হুকুম তামিল করিবার ভার ছিল। সেনাপতি হুকুম তামিল করেন নাই। বার্লিনের কর্ত্তারা ব্যাভেরিয়ার সেনাপতিকে বরখাস্ত করিয়া এক নয়া সেনাপতি বাহাল করেন। তার পাল্টা জবাব দিয়া ব্যাভেরিয়ার সরকার পুরাণা সেনাপতিকেই পদে রাখিয়াছেন।

এখন চলিতেছে ব্যাভেরিয়ায় প্রুশিয়ায় কথা-কাটাকাটি। ব্যাভেরিয়া বলিতেছেন,—"আমাদের সেনাবিভাগ এবং সেনাপতি প্রুশিয়ার অধীন নয়। তোমার হুকুম তামিল করিতে ব্যাভেরিয়া বাধ্য নয়। এই হুকুম বে-আইনি।"

ব্যাভেরিয়ায় প্রুশিয়ায় এইরূপ মন-কষাকষি দেখিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন,—এইবার জার্ম্মাণি দুই টুকরা হইল! ন্যাশন্যালিষ্ট-পন্থী জার্ম্মাণরা ব্যাভেরিয়ার সরকারকে গালাগালি করিয়া বলিতেছে,—"ব্যাভেরিয়ানদের কি দুর্ম্মতি! একদিকে আঁতাঁতের লোকেরা রাইন-রুরকে জার্ম্মাণদের আওতা হইতে কাড়িয়া লইতেছে। অপর দিকে বোলশেভিকপন্থী মজুরেরা জার্ম্মাণির মধ্যস্থলে স্যাক্সনি এবং ট্যুরিঙ্গেন প্রদেশকে জার্ম্মাণ কুণ্টুরের বাহিরে লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে কি প্রুশিয়ার সঙ্গে ব্যাভেরিয়ার আইন লইয়া ঝগড়া বাঁধানো উচিৎ? দুনিয়ার লোক জার্ম্মাণির দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসিতেছে যে!"

হিট্‌লারের আবির্ভাব

ব্যাভেরিয়ার লোকেরা কমিউনিষ্টপন্থীদের যম বটে। কিন্তু ইহারা প্রুশিয়ার সঙ্গে একত্র থাকিতে রাজি নয়। এমনকি একটা স্বতন্ত্র ব্যাভেরিয়ান রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা যে কোন মূহূর্ত্তেই সম্ভব।

কিন্তু এই স্বাধীন ব্যাভেরিয়ান রাষ্ট্র রাজতন্ত্রী হইবে কি গণতন্ত্রী

হইবে সে বিষয়ে ন্যাশন্যালিষ্ট মহলে দুই মত চলিতেছে। সেনাপতি হিণ্ডেনবুর্গ আজকাল অবশ্য সরকারী লোক নন। কিন্তু তাঁহার শিষ্য আছে ব্যাভেরিয়ায় লাখে লাখে। ইনি চাহেন রাজতন্ত্র। ইঁহার দলের লোকেরা পুরাণা রাজপুত্রকে গদিতে বসাইতে চায়। বস্তুতঃ মিউনিকের সভায়-সভায় "জয় রাজার জয়" ধ্বনি উঠিতেছে।

হিণ্ডেনবুর্গের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন সেনাপতি লুডেন-ডোর্ফ। কিন্তু পুরাণা কাইজারি আমলে লুডেনডোর্ফ ছিলেন হিণ্ডেন-বুর্গেরই দক্ষিণ হস্ত। বর্ত্তমান সমস্যায় দেখা যাইতেছে লুডেনডোর্ফ রাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। লুডেনডোর্ফ ব্যাভেরিয়ার লোক নন। কিন্তু তাঁহার স্বপক্ষে আছেন ব্যাভেরিয়ান স্বদেশ-সেবক আডোল্‌ফ্ হিট্‌লার এবং তাঁহার মতাবলম্বী স্বদেশী ভলাণ্টিয়ার।

১৮৭০ সালে যে যুক্তরাষ্ট্র জার্ম্মাণিতে কায়েম হইয়াছিল, তাহার আয়ু বোধ হয় ফুরাইয়া আসিয়াছে। বিস্‌মার্কের কীর্ত্তি এইবার ধুলি-সাৎ হইতে চলিল। জার্ম্মাণ সমাজের নানা ঘাঁটিতে ঘোর অবসাদ ঘনাইয়া রহিয়াছে। তবে জার্ম্মাণ হাড়ে সবই সয়। নিত্যনূতন বিপ্লব আর লড়াই চালাইতে-চালাইতে জার্ম্মাণরা যুগযুগান্তর ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কাজেই কোনো-কিছু গণ্ডগোলে ইহারা অত্যধিক হাহুতাশ করে না। ইহারা মজবুদ ও টেকসই জাত।

রাইন প্রদেশ ভাঙ্গন

(১)

রাইন প্রদেশে ভাঙ্গন লাগিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শহরে "স্বাধীন রাইন রিপাব্লিকে"র ঝাণ্ডা উড়ানো হইতেছে। এই প্রাদেশিক বিপ্লব আজ-কাল জার্ম্মাণির এবং ইয়োরোপের সর্ব্বপ্রধান কথা।

বেলজিয়ামের নেহাৎ লাগাও। লোহালক্করের যন্ত্রপাতি এবং বয়নশিল্পের এক বড় জার্ম্মাণ কেন্দ্ররূপে আখেন ইয়োরোপে নামজাদা।)

এই শহরে বিদ্রোহীরা রাট-হাউস বা টাউনহল দখল করিয়া বসিয়াছে। জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের পুলিস বিদ্রোহীদিগকে থামাইতে পারে নাই। জার্ম্মাণির পক্ষ হইতে সেনা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু বিদ্রোহীরা বেলজিয়ামের শরণাপন্ন হইয়াছে। বেলজিয়াম বলিতেছেন,—"খবরদার আখেনের বিদ্রোহীদিগকে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমরা ইহাদিগকে স্বাধীন রিপাব্লিকের অগ্রদূত স্বীকার করিয়া লইতেছি।"

এই ধরণের কাণ্ড দেখা যাইতেছে রাইনল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরেও। বন্ শহর রাইন দরিয়ার উপর, রাইন প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। জার্ম্মাণির শিক্ষা ও সভ্যতার এক অতি প্রসিদ্ধ খুঁটা স্বরূপ বন্ দুনিয়ায় সমাদৃত হইয়া থাকে। অথচ এই বনই আবার বর্ত্তমান বিদ্রোহী রাইন রাষ্ট্রের কর্ম্মকেন্দ্র। ফরাসী গবর্মেণ্টের প্রভাব এই মুল্লুকের জার্ম্মাণদের উপর খুব বেশী। এইখানকার জার্ম্মাণদিগকে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট কোন মতেই স্ববশে আনিতে পারিতেছে না।

(২)

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছে ফালৎস্ প্রদেশে। ইংরেজীতে এই মুল্লুককে বলে—পালাটিনেট। ফালৎস্ রাইন-মুল্লুকের দক্ষিণ ভাগ। রাইন দরিয়ার বামদিকে এই জনপদের অবস্থান। ফালৎস্ প্রদেশ সার উপত্যকারই লাগাও। ১৯১৯ সাল হইতে সার জনপদ ফরাসীদের অধিকৃত কিন্তু "লীগ"-শাসিত জার্ম্মাণ জেলা।

ব্যাভেরিয়ার সেনাপতি সর্ব্ব-জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের হুকুম তামিল করেন নাই। এইজন্য ব্যাভেরিয়ায় প্রুশিয়ায় আইন বিষয়ক ঝগড়া* চলিতেছে। কিন্তু ব্যাভেরিয়া এখনো বিদ্রোহী হয় নাই, অথবা

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া এক নয়া রাষ্ট্র কায়েম করিবার মতলব ও প্রকাশ করে নাই।

অথচ ফালৎস্ এই সুযোগে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া যাইবার ফন্দি বাহির করিয়াছে। ফালৎস্ বলিতেছে:—"জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট যদি ব্যাভেরিয়াকে জব্দ করিতে না পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, জার্ম্মাণির আইনের এবং রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার কোনো দাম নাই। অতএব এইরূপ রাষ্ট্রের অঙ্গ বিবেচিত হওয়া লজ্জার কথা।" এই বলিয়া ফালৎস প্রদেশ নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। ফরাসী গবর্মেণ্ট বলিতেছেন:—"ভাল কথা।"

(৩)

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট রাইনবিদ্রোহের জন্য আঁতাঁতকে দোষী বিবেচনা করিতেছে। আঁতাঁতের নিকট নালিশও পাঠানো হইয়াছে।

জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট বলিতেছেন:—রাইন জনপদের শান্তি রক্ষার ভার জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের হাতে। যদি জার্ম্মাণির সাধারণ পুলিশ দাঙ্গা হাঙ্গামা থামাইতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে জার্ম্মাণ সেনা ব্যবহার করিবার অধিকার জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের আছে। এ কথা আঁতাঁতের অজানা নাই। রাইনল্যাণ্ডের বিদ্রোহীরা জার্ম্মাণির আওতা হইতে স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহে। এই আন্দোলন থামাইবার অধিকার জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া অন্যায়। অথচ আঁতাঁতের সেনাবিভাগ ইতিমধ্যেই রাইনবিদ্রোহীদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেছে। ইহাতে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টকে তাহার ন্যায্য ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে।"

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইয়োরোপের কোনো দেশই আঁতাঁতের বেআইনি কাণ্ডের কোনো প্রকার সমালোচনা করিতেছে না। সুইডেন, সুইট-সারল্যাণ্ড বা দক্ষিণ আমেরিকার কোনো রাষ্ট্রেই জার্ম্মাণির স্বপক্ষে

সোশ্যালিস্টে ন্যাশন্যালিস্টে লড়াই

(১)

রাইনল্যাণ্ডে চলিতেছে স্বাধীনতার আন্দোলন। এই স্বাধীনতার অর্থ একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করা। জার্ম্মাণির কোনো একতিয়ার এই রাষ্ট্রে থাকিবে না এই মতলব।

জার্ম্মাণির অন্যান্য প্রদেশে বর্ত্তমানে আর এক প্রকার স্বাধীনতার আন্দোলন চলিতেছে। সেই স্বাধীনতার অর্থ বিচিত্র।

ব্যাভেরিয়ার গবর্ণমেণ্ট খোলাখুলি বলিয়াছেন :—"প্রুশিয়ায় আজ-কাল কার্ল মার্ক্‌স্‌-পন্থী সোশ্যালিষ্টদের মত প্রবল। এই মতের অধীনে জার্ম্মাণি 'স্বদেশী আদর্শ' হারাইতে বসিয়াছে। যতদিন প্রুশিয়ায় কার্ল মার্ক্‌সের মত প্রবল থাকিবে ততদিন আমরা প্রুশিয়ার সঙ্গে একত্রে একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিতে চাহি না। আমরা সোশ্যালিষ্ট মতের আওতা হইতে স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য ব্যাভেরিয়ায় এক 'খাটি' জার্ম্মাণ রাষ্ট্র কায়েম করিতে অগ্রসর হইয়াছি। ব্যাভেরিয়া হইবে জার্ম্মাণ কুল্টুরের দুর্গ বিশেষ।

এই মত ব্যাভেরিয়ার গবর্মেণ্ট জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন গবর্মেণ্টকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছেন। ফলতঃ প্রুশিয়ায় এক তুমুল আন্দোলন সুরু হইয়াছে। "ড্যয়েচ নাটসিওনাল" দলের মাতব্বর লোকেরা এই সুযোগে সোশ্যালিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই পাকাইয়া তুলিতেছেন। ইহারা বলিতেছেন :—"বর্ত্তমান জার্ম্মাণ গবর্মেণ্ট অত্যধিক সোশ্যালিষ্টপন্থী। এই গবর্মেণ্ট যতদিন বজায় থাকিবে ততদিন প্রুশিয়ায় শান্তি ঘটিবে না এই গবর্মেণ্টকে তাড়াইয়া জার্ম্মাণির 'খাটি স্বদেশী' আদর্শের গবর্মেণ্ট কায়েম করিলে জার্ম্মাণ নরনারী শান্ত হইবে। ব্যাভেরিয়া এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইয়া সমগ্র জার্ম্মাণ জাতির উপকার সাধন করিল।"

(২)

মতে মতে ঝগড়া জার্ম্মাণিতে আজকাল যত প্রবল পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে বোধ হয় সেরূপ নয়। কোনমতের লোকেরা দেশে প্রাধান্য লাভ করিলে অপরাপর মতের লোকেরা তাহার অধীনে জীবন ধারণ করাকে গোলামী বিবেচনা করে।

সোশ্যালিষ্টদিগকে "ড্যয়েচ-নাট্সিওনাল"পন্থীরা দেশের শত্রু বিবেচনা করে। ফাল্ৎস্ প্রদেশকে সোশ্যালিষ্টরাই জার্ম্মাণি হইতে পৃথক করিয়া ফেলিতে অগ্রসর। কাজেই ন্যাশন্যালিষ্টরা সোশ্যালিষ্ট-দিগকে নিন্দা করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

আবার ন্যাশন্যালিষ্টদিগকেও সোশ্যালিষ্টরা বিশ্বাসঘাতক দেশ-দ্রোহী বিবেচনা করিতেছে। রুরে সত্যাগ্রহের লড়াই থামিবা মাত্র ষ্টিন্নেস, ভোল্ফ ইত্যাদি জার্ম্মাণ ক্রোরপতি শিল্পনায়কেরা ফরাসী সেনাপতিদের সঙ্গে সমঝোতা কায়েম করিতে সচেষ্ট ছিলেন। চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু সোশ্যালিষ্টরা বলিতেছেঃ—"এইসব ক্রোরপতি ন্যাশন্যালিষ্টরা জার্ম্মাণ মজুরদিগকে ফরাসী ক্রোরপতিদিগের নিকট বিকাইয়া দিতে চায়। ষ্টিন্নেস ইত্যাদির বিরুদ্ধে দেশ-দ্রোহিতার অপরাধে মোকদ্দমা চালানো উচিত।"

শিল্প-বাণিজ্যের দুর্গতি

(১)

রুর অঞ্চলের ফ্যাক্টরিগুলায় কাজ এখনো চলিতেছে না। মাস ছয় সাতেক কাজ বন্ধ থাকার ফলে যন্ত্রপাতিগুলা এমন বিকল হইয়া গিয়াছে যে, এইগুলাকে পুনরায় কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিতে অন্ততঃ তিন মাস লাগিবে।

টাকা জার্ম্মাণ মহাজনেরা খরচ করিতে অসমর্থ। এদিকে ফরাসীরা আর তাঁহাদের অন্যান্য সহযোগীরা টাকা যোগাইতে নারাজ। কাজেই রুরের জগদ্বিখ্যাত লোহালক্কড়ের ফ্যাক্টরিগুলা হয়ত একদম নষ্ট হইয়াই যাইবে। এইরূপ আশঙ্কা কোনো-কোনো জার্ম্মাণ মহলে দেখিতেছি।

তাহা হইলে জার্ম্মাণরা শিল্প হিসাবে খোঁড়া হইবে। ইহাতে ইংরেজের সুখী হইবার কথা। কেননা তখন ইংরেজের কারখানাগুলা জার্ম্মাণিকে সহজেই পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারিবে।

সে এখনো কয়েক বৎসরের কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে রুরের এক কোটি বিশ লক্ষ মজুর কর্ম্মাভাবে অর্থাভাবে বিপদগ্রস্ত। আগামী শীতের দৌরাত্ম্যে এবং দুর্ভিক্ষের প্রকোপে রুর অঞ্চল ইয়োরোপের প্রবল বোলশেভিক কেন্দ্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। রুশ ওস্তাদেরা এবং তাঁহাদের জার্ম্মাণ পেটোআরা এই রূপ ভাবিয়া সুখ পাইতেছেন।

(২)

মহালড়াই থামিবার পর হইতে বিজেতাদের দেশে বেকার-সমস্যা অতি প্রবল মাত্রায় দেখা দিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কখনো কখনো পঞ্চাশ লাখ মজুর নিষ্কর্ম্মা ভাবে বসিয়াছিল। বিলাতে আজও প্রায় পনের-ষোল লাখ মজুর বেকার বসিয়া আছে।

কিন্তু জার্ম্মাণিকে ১৯১৯-২২ এই চার বৎসর বেকার-সমস্যা এক প্রকার স্পর্শই করে নাই বলা চলে। এমন কি বর্ত্তমান বৎসরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত, অন্ততঃ পক্ষে প্রথম তিন মাস পর্য্যন্ত, জার্ম্মাণিতে মজুরসমস্যা দেখা দেয় নাই। কিন্তু আজ আর সে কথা বলা যায় না। জার্ম্মাণ-সমাজে কর্ম্মাভাব ঘোরতর ভাবেই পৌঁছিয়াছে।

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে জার্ম্মাণ মজুরদের যে দুর্গতি দেখিতে· পাইতেছি

এবং সরকারী সংখ্যা-ও-তথ্যতালিকাবিভাগের কর্ত্তারা বিগত বিশ বৎসরের হিসাব পত্র আলোচনা করিয়া এই মত প্রচার করিতেছেন।

রুর জনপদের ফ্যাক্টরীগুলা বিদেশীদের আওতায় আসায় জার্ম্মাণি শেষ পর্য্যন্ত ধনে প্রাণে মারা পড়িতে চলিল। এই শীতকালে জার্ম্মাণদের সকল প্রকার কষ্ট-দৈন্যের সীমা থাকিবে না।

(৩)

জার্ম্মাণির ভিতর বড়-রকমের মাল-কেনাবেচা যারপরনাই কমিয়া গিয়াছে। বিদেশ হইতে জার্ম্মাণ মালের অর্ডারও আসিতেছে নেহাৎ কম। এমন কি বিদেশের সওদাগরেরা অনেক ক্ষেত্রে অর্ডার দিয়া পরে অর্ডার তুলিয়া লইতেছে। সকলের মনে সন্দেহ যে, জার্ম্মাণ বেপারীরা বিদেশে মাল পাঠাইয়া উঠিতে পারিবে না।

এদিকে শিল্পবাণিজ্যের পরিচালকেরা কাজ চালাইবার জন্য যথোচিত পরিমাণে টাকা ধার পাইতেছে না। ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তারা কারবার-ওয়ালাদিগকে টাকা যোগাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে। তাহার উপর জুটিয়াছে টাকার খাঁকৃতি।

প্রতিদিন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় মার্কের দাম কমিতেছে প্রচণ্ড বেগে। আজকাল কেহ লাখ, কোটি, ইত্যাদি সংখ্যা ব্যবহার করে না। এ সব অতি তুচ্ছ সংখ্যা মাত্র! মিলিয়ার্ড, বিলিয়ন ইত্যাদি দুর্ব্বোধ্য জ্যোতিষিক সংখ্যায় হিসাব চলে। আটপৌরে খাওয়া-দাওয়ার জন্য রোজ বিলিয়ন মার্কের নোট দুচার খানা দরকার হইতেছে। কিন্তু মার্কের দাম যে-পরিমাণে যত-শীঘ্র কমিতেছে ঠিক সেই পরিমাণে তত শীঘ্র কাগজের টাকা ছাপানো অসম্ভব। কাজেই ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ীরা, সাধারণ গৃহস্থরা সকলেই টাকার খাঁকৃতিতে কোনো কাজ চালাইতে পারিতেছে না।

(৪)

টাকার বাজার যখন গতিবিধিহীন তখন শিল্প-বাণিজ্য-দোকানদারী সবই নিস্তেজ হইতে বাধ্য। টাকার নাম "রুধির"। সকলদিকেই কারবারের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। মজুরদিগকে জবাব দেওয়া হইতেছে। অথবা কম সময় খাটাইয়া কম সময়ের কম মজুরি দেওয়া হইতেছে। ফ্যাক্টরীগুলা সপ্তাহের অর্দ্ধেক বা তিন পোয়া খাটিতেছে অথবা একদম বন্ধই হইয়া যাইতেছে।

ফ্যাক্টরীর মজুরদের ভিতর অনেকে আলুর ক্ষেতে কাজ পাইয়াছিল। অক্টোবর মাসে আলু তোলা শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই মজুরেরা আবার কর্ম্মহীন। পূর্ব্বে যাহারা ছোটখাটো স্বাধীন ব্যবসা চালাইতেছিল, তাহাদের অনেকে এক্ষণে ব্যবসা ছাড়িয়া নকরি ঢুঁড়িতেছে। ফলতঃ বেকারদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। এই গেল জার্ম্মাণির সাধারণ অবস্থা।

রুর অঞ্চলের বেকার-সমস্যা ত ইহার উপর আছেই। সেখানকার প্রায় সব ফ্যাক্টরীই এক প্রকার বন্ধ। তাহার ফলে ফ্যাক্টরীর আশে পাশের ছোট খাটো কারবারগুলা জখম হইয়া রহিয়াছে। গোটা মুল্লুকে অন্নাভাবের মাত্রা চড়িতেছে।

বোখুম শহরের মতন শিল্প-নগরে মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে "ভদ্রলোক"দের সমাজেও বেকার সমস্যা আসিয়া ঠেকিয়াছে। কেরাণী ইত্যাদি মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের জীবন জগতের সর্ব্বত্রই মজুর-জীবনের ভাগ্য ভুগিয়া থাকে।

বেকারদের সংখ্যা

(১)

গেল যে, প্রায় দেড়শ' শহর হইতে বেকারদের সংখ্যা আসিয়াছে। অক্টোবর মাসের প্রথমে ২৯৮,৮৪৪ জন লোক নিষ্কর্ম্মাভাবে বসিয়াছিল। তাহাদিগকে গবর্মেণ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছে। দুই সপ্তাহের ভিতর বেকার সংখ্যা পঁচাত্তর হাজারের বেশী বাড়িয়াছে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ৩৭৫,৪৯১ জন মজুরকে গবর্মেণ্ট সাহায্য করিতেছিল।

যে দেশে গবর্মেণ্ট বেকারদিগকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য, সেই দেশে কর্ম্মাভাব ও অন্নাভাবের কষ্ট ভারতীয় দুর্ভিক্ষের সমান দুঃখ-জনক নয় বলাই বাহুল্য। কাজেই জার্ম্মাণ সমাজে ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা কোনো দিন দেখা দিবে না।

এই দেড়শ' শহরের কোনটায়ই দশ হাজারের কম লোক বাস করে না। রাইন এবং রুর অঞ্চলের বেকার সংখ্যা কত তাহা এই তালিকায় দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু যে সকল শহরের খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাদের প্রত্যেক বেকার লোকের নাম এই তালিকায় নাই। মোটের উপর বুঝিতে হইবে যে বেকারদের সংখ্যা চার লাখের কম হইবে না (নবেম্বর ১৯২৩)।

(২)

মধ্য জার্ম্মাণি এবং স্যাক্সনি খনিপ্রধান দেশ। এই দুই অঞ্চলে খনির মজুরেরা প্রথম প্রথম সপ্তাহে কয়েকদিন মাত্র খাটিবার জন্য বাহাল হইত। পরে অনেক মজুরকে জবাব দিতে হইয়াছে। কয়লার খাদ, লোহার খাদ, পটাশের খাদ সর্ব্বত্রই মজুরদের কর্ম্মাভাব।

কাচের ফ্যাক্টরীতে অর্ডার জুটিতেছে কম। কাজেই কাজ চলিতেছে কম এবং মজুর লাগিতেছেও কম। পোর্সেলেন-শিল্পেও

সাধারণ ধাতু এবং লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি হইতে তৈয়ারী জিনিষ পত্রের কারখানায় ভাটা পড়িয়াছে। অধিকাংশের অবস্থা শোচনীয়। ভ্যুর্টেম্ব্যার্গ জেলার ধাতুর ফ্যাক্টরীগুলায় এখনো কাজ চলিতেছে ভালই। কিন্তু জার্ম্মাণির প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই এই সকল কারখানার দুঃসংবাদ পৌছিতেছে। সর্ব্বত্রই দলে দলে মজুর বরখাস্ত করিবার পালা পড়িয়াছে।

জাহাজ-ঘাটার বন্দরে ফ্যাক্টরীর মজুরেরা কর্ম্মহীন। লোহার কারবারে শতকরা ৮০টা কারখানায় কাজ আধরোজ মাত্র চলে। রাসায়নিক ফ্যাক্টরীগুলার উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া যাইতেছে। সূতা কাটার ব্যবসায় জোর কমিয়া আসিতেছে। চামড়ার ফ্যাক্টরী, কাঠের ফ্যাক্টরী, কাগজের ফ্যাক্টরী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন লাইনে শিল্প-শক্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

চিনির ব্যবসায় এখনো বেশ জোরের সহিতই কাজকর্ম্ম চলিতেছে। কিন্তু খাদ্য দ্রব্য তৈয়ারী করিবার নানা প্রকার কারখানায় কাজ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। বিয়ার তৈয়ারি করিবার বহু ভাটী আজকাল বন্ধ। পোষাক তৈয়ারী করিবার কারখানাগুলাও এই দুরবস্থায় পড়িয়াছে।

(৩)

ফ্যাক্টরীগুলার শিথিলতায় একমাত্র শিল্পনায়ক এবং মজুরদের জীবনে ঢিল পড়িয়াছে এরূপ ভাবা উচিত নয়। ফ্যাক্টরীগুলার সঙ্গে বেপারীদের জীবন, দোকানদারী, কেনাবেচার আড়ত, আমদানি-রপ্তানির আফিস ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত। কাজেই ফ্যাক্টরীতে কর্ম্মাভাবের ফলে জার্ম্মাণির ব্যবসায়ী মহলের অলিতে গলিতে কর্ম্মাভাব এবং অন্নাভাব ছড়াইয়া পড়িতেছে। জার্ম্মাণ-সমাজের সর্ব্বত্র একটা গভীর অবসাদ এবং নৈরাশ্য প্রকটিত হইয়াছে।

বার্লিনে, হাম্বুর্গে এবং অন্যান্য শহরে অশান্তি বিরাজ করিতেছে। রুটির দোকানে সারি বাঁধিয়া নরনারী দেড় ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। একটা রুটি কিনিতে পারা আজকাল এক মহা সৌভাগ্যের কথা। মাখন, চিনি, দুধ ইত্যাদি কিনিতে পারা ত একটা বিশেষ বাহাদুরী। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মার্কের দাম নামিতেছে বলিয়া দোকানদারেরা জিনিষ বেচিতে চায় না। গৃহস্থেরা বিপদগ্রস্ত।

ট্যুরিঙ্গেনে বোলশেভিকী

(১)

জার্ম্মাণির ট্যুরিঙ্গেন (টুরিঙ্গিয়া) প্রদেশ প্রুশিয়া আর ব্যাভেরিয়ার মাঝামাঝি। অর্থাৎ জার্ম্মাণ মুল্লুকের ঠিক মধ্যস্থলে এই জনপদের অবস্থান। বার্লিন হইতে মিউনিক যাইতে হইলে ট্যুরিঙ্গেনের বহু পল্লী ও শহর পথে পড়ে।

প্রুশিয়ার আর ব্যাভেরিয়ার শাসন-পদ্ধতি লইয়া ঝগড়া সুরু হওয়া অবধি দুই প্রদেশের রাষ্ট্রিকেরা ট্যুরিঙ্গেনকে নিজ নিজ দলে ভিড়াইবার জন্য অস্থির। ব্যাভেরিয়ার ন্যাশন্যালিষ্টরা নাকি ইতিমধ্যে ট্যুরিঙ্গেনের সীমানায় ফৌজ মোতায়েন পর্য্যন্ত করিয়া বসিয়াছে। প্রুশিয়া যাহাতে ট্যুরিঙ্গেন পার হইয়া ব্যাভেরিয়ায় পদার্পণ করিতে না পারে এই হইতেছে মতলব।

ট্যুরিঙ্গেন সেকালে ছিল গ্যেটে-শিলারের কর্ম্মক্ষেত্র। আজকাল ট্যুরিঙ্গেন শিল্প-প্রধান, ফ্যাক্টরী-প্রধান, অতএব মজুর-প্রধান দেশ। এই হিসাবে ট্যুরিঙ্গেনের লাগাও স্যাক্সনি প্রদেশের যেরূপ সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা ট্যুরিঙ্গেনেরও সেইরূপ। দুই প্রদেশেই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে মজুরদের লড়াই জারি আছে।

স্যাক্‌সনির পল্লীতে পল্লীতে সোভিয়েটপন্থী বোলশেভিক পঞ্চায়েত চলিতেছে। ট্যুরিঙ্গেনও তাহার পূর্ব্ব (বা ডাইনের) প্রতিবেশীর পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই "রুশ আদর্শের" সোভিয়েটগুলাকে ভাঙ্গিবার জন্য "জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য" অর্থাৎ সমগ্র জার্ম্মাণির রাষ্ট্র-দরবার এবং ট্যুরিঙ্গেন ও স্যাক্‌সনির গবর্মেণ্ট দুইটা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে।

ট্যুরিঙ্গেন আর স্যাক্‌সনি যখন লাগালাগি জার্ম্মাণ মুল্লুক,—তখন লেলিন্‌-ট্রট্‌স্‌কি ইত্যাদি বোলশেভিকীর "ইন্দ্র চন্দ্রেরা" আশা করিতেছেন যে, খৃষ্টান অর্থাৎ অ-ইহুদি জার্ম্মাণ সমাজের হৃদয় মধ্যে এইবার তবে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র কায়েম না হইয়া যায় না। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ট্যুরিঙ্গেনের উপর দুনিয়ার চোখ পড়িয়াছে।

(২)

ট্যুরিঙ্গেনের নাম ভারতে হয়ত সুপ্রচারিত নয়। কিন্তু গ্যেটের নাম আর শিলারের নাম যখন ভারতীয় জ্ঞানমণ্ডলে প্রচারিত তখন এই দুই সাহিত্যবীরের বাস্তুভিটাওয়ালা পল্লীশহরগুলা অপরিচিত থাকা উচিত নয়। য়েনা-ভাইমার জগৎপ্রসিদ্ধ।

এই প্রদেশের য়েনা শহরে গ্যেটে-মণ্ডলের দার্শনিক-প্রবর স্বাধীনতা-সেবী ফিখ্‌টে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে "যৌবন আন্দোলন" কায়েম করিয়া যান। সে প্রায় শতাধিক বৎসরের কথা। আবার ১৯১৮—১৯ সালে নবীন জার্ম্মাণ রিপাব্লিকের শাসনপদ্ধতি কায়েম করিবার জন্য রাষ্ট্রবীরেরা এই প্রদেশেরই ভাইমার নগরে আড্ডা গাড়িয়া ছয় মাস ধরিয়া মোসাবিদা ও খসড়া প্রস্তুত করেন।

এই জনপদের পাহাড়ী বন-উপবনগুলা জার্ম্মাণদের স্বাস্থ্য-নিকেতন। সানাটোরিয়ুম, "কুরর্ট", আরোগ্যশালা, "আর্-হোলুংস-হাইম" ইত্যাদি হোটেল-হাসপাতাল ট্যুরিঙ্গেনে বহুবিধ।

তড়িৎ-কোম্পানীর মতন বড় বড় কারখানার অধীনে এই ধরণের হোটেল-হাসপাতাল এই জনপদে কতকগুলা চলিতেছে। ফ্যাক্টরীর মজুর ও কেরাণীরা সস্তায় এই সকল কেন্দ্রে আসিয়া সুস্থ সবল হইয়া কাজে ফিরিয়া যাইতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের টানেও জার্ম্মাণ নরনারীরা ট্যিরিঙ্গেনের গাঁয়ে-গাঁয়ে দেখা দেয়।

আর্ফুর্ট শহর এই প্রদেশের এক অতি বড় কেন্দ্র। জার্ম্মাণিকে লড়াইয়ে হারাইয়া নেপোলিয়ন এই শহরেই জার্ম্মাণ রাজা, নবাব, আমীর, ওমরাওদিগকে দরবারে ডাকিয়াছিলেন (১৮০৫)। এই আর্ফুর্ট শহরেই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, কার্ল মার্কসের মৃত্যুর (১৮৮৩) পর সোশ্যালিষ্টরা কংগ্রেস ডাকিয়া মার্কস্-পন্থীদের জন্য কর্ম্মকৌশল সূত্রবদ্ধ করে। আজকাল আর্ফুর্ট অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রের মতন বোলশেভিক দলের বাথান। দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে।

বোলশেভিকীর দুস্‌মন্ ব্যাভেরিয়ার ন্যাশন্যালিষ্ট

বার্লিন হইতে রেলে আসিয়া পাঁচ ঘণ্টায় আর্ফুর্টে নামিলাম। সন্ধ্যা হইয়াছে। নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহ (১৯২৩)। বৃষ্টি পড়িতেছে। ষ্টেশনের বাহিরে আসিবামাত্র দেখি লোকের ভিড়ে রাস্তায় চলা ভার। ঘোড়সওয়ার-পুলিশ ভিড় ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছে। বড় বড় দোকানের মালিকেরা তাড়াতাড়ি দুয়ার বন্ধ করিবার পথ দেখিতেছে। নরনারীর চোখে মুখে উদ্বেগ ও অশান্তি। যেন একটা কিছু ঘটিয়াছে বা ঘটিবে।

কানাঘুষায় যোগ দিলাম। আর্ফুর্টের মতন জন-বহুল ধনকেন্দ্রে নানা গুজব চলিতেছে। ট্যিরিঙ্গেনের মজুরপন্থী বোলশেভিকীদিগকে জব্দ করিবার জন্য তাহাদের মুগুর-স্বরূপ ন্যাশন্যালিষ্টদের উদয় হইয়াছে।

বা গুপ্তচর। ব্যাভেরিয়ার আদর্শ অনুসারে অনেক সমিতি খোলাখুলি কাজ করিতেছে। কোন কোন দল এখনো লুকানো। নানা নামে এই সকল সমিতি পরিচিত।

রুশিয়ার আদর্শ জয়ী হইবে কি ব্যাভেরিয়ার আদর্শ জয়ী হইবে তাহার পরীক্ষা চলিতেছে ট্যুরিঙ্গেনের মধ্যবিত্ত ও মজুর মহলে। ট্যুরিঙ্গেনের দক্ষিণ দিককার জেলাগুলা ব্যাভেরিয়ার উত্তরদিককার জেলা সমূহের ঘেঁশা। কাজেই এই সীমান্ত-অঞ্চলে দুই মুল্লুকের গুপ্ত ও খোলা সমিতিগুলা প্রায় সর্ব্বদাই একজোটে এক মতলব অনুসারে কাজ করিবার সুযোগ পায়।

ব্যাভেরিয়ার আদর্শ বলিলে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে বোলশেভিক মতের দুস্‌মনি অর্থাৎ ন্যাশন্যালিজম্‌। ব্যাভেরিয়ার দ্বিতীয় কথা,—ভাইমারে প্রতিষ্ঠিত শাসনপদ্ধতির বিরোধ। ভাইমারের প্রণালীতে প্রদেশগুলার "স্বরাজ" অনেকটা খাটো করা হইয়াছে। ব্যাভেরিয়া প্রাদেশিক স্বরাজ ষোল আনায় বজায় রাখিতে চায়।

ট্যুরিঙ্গেনের লোকেরা ন্যাশন্যালিষ্ট হইয়া কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ভাইমার-প্রণালীর বিরোধীও হইয়া উঠিয়াছে। কিষাণরা প্রায় সকলেই এই দুই হিসাবে ব্যাভেরিয়ার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। বড় বড় শিল্প-নায়করা বোল্‌শেভিক-বিরোধী হইবে ইহা ত স্বাভাবিক। ইহাদিগকে ভাইমার-বিরোধী করিয়া তোলাও ব্যাভেরিয়ার বাহাদুরী।

ভাইমারের শাসন-প্রণালী

ব্যাভেরিয়ার ভাইমার বিষয়ক মতামত লইয়া ট্যুরিঙ্গেনে গণ্ডগোল বেশী চলিতেছে কি কম চলিতেছে, সহজে ঠাওরানো সম্ভব নয়। কিন্তু ধনসাম্যপন্থী মজুরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লোকজনের [illegible]

অনেকটা পাকিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বোলশেভিকীদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য ন্যাশন্যালিষ্ট সমিতির আখড়ায়-আখড়ায় সামরিক অনুশীলন চলিতেছে। কিন্তু মজুরেরা এবং মজুরপন্থীরা ট্যিরিঙ্গেনে যারপরনাই প্রবল। কাজেই বর্ত্তমান ক্ষেত্রের সমস্যা দস্তুর-মতন কঠিন। রক্তারক্তির জন্য দুই পক্ষই প্রস্তুত হইয়া বুক ঠুঁকিয়া আসরে নামিয়াছে।

এই সকল ভজকট লইয়া গোটা জার্ম্মাণির শাসন-দরবার যারপরনাই বিব্রত। স্যাক্সনি, ট্যিরিঙ্গেন ইত্যাদি মুল্লুকের বোলশেভিক ক্ষমতাকে কাবু করা তাহার প্রধান সমস্যা। এই হিসাবে ব্যাভেরিয়া "সর্ব্ব জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রে"র এক বড় উদ্দেশ্যই সাধন করিতেছে।

কিন্তু ব্যাভেরিয়ার ন্যাশন্যালিষ্টরা বাড়াবাড়ি সুরু করিয়াছে। ইহারা "স্বেচ্ছাসেবক" "শান্তিসেনা" সাজিয়া ব্যাভেরিয়ায় আর ট্যিরিঙ্গনে অতি মাত্রায় সর্দ্দারি চালাইতেছে। তাহার উপর ব্যাভেরিয়া ভাইমারে প্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালীর বিরোধী। কিন্তু সর্ব্ব-জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র সেই প্রণালী অনুসারেই গঠিত। কাজেই ব্যাভেরিয়া প্রকারান্তরে সর্ব্ব-জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রের অর্থাৎ বার্লিনের সাম্রাজ্য-দরবারের দুস্‌মন। সুতরাং সর্ব্বজার্ম্মাণ-রাষ্ট্র এক হাতে ট্যিরিঙ্গেনের বোলশেভিকীকে রুখিতে বাধ্য। অপর হাতে ব্যাভেরিয়ার ন্যাশন্যালিষ্টদিগকে ঠাণ্ডা করিয়া ঠুঁটা করিয়া রাখাও তাহার কর্ত্তব্য। বার্লিন হইতে এই কারণে ট্যিরিঙ্গেনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পল্টন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই পল্টন দেখিবামাত্র লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বোলশেভিকরাও চটিয়াছে, আবার ন্যাশন্যালিষ্টরাও চটিয়া লাল।

ভাইমারের প্রণালীতে "সর্ব্ব-জার্ম্মাণ রাষ্ট্র" প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে অধিকারী। সেই অধিকার অনুসারেই

সেই জোরেই ট্যিরিঙ্গেনেও এই ফৌজের অভিযান। কিন্তু কি স্যাক্সনি, কি ট্যিরিঙ্গেন, কোনো প্রদেশই নিজের উপর বার্লিনের কর্ত্তামি পছন্দ করে না। ব্যাভেরিয়ার মতন এই দুই প্রদেশও স্বরাজ-তন্ত্রী।

আসল কথা, ভাইমারের "কনষ্টিটিউশন" বা শাসন-প্রণালীতে "সাম্রাজ্য বনাম স্বরাজ" সমস্যাটা পরিষ্কার করা হয় নাই। প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলার স্বরাজ-ক্ষমতা কতখানি আর এই সকল রাষ্ট্রে সর্ব্ব-জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রের হাত দেওয়ার এক্তিয়ার কোথায় ও কখন, এই সব বিষয় খোলাখুলি আলোচনা করিবার দিন আসিয়াছে। ব্যাভেরিয়ার উদ্যোগে সমস্যাগুলা মীমাংসার পথে পৌঁছিতেছে। "স্বরাজ' শব্দে বুঝিতে হইবে "বহু-কেন্দ্রী-করণ"।

হিট্‌লার-লুডেনডোর্ফের সাধনা

(৯ই নবেম্বর ১৯২৩)

(১)

ব্যাভেরিয়ার 'ন্যাশন্যালিষ্ট'রা অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা একঢিলে দুই পাখী মারিবে কি তিন পাখী মারিবে কিছুই বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। এই জন্যই ব্যাভেরিয়ার আন্দোলন সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে নানা প্রকার অবিশ্বাসযোগ্য গুজব রটিতেছে।

ব্যাভেরিয়ার এবং সর্ব্বজার্ম্মাণ-রাষ্ট্রের সরকার আজকাল 'সোশ্যালিষ্ট' পন্থী এবং ইহুদী-প্রধান। কাজেই 'ন্যাশন্যালিষ্ট'দের পক্ষে এই দুই সরকারই চক্ষুঃশূল। ইহুদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক বিজ্ঞাপন জারি করিয়া মিউনিকের রাষ্ট্রিকেরা খোলাখুলি একটা ঘরোয়া লড়াইয়ের সূত্রপাত করিতেছে।

উঠিয়াছে। প্রুশিয়ার নগরে নগরে,—বিশেষতঃ বার্লিনে ইহুদী-নির্য্যাতন স্নরু হইয়াছে। বড় বড় দোকানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে "ইহুদীদের নিকট মাল বেচা হইবে না"। "ইহুদীদের প্রবেশ নিষেধ,"—এই মর্ম্মে বয়কট জারি করা আজকাল জার্ম্মাণ ন্যাশন্যালিষ্টদের অন্যতম লক্ষণ। ইহুদীদের দোকানপাট লুটও হইতেছে।

ব্যাভেরিয়ার তথাকথিত "শান্তি-সেনা"র প্রাণ কাহারা? বলা বাহুল্য যুবকেরা। ইহারা সেনাপতি লুডেনডোর্ফকে অবনত জার্ম্মাণির উদ্ধারকর্ত্তা বিবেচনা করিয়া থাকে। সুবক্তা হিট্‌লার ইহাদের দীক্ষাগুরু—মাৎসিনি-স্থানীয়। মজার কথা লুডেনডোর্ফ ব্যাভেরিয়ান নন। ইনি প্রুশিয়ান। প্রুশিয়ানদের উপর ব্যাভেরিয়ানরা সর্ব্বদাই চটা। আবার হিট্‌লারও ব্যাভেরিয়ান নন। জন্মে ইনি অষ্ট্রীয়ান,—পরে মিউনিকে আসিয়া বসবাস করিয়া জার্ম্মাণির (ব্যাভেরিয়ার) প্রজাস্বত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইজন "বিদেশী" লোকই বর্ত্তমানে ব্যাভেরিয়ার স্বদেশী আন্দোলনে মাৎসিনি-গারিবাল্‌দি।

(২)

"শান্তি-সেনা"র ফৌজেরা ট্যিরিঙ্গেনের ডিহিতে ডিহিতে মোতায়েন আছে। ব্যাভেরিয়ার দিকে যে সব অটোমোবিল আসে, তাহাদের উপর চৌকি বসিয়াছে। রেলযাত্রীদের উপর খানাতাল্লাসী চলিতেছে। সর্ব্ব-জার্ম্মাণ সরকারের গুপ্তচর যাহাতে ব্যাভেরিয়ায় প্রবেশ করিতে না পারে, এইদিকেই হিট্‌লার-লুডেনডোর্ফ-পন্থীদের প্রধান নজর।

কিন্তু ট্যিরিঙ্গেনে আর স্যাক্‌সনিতে সর্ব্ব-জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সেনা ইতি মধ্যেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বার্লিনের বড় কর্ত্তারা এই উপায়ে প্রকারান্তরে ব্যাভেরিয়াকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিয়াছে। ব্যাভেরিয়ার "প্রাদেশিক স্বরাজ" বা বহু-কেন্দ্রীকরণ বিষয়ক আদর্শ জার্ম্মাণ সমাজে

কতদূর বদ্ধমূল, এইবার তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দেখা যাউক জার্ম্মাণ সমাজে "সাম্রাজ্যের" জোর বেশী কি "স্বরাজে"র জোর বেশী।

লুডেনডোর্ফ আর হিট্‌লার লড়াইয়ের ডাকে সাড়া দিতে যখন-তখনই রাজী। ইহাদের "তর সয় না" বলিলেই ঠিক বলা হইবে। দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র দেখিয়া ইহারা বিপ্লবের ধ্বজা তুলিলেন। ১৯১৮ সালের ৯ই নবেম্বর তারিখে জার্ম্মাণ পল্টন ইংরেজ-ফরাসী-বেলজিয়ানদের নিকট অপমানজনক সর্ত্তে লড়াইয়ে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই অপমান ঘুচাইবার চেষ্টায় ব্যাভেরিয়ার বীরেরা ঠিক ৯ই নবেম্বর তারিখেই বার্লিনের বিরুদ্ধে মিউনিককে বিদ্রোহী দাঁড় করাইলেন। ১৯২৩ সালের ঘটনায় ১৯১৮ সালের প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

ব্যাভেরিয়ার সরকারী সেনায় আর লুডেনডোর্ফের শান্তি-সেনায় কয়েকঘণ্টা ধরিয়া নগর-লড়াই চলিল। সমর-সচিবের আফিস শান্তি-সেনার কব্জায়। দুই পক্ষে কিছু কিছু লোক মারাও পড়িয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হিট্‌লার এবং লুডেনডোর্ফ দুইজনেই সরকারী ফৌজের হাতে বন্দী হইলেন।

মিউনিক ছাড়া ব্যাভেরিয়ার আর কোনো শহর বা পল্লী এই ভাবুকতায় মাতে নাই। লুডেনডোর্ফের মতন লোক এমন একটা কাঁচা কাজে হাত দিতে পারে দুনিয়ার লোকে কখনও বিশ্বাস করিত না। তবে জার্ম্মাণরা বলাবলি করিতেছে,—"লুডেনডোর্ফ অতি মাত্রায় আত্মপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী। নিজেকে কোন মতে বড় করিয়া তুলিবার জন্য চ্যাংড়ামি করিতেও সে রাজী।" যাহা হউক, পরাজিত জার্ম্মাণির ইতিহাসে ১৯২৩ সালের অক্টোবর-নবেম্বর মাস দুনিয়ার নরনারীকে

ত্রয়োদশ অধ্যায়

টিরোলী আল্পসের তালে তালে

(জুলাই ১৯২৪)

ইতালি হইতে অষ্ট্রিয়ায়

ব্রেন্নার 'পাস' (গিরিপথ) পার হইয়া অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিলাম (জুলাই ১৯২৪)*। ডাহিনে, বাঁয়ে, হাতে, পায়ে, মাথায় সর্ব্বত্রই সরল সুদীর্ঘ পাইনের সবুজ সারি। পাহাড়ের পা-কোমর-বুক নিবিড় বনে ঢাকা। কেবল মাথাগুলা পাথরের নিরেট করাত, মুকুট, পিরামিড বা অন্য কোনও আকারের স্তূপ। কোথাও কোথাও চিরতুষারের চাপ জুলাই মাসেও বাঁচিয়া রহিয়াছে।

উত্তরতম ত্রেন্তিনোর দৃশ্যই এখনও চলিতেছে। ষ্টার্‌সিঙ, গোসেনজাস

---

* ১৯২৩ সনের নবেম্বরের মাঝামাঝি হইতে ১৯২৪ সনের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত আটমাস সুইট্‌সাল্যাণ্ডের লুগানো আর উত্তর ইতালির মিলান, পাদভা, ভেনিস, ত্রেন্ত ও লেভিক'য় কাটিয়াছিল। ইহার ভিতর ছয়মাসই ছিলাম সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে। এই সময়কার রচনা "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "সুইটস্থারল্যাণ্ড" আর "ইতালিতে বার কয়েক" এই দুই খণ্ডে দ্রষ্টব্য। এই সময়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলা তৈয়ারী করা হইয়াছিল :—(১) "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" (১৯২৬), (২) "ধনদৌলতের রূপান্তর",—লাফার্গ প্রণীত ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা (১৯২৮), (৩) "পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র",—এঙ্গেলস প্রণীত জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা, (১৯২৬), (৪) "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" গ্রন্থের কিয়দংশ (মান্দ্রাজ ১৯২৬), (৫) "দি পলিটিক্‌স্ অব বাউণ্ডারীজ" গ্রন্থের কিয়দংশ (কলিকাতা ১৯২৬), (৬) "নবীন রুশিয়ার জীবনপ্রভাত", (৭) দুনিয়ার আবহাওয়া" গ্রন্থের

ইত্যাদি স্বাস্থ্যনিকেতনের আবহাওয়া ব্রেন্নারের অপর পারেও পাইতেছি। গিরিশৃঙ্গগুলা নয়-দশ হাজার ফুটেরও অধিক উচুঁ। পল্লীসমূহের উচ্চতা হাজার চার-পাঁচ ফুটের বেশী নয়।

ঝরণা বা পাহাড়ী দরিয়া এখন উত্তরগামিনী। ত্রেন্তিনোর দরিয়া ছিল দক্ষিণ মুখের যাত্রী। কিন্তু আইজাকের মতই সিলও লাফাইয়া লাফাইয়া সঙ্কীর্ণ খাত ভাঙ্গিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিতেছে।

চাষ-আবাদ অতি বিরল। পাহাড়ের বুকে ঘাসের মখমল মোড়া রহিয়াছে। বনের ভিতর কাঠুরিয়ারা কাঠ চিড়িতেছে। পাইনগুলার কোনো কোনো জাতি জ্বালানী কাঠের কাযে লাগে। ল্যার্খে-জাতীয় পাইনের তক্তায় ঘরবাড়ীর দেওয়াল, মেঝে, আসবাব তৈয়ারী হয়।

সিল্ দরিয়ার উপত্যকাকে ভিপ্-তাল বলে। ভিয়েনার পথে বৎসর দেড়-দুই পূর্ব্বে সালৎজাক-তাল দেখিয়া গিয়াছি। টিরোলের সেই পূব তালের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য আবার এই ভিপ্-তালে ফিরিয়া পাইলাম।

(ঘণ্টা দেড় দুয়েকের ভিতর ইন্‌সব্রুকে নামা গেল। ঝরণার তেজ হইতে বিদ্যুৎ তৈয়ারী করিবার কারখানা পথে পড়িল। ইতালিয়ানরা ইচ্ছা করিলে যে কোনও মূহুর্ত্তে ব্রেন্নার হইতে ইন্‌সব্রুক্ দখল করিতে পারে। এই পথে বাধা দিবার মত অষ্ট্রিয়ার পক্ষে কোন প্রাকৃতিক সুযোগ নাই। ইতালীর বিরুদ্ধে টিরোলের আত্মরক্ষা করা আজকাল বড় কঠিন।)

ইন্‌স্‌ব্রুক

(১)

১৯২২ সালের অক্টোবরে জার্ম্মাণি হইতে মিউনিকের পথে

ব্যাভেরিয়ার আল্পস-সম্পদ আর টিরোলের উত্তরপূর্ব্ব তালগুলা। সে সব 'নিম্ন ইন্‌তালের' নানা অংশ। এইবার দক্ষিণ হইতে প্রবেশ। গোটা আল্পসই উত্তরে দক্ষিণে দেখা হইয়া গেল। সুইট্‌স্থার্ল্যাণ্ডের পথেও আল্পসের উত্তর হইতে দক্ষিণে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছি। সুতরাং পাহাড়ী প্রকৃতি কিছু কিছু বশে আসিতেছে।

চাষীদের জীবন, পল্লীগৃহের গড়ন আর নরনারীর বেশভূষা ইত্যাদির তরফ হইতে ত্রেন্তিনোর আধাআধি—উত্তরার্দ্ধটা—টিরোলের সামিল বিবেচনা করিতেছি। উত্তর এচ্ (আদিজে) তালের মেরাণ, আইজাক-এচ্ সঙ্গমের বোৎসেন আর ফ্রান্‌ৎসেন্‌সফেষ্টে দুর্গের পূর্ব্ব অঞ্চল—পুষ্টার-তাল,—এই সবই টিরোল।

টিরোল সুইট্‌স্যার্ল্যাণ্ডের মতই 'তালে' ভরা। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ গিরিঝোরার আশেপাশে যে সকল জমি, তাহারই নাম 'তাল।' সোজাসোজি আমরা এইগুলাকে বলি উপত্যকা।

(২)

তালগুলার বৈচিত্র্য অসীম। টিরোলী জার্ম্মাণ-ভাষা এক এক তালে এক এক প্রকার। সুইস তালের ভাষায়ও এইরূপ বৈচিত্র্যই বিদ্যমান। শুনিতেছি, চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার লোকেরা এক তাল হইতে অপর তালে গেলে পরস্পর কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিত না। টিরোলী এবং সুইস উপভাষাগুলার বিভিন্নতা এতই বেশী।

রেলওয়ের এক বাবু বলিলেন :—'রেল না চলিলে আজও ভিপ-তালের কথা ষ্টুবাইতালের নরনারী বুঝিতে পারিত না। অথচ এই দুই তাল লাগালাগি। ৎসিল্লার তাল কথঞ্চিৎ দূরে। তাহার উপভাষা ত একটা খাঁটি স্বতন্ত্র ভাষাই বিবেচিত হইত। রেলপথের প্রভাবে টিরোলীরা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।"

কিন্তু ইন্‌স্‌ব্রুকের এক জন এঞ্জিনিয়ার বলিতেছে—"ঘরবাড়ীর গড়নগুলাও উপভাষার মতই বিভিন্ন। রেলে বসিয়াও ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন ছাদ, দেওয়াল, এবং ঘরবাড়ী সাজাইবার কায়দা লক্ষ্য করিতে পারা যায়।"

এঞ্জিনিয়ারের পত্নীর নিকট শুনিলাম—"কয়েক সপ্তাহের ভিতর ইন্‌স্‌ব্রুকে এক মিছিল বাহির হইবে। তাহাতে টিরোলের সকল অঞ্চল হইতে নরনারীরা নিজ নিজ তালের 'ট্রাখ্ টৃ' বা পোষাকে সাজিয়া আসিবে। পোষাকের বিভিন্নতা যে কোনও লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।"

ইন্‌স্‌ব্রুকের মিউজিয়ামে চিত্রশিল্পী ডেফ্রেগারের আঁকা 'টিরোল-দৃশ্যাবলী' রক্ষিত হইতেছে। ডেফ্রেগার তালে তালে যাইয়া পোষাকী সাজ-পরা স্ত্রীপুরুষের ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। চিত্রগুলা যথাসম্ভব ফটোগ্রাফ-বিশেষ। দেখিলেই বুঝা যায়, টিরোলের চাষীরা সুখে স্বচ্ছন্দে সুস্থ সবল শরীরে জীবনধারণ করে। 'ডেফ্রেগারের হাণ্ডি' চিত্রশিল্পের এক অতুলনীয় সম্পদ।

ডেফ্রেগারের পর আরও অনেক চিত্রকর পোষাকপরা টিরোলী নরনারীর ছবি আঁকিতে ঝুঁকিয়াছেন। বাস্তু-বৈচিত্র্য, ভাষা-বৈচিত্র্য, লোকাচার-বৈচিত্র্য ইত্যাদির সঙ্গে-সঙ্গে 'ট্রাখ্‌টেন' বা পোষাক-বৈচিত্র্যও টিরোলের আল্পস-পল্লীতে নৃতত্ত্ব-গবেষকদের মস্ত খোরাক।

(৩)

সিল যেখানে 'ইন্'য়ে পড়িয়াছে, সেইখানে ক্ষুদ্র 'ব্যর্গ-ইজেল' পাহাড়ের মাথায় বীর হোফারের মনুমেণ্ট। গোটা ইন্‌স্‌ব্রুক শহর পাহাড়ের পদতলে। অপর পারে ...

বীর হোফারের সঙ্গে নেপোলিয়নের লড়াই ডেফ্রেগারের চিত্রশিল্পে অমর রহিয়াছে।

হোফারের স্মৃতিমণ্ডিত ব্যর্গ-ইজেলের পাইন-বনে কয়েক জন ৎসিল্লার-তালবাসীর সঙ্গে দেখা হইল। ইহারা হাল ও কুফষ্টাইনের মাঝামাঝি জনপদের অধিবাসী। এই তালের লোকরা 'আঙ্গুলের কুস্তী'তে ওস্তাদ। দুই একটা 'প্যাচ' দেখিবার সুযোগ জুটিল। জাপানী জিউজিৎসুর সঙ্গে এই সকল আঙ্গুলের লড়াইয়ের তুলনা করা চলে। অবশ্য এই দুই কছরত কোনো মতেই একবস্তু নয়।

'পালোয়ান'রা বলিল—"ৎসিল্লার তাল না দেখিলে টিরোলের নর-নারীর শক্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের ধারণা করা অসম্ভব। ৎসিল্লার তালের ঘর-বাড়ীগুলার আকৃতিও টিরোলে সবসে ওম্‌দা!" রেলকুলী-দের এক কর্ম্মাধ্যক্ষের মতেও ৎসিল্লার-তালই এই সকল বিষয় নামজাদা।

ব্যর্গ-ইজেলের 'তীর্থযাত্রীদের' টুপিতে-টুপিতে এডেলভাইসের মখমল-তারা প্রায়ই দেখিতে পাই। টিরোলীদের চিন্তায় এই শুভ্র মোলায়েম ফুল বীরত্ব, সামর্থ্য এবং সরলতার নিদর্শন। পাহাড়ী পল্টন বিভাগে এডেলভাইসের পদকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। এই ফুল শুকনা পশমের মত—রঙ্গে ও স্পর্শে।

ইন্‌স্‌ব্রুকে ইনতাল বেশ সুবিস্তৃত,—ত্রেন্তিনোর নিকটস্থ এচ বা আদিজে যেমন। শহরটা দেড় হাজার ফুট উচ্চ বটে,—কিন্তু ইন্‌স্‌ব্রুক ত্রেন্তিনোর মতই গরম। আদিজে-উপত্যকার কৃষিসম্পদ এই অঞ্চলে দেখিতেছি না। আঙুরের ক্ষেত ব্রেন্নারের অনেক দক্ষিণ হইতেই লোপ পাইয়াছে। ইনতালের চাষীরা ভুট্টার চাষ করে। আলুর ক্ষেত, শসার ক্ষেত, শিমের ক্ষেত, কড়াইশুঁটির ক্ষেত ইত্যাদিও

মাঝে-মাঝে সোনালী-হল্‌দে শস্তের ভূমি টিরোলী গ্রীষ্মের বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্পাদন করে।

লাণ্ডেকের আবহাওয়ায়

(১)

১৯২২ খৃষ্টাব্দে দেখিয়া গিয়াছি, ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে লাণ্ডেকের পথে তড়িতের রেল তৈয়ারী হইতেছে। এইবার তড়িতের রেলেই সওয়ারী। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে উঠিতেছি। ইন গড়াইয়া গড়াইয়া নামিতেছে। আইজাক বা সিলের তুলনায় ইন অনেকটা নরম। লাফা-লাফির দৌরাত্ম্য নাই, তবে তেজ আছে দস্তুরমত। ডানিউবের তুলনায়, বিশেষতঃ পাস্‌সাওয়ের নিকট ইন্ যেখানে ডানিউবে পড়িয়াছে, সেখানে ইন্ বেশ দুর্দ্দান্তই বটে।

লাণ্ডেকেও ইন্‌স্‌ব্রুকের মত তড়িতের কারখানা আছে। অধিকন্তু তাঁতের কারখানায়ও বহু লাণ্ডেকবাসী কুলীগিরী করে। লাণ্ডেকই এই অঞ্চলে একটা শহরগোছের বড় পল্লী। আট-নয় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে উঠিবার জন্ম লাণ্ডেকে নামিয়া ভ্রমণকারীরা তালে-তালে যাত্রা করে। 'আল্পেন-ফারাইন' বা আল্পস্‌-পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তা দুই এক জনের সঙ্গে আলাপ হইল।

এক ব্যক্তি খবর দিলেন,—'তুষার-দরিয়া দেখিতে চান ত এখান হইতে ঘণ্টা সাতেক হাঁটিয়া আল্পেন-ফারাইনের এক কুটীরে আশ্রয় লইতে হইবে। 'হিট্টে' বা কুটীরটা হাজার ছয়েক ফুট উঁচু। তাহারই আধ ঘণ্টার পথে এক তুষার-দরিয়া বা গ্লেশিয়ার খতম হইয়াছে।"

পল্লীগুলা দুই-তিন হাজার ফুট মাত্র উঁচু, কিন্তু প্রত্যেক পল্লীর অভিভাবকস্বরূপ পর্ব্বতশিরসমূহ সাত-আট-নয় হাজার ফুটেরও বেশী। হিমালয়ের দুই চারিটা নামজাদা শহরমাত্র আমাদের [illegible]

কিন্তু আল্পসের বুকের মত হিমালয়ের বুকেও এতগুলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সৌন্দর্য্যের খনি,সরল সহজ জীবনের নিকেতন আছে কি না, ভারত-বাসীর জানা নাই।

(২)

পিয়ান্‌স্‌ পল্লীর এক চাষীর ঘরে অতিথি হইলাম। কিষাণ-পত্নী বুয়ার যুদ্ধের খবর রাখে। রুশ-জাপানী লড়াইয়ের গল্পও তাহার অজানা নহে। ভারত সম্বন্ধে প্রশ্ন এই—'এশিয়ার অত দক্ষিণ যদি ভারতবর্ষের অবস্থান, তাহা হইলে সেখানে শীত আসে কি করিয়া ?"

জানালার ভিতরেই একটা 'পেয়ার' গাছের ডাল আসিয়া পড়িয়াছে, দুই একটা ফলও ছিঁড়িয়া খাওয়া গেল। কিন্তু বুঝিতেছি,—আরও দু'এক সপ্তাহ না গেলে ফল পাকিবে না। পেয়ারগুলা দেখিতে ঠিক 'আমারুত' বা পেয়ারারই মত। রৌদ্রতাপে ফলগুলার পিঠ রক্তাভ হইতেছে। ছোট্ট ফিঙ্ক পাখীগুলা সাদা বুকে উড়িয়া পেয়ার হইতে পেয়ারে গিয়া অদৃশ্য হইতেছে। সেবার অক্টোবরের মাঝামাঝি আল্পসের বুকে-বুকে 'ল্যার্খে'-পাইনের লাল শোভা দেখিয়া গিয়াছি। জুলাই মাসে সবই সবুজ, পাকা রাই শস্যের ক্ষেতগুলা কেবল পীতবর্ণ। পার্সাইয়ার গিরিশ্রেণী মাথার উপরে সুনীল আকাশ চষিতেছে !

কার্ণেশ্যন, জিরানিয়াম, পপি ও অন্যান্য ফুলের 'জবাকুসুমসঙ্কাশ' দীপ্তি গোয়ালা ও চাষীদের জানালাগুলা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। পল্লীতে গরু একটাও নাই। অত্যুচ্চ পাহাড়ী বুকের 'আল্‌ম'-ময়দানে তাহারা চড়িতে গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে এইরূপ ব্যবস্থা। বিরামবিহীন ঝরণার গম্ভীর নির্ঘোষের সহিত প্রভাতে ও অপরাহ্ণে ছাগলগুলার কণ্ঠলগ্ন ঘণ্টার ধ্বনি মিশিতেছে। পল্লীর কিষাণরা সকলেই স্বাধীন।

হইল। বাড়ীওয়ালা চাষীর বয়স ৭৫ বৎসর। এই বয়সেও দক্ষিণ-টিরোলে যাইয়া ইতালীর বিরুদ্ধে ইহাকে লড়িতে হইয়াছিল। তখন অবশ্য বয়স বৎসর সাত-আটেক কম ছিল।

এক দোকানওয়ালী বলিতেছে,—“জার্ম্মাণ আর অষ্ট্রীয়ান কাইজার দুইটা যদি তাড়াতাড়ি দেশ হইতে পলাইয়া না যাইত, তাহা হইলে আমরা কোনো-মতেই হারিতাম না। আমাদের সোনার দক্ষিণ-টিরোল আজ ইতালির গোলাম হইত না।”

সাঙ্ক্‌ট্ আণ্টোনের আন্না মাসী

(১)

সাঙ্কট্ আণ্টোন টিরোলের এক অতি প্রসিদ্ধ ‘কুরর্ট্’। শীতকালের বরফ-মজা লুটিবার জন্য দেশী-বিদেশী লোকেরা এই শহরে হাজির হয়। সাঙ্ক্‌ট্ ক্রিষ্টোফ হইতে সাঙ্ক্‌ট্ আণ্টোন পর্য্যন্ত আলর্ব্যর্গ সড়কে ঘণ্টা দুই ধরিয়া বরফের উপর স্কি-দৌড়ানো হাজার হাজার নরনারীর সাধ।

এখানকার বড় হোটেলের নাম “হোটেল পোষ্ট”। মালিক আজকালকার ‘লাণ্ডটাগ’ বা টিরোলের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। আট দশ পুরুষ ধরিয়া এই পরিবার ‘গাষ্টহোফ’, সরাই, চটি বা হোটেল চালাইতেছে। গ্রীষ্মকালেও ‘হোটেল পোষ্ট’ অতিথি-পূর্ণ। ঘর খালি পাওয়া কঠিন।

সুইটস্যার্ল্যাণ্ডের সাঙ্ক্‌ট্ মোরিট্‌স্ বা ডাভোস ইত্যাদি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র যে দরের গ্রীষ্ম-নিকেতন বা শীত-নিকেতন, টিরোলের সাঙ্ক্‌ট্ আণ্টোনও অনেকটা তাহাই। তবে এখানে সুইস শহরের বিলাস এবং আমোদ-প্রমোদের মাত্রা রক্ষা করা অসম্ভব। কাযেই বেশ কম খরচে খাওয়া

থাকা চলে। পল্লীটা প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু। দিনে খুব গরম,—রাত্রিকালে মোলায়েম ঠাণ্ডা।

গ্রীষ্মের প্রধান দৃশ্য দেখিতেছি ঘাসের স্তূপের সারি। ত্রেন্তিনো বা দক্ষিণ-টিরোলের আবাদ-সম্পদ উত্তর-টিরোলের কোথাও নাই।

এক রেল-কুলী বলিল—'আমরা প্রত্যেক পরিবারেই যৎসামান্ত তরীতরকারীর চাষ করিয়া থাকি। প্রত্যেক গৃহস্থেরই একটু আধটু জমী আছে। কিন্তু তাহাতে সংসার চলে না।"

(২)

রেল-কুলীদের ছেলেপুলেরা আন্না-'মাসীর' কিণ্ডার-গার্টেনে প্রতিদিন পাঁচ-ছয় ঘণ্টা করিয়া কাটায়। প্রায়ই পঞ্চাশ-ষাটটি শিশুকণ্ঠে গান শুনি—'ক্লাউজ ইষ্ট ইন্ ডেন ভাল্ড গেগাঙ্গেন' (ক্লাউজ গেছে বনের ভিতর পাখী ধরবার তরে) ইত্যাদি।

মাসী ৬১ বৎসরের বুড়ী। কাগজের নানা প্রকার আসবাব তৈয়ারী করায় ইনি ওস্তাদ। সচিত্র পোষ্ট-কার্ড ব্যবহার দ্বারা সৌখীন ও আটপৌরে জিনিষপত্র প্রস্তুত করা ইঁহার এক বিশেষত্ব। দুই তিন চার পাঁচ বৎসরের শিশুরা এই সব গড়িতেও শিখিয়াছে।

কিণ্ডারগার্টেনের শিশুদের নাট্যাভিনয় দেখিলাম। বুড়ী ইহাদিগকে নট-নটীর শিল্পও বেশ শিখাইয়াছেন। জার্ম্মাণ মুল্লুকে কচি ছেলেমেয়েদের জন্য শত শত নাটক রচিত হইয়াছে। নামজাদা লেখক-লেখিকারা এই দিকে ঝোঁক দিয়া থাকেন।

আন্না-মাসীর পাঠশালায় শিশুরা কখনও 'ওষুধের দোকান' অভিনয় করিয়াছে। কখনও ইহাদের 'থিয়েটারে' 'পুতুলের বিয়ে' পালা ছিল।

খেলার সামগ্রী। এই সকল খেলা-ধূলার জন্য সাজসজ্জা, পোষাক, আসবাব, ষ্টেজ ইত্যাদি সবই বুড়ী নিজে কায়েম করিতে অভ্যস্ত।

শিক্ষয়িত্রীকে মাসী বলিয়া ডাকা ইয়োরামেরিকার "পল্লী-ধর্ম্ম।"

রোজানা-তালে পর্য্যটন-লীলা

(১)

কাঠের পুল পার হইয়া রোজানার অপর দিকে পাহাড়ে উঠিবামাত্র পাইনবনে প্রবেশ করিতে হয়। বুনো ষ্ট্রবেরিগুলা এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে টক্কর দিয়া টুকটুকে লাল ফলগুলা খুঁজিতে লাগিলাম। টপাটপ মুখে না ফেলিলে বে-রসিক সাজিতে হয়, বলাই বাহুল্য।

আবাদের ষ্ট্রবেরিগুলা খুব বড় বড় হয়—প্রায় লিচুর সমান। কিন্তু পাইনের গোড়ায়-গোড়ায় অতি ছোট ঝোঁপের আড়ালে রোদের ফাঁকে-ফাঁকে যে ফলগুলা উঁকি মারিতে থাকে, সে সব নেহাৎ ক্ষুদ্র। বুনো-ষ্ট্রবেরি সিকিখানা তুঁতফলের চেয়েও ছোট। কিন্তু প্রাণ-মাতানো সুগন্ধ মাখনের মত নরম। রক্তবর্ণ ষ্ট্রবেরিগুলা বনে বনে খুঁজিয়া খাইবার মত বিলাস জগতে খুব কমই আছে। বাজারের ষ্ট্রবেরি খাইতে এমন সরস নহে। বাগানে আর বনে তফাৎ অসীম।

হাজার পাঁচেক ফুটের উচ্চতা লাভ করিয়াছি। তাহার প্রমাণ—পায়ের কাছের 'আল্পেন-রোজ'গুলা। এ সবকে আল্পগোলাপ বলা হয়। কিন্তু ইহাদের না আছে গোলাপের পাঁপড়ি, না আছে গোলাপের গন্ধ। সাধারণতঃ এগুলা 'রোডোডেণ্ড্রন' নামে পরিচিত। অপূর্ব্ব ফেরোজা-লালের উজ্জ্বল কান্তি সবুজ ঝোঁপের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করে।

ক্ষণে ক্ষণেই 'আল্পেন-রোজেন' পায়ে দলিতেছি। ফুলগুলা

ঘণ্টা মনে হইবে। ঘণ্টাগুলা উঁচুদিকে মুখ তুলিয়া পাইনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে। এ এক নতুন দৃশ্য,—অতি চমৎকার। পাহাড়ের পিঠে সত্য-সত্যই "আগুন লাগিয়াছে!"

(২)

পাহাড়-পর্য্যটকেরা আল্পেন-রোজগুলা সবই লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, সবই ক্রমে ক্রমে ঝরিয়া পড়িতেছে। জুলাই মাস,—আল্প-গোলাপের ঋতু অবসন্নপ্রায়।

সাঙ্ক্‌ট্‌ আণ্টোনের খোলার চালাগুলার চারিদিকে দেখিতেছি ঘাসের আঁটির পল্টন। ভূমিতে কাঠি গুঁজিয়া তাহার চারিদিকে ঘাস সাজানো টিরোলের চাষীদের রেওয়াজ। ঘাসের আবাদ এখানে এক বড় ব্যবসা। গরুবাছুরের জন্য শীতের খোরাক পুঁজি হইতেছে।

অপর দিকের পাহাড়ের মাথায়-মাথায় চিরতুষারের চাপ গ্রীষ্ম ভরিয়াই না কি দেখা যাইবে। কোনো কোনো পর্ব্বতবক্ষস্থ সবুজ ময়দানের দিকে তাকাইয়া সঙ্গীরা বলিলেনঃ—"ঐগুলাকে বলে 'আল্‌ম্‌।' গ্রীষ্মের সময় গরু চরাইবার জন্য রাখাল-বালকেরা ঐ সব আল্‌মে গিয়া আড্ডা গাড়ে।"

এ পার হইতেই "লয়ট্‌কির্খ্‌নার হিট্টে" নামক আল্পস-ফারাইনের এক কুটীর দেখা গেল। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফুট উঁচু হইবে। ঐ কুটীরে রাত্রিবাস করিয়া পর্য্যটকরা নয় হাজার ফুট শিখর দখল করিতে যায়। কুটীরের আশেপাশে কোথায়ও গাছগাছড়ার চিহ্নমাত্র নাই। যেন এক বিশাল তরঙ্গায়িত ধূসর সাগর জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে।

(৩)

রোজানা দরিয়ার মনোরম আবেষ্টনে পাইনতরু-বীথি। ভয়ঙ্কর

সঙ্কীর্ণ। দুই কিনারার বনই যেন উর্দ্ধে গিয়া পরস্পর ঠেকিয়াছে। ঝড়ের দৌরাত্ম্যে রাক্ষস-প্রমাণ গাছগুলা উপড়াইয়া গিয়াছে। বড় বড় পাথরের চাপও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রোজানার উন্মাদ-নর্ত্তন এই আবহাওয়ায় যার-পর-নাই আনন্দ-দায়ক। সৃষ্টিশক্তির উৎস উজাইয়াই যেন প্রকৃতিপূজায় বাহির হইয়াছি।

এক ব্যক্তি সুদূর পাহাড়ের উচ্চতম শিখর হইতে নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার টুপীতে কটা-বাদামী রঙ্গের "ক্রুণেল" ফুল শোভা পাইতেছে। আল্পেন-রোজের মণ্ডলেরও অনেক উপরে এই সব ফুলের জন্ম-নিকেতন। সগৌরবে পর্য্যটক বলিলেন :—"এইগুলা আমার আজকের লুঠ।"

এডেলভাইসের শুভ্রতারকারাজি পাহাড়ের অতি দুর্গম স্থানে পাথরের উপর বিরাজ করে। ক্রুণেলও প্রায় সেইরূপ স্থানেই দেখা দেয়। এই দুই ফুলের অধিকার লাভ করা টিরোলী-সমাজে একটা কাযের মত কায। অবশ্য টিরোলের প্রায় প্রত্যেক তরুণ-তরুণীই জীবনে এডেলভাইস ও ক্রুণেল বহুবার দখলে আনিয়াছে।

ক্রুণেলগুলা হাতে লইয়া শুঁকিলাম। গন্ধ আছে, কিছু তীব্র, অনেকটা আমাদের লবঙ্গের মত ঝাঁঝালো। ক্রুণেল-রঙ্গের চোখ টিরোলী মেয়েদের গৌরব।

ইয়োরামেরিকান নরনারীদের চোখের তারা সাধারণতঃ গাঢ় নীল। যে দুই চারি জনের চোখের রং কৃষ্ণাভ-বাদামী, তাহাদের কিম্মৎ সৌন্দর্য্যের বাজারে লাখ টাকা! ক্রুণেল-চোখের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন টিরোলী কবিদের আটপৌরে কথা।

ত্রেন্তিনোয় বনের অভাব ভুগিতেছিলাম। টিরোলে সেই অভাব চুকিয়াছে। পাইনের নিঃশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে ফুসফুসের এখন উঠানামা

করিলে শেষ করিতে ইচ্ছা হয় না। পাইনের সূচগুলা চিবাইতেও কত সুখ! তাহা ছাড়া পাইনবনে হাঁটা, সে ত এক চরম বিলাস। শাখাচ্যুত পাইন-সূচ জমিয়া-জমিয়া পথের উপর যেন মোলায়েম গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে।

ক্রমশঃ বুঝিতেছি, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য পাইনতরু ছাড়া অসম্ভব। অবশ্য বাঙালীর পক্ষে এ একপ্রকার "গরীবের ঘোড়া রোগ"! আম, জাম, কাঁঠাল, বাবলা, বকুল, নারিকেল ইত্যাদি গাছের শ্যামল ছায়ায় আজকাল আর শানাইতেছে না! জাপানে, আমেরিকায়, জার্ম্মাণিতে আর এই টিরোলে ঘুরিতে-ঘুরিতে নজর বড় হইয়া গিয়াছে। পাইন-হীন প্রকৃতির গৌরব এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া মনে হইতেছে। দেখা যাক,—কোথায় গিয়া ঠেকি।

বাঙ্গালীর পক্ষে পাইনের স্বপ্ন দেখা খানিকটা আকাশ-কুসুমই বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ভারত ত আর একমাত্র বাঙ্গলার সমতল মুলুক নয়। আল্‌মোড়ার পথে যাঁহারা বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহারা টিরোলের প্রকৃতি-সম্পদই আগাগোড়া চাখিয়া দেখিয়াছেন। পাইনের প্রকৃতি বাঙ্গালীর জীবনে রাজ্য বিস্তার করিতে থাকিলে লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

•

"আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী"

রোজানাতাল উজাইয়া চলিতেছি,—দলে ভিড়িয়া যাওয়া গেল। চামড়ার জাঙ্গিয়া-পরা পুরুষ আর 'টাইট'-কাঁচলি-আঁটা নারী প্রকৃতি-পূজার যাত্রী। মেয়েরা জিমনাষ্টিকের প্যাণ্ট-পরা আর পুরুষের গায়ে "শিলার-কলারওয়ালা" অর্থাৎ বুক-খোলা জামা। পাহাড়-পরিক্রমার

থলে'র ভিতর দশ-বার সের ওজনের কাপড়চোপড়, খাদ্যদ্রব্য, জলের বোতল ইত্যাদি। পাহাড়-চড়ার লাঠি আর বরফ-ক্ষোদার কুড়ালও যাত্রীদের সকলেরই হাতে শোভা পাইতেছে।

ঘণ্টা দুই দেড়েক গলি-ঘোচে উঠিয়া-নামিয়া এক "আল্‌মে" হাজির হইলাম। তিন ভাই রাখাল যুবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইহারা দেড়শ' গরুর জিম্মায় মোতায়েন। আলাপ-পরিচয়ে বুঝিলাম,—রোজ তিন টাকা হারে ইহারা তিন মাসের জন্য বাহাল হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে গরুগুলা ফিরাইয়া "তালে" লইয়া যাইবার হুকুম। কতকগুলা পল্লীর কিষাণরা সমবেতভাবে এই সকল "সেন্নার" বা রাখাল বাহাল করিয়াছে। আল্‌ম্‌টা এখানে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চ হইবে।

রাখালদের কুঁড়ে দেখিলাম। ইহারা তিন মাস এই অঞ্চলে নির্জ্জন জীবন যাপন করে। সকলেরই কপালে "স্বপাক" খাওয়ার আনন্দ বা বিষাদ! গরু চরানো ইহাদের একমাত্র কায। আজ এ-মাঠে, কাল ও-মাঠে খোরাক পরিবর্ত্তন করান হয়। হিসাবপত্র করিয়া বুঝিলাম,—প্রত্যেক গরুর প্রতি কিষাণদের খরচ পড়ে রোজ দেড় বা দুই আনা হিসাবে। আল্‌মে গরু চরাইবার জন্য কিষাণরা সরকারকে গরু প্রতি একটা খাজনা দেয়।

টিরোলের এই "গোচারণে সমবায়" মান্ধাতার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মেজো ভাই বলিল :—"শহরে নরনারীরা কালে-ভদ্রে এক-আধ দিন আমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইলে আমাদের তথা-কথিত আনন্দময় জীবনের তারিফ করিতে-করিতে পাগল হইয়া পড়েন। কিন্তু জলে ঝড়ে আমরা অনাহারে অর্দ্ধাহারে কি কষ্টে দিন-রাত্ত কাটাই, তাহা শহরেরা আন্দাজ করিতে পারেন কি?" তিন মাসের খরচপত্র

পৰ্ব্বত-রত্ন পাটেরিয়োল

(১)

"আল্‌ম্‌টা" রোদে খাঁ খাঁ করিতেছে। আকাশ সুনীল সমুজ্জ্বল। বাতাস ফুরফুরে, খটখটে ওশুক্‌না! পাহাড়ের নাকে চোখে মেঘের যে পর্দ্দা ছিল, প্রকৃতি তাহাকে দিন দুয়েক হইল নিংড়াইয়া ঝরঝরে করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যের সঙ্গে ধরাতলের এখন অবাধ কুটুম্বিতা। মাথার ঘাম পায়ে ঠেকিতেছে।

ঊৰ্দ্ধস্তরে পাইনের ছুঁচোল ডগাগুলি আল্‌গা আল্‌গা দাঁড়াইয়া আছে। নিম্নদিকের স্তরে, এবং ডাহিনে বামে গভীর সবুজ বন। পাইনের আঙ্গুলের আঘাত খাইতে খাইতে অগ্রসর হইতেছি।

অল্প নীচেই রোজানার গর্জ্জনে শ্বেত ফেনা উঠিতেছে। ঝরণার কিনারায় স্থানে স্থানে বরফের চাপ পাহাড়েরই এক এক টুকরার মত দেখাইতেছে। এই গ্রীষ্মে সে সবের গলিবার সম্ভাবনা নাই।

অপর দিকে পাহাড়ের গা ঢালুভাবে নামিয়াছে। কোথাও কোথাও পাথরের অবাধলীলা। আল্পেন-রোজের গোলাপী গুচ্ছ সবুজ ও ধূসরের লুকাচুরির ফাঁকে ফাঁকে ঝাঁকিয়া উঠিয়াছে।

একটা বাঁক ফিরিয়া সম্মুখের দিকে উঠিতেছি, এমন সময়ে চোখ এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ে ভরিয়া গেল। দুনিয়া-দুর্ল্লভ দৃশ্য মনপ্রাণ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আট্‌লাণ্টিকের তুমুল তুফানে একটা বিপুল তরঙ্গ ক্ষণেকের তরে মাথা তুলিবামাত্রই চিরকালের জন্য যেন জমাট বাঁধিয়া রহিল! পাথরের লহরের সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ও নাচিয়া উঠিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে।

পর্ব্বত-শৃঙ্গের রাজরাজেশ্বর স্বয়ংই যেন প্রকৃতির এই নিভৃততম

খাইয়া দিগ্‌বিদিক-কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে রত্নমুকুটের সন্ধানে ভক্তিযাত্রা চালাইতেছি।

(২)

ঐ পর্ব্বত-রত্নই সুপ্রসিদ্ধ পাটেরিয়োল। সুইটস্যার্ল্যাণ্ডের পর্ব্বত-সাগরে মাটারহর্ণ নামক উত্তাল পাথর-তরঙ্গের পিরামিড যাঁহারা দেখিয়াছেন, বোধ হয়, একমাত্র তাঁহারাই পাটেরিয়োলের কিরীট-গরিমা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মাত্র কয়েক হাজার ফুট উঁচু। একটু আধটু বরফের পোঁছ এগালে ওগালে খানিকটা দেখিতেছি। কাঞ্চনজঙ্ঘা বা গৌরীশৃঙ্গের চির-তুষারমণ্ডিত শির পাটেরিয়োলের গৌরব নহে। যতখানি দেখিতে পাইতেছি, তাহার কোনও অংশেই একটা তৃণ পর্য্যন্তও নাই। সবই পাথর, নীরস, নির্ম্মম, নিরেট, পাথুরে জীবন। তথাপি হাঁটিতে হাঁটিতে এক মুহূর্ত্তও পাটেরিয়োলের পর্ব্বত-মোচাটাকে চোখের আড়ালে যাইতে দেওয়া সম্ভবপর হইল না।

তরুণ-তরুণীরা দল বাঁধিয়া গাহিতে সুরু করিল:—"ও লাণ্ড টিরোল!" পর্ব্বতের শিখর, উপত্যকা, খাদ, দরিয়া, ধাপগুলা, গড়ানো ঢালু আল্‌ম, বন্ধুর অসমতল খোঁচে ভরা প্রস্তর স্তূপ,—এই সকল রূপ-বৈচিত্র্যই যেন সঙ্গীতের চড়াই-খাদে আত্মিক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। সুরের উঠানামা কানে শুনিতেছি কি চোখে দেখিতেছি, ঠাওরানো কঠিন।

(৩)

বিশ-পঁচিশ যুবার দল শাইল্লারের ঘাড় মট্‌কাইয়া ও শির টপকাইয়া পাটেরিয়োলের পারে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহারা দরিয়ার

জানা গেল, বার্লিনের এক ইস্কুল হইতে এই দল আসিয়াছে। সঙ্গে আছেন মাষ্টার। পাহাড়-যাত্রীদের "লাঠিসোটা" সবই আছে, মায় দূরবীণ পর্য্যন্ত।

এক কুঁড়েতে প্রবেশ করিয়া দেখি, তিন চার জন তরুণী মাখন তৈয়ারী করিতেছে। রাখালরা যে গরু চরায়, তাহাদের দুধ এই কুটীরেই সঞ্চিত হয়। জলের স্রোতে "টুর্বিণ" লাগাইয়া মাখনের জন্য চাকা ঘুরানো হইয়া থাকে।

কুঁড়ের সম্মুখেই শূয়ার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিতেছে। শ্বেতাঙ্গদের দেশে শূয়ারগুলার রংও সাদা!

সাঙ্ক্ট্ আণ্টোনের পর্ব্বত-প্রদর্শকের সঙ্গে পথে দেখা হইল। ইঁহার সঙ্গে "পর্য্যটকবেশে" দুই ওলন্দাজ যুবা। ইঁহাদের জুতা ভিজিয়া গিয়াছে। বলিলেন,—"শাইল্লার পাহাড়ের পথে বরফ এখনও অতি তাজা।" পাহাড় দেখাইবার জন্য ইঁহার দৈনিক ফী প্রায় ২০ মুদ্রা।

শেষ পর্য্যন্ত ঘণ্টা তিনেক হাঁটিয়া 'হিট্টে'তে বা কুটীরে পৌছান গেল। এই কুটীরের নাম 'কন্‌ষ্টান্‌ৎসার হিট্টে।' পাইনের ছায়ায় ঠাণ্ডা হইতেছি আর 'ফার্গেস-মাইন-নিখ্‌ট্' ফুলের নীল শোভা উপভোগ করিতেছি। 'ভুলো না আমায়' ফুলগুলা আকারে অতি ছোট। নীল জোনাকী পোকার মত ইহারা পাহাড়ের সবুজ গা ঘেঁসিয়া দল বাঁধিয়া থাকে।

(৪)

সাঙ্ক্ট্ আণ্টোনের পুরুত ঠাকুর আসিয়াছেন 'হিট্টে' শোধন করিতে। ইনি 'আল্‌ম' শোধন করিলেন, কুঁড়ে শোধন করিলেন, দরিয়া শোধন করিলেন, পাহাড় শোধন করিলেন। এই সকল 'শোধন'-কার্য্যের 'অন্তর-মন্তর' এইরূপ—'এবারকার গ্রীষ্মে কোনো গাভীর যেন আপদ-

গোটা প্রকৃতিই যেন মানুষ ও জানোয়ারের দলকে বাঁচাইয়া চলে,—হে ভগবান্, তাহার বিধান কর' ইত্যাদি।

চীনারা তাইশান পাহাড় পূজা করে। হিন্দুরা অমরকণ্টক আর বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূজা করে। এই সকল পাহাড়-পূজাকে যে সকল পশ্চিমারা 'প্রাচ্য কুসংস্কার' বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত, তাহারা ক্যাথলিক পুরোহিতের আল্পস-পূজার কথা ভুলিয়া যায় কেন? হিন্দুর দুয়ার-শোধন, দিক-শোধন, ভূমি-শোধন, ঘট-শোধন ইত্যাদি শোধন-ক্রিয়ায় আর পশ্চিমাদের আল্ম-শোধনে, হিট্টে-শোধনে এবং পাহাড়-শোধনে কোনো আত্মিক প্রভেদ, আদর্শের প্রভেদ বা 'জীবন-দর্শনের' প্রভেদ নাই।

(৫)

হিট্টেটা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চ। এত উঁচুতে গাছপালার ভিতর হিট্টে প্রায়ই দেখা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে হিট্টেগুলা সাধারণতঃ আরও উঁচু।

য়েনা শহরের ৎসাইস নামক কাচের কারখানার এক জার্ম্মাণ কর্ম্মচারী গ্রীষ্মের ছুটীতে সপত্নীক টিরোল বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইঁহারা বলিলেন—"সাঙ্ক্‌ট্-আণ্টোন হইতে শাইল্লারের পথে ডার্মষ্ট্যেটার-হিট্টেতে কাল রাত কাটাইয়াছি। সেই কুটীরের আশেপাশে সবই শুক্‌না পাথর।" প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ে তাহার অবস্থান।

শাইল্লার পাটেরিয়োলের অপেক্ষা কয়েক শ'ফুট বেশী উঁচু। কন্‌ষ্টান্‌-ৎসার হিট্টে হইতে পাটেরিয়োলকে অবশ্য ছোট দেখায় না।

পুরুত ঠাকুর বেশ রসিক লোক। ইনি বলিলেন—'আমি শাইল্লার পাহাড় দুচারবার পার হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু পাটেরিয়োলে

যাইতে ভয় পায় না, আমি একমাত্র সেই সব পাহাড়ের যাত্রী।" পুরুত ঠাকুরের ভুঁড়ি কথঞ্চিৎ পুরু।

'হিট্টে'গুলা আল্পস্-পর্য্যটক-পরিষদের তত্ত্বাবধানে চালান হইয়া থাকে। 'গাষ্টহোফ,' 'গাষ্ট-হাউস,' পান্থ-শালা, অতিথি-শালা, 'ডাক-বাংলো', ধর্ম্মশালা ইত্যাদি যে ধরণের আশ্রয়, আল্পসের 'কুটীর'গুলাতেও সেইরূপ আশ্রয়ই পাওয়া যায়। খরচ-পত্র মারাত্মক বেশী নয়।

শয়নঘরের নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে। একলা ঘর লওয়া যায়। এক ঘরে পঁচিশ-ত্রিশটা ঢালা বিছানাও পাওয়া যায়। আবার ঘাসের উপর একসঙ্গে বিশ-পঁচিশ জনের শুইয়া থাকাও সম্ভব। 'যত গুড় তত মিষ্টি।' সবই পয়সার খেলা।

পাহাড়-তীর্থে-জীবন-যৌবন

পাহাড়-যাত্রীরা পাহাড়-তীর্থ হইতে ঘরে লইয়া যায় যৌবন। পাহাড়-যাত্রীরা পাহাড়ে শক্তি ও স্বাস্থ্য পায়। পাহাড়-যাত্রীরা পাহাড়ের তালে-তালে ধরাতলের গড়ন-গরিমা উপভোগ করে।

অবাধ প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ গমনাগমন পাহাড়-যাত্রীদের হাড়মাসে স্বাধীনতার রস সঞ্চারিত করে। প্রতি পদক্ষেপে, প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক উঠানামায় পাহাড়-যাত্রীরা অনাবদ্ধ রক্তের তেজ চাখিতে পায়।

নির্ঝরের শ্রান্তিবিহীন স্রোতের মধুর ডাকে পাহাড়-যাত্রীরা অনন্তের বাণী শুনিতে থাকে। স্থিরগম্ভীর পর্ব্বতশৃঙ্গও পাহাড়যাত্রী-দিগকে সনাতন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ জীবনের নির্ভয় বিশ্বাস উপহার দেয়।

পাথরের উত্তাল তরঙ্গে পাহাড়-যাত্রীরা আবেগের উন্মাদনা লাভ করে। ক্ষণে ক্ষণে উপত্যকার দৃশ্যপরিবর্ত্তনগুলা পাহাড়-যাত্রীদিগের

হৃদয়ে নব-নব বিস্ময়ের ফোয়ারা ছুটায়। এই উন্মাদনায় ও বিস্ময়েই দেবত্ব ও অমরতার ইঙ্গিত রক্তমাংসে মিশিতে থাকে।

পর্ব্বতস্তূপের অশেষ গতিভঙ্গী পাহাড়-যাত্রীদিগকে গতি, উর্দ্ধগতি অগ্রগতির নেশায় মাতোয়ারা করিয়া রাখে। নয়া নয়া রস, নয়া নয়া রূপ, নয়া নয়া গন্ধ, নয়া নয়া শব্দ, নয়া নয়া স্পর্শ, নয়া নয়া দৃঢ়তা, নয়া নয়া কাঠিন্য, নয়া নয়া ল্যবণ্য, নয়া নয়া জীবনানন্দ লুটিবার সুযোগ বিলাইয়া পর্ব্বততীর্থ পাহাড়-যাত্রীদিগকে বিপ্লবের আত্মায় ভরিয়া ফেলে। শক্তিযোগের এই বিপুল দেউল মরা মানুষকেও দিগ বিজয়ের সিপাহীতে পরিণত করে।

পর্ব্বতযাত্রীরা পাহাড়ের আবেষ্টনে অর্জ্জন করে দুনিয়াকে ভাঙ্গিবার ও গড়িবার সাহস, সামর্থ্য এবং প্রবৃত্তি। পর্ব্বততীর্থে নরনারীদের জীবনে জোয়ার সুরু হয়।

অষ্ট্রিয়ায় বোলশোভিক

জীবনে প্রথমবার 'লক্ষপতি' হই ১৯২২ খৃষ্টাব্দে টিরোলে আসিয়া। তাহার পর জার্ম্মাণিতে ফিরিয়া গিয়া অবশ্য 'বিলিয়ন'-পতি অর্থাৎ 'শঙ্খ', 'পদ্ম', 'মহাপদ্ম' ইত্যাদি জ্যোতির্ষিক সংখ্যাওয়ালা মার্কের অধীশ্বর পর্য্যন্ত হইয়াছি। তাহার পর সুইটস্যাল্যাণ্ডে আসিয়া মামুলি আনি, দোআনি আধুলিতে 'পুনর্মূষিকো' হওয়া গিয়াছিল। ইতালিতেও তাহার পর সেই আনি-দোআনির জেরই চলিয়াছে। (নবেম্বর ১৯২৩-জুন ১৯২৪)।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মে (জুলাই মাসে) টিরোলে সেই লাখের রেওয়াজই বজায় আছে দেখিতেছি। তবে বিলাতী নামের রূপার শিলিঙ নূতন কায়েম হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার টাকা বিলাতী ও মার্কিণ টাকার তুলনায় দরে সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু থাই-খরচ সুইটস্যাল্যাণ্ডে বেশী কি অষ্ট্রিয়ায় বেশী, তাহার নিষ্পত্তি করা কঠি

টিরোলে বিলাসের মাত্রা কিছু কম বলিয়া এখানে খানিকটা অল্প খরচেও চালান যায়। কিন্তু মোটের উপর ইতালীকেই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা দেশ বিবেচনা করিতেছি।

এই দুই বৎসর ধরিয়া ডক্টর জাইপেল অষ্ট্রিয়ান রিপাব্লিকের প্রধান কর্ণধার রহিয়াছেন। ইহার আমলে অষ্ট্রিয়ায় কিছু কিছু শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে। এক জন লিখিয়ে-পড়িয়ে টিরোলী যুবা বলিতেছে "জাইপেলকে এক জন পাকা কর্ম্মবীর বলা চলিতে পারে। রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে বিস্‌মার্কের যে ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতাই জাইপেলের আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

কিন্তু কয়েক সপ্তাহ হইল, এই জাইপেলের উপরও রিভল্‌ভার চালানো হইয়াছে। মজুরেরা এবং মজুরপন্থীরা জাইপেলকে কট্টর দুষ্‌মন বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। মজুরদের হাতে জাইপেলের প্রাণ যাওয়া অসম্ভব নহে। অধিকন্তু অষ্ট্রিয়ান রিপাব্লিককে 'কম্যুনিষ্ট' মতে গড়িয়া তুলিবার দিকে ভিতরে-ভিতরে আন্দোলনও চলিতেছে।

সাঙ্ক্‌ট্ য়াকোব পল্লীর নিকটবর্ত্তী রেলপথে এক গাড়ী-ভরা মজুরের সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন ভিয়েনার এক শিক্ষয়িত্রী। ইনি সুইস নরনারীর দানশীলতায় ভর করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সুইটস্যার্ল্যাণ্ডে যাইতেছেন। গাড়ীতে মজুররা গান গাহিয়া জাইপেলের 'চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার' করিয়া ছাড়িতেছিল।

মহিলা গানগুলার বিরুদ্ধে সামান্যমাত্র প্রতিবাদ করেন। মজুরেরা ক্ষেপিয়া তৎক্ষণাৎ মহিলাকে উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দেয়। সাঙ্ক্‌ট্ আন্টোনে গাড়ী পৌঁছিবামাত্র মহিলাকে ষ্টেশন-মাষ্টার নামাইয়া লইয়াছেন। মজুরদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করা মাষ্টার-

রুটীওয়ালার দোকানে লোকের ভিড়। কানাঘুষা চলিতেছে, এক রেল-কুলীর স্ত্রী বলিল—"আমার স্বামীর নিকট শুনিয়াছি যে, বিগত লড়াইয়ে অষ্ট্রিয়ার যে সব ফৌজ রুষিয়ায় বন্দী হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বল্‌শেভিক হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। বল্‌শেভিক মতের মজুর আজকাল প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই মোতায়েন আছে।"

টিরোলীরা গোঁড়া ক্যাথলিক। তাহা সত্ত্বেও সোশ্যালিজম, কমুনিজম্‌ ইত্যাদি মত সমাজে প্রবেশ করিতেছে। এক শিক্ষয়িত্রীর নিকট শুনিলাম,—"আজকালকার মজুরদের অনেকে ইস্কুলে ধর্ম্মশিক্ষার বিরোধী। তাহাদের ছেলে-পুলেরা ধর্ম্মোপদেশের সময় ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া যায়।"

অপর দিকে আর এক মজা চলিতেছে। পরলোকগত অষ্ট্রিয়ান বাদশা কার্লকে ক্যাথলিকরা 'সাঙ্ক্‌ট্‌', 'সাধু' বা 'মহাত্মার' পদে তুলিবার জন্য তুমুল আন্দোলন চালাইতেছে। খৃষ্টভক্ত ক্যাথলিকদের বিশ্বাস—কার্লের মত ধর্ম্মভীরু আদর্শ-চরিত্র নরপতিকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া অষ্ট্রিয়ান নরনারী মহাপাতক করিয়াছে। তাহারই ফলে অষ্ট্রিয়ায় দুর্গতি। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কার্লকে মহাত্মার গদীতে বসাইতে হইবে। ডাক্তার জাইপেল হইতেছেন পেশায় পুরোহিত। জাইপেলের সাহায্যেই কার্লের স্বপক্ষে ঘোঁটমঙ্গল চালানো হইতেছে।

পাঁচন-মাহাত্ম্যে "নাটুর-কুর"

(১)

কিষাণদের ছেলে-মেয়েরা পাহাড়ে-পাহাড়ে 'আর্ণিকা' ফুল সংগ্রহ করিতেছে। ফুলগুলা হল্‌দে রঙের,—অনেকটা গ্যাঁদা ফুলের মত। ফুলে কোন গন্ধ নাই।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এই ধরণের ফুল, লতাপাতা, শিকড় ও অন্যান্য গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া পল্লীবাসীরা 'টে' অর্থাৎ চা তৈয়ারী করে। অসুখ-বিসুখ হইলে এই সব গাছগাছড়ার চা পান করাই আল্পস্‌বাসীদের দস্তুর। ইহারা ডাক্তার-কবিরাজের ধার ধারে না। বড় জোর যে সকল ডাক্তার 'নাটুর-কুর' বা প্রাকৃতিক চিকিৎসার পক্ষপাতী, আল্পসের কিষাণ নর-নারী একমাত্র সেই সব ডাক্তারেরই মক্কেল হয়।"

বুঝিতে হইবে যে, 'আয়ুর্ব্বেদ,' 'হাকিমী', 'পাঁচন'-মাহাত্ম্য, ফল-মূলের 'দ্রব্যগুণ' অষ্ট্রিয়ান (জার্ম্মাণ) পল্লীসমাজে আজও বাঁচিয়া আছে। ডাক্তার বাবু 'নব-বিধানে'র পাশ-করা চিকিৎসক। ইঁহার 'দাওয়াই-খানা'য় ওষুধপত্র বিক্রয় হয় নেহাৎ কম। এই জন্য 'হাতুড়ে' 'সেকেলে' কবিরাজদের উপর ইঁহার আক্রোশ দেখিলাম বেশী।

পাঁচন-মাহাত্ম্য স্থইটস্থাল্যাণ্ডের পল্লীতে-পল্লীতেও খুব চলে। জার্ম্মাণ সমাজে 'নাটুর-কুর' অর্থাৎ গাছ-গাছড়ার মেয়েলী চিকিৎসা এখনও সুপ্রচলিত। বনজঙ্গল, পাহাড় এবং দরিয়ার কিনারা হইতে ফুল, শিকড়, পাতা কুড়াইয়া আনা এই সকল দেশে একটা খেয়াল বা সখ বা বাতিক মাত্র নহে। অনেক স্থলেই এ সব কাজ স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ধনাগমের উপায়।

"উড়ো-পাখী"

লাণ্ডেকের পথে এক দল ছোকরার সঙ্গে দেখা হইল। বয়স ইহাদের বার হইতে বাইশ। প্রায় প্রত্যেকের ঘাড়ে ১৫—২০ সের ওজনের ন্যাপ-স্যাক ভরা মাল। জানু পর্য্যন্ত প্যাণ্ট,—পায়ে মোটা বুট আর ডবল মোজা। শার্টের গলা খোলা। জার্ম্মাণ নাট্যকার শিলার এই

'যৌবন আন্দোলনে' নবজীবন লাভ করিয়াছে। দেখা হইবামাত্র ইহারা বলিয়া উঠিল—'হাইল।' এই শব্দের আসল অর্থ 'স্বাস্থ্য।' খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদি আন্দোলনে যে সকল তরুণ-তরুণী বেশী ঝোঁক দেয়, তাহারা এই বোল আওড়াইয়া পরস্পর অভিবাদন করে। চেনা-অচেনা প্রভেদ করা হয় না।

ষ্টেশন-মাষ্টারের ঝী তাহার মনিবের ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া বাবুর সঙ্গে পাহাড়-পরিক্রমায় বাহির হইয়াছে। এই তরুণদলের কথায় সে বলিল,—"ইহারা ভিয়েনা হইতে আসিতেছে। প্রতিবৎসর টোবাভিল পাহাড়ের এক কুঁড়েতে গ্রীষ্ম কাটানো ইহাদের অভ্যাস। প্‌ফাড্‌-ফিণ্ডার বা পথপ্রদর্শক এই দলের নাম।" টোবাভিল পাহাড় হাজার তিনেক ফুটের অধিক উঁচু।

যৌবন আন্দোলনের তরুণ-তরুণীরা নানা নামে পরিচিত। কোনো কোনো দলের নাম 'ভাণ্ডার-ফোগেল' অর্থাৎ 'উড়ো-পাখী।'

গ্রিন্‌সের পথে এক দল প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া শন্‌শন্‌ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইহারা পার্সাইয়ার শিখরের যাত্রী। সে প্রায় নয় হাজার ফুট উঁচু। 'আউগস্‌বুর্গার হিট্টেতে' রাত্রিবাস করা হইবে। প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে এই কুটীর অবস্থিত। লাঠি, কুড়াল, দড়ি-দড়া সব সরঞ্জামই দলের অঙ্গে শোভিতেছে।

পল্লী-পরিবারের এক ছটাক

এক পল্লীর চৌরাস্তায় কয়েক জন বুড়ীর কথোপকথন চলিতেছে। 'গ্রিস্‌ গট্‌' অর্থাৎ 'বিষ্ণবে নমঃ' বলিয়া জটলায় যোগ দেওয়া গেল। কাঠের এক চৌবাচ্চায় কলের জল গড়াইয়া পড়িতেছে। একটা গোটা গাছ চিড়িয়া খুদিয়া চৌবাচ্চাটা তৈয়ারী করা হইয়াছে। কলের

ধরণের 'জলদেবতা' টিরোলের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই খৃষ্টান 'আধ্যাত্মিকতার' সাক্ষী।

বুড়ীরা জল তুলিতেছে অথবা স্যালাড-শাক ধুইয়া পরিষ্কার করিতেছে। একজনকে বিশেষ কিছু দুঃখিত দেখিলাম। কোন্ দেশে আমার বাড়ী ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসার পর বুড়ী বলিল—"কি হে বাপু, তোমাদের দেশেও কি আমাদের এখানকার মত মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া বুড়ী মাকে ঘরবাড়ী হইতে খেদাইয়া দেয়?"

সহানুভূতির সহিত আর এক বুড়ী বলিল,—"আহা, বিধবা বুড়ীর কি কষ্ট! সম্মুখের ভাল ভাল ঘরগুলা ইহার মেয়ে আর জামাই দখল করিয়া বসিয়াছে। আর পিছন দিককার গোহাল-ঘরের এক কোণে বুড়ীকে কালাতিপাত করিতে হইতেছে।"

বুড়া চাষীর সঙ্গে ছিপে মাছ ধরিতে বাহির হইলাম। পাহাড়ী নদীকে বলে 'বাখ'। বাঙ্গালীর ধারণায় ইহা নদী নয়,—কেন না, জলরাশি শুইয়া গড়াইতেছে না। অথচ জলপ্রপাত বা ঝরণাও ইহাকে বলা চলে না। কেন না, উঁচু জায়গা হইতে শূন্যে লাফাইয়া পড়াও দেখিতেছি না। জল ছুটিতেছে বিপ্লবী আত্মার মত দিগ্‌বিদিক্‌হীন-ভাবে, দাঁত কিড়মিড় করিতে-করিতে। সাদা ফেনার উচ্ছ্বাস ছড়াইতে ছড়াইতে পাগলের মত ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া অনতিপ্রশস্ত জলের চাপ স্তরে স্তরে নামিতেছে। গর্জ্জন অতি ভয়ঙ্কর।

ডাঙ্গার উপর—'বাখে'র কিনারায় চাষীর ছোট্ট এক টুকরা বাগান। তরীতরকারী,—কড়াইশুঁটি, আলু, স্যালাড, শিম সবই গোটা পরিবার সারা বৎসরের জন্য এই জমিটুকু হইতেই লাভ করে।

মাথার উপর বাঁয়ে টোবাভিল পাহাড়ের ঘাড় আর ডাইনে পার্সাই-য়ার চুড়া। তিন ঘণ্টায় মাছ উঠিল ছয়টা। এইগুলাকে বলে 'ফোরেল।' ভাজাইয়া খাওয়া গেল। অতি উত্তম।

"ধামা-মুখী" মার্গারেট

গ্রিন্‌স্ পল্লীর লাল মন্দির আর কেওরাতলা অনেক দূর হইতেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সন্ধ্যাকালে এই মন্দিরের আবহাওয়ায় পায়চারি করিতেছি। টোবাভিল পাহাড়ের তরুশিরে সূর্য্যের আলো এখনও ঝকঝক করিতেছে। পার্সাইয়ার পাহাড়ের 'করাত'গুলা অতি বিকট ধূসরবর্ণে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহারই অনেক নীচে,—তরুহীন মরু-বুকে 'আউগসবুর্গার হিট্টে' নামক পর্য্যটকদের কুটির বা সরাই দেখিতে পাইতেছি। অদূরে বিপুল পাইন-মণ্ডিত পাহাড়ী গলির আবেষ্টনে ত্রিজানাপুল বৈকালী রৌদ্রে সমুজ্জ্বল। প্রকৃতির সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিংয়ের অপূর্ব্ব আপোষ দেখিতে দেখিতে চিত্ত পুলকিত হইতেছে।

এই গাঁয়ে পুরাতন বাড়ীঘর যত দেখিতেছি, তত বেশী টিরোলী তালের আর কোথাও দেখি নাই। রোমান আমলের একটা পাথরের পুলও দেখা গেল। এইখানে এক মিস্ত্রীর দোকানে প্রবেশ করিলাম। তাহার স্ত্রীও ছেলে কোলে করিয়া খাড়া। গরু-ছাগলের গলার ঘণ্টা তৈয়ারী হইতেছে। স্থইটস্যার্ল্যাণ্ডের পল্লীতে পল্লীতে গ্রিন্‌সের ঘণ্টা চালান হইয়া থাকে।

একটা বাড়ী দেখিবার জন্য পর্য্যটক মাত্রই চেষ্টা করে। ভিতরে যাওয়া গেল। বাড়ীওয়ালীর নিকট শুনিলাম,—এই ভবনে মধ্যযুগের টিরোলরাণী মার্গারেট বাস করিতেন। তিনি ছিলেন 'জাঁহাবাজ' মহিলা। 'মাউল-টাউশ' পদবী তাঁহার কপালে জুটিয়াছে। 'বোতলমুখী', 'হাঁড়ীমুখী', 'চিরুণদাঁতী' ইত্যাদি বলিলে যে সকল সদ্‌গুণ বুঝা যায়, 'মাউল-টাউশ' বা 'ধামা-মুখী'র মতলবও তাই।

বাড়ীটা গ্রীষ্মভবনরূপে ব্যবহৃত হইত। অনেক অত্যাচার-কাহিনীর গল্প শুনা গেল।

সেকালের টিরোল বুঝিবার পক্ষে গ্রিন্‌স প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিকট মূল্যবান্ পল্লী। পথগুলা নেহাৎ অপরিষ্কার। নোংরামি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন, এটা অষ্ট্রিয়ান মণ্ডলে ইতালিয়ান জীবনস্পন্দনপূর্ণ এক দ্বীপ।

সাধু-পূজায় টিরোলবাসী

'সাঙ্ক্‌ট্', সাধু, বা মহাত্মার নামে পল্লীর সংখ্যা গণ্ডা-গণ্ডা। বনের ভিতর, পল্লীপথে, পাহাড়ী সড়কের উপর 'কাপ্পেলে' বা চ্যাপেল অর্থাৎ দেবালয়শ্রেণীর ছোট বাস্তু বোধ হয় যেন অগণিত। কাঠের অথবা পাথরের গড়া এই দেবস্থানসমূহে যীশু বা মেরীর চিত্র অথবা স্থাপত্য বিরাজ করে। এইগুলার সম্মুখীন হইবামাত্র পথিকরা হাঁটু বাঁকাইয়া প্রণাম করে।

এ দিকে মন্দিরহীন পল্লী একটাও নাই। যে কোনও পাহাড়ে হাঁটিতে হাঁটিতে উপত্যকার লহরের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগির্জ্জার চূড়ার লহর উপভোগ করিতে হয়। মন্দিরের ভিতর কোন কোন ছবিতে "কালিয়-দমন" মেরীর মূর্ত্তি প্রত্যেক হিন্দুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অধিকন্তু সিংহ-বাহন, মেষবাহন বা অন্যান্য পশুবাহন "সাঙ্ক্‌ট্" বা অবতারের চিত্রও দেখিতে পাই। নরনারীরা যদি কোট-প্যাণ্ট-ঘাগরা-পরা না হইত, তাহা হইলে ইয়োরোপের ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগকে হিন্দু বলিয়া ধরিয়া লওয়া অতি স্বাভাবিকই বিবেচিত হইত।

মিট্রেনভাল্ড-রেলপথ

(১)

ইন-তালকে ইতালির স্যগানা উপত্যকা এবং আদিজে উপত্যকার

মতই সুপ্রশস্ত এবং ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা বোধ হইতেছে। প্রত্যেক ছটাক জমি চষা দেখিতেছি।

ইন্‌স্‌ব্রুক শহর হইতে এই উপত্যকার সৌন্দর্য্য ও শস্যগৌরব পূরা-পূরি ধরিতে পারা যায় না। ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে পার্টেন-কির্খেন নামক ব্যাভেরিয়ান স্বাস্থ্যনিকেতনে যাইবার জন্য যে রেলপথ আছে, সেই রেলপথের পল্লীতে-পল্লীতে আড্ডা গাড়া প্রয়োজন। "মিট্টেন-ভাল্ড পথ" নামে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় রেলওয়ে পরিচিত।

জনপদটা ইন্‌স্‌ব্রুকের উত্তরে অবস্থিত। ইন্‌দরিয়ার ডাইনে সাঙ্ক্‌ট্‌ আন্টোনের পথ। মিট্টেন-ভাল্ড পথ বাঁয়ে। সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ ফুঁড়িয়া নিম্নস্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে উঠিতে অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণির সীমান্ত-প্রদেশে পৌঁছিতে হয়। ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে শার্নিট্‌স্‌ পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়ার (টিরোলের) সীমানায় পৌঁছিতে মাত্র ঘণ্টা দুই লাগে। শার্নিট্‌স্‌ হাজার তিনেক ফুটের অপেক্ষাও বেশী উঁচু। ইন্‌স্‌ব্রুক মাত্র হাজার দেড়েক।

বিদ্যুতের বলে গাড়ী ছুটিতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর মোসাফির। কামরা-ভরা পুরুষ-নারী প্রায় সকলেই "জোম্মার-ফ্রিশ্‌লার" বা গ্রীষ্ম-পর্য্যটকের বেশে। কেহ টিরোলের এক অঞ্চলে কিছু কাল কাটাইয়া অপর অঞ্চলে যাইতেছে। সকলের টুপীতেই হয় এডেলভাইস না হয় প্রুণেল, না হয় আল্পেন-রোজ।

আণ্ড্রেয়াস হোফার যে ধরণের গ্যালিস্‌ বা সাস্‌পেণ্ডার দিয়া প্যাণ্ট আঁটিতেন, সেই ধরণের সাস্‌পেণ্ডার প্রত্যেক পুরুষেরই বুকে দেখিতেছি। মেয়েদের পরণে ঘাগরা আছে বটে, কিন্তু এটা "অধিকন্তু ন দোষায়।" জিমনাষ্টিকের প্যাণ্টই মেয়ে- পর্য্যটকদের প্রধান পোষাক। ঘাগরাটাকে যখন-তখন খুলিয়া "ওভার-কোটে" বা "কেপে" পরিণত করা সম্ভব। চলাফেরার পক্ষে ইহাই যারপর নাই সুবিধাজনক, পাহাড়ে উঠিবার

(২)

এক ব্যক্তি "ৎসিথ্যার" বাজাইতেছে। ব্যবসায়ে ইহার ধনাগম হয়। দড়া-দড়ি তৈয়ারী করার কায। এই ব্যক্তির স্ত্রীপুত্রেরা জে-ফেল্ড পল্লীতে গরমের ছুটী কাটাইতে আসিয়াছে। তাহাদিগকে ইন্‌সব্রুকে লইয়া যাইবার জন্যই সম্প্রতি এই ব্যক্তি মোসাফির।

গাড়ী হইতে ইন্-উপত্যকার দৃশ্য অতি মনোরম দেখায়। শস্য-শ্যামল তালটা সমতল হইয়া আছে। তাহার প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে আর একটা আধা-সমতল আধা-ঢালু তাল দেখিতেছি। এই উচ্চস্তরের তালেও চাষ-আবাদের ফাঁকে ফাঁকে লাল ছাদওয়ালা ঘরবাড়ী এবং লাল মন্দির-চূড়া ঢেউ কাটিতেছে। একদম মাথার উপরে খাড়া আছে টুবাই তালের গিরি-শৃঙ্গসমূহ।

ইন্‌সব্রুক হইতে উত্তর-পশ্চিমে চলিতেছি। ৎসার্ল-ষ্টাইন, বিবার-ভিয়ার ইত্যাদি পল্লীর আল্‌প্‌-পাহাড় স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের খনিবিশেষ। টিরোলের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই সকল অঞ্চলেও ঘরবাড়ীগুলা অনেকটা ভারতীয় 'বাংলো', চৌআরি, আটচালা ইত্যাদির মত দেখায়। সাদা দেওয়ালের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে,—তিনসারি জানালা।

ডাইনে কার্ভেণ্ডল এবং বাঁয়ে ভেট্টারষ্টাইন পর্ব্বতমালা। মধ্যবর্ত্তী 'পাস,' গিরিপথ বা উপত্যকায় শার্নিট্‌স্। কুলকুল করিয়া একটা জলের রেখা বহিয়া যাইতেছে ব্যাভেরিয়ার দিকে। মিউনিক, লাণ্ডস্‌হুট ইত্যাদি শহর যে দরিয়ার উপর অবস্থিত, এইখানেই তাহার সূত্রপাত। নাম ইজার। মিট্টেনভাল্ড ষ্টেশনে পাসপোর্ট দেখাদেখির পালা। জার্ম্মাণ মুলুক এইখানে সুরু। সহাস্যে ষ্টেশন-মাষ্টার সজোরে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—'আউফ্ ভীডার জেয়েন ইন বের্লিন' (আবার দেখা হবে বার্লিনে)।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জার্ম্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ

(১৯২৪)

উন্নতির মাপকাঠি

(১)

ভারতে আজও নিম্নশিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হয় নাই। ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্র এবং জাপানেও সে আজ কাল পঞ্চাশ বৎসরের পুরাণা জিনিষ। এই সকল দেশের লোকেরা এখন উচ্চশিক্ষাকেই অবৈতনিক এবং কথঞ্চিৎ সার্ব্বজনিক করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছে।

জার্ম্মাণিতে একমাত্র চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠশালায় গেলেই কোনো বালক-বালিকা বিদ্যাপীঠের আবহাওয়া ছাড়াইতে অধিকারী নয়। তাহারা যে-কোনো কারখানায় বা আফিসে নকৃরি সুরু করুক না কেন, সেইখানেই তাহাদিগকে আরও চার বৎসরকাল লেখাপড়ায় কাটাইতে বাধ্য করিবার জন্য আইন আছে। এই উপায়ে জার্ম্মাণির মজুর-কিষাণ সমাজকে জগতের সঙ্গে টক্কর দিয়া জীবনসংগ্রামে জয়ী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বর্ত্তমান জগৎ কতখানি আগাইয়া আসিয়াছে একমাত্র এই তথ্য হইতেই ভারতবাসীর কথঞ্চিৎ মালুম হইবে। ভারতবর্ষে আজ যদি প্রত্যেক বালক-বালিকাকে সার্ব্বজনিক শিক্ষার অধিকারী করিয়া দেওয়াও হয় তাহা হইলেও দুনিয়ার তুলনায় আমরা প্রায় যে-কে সেই থাকিয়া যাইব, সন্দেহ নাই।

দুনিয়া চলিতেছে বরাবর সোজা—একই মাপকাঠির ধাপে-ধাপে। যে-সকল জাতি আমাদিগকে এতদিন পঞ্চাশ বৎসর পেছনে ফেলিয়া

চলিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে পাক্‌ড়াও করিবার সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে খুবই কম।

(২)

আজকাল যুবক ভারতে শিল্প সম্বন্ধে, ফ্যাক্টরি সম্বন্ধে, রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে, শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে, পল্লীসেবা সম্বন্ধে, মজুর-সঙ্ঘ সম্বন্ধে যে সকল বাণী, আদর্শ, বোলচাল বা বুথ্‌নি চলিতেছে এইগুলা ইয়োরামেরিকান এবং জাপানী চিন্তায় "সেকালের" কথা। ঐতিহাসিক স্তর বা যুগ-বিন্যাসের হিসাবে এইগুলাকে মান্ধাতার আমলের বা প্রাগৈতিহাসিক কালের বস্তুরূপে নির্দ্দেশ করা চলে। কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক,—জীবনের সকল বিভাগেই আমরা দুনিয়ার বহু পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতেছি।

ভারতে এক্ষণে "সর্ব্বপ্রথম" লোহার কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। "সর্ব্বপ্রথম" রাসায়নিক, "সর্ব্বপ্রথম" এঞ্জিনিয়ার, "সর্ব্বপ্রথম" শিল্পবীর, "সর্ব্বপ্রথম" মজুর-নায়ক ইত্যাদি ধরণের লোক ভারতীয় সমাজে এখনো চলাফেরা করিতেছেন। এইখানেই আমাদের শৈশবাবস্থা হাতে-হাতে ধরা পড়িতেছে।

জার্ম্মাণিতে দেখিতেছি ব্যাঙ্ক-বিকাশের ভরা যৌবন, ফ্যাক্টরিগঠনের প্রৌঢ়াবস্থা, মজুরসঙ্ঘের পরিণত বয়স—সর্ব্বত্রই বিপুলতা, জটিলতা, ঐশ্বর্য্য। এই কারণেই ভারতসন্তান জার্ম্মাণ সমাজের ধরণ-ধারণ দেখিয়া হাবুডুবু খায় আর হা-হুতাশ করে। এই জীবনের কোনো তথ্য সহজে আঁটিয়া উঠা ভারতীয় পর্য্যটকের পক্ষে অসাধ্য।

বর্ত্তমান জগতের "সেকাল"

(১)

বিজ্ঞানবীর ইত্যাদির যুগ গিয়াছে। বার্লিনের যে কোনো মহলে আলাপ-পরিচয় করিলে কতকগুলা নাম আপনা-আপনি হাজির হয়।

নব্যশিল্পের প্রবর্ত্তকরূপে বয়েট (১৭৮১-১৮৫৩) জার্ম্মাণির এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, পূর্ত্ত-পত্রিকা, শিল্প-শিক্ষা ইত্যাদি সকল বিভাগে আজও পূজা পাইয়া থাকেন। বয়েট ছিলেন গ্যেটের আমলের লোক। কবিবরের সঙ্গে তাঁহার লেন-দেনও চলিত।

বর্ত্তমান-জগৎ জার্ম্মাণিতে দেখা দিয়াছে কোথাও-কোথাও বংশ-পরম্পরাক্রমে। তিন-চার পুরুষ ধরিয়া রুর-অঞ্চলের ক্রুপ-পরিবার লোহা-ইস্পাতের কারখানায় লাগিয়া আছে। আলফ্রেড ক্রুপের আমলে (১৮১২-১৮৮৭) জার্ম্মাণির কৃতিত্বে বনিয়াদি ইংরেজ কর্ম্মকারেরা চঞ্চল হইতে থাকে। ফ্রান্সের সঙ্গে প্রুশিয়ার লড়াইয়ের যুগ অর্থাৎ জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠনের কালটা মনে আনিতে হইবে।

বার্লিনের বর্জিশ-পরিবার শত বৎসর ধরিয়া রেলওয়ে-শিল্পের বাজার চালাইতেছে। এই লাইনের প্রবর্ত্তক (১৮০৪-১৮৫৪) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক। বর্ত্তমান বংশধরেরা ক্রুপের সমানই ইজ্জৎ পাইয়া থাকে। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে কারবারে আজকালকার বর্জিশ অগ্রণী।

তড়িতের শিল্পে জীমেন্স-পরিবার বার্লিনকে জগৎপ্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বহু ভারতবাসী জীমেন্স-শুকার্ট কারখানা দেখিয়া গিয়াছেন। ভ্যার্ণার ফোন জীমেন্স (১৮১৬-১৮৯৩) বিজ্ঞানবীর হেল্ম-হোল্ট্‌সের (১৮২১-৯৪) সমসাময়িক।

(২)

রাইন-রুর অঞ্চলে একাধিক ক্রুপের কর্ম্মক্ষেত্র দেখিতে পাই। হুগো ষ্টিন্নেসের নাম বোধ হয় ক্রুপকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ধাতু ও খনির কাজ, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি এবং জাহাজ তৈয়ারী এই সকল বিভাগে

ষ্টিন্নেসকে ফরাসীরা রুরের রাজা বলিয়া থাকে। জার্ম্মাণির আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বোধ হয় ষ্টিন্নেসের সমান প্রভাবশালী লোক আজকাল বেশী নাই। ষ্টিন্নেসও পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই শিল্প-জগতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন।

এই ধরণের আর এক ক্রুপ, বজিশ বা ষ্টিন্নেসের নাম আউগুষ্ট টিস্‌সেন। গত বর্ষের রুর-হাঙ্গামায় ফরাসীরা যে সকল জার্ম্মাণ শিল্পপতিকে নির্য্যাতন করিয়াছে তাহার ভিতর ক্রুপের নাম জগতের সকলেই শুনিয়াছে। টিস্‌সেন শিল্পী-মহলে আর রাষ্ট্রিক-মহলে পেশ বেশ জবরদস্ত লোক। জার্ম্মাণরা টিস্‌সেনকে বর্ত্তমান ধন সম্পদের মস্ত খুঁটা বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত।

(৩)

বর্ত্তমান জগতে আর মান্ধাতার আমলে এই খনি, কয়লা, লোহা. ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, রেল, তড়িং ইত্যাদি লইয়াই প্রধানতঃ যা-কিছু প্রভেদ। কাজেই এই সকল লাইনে যাঁহারা প্রবর্ত্তক, গুরুস্থানীয় অথবা সংগঠনকর্ত্তা তাঁহারাই নবীন জীবন-বেদের মধুচ্ছন্দা, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, বা ঐ পদস্থ কিছু।

রাজা-রাজড়াদের নামও কীর্ত্তি-কলাপ, ধর্ম্ম-মন্দির ও সাধু-সন্তদের মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয়ক "কিচ্ছা" ইতিহাস-কেতাবে পড়া যায়। মিউজিয়াম, চিত্রশালা, সংগ্রহালয়, গ্রন্থাগার ইত্যাদিতেও এই শ্রেণীর তথ্য সাজানো-গুছান রহিয়াছে দেখিতে পাই।

এইগুলার কিম্মৎ কমাইবার প্রয়োজন আছে কি না জানি না। বোধ হয় নাই। এই সবও চাই। কিন্তু মান্ধাতার আমলের আগুন, কৃষিকার্য্য, বয়ন ইত্যাদির আবিষ্কার হইতে আজকালকার রেডিও, জেপেলিন, টেলিফোন অবিষ্কার পর্য্যন্ত মানবজাতির সুখ

সকলগুলাই মানুষের "পূজাস্থান"। এই সকল আবিষ্কারের কাহিনী, আবিষ্কারকের জীবন এবং আবিষ্কার-আবিষ্কারকের পীঠস্থান অর্থাৎ ফ্যাক্টরি, কারখানা, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্রগুলা অন্যান্য "ঋষি", মন্দির এবং প্রাসাদের সঙ্গে-সঙ্গে সমান ইজ্জৎ পাইবার যোগ্য। যে-ব্যক্তি বা যে-জাতি এই-কথাটা বুঝিতে গিয়া গোঁজামিল চালাইতে চেষ্টা করিবে, সেই-ব্যক্তি ও সেই-জাতি "প্রাগৈতিহাসিক" যুগেই আরও কিছু কাল অনর্থক জীবন কাটাইতে বাধ্য হইবে। সভ্যতা জরীপ করিবার সময়ে এই কথাটা ভুলিলে চলিবেনা।

যৌবন-আন্দোলন

জার্ম্মাণরা মরে নাই। ইহাদের শীঘ্র মরিবার সম্ভবনাও নাই। ইহাদের মাথা সজোরে চলিতেছে। জার্ম্মাণ নর-নারী নিত্য-নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগতের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছে। প্রতিদিনই যুবক জার্ম্মাণি নয়া-নয়া আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছে। নতুন তেজের ফোয়ারা সর্ব্বদাই জার্ম্মাণ সমাজে ছুটিতেছে। পরাজিত জার্ম্মাণির মহলে-মহলে মরা হিন্দু-মুসলমান-চীনা-সুলভ বহু দুর্ব্বলতা এবং চরিত্র-দোষ দেখা যাইতেছে সত্য। কিন্তু ইহাদের মাথা অন্যান্য মরা-জাতির মাথার মতন পচিয়া যায় নাই। এইজন্যই ফরাসীরা-ইংরেজেরা জার্ম্মাণদিগকে হারাইয়াও এখনো ইহাদেরই ভয়ে-ভয়ে চলিতেছে! জার্ম্মাণদের যৌবন-আন্দোলন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর সুইস্-ফরাসী রুসো-প্রবর্ত্তিত প্রকৃতি-পূজার এবং রোমান্টিকতার সুরে গাঁথা। এই আন্দোলনের ফলে ছেলেমেয়েরা, যুবক-যুবতীরা পাখীর মতন হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতে চাহে; বস্তুতঃ "ভাণ্ডার-ফোগেল" অর্থাৎ 'উড়ো-পাখী' নামে ইহারা পরিচিত। স্বাধীনতা, বন-জঙ্গলে ঘোরা, শরীরচর্য্যা, চরিত্র-রক্ষা,

দুনিয়াকে একটা নতুন-কিছু দিয়া ছাড়িবে, এই ইহাদের সাধ। এই ভাবুকতায়ই ভাঙা-গড়া সম্ভব হয়।

জার্ম্মাণির ব্যায়াম-বিশ্ববিদ্যালয়

(১)

যৌবন-আন্দোলনের ঢেউ চলিতেছে ১৯০৫ সাল হইতে। বার্লিনের ষ্টেগলিটস্-পাড়ায় ইস্কুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এক ভাবুকদল নবজীবনের সূত্রপাত করে। ফোষ্টার প্রণীত "য়ুগেণ্ড-বেভেগুঙ" (যৌবন-আন্দোলন) গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাই। ছেলে-ছোকরারা অথবা ভাবুকেরা যাহা আরম্ভ করে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা বাড়াইয়া তুলিয়াছে অনেক পথে। একটা পথ ব্যায়াম-শিক্ষার দিকে। বার্লিনের ষ্টাডিয়োন-মাঠে "ড্যয়চে হোখ্‌শুলে ফ্যির লাইবেস্-য়্যিবুঙ্গেন" (শারীরিক ব্যায়ামের জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়) তৈয়ারী হইয়াছে। শার্লোটেনবুর্গের "টেখকনিশে হোখশুলে" যে-দরের এঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, "হাণ্ডেলস হোখশুলে" যে দরের বাণিজ্য-বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যায়াম-বিষয়ক হোখশুলেটাও সেই দরের প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ এই কেন্দ্র একটা লাঠিখেলার বা কুস্তিকসরতের কিংবা টেনিস-হকির আখাড়া মাত্র নয়। পূরা তিন বৎসরের কুচকাওয়াজ, খেলাধুলা, লেখাপড়া দস্তুরমতন চলে। ১৯২০ সালে এইটার গোড়াপত্তন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতার নাম ডাক্তার বিয়ার।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা শেষ করিয়া জার্ম্মাণরা দেশের সর্ব্বত্র ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হয়। মেয়েরাও এইখানে শিখে এবং পরে শিক্ষয়িত্রী হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাক্টরিতে মজুরদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। সেইসকল কারখানায়ও এই নতুন ধরণের

জার্ম্মাণিতে ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য সরকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছে। সেইসকল চিকিৎসকের পদের জন্য ব্যায়াম-কলেজের ছাত্র বাহাল করা সুরু হইয়াছে। প্রত্যেক খেলাধূলার পরিষদে পরিচালকদিগকে ব্যায়াম-কলেজের বিদ্যায় পাকা করিয়া তোলা হইতেছে।

অধিকন্তু জার্ম্মাণ-সমাজে ব্যায়াম, দৌড়্‌ধাপ ইত্যাদির জন্য বহুসংখ্যক আখড়া আছে। তাহাছাড়া এইসকল বিষয়ে মাসিক, সাপ্তাহিক এবং অন্যান্য পত্রিকাও চলে। ব্যায়াম-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই দুইদিকেই ব্যায়ামের ওস্তাদ লোককে নায়ক, সম্পাদক বা লেখকরূপে বাহাল করিবার সুযোগ জুটিয়াছে।

(২)

দুনিয়ার লোকের সঙ্গে জার্ম্মাণ নরনারীকে টক্কর দিতে হইবে, সন্দেহ নাই। তাহাতে বিজয়ী হইবার জন্য অনেক-কিছু করিতে হইবে। ব্যায়ামের এই ব্যবস্থাটা দেখিয়া আবার মনে হইতেছে যে, জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ আজও যেন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই রহিয়াছে।

১৯২২-২৩ সালের শীতকালে বার্লিনের ব্যায়াম-বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৩৮ জন শিক্ষা পাইয়াছে। তাহার ভিতর ছাত্রীসংখ্যা ২২। বিদেশী ছাত্রও লওয়া হয়। সেই সময়ে ২৮ জন ছিল বিদেশী। কলেজটা পরিদর্শন করিতে যাইয়া তোকিওর এক জাপানীকে এইখানে ছাত্রভাবে দেখিয়াছি। এই ব্যক্তি জাপানী পুলিশ-বিভাগের লোক।

শিক্ষাপদ্ধতি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে কসরতের কাণ্ড। মামুলী জিম্‌নাষ্টিক ত আছেই। সাঁতার কাটা, দৌড়, যন্ত্রপাতির খেলা, বরফের উপর নানা-শ্রেণীর ক্রীড়া-কৌতুক, নৌকা-চালানো, বন-ভ্রমণ

বিভাগে স্বাস্থ্যতত্ত্বের সকল কথা। অস্থিবিদ্যা এবং শারীর-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, গা মালিশ করা (মাসাজ), খেলাধূলার ব্যায়াম, অস্ত্র-চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত।

তৃতীয় বিভাগ ব্যায়াম-শিক্ষা-বিষয়ক। চিত্তবিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান, দর্শন, পরীক্ষামূলক শিক্ষাতত্ত্ব, যৌবন-বিষয়ক চিত্তবিজ্ঞান, শিশুপালন এবং এই-ধরণের অন্যান্য বিদ্যা এই বিভাগে আলোচিত হয়। চতুর্থ বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীরা শাসন-বিষয়ক বিদ্যা অর্জ্জন করে। সমিতি, পরিষৎ, গোষ্ঠী, আখ্ড়া, খেলার মাঠে, খেলার সংবাদপত্র, ব্যায়ামের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গ্রন্থশালার পরিচালনা, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যা এই বিভাগের সামিল।

(৩)

ডাক্তার বিয়ার্ বলিতেছেন—"আমাদের এখানে বুলগার, রুশ ইত্যাদি জাতীয় লোক শিখিতে আসিতেছে। ভারতসন্তানকেও সাদরে গ্রহণ করিতে রাজি আছি।"

বিয়ার অস্ত্রচিকিৎসায় জার্ম্মাণির নং১। অস্ত্র-ঘটিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে ইঁহার আবিষ্কার আছে। ক্ষয়রোগ-সম্বন্ধে বিয়ারের অনুসন্ধান ও চিকিৎসাপ্রণালী সুপ্রসিদ্ধ। শরীরের হাড়, মাংসপেশী ইত্যাদি কোনো উপায়ে নষ্ট হইয়া গেলে সেই সবের জীর্ণোদ্ধার বা পুনর্গঠনের কাজেও ইঁহার যশ আছে। চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞেরা বিয়ারের কৃতিত্ব বুঝিতে সমর্থ। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত আছেন।

বিয়ারের সঙ্গে কোনো ভারতীয় চিকিৎসক বা চিকিৎসা-ছাত্র এখনো বোধহয় কাজ করেন নাই। বার্লিনের অন্যান্য বড়-বড় ডাক্তারদের দু'চারজন বিগত দুই-বৎসরের ভিতর কোনো কোনো ভারত-সন্তানের সংস্পর্শে আসিয়াছেন।

মহিলা-পরিষৎ

জার্ম্মাণ-জাতির অর্থাৎ জার্ম্মাণ-ভাষাভাষীর বহু নরনারী আজকাল ইয়োরোপের নানা-দেশে পরাধীন। তাহাদিগকে এই পরাধীনতার ফলে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। এইসকল পরাধীন এবং পরপীড়িত জার্ম্মাণদের জন্য জার্ম্মাণির জার্ম্মাণরা একটা পরিষৎ কায়েম করিয়াছেন।

এই পরিষদের স্ত্রীবিভাগও বেশ করিৎকর্ম্মা। জার্ম্মাণ নারী-সমাজের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি পরিষদের তদ্‌বির করিয়া থাকেন। শ্রীমতী এল্‌জে ফ্রোবেনিয়ুস বলিতেছেন,—"দুনিয়ার যত দেশে জার্ম্মাণ ভাষা-ভাষী লোক বসবাস করিতেছে তাহারা যে জার্ম্মাণ-সমাজ ও সভ্যতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এই জ্ঞান জার্ম্মাণির নারী-মহলে প্রচার ও বদ্ধমূল করা আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই-সম্বন্ধে লেখা এবং বক্তৃতা করা ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য আমার সময় নাই। পূর্ব্বে আমি থিয়েটার এবং নাট্য-সাহিত্যের সমালোচনায় কলম ধরিতাম। গ্যেটে-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ এরিখ্‌ স্মিড বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গুরু ছিলেন।"

এইধরণের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য জার্ম্মাণিতে নানা-প্রকার নারী-সমিতি আছে। পার্লামেণ্টের মেম্বর শ্রীমতী ক্লারা মেণ্ডে বলেন,—"সকল সমিতি আবার নিখিল জার্ম্মাণ নারী-পরিষদের বিভিন্ন শাখা-বিশেষ।" এই উপলক্ষ্যে বার্লিনের শ্রীমতী ফোন ফেলজেন্‌কে জার্ম্মাণির এবং বিদেশের অনেকেই চেনে।

গণতন্ত্রিনী ব্যয়মার

(১)

সার্ব্বজনিক কাজকর্ম্মে যে-সকল মহিলা অগ্রণী অথবা সময় খরচ **করেন** তাঁহারা প্রত্যেকেই লেখক ত বটেই, কেহ-কেহ পাকা বক্তাও

বটে। লেখক বলিলে একমাত্র সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় প্রবন্ধ বা কেতাবের কথাই মনে আনিতে হইবে না। খাঁটি সাহিত্য অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক এবং এইসকল বিভাগের সমালোচনায়ও অনেক জার্ম্মাণ "করিৎকর্ম্মা" নারী হাত দেখাইয়াছেন।

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণির সব-সে নামজাদা মহিলা কে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বোধ হয় শ্রীমতী গ্যর্ট্রুড্ ব্যয়মার জগতের নারী-মহলে এবং পুরুষ মহলেও নং ১ শ্রেণীর লোক বিবেচিত হইবেন। ইনি রাইখষ্টাগের (পার্লামেণ্টের) মেম্বর।

ব্যয়মার বিবেচনা করেন যে, রাজতন্ত্র জার্ম্মাণি হইতে চিরকালের মতন বিদায় লইয়াছে। জার্ম্মাণরা আর কোনো দিন কাহাকেও রাজতক্তে বসাইবে না। অর্থাৎ ইনি ঘোরতর গণ-তন্ত্রিণী। জার্ম্মাণ ভাষায় ইহাঁকে বলা হয় "ডেমোক্রাটিন" (সাম্যবাদিনী)।

ব্যয়মারের সঙ্গে "বাত্চিৎ" চালাইলে বুঝা যায় যে, ইহাঁর মর্ম্মকথা অতি সোজা। ইনি বলিয়া থাকেন—"নারীর দ্বারা পৃথিবীতে যদি কোনো মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাদিগকে পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া সমগ্র সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নারীরা যত বেশী এই সমগ্রতার লক্ষ্য অর্থাৎ গোটা দেশের কল্যাণ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিবে ততই মানব জাতির পক্ষে উন্নতির পথ বিস্তৃত হইতে থাকিবে।"

(২)

ব্যয়মার বলিলেন—"বিপ্লবের পর ভাইমারে যে পার্ল্যামেণ্ট্ বসে সেই পার্লামেণ্টেই আমার প্রথম রাষ্ট্রীয় হাতে-খড়ি। সে ১৯১৮-১৯ সালের কথা। বর্ত্তমান জার্ম্মাণির শাসন-পদ্ধতি তৈয়ারি করিবার কাজে বিশেষতঃ নারীজাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-সম্পর্কিত বিধান-সম্বন্ধে

আজকালকার জার্ম্মাণ-শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যয়মারের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হইল। ইনি বলিতেছেন, "পূর্ব্বে জার্ম্মাণিতে ইস্কুল-পাঠশালায় ছোটবড়, ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ ইত্যাদি জাতিভেদ চলিত খুব বেশী। বিদ্যাপীঠের আবহাওয়ায় যাহাতে এই ভেদ ভাঙিয়া যায় তাহার জন্য আমরা ডেমোক্রাটীক্ অর্থাৎ গণতন্ত্রী দলের মেয়ে-পুরুষেরা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি।"

১৯১৯ সালের ভাইমার-পার্ল্যামেণ্টে ব্যয়মার যে বক্তৃতা করেন তাহা জার্ম্মাণদের জীবনে এবং সমাজ-চিন্তায় যুগান্তর আনিয়াছে। বক্তৃতাটা "সোৎসিয়ালে আর্ণয়াকুঙ" অর্থাৎ সামাজিক নবযুগ বা সমাজে নবজীবন নামে স্বতন্ত্র ছাপা হইয়াছে। গণতন্ত্র এবং নারী-স্বাধীনতার তরফ হইতে এই রচনার দাম অনেক।

ব্যয়মারের বয়স সম্প্রতি পঞ্চাশ পার হইয়াছে। পার্ল্যামেণ্টে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পনর বৎসর ধরিয়া ইনি নানাপ্রকার মহিলাবিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আভ্যন্তরীণ বিভাগের সরকারী মন্ত্রণা-সভায় সচিবের কাজেও ইঁহার পরামর্শ লওয়া হইত।

সাহিত্যে ব্যয়মারের নাম সুপরিচিত। "গ্যেটের বান্ধবীকুল" (১৯০৯) সম্বন্ধে এবং "সাহিত্য ও সমাজে প্রসিদ্ধ মহিলা" সম্বন্ধে রচনা প্রথম-বয়সের লেখা। "দার্শনিক ফিখ্টে" নামক গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধনবিজ্ঞানের রাজ্যে, বিশেষতঃ নারী-সম্পর্কিত ধনদৌলতের কথায় ইঁহার বহু রচনাই আছে। "ডী ফ্রাও" (নারী) নামক পত্রিকা ইঁহার সম্পাদনে চলিতেছে। নারী বিষয়ক সমাজ-চিন্তা "ডী ফ্রাও ইন্ ফোল্ক্স্-ভির্টশাফ্ট্ উণ্ড ষ্টাট্স্লেবেন ড্যর গেগেনভার্ট" অর্থাৎ "বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে নারীর স্থান" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯১৫)।

"তবুও" বা "তাহা সত্ত্বেও" নামক কেতাব "যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর, কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর" ইত্যাদি ধুয়ায় অনুপ্রাণিত।

নয়া-পুরাণার সন্ধিক্ষণে যে-জার্ম্মাণি গড়িয়া উঠিতেছে গ্যর্ট্রুড ব্যয়মার তাহার এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ইনি বিবাহ করেন নাই।

ইহুদি কুমারী আলিসে সালোমন "সোৎসিয়ালে ফ্রাওয়েন-শুলে" (সমাজসেবার জন্য নারী-বিদ্যালয়) চালাইতেছেন। বার্লিনের এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যয়মারের সংশ্রব ছিল এবং এখনো আছে।

জার্ম্মাণ গিন্নীর আদর্শ

কুমারী ব্যয়মার এক তরফ হইতে জার্ম্মাণ সমাজ দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আর-এক তরফ হইতে জার্ম্মাণির ঠানদিদি-স্বরূপ বিধবা হেডভিগ হাইল জার্ম্মাণ নরনারীর অতি প্রিয়। ইনি সত্তর পার হইয়াছেন। ইঁহার স্বামী ছিলেন ফ্যাক্টরির মালিক। নর্ড ডয়চার লয়েড্ নামক জাহাজ-কোম্পানীর স্থাপয়িতা হাইলের পিতা।

হাইলকে লোকে বর্ত্তমান জার্ম্মাণির "প্রথম গৃহিণী" বলিয়া সম্মান করে। পার্ল্যামেণ্টে প্রবেশ না করিয়া কোনো নারী কত অসংখ্য উপায়ে নরনারীর উপকার সাধন করিতে পারে, হাইল তাহার উজ্জ্বল সাক্ষী। স্ত্রীশিক্ষা, নারী-সমিতি, শিশুপালন, গৃহচর্য্যা ইত্যাদি বিভাগে এমন কোনো জিনিষ নাই যেখানে হাইলের হাত অথবা নেতৃত্ব দেখিতে পাই না। ব্যয়মার, সালোমন ইত্যাদি বিদুষীরা নারী-মহলে "সমাজ-সেবক" তৈয়ারি করেন। হাইলের কাজ নারীকে গৃহস্থধর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া তোলা।

ইঁহার লেখা কেতাবগুলা দেখিলেই ব্যক্তিত্বটা ধরা পড়িবে। একখানা বইয়ের নাম "রান্নাবাড়ীর অ, আ, ক, খ", আর একটার নাম "হাণ্ড্-

বুখ্ ফ্যির হাউস্-আর্‌বাইট” (গৃহকর্ম্মের পঞ্জিকা)। লড়াইয়ের রান্নাবাড়ী হইতে দরিদ্র-পাড়ার পরিবারদের গিন্নীপনা পর্য্যন্ত কোনো-কিছুই হাইলের রচনাবলীতে বাদ পড়ে নাই।

ফ্রোবেলের এক আত্মীয়া ছিলেন হাইলের শিক্ষয়িত্রী। হাইল বার্লিনে ফ্রোবেল এবং পেষ্টালোট্‌সির নামে শিশুবিদ্যালয় কায়েম করিয়াছেন। শিশু-চিকিৎসালয়, যৌবন-ভবন, নারী-হাঁসপাতাল ইত্যাদি শ্রেণীর বহুবিধ প্রতিষ্ঠান হাইলের গড়া।

ঘরবাড়ীর সঙ্গে বাগান রচনা হাইলের উপদেশের অন্তর্গত। এই উপলক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শাকশব্জীতত্ত্ব, জীবজন্তুর জীবন-কথা ইত্যাদি প্রচার করিয়া বার্লিনের (এবং পরে জার্ম্মাণির) মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থ-মহলে হাইল জীবন আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

সামাজিক লেন-দেনের জন্য বহুবিধ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করাও হাইলের কৃতিত্বের মধ্যে দেখিতে পাই। এই সমুদয়ের ভিতর বার্লিনের “ল্যিৎসেয়ুম ক্লুব” জার্ম্মাণ মহিলাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোষ্ঠি। নারীদের সার্ব্বজনিক স্বার্থ পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেও ইনি অনেকগুলা সমিতি বা সঙ্ঘ কায়েম করিয়াছেন।

শিল্প-সাহিত্যে জার্ম্মাণ নারী

(১)

দরিদ্র জীবনের ছবি আঁকিয়া শ্রীমতী ক্যেটে কোল্‌ভিট্‌স্ প্রসিদ্ধ হইতেছেন। বার্লিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ইঁহার আঁকা মজুর-জীবন প্রদর্শিত হইয়াছে। কোলভিট্‌স্ চিত্রশিল্পে চরম মাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক। দারিদ্র্য, দুঃখ, নির্য্যাতন, অভাব, পীড়ন ইত্যাদি লইয়া ভাবুকতা করা ইঁহার তুলির ও রঙের অভ্যাস নয়।

নারী-মহলে ভাবুকতা ও রোমাণ্টিকতার জের চালাইতেছেন রিকার্ডা হুখ্। লাইপৎসিগের ইন্‌সেল্ কোম্পানী ইঁহার প্রকাশক। সাহিত্যের ইতিহাস-ঘটিত তথ্যসম্বন্ধে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা হুখের বিশেষত্ব।

গ্যেটে-শিলারের যুগের কথা লইয়া হুখ্ দুইখণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। জার্ম্মাণ রোমাণ্টিকতার মূলসূত্র এই রচনায় প্রচারিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশ সাহিত্য-বীর মাইকেল বাকুনিন স্বদেশে রোমাণ্টিক ভাবুকতা ছুটাইতেছিলেন। পল্লী-প্রীতি, ও "মির" নামক পল্লী-স্বরাজের গৌরব বাকুনিন-সাহিত্যের প্রাণ। হুখ্ সেই সাহিত্য-সম্বন্ধেও উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ্ সাহিত্যের পূর্ব্বাপর অনেক কথা লইয়া হুখ্ জীবন কাটাইয়াছেন। ইয়োরোপের ত্রিশ বৎসরব্যাপী সংগ্রাম (১৬১৫-৪৫) এবং ধর্ম্ম-সংস্কারক লুথার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে লেখিকা বিশেষজ্ঞের ইজ্জদ্ পাইয়া থাকেন। হুখ্ ব্যাভেরিয়ার, মিউনিকের লোক। ইঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই—পত্র-ব্যবহার চলিয়াছে মাত্র।

য়েনা শহরের শ্রীমতী লুলু ডিডেরিখ্‌স্ কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। ইঁহার লেখা গাথাগুলা জার্ম্মাণ সাহিত্য-সংসারে সমাদৃত হয়। স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া "ডী টাট্" (অর্থাৎ কর্ম্ম বা কৃতিত্ব) নামক মাসিক চালাইয়া থাকেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে এই কাগজের বা সম্পাদকদের কোনো যোগাযোগ নাই। ব্যক্তির জীবনীশক্তি, আধ্যাত্মিক ভাবুকতা ইঁহাদের রচনার বিশেষত্ব। ডিডেরিখ্‌স্-কোম্পানী জার্ম্মাণির এক প্রসিদ্ধ প্রকাশক।

গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন শ্রীমতী ক্লারা ফীবিগ্। "ডাস ভাইবার-ডোফ" অর্থাৎ "মেয়ে-পল্লী" নামক গল্পে ঐতিহাসিক তথ্য উপকরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। পল্লীর কিষাণরা লেখিকাকে

গ্রামকে "ক্লারা ফীবিগের মেয়ে-পল্লী" নামে অভিহিত করিয়া পোষ্ট কার্ড ছাপিয়াছিল।

জার্ম্মাণির উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম, সকল অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ফীবিগের নানা রচনায় ঠাঁই পাইয়াছে। পল্লী, শহর কিছুই বাদ পড়ে নাই। দরিদ্রের জীবন, বিশেষতঃ শহুরে মজুর-জীবন সম্বন্ধেও ইঁহার কলম খেলিয়াছে। 'ডাস টেগ্‌লিখে ব্রোট্‌' বা 'রোজ আনি রোজ খাই' নামক উপন্যাসের মতলব 'নামেই প্রকাশ।'

গল্প-উপন্যাস যাহারা লেখে, তাহারা গণ্ডা-গণ্ডাই লেখে। ফীবিগ বলিতেছেন—'উপকরণ বা মাল-মশলা আমাকে ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে হয় নাই। এইগুলাই আমাকে ঢুঁড়িয়া বেড়াইয়াছে।' অর্থাৎ কোনো বিষয়ে কিছু লেখা ফীবিগের পক্ষে কষ্ট-কল্পনা-সাধ্য কাণ্ড-কারখানা নয়। কলম ধরিলেই লেখা আসে। অথবা লেখা আসে বলিয়াই ফীবিগ কলম ধরিতে বাধ্য হন, ইতি ভাবার্থঃ। বুক ঠুকিয়া মাথা ঠুকিয়া উপকরণ বা বিষয় খুঁজিতে-খুঁজিতে যাহারা হয়রাণ হয়, তাহাদের কলমের আগায় 'সাহিত্য' বাহির হয় না।

(২)

মারিয়া ফোন বুন্‌জেন্‌ সাহিত্য-ক্ষেত্রের নানা বিভাগে হাত দিয়াছেন। ইয়োরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকার নানা দেশে পর্য্যটন ইঁহার জীবনের এক বড় তথ্য। গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, জীবন-বৃত্তান্তে, সমালোচনায় তাহার ছাপ পড়িয়াছে।

ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কোন্‌ বইয়ে নাম হইয়াছে?' জবাব—'ইম্‌ রুডেনবোট্‌ ডুর্খ্‌ ডয়েচ্‌লাণ্ড' (অর্থাৎ নৌকাবক্ষে জার্ম্মাণ মুল্লুক)। জার্ম্মাণির অজানা বা অল্প-পরিচিত নদনদী, খাল-বিল, হ্রদ-সাগর ইত্যাদির উপর একলা দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালাইয়াছি। সেই

নৌকাবক্ষে একাকী জীবনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এই গল্পে বিবৃত।' বার্লিনের ফিশার কোম্পানী গ্রন্থের প্রকাশক।

ছবি আঁকায়ও ফোন্ বুন্‌জেনের হাত আছে। বার্লিনের বড় বড় প্রদর্শনীতে 'জল-চিত্র'গুলা দেখানো হইয়াছেও। ইনি বলিতেছেন—'শিল্প-রীতি-সম্বন্ধে আমি পুরাণাপন্থী। নতুন কায়দাগুলার কদর বুঝিতেও রাজি আছি বটে। কিন্তু মোটের উপর প্রাচীন এবং মধ্যযুগের নিদর্শন গুলাই আমার প্রিয়।'

'ড্যয়চে রুণ্ডশাও', 'ড্যয়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ' ইত্যাদি মাসিক ও দৈনিকে বুন্‌জেনের লেখা প্রায়ই বাহির হয়। বিপ্লবের পর হইতে ইনি রাষ্ট্রক্ষেত্রেও দেখা দিয়াছেন। রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী, 'ড্যয়েচ নাটসিওনাল' দলের সঙ্গে ইনি কর্ম্ম করেন।

বুন্‌জেন্ বলিতেছেন—"কাইজারিন (জার্ম্মাণ-সম্রাটের পত্নী) আমার এক মুরুব্বি ছিলেন। রাজদরবারে সম্রাজ্ঞীসকাশে আমার অনেক কাল কাটিয়াছে। 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'।" বুন্‌জেন্ ব্যয়মারের উল্টাপক্ষ।

সরকারী বীমাপ্রথায় দারিদ্র্যলোপ

যুগধর্ম্ম এত শীঘ্র বদ্‌লাইয়া যাইতেছে যে, জার্ম্মাণরা আজকাল একমাত্র রাজবংশকে উঠাইয়া দিয়া সুখী নয়। মামুলী রিপাব্লিক্ বা গণতন্ত্রে ইহাদের পেট ভরিতেছে না। বোল্‌শেভিক রুশিয়ার মার্কামারা লেনিন্-ট্রটস্‌কির মঞ্জুর মাফিক সোভিয়েট-শাসন কায়েম করিবার জন্যও জার্ম্মাণির মহলে-মহলে লোক দেখা যায়। স্যাক্‌সনি, ট্যুরিঙ্গেন এবং রাইন-রুরের কোথাও কোথাও কমিউনিষ্ট্-পন্থী ধনসাম্য-ধর্ম্মী দলের প্রভাব বেশী। ১৯২৩ সালে দুই-তিন বার রুশ জননায়কগণ জার্ম্মাণিতে

সোভিয়েট বিপ্লব আশা করিতেছিলেন। কয়েকবার নানা জায়গায় মজুর-দাঙ্গা দেখা গিয়াছেও।

বর্ত্তমান-জগতের সর্ব্বত্রই নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বের ভিতর বোল্‌শেভিক বেদের মন্ত্রধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইবেই যাইবে। জার্ম্মাণিতেও শুনা যায়। কিন্তু মোটের উপর জার্ম্মাণ মজুরেরা অনেকটা সুখময় জীবন যাপন করে। ইহাদের দরিদ্রতম অবস্থাও বিশেষরূপে শোচনীয় নয়। এই জন্যই বোধ হয় রুশ পেটেণ্টের মজুরতন্ত্র জার্ম্মাণ-সমাজে আজ পর্য্যন্ত বিজয়লাভ করিতে পারে নাই।

মজুর-জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিবার জন্য চল্লিশ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট অনেক কিছু করিয়াছে। সেই সকল কাজ বাধ্যতা-মূলক সরকারী বীমা-প্রথার অন্তর্গত। কি রোগ, কি বার্দ্ধক্য, কি দৈব —যত প্রকারে ফ্যাক্‌টরির মজুরদের এবং আফিসের কেরাণীদের আপদ-বিপদ উপস্থিত হইতে পারে সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া রাষ্ট্রবীর বিস্‌মার্ক ১৮৮৩-৮৯ সালের ভিতর কতকগুলা আইন কায়েম করিয়াছিলেন। এই আইনগুলা মানব জাতির কল্যাণের জন্য জার্ম্মাণির বিশিষ্ট দান-বিশেষ।

আইনের ফলে মহাজন এবং ফ্যাক্‌টরির মালিকেরা দেশের নানা স্বাস্থ্য-কর স্থানে হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কায়েম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সত্তর বৎসরের বুড়া লোক মাত্রেই বৎসরে প্রায় তিনশ' মার্ক (২২৫৲) করিয়া পায়। মজুরদের বিধবা-পত্নী এবং ষোল বৎসরের কম-বয়স্ক বালক-বালিকা পেন্‌শন ভোগ করে। ফলতঃ বিনা উদ্বেগে সাহসের সহিত জার্ম্মাণির আবালবৃদ্ধবনিতা কঠিন-কঠিন কাজের দায়িত্ব লইতে সমর্থ হয়।

মজুরদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য যে সকল আইন

সমুদয় "ডী সোৎসিয়াল-পোলিটিশে গেজেট্‌স্-গেবুঙ" অর্থাৎ সমাজ-রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা নামে প্রচারিত। বার্লিনের "ৎসেণ্ট্রাল ফার্লাগ" এই গ্রন্থের প্রকাশক। বার্লিনের হাব্বিং কোম্পানীও ১৯২৩ সালে এই সম্বন্ধে এক খানা গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিয়াছে। তাহার নাম "আরবাইট্‌স্-রেষ্ট উণ্ড আরবাইট্‌স্-শুট্‌স্ (মজুরদের অধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণ)। দুনিয়ার বড় বড় সকল জাতি জার্ম্মাণির নিকট এই বীমা প্রথা এবং সামাজিক বিধান শিক্ষা করিয়াছে। যুবক ভারতের পক্ষেও জার্ম্মাণিতে এই সব অন্যতম প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়।

পত্রিকায় নবীন-প্রবীন

বিপ্লবের পর জার্ম্মাণিতে নতুন-নতুন মাসিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি সাময়িক পত্র দেখা দিয়াছে। নবযুগের নবীন লেখকেরা "নয়েস্ ড্যয়েচ-লাণ্ড" (নয়া জার্ম্মাণি), "নয়ে রুণ্ডশাও" (নবীন পর্য্যবেক্ষণ) ইত্যাদি কাগজে লিখিতে অভ্যস্ত।

পুরাণা মাসিকের ভিতর 'ড্যয়েচে রুণ্ডশাও' সম্প্রতি পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই কাগজ প্যারিসের 'রেভ্যি দে দ্য মঁদ" অথবা বষ্টনের 'আটলাণ্টিক মান্থলি' ইত্যাদির সমকক্ষ। দেশী-বিদেশী নামজাদা লোক এই আসরের লেখক। এই আসরে দুএকবার বর্ত্তমান লেখককে হাজির হইতে হইয়াছে।

"ড্যয়চে রুণ্ডশাও"য়ের বর্ত্তমান সম্পাদক রুডলফ্ পেখেল স্বয়ং নাট্য-সাহিত্যের সমালোচক। পেখেল বলিতেছেন—রুশ, স্কাণ্ডিনাভিয়ান, ইতালিয়ান, আইরিশ ইত্যাদি নানা জাতীয় সাহিত্য-বীরদিগকে এই কাগজের সাহায্যে জার্ম্মাণ সমাজে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পেখেল ঠিক কোনো দলের লোক নন, কিন্তু স্বদেশ-সেবক বটে। "পোলিটিশে কোল্লেগ" নামক রাষ্ট্রিক সমিতির সম্পর্কে যুবক জার্ম্মাণির

শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তার সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ আছে। নবীন জার্ম্মাণি গড়িয়া তুলিবার কাজে ইনি নিজকে সজাগভাবে মোতায়েন রাখিয়াছেন।

ঠিক এই ধরণেই কোন দলের মুখপত্র নয় এমন দৈনিক কাগজ বার্লিনের "ড্যয়চে আলগেমাইনে ৎসাইটুঙ"। দৈনিকটা ষ্টিন্নেসের সম্পত্তি। জার্ম্মাণ ফ্যাক্টরি এবং শিল্পবিকাশের সকল খবর এই কাগজে পাই।

অবশ্য এই দুই কাগজকেই খাঁটি ডেমোক্রাটপন্থীরা রাজতন্ত্রঘেঁশা এবং অতিমাত্রায় "বুর্জোয়া" বিবেচনা করিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু বিদেশী পর্য্যটকের পক্ষে—বিশেষতঃ যাহারা ধনবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রনীতিঘটিত আন্দোলনে নাম-লেখানো দলের লোক নয় তাহাদের পক্ষে এই দুই দৈনিক ও মাসিককে জার্ম্মাণ "কুল্টরের" বাহন বিবেচনা করিলে চলিতে পারে। ইহাদের আদর্শেই জার্ম্মাণ-গৌরবের যা-কিছু সব নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে' এবং এখনো অনেক দিন নিয়ন্ত্রিত হইবে।

চিত্র–শিল্পী রেবেল

চিত্রশিল্পী মাক্স্ রেবেল বলিতেছেন—"আজকাল জার্ম্মাণির প্রদর্শনীগুলায় নবীনতম শিল্পরীতির অত্যধিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি অতদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই।"

বস্তুতঃ চরমপন্থী জ্যামিতিক রূপবহুল চিত্রাঙ্কন জার্ম্মাণির বাজারে-বিজ্ঞাপনে যত দেখিতে পাই, প্যারিসে, লণ্ডনে বা নিউইয়র্কে তত দেখিতে পাই নাই। একটা বিশেষ কথা এই যে, এমন-কি বার্লিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারিতেও চরমপন্থী চিত্রকর এবং ভাস্করদের হাতের কাজ আদরের সহিত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্যারিসের "আকাদেমী"তে

সেটি হইবার জো নাই। বার্লিনের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জুষ্টি এই হিসাবে অনেকটা উদারতা অবলম্বন করিয়া চলেন।

রেবেলের চিত্রশালায় বুঝিলাম ইঁহার কাজকে একদম মামুলিপন্থী বলা অসম্ভব। নিজের মাথা খাটাইয়া নতুন-নতুন প্রাকৃতিক দৃশ্য গড়িয়া তোলায় ইঁহার হাত দেখিয়াছি। রূপগুলার ভিতর কল্পনার ঠাঁই বিস্তর। শক্তির সঙ্গে সুষমাও একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইসব ওস্তাদিই সাবেক কালের পুরাণা পথেও দেখানো সম্ভব।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী শিল্পগুরু সেজান্ যে-পথ ধরিয়া গিয়াছেন সেই পথের পথিকেরা আজকাল বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার ছাপ রেবেলের পক্ষে এড়ানো সম্ভবপর হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে, আজকালকার যে-কোনো চিত্রশিল্পীর কাজেই অল্প-বিস্তর এই সেজান্-ধর্ম্ম দেখিতে পাই।

রেবেল সুকুমার শিল্পের শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন—'যে যে-পথের পথিকই হউক না কেন, প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কালের জন্য কোনো নামজাদা আর্ট-ইস্কুলে ছাত্রভাবে হাত মক্স করা উচিত এবং আবশ্যক। শিল্প-বিদ্যালয়কে একদম অগ্রাহ্য করিয়া চলিলে প্রবীণ বয়সে চিত্রকরদের অনেক অসুবিধা জুটিতে বাধ্য।"

ডালেম-পাড়া

(১)

বার্লিনের শার্লোটেনবুর্গ ভারতে যতটা পরিচিত, ডালেম-পাড়া তত পরিচিত নয়। কিন্তু ডালেম জার্ম্মাণিতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'কাইজার ভিল্‌হেল্ম্ ইন্‌ষ্টিটুট্' নামক 'ফলিত বিজ্ঞান' ও শিল্পবিষয়ক পরীক্ষাগার এই পাড়ার গৌরব।

পরীক্ষাগারগুলা ছোটখাট ল্যাবরেটরি মাত্র নয়। এই সব এক

বিপুল বিশ্ববিদ্যালয়। এইখানে আজকাল কোনো কোনো ভারতীয় অধ্যাপক বিভিন্ন বিভাগে 'রিসার্চ্চ' করিতেছেন। ইন্‌ষ্টিটুটের অনুসন্ধানকারী ছাত্র হিসাবেও বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব। এক হিসাবে এটা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্যতম অংশ।

ডালেম-পাড়াতেই বার্লিনের বোটানিক্যাল বাগান এবং উদ্ভিদ্-বিষয়ক সংগ্রহালয়। এইখানেই ফার্ম্মেসি বা ভেষজ-রাসায়নিক বিদ্যালয় অবস্থিত। এই ধরণের বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ডালেম পরিপূর্ণ। এ এক বিজ্ঞান-পল্লী বিশেষ। জার্ম্মাণরা বিজ্ঞান ও শিল্পজগতে যে সকল উচ্চতম আবিষ্কার সাধন করিতেছে, তাহার অনেকগুলিই এই পল্লীর ভট্টাচার্য্যদের কীর্ত্তি।

তরুলতার ওস্তাদ অধ্যাপক ডীল্‌স্ বিশেষ করিয়া গাছ-গাছড়ার ভূগোল-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইনি নানা খোঁজ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইসকল বিষয়ে বহুবিধ মৌলিক রচনাও ইঁহার আছে বলাই বাহুল্য। নিউজীল্যাণ্ড এবং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার উদ্ভিদ্-রাজ্য সম্বন্ধে ইনিই দুনিয়ার সর্ব্বপ্রথম শৃঙ্খলা-কারক। মধ্য এবং পশ্চিম চীনের উদ্ভিদ লইয়াও ইনি অনেক কাল কাটাইয়াছেন। উদ্ভিদের ভূগোল-বিষয়ক ইঁহার রচনা রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বোটানিকাল উদ্যান এবং সংগ্রহালয়ের কর্ত্তা হইতে হইলে কি-কি গুণ লাগে ডীল্‌সের কাজকর্ম্ম দেখিলে এবং জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে তাহা কিঞ্চিৎ বুঝা যায়।

(২)

ফার্মেসি-রাসায়নিক টোম্‌স্ বার্লিনে অধ্যাপক হইবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণির নানা অঞ্চলে "ওষুধ" তৈয়ারী করিবার একাধিক ফ্যাক্টরিতে

কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ "ফার্মাৎসয়টিশেস্ ইন্‌ষ্টিটুট"টা টোম্‌সের নিজ-হাতে গড়া। এই ইনষ্টিটুটে যে-সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলে তাহার বৃত্তান্ত প্রতিবৎসরই বাহির হইয়া থাকে। সেইগুলার সম্পাদনের ভার টোম্‌সেরই হাতে।

মামুলি রসায়ন সম্বন্ধে বোধ হয় টোম্‌স কখনো কিছু লেখেন নাই। গাছ-গাছড়ার রসায়ন (সহজ-কথায় "পাচনের" বিজ্ঞান) বিষয়ে ইঁহার বহুবিধ রচনা আছে। এইগুলার কোনো-কোনোটার পাঁচ-সাত সংস্করণ ছাপা হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু সাধারণ ফার্ম্মেসি-বিষয়ক বিশ্বকোষ বা ঐজাতীয় বিপুল গ্রন্থও টোম্‌সের হাত হইতে বাহির হইয়াছে। তেলের রসায়ন ইঁহার একটা বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র। জাপান-সরকারের নিমন্ত্রণে ইনি কিছুদিন হইল সপরিবারে জাপান দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন (১৯২৩ আগষ্ট)। দুর্ভাগ্যক্রমে ইয়োকোহামায় পৌঁছিবার সম-সমকালে ভূমিকম্প সুরু হয়।

টোম্‌স কয়েকবার বলিয়াছেন, "ভারতীয় ছাত্ররা মেহনৎ করে মন্দ নয়। ইহারা বুঝে-সুজেও ভালই। কিন্তু রসায়নে ইহাদের গোড়ায় গলদ অনেক। দেশ হইতে যতটা শিখিয়া আসে, তাহার বনিয়াদ যথোচিত পাকা নয়। এই কারণে ইহাদের পুরাণা অসম্পূর্ণতা-গুলা শুধ্‌রাইয়া ইহাদিগকে নূতন প্রণালীতে দীক্ষিত করিতে অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়।"

ন্যর্ণ্‌ষ্ট্‌ ও আইনষ্টাইন

(১)

রসায়ন-গুরু ন্যর্ন্‌ষ্ট্‌-এর নাম জগৎ-জোড়া। জার্ম্মাণির আবালবৃদ্ধ-বনিতা ইঁহাকে বিদ্যুতের বাতির উদ্ভাবক বলিয়া জানে। ইনি রসায়নের

এবং রসায়ন, এই তিনের রাজ্য বলা যায়। এ একটা নূতন বিজ্ঞান। বুঝিসুঝি না বলাই বাহুল্য।

শার্লোটেন্‌বুর্গে অবস্থিত সরকারী এক পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজকাল ইনি প্রেসিডেণ্ট্। ছেলে পিটাইবার ব্যবসা কয়েক বৎসর হইল ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইঁহার ভবনে একদিন নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে দেখিলাম জার্ম্মাণ-অজার্ম্মাণ শিল্পবীর ও বিজ্ঞান-নায়কের দল।

ন্যর্ন্‌ষ্ট্‌ বলিলেন:—"ভারতবর্ষে এখন ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞানসেবীরা সমবেত হইয়া আকাডেমী বা পরিষদ্ গড়িয়া তুলিতে থাকুন। জার্ম্মাণিতে এবং ইয়োরোপের সকল দেশে এইরূপ পরিষদের সাহায্যেই জ্ঞানবিজ্ঞান উন্নতি লাভ করিয়াছে। এদিকে পয়সাওয়ালা লোকদের—রাজ-রাজড়া আমীর-ওমারহদের লক্ষ্য ছিল বলিয়া পাশ্চাত্য সমাজে বিগত দুইশত বৎসর ধরিয়া বিদ্যার রাজ্য বাড়িয়া চলিয়াছে।"

অধ্যাপক ন্যর্ন্‌ষ্টের সঙ্গে তাঁহার পরীক্ষাগারে কয়েকবার দেখা হইয়াছে। একবার তিনি তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার দিলেন। পাতা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বুঝিলাম ইহাতে রামা-শ্যামার দন্তস্ফুট সম্ভব নয়।

সুইডেনের আরেনিউস, জার্ম্মাণির আইনষ্টাইন ইত্যাদি পণ্ডিতেরা দুনিয়াখানার ভিতর-বাহিরের গড়ন-সম্বন্ধে নতুন নতুন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেই-সম্বন্ধেই ন্যর্ন্‌ষ্টের এই বইয়ে আলোচনা আছে। ইঁহাদের মতনই ন্যর্ন্‌ষ্ট্‌ ও জগৎ-কথা সম্বন্ধে বিজ্ঞান-বিপ্লবী।

নিউটনের আমল হইতে দুনিয়ায় যে সকল মত চলিতেছে সেইগুলা আর পুরাপুরি টেঁকসই বিবেচিত হইতেছে না। বিজ্ঞান-রাজ্যের "ঝাড়ুদারেরা" সেগুলা ঝাড়িয়া-বাছিয়া নতুন-কিছু প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়

আইনষ্টাইনের সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হইয়াছে। কয়েক মিনিটের জন্য। বার্লিনের ভারতীয় রিসার্চ্চ্ ও পি-এইচ-ডি ওয়ালারা সকলে মিলিয়া নিজ-নিজ জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণকে এডেন হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মিষ্টান্ন চুঁ ঢ়িতে-চুঁ ঢ়িতে সেই পণ্ডিত-মজলিসে এই 'ইতরজনের' ও উপস্থিতি ঘটিয়াছিল।

সঙ্গীত-বিপ্লব

(১)

জগৎ ভরিয়াই চলিতেছে বিপ্লব। নয়া-পুরাণার দ্বন্দ্ব দেখিতেছি সঙ্গীতকলায়ও। সঙ্গীতে বিপ্লব? কথাটা ভারতবাসীর মাথায় বসা কঠিন। কেননা সঙ্গীতের ক্রম-বিকাশ, উন্নতি, ঊর্দ্ধগতি বা বিস্তৃতি ইত্যাদি-সম্বন্ধে ভারতে প্রায় একদম কোনো ধারণা নাই। বস্তুতঃ, গোটা স্বকুমার-শিল্পের মুল্লুকেই জগৎ যে কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে তাহা জরীপ করিবার ক্ষমতা ভারত-সন্তানের দেখিতে পাইনা। এই-কথাটা বুঝিবার জন্য খেয়ালও ভারতবাসীর আছে কিনা সন্দেহ।

গোটা জার্ম্মাণিতে, বস্তুতঃ সমগ্র ইয়োরামেরিকায়ই এতদিন চলিতেছিল ভাগ্নারের রাজ্য। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ডে যখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতে "সমজদার" (?!) হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম তখন সেখানকার সঙ্গীতাধ্যাপককে অনেকবার খোলাখুলি বলিতে শুনিয়াছি :—'উনবিংশ শতাব্দীটা ভাগ্নারেরই যুগ।'

জার্ম্মাণিতে আসিয়া অবধি অপেরায় এবং অপেরার বাহিরে ভাগ্নারের স্বরতরঙ্গেই জার্ম্মাণির নরনারীকে ভাসমান দেখিয়াছি। এখানকার যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা ভাগ্নারের রসেই জীবন অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। চিত্রশিল্পী, থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সখের

পিয়ানোবাদক, বেহালা-বাদক হইতে সুরু করিয়া সঙ্গীত-গুরু-স্থানীয় লোকজনও বলেন ঃ—"ভাগ্নার আমাদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে।"

(২)

কিন্তু জার্ম্মাণরা এই ভাগ্নারকেই দুনিয়ার শেষ পীর বিবেচনা করিতেছে কি ? না। চিত্র-শিল্পের লাইনে যেমন ফরাসী সেজানের পর হইতে ফিউচারিজম্ বা ভবিষ্যবাদ নানারূপে দেখা দিয়াছে, সঙ্গীত-শিল্পের বিভাগেও সেইরূপ ভবিষ্যপন্থী "বোল্‌শেভিজম" দেখা যাইতেছে।

ফ্রান্সের ক্লোদ দ'বুসি (১৮৬২—) সঙ্গীত-বিপ্লবের প্রবর্ত্তক। আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার "হার্মনি"। এই শব্দের অর্থগত বস্তু ভারতীয় শিল্পে নাই। কাজেই সম্প্রতি ইহার জন্য একটা ভারতীয় প্রতিশব্দ ঢুঁড়িতে প্রলুব্ধ হইতেছি না।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে "কর্ড্" তৈয়ারী হয়। সেই কর্ড্‌গুলার স্রোত বহাইতে পারিলে হার্মনি সৃষ্টি করা সম্ভব। চিত্র-শিল্পে পারিপ্রেক্ষিক (পার্স্পেক্‌টিভ্) যে-বস্তু, সঙ্গীতে কর্ড্ বা "সন্ধি"-মূলক হার্মনি অনেকটা তাই। হার্মনির দস্তুর এই যে, প্রথম দুইতিনটা কর্ড্ শুনিবামাত্র পরে কোন্ ধরণের কর্ড্ আসিতে বাধ্য তাহার আন্দাজ করা সম্ভব। অবশ্য আমি পারি না। ওস্তাদরা পারে। জার্ম্মাণ পরিবারের অনেক স্ত্রী-পুরুষও পারে। কারণ তাহারা এইদিকে অল্প-বিস্তর শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

তাহা ছাড়া অঙ্ক-শাস্ত্রের মতন সঙ্গীত একটা অতিমাত্রায় মাপ-জোক সমন্বিত বিদ্যা। এখানে গোঁজামিল চলিবার সম্ভাবনা নাই। যেমন 'তাল কাটিয়া' গেলে আখ্‌ড়ার রসিকেরা তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিতে পারে, সেইরূপ কর্ড্‌গুলার "লক্ষ্যমুখীনতা"ও পাকড়াও করা সম্ভব।

দ'বুসি বলিলেন ঃ—"যদি আমার ওস্তাদি তোমরা ধরিতেই পারিলে

তাহা হইলে আর আমার ওস্তাদি রহিল কোথায়? একটা নতুন কিছু করা চাই-ই চাই।” কাজেই দ’বুসি হার্মনির মামুলী পথ বর্জ্জন করিয়া একদম ‘অকথ্য’ উপায়ে কর্ড্‌গুলা লইয়া ‘ছেলেখেলা’ সুরু করিয়াছেন। ইহার নাম সঙ্গীত-রাজ্যে বোল্‌শেভিক পথ।

জার্ম্মাণ ওস্তাদ আর্ন্‌ট্‌ শ্যেন্‌ব্যর্গ (১৮৭৩—) এইখানেই ঠেকিবার পাত্র নয়। কর্ড্‌গুলাকে বিতিকিচ্ছিরূপে যেখানে সেখানে বসাইয়াই ইহার সাধ মিটেনা। সঙ্গীত-কলার যে আদিম ভিত্তি ‘মেলডি’ বা সুর শ্যেন্‌ব্যর্গ তাহাকেও লণ্ড ভণ্ড করিয়া ছাড়িয়াছেন। এমনকি “স্বর” গুলাকেও টুকরা-টুকরা করিয়া ধ্বনির নতুন নতুন রূপ তৈয়ারী করিবার পথে ইনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। এই ভাঙ্গা-ভাঙ্গির লঙ্কাকাণ্ডে পশ্চিমা সনাতন বার-বিভাগওয়ালা স্বরপর্য্যায় আমাদের সুপরিচিত বাইশ“শ্রুতির” কাঠাম ছাড়াইয়াও উঠিতেছে। শ্যেন্‌ব্যর্গের পিয়ানোর গৎগুলি শুনিয়া কার সাধ্য বুঝে? এই যন্ত্রে কিসের আওয়াজ বাহির হইতেছে? সুরের তাণ্ডব না অসুরের ওস্তাদি?

(৩)

ভারতবাসীর পক্ষে সঙ্গীতের এই বিপুল ভাঙ্গা-গড়া বুঝা অসম্ভব। আমরা ভরতমুনির আবিষ্কার পর্য্যন্ত—শুনিতে পাই মিঞা তানসেন্‌ ইত্যাদিরও নাকি অনেক আবিষ্কার আছে—উঠিয়াছিলাম। তাহার পর আর আগাইয়া আসিতে পারিয়াছি কিনা জানিনা। পারিয়া থাকিলে ও তাহার দৌড় কতটা মাপিয়া জুকিয়া দেখা আবশ্যক।

কিন্তু ইয়োরোপীয়ান্‌রা গ্রীক্‌, রোমান্‌ এবং মধ্যযুগের গীর্জ্জাসঙ্গীতকে পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নত হইতে-হইতে জার্ম্মাণ্‌ বাখ (১৬৮৫-১৭৫০) এবং ফরাসী রাম্যো (১৬৮৩-১৭৬৪) ইত্যাদি ঋষির যুগে আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

গ্রন্থই আধুনিক সঙ্গীতের বেদস্বরূপ। সঙ্গীতে এইখানেই বর্ত্তমান জগতের গোড়া। গ্রীক, রোমান্ এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়ান্ বাখ রামোকে কোন-মতেই বুঝিতে পারিবে না। এই দুনিয়া একদম নয়া।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, গোটা ইয়োরোপ ও আমেরিকা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরাণো ভাঙিয়া নবীন গড়িতেছিল। এই যুগেই ষ্টীম-এঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়। এই যুগেই নতুন-নতুন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে (১৭৭০-৮৫)। এই যুগেই আডাম্ স্মিথ্ তাঁহার 'ধনবিজ্ঞান' গ্রন্থ প্রচার করেন (১৭৭৬)। এই যুগেই ফরাসী বিপ্লব দেখা দেয় (১৭৮৯-৯২)। এই যুগেই যুক্তরাষ্ট্রের সূত্রপাত হয় (১৭৮৫)। অর্থাৎ এইখানেই শিল্পবিজ্ঞানে, সাহিত্যে-রাষ্ট্রে, সমাজ-বিন্যাসে, শ্রেণীবিপ্লবে মজুর-সমস্যায় 'বর্ত্তমান জগৎ' দেখা দেয়। ভারতবর্ষ এই যুগেই গোলাম হয় (১৭৫৭-৭২)। ভারতবাসীর দাসত্ব এবং বর্ত্তমান জগতের উৎপত্তি একসূত্রে গাঁথা।

এই বর্ত্তমান-জগতে ভারত-সন্তান,—আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, নাগার্জ্জুন, পতঞ্জলি, আলফারাবি, আলবেরুনির বংশধরেরা নিজ-নিজ মাথার উল্লেখ-যোগ্য কোনো পরিচয় দিতে পারিয়াছে কি? পারে নাই। যদি পারিত, তাহা হইলে ষ্টীম-এঞ্জিন বলিলে শিল্প, রাষ্ট্র ও সমাজের যাহা কিছু বুঝা যায় সবই ভারতবাসীর স্ববশে আসিত। যদি পারিত তাহা হইলে হার্মনি বলিলে সঙ্গীতে যাহা-কিছু বুঝা যায় সবই ভারতীয় শিল্প-স্বরাজে দেখা দিত। অর্থাৎ ভরত-তানসেনের বাচ্চারা নিজেই বেঠোফেন, শপাঁ, ভাগ্নার, চাইকোভস্কি হইয়া জন্মিতে পারিত। তাহা হইলে তাহার পরের ধাপটা—অর্থাৎ দ'বুসি-শ্যেনবার্গের কেরদানি, পাগলামি বা বীরত্ব এবং ওস্তাদি বুঝিবার, বুঝাইবার এবং সৃষ্টি করিবার

(৪)

যাহা হউক, জার্ম্মাণরা এই নবীন সঙ্গীত-সম্বন্ধে অনেকেই নারাজ। নতুনের ঠাঁই দুনিয়ার কোথাও অতি শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। অধিকন্তু নবীনেরা অনেক সময়েই কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া বসে। সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক বিপ্লবে এই কথাটা সহজেই বুঝা যায়। অতিবৃদ্ধির পর বিপ্লবীরা একধাপ পেছন হটিয়া "বুর্জোআ", "সনাতনী", নরম ও মডারেট দলের সঙ্গে খানিকটা আপোষ করিয়া চলে। জগতের যে কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। কিন্তু নয়ায়-পুরাণায় 'রফা' করিতে-করিতে শেষ পর্য্যন্ত নয়াই দিগ্‌বিজয়ী হয়।

বার্লিনে এক সঙ্গীত-গুরুর সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। নাম ওথ্‌স্‌। পিয়ানো এবং বেহালার মহলে ইঁহার নামডাক খুব উঁচু। অর্কেষ্ট্রার পরিচালক (কণ্ডাক্‌টার) হিসাবে ইঁহার ব্যবসা এবং যশ। লড়াইয়ে 'সেনাপতি'র কাজ যেরূপ, সঙ্গীতে কণ্ডাক্‌টারের কাজ সেইরূপ। ভারতে এই-পদের মর্ম্ম বুঝা সহজ নয়।

ভবিষ্যপন্থী সঙ্গীতের ঠাট্টা করিয়া ওথ্‌স্‌ একদিন বলিতেছিলেন,—"আমি একদিন এক মজলিসে কতকগুলা সঙ্গীতের পাকা সমজদারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে নবীন সঙ্গীতের নমুনা, শুনাইব এই কথা জানাইয়াছিলাম। কি করিয়াছিলাম জানেন? বাখ, বেঠোফেন, মোৎসার্ট ইত্যাদি সঙ্গীত-গুরুদের সুপ্রসিদ্ধ গৎগুলা বাজাইয়া যাইতে লাগিলাম। কিন্তু প্রত্যেকটার ভিতরই যেখানে-সেখানে যথেচ্ছরূপে ভুল চালাইয়া দিতে ত্রুটি করি নাই। সুরের, কর্ডের, হার্মনির শ্রাদ্ধ করা যাহাকে বলে ঠিক তাহাই করিতেছিলাম। সমজদারেরা আমার এই বদমায়েসি ত ধরিতে পারিলেনই না, বরং প্রত্যেক বাজনার পরই তাঁহারা 'নবীন' সঙ্গীতের খুব তারিফ করিতেছিলেন।

শেষে গোমর ফাঁক করিয়া বলিলাম,—বুঝিলেন আপনারা কি আহাম্মুক, ভুল এবং দোষগুলাই আপনাদের চিন্তায় গুণ !”

অর্থাৎ শিশুরা হাতে খড়ির সময় যেমন কাগের-বগের ছবি চালায় সঙ্গীতাচার্য্য ওথ্‌সের মতে ‘নবীন’ সঙ্গীত মানুষের কানে ঠিক সেইরূপই ঠেকিতে বাধ্য। কিন্তু যাহারা নতুন-মালের পক্ষপাতী তাহারা বুঝুক না-বুঝুক সেইটার প্রশংসা করিবেই করিবে। এই গেল সনাতনপন্থী সঙ্গীত-গুরুর মত।

ওথ্‌স্ বার্লিনের সঙ্গীত ও সুকুমার শিল্পকলেজের প্রধান অধ্যাপক। আকাডেমিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপ্লব সৃষ্ট হয় না। বিপ্লবের জন্ম হয়—নয়া জগৎ গড়িয়া উঠে—এইসকল প্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দির বাহিরে। নবীন-প্রবীণে দ্বন্দটা বুঝিবার সময় এই কথা মনে রাখা আবশ্যক। ভাগ্নারকেও সেকালের লোকেরা সঙ্গীত-বিপ্লবী বলিয়া গালগালি করিত।

গ্রন্থালয়ের ধ্বনি-শালা

বার্লিনের বিরাট্‌ গ্রন্থশালায় এক নয়া বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগকে “লাউট্‌ আব্‌টাইলুঙ” (ধ্বনি-বিভাগ) বলে। পরিচালকের নাম ড্যেগেন। ইনি ধ্বনি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ড্যেগেন বলিতেছেন ঃ—“আমাদের ধ্বনিশালায় বিশ-পঁচিশ হাজার মানুষের আওয়াজ ফনোগ্রাফের রেকর্ডে ধরিয়া রাখিয়াছি। দুনিয়ার নানা-দেশের লোকের, নানা-ভাষার উচ্চারণ ও সুর এই ধ্বনিশালায় ‘পাঠ’ করিতে পারেন। ভাষা-বিজ্ঞানের তরফ হইতে এমন সুযোগ জগতের আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।”

দু’চারবার যাওয়া-আসা করা গেল। ড্যেগেন বলিলেন ঃ—“ওহে

আমাকে ধরিয়া রাখি।" কাছে ছিল দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত "দ্বিজেন্দ্রলাল"। কেতাব হইতে তিন মিনিট পড়িয়া দিলাম। তিন মিনিটের বেশী কলে ধরা যায় না। পরে জুটিল আর-এক ফরমায়েশ। ড্যেগেন চাহিলেন বাঙালীর মুখে ইংরেজী আওয়াজ শুনিতে। "যুবক-এশিয়ার বাণী" নামে খানিকটা লিখিয়া আওড়াইয়া দেওয়া গেল।

সমাজ-বিজ্ঞানের "জগদ্‌গুরু"

(১)

হুম্বোল্ড এবং হেল্‌ম্‌হোল্টস ইত্যাদি জার্ম্মাণ বিজ্ঞানবীরগণ "জগদ্‌-গুরু" বিবেচিত হন। দার্শনিক কান্ট্‌ এবং হেগেলকেও দুনিয়ার সকল দার্শনিক-মহলেই জগদ্‌গুরুর আসন দিতে কাহারও আপত্তি নাই। বেঠোফেন আর ভাগ্নারও সেই পদেরই লোক।

সেইরূপ সমাজ-বিজ্ঞান (ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি) বিষয়ক বিদ্যার ক্ষেত্রে জগদ্‌গুরু-স্থানীয় পণ্ডিত জার্ম্মাণিতে কাহারা? এই প্রশ্নটা অনেকবার মাথায় উঠিয়াছে। "জগদ্‌গুরু" বলিলে বুঝিতে হইবে এমন একটা লোক যাহার মত-অনুসারে বিভিন্ন "বিদেশে" বহুসংখ্যক নর-নারী জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। যে-কোনো নামজাদা পণ্ডিত বা বহু গ্রন্থের লেখককে এই আসন দেওয়া যায় না। অথবা একাধিক বিদেশী ভাষায় কোনো দর্শনবিজ্ঞানসাহিত্য-সেবীর রচনার তর্জ্জমা প্রচারিত হইলেও তাঁহাকে জগদ্‌গুরু বলিতে পারি না।

প্রশ্নটার জবাব দেওয়া বড় কঠিন। তাহার প্রধান কারণই এই যে, ফরাসী সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণের চিন্তা ইংরেজীতে যত পাওয়া যায় জার্ম্মাণদের চিন্তা তত পাওয়া যায় না। এইখানেই বোধ হয় বুঝিতে হইবে যে, এই বিদ্যার ক্ষেত্রে জার্ম্মাণিতে "জগদ্‌গুরু" বেশী জন্মেন নাই।

(২)

কিন্তু অনেক দিক্ তলাইয়া মজাইয়া ভাবিতেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে ফ্রিড্‌রিশ লিষ্টের সমান প্রভাবশালী লোক ইয়োরামেরিকায় আর কেহ ছিল না। লিষ্ট্ বিলাতী জগদ্‌গুরু আডাম্ স্মিথ-প্রচারিত ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া ইংরেজ-বীরকে ন'কড়া-ছ'কড়া করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। বৃটিশ সন্তান ছিলেন অবাধ বাণিজ্যের ধুরন্ধর। তাহার বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন প্রুশিয়ার স্বদেশ-সেবক। লিষ্ট্ দার্শনিক হিসাবে সংরক্ষণ-নীতির অর্থাৎ সশুল্ক বাণিজ্য-প্রথার অনেকটা জন্মদাতা।

জার্ম্মাণিতে লিষ্টের প্রধান কৃতিত্ব ছিল পরস্পর-বিচ্ছিন্ন জার্ম্মাণ ভাষাভাষী রাষ্ট্রগুলাকে "ৎসোল-ফারাইন" অর্থাৎ শুল্ক-সঙ্ঘে ঐক্যবদ্ধ করা। তাহার ফলে জার্ম্মাণ সমাজে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সম্পদ্ জন্মিতে থাকে। এই সুফল লক্ষ্য করিয়াই সেকালের জার্ম্মাণরা লিষ্ট্‌কে "স্বদেশের উদ্ধারকর্ত্তা"রূপে পূজা করিত। এই-কারণেই আবার তখনকার ইংরেজরা তাঁহাকে যমের মতন ভয় করিত। ফরাসী নেপো-লিয়নকে লড়াইয়ে হারাইয়াও ইংরেজের নয়নে নিদ্রা আসিত না। চিন্তাবীর লিষ্ট তাহাদের "শয্যাকণ্টক" ছিলেন।

লিষ্ট্ যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া ইয়াঙ্কি-সমাজে ধনবিজ্ঞানের জন্ম প্রদান করেন। মার্কিন-জাতির আর্থিক প্রচেষ্টা, সংরক্ষণ-নীতি এবং বিজ্ঞান-সেবার ইতিহাসে জার্ম্মাণ লিষ্ট ছিলেন অগ্রদূত। আমেরিকা দখল করিবার পর হইতে লিষ্ট্ এবং লিষ্টের চিন্তা "দিগবিজয়ে" বাহির হয়। হাঙ্গারির স্বদেশ-সেবক লুই কোসুথ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিষ্ট্‌কে "দুনিয়ার ধন-বিজ্ঞান-শিক্ষক" নামে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। আজ পর্য্যন্ত কি আয়র্ল্যাণ্ড, কি চীন, কি চেকোস্লোভাকিয়া, কি ইতালী, কি ভারত,—জগতের যেখানেই স্বাধীনতা এবং সম্পদের

লড়াই চলিতেছে সেইখানেই লিষ্টের বাণী শিরোধার্য্য। লিষ্ট্ জার্ম্মাণির এক অমর পণ্ডিত।

(৩)

আর-একজন "জগদ্গুরু"ও জার্ম্মাণির সমাজবিজ্ঞানের আবহাওয়ায় দেখিতে পাই। তাঁহার নাম কাল্ মার্ক্স্। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইনি "ডাস কাপিটাল্" (বা পুঁজি) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে যে-সকল সূত্র প্রচারিত হইয়াছে সেগুলা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জগতের সর্ব্বত্র মজুর-সম্প্রদায় নিজের বাইবেল, কোরাণ বা গীতা-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। "মার্ক্সিস্‌ম্‌স্" বা মার্ক্স্-নীতি অগ্রাহ্য করিয়া আজ-কালকার বিজ্ঞানের আসরে কোনো মিঞা দাঁড়াইতে পারেন না। এই নীতির চরম প্রয়োগ হইয়াছে রুশিয়ার বোল্শেভিক গণতন্ত্রে।

লিষ্ট্ বা মার্ক্সের প্রত্যেক কথাই অকাট্য বা গ্রহণীয় একথা কেহই বলিবে না। দুনিয়ার কোনো ক্ষেত্রেই কোনো জগদ্গুরুর সকল মত সর্ব্বদা টেঁকসই নয়।

বার্লিনের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক শুমাখারকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম ঃ—"ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকালকার জার্ম্মাণ চিন্তাধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হইলে আপনি কোন্-কোন্ বিষয় বাছিয়া লইবেন?" খানিকক্ষণ ভাবিয়া ইনি বলিলেন ঃ—"আপনি কি আমাকে সোৎ-সিয়ালিস্‌মুস বা সমাজ-তন্ত্র-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" শুমাখার অথবা অধ্যাপক সোম্বার্ট্ সোশ্যালিষ্ট্ নন। কিন্তু এই সকল বিষয় আলোচনা না করিয়া ইঁহাদের উদ্ধার নাই। অর্থাৎ সকলকেই—মায় সোশ্যালিজমের কট্টর শত্রুদিগকেও সেই কাল্ মার্ক্সের "মহাভারত"-খানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই হয়।

ধনবিজ্ঞানের ধারা

শুমাখার মামুলী ধনবিজ্ঞান নামক কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইনি ব্যাঙ্ক, ইন্‌শিউর‍্যান্স, শিল্প-বাণিজ্যের গতিবিধি, নগরজীবন, রেল-খাল, মুদ্রাতত্ত্ব, লড়াইয়ের ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যতালিকা-মূলক নানা অনুসন্ধানে সময় কাটাইয়া থাকেন। জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানবীরগণের মধ্যে শ্মোল্লার ছিলেন নামজাদা। তাঁহার নামে একটা পত্রিকা চলিতেছে। নাম "শ্মোল্লারস্ য়ারবুখ্"। শুমাখার এই ত্রৈমাসিকের সম্পাদক।

শ্মোল্লারের মতন প্রসিদ্ধ লোক আডোল্‌ফ্ ভাগ্নার। তাঁহার "ঠেওরেটিশে সোৎসিয়াল য়েকোনোমিক্" জার্ম্মাণ-সংসারে চলে খুব। এই ধরণেরই একজন বড় লেখক ছিলেন কার্ল মেঙ্গার। ইতি প্রকৃত পক্ষে অষ্ট্রিয়ান। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মেঙ্গারের নাম ধন-বিজ্ঞানের মহলে-মহলে অল্পবিস্তর শুনা যায়। ভারতেও যাঁহারা উচ্চতম অনুসন্ধান চালাইতে অভ্যস্ত তাঁহাদিগকে মেঙ্গারের আব-হাওয়ায় আসিতেই হয়।

বর্ত্তমানে অষ্ট্রিয়ার সমাজতত্ত্ববিৎ ওথ্‌মান্ স্পান জার্ম্মাণ জাতির নং ১ শ্রেণীর লোক। ইনি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজ ও সঙ্ঘের সম্বন্ধ আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। জার্ম্মাণির ধনবিজ্ঞানবিৎ ক্লাপ্ মুদ্রাতত্ত্বের আসরে এক বিপ্লব ঘটাইতেছেন। ১৯০৫ সালে তাঁহার "ষ্টাট্‌লিখে ঠেওরি ডেস গেল্ডেস্" বাহির হইয়াছে। তাহার মোটা কথা এই:—"জগতে কোনো একটা ধাতু বা কাগজকে লোকে টাকা বলিয়া স্বীকার করে কেন? গবর্ণমেণ্ট এই বস্তুগুলাকে টাকা বলিয়া প্রচার করে বলিয়া। ঐ বস্তুগুলার নিজের ইজ্জৎ কিছুই

ভারত-তত্ত্ব

প্রাচীন ভারত যে-বিদ্যার আলোচ্য বস্তু তাহাকে "ইণ্ডোলোগী" বা ভারততত্ত্ব বলে। বর্ত্তমান জগৎ, যুবক ভারত ইত্যাদি বলিলে যাহা কিছু বুঝায় তাহা ইণ্ডোলোগীর অন্তর্গত নয়। এই-বিদ্যার ধুরন্ধরেরা বাসিমালের, "শুঁটকি মাছের" বেপারী।

ভারততত্ত্ব-বিদ্যায় আজকাল "নতুন" কি-কি চলিতেছে? ভারতীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের লেখা বা অনুসন্ধানগুলার খতিয়ান করিলে এককথায় বলিব,—প্রাচীন ভারতের লোকগুলা রক্তমাংসের মানুষ ছিল কি না সেই বিষয়ে খোঁজ চলিতেছে। অর্থাৎ ভারতীয় "ইণ্ডোলোগেরা" সেই সাবেক-কালের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় তথ্যগুলা জানিবার জন্যই সবিশেষ চেষ্টিত। পুরাণা জীবনের অভিব্যক্তিগুলা সনতারিখ-সমন্বিতভাবে সাজাইবার-গুছাইবার দিকে ভারতের ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের প্রধান প্রয়াস।

কিন্তু ইয়োরোপে "ইণ্ডোলোগ"দিগের অনুসন্ধান কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ইহারা চিরকালই প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্ববিৎ। শব্দ, ধাতু, প্রত্যয় ইত্যাদির আবিষ্কার এবং এইগুলার যোগাযোগ ব্যাখ্যা করা ইহাদের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য। এই-দিক্ হইতে মধ্য এসিয়া বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

মধ্য-এশিয়া-সক্রান্ত ভারততত্ত্বে বার্লিনের "ফোল্কার-কুণ্ডে" (অর্থাৎ নৃতত্ত্ব) বিষয়ক সংগ্রহালয়ের পণ্ডিত ফোন্ লেকক্ জগৎপ্রসিদ্ধ। সেই-ক্ষেত্রেই সংস্কৃতাধ্যাপক ল্যিডার্স্‌ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অশ্বঘোষ-প্রণীত সংস্কৃত নাটকের কয়েক টুক্‌রা মাত্র মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেইগুলার পাঠ উদ্ধার করিয়া ল্যিডার্স প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

তাহার ফলে প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটককে কালিদাস এবং ভাস এই দুয়ের বহু পশ্চাতে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

ভারতবাসীর পক্ষে মধ্য-এশিয়া "বৃহত্তর ভারতে"র এক প্রদেশ। মধ্য-এশিয়া-বিষয়ক আলোচনায় ভারতীয় ইণ্ডোলোগদের নজর পড়া উচিত।

নব্যশিল্পের ব্রহ্মাস্ত্র

(১)

ভারতে অনেকেই শুনিয়াছেন কলযন্ত্রের দ্বারা আকাশ হইতে নাইট্রোজেন চুষিয়া লওয়া সম্ভব। সেই নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রিক্ অ্যাসিড তৈয়ারী করিয়া পরে তাহার সাহায্যে অনেক "চীজ" তৈয়ারী করা হইয়া থাকে। এই আবিষ্কারের জন্য রসায়নাচার্য্য হাবার প্রসিদ্ধ। হাবার, কাইজার ভিল্‌হেল্ম ইন্‌ষ্টিটিউটের এক-বিভাগের পরিচালক।

হাবারের সঙ্গে কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি বলিয়া থাকেন ;—"তোমরা ভাবিয়াছ যে মান্‌হাইম সহরের "বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডা ফাব্‌রিক্" ইত্যাদি কার্‌খানায় কয়েকজন ভারতীয় রাসায়নিককে পাঠাইয়া ফলিত-রসায়ন-বিদ্যাটা দখল করিয়া ফেলিবে? বেয়াকুবির চূড়ান্ত। দুনিয়ার কোনো কার্‌খানায় প্রাণপাত করিলেও আসল জিনিষ কিছুই হস্তগত করিতে পারিবে না। সেজন্য চাই স্বদেশে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা। যতদিন ভারতে ধনপতিরা রিসার্চ্চ, গবেষণা, শিল্পরীতির প্রয়োগ ও পরীক্ষা করাইবার জন্য টাকা ঢালিতে রাজি না হইবে ততদিন তোমাদের দেশে নব্য ধনদৌলতের উৎপত্তি অসম্ভব। কথাটা শুনাইল খারাপ। কি করি?"

(২)

এই উপলক্ষে এঞ্জিনিয়ার মাট্‌শোসের একটা কথা মনে পড়িতেছে। ইনি বলেন :—"ইংরেজরা বর্ত্তমান্-জগতের শিল্প-বিপ্লবে অগ্রণী।

জর্ম্মাণরা প্রথম-প্রথম বিলাতে যাইয়া ইংরেজদের নিকট শিখিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখনকার দিনে নতুন-নতুন যন্ত্রপাতিগুলা সবই ছিল ইংরেজদের একচেটিয়া। ইহারা কোনো-মতেই এইসকল যন্ত্রের একটা সামান্য অংশ পর্য্যন্তও বিদেশে রপ্তানি হইতে দিত না। কঠোর আইনের দ্বারা রপ্তানি বন্ধ করা হইত। কিন্তু জার্ম্মাণরা কি করিয়া স্বদেশে সেই বিলাতী গুপ্তবিদ্যা বা ব্রহ্মাস্ত্রগুলা আনিয়া হাজির করিয়াছে? বিলাত-প্রবাসী একজন জার্ম্মাণ মিস্ত্রী যন্ত্রের এক টুকরা লুকাইয়া লইয়া গিয়া রুশিয়ায় হাজির হইত। আর-একজন সেই যন্ত্রেরই আর-এক টুকরা লইয়া স্পেনে উপস্থিত হইত। আর কেহ বা তৃতীয় এক টুকরা ট্যাঁকে করিয়া ডেন্মার্কে যাইয়া আড্ডা গাড়িত। পরে এইসকল লোক (যন্ত্রচোর) বিভিন্ন মুল্লুক হইতে বার্লিনে আসিয়া সম্মিলিত হইত। সেই সম্মেলনের ফলেই অসাধ্য সাধন সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যাতেই হাতে-খড়ি কঠিন। একবার কোনো-মতে কাজ সুরু করিয়া দিতে পারিলে তাহার পর স্বদেশ-সেবকেরা দেশটাকে অনেক দূর ঠেলিয়া তুলিতে পারে।"

মাটাশোস্ পূর্ত্তবিদ্যার, যন্ত্রপাতির এবং শিল্পবীরগণের ইতিহাস-সম্বন্ধে বহু সংখ্যক কেতাব লিখিয়াছেন। জার্ম্মাণির শিল্প-জীবনের গলিঘুঁচি ইঁহার আঙ্গুলের ডগায় অবস্থিত। জার্ম্মাণ-এঞ্জিনিয়ারিঙ্-পরিষদের এবং অনেকগুলা কটমট টেক্‌নিক্যাল কাগজের ইনি পরিচালক।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্যাভেরিয়ার মফঃস্বল

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

(১)

প্রায় গোলাকার সুবিস্তৃত সমতল ভূমি। যেখানেই দাঁড়াই না কেন, চারিদিকে দেখিতেছি তরুহীন পর্ব্বতের ছোট বড় মাঝারি শির। পাহাড়ের ডগাগুলা ছয় হাজার সাত হাজার আট হাজার ফিট উঁচু হইবে। চরণতল এখানে অবশ্য হাজার আড়াই ফিটের ডাঙায় খাড়া আছে। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (১৯২৪)। গরমে প্রাণ অস্থির।

ডাইনে বাঁয়ে দুই পল্লী বা ছোট সহর। নাম পার্টেনকির্খেন ও গার্মিশ। শিমলা দার্জ্জিলিঙের মতন এই অঞ্চল জার্ম্মাণদের গ্রীষ্ম নিকেতন, স্বাস্থ্য-জনপদ এবং বিলাস-কেন্দ্র। ব্যাভেরিয়ার দক্ষিণতম সীমানায় এই পল্লী-জোড়া অবস্থিত। জার্ম্মাণির আর কোথাও এত উঁচু জমিন নাই, কাজেই জার্ম্মাণির নর-নারীরা "জার্ম্মাণ আল্‌প্‌সে"র গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিতে শিখে নেহাৎ ছেলেবেলা হইতেই।

টিরোলের সীমানা ছাড়াইয়া মিট্টেনভাল্ডের পথে বিদ্যুতের গাড়ীতে নামিয়া আসিয়াছি। টিরোলী আল্‌প্‌সের তাল-গৌরব বা পর্ব্বত-মাহাত্ম্য ব্যাভেরিয়ার কপালে বেশী পরিমাণে জুটে নাই দেখিতেছি। যাহা হউক, আল্‌প্‌স ত বটেই!

(২)

জার্ম্মাণিই গরমের ছুটিতে এইখানে সশরীরে হাজির। সকলের চিত্তই উৎফুল্ল, সকলেই গ্রীষ্ম-পোষাকে বা পাহাড়ী পোষাকে চলাফেরা করিতেছে। তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-পৌঢ়া, বুড়া-বুড়ী সকলেই সমান ভাবে যেন যৌবন-পূজায় মাতিয়া রহিয়াছে। পা-গাড়ীরও যেন অন্তই নাই।

আবার কেহ পাহাড়ের দিকে ছুটিতেছে,—কেহ পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছে। পায়-চলা পথিক বেশী কি সাইকেল-যাত্রীর দল বেশী বলা কঠিন। সড়কে, গলিতে সর্ব্বত্রই নরনারী বোঁচকা-ঘাড়ে, দূরবীণ-হাতে, লাঠিসোটা-সম্বল হইয়া যাওয়া আসা করিতেছে। সর্ব্বত্র শক্তির গতিবিধি, স্বাস্থ্যের আবহাওয়া আর সৌন্দর্য্যের আরাধনা।

কেহই ঘরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সকলেই শরীর-চর্য্যায় লাগিয়া গিয়াছে। জীবনকে নয়া নয়া কর্ত্তব্যের জন্য পোক্ত করিয়া তুলিতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শশব্যস্ত। প্রত্যেকের চোখেমুখে এবং মাংসপেশীতে দেখিতেছি যে, মেয়েপুরুষ উভয়েই সূর্য্যরশ্মিকে চুষিয়া খাইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। প্রকৃতির প্রত্যেক ঐশ্বর্য্যকে অঙ্গে ও চিত্তে বাঁধিয়া রাখা ইহাদের স্বধর্ম্ম বোধ হইতেছে। শীতের পূর্ব্বে শরীরটাকে একদম নয়া গড়িয়া তুলিয়া পূরা-পূরি চাঙ্গা হইয়া তবে ইহারা নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিবে।

শক্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের পূজা এখানে যেমন নিবিড় ও সতেজ আর কোথায়ও এরূপ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই আব-হাওয়ায় সময় কাটাইলে লাভ আছে।

গার্মিশে চাষীর আবহাওয়া

পয়সাওয়ালা লোকের সহর,—হোটেলে খরচ জন প্রতি রোজ প্রায় পনর টাকার কাছাকাছি। ও-সংখ্যা কওয়া বেয়াদবি। জার্ম্মাণ জাতি

স্বদেশী হোটেলকে বলে "গাষ্ট্-হাউস" বা "গাষ্ট্-হোফ" অর্থাৎ অতিথিশালা। এখানে খরচ প্রায় আধাআধি।

কিন্তু জার্ম্মাণ পল্লীতে বসবাসের আর এক কায়দা আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। তাহা আবিষ্কার করাও গেল। পল্লী-পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে এক বিরাশী বছরের বুড়া চাষীর ঘরে গিয়া হাজির হইলাম। বুড়ীর বয়স আশীর কাছাকাছি। দুইয়েই অথর্ব্ব। তবে মেয়ে আর জামাই ইহাদের তত্ত্বাবধান করে। মেয়ের বয়স পঁয়তাল্লিশ হইবে। শুনিলাম, অতিথি রাখিবার ঘর আছে। অতএব এইখানেই স্থিতি। পাশেই চাষীদের জমিন আর ঘোড়া বলদের বাথান। রোদে-মাখা পেয়ার-পীচ গাছে-গাছে ঝুলিতেছে।

সদর ঘর হইতে দোতলায় উঠিতে হইল মইয়ে করিয়া। চাষী-কন্যা আগে উঠিয়া মাচাঙের দুয়ারটা তুলিয়া ধরিল। তাহার পর একে একে উঠা বা প্রবেশ। উঠা-কাণ্ড শেষ হইবামাত্র দুয়ারটা নামাইয়া দেওয়া হইল। দশ বৎসরের উপর দুনিয়ায় ভবঘুরে-গিরি করিতে করিতে এতদিনে বিক্রমপুর-প্রসিদ্ধ "কার" আবিষ্কার করিতে পারিলাম!

ব্যাভেরিয়ান আল্প্সের পল্লীভবনে দোতলাগুলা আমাদের "কার" ছাড়া আর কিছু নয়। তবে সূর্য্যের আলো আসিতেছে, কাঠের মেঝে ঝকঝক করিতেছে। ছাদটায় মাথা ঠেকিতেছে না। দুই দিকে দুই জানালা দিয়া বারান্দায় যাওয়া যায়। মেজেটা তোফা পরিষ্কার, ময়লা জঞ্জাল ইত্যাদি কোথাও নাই।

"বিনা পয়সায়" দেশ-দেখা

সড়কে এক যুবার সঙ্গে আলাপ হইল। গোটা টিরোল, মায় ত্রেন্তিনোর উত্তর জনপদ পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া দেখিয়া আসিয়াছে।

বলিল, "এই মাত্র ৎস্থগ স্পিট্সে হইতে নামিয়া আসিতেছি।" ৎস্থগ স্পিট্সে জার্ম্মাণ আল্প্সের গৌরীশৃঙ্গ! প্রায় আট হাজার সাত শ ফিট উঁচু!

গার্মিশ-পার্টেনকির্থেন পল্লী ৎস্থগ-স্পিট্সে-তীর্থযাত্রীদেরই আধা-পথের আড্ডা বিশেষ। ছোকরার বয়স বিশ বৎসর হইবে। বার্লিনের ব্যবসা-কলেজে লেখাপড়া করে। "প্রায় বিনাপয়সায়" দেশ দেখার সঙ্গেই প্রকৃতি-পূজা চলিতেছে। ঘাড়ে আধমণ মাল।

ব্যাভেরিয়ার ঘরবাড়ীতে টিরোলের জেরই দেখিতেছি। লাল টালি আর সাদা দেওয়াল,—দোতলায় কাঠের বারান্দা, আর উপরা-উপরি তিন সার জানালা সর্ব্বত্রই বিরাজমান। শিলার-কলার আর হোফার-সাস্পেণ্ডার এবং জানু পর্য্যন্ত প্যাণ্ট এই পল্লীতে পুরুষ মাত্রেরই পরণে। আর মেয়েরাও এখানে টিরোলী গ্রীষ্মের পোষাকে সাজিয়া বেড়াইতেছে।

এক তরুণী আগেকার জানাশুনা লোক। টুপী কিনিবার জন্য মিউনিক পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতেছেন। বলিলেন, "আমার মা আপনাদের জন্য বসিয়া আছেন। অটো-যোগে পাহাড়-পরিক্রমার ব্যবস্থা হইয়াছে।" এখানে ইঁহারা বসবাস করেন এক "প্রাসাদে।" আসলে বার্লিনের বাসিন্দা।

হোটেলে চিত্রশিল্পের বাজার

"ভিট্টেলস্বাথার হোটেল"টা চিত্রশিল্পীদের এক বাথান। খরচ পত্র মারাত্মক বেশী নয়, স্থইস হারে দর দস্তর।

হোটেলের মালিক খাবার-ঘরে লইয়া গেলেন। দেওয়ালে-দেওয়ালে শিল্পীদের আঁকা ছবি ঝুলানো আছে। একটার দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া দেখিতেছি, এমন সময়ে মালিক বলিলেন:—ওটা

আঁকিয়াছেন আমাদের অতিথি শ্রীযুক্ত এবার। মিট্টেন-ভাল্ড অঞ্চলের প্রসিদ্ধ পাহাড়-প্রদর্শক ("ব্যর্গ্ ফ্যিরার") এই চিত্রের অঙ্কিত বিষয়। বলিলাম, "মনে হইতেছে মানুষটাকে শিল্পী যেন একদম পাহাড়েরই এক অংশ রূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। পর্ব্বতের নিরেট সামর্থ্য আর শুক্‌না সুষমা এই চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও পারিপার্শ্বিকে রূপ পাইয়াছে।"

চিত্রকর টিড্‌য়েন উপস্থিত ছিলেন। ইহার আঁকা "মুর্গীর দল" এক দেওয়ালে ঝুলিতেছে। আর এক দেওয়ালে দেখিলাম "সরোবরে হাঁসের সাঁতার।" পাহাড়ী "আল্‌মে"র আবেষ্টনে ঘোড়া, বলদ বা ভেড়াও দেখিতেছি কোনো কোনো কাম্বিশে।

সবই খাঁটি প্রাকৃতিক, ঠিক যেন ফটো। কিন্তু চিত্রে ফটো তোলা ছোটখাটো বা নগণ্য শিল্প নয়। ভেড়াই হউক বা গরুই হউক বা মানুষই হউক, কাম্বিশের উপর বস্তুগুলাকে সাজাইতে পারাই "রূপ-দক্ষ"তার আসল কথা। কোন্ মুর্গীটাকে কোথায় বসাইতে হইবে, কোন্ রঙের কতখানি কোন্ হাঁসটার কোথায় লেপিতে হইবে, ঘরের ছাদগুলা পাহাড়ের কোলে কোথায় ঠাঁই পাইবে, মানুষের ঘাড়টা কোন্ দিকে কতখানি বাঁকাইয়া রাখিতে হইবে এই সব সমস্যায় যাঁহারা ওস্তাদ, তাঁহারাই চিত্রমুল্লুকে "শিল্পী"। এই জন্যই চরম মাত্রায় "প্রকৃতিনিষ্ঠ" হইয়াও রূপরঙের সৃষ্টিতে অতিমাত্রায় আদর্শবাদী হওয়াও সম্ভব।

টিডয়েন বলিলেন :—"গত মাসে গোটাচোদ্দ ছবি বিক্রী করিতে পারিয়াছি। কিন্তু গার্মিশ-পার্টেনকির্থেনের স্বাস্থ্যান্বেষীরা বাবু, বিলাসী লোক। সুকুমার শিল্পে পয়সা খরচ করা তাঁহাদের চিন্তায় অপব্যয় মাত্র!"

ব্যাভেরিয়ায় টিরোলী দৃশ্য

পাহাড়ী পল্লীর যে যে দৃশ্য টিরোলে দেখিয়াছি, সেই সবই ব্যাভেরিয়ায়ও মজুদ। পথে পথে "কাপ্লেলে" বা দেবস্থান শোভিতেছে, আল্মের "সেন্নার" বা রাখাল গরু চরাইতেছে। পল্লী-কুটীর হইতে ৎসিথারের তার-সঙ্গীত আসিতেছে। গো-ছাগলের গলায় ঘণ্টা বাজিতেছে।

এই গেল বাহিরের দৃশ্য-শ্রাব্য। ঘরের ভিতর দেওয়ালে মা-মেরী বা যীশুর চিত্র ও মূর্ত্তি। কপাটে দেবতাদের নাম লেখা। তাকে সাজান রহিয়াছে সেকালের অর্থাৎ বাপদাদাদের আমলের হাঁড়ি-কুঁড়ি-থালা-বাসন ইত্যাদি।

"গাষ্টহোফ"-ওয়ালার মেয়ে বড় রসিক। প্রুশিয়ার অর্থাৎ উত্তর জার্ম্মাণির এক সপত্নীক পর্য্যটকের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা চলিতেছে। ব্যাভেরিয়ার লোকেরা প্রুশিয়ানদের জার্ম্মাণ ভাষাকে বর্ব্বরোচিত বিবেচনা করে—এইটুকু মাত্র বুঝিলাম। বিদেশীদের পক্ষে গার্মিশের জার্ম্মাণ বুঝিয়া উঠা অসাধ্য। টিরোলীরা অবশ্য প্রুশিয়ানদের বিরুদ্ধে ব্যাভেরিয়ানদের দলে ভিড়িতেছে।

শু-প্লাট্লার নাচ

সুইটসারল্যাণ্ডের ডাভোস, সাঙ্কট্ মোরিট্স্ ইত্যাদি শহর যা, জার্ম্মাণদের চিন্তায় ব্যাভেরিয়ার গার্মিশ-পার্টেনকির্খেন তাই। অর্থাৎ পয়সার জোরে এই সকল স্বাস্থ্য-নিকেতনের বিলাস ও বাবুগিরির সকল মজাই লুটা সম্ভব! নাচ, গান, বাজনার পালা লাগিয়াই আছে।

গাষ্টহোফের খানা-ঘরে মিট্টেনভাল্ডের এক ছুতোরের সঙ্গে আলাপ হইল। বেহালা তৈয়ারী করিবার শিল্পে এই কারিগর ওস্তাদ। শুনিতেছি, মিট্টেনভাল্ড অঞ্চলের কাঠে অত্যুৎকৃষ্ট বাদ্য-যন্ত্র তৈয়ারী হয়।

এক বাগিচায় "শু-প্লাট্‌লার" নাচ চলিতেছে। লাফাইয়া-লাফাইয়া জুতা থাবড়ানো এই নাচের এক বিশেষত্ব। বাজিতেছে প্রধানভাবে ৎসিথ্যার। বেহালাও মাঝে মাঝে।

"মেয়ে ধরা" এই নাচের অন্যতম অঙ্গ। মেয়ে পাকড়াও হইয়া গেলে পর নর্ত্তক নর্ত্তকী দুয়ে মিলিয়া নানাপ্রকার ভঙ্গীর রূপ দেখায়। হাতে জড়াজড়ি করিয়া জানালা তৈয়ারী করা,—এবং জানালার দুই দিক্ হইতে পরস্পর দেখাদেখি করা, শু-প্লাট্‌লার নাচের এক কৌতুক-ময় রূপ।

ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোল ইত্যাদি জাতির নাচে আর আল্পস্ পাহাড়ের চাষীদের এই নাচে জাতিগত সাদৃশ্য ও সাম্য লক্ষ্য করা হয়ত কঠিন নয়। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, টিরোল ও ব্যাভেরিয়ার পল্লীতে-পল্লীতে, পাহাড়ী ময়দানে, খোলা মাঠে, ৎসিথ্যারের সঙ্গে সঙ্গে জুতা থাবড়াইয়া নাচা কিষাণ ও রাখাল নর-নারীদের এক মস্ত আমোদ।

এই সকল পাহাড়ী নাচে শহুরে সভ্য বাবুরা বড় একটা যোগ দেয় না। তবে হোটেলে-রেষ্টরাণ্টে, বিলাস-বাগিচায় অথবা অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রে বাবুরা পাড়াগেঁয়ে নর্ত্তক-নর্ত্তকীদিগকে ভাড়া করিয়া আনিয়া পাহাড়িয়া নাচের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেই সূত্রেই পার্টেন-কির্খেন বা গার্মিশ ইত্যাদি বাবু-কেন্দ্রে শু-প্লাট্‌লার নাচের রেওয়াজ।

পল্লী-জীবন

বাজারের চার দিকে যে ঘরবাড়ী দেখিতে পাই অথবা লোকালয়ের এ-কোনে ও-কোনে যে সব কুটীর চোখে পড়ে সবই যেন ভারতবাসীর নিকট অনেকটা পরিচিত আকারের বোধ হইবে। এই ধরণের বাস্তুকে সুইস নামে বিবৃত করা হইয়া থাকে। ভারতীয় বাস্তুশিল্পীরা এই

গঠনরীতিকে বাংলা দেশের কোনো কোনো জেলার (যথা পূর্ব্ব বঙ্গের) রীতি রূপে বিবৃত করিতে অগ্রসর হইলে ভুল করিয়া বসিবেন কিনা সন্দেহ।

টিরোলের মতন ব্যাভেরিয়ায়ও সড়কের মোড়ে চৌবাচ্চার তদবির করিতেছেন জল-দেবতার মূর্ত্তি। পথে পথে দেবস্থান (কাপ্লেলে) দস্তুর মতনই নজরে পড়িতেছে। নর-নারীরা হাঁটিতে হাঁটিতে যীশু বা মেরী বা সাধু মূর্ত্তি দেখিবামাত্র মন্তর উচ্চারণ করিয়া ডান হাত ঠেকাইতেছে কপালে, বুকে এবং ডাইনে ও বাঁয়ে। হাঁটুও সহজেই, যেন অনেকটা অজ্ঞাতসারেই,—নোয়াইয়া আসিতেছে।

একজন ফটো-ব্যবসায়ীর নিকট শুনিলাম, জার্ম্মাণরা স্বদেশের জল-বায়ুর খবর রাখিবার জন্য ৎসুগ্‌স্পিট্‌সের উপরে একটা পর্য্যবেক্ষণালয় নির্ম্মাণ করিয়াছে। এত উঁচুতে মেটেওরলজিক্যাল কেন্দ্র জার্ম্মাণিতে আর নাই।

আল্প্‌স্‌-পরিক্রমা

(১)

আল্প্‌সের ফরাসী অঞ্চলগুলা দেখা হয় নাই। অর্থাৎ পশ্চিমতম আল্প্‌স্‌ এখানো অদেখা রহিয়াছে। সেই সকল আল্পসের অধিকারী স্থইস জাতি। আল্প্‌সের সর্ব্বোচ্চ শিখর মঁব্লাঁ জেনেভা হ্রদের আবেষ্টনেই অবস্থিত।

ফরাসী আল্প্‌স্‌ ছাড়া অন্যান্য সকল আল্পস্‌ই নানা কেন্দ্রে অল্পবিস্তর চাখিয়া দেখা গেল। আল্পসের উত্তর সীমানা মিউনিক-কুফষ্টাইন, ষ্টুট-গার্ট-শাফহাউজেন এবং মিট্টেনভাল্ডের পথে পার হওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ সীমানা দেখা হইয়াছে ইতালির পন্তে ত্রেজিয়া, কমো, ভেরোণা ইত্যাদি জনপদে। মধ্য আল্পসে বসবাস করা গিয়াছে, টেসিন প্রদেশের স্থইস মুল্লুকে, ইতালির ত্রেন্তিনোয় আর টিরোলে। আল্প্‌সের পূর্ব্বতম

সীমানা—টিরোলের সালৎসাক ডাল,—ফুঁড়িয়াও ভিয়েনা পর্য্যন্ত যাওয়া গিয়াছিল। কাজেই আল্পস্-পরিক্রমা প্রায় ষোল কলায়ই পূর্ণ হইয়াছে বলা চলিতে পারে।

ধরা যাউক, কোনো ব্যক্তি মধ্য এশিয়ার খোতান হইতে সুরু করিয়া যেন আফগানিস্থানের পথে হিমালয়ের পশ্চিম জনপদ চাখিয়া পঞ্চনদে হাজির হইল। তাহার পর সিন্ধু গঙ্গা গোমতি তিস্তা ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদির ধারা-মুখরিত দক্ষিণ হিমালয়ের প্রস্তর-উন্মাদগুলা স্ববশে আনিতে-আনিতে চীন মুল্লুকের যুন্-নান-ফু পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল। শেষে ছিছোয়ান প্রদেশ হইয়া তিব্বতের উত্তর প্রান্তে গিয়া তাহার আড্ডা গাড়িবার সুযোগ ঘটিল।

এইরূপে হিমালয়-পরিক্রমা ঘটিলে যে সকল অভিজ্ঞতা জন্মিবার কথা, আল্‌স্ পরিক্রমণেও সেই সব ঘটিতে বাধ্য। তবে হিমালয়ের বহর যতখানি, আল্‌সের চৌহদ্দি ততখানি নয়। এই যা প্রভেদ।

(২)

জার্ম্মাণ মুল্লুকের আল্‌সে পর্ব্বত-গৌরব একটা বড়-কিছু নয়। সুইটসার্ল্যাণ্ডে, ত্রেন্তিনোয় আর টিরোলে পর্ব্বতের ভাস্কর্য্য, পর্ব্বতের বাস্তু, পর্ব্বতের বর্ণ ও রূপবৈচিত্র্য অসীম।

সুইটসার্ল্যাণ্ডে আল্পসের যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে বন-সম্পদ নেহাৎ বিরল। টিরোলের পাইন-বন ঐশ্বর্য্যে ভরপুর। ব্যাভেরিয়ায় সেই বন-সম্পদের কিছু কিছু জের পাওয়া যায়। শো-আর্ট্‌সভাল্ড অঞ্চলের বনশোভা অতুলনীয়।

কি ব্যাভেরিয়া, কি টিরোল, কি সুইটসার্ল্যাণ্ড, কি ত্রেন্তিনো সকল অঞ্চলই বন-সম্পদে ভরা। কিন্তু সুইস-আল্‌সের কোলে-কোলে যে সব সুনীল জলরাশির আধার বিরাজ করিতেছে তাহার তুলনা জগতে

পাওয়া কঠিন। ইতালি বোধহয় এই হিসাবে স্থইটসাল্যাণ্ডের কাছা-কাছি গিয়া ঠেকিতে পারে।

ত্রেন্তিনোর আঙুর-ক্ষেত ইতালিয়ান আল্‌পসের বিশেষত্ব। সেই গৌরব টিরোলেও নাই, জার্ম্মাণিতেও নাই। দক্ষিণ স্থইটসাল্যাণ্ডের টেসিন নামক ইতালিয়ান প্রদেশে তাহার জের আছে। আবার পীচ, পেয়ার, আপেল এবং অন্যান্য ফলের বাগানেও ত্রেন্তিনোর আল্পস্‌-জনপদ সকল দেশের সেরা।

(৩)

ব্যাভেরিয়ার পাহাড়ীরা জার্ম্মাণভাষী। টিরোলীরাও জার্ম্মাণভাষী। স্থইস আল্‌পসে চলে জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইতালিয়ান। ইতালির আল্পস্‌-বাসীরা ইতালিয়ানে কথা কয়। ফ্রান্সের পাহাড়ীদের ভাষা ফরাসী। কাজেই ভাষা হিসাবে আল্পস্‌ তিন জাতিতে বিভক্ত।

জার্ম্মাণ স্থইটসাল্যাণ্ডের নরনারী প্রধানতঃ প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ান। আল্পসের অন্যান্য জনপদের পাহাড়ীরা সকলেই রোমান ক্যাথলিক।

এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী এবং তিন ভাষাভাষী নর-নারী পাঁচটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত। জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, স্থইট্‌সাল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালি এই পাঁচদেশের সরকার আল্পস্‌-পাহাড়ের মালিক। এক ইতালি ছাড়া অন্যান্য সকল রাষ্ট্রেই গণতন্ত্রের স্বরাজ চলিতেছে।

আল্পস্‌ পাহাড়ের সকল নর-নারীই স্বাধীন। এক মাত্র ত্রেন্তিনোর তিন লাখ অষ্ট্রিয়ান অর্থাৎ দক্ষিণ টিরোলের জার্ম্মাণরা ইতালিয়ানদের গোলাম। এই সমাজে জার্ম্মাণ ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইতালি কড়া আইন জারি করিয়াছে। পাঠশালার শিশুরাও ইতালিয়ান শিখিতে বাধ্য। জার্ম্মাণ ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা ইতালিয়ান সরকারের

(৪)

আল্প্‌স্ আগাগোড়া চাষী ও রাখালদের দেশ। চাষ এবং পশুচারণ আল্প্‌স্‌বাসীদের প্রধান ব্যবসা। শিল্প বলিলে এই সকল অঞ্চলে প্রধানতঃ হস্ত-শিল্প এবং কুটীর-শিল্প বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান জগতের নবীন শিল্পও আল্প্‌সে দেখা দিয়াছে। এই হিসাবে স্বইটসার্ল্যাণ্ড সকলের উপরে। তাহার পরে ব্যাভেরিয়া, টিরোল এবং ফ্রান্স। নব্য শিল্পের কোঠায় ইতালিয়ান আল্প্‌স্ হাতে খড়ি দিতে সুরু করিয়াছে।

বিদ্যুতের বল পাওয়া যায় পর্ব্বতের নির্ঝরাস্থায়। সেই বিপ্লবময় নর্ত্তন-গর্জ্জনশীল দরিয়ার স্রোত হইতে বিজলী তৈয়ারি করিয়া আল্প্‌স্-বাসীরা আগুন জ্বালিতেছে, গাড়ী চালাইতেছে, ফ্যাক্টরি চালাইতেছে। স্বইসরা এই দিকে অগ্রণী। ব্যাভেরিয়ান, টিরোলী, ফরাসী এবং ইতালিয়ান সকলেই বিদ্যুতের ক্ষমতা কাজে লাগাইতে ঝুঁকিয়াছে।

আর্থিক হিসাবে স্বইস পাহাড়ীদিগকে সবার চাইতে সচ্ছল মনে হইয়াছে। ইতালিয়ান নরনারীরা দরিদ্রতম। টিরোলী এবং ব্যাভেরিয়ানরা মাঝামাঝি।

টেসিনের স্বইস-ইতালিয়ান এবং ত্রেন্তিনোর ইতালিয়ান পল্লীতে ঘর-বাড়ীর দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা ও নোংরামি যথেষ্ট দেখা যায়। অন্যান্য জাতীয় আল্প্‌স্-পল্লীতে কুটীর-সৌষ্ঠব যে-কোনো বিদেশীর চিত্ত আকর্ষণ করিবে। আল্প্‌সের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই পাঠশালাও আছে, মন্দিরও আছে।

ব্যাভেরিয়ার সমতল ভূমি

রেলে বসিলাম—চতুর্থ শ্রেণীর সওয়ারি। তৃতীয় শ্রেণীতে বেশী লোক চলা-ফেরা করে না। জার্ম্মাণ নর-নারীর ঝোঁক চতুর্থ শ্রেণীর

ঘণ্টাখানেকের ভিতর পাহাড়গুলা দূরে সরিয়া গেল। স্থরু হইল সমতল ভূমি,—ময়দানের পর ময়দান। গার্মিশ-পার্টেনকির্খেনের "টিরোলী" বা "স্বইস" রীতির লালে-সাদায় গড়া কাঠের কুটীর সর্ব্বত্রই সবুজ আবেষ্টনে মোড়া দেখিতেছি। পাইন-বনের আওতা এখনো ফুরায় নাই।

ষ্টার্ণব্যর্গ হ্রদের বুকে শত শত ডিঙি সাদা পাল উড়াইয়া স্বচ্ছন্দে ভাসিতেছে। ষ্টীমারও দেখিতেছি। এক ব্যাভেরিয়ান পরিবার এইখানে নামিয়া গেল। শুনিলাম, মিউনিকের লোকেরা এই সাগরের কোলেই গরমের ছুটি কাটাইতে ভালবাসে। এই ধরণের 'জে' অর্থাৎ হ্রদ বা সাগর মিউনিকের অনতিদূরে গণ্ডা গণ্ডা ছড়াইয়া আছে।

ছোট-খাটো পাহাড়ী ক্ষেতে যে সব শস্যের চাষ দেখা যাইতেছিল সেই সবই এই সকল ময়দানের সম্পদ্। বলদে টানা গাড়ী এই অঞ্চলে বিরল নয়। চাষীদের নতুন নতুন বসতবাড়িগুলা দেখিতে আনন্দ হয়। নয়া তাজা গড়নের ছড়াছড়ি জার্ম্মাণ সমাজে যত অন্য কোথায়ও তত বেশী দেখা যায় কি না সন্দেহ। বোধ হয় এক ইয়াঙ্কিস্থান এই হিসাবে জার্ম্মাণির সঙ্গে টক্কর দিতে পারে।

চিমনি-বহুল, বিপুল কারখানা-সমন্বিত আবেষ্টনের ভিতর মিউনিকে আসিয়া দাঁড়াইলাম। নবেম্বর (১৯২৩) হইতে স্থরু করিয়া আট মাস কাল কেবল পাহাড়ী "তালে"র তরঙ্গে-তরঙ্গে সাঁতার কাটিতেছি। রেখার সেই গতি-ভঙ্গী, চড়াই-উৎরাইয়ের বিপ্লব-গরিমা, পাথরের কছরত সবই এক মুহূর্ত্তে স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। যেন কয়েক সপ্তাহ সাগর-বক্ষে ষ্টীমারে কাটাইবার পর ডাঙায় নামিলাম বোধ হইতেছে। চ্যাপটা সোজা মসৃণ মাটির উপর পা যেন পড়িতেই চায় না! এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা (জুলাই ১৯২৪)।

কিষাণ-পল্লীর স্বচ্ছন্দতা

তবে এখনো পল্লীতীর্থের যাত্রী। কাজেই মিউনিকের শহুরে জীবনের সঙ্গে অসহযোগ-নীতি চালানো গেল। গাড়ী বদলাইয়া আবার চাপিলাম এক চতুর্থ শ্রেণীর কামরায়। ইজার-দরিয়ার পাশে-পাশে ভাটাইয়া চলিতেছি।

ষ্টার্ণব্যর্গ অঞ্চলেই দুচারখানা নতুন ধরণের বিপুলাকৃতি ইমারত সুরু হইয়াছে। মিউনিকের আশে পাশে সেই জার্ম্মাণ-সুলভ রীতির ঘরবাড়ী অনেক। তবে "সুইস" টিরোলী কুটীর এখনো চলিতেছে।

দু এক ষ্টেশন ধরিয়া চিমনীর প্রভাব দেখা গেল। পরে প্রধানতঃ চাষ-আবাদের মণ্ডল। প্রত্যেক কিষাণ-কুটীরই যেন এক একটা ভিলা জাতীয় সৌধ। দেড় দুই ঘণ্টার পথে একটাও পুরাণা পোড়ো বাড়ী চোখে পড়িল না। সবই তাজা ঝরঝরে নিরেট সুমার্জ্জিত সুন্দর। ব্যাভেরিয়ার কিষাণ নরনারী সুখে আছে।

পাকা সোনালী রাই শস্যের উপর সূর্য্যরশ্মি হাসিতেছে। যবও পাকিয়া উঠিতেছে। আল্‌ফাল্‌ফা ও ক্লোভার ঘাসের সবুজ দীপ্তিতে ময়দানগুলা সমুজ্জ্বল। আলুর ফসলও দেখিতেছি। অনন্ত অনন্ত যোজন যোজন এই দৃশ্য। ডাইনে বাঁয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়—কেবল কৃষিক্ষেত্রের সবুজ বা হল্‌দে কিরণ, আর ফাঁকে ফাঁকে সাদা দেওয়াল-ওয়ালা লাল টালির টিরোলী কুটীর। জার্ম্মাণদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিংসা না করিয়া থাকা অসম্ভব। জার্ম্মাণির পল্লীতে-পল্লীতে যে সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিরাজ করিতেছে সেই সুখ-স্বচ্ছন্দতা দুনিয়ার সর্ব্বত্র বিরাজ করুক। রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে ভগবানের নিকট ইহাই একমাত্র উপযুক্ত প্রার্থনা।

মজুর-চাষীদের জীবন-কথা

পাশেই এক চাষী কামরার সকলের সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে খোস গল্প চালাইতেছে। ভূমিকা নিম্নরূপ :—

"বুঝ্‌লে ভাইয়া, আজ সকালে নেহাৎ বেয়াকুবের মতন কয়েক গ্লাস বেশী টানিয়া ফেলিয়াছি। বাড়ীতে পৌছিবা মাত্র স্ত্রীর হাতের ঝাঁটা না খাইয়া উদ্ধার নাই।"

যাহা হউক দলে ভিড়িয়া যাওয়া গেল। কেহ বলিতেছে—"ঐযে যবের শিষ দেখিতেছ উহাই ব্যাভেরিয়ার গৌরব। যবে তৈয়ারী হয় বিয়ার। আমরা মদ একপ্রকার চিনি না বলিলেই চলে। আঙুরের ক্ষেত এ সব অঞ্চলে নাই। বিয়ার আমাদের পক্ষে মামুলী জল বিশেষ।"

মজুরে চাষীতে ঝগড়া বাধিয়া গেল। মজুরের বাণী এই,—"চাষীরা বড়লোক হইতেছে, আর মারা পড়িতেছি আমরা। গম রাই ওট্‌স্ যব ইত্যাদি শস্য বেচিয়া চাষীরা প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইয়াছে। সেই লাভের টাকাই দেখা যাইতেছে এই সব প্রাসাদতুল্য পল্লী-ভবনে। গভর্মেণ্ট চাষীদের পক্ষ টানিয়া খাজনার আইন কায়েম করিয়াছে। এই কয় বৎসর ধরিয়া খাজনার চাপ পড়িতেছে ফ্যাক্টরি-চালিত শিল্পের উপর। কাজেই ফ্যাক্টরির মালিকেরা মজুরদিগকে কম বেতন দিতেছে অথবা বরখাস্ত করিতেছে।" ইত্যাদি।

একজন সোশ্যালিষ্ট-পন্থীর মুখে শুনিলাম, "দেখুন ত মশায় কোনো বিদেশী পর্য্যটক ব্যাভেরিয়ায় বেড়াইতে আসিলে জার্ম্মাণিকে দরিদ্র বিবেচনা করিতে পারে কি? বিগত দশ বৎসরের ভিতর যে জাতি পল্লীগৃহগুলা আগাগোড়া নয়া গড়িয়া তুলিতে পারে তাহাকে খবরের কাগজের লেখার জোরে কাঙাল সপ্রমাণ করা সম্ভব নয়। এই জন্যই

ফরাসী ও ইংরেজরা ভার্সাইয়ের কড়ার অনুসারে জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ক্ষতিপূর্ত্তির সকল টাকা কড়ায়-ক্রান্তিতে আদায় করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

ইজার-"তাল"

বিয়ারের ভাটি আছে অথবা ছিল প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই বোধ হয়। সেকেলে রীতিতে কোনো কোনো কিষাণ বা "গাষ্টহোফে"র মালিক আজও নিজ নিজ প্রয়োজন মত বিয়ার তৈয়ারি করিয়া লয় শুনিতেছি। তাহা ছাড়া নব্য রীতির ফ্যাক্টরি,—ছোট বড় মাঝারি,—সর্ব্বত্র মাথা তুলিয়াছে।

এখন লড়াই চলিতেছে ছোট ফ্যাক্টরিতে আর বড় ফ্যাক্টরিতে। বিয়ারের রাজ্যে—অন্যান্য শিল্পরাজ্যের মতন—বড়র জয়ই ঘোষিত হইতেছে। মিউনিকের বৃহদায়তন "বীরভাট্টি"গুলা পল্লী ও ছোট শহরের কারখানাসমুহ গ্রাস করিবার পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিয়ারের মুল্লুকে পল্লী-শিল্প বা কুটীর-শিল্প ক্রমশঃ প্রত্নতত্ত্বের আড্ডায় সরিয়া পড়িতেছে। (আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী পল্লীতে এক বিয়ারের কারখানাকে বলে "বীরভাট্টি"—ইতি ভাষাতত্ত্ব।)

ইজারের উপর একটা বড় গোছের পল্লী বা তেসরা দর্জ্জার শহর ফ্রাইজিঙ। ষ্টেশনের নিকট গির্জ্জাটা দেখাইতেছে কেল্লার মতন। এই দেবালয়ের সম্পর্কে একটা বিদ্যাপীঠ আছে। তাহাতে ব্যাভেরিয়ার জন্য পুরোহিত তৈয়ারি হয়। "গিমনাজিয়ুম" নামক মধ্য-বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাশ না হইলে কেহ এই পুরোহিত-পাঠশালায় ভর্ত্তি হইতে পায় না। গিমনাজিয়ুমের শেষ পরীক্ষা আমাদের বি-এ পরীক্ষার প্রায়

পুরুতগিরির বিদ্যায় সার্টিফিকেট পাইতে হইলে ফ্রাইজিঙের কলেজে কমসে-কম পাঁচ বৎসর কাটান আবশ্যক।

প্যাসেঞ্জার-ট্রেণ,—তবে নেহাৎ গরুর গাড়ীর "রেটে" চলিতেছে না। কিন্তু প্রত্যেক পল্লীতেই স্থিতি, এবং লোকজনের উঠানামা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মালের বস্তা ঘাড়ে করিয়া নরনারীরা মেঝে দখল করিয়া বসিতেছে।

হুঁকা সদৃশ "পাইপে" তামাকু সেবন চলিতেছে। ধোঁয়াটা জলের ভিতর দিয়া আসিলেই এসিয়ায় বসবাসের আনন্দ পাওয়া যাইত। নস্যির কৌটা হইতে চাষী-ভায়া একে ওকে মায় আমাকেও যৎকিঞ্চিৎ লইতে অনুরোধ করিলেন। হাঁচাহাঁচি বড় বেশী শুনিলাম না। অর্থাৎ সকলেরই নাক নস্যিতে পাকা-পোক্ত "বিশেষজ্ঞ"।

ইজার-তালের সমতল ক্ষেত ভাঙ্গিয়াই চলিতেছি। ক্রমশঃ দুই দিকে—বেশ কিছু দূরে—ঢিপিসদৃশ পাহাড়ের গড়ন দেখা গেল। পাইন-বনের সবুজ কান্তি দুই তরফ হইতেই পাইতেছি।

ক্রমশঃ দেখা দিল সম্মুখের এক বনে-ঢাকা পাহাড়ের মাথায় লাল আভা মণ্ডিত দুর্গভবন। তাহারই পায়ের কাছে এক বিপুল মন্দিরের চূড়া আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে। লাণ্ডসহুটে পৌঁছিলাম।

গাড়ীগুলা আজও সেকেলে বাষ্পের জোরেই চলিতেছে। কিন্তু গার্মিশ হইতে মিউনিক পর্য্যন্ত এবং মিউনিক হইতে লাণ্ডসহুট পর্য্যন্ত পথের সর্ব্বত্রই দেখিতেছি বিদ্যুতের রেলপথ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। মাস কয়েকের ভিতরই বাষ্প ব্যাভেরিয়ার রেলে মান্ধাতার আমলের সামগ্রীতে পরিণত হইবে। তারের খুঁটার সারিগুলা নবযুগের চৌকিদার রূপে খাড়া হইয়া আছে।

লাণ্ডস্‌হুট

(১)

লাণ্ডস্‌হুট ছোটখাটো ন্যিন্‌র্ব্যর্গ বিশেষ। সব কয়টা বাড়ীই "গথিক"। সম্মুখের দেওয়ালগুলার মাথা ত্রিকোন ছুঁচোল বঙ্কিম ভঙ্গীতে ভরা। এই রীতিকে প্রকারান্তরে জার্ম্মাণ সমাজের মামুলি রীতি বলা চলে। ইতালীতে রেণেসাঁস অর্থাৎ স্তম্ভের সারি বিশিষ্ট বারান্দা ওয়ালা সমতল ছাদের বাস্তরীতি যেমন সনাতন, জার্ম্মাণিতে সেইরূপ কোণেভরা উঁচু-পিঠওয়ালা ছাদের সমাবেশ খাঁটি-স্বদেশী। জার্ম্মাণ শহরগুলাকে ইট-কাঠের পাইন-বন মনে হয়। ন্যিন্‌র্ব্যর্গে গথিক গড়নের এক উৎকৃষ্ট নগর দেখিয়াছি। তাহারই এক ছায়া বা নকল যেন লাণ্ডস্‌হুটে পাইলাম।

ডাকঘরের এক বড় ইন্‌স্পেক্টর বাবুর বাড়ীতে অতিথি হইয়াছি। বাবু "গিমনাজিয়ুমে"র পাশকরা লোক। জার্ম্মাণিতে সরকারী চাকরী পাইতে হইলে এই পাশের ছাপ থাকা চাই। "রেআল-শুলের" শেষ ছাপ থাকিলেও চলে। উচ্চতর কর্ম্মচারীদের কথা বলা হইতেছে। এই দুই পরীক্ষা আমাদের প্রায় বি-এ, বি-এস সি'র সমান।

বাড়ীর সম্মুখে একটা খালের খাত দেখিতেছি। কিন্তু জল নাই। শুনিলাম ইজার মাঝে মাঝে এত ভরিয়া উঠে যে তখন শহর ডুবির দুরবস্থা উদিত হয়। সেই সময় বানের জল এই খাতে আসিয়া বহিয়া যায়। এই ধরণের আর একটা খাত তৈয়ারী করিয়া লাণ্ডস্‌হুটের নগর-শাসকেরা বন্যার উৎপীড়ন হইতে নরনারীকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

(২)

শড়ক। বাজারে, দোকানে, রাটহাউসে, মন্দিরে, ব্যাঙ্কে, ডাকঘরে প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনে। দুই তিন মিনিট হাঁটিয়া যে-কোনো দিকে গেলেই চষা জমির যোজন যোজন চোখে পড়ে। আর ফাঁকে ফাঁকে চাষীদের বাড়ীঘর।

জার্ম্মাণির অন্যান্য শহরের মতন লাণ্ড্স্হুটেও কুকুরের উৎপাত খুব বেশী। জার্ম্মাণরা কুকুর-প্রেমিক। কুকুর পোষার সখ অন্য কোনো দেশে এত দেখি নাই। কুকুরগুলো বাঘা বাঘা জানোয়ারও বটে। দেখিলেই প্রাণ আঁৎকাইয়া উঠে। কিন্তু অন্যান্য শহরে লোকেরা কুকুরের মুখে চামড়ার "মাউলা-কর্ব" বা মুখবন্ধ ব্যবহার করিতে বাধ্য। লাণ্ড্স্হুটে বোধ হয় সেই রেওয়াজ বা আইন নাই।

চাষীদের সঙ্গে মোলাকাৎ করিতে যাওয়া প্রাণ হাতে করিয়া যাওয়ার সমান। দূর হইতে আগন্তুককে দেখিবামাত্র কুকুরগুলা খেউ খেউ করিয়া দৌড়াইয়া আসে। অনেক সময় মালিকদের হুকুম তামিল না করাই কুকুরদের আবার স্বধর্ম্ম!

(৩)

ইজার এখানে স্রোতস্বতী বটে, কিন্তু জলের রং অনেকটা সবুজ। কাজেই দেখিয়া সুখ নাই। ঘাটের ধারে বেড়াইতে গিয়া পেট ভরে না। নদীটা ছোট সন্দেহ নাই, তবে নেহাৎ নিন্দনীয় নয়। অদূরে পাহাড়ের ঢিপিগুলা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পাদন করে।

পা-গাড়ীতে চড়িয়া ডজন-ডজন পুরুষ-নারী চলাফেরা করিতেছে। আশে পাশের পল্লী হইতে লোকেরা এই খানেই আসে। চাষীদের পক্ষে সাইকেল এক মস্ত সহায়। তাহা ছাড়া বন-ভ্রমণ, স্বাস্থ্যান্বেষণ, ছুটিভোগ, য়ুগেণ্ড-বেভেগুঙ বা যৌবন-আন্দোলন এবং প্রকৃতি-পূজা

কল বিশেষ। সাইকেল ব্যবহার করে মেয়েরা বেশী কি পুরুষেরা বেশী বলা কঠিন।

লাণ্ডস্‌হুটের বরযাত্রী

(১)

শহরশুদ্ধ হৈ হৈ রৈ রৈ। মিউনিক বার্লিন ইত্যাদি দূরদেশ হইতে নরনারী আসিয়াছে। শড়কগুলা নিশানে-নিশানে গুলজার। সাত দিন ধরিয়া মহোচ্ছব চলিতেছে। সেকালের ব্যাভেরিয়ান যুবরাজ (ক্রোণপ্রিন্‌ৎস) পর্য্যন্ত লাণ্ডস্‌হুটে অতিথি।

রাস্তায় রাস্তায় মিছিল, কাণ্ড কি! মধ্যযুগের লাণ্ডস্‌হুট-রাজ পোল্যাণ্ডের এক রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই রাজা বা জমিদার ছিলেন নাকি খুব প্রকৃতিরঞ্জক। কাজেই বিবাহের তিথিটা চার-পাঁচ শ' বৎসর ধরিয়া লাণ্ডস্‌হুটের নরনারী সমারোহের সহিত পালন করিয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিক তথ্যটা ১৪৭৫ সালের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের ঘটনা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা-রাজড়া, আমীর, ওমরাহ, নকীব, বরকন্দাজ, গোলাম, চাকর, ছুতার, কামার, পল্টনের লোক যে পোষাক ব্যবহার করিত সেই পোষাকে সাজিয়া লাণ্ডস্‌হুটের নরনারী সেই তিথি রক্ষা করিতে অভ্যস্ত। তিথিকে বলে "লাণ্ডস্‌হুটার হোখ্‌ৎসাইট" অর্থাৎ লাণ্ডস্‌হুটের বিয়ে।

কেহ রাজা সাজিয়াছে, কেহ রাণী সাজিয়াছে। বরযাত্রীর দল আর কন্যাযাত্রীর দল দেখা গেল। মালপত্র, আসবাব, উপঢৌকন, "তত্ত্ব" ইত্যাদি দস্তুর-মতনই আছে, তাহাদের বাহকও যথোচিত সাজে

চাপরাস মাফিক বেশভূষা করিত। দাসদাসীদের কাপড় চোপড় দেখিয়াই মনিবের নাম ধাম বুঝা যাইত। জার্ম্মাণির শিল্পীরা তখনকার দিনে শ্রেণীতে বা "গিল্ডে" সঙ্ঘবদ্ধ থাকিত। প্রত্যেক সঙ্ঘের এক একটা সঙ্কেত-চিহ্ন, দরবারি পোষাক, নিশান ইত্যাদিও ছিল। সবই দেখা গেল। ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক কিছুই বাদ পড়ে নাই। এই সকল সাজাসাজিতে শহরের পয়সাওয়ালা ভদ্রলোকেরা প্রায় সকলেই হিস্যা লইতে অভ্যস্ত।

ক্যাথলিক গিন্নীর গৃহস্থালী

পোষ্ট-ইন্‌স্পেক্টরের পত্নী প্রতিদিন পাঁচটার সময় ঘুম হইতে উঠেন। উঠিয়াই যান মন্দিরে। খালি পেটে পূজা করা ইঁহার দস্তুর। সাড়ে পাঁচটা হইতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা কাটে "সাঙ্‌ক্ট মার্টিন্‌স কির্খে" নামক গির্জ্জায়। স্বামীও স্ত্রীর সহচর।

বসত-বাড়ির ঘরে-ঘরে খৃষ্টের ছবি, মা-মেরীর ছবি এবং "মাতার দোলোরোজা" (দুঃখিনী জননী) ইত্যাদি বিষয়ক ধর্ম্মচিত্র ঝুলিতেছে। রান্নাঘরে, খাবার ঘরে, শোবার ঘরে, বৈঠকখানায়,—সর্ব্বত্রই দেখিতেছি 'কাপেলে' বা দেবস্থান। ক্রুশে আবদ্ধ যীশুর কাষ্ঠমূর্ত্তি এই দেবস্থানে পূজা পাইয়া থাকেন। দুই বেলা খাইতে বসিবার পূর্ব্বে এবং খাওয়া শেষ হইলে দেবতার নিকট প্রার্থনা করা দস্তুর। মন্তর পাঠ করিতে লাগে দেড় মিনিটের কম নয়। ডান হাত কপালে, বুকে এবং বাঁয়ে, ডাইনে ঠেকাইয়া ক্রুশের চিহ্ন তৈয়ারি করিবার নিয়মও প্রতিপালিত হয়।

একাধিক ধর্ম্ম-সমিতির মেম্বর স্বরূপ এই পরিবারকে অনেক টাকা খরচ করিতে হয়। প্রধানভাবে লক্ষ্য করিতেছি, স্বামী স্ত্রী উভয়েই সাধু ফ্রান্সিসের গড়া "থর্ডর" লোক। এই থর্ডে সন্ন্যাসী সংসারী দুই

শ্রেণীর নরনারীই প্রবেশ করিতে পারে। সন্ন্যাসীদের পক্ষে কঠোরতার মাত্রা খুব উঁচু। সংসারীরা গার্হস্থ্য-জীবনে যত বেশী সম্ভব সংযম ও বৈরাগ্য পালন করিতে বাধ্য।

প্রতি সপ্তাহে আট দশ জন দরিদ্র লোককে ভিক্ষা দেওয়া এই পরিবারের "বাজেটের" অন্তর্গত। হাঁসপাতালে রোগীদিগকে গিয়া দেখা, তাহাদের সুখ ও আরামের জন্য জিনিষপত্র কিনিয়া লইয়া যাওয়া, দুঃস্থ পরিবারের লোকজনকে দুগ্ধ, পথ্য এবং কাপড়চোপড় দিয়া সাহায্য করাও ইঁহাদের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি। গুরু-ঠাকুরদিগকে খাওয়ানো দেব-সেবার সামিলই বিবেচিত হইয়া থাকে। শুনিলাম,—বাবুর মাসিক আয়ের প্রায় আধাআধিই পত্নীর ধর্ম্মঘটিত দান-খৈরাতে উজাড় হইয়া যায়। ক্যাথলিক নরনারীকে হিন্দুরা হারাইতে পারিবে কি? অবশ্য লাণ্ড্স্হুটের পঁচিশ হাজার লোক সকলেই এইরূপ জীবন-যাপন করে না।

লেখাপড়ার সিঁড়ি

জার্ম্মাণীতে মানুষ মাত্রেই ভারতীয় মাপ-কাঠিতে কম-সে কম এণ্ট্রান্স (ম্যাটিকুলেশন) পাশ। কেন না, কি মেয়ে, কি পুরুষ প্রত্যেককেই অন্ততঃ পক্ষে ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সরকারী পাঠশালায় যাইতে হয়। সকলেই বিনা বেতনে লেখাপড়া শিখিতে পায়। ইস্কুলগুলাকে বলে "ফোল্ক্স্-শুলে।" এই ধরণের ফোল্ক্স-শুলে কতকগুলা লাণ্ড্স্হুটেও আছে বলা বাহুল্য।

একটা মজার কথা,—জার্ম্মাণরা এই ষোল বৎসর বয়সের বিদ্যাকে বিদ্যার মধ্যেই গণ্য করে না। যাহারা ফোল্ক্স-শুলের উপরে উঠিতে অক্ষম, তাহাদিগকে "অশিক্ষিত" জনসাধারণের সামিল করা হয়। জার্ম্মাণীর কুলী-মজুর সকলেই

অশিক্ষিত লোক! এই কথাতেই জার্ম্মাণ জাতির দৌড় কতখানি আন্দাজ করা সম্ভব।

তাহা হইলে "শিক্ষিত" লোক কাহারা? যাহারা ফোল্ক্স-শুলে পার হইয়া উপরের ইস্কুলে পাশ হয় তাহারা। ফোল্ক্স-শুলেকে "নিম্ন" বিদ্যালয় বলিলে তাহার পরের ধাপকে "মধ্য" বিদ্যালয় বলিতে পারি। এই ধরণের মধ্য-বিদ্যালয় লাণ্ড্‌স্‌হুটে আছে দুইটা। এই দুই পাঠশালায় লেখাপড়া করিতে হইলে নিজের গাঁট্ হইতে পয়সা খরচ করিতে হয়। প্রত্যেক বিদ্যাপীঠেই নয় বৎসরের ব্যবস্থা।

একটা ইস্কুলের নাম "গিম্‌নাজিয়ুম"। অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি মামুলি জিনিষ পাঠ-চর্চ্চার অন্তর্গত বটেই। গ্রীক এবং ল্যাটিন এই বিদ্যা-পীঠের বিশেষত্ব। ইহাকে সাধারণ, মামুলি বা সাহিত্য-পাঠশালা বলা চলে।

অপরটার নাম "রেআল-শুলে"। এখানে গ্রীক ল্যাটিনের ছায়া মাড়াইতে হয় না। তাহার পরিবর্ত্তে ফরাসী, ইংরেজি ইত্যাদি "আধুনিক" ভাষা শিখিতে হয়, অন্যান্য পাঠ-চর্চ্চায় প্রায় গিম্‌নাজিয়ুমের রীতিই চলে। তবে গণিত এবং বিজ্ঞান-বিদ্যা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উচ্চতর মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়। সহজে এই ইস্কুলকে "আধুনিক" বা "ব্যবহারিক" পাঠশালা বলিতে পারি।

রেআল-শুলের ছাত্রেরা পরে টেক্‌নিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইতে অধিকারী। এই পাঠশালার এক বিভাগে ব্যবসা-বাণিজ্য শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। সেই বিভাগের ছাত্রেরা পরে ব্যবসা-কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে।

নয় বৎসর ধরিয়া এই দুই ইস্কুলে পড়ার নিয়ম। উনিশ-বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোনো যুবা বা যুবতী পাঠ-চর্চ্চা শেষ করিতে পারে

কাটাইয়াই দশ বা এগার বৎসর বয়সে গিমনাজিয়ুম কিংবা রেআল-শুলেতে ভর্ত্তি হয়।

সোজাসুজি বলি,—"গিমনাজিয়ুমের" শেষ পরীক্ষায় যাহারা পাশ হয় তাহারা আমাদের প্রায় বি-এ পাশ করা নরনারীর সমান। আর যাহারা "রেআলশুলের" গ্রাজুয়েট তাহারা প্রায় বি-এস সি।

এই দুই ইস্কুল হইতে লাণ্ডস্‌হুটে প্রতি বৎসর আশী-নব্বুই তরুণ-তরুণী বাহির হয়। পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার নর-নারীর শহরে বৎসর বৎসর আশী-নব্বুই বি-এ, বি এস্ সি—এই দৃশ্য কল্পনা করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব কি? মেদিনীপুরে, জলপাইগুড়িতে বা ময়মনসিংহে প্রতি বৎসর কতজন করিয়া বি এ, বি এস্ সি পরীক্ষায় পাশ হয়? গিমনাজিয়ুম এবং রেআলশুলে দুইই সরকারী তাঁবে সরকারী খরচে চলে। ছাত্র ছাত্রীরা অবশ্য বেতন দিতে বাধ্য। তবে আধা-বেতন, বেতন-রেহাই, ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থাও আছে।

রকমারি "পেশা-বিদ্যালয়"

বি এ, বি এস্ সি, পাশ-করা লোক জার্ম্মাণ সমাজে "হাতী-ঘোড়া" নয়। ইহারা "নিম্নশিক্ষিত" লোক মাত্র। উচ্চ শিক্ষিত হইতে হইলে যুবক যুবতীদিগকে "হোখশুলে"তে অর্থাৎ "উচ্চ পাঠশালায়" ভর্ত্তি হইতে হয়। টেক্‌নিক্যাল হোখশুলে (শিল্প পাঠশালা), হাণ্ডেল্‌স হোখ-শুলে (ব্যবসা পাঠশালা) এবং বিশ্ববিদ্যালয়—প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীর কলেজ উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত। কৃষিবিদ্যা এবং বন-চর্চ্চা ইত্যাদির জন্যও হোখশুলে আছে। লাণ্ডস্‌হুটে এই ধরণের একটা পাঠশালাও নাই।

গোটা সমাজ ম্যাট্রিক-পাশ। এই পাশের পর অধিকাংশ লোকই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে লাগিয়া যায়। ভাত-কাপড়ের টান যে

সকল পরিবারে অত্যধিক নয়, তাহারা ফোল্ক্‌স্‌-শুলের অর্দ্ধ পথেই মধ্য বিদ্যালয়ের যাত্রী হয়। কিন্তু যাহাদের টান আছে তাহারা ফোল্ক্‌স্‌-শুলে শেষ করিতে আইনতঃ বাধ্য থাকে।

ফোল্ক্‌স্‌-শুলে শেষ করিবার পর মজুরি এবং কেরাণীগিরি এই দুই পথ মাত্র খোলা। জার্ম্মাণ সমাজে কুলীতে আর কেরাণীতে কোনো প্রভেদ করা হয় না। কুলীরা আর কেরাণীরা উভয়েই অশিক্ষিত মস্তিষ্কহীন কাজের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়া থাকে। অবশ্য অন্যান্য দেশের মতন জার্ম্মাণিতেও কেরাণীরা সাদা জামা ও কলার পরে বলিয়া নিজেদেরকে কুলীদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর লোক সমঝিতে অভ্যস্ত।

তবে এই ধরণের ম্যাট্রিক-পাশ অশিক্ষিত নর-নারীদের জন্যও জার্ম্মাণিতে গণ্ডা গণ্ডা বিদ্যাপীঠ আছে। সেইগুলাকে বলে 'ফাখ-শুলে'। লাণ্ডস্‌হুটে আছে তিন ধরণের তিনটা 'ফাখ-শুলে' (পেশা-বিদ্যালয়)।

একটায় শিখানো হয় পোর্সলেন, চীনামাটি ইত্যাদির খেলনা তৈয়ারি করিবার 'ফাখ' বা ব্যবসা। দ্বিতীয় ফাখ-শুলেতে যন্ত্রপাতি-ঘটিত সকল প্রকার এঞ্জিনিয়ারিং শিখানো হইয়া থাকে। তৃতীয় বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা শিখে চাষ আবাদ বিষয়ক 'ফাখ'। কিষাণদের ছেলেরা এই ফাখ-শুলের ছাত্র হয়। তিনটা ইস্কুলই সরকারী, ছাত্রেরা বেতন দেয়। কৃষি-ফাখের ইস্কুলটা বসে শীতকালের মাস ছয়েক ধরিয়া। বলা বাহুল্য তখন ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকে।

ফাখ-শুলেতে অন্ততঃ তিন বৎসর কাটাইতে হয়। বৎসরখানেক বা বৎসর দুয়েক কারখানায় অথবা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করা না থাকিলে কেহই এই সকল ফাখ-পাঠশালায় ভর্ত্তি হইতে পায় না। কিষাণ যুবারা গ্রীষ্মে ক্ষেতে কাজ করে,—শীতে আসে পাঠশালায়।

গিমনাজিয়ুম এবং রেআলশুলের বিদ্যা স্ববশে আনিতে অসমর্থ এবং কাজেই পরে কৃষি-কলেজে, ব্যবসা-কলেজে এবং শিল্প-কলেজে ভর্ত্তি হইতে অনুপযুক্ত, তাহারাই ফাখ-শুলেতে ভর্ত্তি হয়। কিন্তু এখানকার ছাত্রদের চাকুরী জুটে খুব বেশী এবং অতি সহজে। জার্ম্মাণির প্রায় সকল ফ্যাক্টরী হইতেই ফাখ-শুলের ছাত্রের জন্য তাগিদ আসে। ছাত্রেরা যন্ত্রের কাজে এবং হাতের কাজে পাকা হইয়া উঠে।"

'ফাখ-শুলে'গুলাকে 'টেকনিকুম'ও বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর অন্তর্গত শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন ইত্যাদি বিষয়ক 'হোখশুলে'তে যে ধরণের উচ্চশিক্ষিত এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, আকরতত্ত্ববিৎ, বন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তৈয়ারী হয়, তাহারা জার্ম্মাণ সমাজের মাথা সন্দেহ নাই। কিন্তু টেক্‌নিকুমের পাশকরা মিস্ত্রী-শ্রেণীর লোকেরাই জার্ম্মাণ ধন-সম্পদের মেরুদণ্ড। এই কথাটা ভারতে এখনো পরিষ্কাররূপে জানা নাই।

ভারতীয় বি-এ, বি-এস্-সিরা জার্ম্মাণির যে-কোনো 'হোখশুলেতে' প্রবেশের অধিকার পাইতেছেন এবং পাইবেন। কিন্তু যাঁহারা ফ্যাক্টরীর কারবারে পাকিয়া উঠিতে চান তাঁহাদের পক্ষে—অনেক ক্ষেত্রেই হোখশুলের মায়ায় না মজিয়া—ফাখশুলে বা টেক্‌নিকুম শ্রেণীর শিল্প-পাঠশালায় প্রবেশ করা উচিত কি না শিক্ষা-নায়কগণের ভাবিয়া দেখা দরকার।

ধোবা-নাপিত-দর্জ্জি

ধুবী আসিয়াছে বাড়ীতে কাপড় কাচিতে। মাসে দুইবার করিয়া এইরূপে কাপড় কাচানো হইয়া থাকে। মধ্যবিত্ত পরিবারে এইরূপই দস্তুর। ধুবীকে সাহায্য করার জন্য গিন্নী অথবা বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা

একদিন আসিল এক মেয়ে-দর্জ্জি। ইন্‌স্পেক্টর-পত্নীর নয়া পোষাক তৈয়ারী হইতেছে। দর্জ্জি বলিল—"পরিবারে পরিবারে চাহিদা এত বেশী যে মরবার ফুরসুৎ নাই। মাসখানেকের পূর্ব্বে আবার আসিতে পারিব না।" ঘরে পোষাক তৈয়ারী করিয়া লইলে সস্তা পড়ে, দরের প্রায় আধা-আধি।

ছেঁড়া গেঞ্জি, মোজা, বিছানার চাদর, বালিশের ওড় ইত্যাদি মেরামত করিবার জন্য সেলাই-নিপুণা নারী আসিল। দরকার পড়িলেই তাহাকে ডাকিয়া আনা হয়। এই সকল সেলাইয়ের কাজে গিন্নী স্বয়ংও কম ওস্তাদ নন। তবে সময়াভাবে সব করিয়া উঠা সম্ভব নয়।

জার্ম্মাণিতে যে-সে লোক ধুবীগিরি বা নাপিতগিরি বা অন্য কোন ব্যবসা চালাইতে অধিকারী নয়। প্রত্যেক শহরেই ব্যবসা সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিবার সরকারী ব্যবস্থা আছে। সার্টিফিকেট পাইতে হইলে পরীক্ষায় পাশ হইতে হয়। অবশ্য এই সকল পরীক্ষা মামুলি ম্যাট্রিক পাশের পরবর্ত্তী।

ছুতারি করা, রাজমিস্ত্রীর কাজ করা, লোহা পিটানো, রুটি তৈয়ারী করা, জানালা পরিষ্কার করা, ঘরে রং লাগানো সবকিছুই সার্টিফিকেটের অধীন। অর্থাৎ ছোট বড় প্রত্যেক ব্যবসাই পরীক্ষায় পাশের উপর নির্ভর করে।

'রাটহাউসের' তত্ত্বাবধানে এই সকল নগর-শিল্পের বা নগর-ব্যবসার তদবির করা হয়। ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন—"আমাদের বাড়ীতে যে দর্জ্জি কাজ করে তাহার সার্টিফিকেট উঁচু দর্জ্জার নয়। বিনা পয়সায় সাগরেদ বাহাল করার অধিকার তাহার নাই।"

যে সকল দর্জ্জি, মিস্ত্রী, ছুতার, কামার, কুমোর বা অন্যান্য শিল্পী বিনা পয়সায় সাগরেদ বাহাল করিতে অধিকারী, তাহারা উচ্চতর

পরীক্ষায় পাশ হইতে বাধ্য। পাশ হইলে তাহাদিগকে 'মাইষ্টার্' (ওস্তাদ) এবং 'মাইষ্টারিণ' (মেয়ে ওস্তাদ) বলে। লাণ্ডস্হুটের সড়কে সড়কে যে সব বিজ্ঞাপন দেখিতেছি তাহাতে মাইষ্টার-মাইষ্টারিণের নাম চোখে পড়িতেছে।

কাঠের কারখানা

এক ৎসিম্মার-মাইষ্টার (ঘরের ওস্তাদ) পরিবারের গিন্নী কারখানার সকল অংশ দেখাইলেন। সংক্ষেপে বলিব—এখানে কাঠ চেরা হইয়া থাকে। মজুর খাটিতেছে গোটা ত্রিশেক। পঞ্চাশের বেশী কখনো খাটে না। কাঠের আগুনে বাষ্পের এঞ্জিন চলিতেছে। মোটের উপর চব্বিশটা যন্ত্র দেখা গেল।

বাবু বলিতেছেন—"আমার বিদ্যার দৌড় ফাখ্শুলে পর্য্যন্ত। ১৮৭২ সালে ব্যবসা সুরু করি খাঁটি ছুতার ভাবে। যন্ত্রপাতি যা কিছু দেখিতেছেন তার একটাও তখন ছিল না। দুইজন মাত্র সহকারী মজুর ছিল সঙ্গে। আজ আমার কারবার বেশ বড়ই বলিতে হইবে। নূতন কোন যন্ত্র খরিদ না করিয়াও আমি বড় বড় অর্ডার সাপ্লাই করিতে সমর্থ। মিউনিকের বাস্তুশিল্পীরা আমার নিকট কপাট, জানালা, সিঁড়ি ইত্যাদির জন্য অর্ডার পাঠায়। জার্ম্মাণির অন্যান্য শহরেও আমি ঘরবাড়ীর সরঞ্জাম যোগাইতেছি। ঈজিপ্ট ইত্যাদি দূর বিদেশেও আমার মাল গিয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"যন্ত্রপাতিগুলার দাম কত হইবে?" জবাব—"সবই যুদ্ধের পূর্ব্বে কেনা। তখনকার দিনে ষ্টীম এঞ্জিন সহ লাগিয়াছিল হাজার পঁয়ত্রিশেক টাকা।" এমন মারাত্মক বিপুল কিছু নয়।

ল্যাণ্ডস্হুটের ছোটখাটো মিস্ত্রীরা এই কারখানায় আসিয়া যন্ত্রের

রুটির দোকান

স্ত্রীপুত্র ভাইবোন সকলে মিলিয়া রুটির কারখানা চালাইতেছে। বোন বলিল—"ম্যাট্রিক পাশের পর রন্ধন-বিদ্যালয়ে রান্নাবাড়ি শিখিয়াছি। তাহার পর বার্লিনের এক কিণ্ডারহাইম বা শিশু-ভবনে গৃহ-স্থালীর তদবির করিতাম। এখন ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা চালাইতেছি।"

আটা সানা হইতেছে এক প্রকাণ্ড ডেক্‌চিতে। মিনিট পনেরোয় ছয় মণ সানা হইয়া যাইতেছে। ডেক্‌চিটা ঘুরিতেছে বিজলীর জোরে। কাঠের তৈয়ারী একটা হাত বা হাতা বিদ্যুতের জোরেই চলিতেছে। আটা সানার কাজ এই কেঠো হাতেই সম্পন্ন হয়। মানুষের হাত কাজে লাগিতেছে মাত্র আটা বা লেই ডেক্‌চি হইতে উঠাইবার নামাইবার সময়।

রুটির আকার গড়িবার জন্য আর একটা ছোট যন্ত্র টেবিলের উপর দেখিতেছি। উননটা জলে কয়লার আগুনে। দেখাইয়া ছেলে বলিল—"মান্ধাতার আমলে এই ধরণের উননই ব্যবহৃত হইতে। লাণ্ডস্‌হুটে ত্রিশটা রুটির কারখানা। প্রত্যেকটাই এইরূপ প্রিমিটিভ। যন্ত্রপাতির ধুমধাম কোথাও নাই।"

রুটিওয়ালার "মাইষ্টার"-চাপরাশ আছে। কাজেই দেখিলাম দুই-তিন জন "অ্যাপপ্রেন্টিশ" বিনা বেতনে সাগরেদি করিতেছে। প্রতিদিন ভোর রাত্রি তিনটা হইতে বিকাল আড়াইটা পর্য্যন্ত বার ঘণ্টা কাজ চলে। গোটা পরিবারই এইরূপ খাটে। রবিবার দিন কাজ বন্ধ থাকে পুরা-পুরি। কিন্তু এই জন্য শনিবার খাটিতে হয় রাত্রি ১টা হইতে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত। আট ঘণ্টা রোজ পারিবারিক বা কুটীর শিল্পে অপরিচিত।

রুটিওয়ালার বড়ছেলে বলিতেছে—"আমার বাপ মার ইচ্ছা নয় যে, আমি দেশ ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া যাই। কিন্তু তলে তলে আমি

নর্ড ড্যয়চার লয়েড নামক জাহাজ-কোম্পানীর নিকট কাজের দরখাস্ত করিয়াছি। একজন ডাক্তার মুরুব্বি জুটিয়াছে। হয় উত্তর আমেরিকা না হয় দক্ষিণ আমেরিকা কিংবা এশিয়ার কোনো লাইনে চাকুরি জুটিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।”

যুবা ম্যাট্রিক পাসের পর পরিবারের কারখানায় কাজ শিখিয়াছে। তারপর দুই একটা স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের বড় সানাটোরিয়ুমে কেক, পিঠাপুলি ইত্যাদি তৈয়ার করিবার কাজে বাহাল ছিল।

ইটের পাঝা

রকমারি ইট তৈয়ারির কারখানা দেখিলাম। লোক খাটিতেছে পনর জন। মালিকের পত্নী বলিলেন,—নেহাৎ জরুরি হইলে কখনো কখনো পঞ্চাশ জন পর্য্যন্ত মজুর বাহাল করা হইয়া থাকে।

রেল-কোম্পানী যে সকল আধ-পোড়া কয়লা ফেলিয়া দেয়, সেই সবই এই কারখানায় ইটের প্রধান উপকরণ। দরিয়ার বালুর সঙ্গে পোড়া কয়লা বা ঝামার গুড়া মিশাইয়া ইট তৈয়ারী করা হইতেছে। কয়লার বদলে কঙ্কড় অথবা সিমেণ্ট ব্যবহার করিয়া কন্‌ক্রীট টালি অথবা উচ্চ শ্রেণীর ইট তৈয়ারী করাও হয়।

মালিক বলিতেছেন—“ছোট খাটো ইট আজকাল আর তৈয়ারী হয় না। তাহাতে সময় লাগে অনেক, খরচও পড়ে বেশী। বড় বড় ইটই আজকালকার দস্তর। ইটের ভিতর চতুস্কোণ ফাঁক বা গর্ত্ত দেখিতেছেন। ইহাও এক নূতন কায়দা। দেওয়ালের ইটের ভিতর হাওয়ার চলাচল থাকিলে ইমারত গুলার স্যাঁতি লাগে না। জল বৃষ্টি বরফ ইত্যাদির সময়ও ঘর খটখটে শুকনা থাকিতে পারে।”

এঞ্জিন চলিতেছে কয়লার বাষ্পে। ঝামা ঝাড়াবাছা ও গুঁড়া করিবার জন্য কয়েকটা যন্ত্র দেখিলাম। ইট, টালি, শ্লেট, পাইপ, রেলিং, স্তম্ভ

ইত্যাদির রূপ গড়া হয় কয়েকটা কলে। স্থাপত্যশিল্পের মনুমেণ্ট, ঘোড়সওয়ার, আবক্ষ মূর্ত্তি, স্তম্ভ ইত্যাদি বসাইবার জন্য পীঠস্থান দরকার হয়। সেই সব পীঠস্থানও কারখানায় তৈয়ারী হইতেছে। দেখিলে মনে হয় যেন গ্রাণাইট পাথরের কাজ।

আটার কল

লাণ্ডস্‌হুটকে জার্ম্মাণরা ইণ্ডুষ্ট্রী-ষ্টাট বা শিল্পনগর বলে না। বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ জন মজুর যে সকল কারবারে খাটে সে সব কারবার বর্ত্তমান জগতের মাপকাঠিতে ইণ্ডুষ্ট্রী, শিল্প ইত্যাদির ফ্যাকটরি বা কারখানা বলিয়া গণ্য হয় না। সে সব পারিবারিক বা কুটীর শিল্প,—অর্থাৎ অনেকটা "সেকেলে" কারবারেরই সামিল। লাণ্ডস্‌হুটকে সেকেলে শিল্পের পল্লীই বলা হইয়া থাকে।

তবে "একাল"ও লাণ্ডস্‌হুটে হাজির আছে। একটা কারখানার মত কারখানা দেখা গেল। কেননা এখানে মালিক বা মালিক-পত্নীর পারিবারিক আবহাওয়া পাইলাম না। গেরস্থ মানুষের কুটীর-শিল্প ইহার চৌহদ্দির ভিতর নাই। এ আবহাওয়ায় কেহ ডিরেক্টার, কেহ এঞ্জিনিয়ার, কেহ কেরাণী, কেহ মজুর ইত্যাদি। মালিকরা কোথায় কে জানে?

ফ্যাক্টরির নাম "ফারাইনিগ্‌টে কুন্‌ষ্ট্‌মিলে" (সংযুক্ত আটা ভাঙার কারখানা)। এই কারখানার 'স্পাইখার' বা 'জিলো' অর্থাৎ গোলাঘরটা বাহির হইতে বাস্তু হিসাবে একটা দেখিবার মত ইমারত। ভিতরকার ব্যবস্থা অদ্ভূত অর্থাৎ নবীনতম শিল্প-ব্যবস্থার চরম নিদর্শন।

ঘোড়ার গাড়ীতে বস্তা বস্তা শস্য আসে। নীচের তলায় এক নলের সাহায্যে সেই শস্য গাড়ী হইতে নামানো হয়। তাহার পর শস্য ঝাড়া,

সবই কলের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। একটাও রোগী-শস্যের দানা অথবা ভিজে শস্যের চাপ কোথাও থাকিতে পারে না। বাহান্নটা গুদাম আছে। ঘণ্টায় ১০০০ মণ পরিষ্কার করিয়া উঠানো হয়। শুকাইবার যন্ত্রে ঘণ্টায় ৫০ মণ তদবির করা চলে। এক সঙ্গে এক লাখ মণ গোলাঘরে ঝর-ঝরে নীরোগ অবস্থায় মজুদ রাখা সম্ভব। যন্ত্রের সাহায্যেই বিনা মেহনতে মাল ওজন করা থাকে।

গোলাঘর হইতে যন্ত্রের সাহায্যেই শস্যগুলা আটা-ভাঙার কলে চালান হইয়া থাকে। ভাবিয়াছিলাম দেখিতে পাইব, মামুলী পাথরের জাঁতাগুলা কলের জোরে চলিতেছে। দেখিলাম এলাহি কারখানা। কার সাধ্য বুঝে যে এখানে গম গুড়া হইতেছে। এক একটা কলের ভিতর চার চারটা ইস্পাতের রোলার চাকার মত ঘুরিতেছে। তাহার ভিতরই গম পিষিয়া গুঁড়া হইতেছে।

এই ধরনের ছয়টা কলের ভিতর দিয়া পার হইলে তবে মিহি ময়দা পাওয়া যায়। ময়দা, আটা, সুজী সবই যথা সময়ে বাহির করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। চাল্‌নি চলিতেছে ঠিক চালনিরই মতন, তবে কলের জোরে। বাহির হইতে এটাকে চালনি বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন।

পাটের বস্তায় গুঁড়া গুলা আসিয়া পড়িতেছে। বস্তাটা যথাসময়ে কলে লাগাইয়া দিবার জন্য লোক আছে। তবে ওজন হইয়া যাইতেছে কলেই আপনা আপনি।

কি গোলাঘর, কি জাঁতা-ঘর দুই ঘরের যন্ত্র গুলিই চলে বিজলীর বলে। বিদ্যুৎ তৈয়ারী হইতেছে জলের তেজে। ইজার দরিয়ার স্রোতকে বাঁধিয়া রাখিয়া ফ্যাক্টরিওয়ালারা মোটর্ চালাইয়া থাকে। প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি কখনো ইজারে জল কম থাকে তাহা হইলে

আগুন জালিয়া বাষ্পের এঞ্জিন চালাইতে হইবে। আসুন,—ঐ ঘরে এঞ্জিনটা পড়িয়া আছে দেখিবেন। বিশ বৎসরের ভিতর একদিনও ও বেচারা কাজে আসে নাই।”

ঘরে ঘরে দেখিলাম কেবল কল। লোকের মেহনৎ একদম দরকার হয় না। ডিরেক্টরের নিকট শুনিলাম, মজুর-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ার সকলের সমবেত সংখ্যা শ দেড়েক।

চাষীর খাজনা

কুকুরের চোখ এড়াইয়াও কিষাণ পরিবারের আবহাওয়ায় সময় কাটাইতেছি। ব্যাভেরিয়াকে জার্ম্মাণরা কৃষিপ্রধান প্রদেশ বলিয়া জানে। সেই প্রদেশের ইজারতাল চাষ-আবাদে প্রসিদ্ধ। উক্রেণিয়া, হাঙ্গারি, রুমেনিয়া ইত্যাদি দেশের মতন ইজার-ধৌত জার্ম্মাণির মফঃস্বল ইয়োরোপের অন্যতম শস্যকেন্দ্র।

ব্যাভেরিয়ার চাষীরা সকলেই নিজ নিজ জমির মালিক। ইহারা খাজনা দেয় সোজাসুজি সরকারকে। মাঝামাঝি কোনো জমিদার নাই। আমাদের পারিভাষিকে বলিব ব্যাভেরিয়ার ষাট লাখ নরনারীর ভূমিস্বত্ব “রাইয়তওয়ারি” প্রথায় চলিতেছে।

চাষীদের ভিতর ছোটবড় মাঝারি ভেদ আছে। কিন্তু প্রত্যেকেই যথাসম্ভব স্বাবলম্বী বা স্বরাজী। অর্থাৎ গম, যব, রাই, ওট্স, আলু, ক্লোভার, ঘাস, ইত্যাদি যা কিছু মানুষের খাদ্য, গোবলদের খাদ্য, ঘোড়ার খাদ্য, আর শূয়রের খাদ্য আবশ্যক সবই নিজ নিজ জমিনে উঠে। অতিরিক্তও কিছু থাকে। সেই সব বেচা হয়।

খাজনা দিতে হয় কত হারে? এই প্রশ্নের জবাব কোনো চাষীই

বৎসর খাজাঞ্চির আফিস হইতে নূতন নূতন হার ঠিক করা হয়। সেই হার আমাদের বিবেচনায় অত্যধিক হইলে আবার নূতন হার ধার্য্য করা হইয়া থাকে। প্রত্যেকবারই কিষাণে আর সরকারে বচসা, দর কষাকষি এবং আপোষ ঘটে।"

জমির উপর খাজনা, কেনাবেচার উপর খাজনা, আয়ের উপর খাজনা, এই ধরণের সাত আট বাবদ খাজনা দিতে হয়। খাঁটি ষ্টাটিষ্টিক্সের তথ্য না লইয়া আনুমানিক ভাবে কষিয়া দেখিতেছি, সরকারকে কিষাণরা সর্ব্বসমেত প্রায় তিন ভাগের একভাগ দিতে বাধ্য। খাজনা দেওয়া হয় শস্যে নয়, টাকায়।

তিন ভাগের একভাগ যায় খাজনায়। আর একভাগ লাগে বৎসর ভরিয়া খাইতে এবং গরু ভেড়া ঘোড়া শূয়র পুষিতে। বাকী একভাগ হইতে পোষাক খরিদ করিতে হয় এবং পুঁজি জমা হইতে পারে।

কিষাণের খাওয়া-পরা

চাষীরা খায় দিনে পাঁচ-ছয় বার। ইহারা "আট ঘণ্টার রোজ" মানে না। সকাল চারটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত ইহাদের রোজ। এক কিষাণ-পত্নী হাসিয়া বলিল, "জিজ্ঞাসা করা উচিত, আমরা খাটি না কখন? চৌপর দিনই আমাদের কায।" ছেলে মেয়ে স্ত্রীপুত্র গোটা পরিবারই এক নিয়মে খাটে। ষোল সতের ঘণ্টার রোজে মাত্র দুইবার অবশ্য পেট পুরিয়া খাইবার রেওয়াজ। তবে অন্যান্য "জল"-খাবারের বেলায় যে সব "পদ" দেখিতেছি তাহাতে পুরা পেটের ত্রুটিও বিশেষ দেখিতে পাই না। শুক্‌না মাংস, রুটি, মাখন এবং কাফি অথবা বিয়ার ইত্যাদি সহ মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বে দুইবার এবং পরে একবার জল-যোগের দস্তুর। সকালে কায সুরু করিবার সময় অবশ্য কাফি এবং রুটি মাখন ত আছেই।

এই গেল গ্রীষ্মের রোজ। শীতকালে সবই বরফে ঢাকা। তখন চাষীদের কায বাহিরে একদম নাই। রেহাইয়ের সময় বটে, কিন্তু ভিতরে প্রায় ষোল সতর ঘণ্টার রোজই চলিতে থাকে। কাপড় চোপড় প্রস্তুত করা, কাঁথা সেলাই করা, জানোয়ার গুলার তদবির করা, চাষের যন্ত্রপাতি এবং আসবাব ইত্যাদি মেরামত করা এই সব তখনকার কায। কিষাণ-পরিবার তখন প্রধানতঃ ছুতার, কামার, তাঁতী, দর্জ্জি, পশুপালক ইত্যাদি শিল্পী বাহাল করিয়া গৃহস্থালীর নয়া নয়া দরকারী কাযে মোতায়েন থাকে।

এক চাষী বলিল—"আমার বড় ছেলে তখন লাণ্ডস্‌হুটের ফাখ-শুলেতে পড়ে, চাষ-আবাদ সম্বন্ধে নতুন নতুন কথা শিখিতে চলিয়া যায়। সারতত্ত্ব, যন্ত্রতত্ত্ব, বাজার-দর, আমদানি-রপ্তানির খবর আমরা অনেকটা এই কৃষিবিদ্যালয়ের মারফতেই বৎসর বৎসর পাইয়া থাকি।"

কোন কোন কিষাণের ঘরে দুই তিন জন মজুর বাহাল দেখিলাম। কেহ পুরুষ কেহ বা মেয়ে। ইহারা বেশী বয়সের লোক নয়। কিষাণের বাড়ীতে ইহাদের থাকা খাওয়া চলে। তাহা ছাড়া কিছু বেতনও জুটে। শীত কালে বোধ হয় একজনের বেশী মজুর রাখা হয় না।

বলা বাহুল্য বসতবাড়ীর লাগাও একটা বড় গোছের বাগান সকল চাষীরই আছে। শসা, শালগম, শিম, স্যালাড ইত্যাদি আনাজ বা শব্জী কেহই কিনিয়া খায় না। তরী তরকারী শীতকালের জন্য কাচের গ্লাসে তাজা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। মুর্গী পোষা একটা মামুলি কথা।

চাষীরা নিজ নিজ রুটি ঘরেই তৈয়ারী করিয়া লয় কিন্তু আটা পিষাইয়া আনে শহরের কল হইতে। বিয়ার এবং পোষাক ছাড়া বোধ হয় কোন জিনিষই চাষীরা খরিদ করিতে অভ্যস্ত নয়।

পল্লী-সমাজ

(১)

ভারতকে পল্লীপ্রধান ও কৃষিপ্রধান দেশ বলা হইয়া থাকে। ভারতীয় পল্লীগুলা গুণতিতে সাত লাখ বিশ হাজার। কিন্তু ইয়োরোপের সকল দেশের পল্লী একত্র করিলে সংখ্যা সাত লাখ বিশ হাজারের কম হইবে কি না সন্দেহ।

জার্ম্মাণি বাংলা বিহারের চেয়ে কোনো মতেই কম পল্লী-প্রধান এবং কম কৃষি-প্রধান নয়। ব্যাভেরিয়া প্রদেশের লোক-সংখ্যা ষাট লাখ। এই জনপদের বড় শহর মিউনিকে মাত্র লাখ পাঁচেক লোক বাস করে,—আর লাণ্ড্সহুটের মতন শহরে পঁচিশ হাজারের বেশী নয়। ফ্রাইজিঙ্ শহরের লোক সংখ্যা হাজার দশেক মাত্র। এই সকল শহরকে বড় গোছের পল্লী বলা চলে,—বর্ত্তমানজগৎসুলভ শহুরে মাপকাঠি অনুসারে।

লাণ্ডসহুটের আশে-পাশে যে সকল পল্লী দেখিতেছি, তাহার কোনোটায় একশ, কোনটায় দেড়শ বাসিন্দা। হাজার নরনারীর পল্লী, গঞ্জ, "মার্ক্‌ট্" বা বাজার আঙুলে গুণা সম্ভব। অবশ্য ষ্টাটিষ্টিক্‌স্ কষিয়া কথা বলিতেছি না। পথ হাঁটিয়া চোখে দেখিয়া লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এইরূপ বুঝিতেছি।

প্রত্যেক পল্লীতেই আর কিছু থাক বা না থাক, একটা করিয়া গির্জ্জা আছেই আছে। আর পাঠশালাও কম-সে কম একটা দেখিতে পাই। পাকা রাস্তা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। তবে রোদে ধূলা আর জলে কাদা অনিবার্য্য। বস্তুতঃ বার্লিন মিউনিক ইত্যাদি মহা-শহরগুলা ছাড়া অন্যত্র জার্ম্মাণরাও ধূলা-কাদার সঙ্গে বসবাস করিতে অভ্যস্ত। লাণ্ড্সহুটে এই দুইয়ের উপদ্রব অত্যধিক।

(২)

ডোনডোর্ফ পল্লীর "ব্যুর্গারমাইষ্টার" (নগর-শাসক বা পল্লী-শাসক) অনেক পরিমাণ জমিজমার মালিক। ঢিঁপিসদৃশ পাহাড়ের পিঠে বেড়াইতে বেড়াইতে ইঁহার ক্ষেতগুলা দেখিতেছি। নগরশাসকের ছেলেমেয়েরা সঙ্গে আছে।

কিষাণ মহাশয় বলিতেছেন:—"আমি নেহাৎ আহাম্মুক। দেখিতেছেন এই পল্লীর প্রত্যেক কিষাণের ঘরই নয়া তাজা চক্‌চকে। একমাত্র আমার ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি সবই পুরানা ও সেকেলে। অন্যান্যেরা বিগত মার্ক-পতনের যুগে টাকাগুলা এই সব নতুন বাস্তুভিটায় ও আসবাব সরঞ্জামে খরচ করিয়া বাঁচিয়াছে। আমি বেয়াকুবের মতন নগদ টাকা জমাইয়া 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়াছি। টাকাগুলা ত সবই পচিয়া গিয়াছে। বাড়ীঘরও আমার অতি কদর্য্য।

এই পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ হইবে প্রায় ছয়শ' বিঘা। ইহার প্রায় এক চতুর্থ অংশ পড়ো। এখানে না চলে চাষ, না গোচারণ। অন্যান্য সমস্ত জমি চাষ করা হয় সপরিবারে, দশজনে মিলিয়া। দরকার হইলে কখনো কখনো একজন বা দুইজন মজুর নিয়োগ করা হয়। বৎসরে নাকি প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা আয় হয়। তাহার ভিতর সকল প্রকার খাজনা বাবদ লাগে প্রায় চার শ' টাকা।

খৃষ্টিয়ানদের "পুরোহিত-সর্ব্বস্ব"

মাত্র পঁচাত্তর আশী জন লোকের পল্লী। পুরুত ঠাকুর বলিলেন:— "স্বাস্থ্যের হিড়িকে পড়িয়া আমি পল্লীবাসী হইয়াছি। পূর্ব্বে আমার তাঁবে বড় বড় পল্লী বা মাঝারি গোছের শহরের গির্জ্জা শাসিত হইয়াছে।"

পুরুতঠাকুর মাত্রেই জার্ম্মাণিতে সরকারী চাকর। গবর্মেণ্টের

দপ্তরখানা হইতে ইঁহাদের বেতন আসে। ডোনডোর্ফের পুরুত মহাশয় বলিলেন :—"আমার মন্দিরের দেবোত্তর আছে আঠার বিঘা জমি। এই জমির আয় আমার বেতনের এক অংশ।"

দেবোত্তরের জমিদারি জার্ম্মাণির কোথাও কোথাও এখনো কিছু কিছু আছে। তবে এই সবের প্রভাব আজকাল বড় একটা নাই। ১৭৯৯ সালের আইনে "সেকুলারিজাট্‌সিয়োন" ঘটিয়াছে। অর্থাৎ মোহন্তদের জমিজমা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। তখন চলিতেছিল ইয়োরোপে ফরাসী-বিপ্লবের বোলশেভিক তাণ্ডব।

পুরুতগিরি করা জার্ম্মাণিতে মুখের কথা নয়। কোনো মতে দু'একটা লাটিন মন্তর আওড়াইতে পারিলেই এই নকরি জুটে না। প্রথমতঃ প্রত্যেককে সাধারণ "গিমনাজিয়ুমে" নয় বৎসর পড়িয়া ভারতীয় "বি-এ"র প্রায় সমান পরীক্ষা পাশ করিতে হয়। আঠার-উনিশ-বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কেহ এই পরীক্ষায় পাশ হইতে পারে না। তাহার পর পাঁচ বৎসর ধরিয়া ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মবিভাগে মামুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মতন লেখাপড়া চালাইতে হয়। পঞ্চম বর্ষের শেষে পরীক্ষায় পাশ হইলে পুরুতগিরির কাজে "শাগরেতি" করিবার আইনতঃ অনুমতি জুটে। কিন্তু কোনো গির্জ্জায় পূরাদস্তুর পুরুতগিরি করা তাহার পরেও অনেক "সবুর-করা"র এবং ধৈর্য্য ধরার ফল।

ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ে কি কি বিষয় পড়িতে হয়? পুরুত ঠাকুর বলিলেন—"আমি ফ্রাইজিঙের গির্জ্জা-বিদ্যালয়ে যেসব শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছি তাহার তালিকা দিতেছি। প্রথম বৎসর ধর্ম্ম-সাহিত্যের গন্ধ মাত্র থাকে না। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, আকরতত্ত্ব, জলবায়ুতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জন্তু-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সকল প্রকার প্রকৃতিবিদ্যা লইয়া এক বৎসর ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয়। তাহার পরের বৎসর দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস প্রধান ভাবে আলোচ্য বিষয় থাকে। প্রাচীন

গ্রীস হইতে আধুনিক ইয়োরোপ পর্য্যন্ত কোনো দেশ এবং কোনো যুগই বাদ যায় না। তাহার পর তিন বৎসর খৃষ্টানদের ধর্ম্মসাহিত্য, ধর্ম্ম-শিল্প, দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্ম্মের ইতিহাস, ধর্ম্ম-ঘটিত আইন, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়।"

জার্ম্মাণদের এই "পুরোহিত-সর্ব্বস্ব" সম্বন্ধে ভারতীয় পুরুতঠাকুরেরা কি বলিবেন? খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক দর্শন বলিলে রোমাণ ক্যাথলিকরা প্রধানতঃ টোমাস আকিনাসের মতামত বুঝিয়া থাকে। টোমাস দ্বাদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান সাধু। শঙ্করাচার্য্যের নাম উচ্চারিত হইলে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে যে ধারণা জন্মে, রোমাণ ক্যাথলিক সমাজে টোমাসের নামেও সেইরূপ। কবিবর দান্তের সাহিত্যে টোমাসের ধর্ম্মব্যাখ্যা বড় ঠাঁই পাইয়াছিল।

পাঁচনের রেওয়াজ

আয়ুর্ব্বেদ এবং য়ুনানি মতের চিকিৎসকেরা জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রিয়ায় এবং সুইট্সাল্যাণ্ডে নিজ নিজ জুড়িদার অনেক পাইবেন। এসকল দেশে ঐ ধরণের চিকিৎসাকে "প্রাকৃতিক চিকিৎসা"—"নাটুর-হাইল" বলে। কবিরাজ, বৈদ্য বা হাকিম মহাশয়েরা "নাটুর হাইল কুণ্ডিগার" অর্থাৎ প্রকৃতি-চিকিৎসাদক্ষ নামে পরিচিত।

নয়মার্ক্ট শহরে বা পল্লীতে চ্যার্মাক নামে একজন কবিরাজের পসার খুব বেশী। প্রকাণ্ড দুর্গ-সদৃশ নবাবী প্রাসাদে ইঁহার বসবাস। বৈঠক-খানায় লোকের ভিড় যৎপরোনাস্তি। চ্যার্মাক বলিতেছেন:—"যেষামন্যা গতির্নাস্তি তারা আসে আমার নিকট। অর্থাৎ নামজাদা পাশ-করা ডাক্তার এবং অস্ত্রচিকিৎসকেরা যখন জবাব দেন, তখন রোগীরা শরণাপন্ন হয় আমার। যমের দুয়ার হইতে রোগীদিগকে

"ঝাড়া, ফুঁকা," "তুক-মুক" ইত্যাদি কিছু দেখিতেছি না। নাড়ী টেপাটিপিও নাই। চোখের রং দেখিয়া ইনি বলিয়া দেন, কবে কোথায় কোন্ হাড়-মাসে কিরূপ দরদ হইয়াছিল। ইঁহার দ্বিতীয় কৌশল মূত্র-পরীক্ষা। ব্যস্। তাহার পরেই অমুক শিকড়, অমুক পাতা, অমুক ফুল ইত্যাদির "টে", কাৎ, বা চা। এক কথায় পাঁচন। জার্মাণ সমাজে পাঁচনের রেওয়াজ খুব দেখিতে পাই। পাঁচন-ছাড়া পরিবার আছে কিনা সন্দেহ।

পাশ-করা ডাক্তাররা পায় ত চ্যার্মাককে গিলিয়া খায়। তাহাদের ভাত মারা যাইতেছে যে!

মাহিয়ানার সিঁড়ি

(১)

দারিদ্র্য কাহাকে বলে, জার্মাণ সমাজে কেহ জানে না। এ দেশের "ফোল্‌ক্‌সশুলে" অর্থাৎ অবৈতনিক প্রাথমিক পাঠশালার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মাসিক বেতন কম-সে-কম ২৪০ মার্ক (১৮০৲)। এই সকল পাঠশালায় জার্ম্মাণির প্রত্যেক শিশু লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য। এই ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ হইলে আমাদের ম্যাট্রিকুলেশ্যনের সমান পরীক্ষা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ম্যাট্রিকুলেশ্যন ইস্কুলের মাষ্টারদের ভিতর কয়জনে মাস মাস ১৮০৲ পাইয়া থাকেন? জার্ম্মাণির শিক্ষাবিভাগে ইহাই নিম্নতম মাহিয়ানা।

এই সকল ইস্কুলের মাষ্টার হয় কাহারা? "ম্যাট্রিকুলেশ্যন" পাশ করার পর, তিন বৎসর এক নিম্নস্তরের শিক্ষক-বিদ্যালয়ে পড়িতে হয়। তাহার পর আর তিন বৎসর পড়িতে হয় উচ্চতর শিক্ষক-বিদ্যালয়ে। এই ছয় বৎসরের বিদ্যা শেষ হইলে,—অর্থাৎ মোটের উপর আমাদের এম-এ, এম-এস্‌সি শ্রেণীর বিদ্যার অধিকারী হইলে, লোকেরা প্রাথমিক

বিদ্যাপীঠে মাষ্টারি করিবার স্থযোগ পায়। এক কথায় বুঝিতে হইবে, —জার্ম্মাণির প্রত্যেক এণ্ট্র্যান্স ইস্কুলের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী অন্ততঃ পক্ষে ঠিক যেন এম-এ, এম-এস্ সি পাশ। আর ইহাদের কেহই ১৮০৲ এর কম দরমাহা পায় না।

ইস্কুলমাষ্টারিই হউক অথবা পুরুতগিরিই হউক কিম্বা রেলওয়েতে কেরাণীগিরিই হউক,—প্রত্যেক চাকরি জার্ম্মাণিতে বেতন হিসাবে সমান। বেতনের সিঁড়ি বার বা তের ধাপে বিভক্ত। ২৪০ মার্ক বা ১৮০৲এর ধাপটা সপ্তম ধাপ। কর্ম্মচারীরা, মাষ্টাররা, কেরাণীরা সকলেই নিজ নিজ বিদ্যা অনুসারে যথানির্দ্দিষ্ট ধাপে ঠাঁই পায়। তাহার পর অভিজ্ঞতা এবং কর্ম্মদক্ষতা মাফিক ধাপের পর ধাপে উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতন-বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। অষ্টম ধাপের বেতন ৪০০ মার্ক বা ৩০০৲। নবম ধাপের বেতন ৪৫০ মার্ক বা ৩৩৬৲ ইত্যাদি।

একদম সর্ব্বনিম্ন বা প্রথম ধাপের বেতন ১০০ মার্ক বা ৭৫৲ অর্থাৎ মাসে পঁচাত্তোর টাকার কমে জার্ম্মাণিতে কেহই নকরি করে না। তবে এত কম মাহিয়ানার লোক জার্ম্মাণ সমাজে আছে কি না সন্দেহ। বোধ হয় ঝাড়ুদার ইত্যাদির বেতন এইরূপ।

রেল-আফিসের এক বাবু গিমনাজিয়ুমে বি-এ পাশ করিয়া চাক্‌রিতে ঢুকিয়াছিলেন। বি-এ পাশ করিলেই চাকরি জুটে,—এরূপ বিশ্বাস করা ভুল। প্রত্যেক চাকরির জন্য উমেদারকে স্বতন্ত্র ভাবে নতুন বিদ্যা শিখিতে হয়। রেল, তার, ডাক, খাজনা, সংখ্যা-তালিকা, আদালত ইত্যাদি প্রত্যেক কর্ম্মকেন্দ্রের জন্যই "টেক্‌নিক্যাল" বা "কত ধানে কত চাল" বিদ্যা আয়ত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বি-এ পাশের জোরে জার্ম্মাণিতে কেরাণী-গিরি জুটে না। যে দেশে রামাশ্যামা সকলেই বি-এ, বি-এসসি, সে দেশে এই সকল পাশের কিম্মৎ কিছুই নয়।

করি। তাহার পর এক বৎসর মিউনিকের সরকারী কেরাণী-বিদ্যালয়ে চোপর দিনরাত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আফিস-বিজ্ঞান শিখি। এই সময়ে খোরপোষের জন্য ৭০।৮০ মার্ক করিয়া পাইতাম। তাহার পর পাঁচ বৎসর প্রাকৃটিকাণ্ট অর্থাৎ অ্যাপ্রেন্টিস রূপে কাজ। এই পাঁচ বৎসর আমাকে সপ্তম ধাপের লোক বিবেচনা করা হইত। কিন্তু বেতন দেওয়া হইত সপ্তম ধাপের ন্যায্য বেতনের বার আনা মাত্র। অর্থাৎ ২৪০ মার্কের ঠাঁইয়ে আমার জুটিত মাস ১৮০ মার্ক বা ১৩৫৲। শেষ পর্য্যন্ত পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পাকা চাকরি জুটিয়াছে। তখন আমার ধাপ ছিল অষ্টম,—৪০০ মার্ক বা ৩০০৲ মাহিয়ানা।"

দেখা যাইতেছে যে, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সের যুবা কাজে "পুরাদস্তর" বাহাল হইবা মাত্র ৩০০৲ বেতন পায়। কাজেই দারিদ্র্য কাহাকে বলে জার্ম্মাণরা জানিবে কোথা হইতে?

রেল-বাবু বলিতেছেন:—"প্রত্যেক ধাপে প্রায় দশ বৎসর কাটিয়েছে। আজ দশম ধাপে রহিয়াছি,—বয়স প্রায় বায়ান্ন,—বেতন ৫০০ মার্ক বা ৩৭৫৲। পঁয়শট্টি বৎসর বয়সে পেন্‌শ্যন পাইব। তখন বেতন হইবে ৫৫০ মার্ক বা ৪২০৲।"

প্রশিয়ায় লোকেরা পেন্‌শ্যন পায় ষাট বৎসর বয়সে। ব্যাভেরিয়ায় পেন্‌শ্যনের বয়স পঁয়ষট্টি।

চাকরি সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা দরকার। প্রত্যেক কর্ম্মচারী বিবাহিত হইবা মাত্র স্ত্রীর জন্য আলগা "ভাতা" মাসিক ১২ মার্ক বা ৯৲ পায়। সন্তান জন্মিবামাত্র প্রত্যেকের বাবদ জুটে আল্‌গা মাসিক ১৫ মার্ক বা ১২৲। সন্তানদের একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীরা এই সন্তান-বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকে।

(৩)

এণ্ট্র্যান্স বা ম্যাট্রিকুলেশ্যনের পর ছয় বৎসর শিক্ষক-বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিয়া প্রাথমিক পাঠশালায় মাষ্টারি করিতে গেলে বেতন জুটে কম-সে-কম ১৮০৲। বি-এ, বি-এসসি বিদ্যা লইয়া বৎসর ছয়েক কেরাণীগিরিতে শাগ্রেতি করিবার পর পাকা নকরি পাইলে ৩০০৲ মাসিক দরমাহা জুটে।

এইবার দেখা যাক,—বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষায় পাশ হইলে,—অর্থাৎ পিএইচ-ডি বা ডক্টর উপাধি থাকিলে বেতন জুটে কত? আমার গৃহস্বামী, পোষ্ট ইন্স্পেক্টর বাবু না ভাবিয়া চিন্তিয়া সোজা বলিলেন :—"দশম ধাপ—৫০০ মার্ক বা ৩৭৫৲।"

মাসিক ৩৭৫৲ পায় জার্ম্মাণিতে কিরূপ লোক? এদেশের "গিমনা-জিয়ুম" এবং "রেআলশুলে" নামক দুই শ্রেণীর মধ্যবিদ্যালয়ের প্রত্যেক মাষ্টারই ডক্টর অর্থাৎ দশম ধাপের কর্ম্মচারী। এই দুই ইস্কুল হইতে আঠার-উনিশ বৎসর বয়সে বি-এ, বি-এসসি বাহির হয়।

স্ত্রী-বৃত্তি এবং সন্তান-বৃত্তি বেতনের প্রত্যেক ধাপেই জাতি-বিদ্যা-বয়স-নির্ব্বিশেষে জুড়িয়া দিতে হইবে বলা বাহুল্য। ইহার নাম জার্ম্মাণ সমাজ। এই সমাজের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সোজা কথা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা কত করিয়া পায়? ইহারা দ্বাদশ ধাপের কর্ম্মচারী। দরমাহা ৭০০ মার্ক বা ৫২৫৲। ইহার কম কোনো অধ্যাপক পায় না। এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। জার্ম্মাণিতে ছাত্রদত্ত বেতন সমূহ প্রায় সবই অধ্যাপকদের প্রাপ্য। এই প্রাপ্যটা "উপরি" অর্থাৎ সরকারী ৫২৫৲ টাকার অতিরিক্ত। যাহার ক্লাসে যত বেশী ছাত্র, তাহার কপালে টাকা তত বেশী। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, দর্শন, ধনবিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি

অধ্যাপকদের "পায়া" খুব ভারি। ইঁহারা "লক্ষপতি"। আবার এমন অনেক বিদ্যা আছে, যার জন্য ছাত্রছাত্রী জুটেই না। এই সব বিদ্যার অধ্যাপকরা বাঁধা ৫২৫৲ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য।

"গিমনাজিয়ুম" ও "রেআলশুলে" ইস্কুলগুলার প্রিন্সিপাল বা হেডমাষ্টারদের পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সমান। মাসিক ৫২৫৲ বেতন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি পাশের পর আর একটা পরীক্ষা দিলে "প্রিফাট ডোৎসেণ্ট" বা সহকারী-অধ্যাপক হওয়া যায়। এই পদের ধাপ একাদশ,—বেতন ৪২০৲।

(৪)

জার্ম্মাণ নরনারীর আর্থিক অবস্থার আলোচনা করিতে গিয়া একটা মস্ত তথ্য নজরে আসিয়াছে। এদেশে ত্রয়োদশ ধাপই বেতনের সর্ব্বোচ্চ ধাপ। সেই ধাপে উঠিলে কর্ম্মচারী, কেরাণী, মাষ্টার, পুরুত-ঠাকুর সকলেই মাত্র ৮০০ মার্ক বা ৬০০৲ মাসিক পায়। অর্থাৎ ৬০০ টাকার বেশী বেতন জার্ম্মাণ সমাজে জানা নাই। এ এক অপূর্ব্ব আইন।

পোষ্ট ইন্‌স্পেক্‌টারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"তাহা হইলে যে সব লোক সমর-সচিব ইত্যাদির পদে মন্ত্রীগিরি করে তাহাদের বেতন কত?" জবাব ঃ—"মন্ত্রীদের পদ বেতনের সিঁড়ির অন্তর্গত নয়। কেন না তাহাদের সংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। মন্ত্রীরা মাসে হাজার দুই মার্ক অর্থাৎ ১৫০০৲ বেতন পায়। তবে ইঁহাদিগকে ঠাট বজায় রাখিবার জন্য ঘরবাড়ী, আসবাব, সরঞ্জাম ইত্যাদি সরকার হইতে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ সরকারী ইমারতগুলা সবই যথারীতি ফিটফাট সাজানো থাকে। যেই কোনো দপ্তরের সচিব বাহাল হয়, তখন সে যথানির্দ্দিষ্ট ইমারতের বাসিন্দা হইতে অধিকারী। কিন্তু মাসিক দরমাহা তাহার ১৫০০৲।"

অতএব জার্ম্মাণ সমাজের প্রথম আর্থিক কথা,—প্রাথমিক পাঠশালার মাষ্টারেরা পায় ১৮০৲ মাস। দ্বিতীয় কথা ৬০০৲ এর বেশী বেতন পায় না চরমতম শিক্ষিত লোকেরাও। আর তৃতীয় কথা,—এদেশে যাহারা রাজ্য চালায়, পল্টন চালায়, আইন চালায় তাহাদের মাহিয়ানা ১৫০০৲ এর বেশী নয়।

লক্ষপতি, ক্রোরপতি ইত্যাদির জন্য হাজার হাজার পথ এদেশে খোলা আছে। লোকেরা তেজারতির লাইনে, কৃষিকর্ম্মে, ব্যাঙ্কে, ফ্যাক্টরিতে পুঁজিপতি হইতেছে। লেখক হিসাবে, অভিনেতা হিসাবে, চিত্রকর হিসাবে, গায়ক হিসাবে, এই ধরণের অন্যান্য অসংখ্য হিসাবেও লোকেরা অজস্র টাকা উপার্জ্জন করে।

এই সকল কথা মনে রাখিয়াও সরকারী বেতনের সিঁড়িটা সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখা আবশ্যক। এই সিঁড়ি মাফিকই জার্ম্মাণির মধ্য-বিত্ত সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আর এই সিঁড়ির মূলমন্ত্র এই যে, নিম্নতম, মূর্খতম, নেহাৎ আনাড়ি লোকও যেন খানিকটা সুখে-স্বচ্ছন্দে শরীরটা বাঁচাইয়া সংসারে চলাফেরা করিতে পারে। জার্ম্মাণ আদর্শ জগতে ছড়াইয়া পড়িলে মানবজাতির দুর্গতি অনেক পরিমাণে ঘুচিবে।

টোন পুড়াইবার শিল্প

রাইটার-পত্নী বলিতেছেন:—"স্বামী আমাদের ব্যবসার মালিক বটে। কিন্তু হিসাব পত্র চলে সবই আমার নজরে। স্বামীর উপর অঙ্কের ভার দিলে এতদিনে কারখানাটা কারখানা-লীলা সম্বরণ করিত।"

"টোন"-মাটির বাসন তৈয়ারি করা রাইটারদের কারবার। টোনকে পোর্সলেন বা চীনামাটির মাসতুত ভাই বলা চলে,—মাটিটা কিছু নিকৃষ্ট। ইয়োরামেরিকায় ঘরে-বাইরে যে সব থালা বাটি পেয়ালা ডেকচি গামলা দেখিতে পাই, সে সবকে সহজে আমরা পোর্সলেন

বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ সে সবের শতকরা নিরানব্বুইটা "টৌন" বা পোর্সলেন দুনিয়ায় একমাত্র পয়সাওয়ালাদের, এবং মধ্যবিত্তদের পোষাকী আসবাব।

রাইটার অতি উঁচুদরের সুকুমার শিল্পী। দেশ-বিদেশের লোকেরা ইহার হাতের গড়া বাসন-কোসন, চিমণী-চুল্লা লইয়া যায়। "রূপ-দক্ষতায়" রাইটারকে প্রথম শ্রেণীর কারিগর বলিতেই হইবে। মিউনিকের শিল্প-বাজারে রাইটারের "হাফ্‌নারাই" বা টৌন-কারখানার নাম আছে।

রাইটার বলিতেছেন :—"লাণ্ড্‌সহুটের এই বাড়ীটা আমাদের অনেক দিনের বাস্তভিটা। এই যে ভাটিটা দেখিতেছেন, ইহাতে আমার পিতামহ-প্রপিতামহ সকলেই টৌন পুড়াইয়া গিয়াছে। এই ধরণের মান্ধাতার আমলের ভাটি জার্ম্মাণিতে আর একটাও আছে কি না সন্দেহ। আমি ইহাকে পুরানা কায়দায়ই রাখিয়া দিয়াছি। কাঠ পুড়াইয়া আগুন তৈয়ারি করি। নবীনতম ভাটির পরিচালকেরা আমার এই সেকেলে ভাটির কেরদানি দেখিয়া বিস্মিত হয়। আমার পিতার তৈয়ারি চিম্‌ণী ট্রাউসনিট্‌স দুর্গের এক ঘরে দেখিতে পাইবেন।"

ছেলেও কারবারে বাহাল আছে। গোটা কারখানায় মাত্র পাঁচটা ছোটখাটো যন্ত্র। একটা মোটরের সাহায্যে যন্ত্রগুলা চালানো হয়। আট জন মাত্র মজুর কাজ করে। খাঁটি পারিবারিক শিল্প হিসাবে রাইটারের কারখানায় অনেক কিছু শিখিবার আছে।

রাইটারের মাল ভাটি হইতে পড়িতে পায় না। গরম গরম সবই বিক্রী হইয়া যায়। ইঁহারা "চোপর দিন রাত"ই খাটিতেছেন। রাইটার বলিলেন :—"মজুরদের বেলায় আইন আছে আট ঘণ্টার রোজ। আমি খাটি প্রায় আঠার ঘণ্টা!" স্ত্রী বলিলেন :—"ইহাই আমার স্বামীর একমাত্র ব্যাধি।"

ইজার-তালে জল-প্লাবন

দিনরাত বৃষ্টি পড়িতেছে। সবুজ ইজার ফুলিয়া উঠিয়াছে। জল কিনারা ছাপাইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে "খাল বিল পুকুর পূরিল।" চারিদিকে হাহাকার,—বিষম বন্যা। এই অবস্থা একমাত্র লাণ্ডসহুটেই গণ্ডীবদ্ধ নয়। মিউনিকও ইজারের উপর,—তাহার দুরবস্থাও এইরূপ। গোটা ইজারতাল জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

লাণ্ড্সহুটের সড়কগুলা নদীতে পরিণত হইল। মাঠঘাট সবই জলের নীচে। বসতবাড়ীর "কেলার" বা আন্তর্ভৌম প্রকোষ্ঠগুলায় এক হাঁটু বা এক বুক জল। কাজে ভিড়িয়া গেলাম। কয়লা, কাঠ, বাক্স, হাঁড়ীকুঁড়ি সবই "কেলার" হইতে উপরের তলায় তুলিয়া আনিতে লাগিয়া যাওয়া গেল।

হাজার হাজার কিষাণের "পাকা ধানে" সর্ব্বনাশ। মিট্টেনভাল্ড অঞ্চলে কোনো কোনো কিষাণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। লাণ্ডসহুট অঞ্চলে রাশি রাশি শস্যের আঁটি ভাসিয়া যাইতেছে। গরু ছাগলের দুর্দ্দশাও যৎপরোনাস্তি।

যাহা হউক,—দৃশ্যটা চমৎকার। ট্রাউসনিট্স দুর্গের ছাদে যাইয়া আবেষ্টনটা দেখিতেছি। গোটা জনপদ সাগরে পরিণত হইয়াছে। পল্লীভবনগুলা দূরে দূরে কতকগুলা দ্বীপের মতন দেখাইতেছে। মাঠে মাঠে চলিতেছে নৌকা। মেয়ে পুরুষেরা হাঁটিতেছে জুতা মাথায় বা ঘাড়ে করিয়া। বন্যার দৌরাত্ম্যে ভারতে এবং চীনেও এইরূপ দৃশ্যই দেখা যায়।

দুই তিন দিনের ভিতরই দুর্দ্দৈব কাটিয়া গেল। দশবিশ বৎসরের ভিতর নাকি এমনটি আর লাণ্ডসহুটে ঘটে নাই।

তবে জার্ম্মাণিতে চাষীদের মাবাপ গবর্মেণ্ট। জমিদার নামক

জীব এদেশে নাই। কোনো নির্দ্দিষ্ট হারে বৎসর বৎসর খাজনা দিতে হয় না। প্রত্যেক বৎসর গবর্মেণ্ট চাষ-আবাদের আয় দেখিয়া খাজনার পরিমাণ ঠিক করিয়া দেয়। সেই পরিমাণ ঠিক করিবার সময় প্রত্যেক কিষাণের মাসিক খরচ এবং বার্ষিক আয়-লোকসান ইত্যাদি সবই খুঁটিনাটির সহিত আলোচিত হয়। কিষাণেরা গবর্মেণ্টের নির্দ্ধারিত খাজনার পরিমাণ যুক্তি দেখাইয়া কমাইতে অধিকারী।

চাষীদের সরকারী খাজনা

ব্যাভেরিয়ায় কিষাণরা কত হারে খাজনা দেয় সেই বিষয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া খাজাঞ্চি-খানায় বড় বাবুদের সঙ্গে মোলাকাৎ হইল। বুঝিয়া উঠা কঠিন। যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করিয়া, ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম। রামার দলিলপত্র, শ্যামার দেনাপাওনার হিসাব ইত্যাদি অনেক নথি নাড়াচাড়া করিলাম। প্রায় এক ডজন খাজনার নাম শুনা গেল। প্রত্যেক কিষাণকেই এই সব দিতে হয়।

ধরা যাউক যেন কোনো লোকের ১৫০ বিঘা জমিতে চাষ চলে। তাহার সঙ্গে কাজ করে স্ত্রী এবং চার পুত্রকন্যা আর দুই মজুর। তাহা হইলে সকল প্রকার শস্য এবং জানোয়ার বেচিয়া,—খরচ পত্র বাদে—তাহার মজুত থাকে আজকালকার বাজার-দর হিসাবে বার্ষিক প্রায় ১,৫০০৲। এই দেড় হাজার টাকার উপর জমি-কর, ঘর-কর, গির্জ্জা-কর, পল্লী-কর, জেলা-কর, ব্যবসা-কর, আয়-কর ইত্যাদি সকল প্রকার করের সমবেত পরিমাণ প্রায় ১৫০৲। বাকি থাকে ১৩৫০৲। এই টাকায় কিষাণের বার্ষিক ভরণপোষণ হয়।

কম-সে-কম দেড়শ' বিঘা জমি যে কিষাণের নাই, তাহার পক্ষে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করা এই অঞ্চলে সম্ভবপর নয়। অন্ততঃ ছয়শ বিঘা

জমি যার তাহাকে জার্ম্মাণরা "গুট্‌স্‌-বেসিট্‌সার" অর্থাৎ ইতালীয় বা ভারতীয় জমিদার জাতীয় লোক বলে। কিন্তু জার্ম্মাণ জমিদার কোনো রাইয়তের বা প্রজার মালিক বিশেষ নয়। সেও এক কিষাণ,—বড় গোছের কিষাণ। নিজ হাতে জমি চষা তাহার কোষ্ঠিতে অবশ্য লেখে না। কিন্তু সে লোক লাগাইয়া, চাষ-আবাদ, পশুপালন তদবির করিয়া অন্নসংস্থান করিতে বাধ্য। যদি সে দুর্ভাগ্য ক্রমে কুঁড়ে অথবা মূর্খ্খু হইয়া জন্মে, তাহা হইলে একমাত্র জমির মালিক হওয়ার দরুণ তাহার পেট ভরিবার সম্ভাবনা নাই। শিল্পপতি, ব্যাঙ্কপতি, ব্যবসায়ী ইত্যাদির মতন "গুট্‌স-বেসিট্‌সার" বা জার্ম্মাণ জমিদারকে মাথা খাটাইয়া "আট-দশ ঘণ্টার রোজ" চালাইয়া হাজারপতি বা লক্ষপতি হইতে হয়। বাঁধা খাজনা ভোগ করা জার্ম্মাণিতে জমিজমার মালিকদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নয়।

একশ'-দেড়শ' বিঘার কম জমি যাহাদের তাহারা নিজ চাষ-আবাদ সারিয়া অন্যান্য ভূমিপতিদের নক্‌রি করিতে লাগিয়া যায়। কিষাণদের ক্ষেতে যে সকল মজুর দেখিয়াছি, তাহারা সাধারণতঃ ত্রিশ-পঞ্চাশ বিঘা জমির মালিক। কিন্তু ত্রিশ-পঞ্চাশ বিঘার মালিকেরা আর্থিক হিসাবে স্বরাজী নয়। এই জন্যই পরের কাজে গতর না খাটাইলে তাহাদের চলে না।

ব্যাভেরিয়ায় স্বচ্ছল স্বরাজী কিষাণদের সংখ্যা অনেক। কর্জ্জে ডুবিয়া যাওয়া, অনাহারে মৃতপ্রায় হওয়া অথবা ম্যালেরিয়ায় ভোগা দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে অজানা সামগ্রী। এই কারণেই ব্যাভেরিয়ার চাষী-সমাজে বোল্‌শেভিকীর দন্তস্ফুট অসম্ভব।

মন্দির-গাত্রে ছবি আঁকা

লোরেটো মন্দিরের অভ্যন্তর চিত্রিত করিবার কাজে ইনি মোতায়েন আছেন। ইঁহার সহকর্ম্মী আর একজন যুবা চিত্রকর।

ফ্রান্সিস-পন্থী পুরোহিতদের সঙ্গে মন্দির পরিদর্শন করা যাইতেছে। মই ভাঙিয়া মাচাঙের উপর উঠিলাম। কাউপ বলিলেনঃ—"দেখিতেই পাইতেছেন দেওয়ালটার উপর লেপা-পুছা এক প্রকার শেষ হইয়াই আসিয়াছে। ছাদের কাজ কিছু কিছু বাকি আছে। কাজেঁ হাত দিবার পূর্ব্বে প্রথমে একটা নক্সা তৈয়ারি করিয়াছিলাম।" সেই নক্সাটা ভিন্ন ভিন্ন কাগজে দেখা গেল।

নক্সা মাফিক ছবি আঁকা হইয়াছিল পরে,—দেওয়াল ও ছাদের আকার-প্রকার সদৃশ প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কাগজে। সেই সকল কাগজ দেখাইয়া কাউপ বলিতেছেন,—"দেওয়াল ও ছাদের উপর কাগজ রাখিয়া ছবির রেখায়-রেখায় দাগ টানিতে হয়। সেই দাগগুলা দেওয়াল আর ছাদের উপর চিত্রের জমিন তৈয়ারি করে। তাহার পর রংয়ের খেলা।"

আঁকা হইতেছে ধর্ম্মের কাহিনী,—বলাই বাহুল্য। একটা দেওয়াল আর আধখানা ছাদ লেপিতে লাগিতেছে মাস তিনেক। যুবারা মোলায়েম বর্ণসমাবেশে সুপটু। মূর্ত্তিগুলা সাজাইয়াছেও অতি সুচারুরূপে। সমগ্র রূপাবলীর ভিতর একটা সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কাউপের বন্ধু বলিলেন,—"আমরা ইহার পূর্ব্বে আরও দুই-চারটা মন্দিরে কাজ পাইয়াছি। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে (১৯২৪) আমরা আমেরিকায় যাইতেছি। সেখানে সেইণ্ট লুই শহরের এক গির্জ্জায় আমাদের ডাক পড়িয়াছে।"

ষোড়শ অধ্যায়

মিউনিক

(আগষ্ট ১৯২৪)

মিউনিকে নগর-গরিমা

অনেক দিন মফঃস্বলে কাটাইবার সময় মাঝে মাঝে শহরে আসিলে লাগে মন্দ নয়। লাণ্ড্‌সহুটে মাত্র হাজার ত্রিশেক লোক। ইহাকে আজকালকার নজরে পল্লীর সামিলই বিবেচনা করিতেছি। কিন্তু মিউনিককে আর মফঃস্বল বলা চলে না। সবই এখানে বিপুল। লাখ সাতেক নরনারীর কোলাহল।

ব্যাভেরিয়ার স্বদেশী নাম বায়ার্ণ্‌। মিউনিককে প্রশিয়ানরা বলে ম্যিন্‌খেন। ব্যাভেরিয়ানদের উচ্চারণে ম্যিন্‌চেন।

গোটা জার্ম্মাণির লোকসংখ্যা আজকাল সওয়া ছয় কোটি। তার প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সত্তর-পঁচাত্তর লাখ লোক বাস করে ব্যাভেরিয়ায় বা দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে। ব্যাভেরিয়া এই হিসাবে অষ্ট্রিয়ার চেয়ে কিছু বড়, স্বইট্‌সার্ল্যাণ্ডের দেড়া,—আমাদের ভারতীয় চার-পাঁচটা জেলার অনুরূপ। এক মিউনিক শহরেই ব্যাভেরিয়াণ-জার্ম্মাণদের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ জীবন ধারণ করে। মিউনিক জার্ম্মাণ জীবনের এক মস্ত আড্ডা।

দোকানপাটগুলা নয়হাউজার আর কাউফিঙার ষ্ট্রাসেতে যারপরনাই জাঁকজমকপূর্ণ। শ্বোআবিঙ্‌-মহাল্লার বাস্তগুলা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের প্রতিমূর্ত্তি। ইজার দরিয়ার দুই কিনারায় সবুজ বাগানের পাশে পাশে সড়কসমূহ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সাজাইয়া রাখিয়াছে।

"রেসিডেন্‌ৎস" বা রাজবাড়ী, "রাটহাউস" ইত্যাদি সরকারী বাড়ী, এবং অন্যান্য বসত-বাড়ী সবই নিরেট সৌকুমার্য্যময় ইমারত।

যে পাড়ায়ই যাই,—মনে হইতেছে যেন খানিকটা ভিয়েনায় বা প্যারিসে রহিয়াছি। একটা ছোট খাটো প্রদেশ মাত্রের বড় শহর বোধ হইতেছে না। মিউনিক যদি গোটা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের রাজধানী হইত, তাহা হইলেও জার্ম্মাণ জাতির ইজ্জত নষ্ট হইত না। যাঁহারা বার্লিন দেখিবার পূর্ব্বে মিউনিকে পদার্পণ করিবেন, তাঁহারা ভুলিয়া এই শহরকে সওয়া ছয় কোটি নরনারীর রাষ্ট্রকেন্দ্র বিবেচনা করিলেও দোষ হইবে না।

জ্ঞানমণ্ডলের প্রতিষ্ঠানসমূহ মিউনিকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। মিউজিয়ামে-মিউজিয়ামে "ধূল পরিমাণ"! লুড্‌ভিগষ্ট্রাসেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাড়া বলা চলিতে পারে। শহরের আর একটা পাড়া জুড়িয়া চিকিৎসাবিভাগের ল্যাবেরেটরি, হাসপাতাল ইত্যাদি অবস্থিত। মিউনিকের টেখনিশে হোখশুলে জার্ম্মাণিতে অতি প্রসিদ্ধ।

স্যাক্‌সন নগর ড্রেসডেন যেমন রেণেসাঁস গড়নে ভরপুর, ব্যাভেরিয়ান নগর মিউনিকও সেইরূপ। বাস্তুরীতির তরফ হইতে প্যারিস, ভিয়েনা ও মিলান যে শ্রেণীর অন্তর্গত, মিউনিকও সেই শ্রেণীর শহর। কোনো কোনো ইমারত ঠিক যেন ভেনিস হইতে সশরীরে উপড়াইয়া আনা হইয়াছে। বার্লিনের রীতি অথবা জার্ম্মাণি-প্রসিদ্ধ "গথিক" ঢঙ মিউনিকে অতি বিরল। কিছু বিস্মিত হইতেছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দুনিয়ায় যে সকল নতুন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটায়ই রেণেসাঁসের প্রভাব পড়িয়াছে। প্যারিস, ভিয়েনা, মিউনিক ইত্যাদির ত কথাই নাই,—ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রত্যেক জনপদেই ইতালিয়ান রেণেসাঁস কোনো না কোনো আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মিউনিকের যা কিছু বাস্তুগৌরব, সবই ঊনবিংশ শতাব্দীর চিজ্। ব্যাভেরিয়ার "বিক্রমাদিত্য" লুডভিগ (১৮২৫—৪৮) নামজাদা বাস্তুশিল্পী, স্থপতি ও চিত্রকর বাহাল করিয়া নগরের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার আমল হইতে প্রিন্‌ৎস্‌রেগেণ্ট লুইটপোল্ড (১৮৮৬-১৯১২) পর্য্যন্ত মিউনিকের দরবারে "নবরত্নের সভা" লাগিয়াই ছিল।

এঞ্জিনিয়ার ফোন মিলার

ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ওস্কার ফোন মিলার* সর্ব্বদাই তড়িতের ডাকে সাড়া দিতে-দিতে হয়রাণ হইতেছেন। বিজলীর কতগুলা কারখানা ইঁহার নিজের হাতে গড়া তাহা গুণিয়া উঠিতে পারিলাম না। জার্ম্মাণ মুল্লুকের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই ফোন মিলারের তলব পড়িয়াছে। জলের তেজ লইয়া মাথা খাটানো আজকাল ইঁহার এক মস্ত কাজ।

ইঁহার মতন লোকের আবহাওয়ায় কিছুকাল ধরিয়া সময় কাটাইবার সুযোগ পাওয়া যুবক ভারতের পক্ষে এক মহা সৌভাগ্যের কথা বিবেচিত হইবে। যে সকল ভারতীয় সুধী বিদেশে আসিয়া এঞ্জিনিয়ারিঙ্ লাইনে ডিগ্রি লইতেছেন, তাঁহারা এই ধরণের কেজো লোকের সাগরেতি করিতে পারিবার পূর্ব্বে কর্ম্মক্ষম হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

মিউনিকের "ড্যয়চেস মুজেয়ুম" ইজার দরিয়ার ভিতরকার এক দ্বীপের উপর গড়িয়া উঠিতেছে। এই সংগ্রহালয়ের তদবির করা ফোন মিলারের এক বড় কাজ। এই ধরণের এত বড় মিউজিয়াম জার্ম্মাণিতে আর নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এ যাবৎ দুনিয়ায়

* মিউজিয়াম উপলক্ষ্যে ১৯২৮ সনে ইনি ভারত ভ্রমণে আসিয়া ছিলেন। গ্রন্থকারের সঙ্গে কলিকাতায় দেখা হইয়াছিল।

যাহা কিছু আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হইয়াছে, সবই এই সংগ্রহালয়ে ধারা-বাহিকরূপে স্থান পাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি-ঘটিত সকল প্রকার আবিষ্কার এই বিপুল ভবনে সংগৃহীত হইতেছে।

এক কথায় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্রম-বিকাশে বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্রিক স্রষ্টারা মানবজাতিকে কোথা হইতে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, ফোন মিলারের তত্ত্বাবধানস্থ এই জ্ঞান-মন্দিরে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শহরের অন্য এক ইমারতে এত দিন ধরিয়া সংগ্রহগুলা রক্ষিত হইতেছিল। আগামী বৎসর (১৯২৫) নবগৃহে প্রবেশ হইবে।

মধ্যবিত্ত পরিবার

বাড়ীওয়ালী বিধবা,—এক প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসকের পত্নী। স্বামী যা কিছু টাকা পয়সা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সবই মার্কের পতন-হাঙ্গামায় রসাতলে গিয়াছে। কাজেই বিধবা এক প্রকার পথের ভিখারী।

এক মেয়ে ব্যাঙ্কে কাজ করে,—প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া। আর এক মেয়ে এক জমিদারের বাড়ীতে ছেলেদের অভিভাবক। এই দুই কন্যার রোজগারের উপর বিধবার জীবন ধারণ নির্ভর করিতেছে। মাকে খাওয়াইবার জন্য মেয়েরা আজ পর্য্যন্ত বিবাহের দিকে নজর দিতে ঝুঁকে নাই। ইহাদের বয়স ত্রিশের কোঠা পার হইয়াছে।

ইহাদের আত্মীয়-স্বজন সকলেই উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক। বাড়ীওয়ালীর এক ভাই ডাক্তার, এক ভাই এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। বোনদেরও বিবাহ হইয়াছে এই ধরণেরই উচ্চ শিক্ষিত মহলে। এক ভগ্নীপতি যুক্তরাষ্ট্রে কন্‌সাল,—অপর এক ভগ্নীপতি জার্ম্মাণির এক শহরে ওষুধের দোকানের মালিক।

বাড়ীওয়ালীর মাসী ছিয়াশী বৎসরের বুড়ী। এই বুড়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়া ভাবিতেছি, চুল পাকিলেই লোকে বুড়া হয় না। জার্ম্মাণির এক উড়ো জাহাজে আজ বহুলোক জার্ম্মাণি হইতে আমেরিকায় পৌঁছিয়াছে—এই খবরটা পর্য্যন্ত বুড়ীর জানা আছে। আর এই সংবাদে যৌবন-সুলভ আবেগও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছে। বলিতেছেন—"জার্ম্মাণির ভবিষ্যৎ তাহা হইলে অন্ধকারময় নয়।"

বুড়ীর নিকট "সেকালের" গল্প অনেক শুনিলাম। বলিলেন:— "তোমরা আজকাল মোটরকারে উড়িয়া-উড়িয়া দেশ দেখ। সেকালে আমরা ঘোড়ার ডাকগাড়ীতে হাঁটিয়া-হাঁটিয়া প্যারিসে যাইতাম। আজ মিউনিকে দেখিতেছ সাত লাখ লোক। আমার আমলে এখানে এক লাখ লোকও ছিল না। যে সব বড় বড় ইমারত দেখিতেছ, তাহার প্রায় সব কয়টাই আমি উঠিতে দেখিয়াছি।"

বুড়ীর স্বামী ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ফোন মেন্‌ৎসেল। "নয়ে পিনাকোটেক" নামক নব্য চিত্র-শিল্পের সংগ্রহালয়ে ফোন মেন্‌ৎসেলের আঁকা ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীর ভাইয়েরা কেহ কেহ সেনাপতির পদে উঠিয়াছিলেন। বুড়ী বলিতেছেন:—"মিউনিকের নবরত্নের সঙ্গে আমাদের আনাগোনা বেশ ছিল। রাজ-শিল্পী জোসেফ ষ্টীলারের পুত্র কবি কার্লের ঘরে আড্ডা বসিত অনেক। তে হি নো দিবসা গতাঃ! আজকালকার নতুন-নতুন ঢঙের লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশা আর পোষায় না। এখন কেবল দিন গুনিতেছি।"

বুড়ীর চোখে জল নাই। সকল কথার সঙ্গেই প্রাণভরা হাসি।

বিয়ায়-ভবনে খোসগল্প

ব্যাভেরিয়ার লোকেরা রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে আন্দোলন চালাইতেছে। "ক্যোনিগ্‌স্‌-বুণ্ড" বা রাজদল নামক সমিতির অধীনে ব্যাভেরিয়ার

নরনারীরা ক্রোনপ্রিন্‌ৎস্ বা যুবরাজ রুপরেখ্‌টকে গদ্দিতে বসাইবার জল্পন-কল্পন করিতেছে। লাণ্ডস্‌হুটে তাহার আঁচ পাইয়াছি। পল্লীতে পল্লীতে তাহার সাড়া দেখা গিয়াছে। মিউনিকেও এই আন্দোলন বেশ গরম থাকিবারই কথা।

"হোফ ব্রয়-হাউস" নামক বিয়ার-ভবন রেষ্টরাণ্টে একসঙ্গে প্রায় হাজার নরনারীর অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা গেল। মিউনিকে আসিয়া এই রেষ্টরাণ্টে খানা খায় না এমন বেরসিক লোক কেহই নয়।

এক টেবিলে গল্প জুড়িয়া দেওয়া গেল। মজুর, কেরাণী, বাবু, ব্যাঙ্কার, চিত্রকর, ইস্কুল-মাষ্টার ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই এই হাটে এক গেলাসের ইয়ার। পর্য্যটকের হ্যাপস্যাক ঘাড়ে বহিয়া এক মহিলা তাঁহার স্বামীর সঙ্গে আসিয়া হাজির হইলেন। প্রসিদ্ধ স্থপতি, অধ্যাপক পেৎসোল্‌ড্ আমাদের সঙ্গী ও নগর-প্রদর্শক।

মহিলা বলিলেন,—"হিট্‌লারের আন্দোলনে আমাদের সহানুভূতি পূরাপূরিই ছিল। ব্যাভেরিয়া হইতে ইহুদি জাতটাকে খেদাইয়া দেওয়া ছিল হিট্‌লারের সাধ। সেই কাজে প্রত্যেক খাঁটি ব্যাভেরিয়ান নরনারী সাহায্য করিতে রাজি। কিন্তু সেনাপতি লুডেনডোর্ফ টার সঙ্গে মিশিয়া হিট্‌লার নেহাৎ কাঁচা কাজ করিয়াছিল। হাজার হইলেও হিট্‌লার ছোকরা যুবা।"

আমি থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—"কি রকম? লুডেন-ডোর্ফকে এত হেয় পদার্থ বিবেচনা করিতেছেন কেন?"

প্রথমেই বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মহিলা বলিলেন :—"লুডেনডোর্ফ আবার সেনাপতি? মাছরাঙা আবার পাখী! ব্যাভেরিয়ার সেনা-পতিদের কাছে লুডেনডোর্ফ দাঁড়াইবার উপযুক্ত লোকই নয়। ব্যাভেরিয়ায় এত পাকা মাথা থাকিতে হিট্‌লার কি না প্রশিয়ার এই আনাড়িটাকে দলের কর্ত্তা বাছিয়া লইল? লজ্জার কথা। দুঃখের

কথাও বটে। বিগত নবেম্বরের এমন স্থযোগটা মাঠে মারা গেল। ছেলে-ছোকরাদের হাতে দেশ-উদ্ধারের ভার থাকিলে অনেক সময়ে এইরূপ আহাম্মুকি ঘটিতে বাধ্য।"

পত্নীর কথায় সায় দিয়া স্বামী বলিতেছেন,—"প্রশিয়ায়-ব্যাভেরিয়ায় আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ। প্রশিয়ার দৌরাত্ম্য ব্যাভেরিয়ানরা কোনো মতেই সহিবে না। জার্ম্মাণি দুই টুকরা হইয়া গেলে আমাদের কোনো ক্ষতি নাই। প্রশিয়া উত্তর জার্ম্মাণির কর্ত্তা থাকুক। আর আমরা দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে একটা নয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রজা হইব। সেই রাষ্ট্রে ব্যাভেরিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার (কম সে কম টিরোলের) সংযোগ সাধিত হইতে পারিবে।

এক ব্যক্তি বলিলেন ঃ—"লুডেনডোর্ফের কি আস্পর্দ্ধা! তার ইচ্ছা যে, ব্যাভেরিয়া প্রশিয়ার লেজুড় মাত্র থাকুক, আর প্রশিয়ার ক্রাউণ-প্রিন্স—হোহেন্‌ৎসোলার্ণ দ্বিতীয় ভিল্‌হেল্মের পুত্র—নয়া জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের বাদশা হউক। কেন? আমাদের ভিট্টেলবাথ বংশ কি দোষ করিল? হিট্‌লার লুডেনডোর্ফের ধড়িবাজি ধরিতে পারে নাই। ব্যাভেরিয়ার যা কিছু সম্পদ দেখিতে পাইতেছেন সবই আমরা ভিট্টেলবাথদের সং-প্রয়াসে লাভ করিয়াছি। যুবরাজ রুপ্‌রেখ্‌টকে ছাড়িয়া আমরা কি হোহেন্‌ৎসোলার্ণদের চরণ সেবা করিতে ছুটিব? তাহা কখনই সম্ভবপর নয়।"

টেবিলে একটা ছোটখাটো রাজনৈতিক মজলিশ উপভোগ করিতেছি। ব্যাভেরিয়ার খাঁটি স্বদেশী স্বরাজ সম্বন্ধে ভিতরকার কথা অনেক বাহির হইয়া পড়িল। তবে রুপ্‌রেখ্‌ট রাজতক্তে বসিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কেন না ইহুদিরা ব্যাভেরিয়ায়ও ধনদৌলতে খুব পুরু। আর বোল্‌শেভিক সর্দ্দারদের গলার আওয়াজও বেশ চড়া।

শিল্প-নগর মিউনিক

বইয়ের দোকানে ছবির বাজার জার্ম্মাণির এক বিশেষত্ব। অধিকন্তু দোকানগুলা এরূপভাবে সাজানো যে প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন স্বকুমার শিল্পের প্রদর্শনী বা হাট দেখিতেছি। তাহা ছাড়া সচিত্র কেতাবের ছড়াছড়ি।

ছবি ও মূর্ত্তির দোকান জার্ম্মাণির অলিতে গলিতে অনেক দেখিয়াছি। "কুন্‌ষ্ট-হাণ্ড্‌লুঙ্‌" অর্থাৎ স্বকুমার শিল্পের ব্যবসা প্যারিসে বেশী কি জার্ম্মাণ মুল্লুকের নগরে নগরে বেশী বলা সহজ নয়। ভিয়েনা, ড্রেসডেন, য়েনা, বার্লিন, ইন্‌সব্রুক,—সর্ব্বত্রই শিল্পের বাজার যে-সে লোকেরই চোখে পড়ে। মিউনিক এই হিসাবে একটা রাজধানী বিশেষ। "গালারী" বা "কুন্‌ষ্ট-হাণ্ডলুঙ্‌" নামে অগণিত দোকানের সারি দেখিতেছি কোনো কোনো মহাল্লার প্রত্যেক সড়কে। আবার প্রত্যেক মহাল্লায়ই এই ধরণের দুই চারটা হাট নজরে আসিতেছে। দোকানগুলা ঐশ্বর্য্যপূর্ণও বটে।

পশু-শিল্পী টিড্‌য়েনের চিত্রশালায় খোস-গল্প হইল। শুনিলাম কম সে কম বিশ হাজার নরনারী ছবি আঁকিয়া অথবা মূর্ত্তি গড়িয়া এই শহরে অন্ন সংস্থান করে।

অন্যান্য শহরের মতন মিউনিকেও নানা "দলে"র স্বকুমার শিল্প চলিতেছে। এই সকলের প্রদর্শনীও বসে বৎসরে কয়েকবার। প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন হাট-বাজার সন্দেহ নাই। তবে প্যারিসের "গ্রাঁ প্যালে, "পেতি প্যালে" ইত্যাদি ভবনের মতন সার্ব্বজনিক প্রদর্শনীর জন্য এক বিপুল প্রাসাদ এখানেও দেখিলাম। নাম "গ্লাস পালাষ্ট" বা কাচের প্রাসাদ। এই "শিষ-মহলের" ছাদ ও দেওয়াল সবই কাচের তৈয়ারি। কাজেই বাস্ত ও চিত্রগুলার উপর আলো পড়িতেছে

যথেষ্ট। গতানুগতিক রীতি হইতে স্থরু করিয়া ভবিষ্যপন্থী পর্য্যন্ত সকল প্রকার মালই দেখা গেল। এখন চলিতেছে গ্রীষ্মের বাজার।

"কুন্‌ষ্ট্" নামক সচিত্র শিল্প-পত্রিকার সম্পাদক কির্শেন্‌গ্রাবার ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সংবাদ চাহিতেছেন। এই পত্রিকায় ভারতবর্ষ এখনো প্রচারিত হয় নাই। জার্ম্মাণদের শিল্প-পত্রিকাগুলায় দুনিয়ার সংবাদ ঠাঁই পায়। অধিকন্তু পত্রিকাগুলার সাহায্যে শিল্প-বাজারের শিল্প-কেনাবেচাও সাধিত হয়।

সমর-বিভাগের "মায়োর" বা মেজর পদস্থ সেনাপতি কিছুকাল "বেকার" ছিলেন। সম্প্রতি ইনি ব্যাভেরিয়ার "কুনষ্ট্-গেভের্বে-ফারাইন" অর্থাৎ স্থকুমার-শিল্প-ব্যবসা-পরিষদের সম্পাদক হইয়াছেন। পরিষৎটা পঁচাত্তর বৎসরের পুরাণা প্রতিষ্ঠান।

ইঁহাদের বাজারে দেখিলাম চীনামাটীর বাসন-কোসন, খাট, টেবিল, ছেলেদের খেলনা, মেয়েদের গহনা, বাবুদের ছড়ি, বাগ-বাগিচার আসবাব ইত্যাদি। আর ছবি-ছাপা, মর্ম্মর মূর্ত্তি, কাঠের ফ্রেম কিছুই বাদ পড়ে নাই। "স্থকুমার শিল্প" শব্দটা ফ্রান্সে-জার্ম্মাণিতে অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেখানেই রূপ-সৃষ্টি আর রংয়ের খেলা সেইখানেই স্থকুমার শিল্প। ছুতার, মিস্ত্রী, কামার, কুমার, স্যাকরা, চিত্রকর, ভাস্কর সকলেই এ সকল দেশে "স্রষ্টা", "রূপদক্ষ" বা শিল্পী। আটপৌরে জীবনে এই কারণেই সৌন্দর্য্য, সৌষ্ঠব, সৌকুমার্য্য ইত্যাদির ছায়া পড়িতে পায়।

সুন্দরীর হাট

"রেসিডেন্‌ৎস" বা রাজবাড়ীতে ভিটেলবাখ বংশের বাস্তুভিটা দেখা গেল। ইয়োরামেরিকার লোকেরা আগ্রা-দিল্লী দেখিয়া-না-দেখিয়া "প্রাচ্যের বিলাস" প্রচার করিতে অভ্যস্ত। যে সকল প্রাচ্যের নরনারী

ভার্সাই, পট্‌সডাম, ড্রেসডেন, ভিয়েনা ইত্যাদি শহরের প্রাসাদ দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, এই হিসাবে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে কোন দিনই প্রভেদ নাই। হীরা-জহরৎ, সোণায় মোড়া দেওয়াল, সোণার খাট আর সোণার চেয়ার রাজা-রাজড়া মাত্রেরই "সামান্য ধর্ম্ম"।

ভিট্টেলবাখ বংশের বাদশামহাল আর বেগমমহাল দেখিয়া সেই "সামান্য ধর্ম্মের"ই আর একটা পরিচয় পাওয়া গেল মাত্র। এই প্রাসাদের দেওয়ালে-দেওয়ালে যে সকল "গোব্‌লাঁ" ঝুলিতেছে সেই সব বোধ হয় মিউনিকের একটা "সেকেলে" অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বিশেষত্ব। আজকাল না কি এই ধরণের গালিচা বা সুজনী ব্যাভেরিয়ায় তৈয়ারী হয় না। দেখিলে চোখ জুড়ায়। বুননগুলা যারপরনাই উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকৌশলের সাক্ষী।

রেসিডেন্‌ৎসের দেওয়ালে ও ছাদে চিত্রাবলী আছে দস্তুরমতন। রাজারা দেশ-বিদেশ হইতে যে সকল ছবি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সবও কোনো ঘরে মজুত দেখিতেছি। পর্য্যটক মাত্রেই একটা ঘরে ভিড় করিয়া জটলা করিতেছে। সকলের মুখেই শুনিতেছি,— "বাঃ! খুবসুরত! ওন্দা" ইত্যাদি।

ঘরটায় রক্ষিত হইতেছে জোসেফ ষ্টীলার প্রণীত "শ্যেন্‌হাইট্‌স্‌-গালারী" অর্থাৎ "সুন্দরীর হাট।" ষ্টীলার ছিলেন রাজশিল্পী। রাজার নজরে কোনো রূপসী পড়িবামাত্র শিল্পীর ডাক পড়িত। তৎক্ষণাৎ রূপসী চিত্রে দেখা দিতেন। রাজকুমারী হইতে রাস্তার ভিখারী পর্য্যন্ত কেহই এই হাটে বাদ পড়ে নাই। গোটা পঞ্চাশেক মূর্ত্তি দেখিতেছি। ষ্টীলার গ্যেটের আমলের লোক। গ্যেটের ছবি ষ্টীলারের এক প্রসিদ্ধ কাজ। সে যুগের রুশ বাদশাও ষ্টীলারের হাতে রূপ পাইয়াছিলেন। ষ্টীলারের আঁকা ছবি পট্‌সডামের "সাঁসুসি" প্রাসাদে দেখিয়াছি। মিউনিকের "নয়ে পিনাকোটেক" মিউজিয়ামেও দেখিতে পাওয়া যায়।

শিক্ষাবীর কের্শেনষ্টাইনার

বুড়া কের্শেনষ্টাইনারের যৌবন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। জুলাই মাসে (১৯২৪) সত্তর পার হইয়াছেন। এই উপলক্ষে সরকারের তরফ হইতে এবং জন-সাধারণের তরফ হইতেও মহা সমারোহের সহিত সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতের শিক্ষা-জগতে কের্শেনষ্টাইনার পরিচিত কি না বলিতে পারি না। আমেরিকায় থাকিবার সময়েই কের্শেনষ্টাইনারের নাম শুনিয়াছি। ১৯১৪।১৫ সনে ইঁহার দুই একখানা বইয়ের ইংরেজি তর্জ্জমা প্রকাশিত হয়। "শিক্ষাবিজ্ঞানের" সাহিত্যে ষ্টানলি হল এবং জন ডুয়ী ইত্যাদির যে স্থান, কের্শেনষ্টাইনারেরও সেই স্থান।

কের্শেনষ্টাইনারের একটা বিশেষত্ব আছে। সেইদিকে ভারতবাসীর নজর পড়া আবশ্যক। জার্ম্মাণিতে "বেরুফস্‌শুলে" অর্থাৎ ব্যবসা-বিদ্যাপীঠ এবং "ফোর্ট-বিল্ডুংস্-শুলে" অথবা "কন্‌টিনুয়েশন"-পাঠশালা নামক কতকগুলা ইস্কুল আছে। সেই সকল ইস্কুলে মজুরেরা নিজ-নিজ ব্যবসায়ে অবৈতনিক শিক্ষা পায়। অন্ততঃ পক্ষে আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক মজুর শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য। গবর্মেণ্টের অধীনে, না হয় শিল্প-কারখানার অধীনে ইস্কুলগুলা চলিয়া থাকে।

মনে রাখিতে হইবে যে,—চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক বালিকাই সরকারী অবৈতনিক ফোল্‌কস্‌শুলে বা প্রাথমিক পাঠশালায় ভারতীয় ম্যাট্রিকুলেশন বিদ্যার অধিকারী হইতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ কোনো মজুরের বিদ্যাই ম্যাট্রিকুলেশনের কম নয়। তাহার পর কাজে ঢুকিয়াও মজুরেরা আরও চার বৎসর নিজ নিজ শিল্পে বা ব্যবসায়ে বিদ্যা বাড়াইবার সুযোগ পায়।

এই ধরণের বিদ্যা বাড়াইবার সুযোগ সৃষ্টি করাই কের্শেনষ্টাইনারের

আসল কীর্ত্তি। ১৯০০ সালের পূর্ব্বে মিউনিকে কন্‌টিনুয়েশন-পাঠশালা একটাও ছিল না। কের্শেনষ্টাইনার একটা-একটা করিয়া ৪৬টা ইস্কুল কায়েম করিয়াছেন। কোনো ইস্কুলে জুতা তৈয়ারী করা শিখানো হয়, কোনো ইস্কুলে ঘড়ির কাজ শিখানো হয়। ছাপাখানার কাজ, বই বাঁধাইয়ের কাজ, ঘোড়ার লাগাম তৈয়ারি করা, দর্জ্জিগিরি করা, গাড়ী প্রস্তত করা, বাগানের মালীর কাজ, পিঠাপুলি প্রস্তুত করা, হোটেল চালানো, ফুলের দোকান চালানো, কাঠের খোদাই, তড়িতের যন্ত্রপাতি চালানো ইত্যাদি প্রত্যেক শিল্প ও ব্যবসার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিদ্যাপীঠ আছে। মিউনিকের সকল বেরুফস্-গুলেতে প্রায় পনর হাজার ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী—মজুরি করিবার ফাঁকে ফাঁকে—বিনা পয়সায় বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছে। কের্শেনষ্টাইনারের নাম জানে না রাস্তায় ঘাটে এমন কোনো লোক নাই। কের্শেনষ্টাইনারকে জার্ম্মাণ সমাজের অন্যান্য অঞ্চলেও একজন "পথ-প্রদর্শক"রূপে পূজা করা হইয়া থাকে।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে থাকিবার সময় কের্শেনষ্টাইনারের কেতাব ফরাসী ভাষায় দেখিয়াছি। জেনেভার "আঁ্যাস্তিতিউ জাঁ-জাক রুসো" নামক শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ভিতর এই জার্ম্মাণ (ব্যাভেরিয়াণ) শিক্ষাবীরের পরিচয় পাওয়া যায়।

কের্শেনষ্টাইনারের পত্নী বলিলেন,—"আমি সেই আঁ্যাস্তিতিউর পরিচালক ডক্টর ক্লাপারেদের ছাত্রী ছিলাম।" মহিলা মার্কিণ দার্শনিক জেম্‌সের চিত্ত-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ জার্ম্মাণ ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। জার্ম্মাণির জ্ঞানমণ্ডলে মোসাফিরি করিতে করিতে লক্ষ্য করিয়াছি যে, অধ্যাপকদের পত্নীরা কেহ-কেহ বিদুষী এবং গ্রন্থকর্ত্রী।

মহিলা গিন্নীগিরির কাজে ঢিল দিতে অভ্যস্ত নন দেখিলাম। ঝী আছে বটে, কিন্তু ঘরকন্নার সকল দিকেই নজর ইঁহার তীক্ষ্ণ। দু একবার যাওয়া-আসা করিতে-করিতে কুটুম্বিতা বাড়িয়া গেল।

কের্শেনষ্টাইনারের পত্নী বলিলেন,—"এস তোমাদিগকে আমাদের ঘরগুলা দেখাই। এই যে 'ষ্টুবে' বা বৈঠকখানাটার আসবাব দেখিতেছ, সবই টিরোলী ঢঙের জিনিষ। শোবার ঘরের খাট, টেবিল, সাজসজ্জাও সবই আমরা টিরোল হইতে আনাইয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে বাড়ীটা যখন তৈয়ারী করানো হয়, তখন আমার স্বামী টিরোলী বাস্ত-রীতির ভিতর-বাহির মনে রাখিয়া এঞ্জিনিয়ারকে কাজে নামাইয়াছিলেন।"

পেৎসোল্ডের ভাস্কর্য্য

স্থপতি পেৎসোল্ডের "আটেলিয়ে" বা কর্ম্মশালায় গতিবিধি চলিতেছে। কাঠে, কাচে, পোর্সলেনে, পাথরে নানাপ্রকার পদার্থেই শিল্পীর রূপদক্ষতা বিরাজ করিতেছে।

এক ব্যক্তির বসতবাড়ী তৈয়ারি হইতেছে। সম্মুখের দেওয়ালে মান্ধাতার আমলের "নিবেলুঙ"-বীরদের কাহিনী খোদাই করানো তাঁহার সাধ। সেই ফরমায়েস পাইয়া পেৎসোল্ড কাদামাটি দিয়া মূর্ত্তি গড়িতে লাগিয়া গিয়াছেন। এই ধরণের বহু "সেকেলে" কাহিনী পেৎসোল্ডের হাতে প্রথম মূর্ত্তি পাইয়াছে। রূপের বাজারে পেৎসোল্ড "ক্লাসিক" অর্থাৎ গ্রীক-রোমাণ রীতির প্রতিনিধি। ইহার সঙ্গে দু এক মহিলা সাগরেত পোর্সলেনের কাজে বাহাল আছে। পেৎসোল্ডের বাল্যবন্ধু ড্যিল আজীবন সহশিল্পী রহিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক মূর্ত্তিটাই একসঙ্গে দুইজনের হাতের কাজ।

পেৎসোল্ড বলিলেন,—"যতদিন আমরা অবিবাহিত ছিলাম, তত দিন আমরা এক বাড়ীতে বসবাস করিয়াছি। বিবাহের পর এক বাড়ীতে দুই পরিবারের স্থানাভাব। কাজেই বসবাস এখন আলাদা। কিন্তু কাজকর্ম্ম সবই যৌথ।"

"এংলশির গার্টেন" বা বিলাতী বাগিচা হইতে প্রিন্‌ৎসরেগেন্টেন, ষ্ট্রাসেতে আসিলে প্রথমেই পড়ে নাট্‌সিওনাল মুজেয়ুম। এইখানে ইজারের উপর এক সুন্দর সাঁকো। অপর পাড়টা কথঞ্চিৎ উঁচু,—পাহাড় সদৃশ। তাহার উপর এক বিজয়-স্তম্ভ শোভিতেছে। মাক্‌স্‌মিলিয়ান-বাগিচার এই বাস্তু-সম্পদ যে কোনো মিউনিক-পর্য্যটকের চিত্ত আকৃষ্ট করিবে। এই স্তম্ভ পেৎসোল্ড এবং ডিয়েলের গড়া।

পেৎসোল্ড বলিলেন,—"১৮৭১ সালের শান্তিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ১৮৯৫ সালে মিউনিক শহরের কর্ত্তারা শিল্পী মহলে ফরমায়েস পাঠাইয়াছিল। তখন আমরা সবেমাত্র আকাডেমী বা শিল্পবিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছি। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন নামজাদা বাস্তুশিল্পীর মোসাবিদা নগর-শাসকদের হস্তগত হয়। আমরাও একটা খসড়া পাঠাইয়াছিলাম। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরাই জয়ী হই। তিন বৎসর দিনরাত খাটিয়া ফ্রীডেন্‌স-ডেঙ্কমাল বা শান্তি-স্তম্ভ তৈয়ারি করিয়াছি। এইটাই আমাদের প্রথম কাজ। তাহার পর হইতে আমাদের কাজ নানা সরকারী ও সার্ব্বজনিক ফরমায়েস অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।'

যৌবনে নামজাদা হওয়া সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সতীর্থ সুহৃদ্‌গণের হিংসার আগুনে জলিয়া-পুড়িয়া মরিতে হয়,—কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে,—কি শিল্পীমহলে কি সুধীমহলে। পেৎসোল্ড বলিতেছেন,—"লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা আমাদের কপালে একপ্রকার খতম হইয়াছে। নিজেরা ঘরে বসিয়া নিজ নিজ ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছি। সামাজিক লেনদেনের হট্টগোলে ভিড়িলে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা যে সময়ে যুবা, হিল্‌ডেব্রাণ্ড সেই

সময়ে বোধ হয় খুব প্রবীণ লোক। তাঁহার সঙ্গে আপনাদের বনিবনাও কিরূপ ছিল ?”

পেৎসোল্ড বলিলেন,—“হিল্‌ডেব্রাণ্ডকে আমরা গুরুস্থানীয় বিবেচনা করিতাম। ঘটনাচক্রে—সৌভাগ্যক্রমে তিনিও আমাদিগকে সুনজরেই দেখিতেন। আমরা যে সময়ে ডেঙ্কমালটার ফরমায়েস পাই, প্রায় সেই সময়েই—১৮৯৫ সালে—হিল্‌ডেব্রাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি মাক্‌স্‌-মিলিয়ানস্‌-প্লাট্‌সে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভিট্টেল্‌সবাখার ব্রুন্নেন নামে যে অপূর্ব্ব জলের ফোআরা দেখিয়াছেন সেইটা হিল্‌ডেব্রাণ্ডের গড়া।”

পথিকেরা রাস্তায় হাঁটিতে-হাঁটিতে ঐ চৌরাস্তায় হাজির হইলে ব্রুন্নেনটার চমৎকার পরিকল্পনা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে বাধ্য। আশে-পাশের আকাশ এবং আবেষ্টনের ইমারতগুলার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এই প্রস্তরশিল্পের বিশেষত্ব। হিল্‌ডেব্রাণ্ডের রূপতত্ত্ব “ডী ফোর্ম” নামক গ্রন্থে প্রচারিত আছে।

চিত্রশিল্পের পঞ্চাশ বৎসর

বাড়ীওয়ালী ফ্রাওয়েন-কির্খে নামক মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—“নয়ে ষ্টাট্‌স্‌-গালারী”তে জার্ম্মাণ চিত্র-শিল্পের বিপুল মেলা বসিয়াছে। এইটা না দেখিয়া মিউনিক ছাড়িয়া গেলে অন্যায় করা হইবে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের জার্ম্মাণ কাজ এইখানে দেখানো হইতেছে। জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন মিউজিয়াম এবং দূরদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ছবিগুলা আনা হইয়াছে।”

দেখা গেল। সংগ্রহ উঁচু দরের বটে। জার্ম্মাণির অন্যান্য নগরেও মনে হইয়াছে,—চিত্রশিল্পের আসরে দুনিয়ার লোক জার্ম্মাণদিগকে সম্মান করিতে শিখে নাই। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্রশিল্পে জার্ম্মাণরা কোনো মতেই অন্য কোনো জাতি হইতে

নিকৃষ্ট জীব নয়। ১৮৭৫—১৯২৪ এই পঞ্চাশ বৎসরের কাজগুলা, দেখিবা মাত্র সেই ধারণাই আবার বদ্ধমূল হইল। বার্লিনের নাট্সিওনাল গালারীতে বর্ত্তমান সংগ্রহের কোনো কোনোটা পূর্ব্বেই কয়েকবার দেখিয়াছি।

ফরাসী শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিব,—ফোন মারে (১৮৩৭—৮৭) জার্ম্মাণির সেজান-স্থানীয়। ইঁহাকে নব্য চিত্রশিল্পের অন্যতম জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। ইঁহার রূপ-রঙ দেখিয়া গতানুগতিকরা মোটের উপর খুসীই হইবেন। তবে "ছোকরারা"ও এই সকল কাজে নবযুগের সুপ্রভাত ঠাওরাইতে ছাড়িবেন না।

এই লাইনের কাজে ফ্রানৎস মার্ক (১৮৮০—১৯১৫) অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছিলেন। ভবিষ্য-পন্থিতার অনেক দাগ মার্কের পশু ও প্রকৃতির গড়নে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণগুলা বেশ মোলায়েম ভাবে মিশানো আছে। কাজেই চরম মতের গতানুগতিকরা ছাড়া অন্যান্য সমঝদারেরা মার্ককে বয়কট করিবে না।

কিন্তু ভবিষ্যপন্থীদের চরমে ঠেকিয়াছেন ফাইনিঙ্গার (১৮৭১—)। এই শিল্পীর রূপ-রঙ বিলকুল "জ্যামিতিক"। প্যারিসের আল্‌বেয়ার গ্লেজ ফাইনিঙ্গারকে জুড়িদার বিবেচনা করিবেন। চরম মতের নবীনেরা আজকাল কোকোশ্‌কা, পেখষ্টাইন, নোল্ডে ইত্যাদিকে পাঁড় বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। যাহারা বোল্‌শেভিক কাণ্ডে ভয় পায় তাহাদের পক্ষে এই সকল উদ্দাম রূপদক্ষতার সম্মুখে না আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে গতানুগতিক রীতিও কম পুষ্টিলাভ করে নাই। সেই রীতির প্রতিনিধিও অনেক দেখিতেছি। আজকাল বার্লিনের আকাডেমীর কর্ত্তা লিবারমান। তাঁহার চিত্রশিল্পের নাম-ডাক আছে। ব্যোক্‌লিন (১৮২৭—১৯০১) এই রীতিরই একজন জার্ম্মাণ "বীর"।

বৎসর কয়েক হইল হান্‌স টোমার (১৮৩৯—১৯২১) মৃত্যু হইয়াছে। টোমাকে লইয়া জার্ম্মাণরা খুব মাতামাতি করিয়া থাকে। পশু-শিল্পী ৎসিগেলকে (১৮৫০—) টিড্‌য়েন দীক্ষাগুরু বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ চিত্রকরদের অনেকেই কোনো কোনো বয়সে মিউনিকে আসিয়া ইজারের ঘাটে জল খাইয়া গিয়াছেন। আজকালকার জার্ম্মাণ শিল্পীরাও মিউনিকের ডাকে সকলেই সাড়া দিয়াছেন। এ মিউনিকের কম গৌরব নয়।

লণ্ডনের সমঝোতা

জার্ম্মাণিতে আজকাল আর দিনে দশবার করিয়া মার্কের দাম কমে না। কাগজের নোট ছাপাছাপি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। নবেম্বর (১৯২৩) হইতে নয় মাস ধরিয়া "পাকা টাকা" জারি আছে। নাম তার "রেণ্টেন মার্ক।" জার্ম্মাণির সকল ব্যাঙ্ক, কারখানা এবং কৃষি-সম্পত্তির মালিকেরা সমবেত হইয়া এই টাকা চালাইবার ভার লইয়াছে। গবর্মেণ্ট দুই বৎসর ধরিয়া দেউলিয়া ভাবে চলিতেছিল। রেণ্টেন-মার্কের মালিকেরা গবর্মেণ্টকে কিছু টাকা ধার দিয়া তাহার ইজ্জৎ বাঁচাইতে সাহায্য করিয়াছে। তবে গবর্মেণ্ট এখন আর নিজ খেয়াল অনুসারে যখন তখন টাকা জারি করিতে অর্থাৎ নোট ছাপিতে অধিকারী নয়। মুদ্রার উপর ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব না থাকা গবর্মেণ্টের পক্ষে অপমানের কথা সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যে বিলাতে মজুর-রাজ কায়েম হইয়াছে। রামজে-ম্যাকডোনাল্ডের সর্দ্দারিতে দুনিয়ায় স্বর্ণযুগ আসে নাই বটে,—কিন্তু বিশ্বসমস্যা যেরূপ জটিল তাহাতে মজুরদলকে নেহাৎ গালাগালি করাও বেয়াকুবি। ফ্রান্সেও পঁয়কারের রাজত্ব নাই। তাহার ঠাঁইয়ে এরিয়ো

মিলিয়া ইয়োরোপকে মেরামত করিবার কাজে ব্রতবদ্ধ হইয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত লণ্ডনে বৈঠক বসিল। বাদানুবাদ চলিতেছে। এরিয়ো সোশ্যালিষ্ট নন।

এই বাদানুবাদে "খানিকটা" যোগ দিবার অধিকার পাইয়াছে জার্ম্মাণিও। জার্ম্মাণিতে ন্যাশন্যালিষ্টরা দলে ফুলিয়া উঠিয়াছে বটে এবং কমিউনিষ্টদের সংখ্যাও অনেক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুই চরম দলের চেয়ে বেশী প্রতাপশালী লোক হইতেছে "সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাটিশে পার্টাই" অর্থাৎ সোশ্যালিষ্ট-পন্থী দল। ইহাদিগকে সহজে রামজে-ম্যাকডোনাল্ড ইত্যাদিরই "দলের লোক" বলা চলে।

জার্ম্মাণেরা লণ্ডনের সমঝৌতাটা হজম করিয়া হইল। রুর-রাইন হইতে বিদেশী পল্টন এখনো সরানো হইবে না। জার্ম্মাণ শিল্প-বাণিজ্যের উপর বিজেতাদের কড়া চৌকি এখনো বজায় থাকিবে। তবে ইহারা সকলে মিলিয়া জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টকে কয়েক কোটি টাকা ধার দিতে রাজি হইয়াছে। সেই টাকা পাইলে গবর্মেণ্ট আবার নিজের তাঁবে মুদ্রা চালাইতে সমর্থ হইবে। তখন রেণ্টেনমার্ক তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে।

ন্যাশন্যালিষ্টরা বলিতেছে:—"এক মুঠা অন্নের জন্য সোশ্যালিষ্টরা আবার বিজেতাদের নিকট স্বদেশকে বিকাইয়া দিল।" লুডেনডোর্ফ এবং হিণ্ডেনবুর্গ যুবার দল ক্ষেপাইবার কাজে মোতায়েন আছেন। ব্যাভেরিয়ায়ও লণ্ডনের সমঝৌতার বিরুদ্ধে লোকমত কম জবর নয়। কিন্তু দেশের "আর্থিক অবস্থা" সম্বন্ধে মাতব্বর লোক ন্যাশন্যালিষ্টরা নয়, কমিউনিষ্টারাও নয়। এই বিভাগের আসল ওস্তাদ ইহুদি এবং ইহুদি-নিয়ন্ত্রিত সোশ্যালিষ্ট দল। তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বহু খৃষ্টান, এবং রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে ন্যাশন্যালিষ্ট-পন্থী শিল্প-পতিরা, সোশ্যালিষ্টদের মতেই

তিন বৎসর পূর্ব্বে (১৯২১) আগষ্ট মাসের শেষে প্যারিস হইতে জার্ম্মাণিতে পৌছিয়াছিলাম। জার্ম্মাণ মুল্লুকের আওতায় পূরা তিন বৎসর কাটিল। ইতিমধ্যে দুইবার অষ্ট্রিয়ায় কাটিয়াছে মাস দেড়েক, উত্তর ইতালিতে দুইবারে মাস দুই এবং সুইটসার্ল্যাণ্ডে ছয় মাস। মোটের উপর ছাব্বিশ-সাতাইশ মাস জার্ম্মাণিতে বসবাস করা হইল। জার্ম্মাণি এত "বড়" দেশ যে এখানে ভারত-সন্তানেরা ছাব্বিশ-সাতাইশ বৎসর কাটাইলেও তাঁহারা প্রতিদিনই স্বদেশের জন্য নতুন নতুন "স্বকার্য্য সাধনে"র ফিকির চুঁড়িয়া পাইবেন (১৯২৪ আগষ্ট)।

সপ্তদশ অধ্যায়*

বার্লিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান

১। সাগর-পরিষৎ

বার্লিনের সাগর-পরিষৎ জার্ম্মাণ পণ্ডিতমহলে এবং ইয়োরামেরিকার বিশেষজ্ঞ-সমাজে অতি পরিচিত প্রতিষ্ঠান। ইহার বয়স মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর। "ইন্‌ষ্টিটুট্ ফ্যির মেরেস্‌কুণ্ডে" অর্থাৎ সমুদ্রতত্ত্ব-বিদ্যাপীঠ নামে ইহার জন্ম। সে ১৯০০ সালের কথা। সমুদ্র সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞান বাড়াইয়া দেওয়া এবং ছড়াইয়া দেওয়ার জন্য এই ইন্‌ষ্টিটিউট কায়েম হইয়াছিল।

তখনকার দিনে এই পরিষদের কর্ত্তা ছিলেন ভূগোলতত্ত্ববিৎ ফোন রিখটোফেন। সমুদ্র-বিজ্ঞানে বিশেষ ওস্তাদ শ্রীযুক্ত ফোন ড্রিগাল্‌স্কি এবং ফোন হালে নামক দুই জন অধ্যাপক দুই বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাঙালীর মাথায় প্রথমেই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে,—সমুদ্র-তত্ত্বের বিভাগ দুইটা কি কি? বার্লিনের কর্ম্মকর্ত্তারা এই ইন্‌ষ্টিটিউটের পরিচালনায় যে কর্ম্ম-বিভাগ চালাইয়াছেন তাহা হইতেই এই সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হইতে পারিবে। তাঁহাদের মতে সমুদ্র-তত্ত্বের এক তরফ হইতেছে ভূগোল সম্বন্ধীয় এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক। অন্য তরফ ঐতিহাসিক এবং নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। সাগরের গণিত, সাগরের তাপ-আলোক ইত্যাদি, সাগরের রসায়ন এবং সাগরের

---

* ১৯২৬-২৭ সনে মাসিক "প্রকৃতি"র জন্য লিখিত (১৯২৫ সনের শেষাশেষি বিদেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর)।

জীবজন্তু এই সব পড়ে ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক বিভাগে। আর ঐতিহাসিক-মানবীয় বিভাগের অন্তর্গত হইতেছে সাগর-শক্তির সদ্ব্যবহার বিষয়ক সকল-কিছু। সাগরে পাড়ি মারা, সাগর-কূলে বসিয়া বিরলে লহরমালা হেরিতে-হেরিতে মাছ পাকড়াও করা, সাগর ডিঙাইয়া তেজারতি করিতে যাওয়া, সাগরের ধনরত্ন লুটিয়া বেড়ানো, সাগরকে বাঁদী করিয়া তাহার সাহায্যে "বিজিগীষু" হওয়া—এই সবই ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ব-বিষয়ক সমুদ্র-বিজ্ঞানের সামিল। বলা বাহুল্য, দিগ্‌বিজয়ই সমুদ্র-শক্তির সামরিক সদ্ব্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্যও শক্তিমান নরনারী সাগরকে কুপোকষা করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত।

বার্লিনের সাগর-পরিষদে আজও এই দুই শ্রেণীর সাগর-সাধনা চলিতেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো ত আছেই। সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা, অনুসন্ধান এবং বিদ্যার সীমানা বাড়াইয়া দিবার প্রয়াসও চলিয়া থাকে। সাগরের নোনা জল জার্ম্মাণদের কপালে বড় বেশী জুটে নাই বটে; কিন্তু সাগর-চর্চ্চায় সময় ও পয়সা খরচ করিতে এ জাত পেছন-পা নয়।

ইন্‌ষ্টিটিউটের কাজের জন্য একটা পরীক্ষা-ভবন আছে। সেখানে সমুদ্র-তত্ত্ববিষয়ক "ঘরোআ" অনুসন্ধান এবং মাপাজোকা চলিয়া থাকে। পরীক্ষা-ভবনের বাহিরে কিন্তু তাহারই আনুষঙ্গিক যন্ত্র-ভবনটা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। যন্ত্রপাতির সংগ্রহের দিকে কর্ম্মকর্ত্তাদের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ।

একদম শুক্‌না খটখটে ডাঙার উপরে সমুদ্র-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন হওয়া সম্ভব কি? মোটেই নয়। কাজেই বার্লিনের লোকেরা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া থাকে। বার্লিন অঞ্চলটার আশেপাশে ছোট বড় মাঝারি অনেক গুলা হ্রদ আছে। হ্রদগুলা সবই নেহাৎ "সাগর-

পুকুরেরই জুড়িদার। যাহা হউক, এই সব হ্রদ-সাগর বা হ্রদ-পুকুরের আবহাওয়ায় জলবায়ুবিজ্ঞানের নানা কথা খোলা প্রাকৃতিক আবেষ্টনে তলাইয়া মজাইয়া বুঝা সম্ভব। তাহা করা হইয়াও থাকে। অধিকন্তু আসল সাগরের কিনারায় গিয়া সাগর-সম্পর্কে মানব-জীবনের তথ্যসমূহ আলোচনা করা হয়। এইরূপ সাগরাভিযান বৎসরে কয়েকবার করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই উপলক্ষে সাগরের বুকে ভাসিবার সুযোগও জুটে। আর গভীরতম সমুদ্রের তত্ত্বকথায়ও হাতে কলমে প্রবেশ লাভ হয়।

গ্রন্থশালার বহর ছোটখাটো নয়। ১৫,০০০ কেতাব আছে তালিকায়। পত্রিকার সংখ্যা ১০০। তাহা ছাড়া ১০,০০০ কার্ড-আকৃতির ছবি আছে।

জার্ম্মাণরা সমুদ্র-চর্চ্চায় অনেক ছাত্রই পায়। বার্লিনের ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রায় চল্লিশ জনের নাম দেখিতে পাই প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক বিভাগে। ঐতিহাসিক-নৃতত্ত্ব বিভাগের দিকেই উৎসাহ বেশী। মাঝে মাঝে গোটা আশী জন ছাত্র এক সঙ্গে এই বিভাগে ভর্ত্তি হয়।

বিজ্ঞান-সেবার প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতেই জার্ম্মাণিতে পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে। এই কেন্দ্র হইতেও বাহির হয় "ফারোফেণ্ট-লিখুঙেন ডেস্ ইন্‌ষ্টিটুটস্ ফ্যির মেরেস্‌কুণ্ডে" (সমুদ্র-তত্ত্ব-পরিষদের রচনাবলী)। এই সকল রচনা দুই পর্য্যায়ে প্রকাশিত হয়। ইন্‌ষ্টিটিউটের দুই বিভিন্ন বিভাগ অনুসারে পর্য্যায় দুইটার রচনাবলী বিভিন্ন।

আজকালকার দিনে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই উচ্চতম জ্ঞানবিজ্ঞান জন-সাধারণের ভিতর ছড়াইবার দস্তুর দেখা যায়। এই সাগর-পরিষদের তত্ত্বাবধানেও সমুদ্র-তত্ত্ব সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় সার্ব্বজনিক বক্তৃতার সাহায্যে "রাস্তার লোকের" কানে গিয়া পৌঁছিতে পায়।

তাহা ছাড়া, ইস্কুল-কলেজে নাম-লেখানো নাই এমন লোকজনকে সমুদ্র-বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট অংশ পূরাপূরি শিখাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। জনসাধারণের জন্য প্রস্তুত বক্তৃতাসমূহ স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে প্রকাশিত করা হইয়া থাকে। "মেরেস্‌কুণ্ডে" বা সমুদ্র-তত্ত্ব নামে এই গ্রন্থ পরিচিত। প্রত্যেক খণ্ডে দশটা করিয়া বক্তৃতা থাকে।

সমুদ্র-তত্ত্বের "মুজেয়ুম" বা সংগ্রহালয় ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্তর্গত একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। চার বিভিন্ন শাখায় এই মুজেয়ুমের প্রদর্শিত বস্তুগুলা সংগৃহীত হয়। প্রথম শাখার বস্তুগুলা আসে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সরকারী নৌবিভাগের সংগ্রহ হইতে। দ্বিতীয় শাখা ঐতিহাসিক-নৃতত্ত্ব বিষয়ক। সমুদ্র-তত্ত্বের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বস্তু তৃতীয় শাখায় প্রদর্শিত হয়। চতুর্থ শাখায় দেখা যায় সামুদ্রিক জীবজন্তু। সাগরের মাছ, মাছ ধরার সরঞ্জাম ইত্যাদি সম্পর্কিত বস্তুসমূহ এই শাখার সামিল।

রিখ্‌টোফেনের মৃত্যুর পর পেঙ্ক্‌ এবং ম্যাৎর্স্‌ সমুদ্রবিজ্ঞানে বার্লিনের নামজাদা অধ্যাপক। বর্ত্তমানে একমাত্র পেঙ্ক জীবিত আছেন। ভূগোলবিদ্যার আসরেই পেঙ্কের নামডাক খুব বেশী।

ম্যাপ আঁকা ভৌগোলিক কারবারে এক বড় কাজ। এই ইন্‌ষ্টিটিউটে তাহার বাবস্থাও আছে। এই জন্য একজন স্থায়ী "কার্টোগ্রাফ" অধ্যাপকদের সঙ্গে কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

২। ভূগোল-পরিষৎ

"সেকালে" বার্লিনে ভূগোলবিদ্যা-চর্চ্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। তাহাতে রাখা হইত কতকগুলা ভৌগোলিক কেতাব এবং মানচিত্র। এই সমুদয়ের সংগ্রাহক ছিলেন কীপার্ট। প্রতিষ্ঠানটাকে বলা হইত "গেওগ্রাফিশার আপ্‌পারাট" (ভৌগোলিক যন্ত্রপাতি)।

১৮৬৬ সনে ফার্ডিনাণ্ড্ ফোন রিখ্‌ঠোফেনকে অধ্যাপক বাহাল করা হয়। তখন কীপার্টের যন্ত্রপাতি নেহাৎ 'সেকেলে' বিবেচিত হইতে থাকে। একটা নয়া প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আয়োজন স্থরু হয়। নতুন-নতুন বই, ছবি, যন্ত্র, মানচিত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি পড়ে। "গেওগ্রাফিশেস্ ইন্‌ষ্টিটুট" (ভূগোল প্রতিষ্ঠান) নামে এই সংগ্রহালয় বিবৃত হইতে থাকে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের সাগরতত্ত্ব-সংগ্রহালয় (মুজেয়ুম ফ্যির মেরেসকুণ্ডে) নামক একটা স্বতন্ত্র বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারই সংশ্রবে ভূগোল-প্রতিষ্ঠানকে আনিয়া এক সঙ্গে দুই বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের বন্দোবস্ত হইতে থাকে (১৯০২)। আজও একই সৌধে এই দুই সংগ্রহালয় এবং "ইন্‌ষ্টিটুট" দেখিতে পাই।

ভূগোল-প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মামুলি লেখা-পড়া চালাইবার সুযোগ পায়,—বলাই বাহুল্য। তবে এই ইন্‌ষ্টিটুটের কতকগুলা স্বতন্ত্র কার্য্যতালিকা আছে। প্রথমতঃ, মানচিত্র আঁকিবার বিদ্যা এখানে হাতে-কলমে শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয়তঃ, ভৌগোলিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখানো হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, নদনদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-উপবন,—ইত্যাদি ভূগোল-সংক্রান্ত জলস্থল-নভোমণ্ডলের জরীপ করাও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়।

ভারতবর্ষের কোনো ইস্কুল-কলেজে এই তিন বিদ্যার কোনোটা শিখানো হয় কি না জানি না।

অধিকন্তু এই ইন্‌ষ্টিটুট ভৌগোলিক পর্য্যটনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পর্য্যটনের সাহায্যে নবীন ছাত্রেরা ভূগোলবিদ্যার অ, আ, ক, খ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। আর যাহারা ভূগোলবিদ্যায় পাকিয়া উঠিয়াছে তাহাদের জন্যও পর্য্যটন কায়েম করা হয়। তাহারা

এই উপায়ে ভৌগোলিক তর্ক-প্রশ্ন অথবা সমস্যামূলক তথ্যগুলা স্বাধীন-ভাবে আলোচনা করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

তাহা ছাড়া, উচ্চ অঙ্গের গবেষণা এবং অনুসন্ধানের ব্যবস্থাও আছে। যে সকল বিজ্ঞানসেবী ভূগোলবিদ্যার সীমানা বাড়াইয়া দিবার কাজে মোতয়েন আছেন তাঁহাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া ইন্‌ষ্টিটুটের অন্যতম ধান্ধা।

জার্ম্মাণির প্রত্যেক বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই এক একটা "কোল্লো-কিয়ুম" অর্থাৎ "বাক-বিতণ্ডা" বা সম্মেলনের আয়োজন আছে। পদার্থবিদ্যার পণ্ডিত বাগ্‌নুস্ এই সম্মেলন-প্রথার প্রবর্ত্তক। তাঁহার দেখাদেখি রিখ্‌ঠোফেনও নিজ বিদ্যার জন্য কোল্লোকিয়ুমের ব্যবস্থা করেন। এইরূপ "ভৌগোলিক বাক্-বিতণ্ডার"র কোনো কোনো আয়োজনে সুইডেনের তিব্বত-পর্য্যটক পণ্ডিত স্বেন হেডিন যোগদান করিয়া গিয়াছেন।

১৯০৬ সনে আল্‌ব্রেষ্ট্ পেঙ্ক্ ভূগোল-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বাহাল হন। তিনি প্রথমে কিছুকাল অধ্যাপক গ্রুণ্ডের সঙ্গে, পরে অধ্যাপক ব্রাউনের সঙ্গে কোল্লোকিয়ুমের পরিচালনা করেন। ভারতবর্ষে এই সকল ভূগোলাধ্যাপকদের নাম বোধ হয় জানা নাই। কিন্তু জার্ম্মাণ পণ্ডিত মহলে ইঁহাদের গবেষণা সুবিদিত।

১৯০৮-৯ সনে অধ্যাপক, পেঙ্ক আমেরিকায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া যান। তাঁহার পরিবর্ত্তে আমেরিকা হইতে "বিনিময়-অধ্যাপক" আসেন ডেভিস। কোল্লোকিয়ুম পরিচালনার ভার ডেভিসের হাতে পড়ে।

কয়েক বৎসর হইল ইন্‌ষ্টিটুটের একটা নতুন শাখা খোলা হইয়াছে। উপনিবেশ এবং "সাগরের ওপার" (য়্যিবার-জে) সম্বন্ধে সকল প্রকার ভৌগোলিক তথ্য ও তত্ত্ব এই বিভাগের অন্তর্গত। অধ্যাপক ফ্রিট্‌স্ য়েগার এই এলাকার কর্ত্তা।

আজকাল ইন্‌ষ্টিটুটের গ্রন্থশালায় ২০,০০০ বিভিন্ন কেতাব আছে। মানচিত্র গুণতিতে হইবে ৪০,০০০। তাহা ছাড়া ১৪৫টা সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিত রূপে আসিয়া থাকে।

গড়-পড়তা ১০০ জন ছাত্রছাত্রী প্রত্যেক "সেমেষ্টারে" (বর্ষার্দ্ধে) অর্থাৎ অধ্যয়ন-ঋতুতে ইন্‌ষ্টিটুটে যাতায়াত করিতে অভ্যস্ত।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতন ভূগোল-প্রতিষ্ঠানও পত্রিকা বাহির করিয়া থাকে। নাম তাহার "গেওগ্রাফিশে আবহাণ্ড্‌লুঙেন" (ভৌগোলিক প্রবন্ধাবলী)।

এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসাবে বার্লিনের "গেজেলশাফ্‌ট্‌ ফ্যির অ্যার্ডকুণ্ডে" (পৃথিবী-তত্ত্ব-সমিতি) উল্লেখযোগ্য।

৩। জলবায়ুতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠান

প্রুশিয়া রাজ্যের "ষ্টাটিষ্টিশেস্‌ ব্যিরো" (তথ্যতালিকা বিষয়ক কর্ম্মকেন্দ্র) অনেক দিনকার পুরাণা প্রতিষ্ঠান। ১৮৪৭ সনে দেশের জলবায়ু জরীপ করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের এক শাখা কায়েম করা হয়। নাম তাহার "মেটেওরোলোগিশেস্‌ ইন্‌ষ্টিটুট"। ১৮৪৮ সনে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যাধ্যাপক্‌ ডোফে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ সন পর্য্যন্ত ইনিই কর্ত্তা থাকেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানটা ফোন্‌ বেৎসোল্‌ডের হাতে আসে। ১৮৮৫ সনে আবহাওয়া-তত্ত্ব বা জলবায়ু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। এই পদে বেৎসোল্‌ড বাহাল হন। সঙ্গে সঙ্গে মেটেওরোলোগিশেস্‌ ইন্‌ষ্টিটুটের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবিড়তর যোগাযোগ কায়েম হয়।

১৯০৭ সনে হেল্‌মান এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হন। ১৯২২ সন হইতে অধ্যাপক ফোন ফিকারের তত্ত্বাবধানে ইনষ্টিটুট পরিচালিত

প্রুশিয়ার এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা উত্তর-জার্ম্মাণির আবহাওয়া ও ধরাতল-সংক্রান্ত চুম্বক গুণাগুণ পর্য্যবেক্ষণ করা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কাজের সংস্পৃষ্ট সকল প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা করাও ইহার উদ্দেশ্য-তালিকার অন্তর্গত।

বার্লিনের নিকটবর্ত্তী পট্‌স্‌ডাম নগরে এক বিপুল "ওবজার্ভাটোরিয়ুম" (পর্য্যবেক্ষণালয়) ইন্‌ষ্টিটুটের সম্পত্তি। এইখানে জলবায়ু এবং ধরা-চুম্বক সম্বন্ধে সকল প্রকার তথ্য সংগৃহীত হয়। শ্নেকোপ্পে (৪,৮০৯ ফিট) এবং ব্রোকেন (৩,৪২৬ ফিট) নামক পাহাড়ের ডগায় মাঝারি গোছের তুইটা পর্য্যবেক্ষণ-ভবন রক্ষিত হইতেছে। তাহা ছাড়া দেশের নানাস্থানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ১৬৪টা পর্য্যবেক্ষণ-কেন্দ্র (ষ্টাট্‌সিয়োন) আছে। প্রায় ২,৩০০ কেন্দ্রে বৃষ্টি মাপিবার কল রাখা হইয়াছে। আর ১,১৫০ জায়গায় ঝড়-তুফানের "ষ্টাট্‌সিয়োন" রহিয়াছে।

এই সকল বিভিন্ন "ষ্টাট্‌সিয়োন" হইতে সঙ্কলিত তথ্যগুলা ইন্‌ষ্টিটুটের তিন বিভাগে একত্র করা হয়। সকলগুলার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রচারের ভার ইন্‌ষ্টিটুটেরই হাতে।

অপর দিকে পট্‌স্‌ডামের পর্য্যবেক্ষণালয় দৈনন্দিন মামুলি তথ্য সংগ্রহ ছাড়া উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য গঠিত। এই বিদ্যায় যে সকল যন্ত্রপাতি লাগে তাহার উন্নতি বিধান করা এই ওব্‌জার্ভাটোরিয়ুমের অন্যতম লক্ষ্য। তাহা ছাড়া জলবায়ু-বিজ্ঞান, পৃথিবীর চুম্বক-তত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যার আলোচনাপ্রণালী সম্বন্ধেও নতুন-কিছু আবিষ্কার করিবার দিকে এই প্রতিষ্ঠানের ধান্ধা আছে।

১৯২৪ সনে ইন্‌ষ্টিটুটের চতুর্থ বিভাগ কায়েম হইয়াছে। এই

ইন্‌ষ্টিটুটের সকল প্রকার তথ্য, তত্ত্ব, গবেষণা, অনুসন্ধান, আবিষ্কার, এবং ভবিষ্যদ্ বাণী প্রকাশিত করিবার জন্য পত্রিকা আছে।

কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৫৫।

এক এক সেমেষ্টারে বা "বর্ষার্দ্ধে" (অধ্যয়ন-ঋতুতে) ছাত্র আসে সাধারণতঃ ৭ জন হইতে ১৫ জন।

ইন্‌ষ্টিটুটের গ্রন্থশালায় আছে ৩৪,০০০ কেতাব এবং ১০০ খানা পত্রিকা। স্বকীয় পত্রিকার বিনিময়ে এই পত্রিকাগুলা পাওয়া যায়।

৪। ধাতুরত্ন-পরিষৎ

১৭৮৯ সনে রাজপ্রাসাদে "রত্নসংগ্রহ" সুরু হয়। ১৮১০ সনে এইটার নাম দেওয়া হয় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আকর-তত্ত্বসংগ্রহ-ভবন (মিনারালোগিশেস্ মুজেয়ুম)। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধে সংগৃহীত বস্তুগুলা স্থানান্তরিত করা হয়।

এই মুজেয়ুমের প্রথম পরিচালক ছিলেন শ্রীযুক্ত ভাইস। তাঁহার সঙ্গে যে সকল আকর-তত্ত্ববিৎ খনিজবিদ্যার অনুসন্ধান চালাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাম্মেল্‌স্‌ব্যর্গ, রোজে, বায়রিখ, ভেব্‌স্কি ইত্যাদি পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য। ভাইসের মৃত্যুর পর (১৮৫৫) রোজে হন বড় কর্ত্তা। রোজের মৃত্যু হয় ১৮৭৪ সনে। এই সময়ে মুজেয়ুমকে তিন স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করা হয়। এক এক জন পণ্ডিতের তাঁবে এক একটা বিভাগ পরিচালিত হইতে থাকে। সর্ব্বময় কর্ত্তা বাহাল হন বায়রিখ।

তখনও সাধারণ ভূতত্ত্ব হইতে আকর-তত্ত্বের বিয়োগ ঘটে নাই। এক সংগ্রহালয়েই দুই ধরণের বস্তু সংগৃহীত হইত। কিন্তু ছাড়াছাড়ি ঘটে ১৮৮৮ সনে। অর্থাৎ ঐ বৎসর আকর-তত্ত্ব স্বরাজ লাভ করে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধ হইতে আকর-তত্ত্ব-সংগ্রহকে সরাইয়া

লইয়া যাওয়া হয়। সহরের অন্য এক পাড়ায় স্বতন্ত্র সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সৌধই আজকালকার "মিনারালোগিশেস্ মুজেয়ুম"। মুজেয়ুমের সঙ্গে সঙ্গে "ইন্‌ষ্টিটুট" (শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান)ও কায়েম হইয়াছে। এই নবীন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা হন অধ্যাপক ক্লাইন। তিনি পূর্ব্বে ছিলেন গ্যেটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মুজেয়ুম-ভবনের নীচের তলায় সংগৃহীত বস্তুগুলা জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে। লোকেরা গিয়া ভিড় করে একটা সংগ্রহের সম্মুখে। ১৮০৩ সনে রুশিয়ার বাদশা প্রথম আলেকজাণ্ডার প্রুশিয়ার রাজাকে কতকগুলা রুশ মণিমুক্তা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। এই সব ঐ সংগ্রহের অন্তর্গত। তাহা ছাড়া ভাইস, রোজে ইত্যাদি পণ্ডিতগণ সেকালে নিজ নিজ পর্য্যটন এবং অনুসন্ধানের ফলে যে সকল দ্রব্য ঘরে লইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন সেই সবও লোকের দৃষ্টি টানিয়া লয়। মুজেয়ুমের কর্ম্মকর্ত্তারা এই সব সংগ্রহকে যার পর নাই মূল্যবান বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

বিগত বিশ-ত্রিশ বৎসরের ভিতর রুম্প্ ফ্, কোন য়ানসোন ইত্যাদি আকর-তত্ত্ববিদ্‌গণ নানা বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে অসংখ্য মাল আসিয়াছে। অধিকন্তু জার্ম্মাণির পটাশ-খনির স্তর-বিন্যাস এবং তাহার বিচিত্র রূপ-সম্পদ বুঝিবার পক্ষে সহায়ক নানা দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য,—এই হরেক রকম "মণি-মুক্তা"র রাশি এবং "ইট-পাট্‌কেল-পাথরের" ছড়াছড়ি গুলা বিজ্ঞান-সেবীদের পক্ষে গবেষণা, পরীক্ষা এবং "রিসার্চ্চ" ইত্যাদি কর্ম্মের সরঞ্জাম বিশেষ।

এই গেল মুজেয়ুমের বৃত্তান্ত। ইনষ্টিটুট বিভাগ হইতেছে বিদ্যাপীঠ। এইখানে পঠন-পাঠন হয়। কাজেই বক্তৃতা-গৃহ আছে,

জন্য কতকগুলা স্বতন্ত্র সংগ্রহ আছে। গড়ন-বিজ্ঞান বা রূপ-তত্ত্ব এবং, পদার্থবিন্যাসংক্রান্ত ও রাসায়নিক দ্রব্যগুণ আলোচনা করিবার পক্ষে এই সকল সংগ্রহে সাহায্য পাওয়া যায়। "ধাতুরত্বে"র "কুলশীল" বুঝাইবার জন্য নানা প্রকার সংগ্রহ আছে। এই সমুদয়ের আকৃতি-ভেদ, গঠন-প্রণালী এবং রূপান্তর-গ্রহণ ইত্যাদি তথ্যের ব্যাখ্যানুরূপ সংগ্রহও দেখিতে পাওয়া যায়।

"ক্রিষ্ট্যাল" বা দানা বাঁধিবার ধরণ-ধারণ পরীক্ষা করিবার জন্য স্বতন্ত্র কামরা আছে। পাথরের ভিতর-বাহির এবং গঠন-গড়ন সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয় কতকগুলা ঘরে। আকর-তত্ত্ব এবং প্রস্তর-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে নানা প্রকার ফটো-চিত্র গ্রহণ করিতে হয়; তাহার জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। অধিকন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক রাসায়নিক কাজকর্ম্মের জন্য ঘর ত বাঁধা আছেই। লাইব্রেরিতে আছে হাজার তিনেক বই, আর দশখানা বিজ্ঞান-পত্রিকা। প্রত্যেক "সেমেষ্টার" (বর্ষার্দ্ধ) বা অধ্যয়ন-ঋতুতে সাধারণতঃ ২৫।৩০ জন ছাত্র এই ইন্‌ষ্টিটুটে লেখা-পড়া করিয়া থাকে। আলোচ্য বিষয় তিন স্বতন্ত্র বিদ্যার অন্তর্গত :—(১) মিনারালোগী (আকর-তত্ত্ব), (২) ক্রিষ্টালোগ্রাফী (দানা-তত্ত্ব), (৩) পেট্রোগ্রাফী (প্রস্তর-তত্ত্ব)। বিদ্যাগুলার জার্ম্মাণ নাম আর ইংরেজি নাম ঘটনাচক্রে একরূপ।

১৯২১ সন পর্য্যন্ত অধ্যাপক লীবিশ ছিলেন মুজেয়ুম এবং ইন্‌ষ্টিটুটের ডিরেক্টর। আজকাল বড় কর্ত্তা অধ্যাপক য়ানসোন।

৫। ভূতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠান

১৮৮৮ সন পর্য্যন্ত আকরতত্ত্ব-সংগ্রহালয়ের সঙ্গে সাধারণ ভূতত্ত্ব বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গাঁথা ছিল। ঐ বৎসর "গেওলোগিশ-পাল্যেওণ্টোলোগিশেস্ ইন্‌ষ্টিটুট উণ্ড মুজেয়ুম" (ভূ-জীবাশ্ম-তত্ত্বের বিদ্যাপীঠ ও

সংগ্রহালয়) "মিনারালোগিশ-পেট্রোগাফিশেস্ ইন্‌ষ্টিটুট" (ধাতুরত্ন-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠান) এর আওতা হইতে স্বতন্ত্রতা লাভ করে। ভূ-জীবাশ্ম প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বাহাল হন বায়রিথ। ১৮৯৯ সনে অধ্যাপক ব্রাঙ্কা ইন্‌ষ্টিটুটের কর্ত্তা হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভূতত্ত্ব এবং জীবাশ্ম-তত্ত্ব বিষয়ক বস্তুসংগ্রহকে জনসাধারণের দর্শনযোগ্য অবস্থায় আনিয়া খাড়া করেন।

মুজেয়ুমের এক বিভাগে এই প্রদর্শনী রক্ষিত হইতেছে। অন্য এক বিভাগে "পাল্যেওণ্টোলোগী" বা জীবনের প্রত্ন-তত্ত্ব (প্রত্ন-জীবতত্ত্ব) বা জীবাশ্ম-তত্ত্ব বিষয়ক বিপুল সংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। লেখা-পড়ায় সাহায্য করিবার জন্য নানা প্রকার সংগ্রহ আছে। পুরাণা হাড়গোড়, সেকেলে জীবজন্তুর আকৃতি মাফিক প্লাষ্টারের মডেল, ছবি, মানচিত্র, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সাজসরঞ্জামও কম নয়।

প্রত্ন-জীব বিষয়ক সংগ্রহগুলা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। উদ্ভিদ-জগতের প্রত্নতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য আছে এক সারি বস্তু। মেরুদণ্ডহীন জীবজন্তুর জন্য দেখা যায় দ্বিতীয় সারি। তৃতীয় বিভাগে আছে মেরুদণ্ডশীল জীবের সাক্ষী। এই বিভাগে পক্ষিজগতের আদিপুরুষ বা দুনিয়ার প্রাচীনতম পক্ষী রক্ষিত হইতেছে। ১৮৭৭ সনে এইটা পাওয়া গিয়াছে। "আর্কেওপ্‌টেরিক্‌স্ নামে এই পক্ষী-"মনু" পরিচিত।

মেরুদণ্ডশীল জানোয়ারদের ভিতর যেগুলা বিশালাকৃতি সেইগুলার "হাড়গোড়" রক্ষিত হয় স্বতন্ত্র গৃহে। তাহা ছাড়া স্তন্যপায়ী জীবজন্তুর কোনো কোনো আদিপুরুষের মূর্ত্তি বৈজ্ঞানিক কল্পনার সাহায্যে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। এই সমুদয়ের ফটোগ্রাফ রক্ষিত হইতেছে। সেকেলে জানোয়ারদের পদচিহ্ন এবং পায়ের অংশ কোনো কোনো পাথরের অঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। "ইথ্‌থিয়োসোর" নামক জানোয়ারের সমগ্র অস্থিকঙ্কাল পাথরে পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়।

জার্ম্মাণরা পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে কতকগুলা "দিনোসোর" জানোয়ারের চালান লইয়া আসিয়াছে। জার্ম্মাণির হাল্‌বারষ্টাট নগরে কতকগুলা "দিনোসার" এবং সেকেলে কচ্ছপ পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু মার্কিণ মুল্লুক হইতে কার্ণেগীর খরচে আসিয়াছে অন্য এক "দিনোসোরের" প্লাষ্টার প্রতিমূর্ত্তি।

এই গেল প্রত্ন-জীবের প্রদর্শনী। ভূতত্ত্ব-প্রদর্শনীতে প্রথম অংশ হইতেছে পৃথিবীর স্তরবিভাগ। আর এক অংশে সাধারণ ভূতাত্ত্বিক যুগ-বিভাগ দেখা যায়,—দেওয়ালের গায়ে আঁকা চিত্রাবলীতে। এইখানে প্রদর্শিত হইতেছে দুনিয়ার যুগান্তর এবং যুগ-পরম্পরা। যুগের পর যুগ নানা জীবজন্তু বাঁচিয়াছে-মরিয়াছে। এই জীবনধারার সাক্ষীগুলা এখানকার সংগ্রহের অন্যতম দ্রষ্টব্য। কোথাও বা "কয়লার যুগের" উদ্ভিদ-জগৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বরফের শক্তি, জলের শক্তি, বাতাসের শক্তি, সূর্য্য-কিরণের শক্তি ধরাতলকে নানা আকার-প্রকার প্রদান করিতেছে। রাসায়নিক প্রভাবও দুনিয়ার রূপ-গঠনে কম নয়। এই সকল বিশ্ব-শক্তির কাজ বুঝাইবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর রূপান্তর গ্রহণ এবং গড়ন-বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য নানা বস্তু সংগৃহীত আছে। চীন হইতে রিখটোফেন আনিয়াছিলেন নানা প্রকার পাথর। মিশরে পাথর সংগ্রহ করেন শ্বোআইনফুর্ঠ। এই সবও ভূতত্ত্বের প্রদর্শনী-ভবনেই ঠাঁই পাইয়াছে। আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত দ্রষ্টব্য বস্তুর জন্য একটা ছোট ঘর আছে। ভূমিকম্প-বিজ্ঞানের সরঞ্জামও দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থশালায় আছে ৬,০০০ বই এবং ৪৩টা বিজ্ঞান-পত্রিকা। ছাত্র সংখ্যা প্রত্যেক সেমেষ্টারে হয় ৩০।৪০ জন। ১৯১৭ সন হইতে অধ্যাপক পোম্‌পেক্‌ এই সংগ্রহালয়-বিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন।

বার্লিন শহরে এই প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত ভূতত্ত্ব-বিষয়ক তিনটা স্বতন্ত্র পণ্ডিত-সঙ্ঘ আছে। একটার নাম "পাল্যেওন্টোলোগেন-

ফারাইনিগুঙ্" (জীবাশ্মসেবি-সভা)। দ্বিতীয় সঙ্ঘের নাম "ডী ড্যয়চে গেওলোগিশে গেজেলশাফ্ট্" (জার্ম্মাণ ভূতত্ত্ব-পরিষৎ)। তৃতীয় সঙ্ঘ "পাল্যেওণ্টোলোগিশে গেজেলশাফ্ট (ভূতত্ত্ব-পরিষৎ) নামে পরিচিত।

৬। অনধিকার-চর্চ্চার কৈফিয়ৎ

এই সকল কাঠ-খোট্টা বৃত্তান্তের উপকারিতা কতটুকু বলা কঠিন। বিশেষতঃ, যে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করা যাইতেছে তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের কোন উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ নাই। এ অতিমাত্রায় অনধিকার-চর্চ্চা।

কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে তারিখগুলার কিম্মৎ আছে। বিজ্ঞান-জগতের যুগ-পরম্পরা বিজ্ঞান-সেবীদের নিকট তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়। তাহা ছাড়া এই যুগ-পরম্পরায় যে সকল লোক যুগস্তম্ভ স্বরূপ তাঁহাদের নামগুলাও বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে মূল্যবান। অধিকন্তু বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের কোন্ ধাপে বর্ত্তমান ভারত অবস্থিত তাহা আন্দাজ করিবার পক্ষে এই সন-তারিখ এবং নামগুলার দাম অনেক। ১৯২৬ সনের ভারত বিজ্ঞান-দুনিয়ার কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া আছে বা গতিবিধি চালাইতেছে তাহা মাপিতে হইলে বিজ্ঞান-সেবীদিগকে এই সন-তারিখ এবং নামগুলার শরণাপন্ন হইতে হইবেই হইবে।

আর এক কথা। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা কাহাকে বলে ভারতবর্ষের নেহাৎ কম লোকই বোধ হয় জানে। কেন না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান এবং বৈজ্ঞানিক কর্ম্মকেন্দ্র আছে তাহার প্রায় সব কয়টার আসল কর্ত্তাই হইতেছে অ-ভারতীয় লোক। আজ পর্য্যন্ত আমাদের চরম বিজ্ঞান-পণ্ডিতেরাও

এই সকল প্রাতিষ্ঠানিক শাসন অথবা প্রতিষ্ঠানের গঠন-গড়ন-বিভাগ সম্বন্ধে হাতে-কলমে কোনো-কিছু করিবার যথোচিত সুযোগ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। কাজেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের নাম, ধাম, শ্রেণী, সামঞ্জস্য-বিধান, ক্রমবিকাশ এবং অংশবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য ভারতীয় বিজ্ঞান-সেবীদের পক্ষেও অগ্রাহ্য নয়।

এই গেল "খাঁটি" বিজ্ঞান-বিদ্যার সেবকগণের কথা। বর্ত্তমান লেখক যে সকল বিদ্যার চর্চ্চা করিতে অভ্যস্ত সেই সমুদয়ের পুষ্টিসাধনের জন্যও এই "অনধিকার-চর্চ্চা" বেশ কার্য্যকরী। তর্কশাস্ত্র, চিত্তবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, সমালোচনা, নৃতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, "নীতিশাস্ত্র", ধনবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার বহু খোরাক আসে এই সকল "এক্‌জ্যাক্‌ট্ সায়েন্সের" (অর্থাৎ মাপজোক-নিয়ন্ত্রিত, গণিত-নির্দ্ধারিত বিজ্ঞানাবলীর) মুল্লুক হইতে। আমাদের এলাকার বিদ্যাগুলাকে সংক্ষেপে নাম দেওয়া যাউক "দর্শন"।

"বিজ্ঞান"-গুলার কট-মট অংশ না বুঝিলেও,—বুঝিতে চেষ্টা না করাই হয়ত অনেক সময়ে ভাল,—ইহাদের মোটা মোটা সিদ্ধান্তগুলা "দর্শন"-সেবীদের সর্ব্বদাই কাজে লাগে। অধিকন্তু এই সকল বিজ্ঞানে যে আলোচনা-প্রণালী কায়েম হইয়া থাকে সেই আলোচনা-প্রণালী "দর্শন"-বিদ্যার রাজ্যে কায়েম করা অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ সেই আলোচনা-প্রণালী আমাদের দেশে কায়েম করিতে না পারিলে "দর্শন"-বিষয়ক লেখা-পড়া "সেকেলে" থাকিয়া যাইতে বাধ্য। এই দিকে যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার জন্য "বিজ্ঞানে"র সঙ্গে আত্মীয়তা প্রধানভাবে দায়ী।

বিদেশে "ভবঘুরো" গিরি করিবার সময় এই কারণেই এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ইত্যাদি শ্রেণীর পণ্ডিতের সঙ্গে খুব বেশী দহরম-মহরম করা গিয়াছে। ল্যাবরেটারী, পরীক্ষাগৃহ, যন্ত্রপাতির

সংগ্রহালয়, কলকারখানা-নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মকেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আওতায় বার বৎসরের অনেক দিন কাটিয়াছে। বুঝিয়া-না-বুঝিয়াও এই সকল "খাঁটি বিজ্ঞান" এবং পরীক্ষাগারের আবহাওয়ায় চলাফেরা করিয়াছি। এইরূপ অনধিকার চর্চ্চার অনেক নমুনা এগার খণ্ডে বিভক্ত "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের নানা ঠাঁইয়ে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পাছে কোনো "বিজ্ঞান"-পণ্ডিত "প্রকৃতি"তে আমার লেখা দেখিয়া সম্পাদকের নিকট অথবা সোজাসুজি আমার নিকটই কৈফিয়ৎ তলব করিয়া বসেন, এই জন্য আগে হইতেই মাফ্ চাহিয়া রাখিলাম। বলা বাহুল্য, বার্লিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানসমূহের নামধাম, কুলশীল হইতে ভারতসন্তানের এবং দুনিয়ার "দর্শন"-সেবীদের যাহা-কিছু শিখিবার আছে প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক ইত্যাদি শহরের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহও সেইরূপই শিক্ষাপ্রদ। ইচ্ছা করিলে সেগুলার বিবরণ লইয়াই প্রবন্ধমালা সুরু করা চলিত। অন্যত্র করা গিয়াছেও।

৭। প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্যাপীঠ

বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম (১৮০৯) হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রাণিতত্ত্ব-সংগ্রহালয় (ৎসোলোগিশেস্ মুজেয়ুম্) তৈয়ারী করা হয়। এই সংগ্রহালয়ের জন্য সর্ব্বপ্রথম বস্তু পাওয়া যায়—রাজকীয় প্রাকৃতিক সংগ্রহালয় হইতে। পরে নানা লোকের উপহার আসিয়া জুটিয়াছে। অনেক জিনিষ কিনিয়াও আনা হইয়াছে।

রাজকীয় প্রাকৃতিক সংগ্রহালয়ের সব-কিছুই প্রাণিতত্ত্ব-সংগ্রহালয়ের কপালে জুটে নাই। তখনকার দিনে বার্লিনে নামজাদা অস্থিতত্ত্ববিৎ ছিলেন রুডোল্‌ফি। তিনি আর একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার কারবার ছিল—প্রাণিপুঞ্জের হাড়গোড়, মাংসপেশী ইত্যাদির কাটা-ছিঁড়া করা। এই প্রতিষ্ঠানের

জন্য তিনি রাজকীয় প্রাকৃতিক সংগ্রহালয় হইতে অনেক-কিছু পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠানের নাম—"ৎসোটোমিশে সাম্‌লুঙ্।"

প্রাণিতত্ত্ব-মুজেয়ুমের একটা বড় যুগ হইতেছে ১৮১৫ হইতে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত। এই সময়ে তাহার কর্ণধার ছিলেন নামজাদা বিজ্ঞানবীর লিখ্‌টেনষ্টাইন্। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও ছিল তাঁহার অন্যতম কাজ। ১৮৪৩ সনে তিনি বার্লিনের "ৎসো" বা জুঅলজিক্যাল্ গার্ডেন গড়িয়া তোলেন। তাঁহার আমলে মিউজিয়ামের বস্তুগুলা সাজানো-গুছানো হয়। অধিকন্তু প্রথম প্রথম অনেক নতুন-নতুন চিজ্ কেনাও চলিতে থাকে। কিন্তু এই বহর বাড়াইবার কাজ পয়সার খেলা। আর ডিরেক্টার-বিজ্ঞানবীরদের খেয়াল মাফিক বিজ্ঞানসেবার জন্য পয়সা জুটা সর্ব্বদা সম্ভবপর নয়। বার্লিনের সরকার লিখ্‌টেন্‌ষ্টাইন্‌কে শেষ পর্য্যন্ত জবাব দিলেন,—"এ পর্য্যন্ত যা পেয়েছ, বাবা, তাতেই যা পার করে' চল। আজ থেকে চরে খাও।" মিউজিয়ামের দারিদ্র্য বেশ একটু উল্লেখযোগ্য কোঠায় আসিয়াই ঠেকিয়াছিল। গৃহস্থ লোকেরা যেমন দায়ে পড়িলে অনেক সময় লোটাবাটি, আসবাব-পত্র, স্ত্রীর গহণা ইত্যাদি বাঁধা দিয়া অথবা একদম বেচিয়া কোনোমতে একবেলা বা দু'বেলা আঁচাইবার ব্যবস্থা করে, লিখ্‌টেন্‌ষ্টাইন্‌কেও মুজেয়ুম্‌টা বাঁচাইবার জন্য সেই নীতিই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজন্তি পণ্ডিতাঃ"—এই বুঝিয়া প্রাণিবিজ্ঞানের পণ্ডিত মহাশয় নিজ মুজেয়ুমের বস্তুগুলা হইতে বাছিয়া-বাছিয়া অনেক সেরা মাল বাজারে বেচিতে বাধ্য হন। কথাটা যুবক-ভারতেও মাঝে মাঝে মনে রাখা দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রশিয়ার "ৎসোলোগিশেস্ মুজেয়ুম্" পয়সার অভাবে নিজ সংগৃহীত বস্তু বেচিয়া কোনোমতে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয়। বিজ্ঞানজগতে জরুরি অনেক জিনিষ বটে,—কিন্তু জরুরি বলিলেই জিনিষ আসিয়া জুটে না।

দারিদ্র্য-দুর্য্যোগ সত্ত্বেও মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা চাই। ইহারই নাম বিজ্ঞান-"সাধনা।"

"বাঘা"-"বাঘা" অধ্যাপকেরা এক একটা নতুন নতুন সিদ্ধান্ত অথবা নতুন নতুন গবেষণাপ্রণালীর জন্মদাতা বা প্রচারক নামে বিজ্ঞান-জগতে সুপরিচিত। লিখ্‌টেন্‌ষ্টাইনের আমলে প্রাণিতত্ত্ববিদ্যাটা চামড়া, খোলস ইত্যাদিতেই অনেকটা আবদ্ধ ছিল। জানোয়ারের ভিতরে প্রবেশ করা তখনও বড় একটা দস্তুর ছিল না। জীবজন্তুর বাহ্য লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইলেই লোকেরা প্রাণিতত্ত্ববিৎরূপে বাজারে দাঁড়াইয়া যাইত। কিন্তু লিখ্‌টেন্‌ষ্টাইনের পর বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ব্যক্তি প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপক বাহাল হন, তিনি ছিলেন জানোয়ারের ভিতরে প্রবেশের পক্ষপাতী। "সেকেলে" প্রাণিবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তাঁহার গবেষণা বিশেষ কার্য্যকরী হয়। "নবীন প্রাণিবিজ্ঞানের" বিশেষত্ব হইল জানোয়ারের হাড়গোড়, মাংশপেশী ইত্যাদি কাটাছিঁড়া করা। 'অ্যানাটমি' বা অস্থিবিদ্যা ছাড়া জীবজন্তুর রূপভেদ, গড়ন-ভেদ, জাতি-ভেদ আবিষ্কার করা চলিতে পারেনা। এই হইল নয়া বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। ১৮৫৮ হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত—পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই গবেষণা-প্রণালীর কাজ চলিতে থাকে। প্রবর্ত্তক ছিলেন অধ্যাপক পেটার্স। জানোয়ায়ের বাহ্য লক্ষণ ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার খেয়াল পেটার্স লাভ করেন—তাঁহার গুরু ম্যিলারের নিকট হইতে। ম্যিলার ছিলেন সেকালের জগৎ-প্রসিদ্ধ "ফিজিঅলজিষ্ট"। তাঁহার অধ্যাপনায়, শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিদ্যায় ওস্তাদি লাভ করিবার ফলে পেটার্স সেকেলে প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্যায় একটা নতুন দস্তুর লাগাইতে সমর্থ হন।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার আর এক ধাপ সুরু হয় ১৮৮৪ সনে। সেই বৎসর শুলৎসে অধ্যাপক বাহাল হন। বাহাল হইবার সময়ই তিনি কড়ার

করেন যে, সংগ্রহালয়-পরিচালনার সঙ্গে অধ্যাপনার কোন যোগাযোগ থাকিতে পারিবে না। অধিকন্তু প্রাণিতত্ত্ব শিখাইবার জন্যই একটা স্বতন্ত্র "ইন্‌ষ্টিটুট্" খাড়া করিতে হইবে। "ইন্‌ষ্টিটুট্" হইতেছে খাঁটি ল্যাবরেটরী-জাতীয় বিদ্যাপীঠ। এখানে যা-কিছু সবই লেখাপড়া, পরীক্ষা-পরখ ইত্যাদির সহায়ক। মামুলি দর্শনযোগ্য বস্তুর ঠাঁই "ইন্‌ষ্টিটুটে" থাকিতে পারে না। শুলৎসের তত্ত্বাবধানে এইরূপ লেখাপড়ার সহায়ক মালপত্র আকারে বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের ব্যবহারোপযোগী বহুসংখ্যক দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে; তাহার সাহায্যে প্রাণীদের শ্রেণী, জাতি, উপজাতি ইত্যাদি বংশপরিচয় নির্দ্ধারণ করিতে সুযোগ জুটে। জানোয়ারে-জানোয়ারে হাড়গোড়-মাংসপেশীর তুলনায় সমালোচনা-সাধনও এই সব বস্তুর সাহায্যে সহজ হইয়া আসে। অধিকন্তু জীবজন্তুর ক্রমবিকাশের ধারা বুঝাইবার পক্ষেও আণুবীনিক দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্যক হয়। তাহা ছাড়া "ইন্‌ষ্টিটুটে" সংগৃহীত হইয়াছে—কাঠ, প্লাষ্টার, কাচ ইত্যাদি উপকরণে প্রস্তুত নানাপ্রকার "মডেল" বা অনুকরণ-বস্তু। সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক জীবজন্তুর নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশের নমুনাও গবেষণা-পরীক্ষার জন্য মজুত রহিয়াছে। কাটাছিঁড়ার ল্যাবরেটরীতে যন্ত্রপাতির রেওয়াজ খুব বেশী, বলাই বাহুল্য। কাজেই "ইনষ্টিটুটে"র "ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্টারিয়ুম" বা যন্ত্রভবন বেশ বড়; তাহাতে আছে গণ্ডা গণ্ডা অণুবীন, আণুবীনিক ফটো তোলার আসবাব ও কলকব্জা, আর অন্যান্য "অস্ত্রশস্ত্র"। "ইনষ্টিটুটের" অন্যতম সম্পদ গ্রন্থশালা। ৮,০০০ খানা ছোট-বড়-মাঝারি কেতাব আর ৩৪টা প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক দেশী-বিদেশী পত্রিকা ছাপার হরপে আধ্যাত্মিক খোরাক যোগাইয়া থাকে।

"পঠন-পাঠনের" কায়দা ঋতু অনুসারে বিভিন্ন। গ্রীষ্মকালে শিক্ষাপ্রণালী "মাক্রোস্কোপিশ-ৎসোটোমিশ",—অর্থাৎ খোলা চোখে

জানোয়ারের ভিতর-বাহির যতটা বুঝা সম্ভব, তাহার আলোচনা হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটাছিঁড়া করার কৌশলও ইহার অন্তর্গত। শীতকালের পাঠ-চর্চা "মিক্রোস্কোপিশ-ৎসোলোগিশ।" অঙ্গপ্রতঙ্গের গড়ন-সংক্রান্ত যেসকল খুঁটিনাটি মামুলি চোখে দেখা-বুঝা অসম্ভব, তাহার জন্য দরকার হয় অণুবীন। শীতকালে এই অণুবীনের পালা। ছাত্রসংখ্যা প্রত্যেক ঋতুতেই গড়ে প্রায় ২০০।

এই গেল বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত ছেলে পিটাইয়া মানুষ করিবার ব্যবস্থা। বার্লিনে প্রাণিতত্ত্ব চর্চ্চার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও আছে। একটা পরিষদের নাম—"গেজেলশাফট্ নাটুরফর্শেণ্ডার-ফ্রয়ণ্ডে" (প্রকৃতি-গবেষক-সুহৃৎ-সমিতি)। "ড্যয়চে এণ্টোমোলোগিশে গেজেলশাফ্ট্" (জার্ম্মাণ-কীটতত্ত্ব-সমিতি) নামে একটা পরিষৎ আছে। "ড্যয়চে ওর্ণিথোলোগিশে গেজেলশাফট্" (জার্ম্মাণ-পক্ষিতত্ত্ব সমিতি) একটা স্বতন্ত্র পরিষৎ। তাহা ছাড়া প্রকৃতিতত্ত্ব-সংগ্রহালয়ের সুহৃৎ-সঙ্ঘ নামে চলিতেছে "ফারাইণ ড্যর ফ্রয়ণ্ডে ডেস্ মুজেয়ুম্স্ ফ্যির নাটুরকুণ্ডে।"

৮। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-সংগ্রহালয়

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ক "মুজেয়ুম" এক সঙ্গে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তরুলতার শ্রেণী ও জাতিভেদ শিখাইবার জন্য এটা ল্যাবরেটরী বা বিদ্যাপীঠ। উদ্ভিদজগতের ভূগোল শিখাইবার কাজেও এই মুজেয়ুম হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। অধিকন্তু ওষুধপত্রের গাছগাছড়া ইত্যাদি সংক্রান্ত উদ্ভিদবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনও এই কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া "ঔপনিবেশিক" তরুলতার চর্চ্চা এখানকার অন্যতম লক্ষ্য। "কোলোনিয়াল" শব্দে জার্ম্মাণরা ইয়োরামেরিকার বহির্ভূত গোটা দুনিয়াটাকেই ধরিয়া লয়। এই পারিভাষিকে আমাদের ভারতীয় শাকশব্জী, লতাপাতা, ফলমূল ঔপনিবেশিক উদ্ভিদ-

তত্ত্বেরই অন্তর্গত। "বোটানিশেস্ মুজেয়ুম"টা "ইন্‌ষ্টিটুটের" উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। ইহা একমাত্র সংগ্রহালয় নয়। লেখাপড়া, পরখ, পরীক্ষা ইত্যাদি সব-কিছুই এই আওতায় চালানো হইয়া থাকে।

আজকালকার সংগ্রহালয়টা বিপুল বিদ্যাকেন্দ্র। বলা বাহুল্য, অন্যান্য সংগ্রহালয়ের মতন এটারও বিপুলতা আস্তে আস্তে বাড়িয়াছে। এখানে যেসব তরুলতা, গাছগাছড়া, ফলমূল সংগৃহীত দেখিতে পাই তাহার কোনো-কোনোটা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একত্র করা হইয়াছিল। এই সংগ্রহের কাজ দুইএকজন গাছ-"বাতিকওয়ালা" লোকের ব্যক্তিগত খেয়ালে অনুষ্ঠিত হয়। পরে সংগ্রহটা "আকাডেমী ড্যার ভিসেন্‌সেন্‌শাফ্‌টেন" (বিজ্ঞান-পরিষদ) নামক রাজকীয় সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানে সঁপিয়া দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত একটা স্বতন্ত্র "হার্বারিয়ুম", বা উদ্ভিদ-সংগ্রহালয় সরকারী তাঁবে দেখা দেয়। সে ১৮১৮ সনের কথা। তাহার ভিতর প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ ফোন হুম্বল্ড কর্ত্তৃক সংগৃহীত দক্ষিণ আমেরিকার তরুলতাসমূহ আসিয়া জুটে। এই অবস্থায় "হার্বারিয়ুম"-টাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক লিঙ্ক্।

একমাত্র উদ্ভিদ-সংগ্রহালয়ের কেন, সকল প্রকার সংগ্রহালয়েরই জীবন-লীলা নির্ভর করে পর্য্যটনের উপর। দেশের লোকের মাথায় পর্য্যটনের বাতিক না চাগিলে আর সঙ্গে-সঙ্গে বস্তু-সংগ্রহের নেশা না চাপিলে মিউজিয়াম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেখাও দেয় না, বাড়েও না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কতকগুলা জার্ম্মাণ "ভবঘুরে" নামজাদা হয়। তাহাদের কয়েকজনের বাতিক ছিল "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ"-সম্পর্কিত। হুম্বল্ডের নাম প্রথমেই করা হইয়াছে। কামিস্‌সো নামক একজন বিজ্ঞানসেবী পালে-টানা জাহাজে দুনিয়া টহল দিয়া আসেন। এই পৃথিবী-প্রদক্ষিণার ফলে "হার্বারিয়ুমে"র সংগ্রহ বেশ পুরু হয়। জেল্লোজ ঘুরিয়াছিলেন

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন লিখ্‌টেনষ্টাইন। মেক্‌সিকোর বনে-জঙ্গলে টহল দিয়াছিলেন শীডে আর ডেপ্পে। কানারী দ্বীপপুঞ্জে পর্য্যটন করেন বুক্‌স্। এই সকল "ভবঘুরে্য"দের দৌলতে "হার্বারিয়ুম" নানাদিকে বাড়িতে পারিয়াছে।

লিঙ্ক ছিলেন কর্ত্তা ১৮৫১ পর্য্যন্ত। তাঁহার পর ব্রাউন ১৮৭৭ পর্য্যন্ত পরিচালনা করিয়াছেন। এই সময়ের বিশেষ সংগ্রহগুলা কুণ্ঠ্‌, এজেনবেক, এবং ক্লোটোভ ইত্যাদি সংগ্রাহকের নামের সহিত জড়িত। দেশের লোকের ভিতর কতকগুলা "ভবঘুরে্য" জুটিলে না হয় দুনিয়ার এখান-ওখান-সেখান হইতে নানাপ্রকার মাল সংগৃহীত হইল। কিন্তু কোনো এক কেন্দ্রে এইগুলা মজুত করা আবার মুখের কথা নয়। সংগ্রহের খরচের চেয়ে মজুতের খরচ আর মজুত করার পর সেই সব রক্ষণাবেক্ষণের খরচ আরও বেশী। বামুন ঠাকুর হাতীটা না হয় বিনা পয়সায়ই দানস্বরূপ পাইয়া বসিল। কিন্তু হাতী পুষে কে? সংগ্রহালয়ের কাণ্ড গরীবের হাতী পোষা বিশেষ। বার্লিনের উদ্ভিদ-সংগ্রহালয় বহুবার স্থানান্তরিত হইয়াছে। আজ যে বাড়ীতে ইহার ঠাঁই কাল সেই বাড়ীতে আর কুলায় না। মাল-বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ ঘরবাড়ীর দুর্য্যোগ মিউজিয়াম মাত্রেরই অভিজ্ঞতায় দেখা যায়। শেষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানটা যেখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে তাহার বয়স আজ মাত্র বিশ-বাইশ বৎসর। ১৯০৭ সনে এই নবীন ভবনে গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভবন বিপুল। পঠন-পাঠনের ঘর, শাসন-পরিচালনার ঘর, গ্রন্থশালা, ল্যাবরেটরী, অনুসন্ধান-গবেষণাগার ইত্যাদি সবই এক জায়গায়। ল্যাবরেটরীতে একশ' জন ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে অণুবীনের কাজ চালাইতে পারে। লাইব্রেরীতে আছে ৫০,০০০ কেতাব আর ৮১টা পত্রিকা। তাহা ছাড়া জনসাধারণের জন্য খোলা আছে প্রদর্শনী-গৃহ।

উদ্ভিদতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে একটা "বাইঅলজিক্যাল" বা প্রাণতত্ত্ব-বিষয়ক বিভাগ চলিতেছে। তরুলতার জীবন-বিকাশ, বাড়তি ও বিস্তার ইত্যাদি জীবনঘটনা অণুবীনের সাহায্যে অনুসন্ধান করা হয়। পরে এইসব ছবির মারফৎ বৃহদাকারে দেখানো হইয়া থাকে। পরগাছা, কীটপতঙ্গভুক উদ্ভিদ ইত্যাদির জীবনবৃত্তান্ত এই বিভাগের বিশেষরূপে আলোচ্য বস্তু।

মুজেয়ুমের বড় ঘরে অনেকগুলা ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ-জগতের বংশ-লতিকা এই সকল ছবির ভিতর ধরিয়া রাখা হইয়াছে। "পাল্যেও-বোটানিশ" বিভাগে উদ্ভিদজগতের প্রত্নতত্ত্ব আলোচিত হয়। দর্শনযোগ্য বস্তুর ভিতর দক্ষিণ আল্পস পাহাড়ে আবিষ্কৃত "সেকেলে" তালগাছের "ফসিল" বা প্রস্তরীভূত রূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পারিবারিক, সাংসারিক বা আর্থিক জীবনে যে সকল গাছ-গাছড়া কাজে লাগে তাহার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিভাগ বুঝাইবার জন্য যে ঘরগুলা দেখা যায় তাহার ভিতর নিম্নতম উদ্ভিদ হইতে সুরু করিয়া উচ্চতম উদ্ভিদজীবনের গড়ন স্তরে স্তরে বুঝানো রহিয়াছে।

আজকালকার পরিচালক হইতেছেন অধ্যাপক ডীল্‌স্। ইনি উদ্ভিদ-জগতের ভুগোলতত্ত্বে ওস্তাদ। রুশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের গাছ-গাছড়া তাঁহার প্রধান গবেষণা-ক্ষেত্র। ফী বৎসর গড়ে প্রায় ২৫০ ছাত্রছাত্রী উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চা করিয়া থাকে।

বার্লিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে এই বিদ্যার জন্য কতকগুলা প্রতিষ্ঠান আছে। "ড্যয়চে বোটানিশে গেজেলশাফ্‌ট্‌" (জার্মাণ উদ্ভিদ-তত্ত্ব সমিতি), "ফ্রাইয়ে ফারাইনিগুঙ ফ্যির ফ্লান্‌ৎসেন-গেওগ্রাফী উণ্ড সিষ্টেমাটিক" (উদ্ভিদভূগোল ও উদ্ভিদজাতি চর্চার জন্য বে-সরকারী সমিতি) আর "বোটানিশার ফারাইন ফ্যির ডী প্রোফিন্‌ৎস

ব্রাণ্ডেনবুর্গ (ব্রাণ্ডেনবুর্গ জেলার উদ্ভিদতত্ত্ব সমিতি) ইত্যাদি পরিষৎ উল্লেখযোগ্য ।

৯। উদ্ভিদ-শরীরাভ্যন্তর প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য বিদ্যার মতন উদ্ভিদতত্ত্বেও যুগে-যুগে আকার-প্রকার বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৭৭ সন পর্য্যন্ত একজন অধ্যাপকই এই বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ সম্বন্ধে ওস্তাদ বিবেচিত হইতেন। অধ্যাপক ব্রাউনের আমল পর্য্যন্ত এইরূপ চলিয়াছে। পরে দুইটা স্বতন্ত্র বিভাগ কায়েম হয়। একটার নাম "সাধারণ উদ্ভিদতত্ত্ব"। এই সাধারণ বিভাগে "ফিজি-অলজি" বা শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতরকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোচিত হয়। এইজন্য একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম হইয়াছে। নাম "ফ্লান্‌ৎসেন-ফিজিওলোগিশেস্ ইন্‌ষ্টিটুট"। এই প্রতিষ্ঠানের নবীন গৃহে প্রবেশ ঘটিয়াছে মাত্র সেদিন,—মহা লড়াইয়ের পূর্ব্ব বৎসর, ১৯১৩ সনে। একালের পরিচালকদের মধ্যে হাবার্লাণ্ড বিশেষ নামজাদা। ১৯২৪ সনে তিনি পেন্‌শ্যন পাইয়াছেন।

নতুন বাড়ীতে ৭০ জন এক সঙ্গে গবেষণা চালাইতে পারে। লাইব্রেরিতে আছে ৪০০০ বই, হাজার চারেক পুঁথি, ২৪টা পত্রিকা। খাঁটি ফিজিঅলজি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির জন্য ঘর-দুয়ার ত আছেই। অধিকন্তু রসায়ন এবং ব্যাক্টিরিঅলজি (কীটাণুতত্ত্ব) ইত্যাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। একটা ঘর সর্ব্বদাই সমান তাপে রাখিবার আয়োজন করা হইয়াছে। কতকগুলা অন্ধকার ঘর, ফটোগ্রাফি কামরা, টীকা লাগাইবার ঘর, জীবনের বাড়তি দেখিবার ঘর ইত্যাদি নানাপ্রকার ঘর এই ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্তর্গত।

প্রায় শ' দুয়েক ছাত্রছাত্রী এই ইন্‌ষ্টিটুটে লেখাপড়া করে। তাহা ছাড়া গবেষণা চালাইবার জন্য কয়েকজন সর্ব্বদাই মোতায়েন আছে। বর্ত্তমানে পরিচালক অধ্যাপক কীপ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

জার্ম্মাণ হাসির এক ছটাক *

জার্ম্মাণরাও হাসিতে জানে। মুচ্‌কে হাসিও জার্ম্মাণ নরনারীর ঠোঁটের আগায় দেখা দেয়, আর হো-হো করিয়া গাল ভরিয়া পেট ভরিয়া হাসাহাসিও জার্ম্মাণির ঘরে-বাহিরে দেখিতে পাই। ইহারা খাইতে বসিয়া হাসে, বৈঠকখানায় আড্ডা মারিতে মারিতে হাসে, রাস্তায়-শড়কে বেড়াইতে বেড়াইতেও হাসে, আবার ট্রামে রেলে মোটরকারেও হাসে। নাচিবার সময়ও জার্ম্মাণ মেয়ে-পুরুষেরা হাসির সঙ্গে অসহযোগ চালায় না। থিয়েটারে, সিনেমায়, সঙ্গীত-ভবনে খেলাধূলা-নাচগান-নাটক ইত্যাদি দেখিবার-শুনিবার সময়ও ইহাদের মেজাজে হাসিবার আনন্দ ফুটিয়া উঠে। ছোড়া-ছুঁড়ীরা যেমন হাসে বুড়াবুড়ীরাও ঠিক তেমনি হাসে।

জার্ম্মাণ খবরের কাগজে হাসিবার জায়গা আছে। সাপ্তাহিক-মাসিকগুলাও হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে অভ্যস্ত। রাইখ্‌স্‌টাগ-লাণ্ডটাগ ইত্যাদি পার্ল্যামেণ্ট সভায় হাসা-হাসির রেওয়াজ বেশ আছে। সভা-সমিতিতে অথবা আমোদগৃহে হাসির ওস্তাদেরা লোক হাসাইয়া পয়সা রোজগার করিতে জানে। আবার নাট্যকার, উপন্যাস-লেখক ইত্যাদি সাহিত্য-স্রষ্টারাও হাসিঠাট্টা-ব্যঙ্গ-টিটকারি ইত্যাদির রস ছিটাইয়া নিজ নিজ রচনা বেশ রুচিকর করিয়া তুলিতে পটু।

যে সকল বিদেশী লোক জার্ম্মাণদেরকে অতিগম্ভীর কাঠখোট্টা শুক্‌না জাতি বলিয়া জানে তাহারা জার্ম্মাণদের ধরণধারণ সম্বন্ধে একদম

---

* ১৯৩০ সনে দ্বিতীয়বার জার্ম্মাণিতে প্রবাসের সময় লিখিত।

আনাড়ি। এই সূত্রে আর একটা জাতির কথা মনে পড়িতেছে। সে জাপানী জাতির কথা। ইয়োরামেরিকার লোকেরা,—ব্যবসায়ী, রাষ্ট্রিক, সাহিত্য-সেবী, পণ্ডিত সকলেই,—আমাকে অনেকবার বলিয়াছে ঃ—"জাপানীরা বড় বেরসিক জাতি। উহারা কখনো হাসে না। বড় জোর একটু মুচ্‌কে হাসি উহাদের ঠোঁটে আসিয়া হাজির হয়। কিন্তু হাসির ঠেলায় ঠোঁট ফাটিয়া যায় না। দাঁত-দেখানো হাসি জাপানী-জীবনে অজ্ঞাত।" জাপান সম্বন্ধে এই ধরণের বিদেশী মত শুনিয়াছি অসংখ্যবার। কিন্তু জাপানী নরনারীর সঙ্গে অনেক দিন ঘরকন্না করিয়া বুঝিয়াছি যে, এই মত বিলকুল কুসংস্কার মাত্র। জাপানীদের ছেলে বুড়া পুরুষ নারী সকলেই বেশ প্রাণ খুলিয়া এমন কি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াও হাসিতে জানে। জাপানী হাসিতেও দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের কাছে এই কথাটা এক বিপুল "আবিষ্কার" বিশেষ বিবেচিত হইবে। ঠিক সেই ধরণেরই সমাজ-বিজ্ঞান-বিষয়ক আর একটা "আবিষ্কার" হইতেছে জার্ম্মাণ হাসির সংবাদ।

বাঙালীরা গোপাল ভাঁড়ের গল্প শুনিয়া হাসে। জার্ম্মাণ-সমাজেও এই ধরণের গোপাল ভাঁড় আছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী-গ্রন্থের ভাঁড়ুদত্ত যে রসের সৃষ্টি সেই রসের সৃষ্টি জার্ম্মাণ সাহিত্যেও প্রচুর। সংস্কৃত নাটকের বিদূষককেও জার্ম্মাণ গল্পে-উপন্যাসে-নাট্যে যখন-তখন দেখিতে পাওয়া যায়। ছোটখাটো ইয়ারকি ফাজলামি বখামি বলিলে যাহা কিছু বুঝা যায় জার্ম্মাণ লেখকেরা তাহাও বাদ দেয় না। নিত্যনৈমিত্তিক থিয়েটারে নাচঘরে সিনেমায় দর্শকেরা এই ধরণের বখামি ছ্যাবলামি দেখিয়া-শুনিয়াই হাসিতে হাসিতে "গড়াগড়ি" যায়। ভদ্রঘরের বৈঠকখানার খোস গল্পেও এই সব সার্ব্বজনিক হাসি-ঠাট্টায় মসগুল হওয়া অতি মাত্রায় আটপৌরে কথা। তাহা ছাড়া উচ্চ অঙ্গের হাস্যরস ত

আছেই। গভীরতা, গাম্ভীর্য্য ইত্যাদির সঙ্গে-সঙ্গেই অথবা পাশে-পাশেই জার্ম্মাণ লেখক-পাঠকেরা এই রসের স্বাদ চাখিতে অভ্যস্ত।

ভিল্‌হেল্‌ম্‌ বুশ নামক এক লেখক ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের ঘরে-ঘরে আনন্দ ছড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা রচনা দক্ষিণ জার্ম্মাণির প্রত্যেক পরিবারেরই আটপৌরে জীবনের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। তাঁহার লেখা বইগুলা বিশ-পঁচিশ সংস্করণে বাহির হইয়াছে। "ক্রিটিক ডেস্ হ্যার্ৎসেন্‌স্" (হৃদয়-সমালোচনা) নামক বুশ-প্রণীত কবিতা-গ্রন্থের একটা কবিতা নিম্নরূপ :—

"ভালবাসার মাত্রাটা ছিল অত্যন্ত জবর,
দস্তুর মাফিক পাণ্ডুবর্ণ হ'ত বটে তারা,
হাজার কথা কইত তারা রোজ পরস্পর
তথাপি তাদের কথা নাহি হ'ত সারা।
বিরহে কাটিল অনেক জীবনের কাল,
যাক, তবু পরে হ'ল সে কষ্টের শেষ,
দেখিতে দেখিতে ফল্‌ল বিবাহের কপাল,
এখন দুয়ের প্রাণ ত সুখশান্তির দেশ !
স্বামীর মোজা বুন্‌তে বুন্‌তে পত্নী হয়রাণ,—
প্রভাতী পোষাকে তার এই বড় কাজ,
কোলোনের সংবাদপত্র পাঠে স্বামীর ধ্যান,—
পত্নীকেও সে খবর শুনাতে মাঝ মাঝ।"

ইয়োরামেরিকায় বিবাহের পূর্ব্বে যুবক-যুবতীরা পরস্পর পরস্পরকে জানে। আমাদের দেশে এইরূপ জানাজানির রেওয়াজ নাই। তবে দুই দুনিয়ায়ই "লাখ কথায় বিয়ে।" বিবাহের পূর্ব্বে অনেক কথা-কাটাকাটি, বুঝাশুনা, ভাবা-চিন্তা দরকার হয়। আবার বিবাহের

পরবর্ত্তী প্রথম দু'এক বৎসরের অবস্থা দুই মুল্লুকেই এক প্রকার। অর্থাৎ "গোলাপী নেশা," প্রেমের টান, স্বপন-ভাবুকতা ইত্যাদি সব-কিছুই যুবক-যুবতীর প্রাণে নয়া জগৎ খুলিয়া ধরে। কাজেই এই অবস্থাও কি ভারতে আর কি ইয়োরামেরিকায় সর্ব্বত্রই সহজে মালুম হইবে। বুশ-প্রণীত কবিতার প্রথম দিক্‌টা বেশ সুবোধ্য সন্দেহ নাই। "ভালবাসার যুগে" কথা বলিয়া-বলিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইলেও কথা শেষ করা সম্ভব নয়। ভারতীয় যুবাও মর্ম্মে মর্ম্মে ইহা বুঝিবেন। কিন্তু মজার কথা—বিবাহের পরবর্ত্তী (অর্থাৎ বৎসর চার-পাঁচেকের পরবর্ত্তী) অবস্থা। তখন "দুয়ের প্রাণ ত সুখশান্তির দেশ!" আলবৎ। কিন্তু কিরূপ সুখ-শান্তি? তখন না আছে হাজার-হাজার কথা কওয়া আর না আছে বিরহের মধুর স্বপন। তখন নারী বুনিতেছেন মোজা আর পুরুষ পড়িতেছেন খবরের কাগজ!

শুনিবামাত্র হয়ত খিলখিল করিয়া হাসিবার দরকার হইবে না। হাসিতে হাসিতে নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়িয়া যাইবারও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কবিতাটা যে বেশ সরস সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক মানুষের জীবনে যে একটা মস্ত জুয়াচুরি, বুজরুকি, গোঁজামিল, বৈষম্য বা অসামঞ্জস্য বিরাজ করিতেছে তাহা অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনকে চিরিয়া দেখিলে তাহার ভিতর এই ধরণের দ্বৈতভাব, কপটতা, বা কুটিল স্বভাব অসংখ্য ধরা পড়িবে। সেইগুলা খুলিয়া দেখানোই হাস্যরসের অন্যতম কাজ।

বিদেশী সাহিত্যের হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ বুঝিয়া উঠিতে হইলে বিদেশী ভাষায় দখল থাকা দরকার। জার্ম্মাণ হাসির এক-আধ কাঁচ্চা উপভোগ করিতে হইলে ভাষা না জানিলে চলিবে না। বস্তুতঃ অনেক সময়ে শব্দের সমাবেশেই জীবন সম্বন্ধে সমালোচনা অথবা লোক-চরিত্রের উপর কৌতুক কিম্বা সমাজের উপর কটাক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

তর্জ্জমায় রস পাওয়া অনেক সময়েই সম্ভবপর হয় না। কাশীর পরিহাস-রসিকেরা সে সকল শব্দ ব্যবহার করিতে ওস্তাদ সেই সব শব্দ না জানা থাকিলে এমন কি পাটনার হিন্দী ভাষীরাও কাশীওয়ালাদের হাসির মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ হইবে। সুতরাং জার্ম্মাণ সাহিত্যের রং-তামাসা বাঙালী, মারাঠা, তামিল বা অন্য কোনো ভারতীয় দেশবাসীর পক্ষে বিনা কষ্টে দখল করা কঠিন।

ভাষা ছাড়া আর একটা কারণও আছে। বিদেশী সমাজের ধরণ-ধারণ জানা না থাকিলে বিদেশী নরনারীর হাসি-ঠাট্টা বুঝা এক প্রকার অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুশ-প্রণীত কবিতাটা আবার ধরা যাউক। মোজা বুনা বা মোজা মেরামত করা ইয়োরামেরিকার পারিবারিক জীবনে ঠিক কিরূপ কাজ ইহা ভারত-সন্তানের পক্ষে ঠাওরানো সম্ভবপর নয়। কোথায় বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের "হাজার কথা কওয়া" এবং "পাণ্ডুবর্ণ হওয়া" আর কোথায় "প্রভাতী পোষাকে" মোজা শেলাই করা! এই অসামঞ্জস্যের গভীরত্ব, একদম "ট্র্যাজেডি,"—ইয়োরামেরিকার নরনারী ছাড়া অন্য কেহ পূরাপূরি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। অপর দিকে পত্নীর পাশে বসিয়া "দৈনিক পত্র" পাঠ করাটা স্বামীর পক্ষে প্রেমের আদালতে যে কতটা "ক্রিমিন্যাল", বা দূষণীয় তাহা ইয়োরামেরিকার পরিবারে-পরিবারে অহরহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেশের পত্নীরা তাহাদের স্বামীর বিরুদ্ধে যখন-তখন এই ধরণের নালিশই করিয়া থাকে। অনেক মহিলার মুখেই শুনিয়াছি:—"আরে মশায় কি বল্‌ব, আমার স্বামী, সে যখন ঘরে আসে তার একমাত্র কাজ ঐ খবরের কাগজটা পড়া। আমার জন্য এক মুহূর্ত্তও ফুরসুৎ নাই!" ইত্যাদি।

নামজাদা লেখকের ভিতর সেকালের লেস্‌সিঙ্‌ তাঁহার "মিনা" গ্রন্থে, গ্যেটে তাঁহার "ফাউষ্ট" গ্রন্থে আর শিলার তাঁহার "ভালেন্‌ষ্টাইন" গ্রন্থে উচ্চ শ্রেণীর হাসি-ঠাট্টা ছড়াইয়া গিয়াছেন। একালের

হাউপ্‌ট্‌মানও হাস্যরসের বিতরণে কৃপণ নন। যে-কোনো জার্ম্মাণ সাহিত্য-সেবীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলেই এই সকল জগদ্‌-বিখ্যাত সাহিত্য-বীরের নাম শুনিতে পাওয়া যাইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কয়েকজন বড় লেখক জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম বোধ হয় ভারতে সুপ্রচারিত নয়। দুই তিনজনকে হাস্যরসের স্রষ্টা হিসাবে উচ্চ আসন দেওয়া সম্ভব। একজনের নাম গুষ্টাভ ফ্রাইটাগ (১৮১৬-৯৫)। ইনি "আনেন" (পূর্ব্বপুরুষ) নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস-গ্রন্থাবলীর প্রণেতা হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে অনেকটা জার্ম্মাণ সাহিত্যের স্কটরূপে বিবৃত করা চলে। তাঁহার লেখা নাটকও আছে। "ব্রাউট্‌-ফার্ট" (কন্যাযাত্রা) নাটকে মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের সমাজচিত্র পাই। তাহাতে হাসিঠাট্টার বেশ সুযোগ আছে। ধনী জমিদার-সমাজের চিত্র আছে "গ্রাফ (জমিদার) ভাল্ডেমার" নাটকে। ইহাতে বাবু-পরিবারের সঙ্গে বাগানের মালীর পরিবারের যোগাযোগ মোলায়েম রসিকতার সহিত বিবৃত আছে। "জোল উণ্ড হাবেন" (দেনা-পাওনা অথবা জমা-খরচ) নামক উপন্যাসে বৈশ্য সমাজের বিবরণ পাই। ইহার ভিতর খাঁটি জার্ম্মাণ সমাজের অনেক চরিত্রকে নিপুণভাবে আনিয়া ধরা হইয়াছে। রস-সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে জার্ম্মাণরা এই বইখানাকে খুব তারিফ করিতে অভ্যস্ত।

জার্ম্মাণ সাহিত্যের ডিকেন্সরূপেও এই যুগের একজন লেখককে দাঁড় করানো চলে। তাঁহার নাম ফ্রিট্‌স্‌ রয়টার (১-১০-১৮৭৪)। এক-দেড় যুগ ধরিয়া জার্ম্মাণ পাঠক-পাঠিকারা রয়টারের ভক্ত রহিয়াছে। এমন সর্ব্বজনপ্রিয় উপন্যাস-লেখক জার্ম্মাণ সমাজে বড় বেশী নাই। ১৮৩০-৩৩ সনে জার্ম্মাণিতে চলিতেছিল রাষ্ট্রবিপ্লব। এই বিপ্লবে যোগদানের ফলে রয়টারের কপালে ছিল জেল-ভোগ। বৎসর ছয়েক কারাবাসের অভিজ্ঞতার পর সুরু হয় তাঁহার উপন্যাস-রচনা।

রয়টারের রচনায় নীচু দরের, মাঝারি গোছের আর উঁচুদরের হরেক্ রকম হাস্যরসই পাওয়া যায়। প্রত্যেক বই নিজ পরিচিত পল্লীর আর জেলার নরনারীর সুখদুঃখ সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ রচনা। আর অনেক গুলোর সঙ্গেই নিজ জীবনের, নিজ অভিজ্ঞতার কথা সুজড়িত। লোকচরিত্রের বিশ্লেষণে রয়টার সিদ্ধহস্ত। মেক্‌লেনবুর্গ জেলার নরনারীরা তাঁহার লেখার ভিতর জ্যান্ত মানুষের মতন চলাফেরা করে। এই সূত্রেই হাস্যরসের অবতারণাও সহজসিদ্ধ হইয়াছে। "উংমিনে ফেষ্টুংসটিড" (আমার কারাবাসের যুগে) নামক গ্রন্থের ভিতর হাসির সঙ্গে করুণ রসের মিশ্রণ চাখিতে পারা যায়। তিন খণ্ডে প্রকাশিত একখানা উপন্যাস-গ্রন্থের প্রধান চরিত্র,—ইনস্পেক্টর ব্রেজিশ,—জার্ম্মাণ সাহিত্যের উপাদেয় বস্তু। এমন শিল্পদক্ষতার সহিত এই ব্যক্তিকে আঁকা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা রয়টারের রচনাকে ডন কুইক্‌সোটের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকে।

হাস্যকৌতুকের দৃষ্টান্ত দু'এক কথায় দেওয়া সহজ নয়। গল্পগুলার "সারাংশ" প্রকাশ করিলেও মজাদার মালগুলা বাদ পড়িবার সম্ভাবনা। রচনাসমূহেয় "আগাগোড়া তর্জ্জমা" না পাইলে পাঠকেরা লেখকের সৃষ্টিকৌশল উপভোগ করিতে পারিবে না। মার্কিণ লেখক হোম্‌স্, অথবা ফরাসী আনাতল ফ্রাঁস, এমন কি ইংরেজ লেখদের রচনা "সংক্ষিপ্ত চুম্বকে" উপভোগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে ফ্রাইটাগ অথবা রয়টারের রচনা হইতে তর্জ্জমা প্রকাশ করিবার দায়িত্ব নাই। জার্ম্মাণ হাসির সংবাদ দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। হাসির নমুনা দিতে হইলে অনেক কিছু লেখা জরুরি হইবে। দুঃখের কথা তাহার জন্য সময় নাই।

তবে লেখাপড়ার আবহাওয়া-সম্পর্কিত জার্ম্মাণ হাসির একটা নমুনা দিতেছি। ইস্কুলমাষ্টার, অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়, ঐতিহাসিক

গবেষণা, বৈজ্ঞানিক খোঁজ ইত্যাদি বস্তু জার্ম্মাণ-সমাজে চরম সমাদর পাইয়া থাকে। কিন্তু এই সব লইয়াও যে জার্ম্মাণরা জবর হাসিঠাট্টা চালাইতে অভ্যস্ত তাহা হয়ত ভারতে অনেকেরই জানা নাই। পণ্ডিত মহাশয়দের উপর বিদ্রূপ চালাইবার সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া হান্‌স্ হোফমান অমর হইয়া রহিয়াছেন। বইটার নাম "ডাস গিমনাজিয়ুম ৎসু ষ্টোল্‌পেনবুর্গ" (ষ্টাল্‌পেনবুর্গের বিদ্যাপীঠ)। কয়েকটা গল্পের সঙ্কলনে বইখানা গ্রথিত (১৮৯১)। আজকাল আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা চলিতেছে তুমুলভাবে। রামায়ণের কথা, মহাভারতের কথা, মনুসংহিতার কথা, কৌটিল্যের কথা, ভাস-কবির কথা ইত্যাদি নানা কথাই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকটার ভিতরই একটা মজাদার "সমস্যা" আছে। সমস্যার এক আকার নিম্নরূপ:—"বইটা কি একজনের লেখা না অনেক লোকের লেখার সঙ্কলন?" "সমস্যা"কে আর এক আকারে দেখা যায়। সে হইতেছে পাণ্ডুলিপিসংক্রান্ত। প্রশ্ন নিম্নরূপ:—"কোন্ পাণ্ডুলিপিটা খাঁটি? কোন্ পাণ্ডুলিপিটা মেকি? কোন্ পাণ্ডুলিপির ভিতর প্রক্ষিপ্ত অংশ বেশী?"

এই ধরণের প্রত্নতত্ত্ব-চর্চ্চা ইয়োরোপের সকল দেশেই অনেক-কিছু অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীক হোমার-প্লেটো-আরিষ্টটল ইত্যাদি সম্বন্ধে "সমস্যার" আকার-প্রকার আজকালকার ভারত-পরিচিত প্রত্নতত্ত্ব-সমস্যারই অগ্রদূত মাত্র। বলা বাহুল্য, প্রত্নতত্ত্বের এই সকল "সমস্যা"-বিজ্ঞানে জার্ম্মাণরা খুব ওস্তাদ ছিল, এখনও আছে। কাজেই "নিবেলুঙেন-লীড" (নিবেলুঙগাথা) নামক প্রাচীন টীউটনিক বীর-কাহিনী (এক কথায় প্রাচীন জার্ম্মাণ সংস্কৃতি) বিষয়ক প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা যে মসগুল হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই বিষয়ে হাসি-টিট্‌কারি করিবার জন্য হোফমান একটা গল্প

লিখিয়াছেন। গল্পের নাম "হাণ্ডশ্রিফ্‌ট্ আ" (হস্তলিপি ক বা পুঁথি নং ১)। একজন যুবা জার্ম্মাণ ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষক হইবার জন্য পরীক্ষা দিবে। এই পরীক্ষার জন্য দরকার নিবেলুঙ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা। যুবা পুঁথি নং ১ এর তারিফ করে। কিন্তু পুঁথি নং ১ এর বিরুদ্ধে মত পণ্ডিত-সমাজে প্রবল। অবশ্য কোনো কোনো বড় পণ্ডিত নং ১ এর স্বপক্ষেই মত দিয়াছেন। কিন্তু পুঁথি নং ৩ এর স্বপক্ষে কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিতের মত আছে। অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্বের আসরে ষাঁড়ের লড়াই চলিতেছে। এই দুর্ব্বিপাকে ছাত্র বেচারা কি করিবে? ঘটনাচক্রে তাঁহার পরীক্ষক মহাশয় হইতেছেন নং ৩এর স্বপক্ষে। পরীক্ষার ঘরে পরীক্ষক-পরীক্ষার্থীর ঝগড়া আর কথা-কাটাকাটি বিপুল যুদ্ধের আকার ধারণ করিল। যুবাকে পাশ করা হইল না। জার্ম্মাণ ভাষা পড়াইতে দিবার অধিকার তাঁহার জুটিল না। তিনি সুদূর পল্লীর এক প্রাথমিক পাঠশালায় অঙ্ক আর ভূগোল পড়াইবার ক্ষমতা মাত্র পাইলেন! আর তঙ্‌খা যাহা জুটিল তাহাতে বিবাহ করা সম্ভবপর হইল না। প্রত্নতত্ত্বের লড়াইয়ে যুবা প্রথমে হারাইলেন প্রণয়িনীকে তাহার পর হারাইলেন বিজ্ঞানজগতে প্রবেশের অধিকার আর যথোচিত বেতন। এই বিষাদাত্মক ঘটনার বিশ্লেষণ করিয়া হোফমান জার্ম্মাণ পাণ্ডিত্যের আর পণ্ডিত-সংসারের উপর কঠোর চাবুক চালাইয়াছেন।

পণ্ডিত-সংসার সম্বন্ধে টিটকারির নমুনা আর একটা দিতেছি হোফমানেরই গল্প হইতে। একটা বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মহাশয়েরা গ্রীক আর ল্যাটিন সাহিত্যে এত ডুবিয়া রহিয়াছেন যে জার্ম্মাণির ভাষা-সাহিত্যে কি আছে-না-আছে জানিবার-বুঝিবার ফুরসুৎ নাই। প্রাচীন ইয়োরোপের ইতিহাস তাঁহাদের মগজে এমন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে যে, বর্ত্তমান জার্ম্মাণ-সমাজের সুখদুঃখ তাঁহাদের ধ্যান-

ধারণার অতীত। এক কথায় ইস্কুলের সঙ্গে সংসারের যোগ একদম নাই। ছাত্রেরাও মাষ্টার মহাশয়ের আহাম্মুকি দেখিয়া হাসিঠাট্টা করে। তাহাতেও পণ্ডিত-মূর্খদের হুঁস হয় না। ঘটনাচক্রে ১৮৭০ সনে জার্ম্মাণির সঙ্গে ফ্রান্সের লড়াই বাধিল। খবরের কাগজে সংবাদ রটিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকগণ এখনও তাহার খবর রাখে না! বরং একজন অধ্যাপক আসিয়া প্রাচীন গ্রীসের এক যুদ্ধ-ঘোষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা সুরু করিয়া দিলেন। ছাত্রেরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমরা ভারতে অধ্যাপকগুলাকে অনেক সময়েই অকর্ম্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থ বিবেচনা করিয়া থাকি। কিন্তু জার্ম্মাণ লেখকরাও যে জার্ম্মাণির পণ্ডিতগুলাকে মূর্খ ও আহাম্মুক সপ্রমাণ করিবার জন্য বই লিখিয়া লোক হাসাইয়া নামজাদা হইয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে জার্ম্মাণ হাসির আর জার্ম্মাণ সুকুমার শিল্পের একটা অভিনব রূপ দেখিতে পাইব। আর সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাটাও ফুটিয়া উঠিবে যে, অন্যান্য নরনারীর মতন ইস্কুলমাষ্টার, অধ্যাপক, আচার্য্য স্থানীয় লোকেরাও আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতন টোল-মক্তব-চতুষ্পাঠী-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি লেখাপড়ার আবহাওয়াগুলাও হাসিঠাট্টার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আর রং-তামাসার সামগ্রীই বটে। পৃথিবীর কোনো মিঞাই আর কোনো কর্ম্মই হাস্য-কৌতুকের বহির্ভূত বা ঊর্দ্ধস্থায়ী নয়। সর্ব্বত্রই চাই হাসি, আরও হাসি, আবার হাসি।

ঊনবিংশ অধ্যায়*

জার্ম্মাণ দেশে দ্বিতীয় প্রবাস

(১৯২৯ জুলাই—১৯৩১ আগষ্ট)

(১)

প্রঃ—দ্বিতীয়বারকার জার্ম্মাণি ভ্রমণ সম্বন্ধে আপনি কোন বই লিখেছেন কি ?

উঃ—না, এ বিষয়টা একদম বাদ পড়ে গেছে। তবে ইংরেজিতে একটা রোজনামচা গোছের বার করেছি, এটা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স (বঙ্গীয় বণিক্-ভবন) পত্রিকায় বেরিয়েছে, ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে।

প্রঃ—আচ্ছা, এ যাত্রায় জার্ম্মাণির কোন্ কোন্ অঞ্চল দেখা হয়েছে ?

উঃ—দেখা হয়েছে বিস্তর।

প্রঃ—কবে থেকে কবে পর্য্যন্ত ছিলেন ?

উঃ—এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন, কেন না এবারকার ইয়োরোপ-প্রবাসের সময়ও এক সঙ্গে নানা দেশে পর্য্যটন ঘটেছে। কলম্বো হতে সোজা পথে ইতালিতে পৌঁছি, সে ১৯২৯ সনের মে মাসের শেষাশেষি। তারপর কিছুদিন ইতালিতে কাটিয়ে স্বুইটস্যারল্যাণ্ডে যাই ; স্বুইটস্যার-ল্যাণ্ডের পরই যাই ফ্রান্সে। সেখান থেকে যাই বিলেতে, বিলাতে কাটে কিছুদিন। তারপর আসি ফ্রান্সে। ফ্রান্স থেকে যাই জার্ম্মাণি জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। কিছুদিনের জন্য থাকি ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে।

গ্রন্থকারের সহিত "সুবর্ণবণিক সমাচারে"র জন্য কবি হেমেন্দ্র বিজয় সেন এম, এ, বি, এল মহাশয়ের কথোপকথন। ১৯৩৩ সনে প্রকাশিত (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৪০)।

ঐ সঙ্গে আগষ্টের শেষাশেষি পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে কাটানো হয়। তারপর যাই চেকোস্লোভাকিয়ায়, সেখানে কাটে হপ্তা পাঁচেক। তারপরে অষ্ট্রিয়ায়।

সেখান থেকে ফের আসি জার্ম্মাণিতে। এবার অবশ্য দক্ষিণ জার্ম্মাণি, যার প্রধান শহর মিউনিক। এখান থেকে চলে যাই সুইট-স্যারল্যাণ্ড,—জেনীভা শহরে—যেখানে লীগ্ অব্ নেশ্যন্‌সের আড্ডা। জেনীভা সম্বন্ধে আগে বলে দিয়েছি সুইটস্যারল্যাণ্ড বিষয়ক মোলাকাতে। জেনীভাতে কাটে ৩।৪ মাস। তারপর যাই ইতালিতে, সেখানে ছিল মিলান আর পাদভা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ। তারপর যাই অষ্ট্রিয়ায়, এবার অবশ্য ভিয়েনায় নয়, ইন্‌স্‌ব্রুককে। এ হ'ল অষ্ট্রিয়ার টিরোল প্রদেশের বড় শহর,—আল্পস্ পাহাড়ের আব-হাওয়ায় অবস্থিত ইন্-দরিয়ার উপর। তারপর ১৯৩০ সনের মার্চ্চ মাসে গিয়ে হাজির হই মিউনিক শহরে, আর মিউনিকেই আড্ডা গাড়া হয়। ব্যাভেরিয়ার গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণে মিউনিকের টেক্‌ন-লজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টারি করার নকরী পাই।

প্রঃ—এ পদ কত দিনের জন্য ছিল? সেই সময়টা সমস্তই কি আপনি মিউনিক শহরেই কাটিয়েছেন?

উঃ—চাকুরীটা ছিল পুরো এক বছরের জন্য—১৯৩০এর মে হতে ১৯৩১এর এপ্রিল পর্য্যন্ত মেয়াদ। জার্ম্মাণ দেশে অধ্যয়ন-বর্ষকে দুই অর্দ্ধাংশে ভাগ করা হয়। এক এক অর্দ্ধাংশকে সেমেষ্টার (বা বর্ষার্দ্ধ) বলে। অবশ্য পুরো ছয় মাস লাগে না, ছুটি থাকে অনেক। ঐ ছুটির সময় জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যাবার সুযোগ জুটেছিল বিস্তর। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্যে নিমন্ত্রণও পাওয়া গিয়েছিল সেমেষ্টারের ভিতরেই। কাজেই অধ্যয়ন-বর্ষটা একমাত্র মিউনিকে কেটেছে একথা বলা চলে না।

প্রঃ—অধ্যয়ন-বর্ষের ভিতর কোন্ কোন্ জায়গায় পর্য্যটনের সুযোগ জুটেছিল?

উঃ—মনে রাখ্তে হবে মিউনিক জার্ম্মাণির প্রায় দক্ষিণতম অংশে অবস্থিত। মিউনিক থেকে জার্ম্মাণির কোনো অঞ্চলে যাওয়া মানেই প্রধানতঃ উত্তর দিকে যাওয়া। উত্তরতম জায়গার নাম কীল। বার্লিনের পথে প্রায় আধাআধি ঠাঁইয়ে য়েনা অবস্থিত। য়েনার প্রায় আধা পথে ভ্যিরৎসবুর্গ। মিউনিকের পশ্চিম দিকে,—অবশ্য খানিকটা উত্তর-পশ্চিমে—অবস্থিত ষ্টুটগার্ট ও কার্লস্রুহে। এই দুই ঠাঁইয়েও টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে—দু' জায়গায়ই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে' এসেছিলাম। পশ্চিম দিকেই আরো অনেক উত্তরে জোলিঙ্গেন ও বীলেফেল্ড। এই দুই জায়গার বণিক্-ভবন হ'তে নিমন্ত্রণ এসেছিল, কাজেই এই দুই অঞ্চলও দেখা হয়েছে। জোলিঙ্গেন হচ্ছে কোলোন শহরের নিকট। মিউনিকের নিকটে খানিকটা উত্তর-পশ্চিমে ভ্যিৎর্সবুর্গ। এখানে আছে এক বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানেও নিমন্ত্রণ ছিল। মিউনিকের আরো নিকটে আউগ্‌স্‌বুর্গ। আউগ্‌স্‌-বুর্গেও বণিক্ ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা গেছে। বলা দরকার যে, বার্লিনেও নিমন্ত্রণ ছিল এবং সে উপলক্ষে বার্লিনেও যেতে হয়েছিল। তাছাড়া বার্লিনের কাছে লাইপৎসিগ শহর। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা দিতে হয়েছিল।

প্রঃ—মিউনিকের চাকুরীর মেয়াদ ফুরোবার পর আপনি কি জার্ম্মাণিতে আরো কিছুদিন ছিলেন?

উঃ—প্রথমে কিছুদিন কাটাই মিউনিকেই, তারপর গিয়ে বসি বার্লিনে। বার্লিনে থাকবার সময় দু'বার ড্রেস্‌ডেনে যেতে হয়। একবার বক্তৃতার জন্য। ১৯৩১এর এপ্রিলের মাঝামাঝি হ'তে আগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত বার্লিনেই কাটে। তারপর মিউনিকের পথে

ইন্‌স্‌ব্রুক হয়ে সোজা দক্ষিণে চলে আসি ইতালির রোম নগরে। এ হ'ল সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। তখন সেখানে আন্তর্জ্জাতিক লোকবল-পরিষদের কংগ্রেসে অন্যতম সভাপতি হিসাবে যোগ দিতে হয়। তার পরেই অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইতালির জেনোআ বন্দরে ভারতমুখো সওয়ারী।

প্রঃ—আপনি এতগুলো শহরের নাম করলেন আর উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম বল্লেন। সবই আমার কাছে জগা খিঁচুড়ীর মত হয়ে যাচ্ছে। একটু সোজা করে বলুন। জার্ম্মাণির শহরগুলো অন্যান্য দেশের শহরগুলোর কোন্ কোন্ দিকে অবস্থিত? তাছাড়া আপনি এতবার জার্ম্মাণি ছেড়ে বাইরে গেছেন আর বাহির হতে জার্ম্মাণিতে এসেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে জার্ম্মাণ জাতের লেনদেন সম্বন্ধে অনেক জটিল সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

উঃ—ব্যাপারটা কিছু জটিলই বটে। দ্বিতীয়বারকার ইয়োরোপ-প্রবাসের সময় ভবঘুর্‌য়েগিরির চরম করে' ছাড়তে হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে লেনদেনও আবার ছিল খুবই সুবিস্তৃত ও নিবিড়। কাজেই প্রত্যেক দেশে দুতিনবার আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। এই ত গেল এইবারকার কথা। প্রথমবার যখন জার্ম্মাণি যাই তখনও ঘোরাফেরার মাত্রা খুবই ছিল। জার্ম্মাণিতে প্রবেশ করেছিলাম প্যারিস হতে কোলোনের পথে। সে যাত্রায় বার্লিনই ছিল আসল আড্ডা; বাড়ীঘর বল্লে বার্লিনের ডেরাই বুঝতাম। সে যাত্রায় কাটে বছর চারেক। তবে এর ভেতর অষ্ট্রিয়া সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড আর ইতালি—এই তিন দেশে অনেকবার যেতে হয়েছিল আবার ওসব দেশ থেকে ফিরতেও হয়েছিল।

প্রঃ—সে কবেকার কথা মশায়?

উঃ—আজকের হিসেবে সে এক মান্ধাতার আমল। ১৯২১এর

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হতে ১৯২৫এর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কাটিয়েছিলাম,—হয় খোদ জার্ম্মাণিতে না হয় জার্ম্মাণ ভাষার ও সভ্যতার আওতায় সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও উত্তর-ইতালিতে। খোদ জার্ম্মাণিতে বোধ হয় পুরা বছর তিনেক কেটেছিল।

প্রঃ—আচ্ছা তাহলে যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে জার্ম্মাণিতে আপনি কতবার গেছেন, তাহলে কি বল্‌বেন ?

উঃ—গুণে বলা কঠিন, যদি নেহাৎ তামাতুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে না বসি। তবে প্রথমবার চার বছর আর এবারকার ২½ বছর—এই ৬½ বছরের ভিতর কমসে কম বার দশ-বার যাওয়া-আসা করেছি। আর বার্লিন ছাড়া অথবা বার্লিনে যাওয়া যে কতবার ঘটেছে, তা বলা অসাধ্য। দ্বিতীয়বার মিউনিকে আড্ডা ছিল বলে' মিউনিক ছাড়া আর মিউনিকে আসাও প্রায় বার্লিনের মতনই ধরে' নিতে হবে।

প্রঃ—তাহলে জার্ম্মাণির কোনো অঞ্চল অ-দেখা রয়েছে কি?

উঃ—রয়েছে বৈকি ? গোটা পূর্ব্ব অঞ্চল অদেখা রয়েছে।

প্রঃ—পূর্ব্ব অঞ্চলটা কাকে বলে ?

উঃ—বার্লিনের পূব আর ড্রেসডেনের পূব সবই পূর্ব্ব অঞ্চল। বস্তুত এই জনপদের নাম পূর্ব্ব প্রুশিয়া।

প্রঃ—এই জনপদের কোনো বড় শহরের নাম কর্‌তে পারেন ?

উঃ—একটার নাম ব্রেস্‌লাও, এটা ওডার দরিয়ার উপর অবস্থিত। তাছাড়া চরম উত্তর-পূর্ব্বে ক্যোনিগ্‌জ ব্যর্গ শহর অবস্থিত।

প্রঃ—এই জনপদটা কি নেহাৎ ছোট যে মাত্র দুটো শহরের নাম কর্‌ছেন ?

উঃ—ছোট নয়। গোটা জার্ম্মাণির প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। তবে জনপদটা কৃষি-প্রধান আর জমিদার-প্রধান। ওসব অঞ্চলে নাম-জাদা শহর অর্থাৎ শিল্পপ্রধান ফ্যাক্টরীবহুল নগর গুণ্‌তিতে বেশী নয়।

তবে ওঅঞ্চলের আরও দুটো শহরের নাম করে রাখা ভাল। একটির নাম ডান্‌ৎসিগ্‌। এটা হল সমুদ্রবন্দর। আর একটার নাম ফ্রাঙ্কফোর্ট।

প্রঃ—সেকি মশায়? আপনি না ফ্রান্স থেকে ফ্রাঙ্কফোর্টে পঁউছে-ছিলেন? তাহলে ফ্রাঙ্কফোর্ট ত জার্ম্মাণির পশ্চিম কিনারায় হওয়া উচিত।

উঃ—জার্ম্মাণিতে দুটো ফ্রাঙ্কফোর্ট আছে। একটা হ'ল জগদ্বিখ্যাত ফ্রাঙ্কফোর্ট। সেইটাই ফ্রান্সের কাছাকাছি, মাইন দরিয়ার উপর অবস্থিত। আর পূর্ব্ব অঞ্চলের ফ্রাঙ্কফোর্ট হ'ল ওডার দরিয়ার উপর অবস্থিত। এই দরিয়ার উপরই ব্রেসলাও। তবে ব্রেসলাওএর উত্তরে ফ্রাঙ্কফোর্ট বার্লিনের নিকটবর্ত্তী, অবশ্য পূর্ব্বদিকে। যে মাইন দরিয়ার উপর পশ্চিম ফ্রাঙ্কফোর্ট অবস্থিত সে দরিয়া রাইন নদীতে গিয়ে পড়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা আপনি আবার অষ্ট্রিয়া আর সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের নাম করছেন কেন?

উঃ—কারণ অতি সোজা। জার্ম্মাণির দক্ষিণেই এই দুটা দেশ।

প্রঃ—অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণির ঠিক দক্ষিণে?

উঃ—অষ্ট্রিয়ার টিরোল প্রদেশ জার্ম্মাণির ডাহা দক্ষিণ। কাজেই ইন্‌স্‌ব্রুকের খাড়া উত্তর মিউনিক। আসল কথা, ইতালি হতে জার্ম্মাণি যাবার সোজা পথ হ'ল "ভেরোণা-বল্‌ৎসান-ইন্‌স্‌ব্রুক-মিউনিক-বার্লিন। এই জন্যই অষ্ট্রিয়ার নাম জার্ম্মাণি-যাত্রীর কাছে সর্ব্বদাই কাজে লাগে। এদিকে টিরোলের পশ্চিমে সুইটস্যারল্যাণ্ড। আর এদেশের বড় শহর জুরিখ হ'তে অনেকে আবার সোজা উত্তরে জার্ম্মাণির ষ্টুট্‌গার্ট ইত্যাদি শহরে যায়। জুরিখের খাড়া দক্ষিণ হ'ল উত্তর ইতালির মিলান সহর। ঘটনাচক্রে অষ্ট্রিয়ায়ও জার্ম্মাণ ভাষা আর সুইটস্যারল্যাণ্ডের যে অঞ্চলে জুরিখ অবস্থিত, সে অঞ্চলেরও ভাষা জার্ম্মাণ। ফলতঃ, জার্ম্মাণ নরনারী ষ্টুটগার্ট হতে সোজা দক্ষিণ যদি সুইটস্যারল্যাণ্ডে আসে আর মিউনিক

হ'তে সোজা দক্ষিণ ইন্‌স্‌ব্রুককে যায় তা হ'লে তারা ভাষার তরফ হতে বাস্তবিকই জার্ম্মাণি-ছাড়া হয় না। রাষ্ট্রনৈতিক কথা ছেড়ে দিলে এই দুই দেশকে অনেকাংশে "বৃহত্তর জার্ম্মাণি"র অংশবিশেষ বিবেচনা করা সম্ভব। অবশ্য কোনো অষ্ট্রিয়ানকে অথবা সুইসকে,এ ধরণের কথা বল্‌লে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" ভোগ করতে হবে।

প্রঃ—আচ্ছা, সহজে জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলগুলাকে বুঝবার জন্য কিরূপ-প্রদেশ-বিভাগ করলে সুবিধা হয়?

উঃ—প্রথমতঃ, উত্তর জার্ম্মাণি আর দক্ষিণ জার্ম্মাণি এরূপ ভাগ করলেই বোধ হয় বুঝতে কিছু সোজা হয়। উত্তর জার্ম্মাণির সহজ নাম প্রুশিয়া। ইহার ভিতর গোটা রাইন জনপদও পড়ে, যার বড় শহর কোলোন। দক্ষিণ জার্ম্মাণি বলতে প্রধানতঃ ব্যাভেরিয়া, যার বড় শহর মিউনিক, আর একটা বড় শহর ন্যিরণব্যর্গ। তৃতীয় বড় শহরেরও নাম উল্লেখ করেছি আউগ্‌সবুর্গ। ব্যাভেরিয়ার পশ্চিম জনপদের নাম ভির্টেমব্যার্গ। যার বড় শহর ষ্টুটগার্ট। উত্তর আর দক্ষিণ জার্ম্মাণির মাঝামাঝি দুই জনপদ। এই দু'য়ের ভিতর স্যাক্‌সনি দেশবিদেশে নামজাদা। তার বড় শহর ড্রেসডেন্‌ ও লাইপৎসিগ। অপর জনপদের নাম টুরিঙ্গিয়া। তার এক প্রসিদ্ধ শহর য়েনা, যার লাগাও ভাইমার। এই দুই শহর মহাকবি গ্যেটের জীবনবৃত্তান্তে জগদ্বিখ্যাত।

প্রঃ—আচ্ছা মশায় জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বা জেলাগুলার সঙ্গে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বা বাংলা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার তুলনা করলে কিরূপ দেখা যায়?

উঃ—প্রুশিয়া আর ব্যাভেরিয়া একত্র করলে যতটা দাঁড়ায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী তার চেয়ে কিছু ছোট। প্রুশিয়াকে একলা ধরলে বম্বে প্রেসিডেন্সী কিছু বড় আর আমাদের যুক্তপ্রদেশ কিছু ছোট। আর

আমাদের বাংলা দেশ জার্ম্মাণির প্রুশিয়া বাদ দিলে যেটুকু থাকে তার চেয়ে কিছু বড়।

প্রঃ—প্রুশিয়া বাদ দিলে জার্ম্মাণির থাকে কতটুকু ?

উঃ—প্রুশিয়ার প্রায় ⅓ অংশ ব্যাভেরিয়া। প্রুশিয়া গোটা জার্ম্মাণিতে দশ আনার চেয়েও বেশী হিস্যা অধিকার করে। বাংলা দেশ আয়তনে জার্ম্মাণির ৬ আনা মাত্র অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও কম।

প্রঃ—আচ্ছা জার্ম্মাণির লোকসংখ্যা কত ?

উঃ—৬ কোটি ৩২ লাখ। আমাদের বাংলা দেশে ৫ কোটি ১০ লাখ ১৯৩০এর লোক-গণনা অনুসারে। অতএব কম আয়তনে বেশী লোক বাস করে বাংলা দেশে। বাংলা দেশে এক বর্গ মাইলে লোক বাস করে শ ছয়েক, জার্ম্মাণিতে ৩৩০ মাত্র। বাংলা দেশের চেয়ে ঘন বস্তিওয়ালা দেশ ইয়োরোপে প্রথমতঃ বেলজিয়াম, আর তারই লাগালাগি ইংল্যণ্ড ও ওয়েলস্।

প্রঃ—আচ্ছা জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দু' একটা বিশেষত্বের কথা বলুন, যা দেখে অঞ্চলটাকে সহজে মনে রাখতে পারি।

প্রঃ—এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া তত সহজ নয়। পূর্ব্ব অঞ্চলটাকে মোটামুটি কৃষিপ্রধান ধরে' নিয়েছি। ঠিক তারই দোসর বলা যেতে পারে ব্যাভেরিয়াকে। তবে এই অঞ্চলেও বড় বড় শিল্প-নগর আছে। বস্তুতঃ জার্ম্মাণির অন্যতম জগৎপ্রসিদ্ধ যন্ত্রকারখানার কেন্দ্র এম্-আ-এন, ব্যাভেরিয়ার আউগ্সবুর্গ আর ন্যুরনবার্গ শহরেই অবস্থিত। পূর্ব্ব অঞ্চল আর দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যাভেরিয়াটুকু ছেড়ে দিলে জার্ম্মাণির যতটুকু বাকি থাকে সবই শিল্পকেন্দ্র। তার ভিতরও আবার উনিশবিশ করা সম্ভব, যদিও খুবই কঠিন।

প্রঃ—করুন না চেষ্টা।

উঃ—আচ্ছা তাহলে প্রুশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলটার কথা বলি প্রথমে।

তা হচ্ছে নামজাদা রুর প্রদেশ। লোহালক্কড়ের কারখানায় ইহা জগৎ-প্রসিদ্ধ। রুর অঞ্চলটা রাইন জনপদেরই বিস্তার বিশেষ। রাইন জনপদটা আগাগোড়াই শিল্পপ্রধান,—বিশেষত কোলোনের লাগালাগি জনপদ আর ফ্রাঙ্কফোর্টের লাগালাগি জনপদ। রুর আর রাইন—দুইই প্রুশিয়ার অন্তর্গত। প্রুশিয়া ছেড়ে শিল্প-জনপদ ঢুঁড়তে হলে প্রথমেই নজরে পড়বে স্যাক্সনি প্রদেশ। তার লাগাও টুরিঙ্গিয়া প্রদেশও আগাগোড়া শিল্পপল্লীতে ভরা। এই গেল মধ্যজার্ম্মাণির কথা। দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে পশ্চিম দিক্‌কার ভির্টেমব্যর্গ আর একটা রাইন্‌-রুর-টুরিঙ্গিয়া বিশেষ।

প্রঃ—তাহলে শিল্প ছাড়া মুল্লুক জার্ম্মাণিতে কি নাই?

উঃ—আগেই বলেছি, পূর্ব্ব জনপদ আর ব্যাভেরিয়া কৃষিপ্রধান। তা সত্ত্বেও এই দুই অঞ্চলেও ছোট-বড় মাঝারি চিমনির ধোঁয়া যেখানে-সেখানে উড়ে থাকে। কাজেই আপনার জবাবে বলতে বাধ্য যে, জার্ম্মাণি দেশটা আগাগোড়াই ফ্যাক্টরী-প্রধান। এর জুড়িদার ইয়োরোপে হচ্ছে—বিলাত, বড় দেশগুলার ভিতর। আর ছোট দেশগুলার ভিতর এর জুড়িদার বেলজিয়াম। সুইটস্যারল্যাণ্ডকে আর অষ্ট্রিয়াকেও কিছু জার্ম্মাণ গোত্রে ফেলতে পারি। ফ্রান্স বেশ-কিছু পশ্চাতে, ইতালি ত অনেক পেছনে বটেই।

(২)

প্রঃ—আচ্ছা, জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন শহর থেকে আপনাকে যখন ডেকে নিয়ে যেত, তখন সাধারণতঃ সেখানে আপনি কতদিন থাকতেন, আর কি রকম ভাবে দিন কাট্‌ত?

উঃ—এক কথায় জবাব দেওয়া কঠিন, কেননা, নানা জায়গায় নানা সোআদ। তা ছাড়া নিমন্ত্রণের সর্ত্তও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

প্রঃ—একটা জনপদের কথা বলুন, যার সম্বন্ধে আমরা ভারতে তত বেশী খবর রাখি না। বেশ ত, ষ্টুটগার্টের সম্বন্ধেই কিছু বলুন না কেন?

উঃ—এ শহরটা শ্বোআর্ট্স্ভাল্ড জনপদের,—ইংরেজিতে যাকে বলে ব্ল্যাক ফরেষ্ট আমি যাকে বলি "কৃষ্ণবন", সেই অঞ্চলের ভারী শহর। আর বাস্তবিক জার্ম্মাণির বড় বড় নামজাদা শহরগুলার এটা অন্যতম। এইখানে আমার ডাক পড়ে ১৯৩০ সনের নভেম্বর মাসে। ছিলাম সেখানে মাত্র সাড়ে তিন বা চার দিন। এ কয়দিনের রোজনামচা দিলেই খানিকটা বুঝতে পারা যাবে, ওখানে আমাকে কি রকম ধরণের কাজ করতে হয়েছে আর ওখানকার আবহাওয়ায় মোটের উপর কোন্ ঢঙের কথাবার্ত্তা বা কাজকর্ম্ম বেশী মানান্সই।

প্রঃ—আচ্ছা এক কাজ করুন না, আপনি ওখানে পৌছে অবধি ছাড়া পর্য্যন্ত দিনের পর দিন যা কিছু করেছেন, তার একটা তালিকা দিয়ে যান, তাহলেই বুঝে নেব কত ধানে কত চাল।

উঃ—বেশ তাই করা যাক। সাড়ে তিন বা চার দিনে আমাকে মোটের উপর ১৬ দফা মোটা মোটা কাজে বা কথাবার্ত্তায় যোগ দিতে হয়েছে।

(১) ১৪ই নভেম্বর

ভূগোল-বিদ্যার অধ্যাপক ভুন্ডার্লিখএর সঙ্গে ভ্যির্টেম্ব্যর্গ জনপদের ফ্যাক্টরী, কলকারখানা ও শিল্পকেন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা। ভ্যির্টেম্ব্যর্গ একটা রাষ্ট্র বা প্রদেশ, ঠিক যেমন প্রুশিয়া, ব্যাভেরিয়া ইত্যাদি। এই রাষ্ট্রেরই নামজাদা শহর ষ্টুটগার্ট।

(২) ১৪ই নভেম্বর

টেখনিশে হোখশুলে বা টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্ব্বজনিক বক্তৃতা। এই বক্তৃতার জন্যই রাহা খরচ পেয়ে এই শহরে এসেছি।

বক্তৃতার বিষয় ছিল "বর্ত্তমান ভারতের ক্রমবিকাশ আর বিশ্বদৌলতে তাহার ইজ্জৎ"। এই বক্তৃতায় তুলনামূলক শিল্পনিষ্ঠার "ইকুয়েশন" বা সাম্য-সম্বন্ধগুলা সর্ব্বপ্রথম খোলা বাজারে প্রচার করবার সুযোগ পাই।

(৩) ১৪ই নভেম্বর

বক্তৃতার পর "ডয়েচে আকাডেমী" বা জার্ম্মাণ পরিষদ্ প্রতিষ্ঠানের ষ্টুটগার্ট-শাখার একটা সভায় যোগদান। সেই সভার স্থানীয় সভ্যদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা। টেকনলজি, চিকিৎসা-বিজ্ঞান আর অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ভ্যির্টেম্বার্গ প্রদেশে বৃত্তি অথবা বিনা খরচে বসবাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সম্ভবপর কিনা, সেই বিষয়ে আলোচনাই ছিল প্রথম কথা। এই আলোচনার পর ভারতীয় ছাত্রদের জন্য দু' একটি সুব্যবস্থা হতে পেরেছে।

(৪) ১৪ই নভেম্বর

এখানকার বণিক্-সভার বড় কর্ত্তা ডক্টর ক্লীনএর সঙ্গে কথোপকথন। শিক্ষা-সচিবের দপ্তরের একজন বড় কর্ম্মচারী ডক্টর বাওয়ার এই আলোচনায় যোগ দেন। সঙ্গে ছিলেন মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বা যন্ত্রবিদ্যার অধ্যাপক গ্রাম্মেল। সংস্কৃতের অধ্যাপক হওয়ারও উপস্থিত ছিলেন। ভুন্ডার্লিখও ছিলেন; আর ছিলেন জার্ম্মাণির একজন ভূতপূর্ব্ব কন্সাল, নাম তাঁর ষ্ট্রাউস্। তিনি নিজে একজন বড় বেপারী। এঁদের সঙ্গে আলোচনার প্রধান কথা ছিল ভারতে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা বিষয়ক ইস্কুল-কলেজ।

এই যে চার দফা কাজের ফিরিস্তি দেওয়া হ'ল এতে সময় কেটেছিল সন্ধ্যা ৫টা হ'তে রাত ১২টা পর্য্যন্ত। ট্রেন থেকে নেমেছিলাম বিকাল ৫টার সময়। বক্তৃতা ছিল সন্ধ্যা আটটার সময়।

(৫) ১৫ই নভেম্বর

"ডয়েচেস্ আউস্‌লাণ্ড ইনষ্টিটুট্" অর্থাৎ "প্রবাসী-জার্ম্মাণ পরিষৎ"

পরিদর্শন। ইহার সেক্রেটারীর নাম মোশাক, তাঁহার সঙ্গে সকল বিষয়ে আলোচনা। দুনিয়ার যেখানে যেখানে জার্ম্মাণ নরনারী স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে বসবাস করে, তাহাদের আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ রাখা এই ইনষ্টিটুট্ বা পরিষদের উদ্দেশ্য।

(৬) ১৫ই নভেম্বর

শহরের অনতিদূরে অবস্থিত সালামাণ্ডার জুতার কারখানা। এইটা দেখে আসা গেল। কারখানাটা জার্ম্মাণির অন্যতম বৃহৎ জুতার কারবার। ইয়োরোপে ইহার নাম-ডাক খুব বেশী।

(৭) ১৫ই নভেম্বর

ভুন্‌ডার্লিখের বাড়ীতে আলোচনা। ইতালি ও বল্‌কান জনপদের বিভিন্ন দেশে আধুনিক শিল্প-কারখানার প্রসার কেমন বেড়েছে—ইহাই ছিল আলোচনার মুদ্দা।

(৮) ১৫ই নভেম্বর

শহরের একজন হেডমাষ্টার ডক্টর অ্যার্ণষ্টএর সঙ্গে ভ্যির্টেম্বার্গ প্রদেশের মাধ্যমিক ও শিল্পবিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পরিচালনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা।

(৯) ১৬ই নভেম্বর

"ফারাইন ডয়চার ইঞ্জেনিঅরে" নামক জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার পরিষদের স্থানীয় শাখার সম্মেলনে যোগদান। পরিষদের বড় আফিস বার্লিনে অবস্থিত। বার্লিন হতে ডিরেক্টর এসেছেন—নাম অধ্যাপক মাচ্‌স। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেক দিনকার—সেই ১৯২১-২২এর যুগ হতেই এঁকে আমি বেশ ভাল রকম জানি। ইনি সম্প্রতি আমেরিকা, জাপান আর চীন বেড়িয়ে দেশে ফিরেছেন। ইনি এই সকল দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন।

(১০) ১৬ই নভেম্বর

কয়েকজন কারখানার মালিক ও যন্ত্রবীর-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। কাগজের কলের ওস্তাদ শয়ফেল্‌ন্‌, আর বাস্তুশিল্পী ষ্টক্কার এঁদের মধ্যে ছিলেন। দুনিয়ার যন্ত্রপাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় সুপণ্ডিত ডক্টর মেম্‌কের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তা ছাড়া উড়ো-জাহাজ-বিষয়ক এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার অধ্যাপক মাডেলুঙ্, ইনিও কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়েছিলেন। কথা চল্‌ছিল একালের শিল্প-প্রবীণ দেশগুলার সঙ্গে শিল্প-নাবালক দেশগুলার লেনদেন কোন্ প্রণালীতে কোন্ দিকে চলেছে এই বিষয়ে।

(১১) ১৬ই নভেম্বর

অধ্যাপক মাচ্চসএর সঙ্গে পল্লী-পর্য্যটন। অটোমোবিলে গোটা শ'য়েক মাইল ঘোরা গেল। সঙ্গে ছিলেন গোটা পঞ্চাশেক এঞ্জিনিয়ার। লুড্‌ইগ্‌স্‌বুর্গ অঞ্চলে একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র আছে। এখানে জার্ম্মাণির এক প্রান্ত হতে বিজলী আমদানি করে' তাকে বাড়িয়ে অন্য অঞ্চলের দিকে রপ্তানি করা হয়। এই কারবারের যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে দেবার জন্য বাহাল ছিলেন ব্যিগেল্‌ন্।

(১২। ১৬ই নভেম্বর

একালের রুশিয়ায় যন্ত্রপাতির প্রসার কতখানি বেড়েছে, এই বিষয়ে মাচ্চসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা। মাচ্চস্ রুশিয়ায়ও ছিলেন।

(১৩) ১৭ই নভেম্বর

ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার ও ধনকুবের ভ্যার্ঠাইমারএর সঙ্গে মোলাকাৎ। বলে' রাখা ভাল ইনি ধর্ম্মে ইহুদি।

(১৪) ১৭ই নভেম্বর

কন্‌সাল ষ্ট্রাউসের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে মোলাকাৎ। ইনিও ইহুদি।

(১৫) ১৭ই নভেম্বর

"আলিয়ান্‌ৎস উণ্ড ষ্টুটগার্টার" নামক জগদ্বিখ্যাত বীমা-কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র পরিদর্শন। ডিরেক্টর লাইনফষ্ট ছিলেন প্রদর্শক।

(১৬) ১৭ই নভেম্বর

বাণক্‌-ভবন (চেম্বার অব্ কমার্স) পরিদর্শন। প্রেসিডেণ্ট ক্লীনএর সঙ্গে মোলাকাৎ। জার্ম্মাণির ধনদৌলতে ভ্যির্টেম্ব্যর্গ প্রদেশের ঠাঁই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা।

প্রঃ—এতগুলো কাজ আপনি চার দিনের ভেতর সারতে হয়রান্ হয়ে পড়েন নি? আর এসবের ব্যবস্থাই বা এক্য়দিনের ভেতর ঘটে' উঠ্‌ল কি করে'?

উঃ—চারদিন ত নামে। আসল হল ১৪ই নভেম্বর বিকাল ৫টার সময় ষ্টুটগার্টে পৌছুলাম (মিউনিক হতে)। আর ১৭ই নভেম্বর সকাল বেলা ১০।১১টায় ষ্টুটগার্ট ছেড়ে মিউনিক রওনা হলাম। কাজেই ষ্টুটগার্টে কেটেছিল মাত্র আড়াই দিন। ব্যবস্থাটা ক'রে রাখা হয়েছিল সবই ষ্টুটগার্টের টেকনলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হ'তে। আমি কেবল মিউনিক থেকে এখানে গিয়ে ওঁদেরকে রাজী করে' দিয়েছিলাম মাত্র।

প্রঃ—কিন্তু ওরা বুঝলে কি করে এই অতিথির মেজাজ কোন্ ঢঙের হবে?

উঃ—কোনো লোক নেমন্তন্ন করলেই আমি আগে ঠোঁট-কাটার মত তাঁদেরকে জানিয়ে দি আমার আঁচ কোন্ ধরণের। তাই দেখে তাঁরা আমার জন্য দিনক্ষণ লোকজন ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করে' রাখেন। তারপর আমি যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে' তালিকা দেখে' আমার মতলব মাফিক দেখাশুনা ও মোলাকাৎগুলা বেছে নি। এরূপ বাছাই-কাজের পরও অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত হয়ত হাড়-মাসের সইবার ক্ষমতা আর সাময়িক মর্জির উপর গতিবিধি, কথাবার্ত্তা আর দেখাশোনা নির্ভর করে।

প্রঃ—যাওয়া-আসার খরচ, থাকার খরচ ইত্যাদি কে দিলে ?

উঃ—আর কে ? গৌরী সেন। পৌঁছুবা মাত্র দেখি হোটেল রয়েছে ঠিক, ঘর রিজার্ভ মায় মোটরও অনেকটা তাঁবে।

প্রঃ—আচ্ছা বেশ, ঘরভাড়া, খাই খরচ ইত্যাদি দেয় কে ?

উঃ—আগেই বলেছি গৌরী সেন। আসল কথা, সকাল বিকেল রাত কোন সময়ই হোটেলে খাবার দরকার পড়ে নি। সবকটা খাবার ব্যবস্থাই ছিল লোকজনের বাড়ীতে। আর খানাপিনার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা কিছু পরে আলোচনা, তর্কাতর্কি, হাতাহাতি আর পাঞ্জা-কষাকষি !

প্রঃ—তাহলে "ডয়চে আকাডেমী"র সঙ্গে আপনার এ সব দেখাশুনার আর বলা-কওয়ার কিরূপ সম্বন্ধ ?

উঃ—বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণগুলা কোনো সময় আসৃত খোদ আমার নিকট, কোনো সময় যেত "ডয়চে আকাডেমী" বা জার্ম্মাণ পরিষদের নিকট। কোনো কোনো সময় ডয়চে আকাডেমী নিজেই জার্ম্মাণির বিভিন্ন কেন্দ্রে লিখে' নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে' রাখত্। খরচপত্রের জন্য ডয়চে আকাডেমী দায়ী থাক্‌ত না, দায়ী হত তারা, যারা নিমন্ত্রণ কর্‌ত। অনেক সময়ই যথাস্থানে পৌঁছে দেখি একটা মোটরকারও আমার জন্য রিজার্ভ করা আছে। আর যাওয়া-খাওয়ার, দেখাশোনার, বক্তৃতার, কথোপকথনের প্রোগ্রামও দস্তুর মতন তৈয়ার থাকত। আমার ব্যবসা ছিল একমাত্র নিজের মেজাজ মাফিক আর ক্ষমতামাফিক শহরগুলোকে বা জনপদগুলোকে যুবক বাঙলার জন্য লুটে' আনা। জার্ম্মাণরা আমার কাছ থেকে নিজেদের জন্য বেশী নিতে পেরেছে, কি আমি আমার দেশের জন্য জার্ম্মাণদেরকে বেশী দুয়ে নিতে পেরেছি সম্প্রতি এর হিসেব করে' দরকার নেই।

প্রঃ—যারা আপনাকে নিমন্ত্রণ করত, তারা ছাড়া ঐ সকল শহরের অন্যান্য লোকেরা দেখা করবার বা কথা বলার সুযোগ পেত কি ?

উঃ—আলবৎ পেত, খুব বেশীই পেত, এত পেত যে, অনেক সময় 'ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি' বলবার অবস্থা এসে দাঁড়াত। পৌঁছেই দেখি শহরের সবকটি কাগজে—ছোট বড় মাঝারি—আর তা ছাড়া সকল প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক দলের মুখপত্রেই,—এই অধম বঙ্গ-চন্দ্রের নাম ধাম কাজকর্ম্ম প্রকাশিত হয়ে রয়েছে। তারপর যাঁহা বক্তৃতা দেওয়া হল, তাঁহা এক সঙ্গে সবকটা কাগজে বক্তৃতার লম্বা লম্বা সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ। কোনো সময় দুকলম আড়াই কলম পর্য্যন্ত বক্তৃতার রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। আর বক্তাটার ফটোগ্রাফ বা গোবরগ্রাফও শহরের প্রায় সবকটা কাগজেই একটা আঁচড় মেরেছে! কাজেই টেলিফোনে মোলাকাতের বন্দোবস্ত, হোটেলের বৈঠকখানায় লোকজনের ধরণা দিয়ে বসে' থাকা আর সভাস্থলে অথবা পর্য্যটন-কেন্দ্রে কিম্বা কারখানাদি পরিদর্শনের সময় করমর্দ্দনের হুড়োহুড়ি তো জবর রকমেই হত। ছোঁড়াছুঁড়ীদের নোট-বহিতে নাম সইএর হাঙ্গামাও পোহাতে হত বিস্তর।

প্রঃ—কি আশ্চর্য্য, আপনি একটুকুও ষ্টুটগার্টের থিয়েটার-সিনেমা, নাচগান, চিত্রকলা প্রভৃতির বিষয় বললেন না?

উঃ—আসল কথা, অর্থনৈতিক কাজকর্ম্ম বা চিন্তাধারা ছাড়া অন্য কোনো বিষয় আমি ডায়েরীতে গুঁজতে চেষ্টা করি নি। এমন কি যেখানে একমাত্র সামাজিকভাবে খাওয়া, গান-বাজনা শোনা ইত্যাদি ঘটেছে তার উল্লেখও আমার এবারকার ইংরেজি জার্ম্মাণ-প্রবাস বৃত্তান্তে ঠাঁই পায় নি।

বিংশ অধ্যায়

জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞান-পরিষদের ধরণ-ধারণ*

প্রঃ—আচ্ছা, একবার উত্তুরে্যে জার্ম্মাণির কথা বলুন।

উঃ—বেশ, জার্ম্মাণির উত্তরতম জনপদও আমার জানা আছে; সে হামবুর্গ্ বন্দরেরও উত্তরে। শহরটার নাম কীল। হামবুর্গের মতই কীলও একটা বন্দর। মিউনিক যেমন জার্ম্মাণির ডাঁহা দক্ষিণ, কীল তেমন ডাঁহা উত্তর।

প্রঃ—সেখানে কি গিয়েছিলেন শুধু বেড়াতে আর সমুদ্রের হাওয়া খেতে?

উঃ—বেড়ানো আর সমুদ্রের হাওয়া খাওয়া এ হাড়ে বেশী ঘটে নি, আর কীলে ত ঘটনাচক্রে একদম নয়ই!

প্রঃ—কেন? কীলের উপর এত আক্রোশ কেন, ওরা কি খুব কিলিয়ে দিয়েছিল নাকি?

উঃ—হাঁ, প্রায় একরকম তাই। ছিলাম মাত্র দু'দিন কিন্তু এই দু'দিনে কাজ ছিল প্রায় দশ দফা আর তা ছাড়া ওখানকার লোকেরা আমাকে দুয়ে নিয়েছিল খুব জবরভাবে। একদম হয়রাণ পরেষাণ করে ছেড়েছিল।

প্রঃ—কেন কিছু খেতে পরতে দেয় নি নাকি?

উঃ—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী ছিল না। খোদ "রাজবাড়ী"তে বাস আর দক্ষিণাও পাওয়া গিয়েছিল বেশ-কিছু অতিরিক্ত হারেই। অন্যান্য শহরে সাধারণতঃ যা পাওয়া যেত, এখানে জুটেছিল তার প্রায় ডবলেরও কিছু বেশী মনে পড়্ছে।

---

* "সুবর্ণবণিক সমাচার" ও "আর্থিক উন্নতি"র জন্য কবি হেমেন্দ্রবিজয় সেনের সহিত গ্রন্থকারের কথোপকথন।

প্রঃ—"রাজবাড়ী" পেলেন কোথায় ?

উঃ—কীলই হচ্ছে সেই বন্দর যেখানকার 'সাগরকুলে বসিয়া বিরলে' সেকালের কাইজার বাহাদুর বাল্‌টিকের লহরমালা দেখতেন। এইখানেই ছিল বাদসাহী আমলের সাগর-পরিষদ্ আর পারিষদ্‌বর্গের ক্লাব। সেই ক্লাবটাই একালে কালচক্রে জার্ম্মাণির জগদ্বিখ্যাত ধনবিজ্ঞান-পরিষদের আড্ডা।

প্রঃ—আচ্ছা এ আড্ডায় কি রকমভাবে দিন কাট্‌ল তার কিছু খবর দিন।

উঃ—১৯৩০ সনের মে মাসের মাঝামাঝি কীলে আমার ডাক পড়েছিল। ছিলাম মাত্র দু'দিন ১৬ই আর ১৭ই। ওখানকার রাজস্ব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্লেক আমাকে দেখা-শুনা করার জন্য বাহাল ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রথমেই জার্ম্মাণির খাজাঞ্চিখানা এবং সরকারী আয়ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে আলাপ হল।

প্রঃ—আপনি এখানে "অধ্যাপক" পেলেন কোথায় ?

উঃ—কীলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধন-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের একটা ইন্‌ষ্টিটুট্ বা পরিষৎ আছে। সেই পরিষদেরই তদ্বিরে আমার এখানে আসা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা।

প্রঃ—প্রথম দিনই আর কি কি হল ?

উঃ—পরিষদের অধ্যাপকেরা ধনবিজ্ঞানবিষয়ক একটা ত্রৈমাসিক বার করেন। নাম তার "ভেল্‌ট্‌-ভির্ট্‌-শাফট্‌লিখেস্ আর্খিফ্" অর্থাৎ "বিশ্বদৌলত-গ্রন্থাগার",—সে এক ঢাউস পত্রিকা। তিনি এক লাইব্রেরীই বটে—পত্রিকাটার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কায়েম হয় ১৯২১ সনে প্রথমবার যখন জার্ম্মাণিতে ছিলাম। সে যাত্রায় হাম্বুর্গ, কীল বা উত্তুরে জার্ম্মাণির কোনো অঞ্চলে যাওয়া হয় নি। জার্ম্মাণির অন্যান্য দিকে গিয়েছিলাম বটে। তবে বার্লিনেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর অন্যান্য

বিজ্ঞান-পরিষদে বক্তৃতা ছাড়া আর কোথায়ও বক্তৃতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি। যাহোক্ কীলের সঙ্গে আত্মিক যোগ সেই সুযোগেই কায়েম হয়। ঐ পত্রিকাকেই বগলদাবা করে' ফিরে আসি ভারতে ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত "আর্খিফ"টা আমার চিরসহচর। আজকাল ইনি আমাদের বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের আর "আর্থিক উন্নতি" মাসিক পত্রিকার রসদ যোগাচ্ছেন। বিশ্বদৌলত-গবেষক হার্ম্ম্স্ ইহার সম্পাদক।

প্রঃ—আচ্ছা এই পত্রিকার সম্পাদন সম্বন্ধে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা আছে?

উঃ—তাই ত বল্‌তে যাচ্ছিলাম। অধ্যাপক ফ্লেকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময় টেলিফোন এল,—সম্পাদকীয় কামরায় আমার জন্য লোকেরা প্রস্তুত। গেলাম। গিয়ে দেখি, ডক্টর বেন্‌টে কাগজপত্রের পাণ্ডুলিপি, প্রুফের তাড়া ইত্যাদি নিয়ে বসে আছে। দেখ্‌ছি কোনো লেখা এসেছে রুশিয়া হতে, কোনোটা আমেরিকা হতে; লেখকেরা কেহ ইংরেজ, কেহ ফরাসী, কেহ ইতালিয়ান আর অবশ্য অধিকাংশ জার্ম্মাণ ত বটেই। কাগজ-সম্পাদন একটা কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। বাঙালীকে এবিষয়ে নেহাৎ আনাড়ি বিবেচনা করা চল্‌বে না। তবে বেন্‌টের তদ্‌বিরে বিশ্বজোড়া আলোচনা চলেছে আর অসংখ্য বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা ছাপা হচ্ছে। কাজেই দায়িত্ব বিপুল।

প্রঃ—কাগজ ছাপা হয় কোথায়? প্রকাশের কি ব্যবস্থা?

উঃ—ছাপা হয় য়েনা শহরে, প্রকাশিতও হয় সেখানে। প্রকাশক দুনিয়ায় নামজাদা। কোম্পানীটার নাম গুষ্টাফ ফিশার। বাস্তবিক এটা কোম্পানী নয়। ফিশার নিজেই কারবারটা চালিয়ে থাকে। সম্পাদকের দায়িত্ব পাণ্ডুলিপিটা য়েনায় পাঠিয়ে দেওয়া। আর যা কিছু দেনা-পাওনা, হিসাবপত্র, সবই ফিশারের ঘাড়ে। বেন্‌টে আমার নিকট

মাঝে মাঝে বই পাঠিয়েছে সমালোচনার জন্যে। প্রবন্ধ আমি পাঠিয়েছি এঁর কাছে, পয়সা পাওয়া গেছে ফিশারের কাছ থেকে।

প্রঃ—আপনি লিখতেন কোন্ ভাষায় ?

উঃ—বলা বাহুল্য জার্ম্মাণে। বেন্‌টে আমার সঙ্গে দেখা মাত্রই বল্‌লেন যে, প্রধান সম্পাদক, অধ্যাপক হার্ম্‌স্, কদিন হল সরকারী কাজে বার্লিন গেছেন, তবে অন্যান্য আর সবাই এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের সঙ্গে সকল প্রকার আলোচনার ব্যবস্থাও ঠিক আছে। ওখানে এদিক্ ওদিক্ দেখাশুনা চল্‌ছে এমন সময় টেলিফোন এল্ "আর্খিফ্" হতে। যেতে হবে আমাকে সেখানে।

প্রঃ—"আর্খিফ্" কি মশায় ? আগে ত বুঝলাম "আর্খিফ্" একটা পত্রিকার নাম। এখন ত যেরকম মনে হচ্ছে, এ একটা ঘরবাড়ী বা আফিস বিশেষ, ঠিক যেন সম্পাদকীয় কামরা।

উঃ—আর্খিফ্ ইংরেজী আর্চ্চিভ্ অর্থাৎ সরকারী দলিল-পত্রের সংগ্রহালয়। যাওয়া গেল আর্খিফে,—দেখতে এটা কি জানোয়ার। আর্খিফের অধ্যক্ষ ডক্টর লোট্‌শ্। জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "আগে আপনি আর্খিফ-জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান দেখেছেন কি ?" বল্লাম, "দেখেছি বটে, তবে কোনো একটা 'বিজ্ঞান-পরিষদের সম্পর্কে আর্খিফ্ কেমন ভাবে চলে' তার ধারণা আমার নাই। আমেরিকায়, ফ্রান্সে অথবা বিলাতে এরকম ধরণের কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ে না।" কাজেই লোট্‌শ্ আমাকে নিয়ে একোণ থেকে ওকোণ, আর ওকোণ থেকে সেকোণ পর্য্যন্ত পায়চারি করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বচসা ও প্রশ্নাপ্রশ্নি।

প্রঃ—আচ্ছা, আর্খিফ্ জানোয়ারটা কি তাহলে ?

উঃ—দেখলাম কতকগুলা মেয়ে আর কতকগুলা পুরুষ টেবিল-চেয়ারে বসে' কাজ করছে কামরাগুলার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। আর

ঘরের ভিতর দুধারে কেবল আলমারির পর আলমারি। কিন্তু আলমারির ভেতর বই অথবা মাসিক পত্র অথবা ঐ ধরণের কোনো লিপি এক প্রকার নাই। সবই নথির বস্তা। তবে অবশ্য একদম খেড়ো-বাঁধানো আমাদের খাঁটি স্বদেশী ব্যবস্থা নয়। আজকালকার দিনে জার্ম্মাণিতে এবং অন্যান্য দেশেও বেশ ইস্পাতের খোপে ভাগ করা আলমারি আর তার ভেতর ফাইলের পর ফাইল। আসল কথা আমাদের উকিলবাবুরা, হাকিমবাবুরা যেকোনো আদালতের সম্পর্কেই দলিল-দস্তাবেজের ঘর হামেশা দেখছেন। সোজা বাংলায় তার নাম "রেকর্ড রুম"। যার নাম রেকর্ড রুম, তারই নাম আর্খিফ্। তবে ধনবিজ্ঞান-পরিষদেও যে একটা রেকর্ড রুম দরকার হয়, সেটা হল নতুন।

প্রঃ—হাঁ মশায়, বাস্তবিকই ধনবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের জন্যে নথির বস্তা কিরূপ ?

উঃ—কর্ম্মচারীরা (মেয়ে পুরুষ) দেখলাম দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রাদি থেকে কাঁচি দিয়ে কাটছে। দেখ্ছি কোথাও বা আধ পাতা, কোথাও বা তিন-পোয়া পাতা, কোথাও বা দেড় পাতা উদ্ধৃত করে রাখ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই আঁঠা মেরে কাগজের উপর সেগুলিকে লাগিয়ে রাখছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু লিখছে।

প্রঃ—কাজ করছে এরা কার হুকুমে ?

উঃ—পত্রিকা গুলোর গায়ে দেখছি লাল-নীল পেন্সিলে দাগ মারা রয়েছে। ঐ দাগ অনুসারে মেয়ে পুরুষেরা কেটে চলেছে।

প্রঃ—দাগটা মেরেছে কে ?

উঃ—দাগমারার অধিকার ডক্টর লোট্শের।

প্রঃ—ও হরি, এ যে কাটিংএর লাইব্রেরী ! তাই বুঝি আপনিও আপনার এই ঘরে যতগুলি কাগজ দেখছি, সবগুলি কুচি-কুচি করে

কেটে অস্থির করে ছেড়েছেন ? এই যে শেলফের উপর ১২।১৪টা বাস্কেটের ভেতর ফরাসী, ইংরেজী, ইতালিয়ান বা জার্ম্মাণ কাগজের কাটিংগুলা দেখ্‌ছি ? আর ঐ যে গোটা চল্লিশেক পুরু পুরু ফাইল দেখ্‌ছি ? ঐগুলিই কি আপনার কীল-আর্খিফের ইস্পাতের খোলের ভিতরকার নথিপত্র নাকি ?

উঃ—এবার তাহলে বুঝেছেন, কত ধানে কত চাল। একটা মজার কথা বলি। লোটশের সঙ্গে কথা বল্‌ছি, আর সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করছি—"আচ্ছা বলুন ত ১৯২৯ সনে ভারতবর্ষে কত টন কয়লা উঠেছিল।" লোটশ্‌ তখনি দু'কদম হেঁটে চলে গেল আমাকে নিয়ে কতকগুলি শেলফের সামনে। সেখানে গিয়ে আমাকে বললে—"এই দেখুন মশায় ভারতবর্ষ ; কি চান, কয়লা ? আচ্ছা।"

ধাঁ করে একটা খোপে দিলে হাত, বেরিয়ে এল এক নথি, ভেতরের কাগজপত্র অর্থাৎ কাটিংগুলা সাজানো রয়েছে বৎসর মাফিক মাল হিসাবে। ব্যস্‌, চলে এল কয়লা :—১৯২৫,' ২৬,' ২৭এর পর' ২৮ তারপর' ২৯। এর নাম আর্খিফ্‌।

প্রঃ—আচ্ছা এরকম ধরণের পরীক্ষায় লোট্‌শ্‌কে আর কিছু ফেলেছেন কি ?

উঃ—আলবৎ ফেলেছি। জিজ্ঞেস করলাম—"মশায়, সোভিয়েট রুশিয়ার মজুরীর হার কত ?" লোট্‌শ্‌ বললে—"কুছপরোয়া নাই।" নিয়ে গেল অন্য কতকগুলা শেলফের কাছে। দেড় মিনিটেই দেখলাম জবাব, ছাপা হরফে, রুষ ভাষায় কিছু কিছু জার্ম্মাণে আর ফরাসীতেও। অতএব বোঝা যাচ্ছে আর্খিফ্‌ জানোয়ারটা কি, আর আর্খিফ্‌ ধনবিজ্ঞান-গবেষণার কত বড় বনিয়াদ। আমার বিবেচনায় এইটেই হচ্ছে আসল ল্যাবরেটরী বা গবেষণা-কেন্দ্র।

প্রঃ—আচ্ছা এ ধরণের আর্খিফ্ আপনি কি আর কোথাও দেখেন নি ?

উঃ—এক হিসেবে দেখিনি, আর এক হিসেবে, এই ধরণেরই প্রায় কিছু-কিছু দেখেছি, যেমন নিউ ইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরীতে। সেখানে আর্খিফ নামে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। তবে লাইব্রেরীর প্রত্যেক বিভাগে তথ্য আর সংখ্যা বা অঙ্ক সংগ্রহ করে' রাখবার কিছু-কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে পর মাঝে মাঝে সন্তোষজনক জবাব পাওয়াও যায়। এবার বিলেতের কথা কিছু বলি। কোনো লাইব্রেরী বা মিউজিয়াম অথবা পরিষদের কথা বল্‌ব না। বৃটিশ লেবার পার্টি নামক বিখ্যাত রাষ্ট্রদলের দৃষ্টান্ত দিতে চাই। সেখানে গিয়ে দেখি তার গবেষণা-বিভাগ রয়েছে দস্তর মতন। আর সেখানেও মেয়ে-পুরুষ কাজ করছে, তাদের মাথায়ও অধ্যক্ষ আছে। অধ্যক্ষের দাগ অনুসারে কর্ম্মচারীরা কাঁচি চালাচ্ছে, আঠা লাগাচ্ছে, কাটিংগুলা বস্তাবন্দী করছে, মাঝে মাঝে মাসিক অথবা বই থেকে টাইপ করেও টুকে রাখছে। এই অধম বঙ্গচন্দ্রের দস্তর হচ্ছে সর্ব্বত্রই কিছু-না-কিছু পরখ করে দেখা। লণ্ডনের এই গবেষণা-বিভাগেও করে দেখেছি। টকাটক জবাব।

প্রঃ—মশায়, এই যে আপনার দেরাজের ভেতর তাড়া-বাঁধা ছোট ছোট কাগজের টুকরো বা কার্ডের টুকরোগুলো দেখছি, ওগুলো তাহলে কি ? এগুলোর সঙ্গে আর্খিফের কোনো আত্মীয়তা আছে নাকি? টুক্‌রো গুলাও দেখ্‌ছি গুন্‌তিতে কয়েক লাখ হবে, এসব কোত্থেকে এসে জুটলো ?

উঃ—ঠিক বলেছেন, আর্খিফের সঙ্গে এদের আত্মীয়তা খুবই নিবিড়। তবে খাঁটি আর্খিফ্ দেখার অনেক বছর পূর্ব্বে এগুলার সূত্রপাত ১৯১৭ সনে আমেরিকার নিউইয়র্কে। দেখতেই পাচ্ছেন, এগুলো ছাপা কাগজের কাটিং নয়, নিজের হাতে লেখা নোট। যখন যেখানে মাল পাওয়া

গেছে, তখন সেখানে যাহক-কিছু টুকে রাখা হয়েছে। আমেরিকার ইয়ারেরা অবশ্য খুব পুরু চোস্ত কার্ডে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলা টাইপ করিয়ে রাখে। আমি বঙ্গচন্দ্র পয়সাই বা পাব কোথায়, টাইপই বা করে কে? আর তারপর লাখ লাখ কার্ড নিয়ে সাগর-ডিঙ্গানো পাহাড়-উৎরানো সম্ভবপর নয়! এসব পয়সার খেলা, আর অনেক সময় ঝকমারিও বটে, কারণ কাগজপত্রে ধূলো এসে জমে প্রচুর। এই ১৬।১৭ বছর ধরে' পাতলা ফুলস্কেপ কাগজে কার্ডের আকারের চিরকুট রোজই দশ-বিশ খানা করে' মজুদ হয়েছে। এগুলো না থাক্‌লে পরে কোনমতেই কোনো বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় যোগদান করা অসম্ভব। আর বাস্তবিক পক্ষে আমেরিকান লাইব্রেরীতে বা পণ্ডিতদের বাড়ীতে, বিলাতী সুধীবর্গের পাঠভবনে, মায় রাজনৈতিক দলের গবেষণা-দপ্তরে আর জার্ম্মাণির নানা কেন্দ্রে, শেষ পর্য্যন্ত কীল-পরিষদের এই নামজাদা আর্থিফে, এই ধরণের কার্ড-জাতীয় কাগজ-পত্র, কাটিং, টাইপ করা চিরকুট ইত্যাদির আবহাওয়াই পেয়েছি। এই সঙ্গে বলে' রাখা ভাল যে, জেনীভার লীগ অব্ নেশন্স্ আর আন্তর্জ্জাতিক মজুর-পরিষদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের তদ্‌বিরেও জার্ম্মাণ আর্থিফ-জাতীয় দলিলপত্রের সংগ্রহালয় বর্ত্তমান।

প্রঃ—ঐ ধরণের ধনবিজ্ঞান-পরিষদ্ জার্ম্মাণিতে কতগুলা আছে?

উঃ—ডজন ডজন, ঠিক "কালো জামের" মত প্রচুর।

প্রঃ—সেকি মশায়, আপনি কি হেঁয়ালি বক্‌ছেন?

উঃ—ব্যাপার অতি সোজা। জার্ম্মাণির প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই এই রকম ধরণের এক একটা ধনবিজ্ঞান-পরিষদ্ আছে,—নাম যদিও তার এক এক জায়গায় এক এক রকম। কোথাও নাম তার ইনষ্টিটুট, কোথাও বা সেমিনার নামে এই পরিষদ্ পরিচিত। তবে কর্ম্মপ্রণালী সর্ব্বত্রই একপ্রকার। কিন্তু জেনে রাখা ভাল, যে বর্ত্তমান যুগে

লেখাপড়া, গবেষণা, অনুসন্ধান, আলোচনা—সবই পয়সাসাপেক্ষ। যত গুড়, তত মিষ্টি। জার্ম্মাণরা খুব ধনী সন্দেহ নাই, কিন্তু তা বলে প্রত্যেক বিদ্যাকেন্দ্রেই তারা কীল'এর মতন হোমরা-চোমরা ইনষ্টিটুট খাড়া করতে পারে নি।

প্রঃ—কিন্তু তা বলে কালো জামের মত প্রচুর—একথা বলছেন কেন?

উঃ—জার্ম্মাণিতে বিশ্ববিদ্যালয়-জাতীয় বিদ্যাকেন্দ্রের সাধারণ নাম "হোখশুলে"। শব্দটা দেখে অনেকে মনে করে এটা বুঝি ইংরেজী হাইস্কুল বা মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ের সমান। এ ধারণা পৃথিবীর সকল দেশেই আছে। বলা বাহুল্য এটা একটা মস্ত ভুল। যাহা হউক, এই হোখশুলে-শ্রেণীর বিদ্যাকেন্দ্র নয়টি বিভিন্ন বর্গে বিভক্ত। এই নয় শ্রেণীর কোনো একটা বিদ্যাকেন্দ্রে ঢুকতে হলে আমাদের দেশী বি এ অথবা বি এস্-সি পাশের প্রায় সমান বিদ্যা থাকা চাই। তারপর এই সকল হোখশুলেতে অন্ততঃ তিন বৎসর কিম্বা চার বৎসর পড়্‌তে হয়। তবে ডক্টর উপাধি পাওয়া যায়।

প্রঃ—আপনি কি বলতে চান যে, এই ধরণের হোখশুলে জার্ম্মাণিতে ডজন ডজন?

উঃ—হাঁ। ঐ যে নয় শ্রেণীর হোখশুলের কথা বলছি তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। দেখুন,—

(১) সাধারণ্যে পরিচিত ইউনিভার্সিটি জাতীয় হোখশুলে। ইহাদের সংখ্যা ২৩।

(২) টেখ্‌নিশে হোখ্‌শুলে অর্থাৎ টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। ইহাদের সংখ্যা ১১।

(৩) হাণ্ডেল্‌স্-হোখ্‌শুলে অর্থাৎ বাণিজ্যবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়। ইহাদের সংখ্যা ৫।

(৪) কৃষিবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়—ইহাদের সংখ্যা ৪।

(৫) পশু-চিকিৎসা-বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়—ইহাদের সংখ্যা ২।

(৬) কোলোনিয়াল-হোখ্‌শুলে অর্থাৎ উপনিবেশ-বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়, এর সংখ্যা ১।

(৭) খনিবিদ্যাবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়,—ইহাদের সংখ্যা ২।

(৮) বনবিদ্যাবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়—ইহাদের সংখ্যা ৩।

(৯) ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়—ইহাদের সংখ্যা ৮। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ না থাকলে জার্ম্মাণিতে কেহ পুরুত ঠাকুর হতে পারে না।

প্রঃ—ওরে বাপরে! গুন্‌তিতে দেখছি ৫৯। প্রায় ৫ ডজন! এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকটার কি এক একটা ইন্‌ষ্টিটুট্‌, সেমিনার বা পরিষদ্‌ আছে?

উঃ—রাধামাধব! মাত্র এক একটা? প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলা বিদ্যা পড়ানো হয়, তার প্রত্যেক বিদ্যার সঙ্গেই এক একটা পরিষদ্‌ চলে। থুরি, কথাটা ঠিক হ'ল না। ব্যাপার আরো গুরুতর। প্রত্যেক বিদ্যার জন্য যতগুলো অধ্যাপক আছে, তার প্রত্যেক অধ্যাপকই এক একটা সেমিনার, ইন্‌ষ্টিটুট্‌ বা পরিষদের পরিচালক। তবে যে বিদ্যার ক্ষেত্রে ৫।৭ জনের এলাকা প্রায় এক অথবা লাগালাগি তারা সকলে মিলে একটা যৌথ প্রতিষ্ঠান চালিয়ে থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা সে সকল ক্ষেত্রে পরিচালক বাহাল করে কে?

উঃ—অধিক ক্ষেত্রেই গভর্ণমেণ্ট। যেখানে কোনো একজনকে স্থায়ী কর্ম্মকর্ত্তারূপে সরকারী দপ্তর হ'তে বাহাল কর্ব্বার সুযোগ নেই, সেই সকল ক্ষেত্রে অধ্যাপক শ্রেণীর লোকেরা বৎসর বৎসর নিজেদের ভিতর থেকে এক একজনকে বাছাই করে নেয়। ঐ সকল ক্ষেত্রে কেহই এক বছরের বেশী কর্ত্তা থাকতে পারে না।

প্রঃ—আচ্ছা ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার জন্য তাহলে কি জার্ম্মাণিতে অন্ততঃ গোটা ষাটেক পরিষদ আছে বুঝতে হবে ?

উঃ—ঠিক তা নয়, আরো অনেক বেশী। কেননা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই, বিশেষতঃ বড়গোছের বিদ্যা-কেন্দ্রে ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়েও বিভিন্ন পরিষদ্ চালানো হয়ে থাকে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে জনসাধারণও অনেক ধনবিজ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র কায়েম করেছে। সে সবও নানা নামে পরিচিত। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার কথা—জার্ম্মাণির প্রত্যেক বড় বড় শিল্প-কারখানায়, বড় বড় ব্যাঙ্কে, বড় বড় বীমা-কোম্পানীতে নিজ নিজ কাজ চালাবার জন্যে অর্থাৎ ব্যবসার গতিভঙ্গী বুঝবার জন্যে বাজার-গবেষণাপরিষদ, শিল্পগবেষণা-পরিষদ্, অর্থনৈতিক অনুসন্ধান-পরিষদ্ ইত্যাদি নানা রকমের ও নানা নামের বিদ্যাকেন্দ্র আছে।

প্রঃ—কীলের ইন্‌ষ্টিটুটে আর কি দেখলেন ?

উঃ—ইন্‌ষ্টিটুটের আর এক শাখা হচ্ছে লাইব্রেরী। লাইব্রেরীতে ঢুকবা মাত্রই ডক্টর গ্যিলিখ আমাকে "আর্থিক উন্নতি"র কয়েক সংখ্যা দেখিয়ে বল্‌লেন—"কি মশায়, আপনার নামে নালিশ আছে। আপনার কাগজ নিয়মিত বেরোয় না কেন ? তিন মাস আগেকার কাগজ পেয়েছি, তারপর আর তার টিকি দেখবার যো নেই। লিখে লিখেও চিঠির জবাব পাইনি। তারপর এই দেখুন প্রথম বছরের দু'তিন কপি আমাদের অফিসে নেই। দ্বিতীয় বছরটাও দেখছি কিছু কানা। একে সম্পূর্ণ কর্ব্বার ব্যবস্থা আপনি এখান থেকেই যা হয় করে দিন।"

প্রঃ—ওরা "আর্থিক উন্নতি" নিয়ে কি করে ? কেউ বাংলা জানে কি ?

উঃ—গ্যিলিখের কথায়ই জবাব দেওয়া যাক্। গ্যিলিখ বল্লেন—"আর্থিক উন্নতির সূচীপত্রের যে ইংরেজী তর্জমা ছাপা হয়, তাই দেখে

আমরা অনেকটা আঁচ করে নিচ্ছি বাংলা দেশে ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার ধরণ-ধারণ কিরূপ। ইংরেজী ধনবিজ্ঞান পত্রিকা ভারতবর্ষে বেরোয় খুব কম, আপনার সম্পাদিত বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের ত্রৈমাসিক জার্ণাল ইত্যাদি পত্রিকা গুন্তিতে বেশী নয়। ঘটনাচক্রে আপনার ইংরেজী জার্ণালও "আর্থিক উন্নতি"র মতনই পেছনে পড়ে থাকে, আর আপনাদের ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সে চিঠি লিখেও জবাব পাওয়া যায় না। যাক্, "আর্থিক উন্নতির" সূচীপত্রের ইংরেজী তর্জ্জমাটা আমাদের ইনষ্টিটুটের পণ্ডিতেরা মাঝে মাঝে ৫।৭টি একত্র হলে' ঘাঁটা-ঘাঁটি করে' থাকেন। অবশ্য আমরা কেউ বাংলা বুঝি না। তবে বাংলা ভাষা-জানা ভারতসন্তান জার্ম্মাণিতে দু'চার জন করে' বেড়ে চলেছে। ধনবিজ্ঞানে অনুরাগী বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় ছাত্র জার্ম্মাণির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প দিনের ভিতরে আরো বেড়ে যাবে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানসেবীরা যে কস্মিন্ কালে বাংলা ভাষা অথবা অন্যান্য ভারতীয় ভাষা একদম শিখবে না, সেকথা বলা চলে না। বস্তুতঃ ভারতপর্য্যটক সুধীরা জার্ম্মাণিতে ফিরে আসবার পর ভারতীয় পণ্ডিতদের সম্পাদিত কাগজ-পত্র বেশ আগ্রহের সহিত ঘেঁটে থাকেন। কাজেই আমাদের কীল-এর ইনষ্টিটুটেও "আর্থিক উন্নতি"র পুরাণো ভলুমগুলার মাঝে-মাঝে বেশ-একটু তলব পড়ে। আর তলব আসে জার্ম্মাণদের কাছ থেকেই। ভবিষ্যতে এই তলব বাড়্বে ছাড়া কম্বে না।'

এই সঙ্গে গ্যিলিথ আরও বললেন—"কীলের এই পরিষদ্ একমাত্র কীলের পণ্ডিতদেরই কাজে আসে এরূপ বুঝলে ভুল কর্ব্বেন। আমাদের পরিষদে অজস্র কাটিং আছে। আপনি ত এই দেখে এলেন। এত বড় আর্থিফ্ বাস্তবিক জার্ম্মাণিতে আর নেই। আর আমরা আমাদের লাইব্রেরীকেও যথাসম্ভব বিশ্বগ্রাসী রূপে গড়ে তুলতে

চেষ্টা করছি। জার্ম্মাণির নানা স্থান থেকে নানা পণ্ডিত আমাদের কাছে তথ্যের জন্যে, অঙ্করাশির জন্যে অথবা দেশবিদেশের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে খবর পাবার জন্যে রোজই চিঠি লিখে থাকেন। এই সকল চিঠির জবাব দেওয়া আমাদের ইন্‌ষ্টিটিউটের একটি উল্লেখযোগ্য বড় কাজ। মনে করুন ষ্টুটগার্টের কোনো পণ্ডিত চীন দেশের কাপড়ের কল সম্বন্ধে গবেষণা করছেন; তিনি বিগত ২।৩ বৎসরের তাঁতের সংখ্যা আর টাকুর সংখ্যা কিরূপ জান্‌তে চান। আমাদের কাছে চিঠি লিখলে আমরা তাঁদেরকে কাগজপত্র ঘেঁটে প্রশ্ন-মাফিক জবাব ত দিয়েই দি, সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা, গ্রন্থাদিও ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে সাহায্য করি। ডাকমাশুল অবশ্য তাঁকেই যোগাতে হয়। এই সকল জবাব দেওয়ার ভার আমার নহে, এটা আর্থিক্ বিভাগের কর্ত্তা ডক্টর লোট্‌শের অধীন। কাজেই "আর্থিক উন্নতি" ইত্যাদি ভারতীয় পত্রিকার বাজার জার্ম্মাণিতে একমাত্র কীল নহে, গোটা জার্ম্মাণ সমাজই কীল-পরিষদের মারফৎ বাঙালী-পরিচালিত এই ধনবিজ্ঞান-মাসিকটাকে চুষে নেবার সুযোগ পায়।"

প্রঃ—কৈ, আপনি কীলের বক্তৃতার কথা ত বল্লেন না?

উঃ—হাঁ যথাসময়ে বক্তৃতা দিতে হল বৈ কি। বক্তৃতার বিষয় ছিল "বর্ত্তমান ভারতে যন্ত্রনিষ্ঠা ও বাণিজ্যনীতি।" ঝাড়া দেড় ঘণ্টা বোধ হয় বক্তৃতা হল। তারপর গিয়ে বসা হল ইন্‌ষ্টিটিউটের ক্লাবে। সেখানে ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ-কিছু "ইচ্ছা করা"। খানাপিনা চলতে লাগল। তারপর সুরু হল প্রশ্নাপ্রশ্নি। প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিতে শেষ পর্য্যন্ত রাত্রি সাড়েবারটা বেজে গেল। সমাজ-বিজ্ঞানের প্রবীণ পণ্ডিত টোন্নীস ছিলেন, ধনবিজ্ঞানের যুবা পণ্ডিত কল্‌ম্, ইতিহাস-পণ্ডিত শেল ইত্যাদি অনেকেই প্রশ্ন কর্লেন। জবাব দিতেও হল, বলা বাহুল্য। সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রাডারও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন।

তর্কাতর্কি চলছিল বলা বাহুল্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-জোড়া। মনে রাখতে হবে এই পরিষদের নাম "ভেলট-ভিট্র্শাফ্ট্" অর্থাৎ বিশ্বদৌলত এবং "জে-ফার্কেয়ার" অর্থাৎ সমুদ্র-বাণিজ্য,—এই দুই বিষয়ের পরিষৎ। কাজেই এখানে 'সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে' কিছুই বাদ পড়বার নয়।

তবে মনে পড়ছে,—অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণনীতি এই সম্বন্ধে ঘোড়তর লড়াই হয়েছিল। ওখানকার লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—"হ্যারে, তুই ত আমাদের জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞান-গুরু ফ্রীড্রিশ লিষ্ট প্রণীত জগদ্‌বিখ্যাত বইটা 'স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি' নামে বাংলায় তর্জ্জমা করেছিস্। তার মানে কি বুঝতে হবে যে, তুই অবাধ বাণিজ্যের দুষমণ আর সংরক্ষণনীতির পাঁড় ?" জবাব দিয়েছিলাম এক কথায়,—"যে-কোনো একখানা বই তর্জ্জমা করলেই যে অনুবাদক বেচারা গ্রন্থকারের চেলা ষোলআনা, এরূপ বিশ্বাস কর্ব্বার কোনো কারণ আছে কি ?" আর একটা কথা সম্বন্ধে এখানকার আড্ডায় খুব গুলতান চলেছিল। "প্রথম শিল্প-বিপ্লব" আর "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব" এই দুইটা পারিভাষিক শব্দ আমার বক্তৃতায় একটা বড় ঠাঁই অধিকার করেছিল। এই দুটা বিপ্লবে প্রভেদ কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য করা যেতে পারে তাই নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কাটাতে হয়েছিল।

প্রঃ—ঘুমুতে গেলেন কখন মশায় ?

উঃ—জর্ম্মাণ মুল্লুকে অতিথি হওয়া ঝকমারি। ওখানে খাবার শেষ নাই। রাত্রি সাড়ে ১২টার পর ও আবার কিছু "ইচ্ছে করতে" হল। সকলে মিলে বসা গেল। অবশ্য বলা বাহুল্য, তর্কাতর্কি আর হাতাহাতির সময় ও খাওয়া-দাওয়ার রেহাই ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত গোটা দুয়েকের সময় নিশ্চিন্তি।

প্রঃ—তারপর দিন কি হল ?

উঃ—প্রথমেই "কোন্‌য়ুক্‌টুর" অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক আথিক ওঠা-নামা বিষয়ক ইন্‌ষ্টিটিউটের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন।

প্রঃ—এ আবার কি মশায়? ধনবিজ্ঞান-পরিষদটাই ত একটা ইন্‌ষ্টিটিউট—তার ওপর আবার কি?

উঃ—এ হচ্ছে পরিষদের অন্তর্গত আর একটা পরিষদ্। এখানে পরিচালক হচ্ছেন অধ্যাপক কল্‌ম্‌। তাঁর সঙ্গে কাজ করেন কয়েকজন গবেষক্। তাঁদের ব্যবসা হচ্ছে বাজারের ওঠানামা, দেশবিদেশের আর্থিক গতিভঙ্গী ইত্যাদি বস্তুগুলা অঙ্কের সাহায্যে আর রেখার সাহায্যে বিশ্লেষণ করা। পাঁচ ছয় জনকে বাহাল দেখলাম। কেউ চীন সম্বন্ধে কাগজ ঘাঁটছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এক গবেষককে খোঁজ নিতে হচ্ছে। কেহ রেল, কেহ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি নানা বিষয়ে নানা গবেষক মোতায়েন।

প্রঃ—এই যে গবেষকদের কথা বললেন এদের অন্নবস্ত্র যোগায় কে?

উঃ—প্রশ্নটা ভাল। জার্ম্মাণির যত জায়গায় যত পরিষদ্ বা গবেষণা-কেন্দ্র চলেছে, তার কর্ম্মকর্ত্তারা সকলেই বেতনপ্রাপ্ত লোক। অবশ্য এখানে বলে রাখা উচিত যে, যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করেছি সবই সরকারী প্রতিষ্ঠান। অতএব এই সকল বিদ্যাকেন্দ্রের প্রত্যেক অধ্যাপক হতে প্রত্যেক দারোয়ান পর্য্যন্ত সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী। কাজেই কি লাইব্রেরিয়ান, কি কাটিংএর অধ্যক্ষ, কি গোটা ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর—সকলেই বেতনপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী। কাটিংএর আপিসে যে সকল স্ত্রীপুরুষকে কাজ করতে দেখেছি তাদেরকে গবেষক বলা হবে না। বলা বাহুল্য তারা সকলেই কেরাণী-জাতীয় লোক। অবশ্য সকলেই ধনবিজ্ঞান বিষয়ে কাটিং করতে সুপটু। লাইব্রেরীতে যারা কাজ করে, তারাও কেরাণী-জাতীয়,—অধ্যক্ষ বাদে। অধ্যক্ষেরা মোটের উপর অধ্যাপক-শ্রেণীর লোক। সাধারণতঃ অধ্যাপকেরাই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালক বা কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

প্রঃ—আমি জান্‌তে চাই, গবেষকেরা কিছু পয়সা পায় কিনা ?

উঃ—কীলের এই পরিষদে যে কয়জন গবেষক দেখলাম, তারা সকলেই বৃত্তি-প্রাপ্ত লোক। কিন্তু এ হচ্ছে ব্যতিরেক। বিশেষ মজার কথা,—একমাত্র গবেষণার জন্য "ছাত্রবৃত্তি" বা পয়সা পাওয়ার ব্যবস্থা কোথাও দেখেছি বলে' মনে হয় না।

প্রঃ—তাহলে জার্ম্মাণিতে এত সব লেখালেখি বেরোয় কি করে ?

উঃ—আসল কথা, প্রত্যেক পরিষদের সঙ্গেই যে-সকল লোক সরকারী কর্ম্মচারীরূপে কাজ করে, তারা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু লেখাপড়া করে' থাকে,—বস্তুতঃ লেখাপড়া করতে বাধ্য। লেখাপড়া না করলে তারা চাকরী পায় না। বিশেষতঃ যারা অধ্যক্ষ অথবা অধ্যক্ষের সহকারীরূপে নিযুক্ত তারা প্রত্যেকেই গবেষক। গবেষণার জোরে কাজে বাহাল, আর গবেষণার জোরে কাজে স্থিতি। এইবার মনে আন্‌তে হবে যে, জার্ম্মাণির ইস্কুল-কলেজে, ইস্কুল-কলেজের বাইরে, ফ্যাক্টরীতে, কারখানায়, ব্যাঙ্কে, বীমা-ভবনে, রাজনৈতিক দলের অন্তর্গত কর্ম্মকেন্দ্রে সর্ব্বত্রই গবেষণার কেন্দ্র রয়েছে। তারই সঙ্গে অসংখ্য অধ্যক্ষ আর অধ্যক্ষদের সহকারী গবেষণার কাজে বাহাল। কাজেই সপ্তাহে সপ্তাহে, মাস মাস গবেষণার জোগান এতবেশী যে, ধনবিজ্ঞান, টেক্‌নলজি, সমাজ-বিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান—এই সব বিজ্ঞানের জন্য জার্ম্মাণিতে হাজার বারো দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পত্রিকা বাহির হয়। এদের প্রত্যেক ছটাক লেখা দিয়ে লেখকেরা পয়সা পায়। তাছাড়া সরকারী কাজের জন্য নিয়মিত মাসিক তঙ্খা ত আছেই। অর্থাৎ আত্মত্যাগী, বৈরাগী, না-খেতে-পাওয়া লেখক জার্ম্মাণীতে একজনও নাই।

প্রঃ—গবেষণা যদি না করে, তাহলে এসব লোকের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় ?

উঃ—জার্ম্মাণিতে অনেককে এবিষয়ে প্রশ্ন করেছি। জবাব পেয়েছি নিম্নরূপ—'গবেষণা করে না অথচ কেহ অধ্যাপক বা অধ্যক্ষ বা সহকারী —এমন কোনো লোক জার্ম্মাণিতে আছে কিনা সন্দেহ। যদি থাকে তবে তার উন্নতি অসম্ভব।' বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক অধ্যাপক, অধ্যক্ষ এবং সহকারী কোন-না-কোনো কাগজের—দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক ইত্যাদির—সঙ্গে সম্পাদক অথবা সহ-সম্পাদক হিসাবে সংযুক্ত। আমার যতদূর মনে পড়ে,—আর অনেকটা খোঁজ-খবর নিয়ে এইরূপই বুঝেছি যে,—কাগজ চালায় না কিম্বা কাগজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ নাই অথচ লোকটা মাষ্টারি করে এমন জানোয়ার জার্ম্মাণিতে নাই। আর এই জন্যই হাজার-হাজার পত্রিকা আর মন-মন ছাপাছাপি জার্ম্মাণ সমাজে প্রতি বৎসর বেরুতে পারে। অবশ্য মনে রাখা উচিত যে, পত্রিকা চালাতে গিয়ে মাষ্টার, অধ্যক্ষ বা সহকারী ইত্যাদি শ্রেণীর গবেষকদেরকে নিজের ট্যাঁকের টাকা খরচ করতে হয় না। তাঁরা সম্পাদন করেই খালাস। এমন কি অনেক ক্ষেত্রেই সম্পাদন-সমালোচনা আর নিজ রচনার জন্য প্রত্যেকেই বেশ-কিছু পেয়ে থাকে। বিনা খোরাকে জার্ম্মাণ মুল্লুকে কেউ কিছু করে না। প্রকাশের ভার প্রকাশকদের, খরচপত্র যা-কিছু সব তাদের কাছ থেকেই আসে। এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য একদম নাই বল্লেই চলে। অর্থাৎ বুঝতে হবে যে, এসব দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বেচে প্রকাশকেরা টাকা রোজগার করতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ জার্ম্মাণির পল্লীতে-শহরে গাঁয়ে-গাঁয়ে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক বিস্তর, আর তারা পয়সা খরচ করে' কেতাব আর পত্রিকা কিনে থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা এত কথাই যখন বললেন, তখন কুলের কথাটাই খুলে বলুন না কেন, বাস্তবিক তারা পায় কত ?

উঃ—লেখাপড়া সংক্রান্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের কথা বল্‌ছি। বয়েস

হিসেবে মাইনে। বয়স যেমন বাড়তে থাকে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে মাইনেও তেমনি নির্দ্দিষ্ট হারে বেড়ে যায়। ভারতীয় সরকারী চাকুরেদের কাছে এ নতুন-কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রেণীর পদে যদি কোনো লোক বাহাল হয়, তাহলে ৩৫ বৎসর বয়সের আগে সাধারণত সে অবস্থা আসে না। তখন তাকে ৫০০।৬০০ মার্ক দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত সে ১২০০ মার্ক পর্য্যন্ত ওঠে। আজকালকার মার্কের দর টাকা টাকা। আসল দর এক টাকায় দেড় মার্ক। এই হল গভর্ণমণ্টের কাছ থেকে পাওয়া বেতন। কিন্তু জার্ম্মাণিতে একটা কিম্ভূতকিমাকার নিয়ম আছে। তার ফলে অধ্যাপকেরা ফুলে' উঠ্‌তে পারে।

প্রঃ—সে কি রকম ?

উঃ—ছাত্রেরা যত বেতন দেয়, তার একটা নির্দ্দিষ্ট হিস্যা, প্রায় ।০ আনা অধ্যাপকদের প্রাপ্য। কাজেই যদি কোনো অধ্যাপকের ক্লাসে ৫০০ ছাত্র হয় তাহলে সে অধ্যাপকের "পায়া ভারি"। কিন্তু ঘটনাচক্রে যদি অধ্যাপকের একটি কি দুটি ছাত্র হয়, তাহলে সে "অন্ত ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ"-নীতি চালাতে বাধ্য। মনে করা যাক একজন অধ্যাপকের বয়স ৪৫ বৎসর আর সে যেন প্রাচীন চীনতত্ত্ব অথবা আসিরিয়া সম্বন্ধে খুব নামজাদা পণ্ডিত। কিন্তু তাঁর কাছে ছাত্র কালেভদ্রে দু'একজন মাত্র হয়। কাজেই ছাত্র-বেতনের হিস্যা তাঁর কপালে এক আধলাও জোটে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ৪৫ বৎসর বয়সে গভর্ণমেণ্টের নিকট হতে প্রাপ্য বেতন হাজার মার্ক। অর্থাৎ এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতটি আর্থিক হিসাবে অতি গরীব। তবে জার্ম্মাণিতে সরকারী ব্যবস্থায় অনেক মিউজিয়াম্, লাইব্রেরী, ইন্‌ষ্টিটুট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আছে। এই সবের কোন-না-কোনটায় এই ব্যক্তি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হতে পারে। এই জন্যে তাঁর কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা পাওয়ার কথা। তার

উপর প্রকাশকেরা হয়ত প্রাচীন চীন, মিশর, আসিরিয়া, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সম্বন্ধে পত্রিকা-গ্রন্থাদি প্রকাশ কর্ব্বার জন্যে তাঁকে সম্পাদক পাকড়াও করে। এই সূত্রেও তাঁর কিছু আয় হতে বাধ্য। এই বে-সরকারী কাজের জন্য তাঁকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি নিতে হয়।

প্রঃ—কীলে আর কি দেখলেন ?

উঃ—আগেই বলেছি, কীলেরই "সাগরকূলে বসিয়া বিরলে" কাইজার বাহাদুর লহরমালা দেখতেন। বস্তুত কীল জাহাজ তৈয়ারি কাজের এক বড় কর্ম্মকেন্দ্র। এই কারখানাগুলোকে বলে "ভেফ্‌ট্"। এই রকম একটা নামজাদা ভেফ্‌ট্ দেখবার ব্যবস্থা ছিল। দেখে আসা গেল। কারখানার নামটা হোলভার্ট ভেফ্‌ট্। জাহাজ তৈরী দেখা-শুনার পর কীলের জগদ্বিখ্যাত খাল দেখতে যাওয়া গেল। মোটর লঞ্চ বাঁধা ছিল। সমুদ্রের যেখানে গিয়ে খালটা পড়েছে, সেইখানে গিয়ে খানিকটা জলকেলি করা গেল। এই খাল দিয়েই জার্ম্মাণরা বাল্‌টিক সাগরের জল উত্তর সাগরে বা জার্ম্মাণ সাগরে নিয়ে ঠেকিয়েছে। অর্থাৎ জার্ম্মাণির মানোয়ারী জাহাজ আজকাল ডেনমার্ক ঘুরে যেতে বাধ্য হয় না। বালটিক সাগর থেকে জার্ম্মাণ আওতার ভেতর দিয়ে ইংল্যাণ্ডের দিকে পৌছাতে পারে। এই খাল্ কেটেছিল্ বলে' জার্ম্মাণির উপর ইংরেজ তিতি-বিরক্ত হয়েছিল। এই খাল-কাটাই অনেকের মতে বিগত লড়াইয়ের অন্যতম কারণ। অবশ্য বিয়ের মত লড়াইয়েও "লাখ কথা" লাগে। যা হোক, কীলের এই "শ্লয়জে" বা সাগর-খালসঙ্গমের ফটক বিশ্ব-দৌলতে আর বিশ্বরাষ্ট্রনীতিতে অতি নামজাদা।

প্রঃ—এই খানেই কি খতম হল কীল ?

উঃ—আরও কিছু অবশ্য ছিল সামাজিক, অর্থাৎ লোক-জনের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি। তাহা উল্লেখ করার দরকার নাই। ভারতীয় অধ্যাপক একজন এখানে সংস্কৃত পড়্‌ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে

কথাবার্ত্তা ছিল। তিনি গুজরাতী,—সপরিবারে ছিলেন। আমাদের একজন বাঙ্গালী ছোকরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, তার সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হল। সে মুসলমান। কীল সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে চাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৫।৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী এক সঙ্গে আমার ঘরে এসে হাজির হয়েছিল। তারা এসে আবার আমার সেই বক্তৃতার সমালোচনা সুরু করলে। এক একজনের এক এক প্রশ্ন। আমার কথা-বার্ত্তার ভেতর "তুলনামূলক শিল্পনিষ্ঠা" অথবা "শিল্পনিষ্ঠার বিশ্বরূপ" ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ বেশ-কিছু কায়েম হয়। তাছাড়া দেশের সঙ্গে দেশের তুলনায় আর যুগের সঙ্গে যুগের তুলনায় "ইকুয়েশন" বা সাম্যসম্বন্ধ কসে' বার করা আমার একটা দস্তুর। ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনায় কত বছর পেছনে রয়েছে ইতালি, ইতালির মাপে বুলগেরিয়া কতটা পেছনে, ফ্রান্সের মাপে বিলেত কতখানি এগিয়ে, রুশিয়ার মাপে জার্ম্মাণি কতটা এগিয়ে, জার্ম্মাণির মাপে জাপান কতটা পেছনে ইত্যাদি কথা বস্তুনিষ্ঠ-ভাবে বুঝিয়ে দিতে হল। ব্যাঙ্কের কথা পাড়তে হল, বীমার কথা পাড়তে হল, চাষ-আবাদের কথা তুলতে হল, ফ্যাক্টরীর কথা বলতে হল। যন্ত্রপাতি-"ব্যবহারে"র কথা বল্‌তে হল। আর তা ছাড়া যন্ত্রপাতি "তৈয়ের" করার ক্ষমতা সম্বন্ধে দেশের তুলনা চালাতে হল। মনে রাখা উচিত যে, যন্ত্রপাতি তৈয়ের করা যতখানি শিল্পনিষ্ঠার পরিচায়ক, যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা ভোগ করা তার অনেক নীচের কোঠায় অবস্থিত। ভারতে আমরা আস্তে-আস্তে যন্ত্রপাতি ভোগ বা প্রয়োগ করবার দিকে এগুচ্ছি, কিন্তু যন্ত্রপাতি "সৃষ্টি" করবার মতন কেরদানি পাকড়াও করা ভারতবাসীর পক্ষে এখনও অনেক দেরীর কথা।

একবিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় জার্ম্মাণ প্রবাসের দেখা-শুনা ও আলাপ-পরিচয়

দ্বিতীয় বারকার জার্ম্মাণ প্রবাসের (১৯২৯ জুলাই—১৯৩১ আগষ্ট) বৃত্তান্ত একপ্রকার কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই। ইংরেজিতে একটা রোজনামচা ছাপা হইয়াছিল মাত্র,—বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স পত্রিকার ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। বর্ত্তমান গ্রন্থের ভিতর মোলাকাতের সাহায্যে ষ্টুটগার্ট, কীল ও মিউনিক সম্বন্ধে কিছু ঝাড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। পর্য্যটনের এবং পঠন-পাঠনের কাহিনী সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই অধ্যায়ে নমো নমো করিয়া কয়েকটা প্রতিষ্ঠান ও কয়েকজন ব্যক্তির তালিকা দিয়া যাইতেছি। তাহা হইতেই দেখা-শুনা, আলাপ-পরিচয় এবং আত্মিক লেনদেনের আভাষ পাওয়া যাইবে।

প্রথমে মিউনিকের কথা বলি। "ডয়চেস মুজেয়ুম"-প্রতিষ্ঠাতা ওস্কার ফোন্ মিলার, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ওস্সানা, ধর্ম্মশাস্ত্রী আইখ মান, স্বাস্থ্যবিষয়ক ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর কিসকাল্ট, রাজস্বশাস্ত্রী লট্‌ৎস, অর্থ-শাস্ত্রী ৎস্বইডীনেক ও আডোল্‌ফ ভেবার, ডয়চে আকাডেমীর সুধীবর্গ, পদার্থশাস্ত্রী জোম্মারফেল্ড ও ৎসেন্নেক, পার্ল্যামেণ্টের মহিলা মেম্বার আম্মান, মহিলা-কবি আডেলহাইড হাউসমান, মহিলা স্থাপত্য-শিল্পী এলিজাবেথ ফোন এশ্বো, শিক্ষাশাস্ত্রী কের্শেনষ্টাইনার, ভারতশাস্ত্রী এ্যর্টেল ও শ্যার্মাণ, সংখ্যাশাস্ত্রী ফ্রীডরিশ ৎসান ইত্যাদির সহযোগিতা এই সময়কার অন্যতম বিশেষত্ব।

কোলোনের নিকটবর্ত্তী জোলিঙ্গেনের ব্যাঙ্কার ব্যর্গ, ফ্রাঙ্কফোর্টের

বিখ্যাত রংয়ের কারখানার প্রধান ডিরেক্টর রাসায়নিক কার্ল ডুইসব্যর্গ, বার্লিনের এঞ্জিনিয়ার-পরিষদের অন্যতম পরিচালক অধ্যাপক মাচ্চস, আউগ্‌স্‌বুর্গের রেল-প্রেসিডেণ্ট কার্ল লিষ্ট, বার্লিনের ব্যাঙ্ক-ডিরেক্টর মাই-জেমান ও ব্যাঙ্কার ডক্টর টেটেন্‌স্‌ এবং যাইডেল্‌স্‌, রুরজনপদের এস্‌সেন নগরের খনি-পরিষদের ডিরেক্টর ল্যেভেন্‌ষ্টাইন, বার্লিনে অবস্থিত ফারাইন ডয়চার মাশিনেন-বাও-আন্‌ষ্টাল্টেন নামক যন্ত্রপাতির কারখানা-সঙ্ঘের ডিরেক্টর কার্ল লাঙ্গে, রুরজনপদের ডুইসবুর্গের "ডেমাগ" কোম্পানীর ডিরেক্টর রয়টার, লাইপৎসিগের ব্যাঙ্কডিরেক্টর ওপ্পেন-হাইম, আউগ্‌সবুর্গ ও ন্যিরনব্যর্গের এম্‌-আ-এন কোম্পানীর অন্যতম প্রধান ডিরেক্টর ভেলহাউজেন ইত্যাদি জার্ম্মাণির নানা কেন্দ্রের নানা "করিৎকর্ম্মা" ব্যক্তির নিকট হইতে বকমারি উপকার পাওয়া গিয়াছিল।

এইবার অষ্ট্রিয়ার কথা কিছু বলা যাউক। ভিয়েনার সমাজ-শাস্ত্রী ওথমার স্পান্‌ ও তাঁহার শিষ্য অধ্যাপক য়াকোব বাক্‌সা, রাষ্ট্রশাস্ত্রী হান্‌স্‌ কেলজেন, অষ্ট্রিয়ান রিপাব্লিকের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট কৃষিবিষয়ক অর্থশাস্ত্রী মিখায়েল হাইনিশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার (রেক্টর) ঐতিহাসিক গ্লাইসপাখ, বণিকভবনের ডিরেক্টর গ্যেট্‌সিঙ্গার এবং কলিকাতার বসু-ইন্‌ষ্টিটিউটের অতিথি-অধ্যাপক উদ্ভিদ-শাস্ত্রী হান্‌স্‌ মোলিশ ইত্যাদি পণ্ডিতগণের সঙ্গে আদান-প্রদান হইয়াছিল। এই সূত্রে অষ্ট্রিয়ার অন্য শহর ইন্‌স্‌ব্রুকে যে সকল সুধীর সাহচর্য্য ঘটিয়ছিল, তাঁহাদের ভিতর প্রাচীন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ লেমান-হাউপ্‌ট্‌, আন্তর্জ্জাতিক আইনকানুনের অধ্যাপক লাম্প, অর্থশাস্ত্রী গ্যিণ্টার ও শুল্লার্ণ, রাসায়নিক ফিলিপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার শাসনশাস্ত্রী কোগ্‌লার, ভাষাশাস্ত্রী আম্মান, চিকিৎসা-শাস্ত্রী জেকেল ইত্যাদি পণ্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য।

বার্লিনে দেখা কয়েকটা বড়-বড় কারবারের নাম করা যাইতেছে, যথা :—

(১) ক্লিঙ্গেনব্যর্গ বৈদ্যুতিক কারখানা, (২) ওষ্টবাঙ্ক ফ্যির হাণ্ডেল উণ্ড ইণ্ডুষ্ট্রী, (৩) "টেখ্‌নিক উণ্ড ভির্টশাফ্‌ট" পত্রিকার কার্য্যালয়, (৪) "ষ্টক" কোম্পানীর মোটর চালিত হালের কারখানা, (৫) ডিস্কোণ্টো গেজেলশাফ্‌ট (ব্যাঙ্ক), (৬) বার্লিনার-হাণ্ডেল্‌স্‌গেজেল্‌শাফ্‌ট (ব্যাঙ্ক), (৭) আলিয়ান্‌ৎস্‌ উণ্ড ষ্টুটগার্টার বীমাকোম্পানী, (৮) "ল্যেভে" যন্ত্রপাতির কারখানা, (৯) ড্রেস্‌ড্‌নার বাঙ্ক, (১০) নর্থ বৃটিশ অ্যাণ্ড মার্ক্যাণ্টাইল বীমা কোম্পানী, (১১) "রুডল্‌ফ মোস্‌সে' প্রকাশক কোম্পানী, (১২) "উল্‌ষ্টাইন" প্রকাশক কোম্পানী।

"রাইখ্‌স্‌-ফার্বাণ্ড ড্যর ডয়চেন ইণ্ডুষ্ট্রী" (সর্ব্বজার্ম্মাণ শিল্পসঙ্ঘ) জার্ম্মাণির উচ্চতম কারখানা-পরিষৎ। প্রথম প্রবাসের সময় হার্মান ব্যিশরকে ইহার প্রেসিডেণ্ট দেখিয়াছি। দ্বিতীয় প্রবাসের সময় প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ফ্রাঙ্কফোর্টের রাসায়নিক ডুইসব্যর্গ। এই পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তাদের ভিতর ডক্টর ৎসোবেল, ফোন ব্রাকেল এবং ফোন লুপিন ইত্যাদির সঙ্গে আলোচনা হইত।

বার্লিনের বাহিরে জার্ম্মাণির নানা জনপদে যে সকল কারখানা ও কারবারের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা গিয়াছিল তাহার ভিতর নিম্নে কতকগুলা উল্লেখ করা হইতেছে, যথা—

(১ কোলোনের নিকটবর্ত্তী ড্যয়ট্‌সের মোটরযন্ত্রের কারখানা; এবং জোলিঙ্গেনের ছুরি-কাঁচির কারখানা সমূহের ভিতর ডিরেক্টর হেণ্ডরিখ্‌স্‌ পরিচালিত হার্ডার কারখানা, আর ডিরেক্টর ব্রাস পরিচালিত কাউফমান কারখানা ইত্যাদি।

(২) নির্ণবার্গের ডিরেক্টর ...

(ছুঁচের কারখানা), "এম্-আ-এন" যন্ত্রকারখানা, আর "মিল্‌চ্-হোফ" (দুধের কারখানা) ইত্যাদি।

(৩) বীলেফেল্ডের ডক্টর শারশ্মিট-পরিচালিত "গুণ্ডলাখ" ছাপাখানা ও প্রকাশকভবন, এবং "ফিশার উণ্ড কের্কে" যন্ত্রকারখানা ইত্যাদি।

(৪) ভিৎসবুর্গের বিয়ার কারখানা, "ষ্টিট্‌র্স্" ছাপাখানা, নোয়েল কোম্পানী (পুল-রেল ইত্যাদির কারখানা), ডক্টর কালে-পরিচালিত সিমেণ্টের কারখানা, "ফ্রাঙ্কোনিয়া" চক্‌লেট (মিঠাইয়ের) কারখানা, ক্যেনিগ উণ্ড বাওয়ার কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্র তৈয়ারির কারখানা ইত্যাদি।

(৫) লাইপৎসিগের জাক কোম্পানীর কৃষিযন্ত্রের কারখানা, কির্খনার কোম্পানীর কাঠবিষয়ক যন্ত্রপাতির কারখানা, শেল্টার উণ্ড গীজেকে কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রের কারখানা, "ইন্সেল" প্রকাশক-ভবন, "মার্কার্ট উণ্ড পেটার্স" (প্রকাশকভবন), "ক্যেলার উণ্ড ফোল্ক্‌মান" (প্রকাশকভবন), "মেস্‌সাম্ট্" (মেলা দপ্তর) ইত্যাদি।

(৬) কাল্‌স্রুহের রাইনবন্দর, ডিরেক্টর ডক্টর মোস-পরিচালিত "হাইড উণ্ড নয়" কোম্পানীর সিলাইয়ের কলের কারখানা ইত্যাদি।

(৭) য়েনার "ৎসাইস" কাচের কারখানা, "শট" কাচের কারখানা, "ফিশার" প্রকাশক-ভবন ইত্যাদি।

(৮) আউগ্‌স্‌বুর্গের প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডেনমায়ার-পরিচালিত তুলার সুতা ও কাপড়ের কল, রেল কারখানা, "এম-আ-এন্" (ডীজেল মোটর কারখানা) ইত্যাদি।

(৯) ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্টের "মাশিনেন ফাব্রক" (যন্ত্র-কারখানা)।

(১০) ডুইসবুর্গের ডিরেক্টর রয়টার-পরিচালিত "ডেমাগ"

বার্লিন, ভিয়েনা, ইন্স্ব্রুক, মিউনিক, ষ্টুটগার্ট, কার্লস্রুহে, ন্যুর্ণ্ব্যার্গ, বীলেফেল্ড, ভ্যিৎর্স্বুর্গ, জোলিঙ্গেন, লাইপৎসিগ ইত্যাদি শহরের "ইণ্ডুষ্ট্রীউণ্ড হাণ্ডেল্স্কাম্মার" (শিল্প-বাণিজ্য ভবন) এর সঙ্গে কথঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সাধিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় জার্ম্মাণ প্রবাসের দেখাশুনা আর আলাপ-পরিচয়ের কতকগুলা বিশেষত্ব আছে।

প্রথমতঃ, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিক্ষেত্রে "রাট্সিওনালিজীরুঙ", র‍্যাশন্যালিজেশন বা "যুক্তিযোগ" কাহাকে বলে তাহা স্বচক্ষে দেখিবার ও বুঝিবার জন্য কারবারগুলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। "যুক্তিযোগ"কে "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবে"র লক্ষণ বিবেচনা করা লেখকের অর্থশাস্ত্র-গবেষণার অন্যতম বনিয়াদ।

দ্বিতীয়তঃ, এই সময়েই (১৯২৯-৩১) বিশ্বব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগ দেখা দেয়। সেই মন্দার জোয়ার জার্ম্মাণির সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিবার সুযোগ জুটে। কারবার-গবেষণার ভিতর ছিল মন্দা-বিশ্লেষণ আর বেকার-বিশ্লেষণ অন্যতম বড় কথা।

তৃতীয়তঃ, লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে ডয়েস-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপ্রণালীর পরিবর্ত্তে ইয়ং-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপ্রণালী ঐই সময়ে কায়েম হইয়াছিল। অধিকন্তু ১৯৩১ সনে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট হুভার-প্রবর্ত্তিত প্রথম "মরাটোরিয়াম" বা কর্জ্জের রেহাই জারি করা হয়।

ফলতঃ, আর্থিক জার্ম্মাণির এক বিপুল সন্ধিক্ষণে লেখকের দ্বিতীয় জার্ম্মাণ প্রবাস ঘটিয়াছিল। এই সমুদয় ওলট-পালটের স্পর্শে আসিয়া গবেষণার আকার-প্রকারও বদলাইতেছিল।

জার্ম্মাণির বিভিন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের সঙ্গে হৃদ্যতাও আলোচনার সুযোগও যথেষ্ট ছিল।

য়েনায় দার্শনিক অয়কেনের বিধবা পত্নীও কন্যার গৃহে অতিথি

ছিলাম (৯-১০ মে ১৯৩০)। অয়কেন-ভবনেই বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। অর্থশাস্ত্রী যোসেফি, ইতিহাসাধ্যাপক গ্যার্লাণ্ড, সমাজশাস্ত্রী শোমেরুস, শিক্ষা পরিচালক ষ্টিয়ার ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

জার্ম্মাণির প্রবীনতম ভারতশাস্ত্রী যুলিউস যোলিকে ভ্যুৎর্সবুর্গে অতি অথর্ব্ব অবস্থায় দেখিয়াছিলাম (১৮ জানুয়ারি ১৯৩১)। এই তথ্য ভারতসন্তানের পক্ষে উল্লেখযোগ্য। তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইত্যাদি পণ্ডিতগণের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।

এইবার কয়েকটা মফঃস্বলের যে সকল পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারা গিয়াছিল তাঁহাদের কয়েকজনের নাম করিয়া যাইতেছি ঃ—

(১) কোলোনের সমাজশাস্ত্রী ফোন ভীজে, যানবাহন-শাস্ত্রী টীস, গ্রীস-শাস্ত্রী ক্রোল, অর্থশাস্ত্রী একার্ট ও শ্মালেনবাখ, এবং ইতিহাসাধ্যাপক মার্টিন স্পান ইত্যাদি।

(২) ড্রেসডেনের বাস্তুশাস্ত্রী এঞ্জিনিয়ার ম্যিসমান, রাসায়নিক হাইডুশকা, শিক্ষাশাস্ত্রী ক্লাইনডীন্‌ষ্ট ইত্যাদি।

(৩) লাইপৎসিগের কৃষিযন্ত্রশাস্ত্রী হোল্‌ডাক, রাষ্ট্রশাস্ত্রী য়ার-রাইস, অর্থশাস্ত্রী ভীডেনফেল্ড, গ্রন্থাগার-পরিচালক উলেনডাল, চিকিৎসাশাস্ত্রী জিগেরিষ্ট ইত্যাদি।

(৪) ভ্যুৎর্সবুর্গের ভূগোলশাস্ত্রী জাপ্পার, ধর্ম্মশাস্ত্রী ম্যার্ক্‌লে, শিশুচিকিৎসাশাস্ত্রী রীট্‌শেল ইত্যাদি।

(৫) ন্যির্ণবার্গের অর্থশাস্ত্রী হেলাণ্ডার, লেমান ও ফ্যার্জোফেন, মিউজিয়াম-পরিচালক হাম্‌পে, সমাজশাস্ত্রী রুম্‌ফ্‌ ইত্যাদি।

(৬) কার্লস্‌রুহের অর্থশাস্ত্রী ভেলে ও ভাফেনশ্মিট্‌, নদী-বিষয়ক এঞ্জিনিয়ার রেবক, রেল-বিষয়ক এঞ্জিনিয়ার আম্মান, ব্যাঙ্কশাস্ত্রী ষ্টাইন, আলোকবিষয়ক এঞ্জিনিয়ার টাইখ্‌ম্যিলার, যন্ত্রশাস্ত্রী গ্রোবষ্ট্‌ ও প্লাঙ্ক, পদার্থশাস্ত্রী গায়েডে, রাসায়নিক ক্যোনিগ ইত্যাদি।

(৭) ফ্রাঙ্কফোর্টের অর্থশাস্ত্রী প্রিব্রাম, ফ্যেল্কার ও আর্ণ্ট্, ব্যাঙ্কশাস্ত্রী কাল্‌ভেরাম ও কান, সমাজশাস্ত্রী গ্রোসমান, পল্লিগকাইট ও জালোমোন, ইতিহাসাধ্যাপক ক্যেব্‌নার ইত্যাদি।

প্রথম প্রবাসের সময় বার্লিন ছিল প্রধান আড্ডা। কাজেই দ্বিতীয়-বারে বার্লিনে অনেক পুরাণা মুখের সঙ্গে দেখাশুনা হইয়াছিল বলা বাহুল্য। নয়া-পুরাণা কয়েকজনের নাম করা যাইতেছে, যথা—কৃষিবিশ্ব-বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার আয়েরেবোয়ে এবং কৃষিবিষয়ক অর্থশাস্ত্রী রিট্টার, শিক্ষাশাস্ত্রী রেস্মে, বাস্তশাস্ত্রী য়াফফে, রেল-প্রেসিডেণ্ট হাম্মার, চিকিসাশাস্ত্রী কুট্‌নার ও ফ্লাইশমান, ইস্‌লামশাস্ত্রী বেক্কার, ভারতশাস্ত্রী লিয়ডার্স ও গ্লাজেনাপ, কর্পোরেশনের অন্যতম এঞ্জিনিয়ার বাসিন, "ডয়চে রুণ্ডশাও"-সম্পাদক রুডল্‌ফ্ পেখেল, "ডয়চার ফোল্কস্-ভির্ট্"-সম্পাদক ষ্টোল্‌পার, অর্থশাস্ত্রী শুমাখার, প্রিয়োন, বন ও ব্রীফ্‌স্, বাণিজ্যশাস্ত্রী লাইট্‌নার ও নিক্‌লিশ, সংখ্যাশাস্ত্রী ভাগেমান ও ভোইটিন্‌স্‌কি, বীমাশাস্ত্রী মানেস, আইনশাস্ত্রী রাবেল ও আডাম, যন্ত্রশাস্ত্রী শ্লেজিঙ্গার ও মাচ্চস। কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে সরকারী বীমাদপ্তরের ডক্টর ব্যালিনার, আলিয়ান্‌ৎস উণ্ড ষ্টুটগার্টার বীমা কোম্পানীর হেনিগ, সর্ব্বজার্ম্মাণ মজুর পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তা ফুর্টভ্যেংলার, রাইখষ্টাগের মজুর-প্রতিনিধি ব্রাণ্ডেস, ধাতু-মজুর-সমিতির কর্ম্মকর্ত্তা গ্রোণ, তাঁতমজুর-পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রাডার, সরকারী সংখ্যাদপ্তরের কর্ম্মকর্ত্তা ফাইল্লেন ইত্যাদি ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য।

বার্লিনে সরকারী "ষ্টাটিষ্টিশেস্ রাইখ্‌স্-আম্‌ট্" নামক সংখ্যাদপ্তরের তদবিরে "ইন্‌ষ্টিটুট ফ্যির কোন্‌যুঙ্কটুর-ফর্শুঙ্" (আর্থিক পরিস্থিতি পরিষৎ) চলিয়া থাকে। দুয়েরই প্রেসিডেণ্ট অর্থশাস্ত্রী ভাগেমান। তাঁহার সঙ্গে তুলনামূলক সংখ্যা-প্রয়োগ সম্বন্ধে দপ্তর ও পরিষদের আব-হাওয়ায় আলোচনা হইত।

"আর্খিফ ফ্যির সীডলুংসভেজেন উণ্ড ষ্টেটেবাণ্ড" (আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপন ও নগর গঠন বিষয়ক পরিষৎ) বার্লিনের এক উল্লেখ-যোগ্য গবেষণা-প্রতিষ্ঠান। বাস্তুশিল্পী য্যাফ্‌ফের তদবিরে এইটা চলিতেছে। এইখানে সেক্রেটারী প্রীজের সঙ্গে চিন্তার আদানপ্রদান হইয়াছে।

এক নিঃশ্বাসে যেসব লোকের নাম করিয়া গেলাম তাঁহাদের নিকট হইতে নানা উপলক্ষে যত আত্মিক ও অনাত্মিক মাল পাইয়াছি সেই সবের দাম প্রচুর। এই সকল মাল আজও চিন্তার খোরাক এবং কর্ম্মের হদিশ জোগাইতেছে। ভবিষ্যতের অনুসন্ধান-গবেষণায়ও তাঁহাদের সঙ্গে ছোঁআ-ছুঁয়ির ছাপ থাকিয়া যাইবে। তাঁহাদের অনেককে জীবনের চিরসহচররূপেই সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

তাঁহাদের পুস্তিকা, গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদি রচনাবলী নিয়মিতরূপে আসিয়া থাকে। তাহার দৌলতেই চলে "আর্থিক উন্নতি", বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ও আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গপরিষদের আর্থিক ও আত্মিক দুনিয়া বিষয়ক গবেষণা। এই সবের সাহায্যেই বঙ্গীয়-জার্ম্মাণ বিদ্যা-সংসদেরও ক্রমবিকাশ সাধিত হইতেছে। তাহা ছাড়া তুলনামূলক অর্থরাষ্ট্রসমাজশাস্ত্রের জন্য "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" (১৯২৬), "পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ সিন্স ১৯০৫" (১৯২৮), "কম্পারেটিভ পেডাগজিক্‌স্‌" (১৯২৯), "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" (১৯৩০, ১৯৩৫), "অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্‌স্‌" প্রথম ভাগ (১৯৩২), "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" (১৯৩২), "ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্স" (১৯৩৪), "বাড়তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) আর "সোশ্যাল ইন্‌শিওর্যান্স" (১৯৩৫) ইত্যাদি গ্রন্থে যে সকল জার্ম্মাণ তথ্য ও তত্ত্ব কাজে লাগানো গিয়াছে সেই সকল তথ্য ও তত্ত্ব এই পণ্ডিত ও পরিচালকবর্গের সহ-যোগিতার নিকটই ঋণী।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জার্ম্মাণ-জাতের হিট্‌লার-রাজ

(১৯৩৪ জানুয়ারি)*

প্রঃ—আচ্ছা, মশায়, আজকাল হিট্‌লার যে এত নাম করেছে এ সম্বন্ধে আপনি কখনো কিছু লিখেছেন কি? আপনি জার্ম্মাণিতে থাক্‌তে হিট্‌লারের কোনো আওয়াজ শুনেছেন?

উঃ—হাঁ, নিশ্চয়। জার্ম্মাণি সম্বন্ধে আমি বাংলায় আর ইংরেজিতে ১৯২১ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত যা কিছু লিখেছি তার ভেতর হিট্‌লারের আওয়াজ মাঝে-মাঝে শুন্‌তে পাওয়া যায়। সেই সব লেখা যথাসময়ে টাট্‌কা-টাট্‌কা বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিকে বেরিয়ে গেছে। "হিট্‌লারের আওয়াজ" বল্‌লে নেহাৎ হিট্‌লার লোকটার হুঙ্কারই সব সময়ে বুঝতে হবে না। হিট্‌লারের যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষার কাছাকাছি আকাঙ্ক্ষাওয়ালা লোক জার্ম্মাণিতে বিস্তর দেখেছি। তাদের ডাক-হাঁকও "হিট্‌লারের আওয়াজের" অন্তর্গত করে নিচ্ছি। তাছাড়া স্বয়ং হিট্‌লার, হিট্‌লারী দল, আর হিট্‌লারের ইয়ার-দোস্তের অন্যান্য লোকদের চিন্তা ও কর্ম্ম নানা ইংরেজি প্রবন্ধেও বার করেছি। এইসব পরে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বইটার নাম "পলিটিক্স অব্ বাউণ্ডারীজ্" (অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতির সীমানা)। বইটা বেরিয়েছিল ১৯২৬ সনে। অধিকন্তু জার্ম্মাণিতে হিট্‌লার-রাজ কায়েম (১৯৩৩ জানুয়ারি) হবার পর ইংরেজিতে একটা রচনা প্রকাশ করেছি। সেটা ইন্‌শিওর‍্যান্স এণ্ড ফিনান্স রিভিউ মাসিকে (অক্টোবর, নভেম্বর, ১৯৩৩) বেরিয়েছে।

---

* "সুবর্ণবণিক্ সমাচার" ও "আর্থিক উন্নতি"তে গ্রন্থকারের সহিত কবি হেমেন্দ্র বিজয় সেনের কথোপকথন (চৈত্র ১৩৪০, মার্চ ১৯৩৪)।

ব্যাভেরিয়ায় হিট্‌লার (১৯১৪-১৯)

প্রঃ—হিট্‌লারের ছেলেবেলার কথা কিছু জানেন কি ?

উঃ—বড় বেশী নয়, তবে এর জন্ম অষ্ট্রিয়াতে অর্থাৎ রাষ্ট্রিক হিসাবে এ জার্ম্মাণ-সন্তান নয়। কিন্তু ভাষা হিসাবে অষ্ট্রিয়ানরা জার্ম্মাণ বটেই। তাছাড়া ধর্ম্মে এ রোমাণ ক্যাথলিক। অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মাণরা প্রায় সবই রোমাণ ক্যাথলিক। আর একটা খবর জানি। লড়াই স্বরু হবার সময় (১৯১৪) এর বয়স ছিল বছর পঁচিশেক। এই সময় হিট্‌লার অষ্ট্রিয়া ছেড়ে দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে অর্থাৎ ব্যাভেরিয়াতে এসে হাজির হয়। আর ব্যাভেরিয়াতেই জার্ম্মাণ সেনাবিভাগে নকরি নিয়ে লড়াইয়ে যেতে যায়। সামরিক শাসন ছিল তখনকার দিনে প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন।

প্রঃ—অষ্ট্রিয়ান হয়ে হিট্‌লার ব্যাভেরিয়ার সঙ্গে এত হামদর্দ্দি করলে কেন ?

উঃ—দক্ষিণ জার্ম্মাণির লোকেরা অর্থাৎ ব্যাভেরিয়ান নরনারী ধর্ম্মে রোমাণ ক্যাথলিক। আর উত্তর জার্ম্মাণির লোকেরা অর্থাৎ প্রশিয়ান নরনারী প্রটেষ্টাণ্ট। কাজেই অষ্ট্রিয়ানরা ব্যাভেরিয়ার লোকজনকে সামাজিক হিসাবে অনেকটা নিজের ভাই-বোন বা আত্মীয়-স্বজন বিবেচনা করে। মজার কথা,—ব্যাভেরিয়ার লোকেরা প্রুশিয়ার লোকজনকে বড় বেশী পছন্দ করে না। ব্যাভেরিয়ান নরনারী অষ্ট্রিয়ার লোকজনকেই ঘরকন্নার তরফ হতে প্রুশিয়ার লোকজনের চেয়ে বেশী নিজের বিবেচনা করে। এই গেল হিট্‌লারের সঙ্গে ব্যাভেরিয়ার মাখামাখির গোড়ার কথা। আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য। ছেলেবেলায় অথবা যৌবনে বিশেষতঃ লড়াইয়ের কয়েক বৎসর আগে হিট্‌লার ব্যাভেরিয়ার মিউনিক শহরে যাতায়াত করত। সেই থেকে শেষ পর্য্যন্ত ব্যাভেরিয়ার পল্‌টনে জার্ম্মাণ ফৌজ হিসাবে হিট্‌লার

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়তে লেগে যায়। যুদ্ধের যুগটায় (১৯১৪-১৮)হিট্‌লার জার্ম্মাণ দেশের প্রজা বা "নাগরিক" ছিল না।

প্রঃ—লড়াইয়ের পর তার কিছু খবর পাওয়া যায়?

উঃ—বড় খবর এই যে, লড়াইয়ের পর অন্যান্য দেশের মতন জার্ম্মাণিতেও কমিউনিষ্ট বিপ্লব বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাথা খাড়া করেছিল। এই হাঙ্গামার একটা বড় কেন্দ্র ছিল ব্যাভেরিয়ার মিউনিক শহর। ১৯১৯ সনের মাঝামাঝির কথা বল্‌ছি। সেই সময় কমিউনিষ্ট বিপ্লবকে ধ্বংস করবার জন্য মিউনিকের যে সকল জার্ম্মাণ যুবা স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করেছিল, হিট্‌লার তাদের অন্যতম।

কমিউনিজ্‌মের যম, কিন্তু দারিদ্রের সেবক (১৯১৯)

প্রঃ—হিট্‌লার তাহলে কমিউনিষ্ট নয়?

উঃ—নিশ্চয় না। ও হচ্ছে কমিউনিজমের যম। মনে রাখতে হবে যে,—সে সময় সমস্ত ইয়োরোপে বা পৃথিবীর সর্ব্বত্র রুশ লেনিনের জয়জয়কার। সেই যুগে অর্থাৎ বোল্‌শেভিজমের বিশ্ববিজয়ের প্রথম যুগে হিট্‌লার কমিউনিজম্‌ ধ্বংস করবার কাজে এগিয়ে গিয়েছিল।

প্রঃ—আচ্ছা মশায়, কমিউনিজম্‌কে লোকেরা জনসাধারণের স্থযোগ-স্থবিধা বিস্তারের যন্ত্রস্বরূপ বিশ্বাস করে না কি? আর জনসাধারণের অধিকার খর্ব্ব করার কাজে যদি হিট্‌লার একটা বড় চাঁই ছিল, তাহলে ১৩।১৪ বৎসরের ভেতর আর বিশেষতঃ সম্প্রতি জার্ম্মাণির জনসাধারণ হিট্‌লারকে এত পূজা করে কেন?

উঃ—এইখানেই একটা নতুন রহস্য আছে। হিট্‌লার কমিউনিষ্ট-বিপ্লব ধ্বংস করলে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৯ সনেই একটা মজুর-দলের সভ্য হয়ে পড়্‌ল। আর এর মধ্যেও একটা মজার কথা আছে। লোকটা মজুর-দলের সোয়াদ পেলে কোথায়? ঐ সময় হিট্‌লার

ব্যাভেরিয়ান পল্টনে বাহাল ছিল। পল্টনের ফৌজগুলোকে লেখাপড়া শেখাবার দস্তরমতন সরকারী ব্যবস্থা আছে। তখনও ছিল। একটা শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ধনবিজ্ঞান। আর এই ধনবিজ্ঞানের মাষ্টার ছিল গট্‌ফ্রীড্ ফেডার। এই ব্যক্তির ধনবিজ্ঞান-আলোচনার ভেতর একটা কথা খুব বড় আকারে দেখা দিত। সেটা হচ্ছে "স্বার্থের দাসত্ব-শৃঙ্খল না ভাঙলে সমাজের মঙ্গল নাই।" এই মুদ্দা হিট্‌লারের মাথায় খুব জোরের সহিত বসেছিল। কাজেই নির্দ্ধনের কথা ভাবা, কেরাণীর কথা ভাবা, মজুরের কথা ভাবা, চাষীর কথা ভাবা হিট্‌লারের চিন্তার ভিতর খুব বড় ঘর অধিকার করে।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও জেনে রাখা ভাল যে, হিট্‌লার নিজে বড়লোকের বাচ্চা নয়। মামুলি মধ্যবিত্তের ঘরে এর জন্ম। হিট্‌লারের বাপ ছিল শুল্ক-দপ্তরের কেরাণী। চৌদ্দ পুরুষে কখনও নবাবী বিলাসভোগ ইত্যাদি কাণ্ড হিট্‌লারের কোষ্ঠিতে লেখা ছিল না। কাজেই এর পক্ষে দরিদ্রের ক্রন্দন, মধ্যবিত্তের দুরবস্থা, চাষীর দৈন্য ইত্যাদি কথা ধন-বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ মাত্র নয়; অথবা নেহাৎ খবরের কাগজ পড়ে' গরিবের সঙ্গে দহরম-মহরম চালানো এর পক্ষে আবশ্যক হয় নি। জন্মেছিল এ দারিদ্র্যের আবহাওয়ায়। কাজেই চাষী, মজুর ও জনসাধারণ হিট্‌লারের পক্ষে স্বাভাবিক রূপেই অতি প্রিয়।

নাৎসি দলের দুই বাণী (১৯২০)

প্রঃ—হিট্‌লার জার্ম্মাণির রাজনৈতিক আন্দোলনে কখন কি ভাবে প্রবেশ করলে? আর তখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অবস্থাই বা কিরূপ?

উঃ—১৯২০ সনেই হিট্‌লারের রাজনৈতিক কাজকর্ম্ম প্রথম মূর্ত্তি গ্রহণ করে। তার দলের নাম হয়—ন্যাশন্যাল-সোশ্যালিষ্ট। তাতে

অবশ্য ৫।৭ জন ছেলেছোক্‌রা ভিড়েছিল। ঐ সঙ্গেই ভারতের সুপরিচিত স্বস্তিক চিহ্নও নিশানে কায়েম করা হয়। এই চিহ্নটাকে হিট্‌লার টিউটনিক জাতির আবিষ্কৃত আদিম চিহ্ন বিবেচনা করে! আদিম টিউটনিক বল্‌লে আজকালকার জার্ম্মাণ মহলে আর অন্যান্য ইয়োরোপীয়ান মহলেও "নর্ডিক্" অর্থাৎ উত্তুরে্য জাত বিবেচনা করা হয়। ঐ সময়েই হিট্‌লার তার দলের বিভিন্ন বিভাগ কায়েম করে। এক বিভাগের কাজ ছিল অসম-সাহসিক কাজ করা ("ষ্টুর্ম্" করা)।

প্রঃ—মশায় আজকাল যাকে নাজি দল বলা হয় সেটা কিরূপ জানোয়ার? হিট্‌লার সেটা কায়েম কর্‌লে কবে?

উঃ—১৯২০ সনে যে দল কায়েমের কথা বলেছি, সেটারই নাম আপনার উচ্চারিত নাজি। তাকেই ইংরেজিতে বলেছি ন্যাশন্যাল-সোশ্যালিষ্ট। এই কথাটার জার্ম্মাণ বাণান যেরূপ, তার খাঁটি জার্ম্মাণ উচ্চারণ "নাট্‌সিওনাল-সোৎসিয়ালিষ্ট"। জার্ম্মাণরা লম্বা-চওড়া নাম গুলাকে খুব সংক্ষেপে বিবৃত করবার চেষ্টা করে' থাকে। এজন্য বড় নামের একটা ছোট সংস্করণ তৈয়ার করা ওদের মামুলি দস্তুর। এই যে নাট্‌সিওনাল-সোৎসিয়ালিষ্ট শব্দটা বলা হ'ল এর প্রথম শব্দের "না"র সঙ্গে দ্বিতীয় অর্দ্ধের "ৎসি" জুড়ে' যে শব্দ হয়, সেই শব্দই এই দলের ছোট নাম।

প্রঃ—তাহলে "নাৎসি" যদি আসল্ জার্ম্মাণ নাম হ'ল, তবে ইংরেজরা তাকে নাজি বলে কেন?

উঃ—কারণ আর কিছুই নয়। ইংরেজিতে যেটি 'জেড্' বা আমাদের বাঙাল "জ" সেটা জার্ম্মাণ 'ৎস'। উচ্চারণের মামলা মাত্র।

প্রঃ—এরূপ কিম্ভূত-কিমাকার নাম দিয়ে হিট্‌লার জার্ম্মাণ ছোঁড়াদেরকে কি বোঝাত?

উঃ—বোঝাত দুটো কথা। প্রথম,—হতে হবে দেশ-ভক্ত। হিট্‌লার

বল্‌ত—"ভাব্‌বি সর্ব্বদা সমগ্র জাতির কথা, গোটা দেশের কথা। কোনো একটা শ্রেণীর কথা ফুলিয়ে তুলিস না। কোনো একটা সম্প্রদায়ের কথা বা দলের কথা ফেনিয়ে তুলে' দেশের স্বার্থ খাটো করিস না। চাই ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণ জাতির উন্নতি।" একে বলে ন্যাশন্যালিজম্‌।

দ্বিতীয় কথা ছিল—"ভাব্‌বি চব্বিশ ঘণ্টা গরিবের কথা, কেরাণীর কথা,—কেরাণীর আর্থিক উন্নতি, চাষীর আর্থিক উন্নতি, মজুরের আর্থিক উন্নতি। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য প্রাণপাত কর্ত্তে হবে।" এই জিনিষটাকে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ বল্‌তে পারি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা ষোল আনা সোশ্যালিজ্‌ম্‌ নয়। কেন না যারা ষোল আনা সোশ্যালিষ্ট তারা নির্ধনদের উপকার করবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভেতর একটা শ্রেণীবিরোধ, ঘরোয়া লড়াই ইত্যাদি অশান্তি কায়েম করতে প্রস্তুত। কম্‌-সে-কম শ্রেণী-বিরোধের আবহাওয়া তৈয়ের করা সোশ্যালিজমের স্বধর্ম্ম। হিট্‌লার সোশ্যালিষ্ট হিসাবে গরিবের উন্নতি চায় কিন্তু ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের লড়াই চায় না।

ন্যাশন্যালিষ্ট, সোৎসি আর কমিউনিষ্টের বিরুদ্ধে হিট্‌লার

প্রঃ—১৯১৯-২০এর যুগে জার্ম্মাণিতে অন্যান্য দল কিরূপ ছিল ?

উঃ—ছিল অনেক দল। সব চেয়ে বড় দল ছিল সোশ্যালিষ্ট। তাদের ছোট নাম "সোৎসি"। বোঝাই যাচ্ছে, এই দলটার বিরুদ্ধে খাড়া হল "নাৎসি"। আর একটা দল ছিল খুব নামজাদা—লড়াইয়ের সময় সেই দলই ছিল প্রবল দল। এই দলকে সহজে ন্যাশন্যালিষ্ট দল বলা যেতে পারে। ন্যাশন্যালিষ্ট দল সোৎসিদের সঙ্গে চিরকালই আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ চালিয়ে এসেছে। কিন্তু লড়াইয়ের পর,—যুদ্ধে হেরে যাবার ফলে ওদের ক্ষমতা সোৎসির চেয়ে অনেক কম হয়ে পড়েছিল। এই সময় আর একটা দল নতুন মাথা খাড়া

করে, তারা হল পুরোপুরি লেনিনপন্থী কমিউনিষ্ট। মনে রাখতে হবে যে, জার্ম্মাণরা ফরাসী, ইতালিয়ান এবং ইয়োরোপের অন্যান্য জাতের মতন ডজন-ডজন রাষ্ট্রিক দলে বিভক্ত। ইংরেজদের মতন বা মার্কিণদের মতন দুটো বা তিনটে দলে ওদের পেট ভরে না।

হিট্‌লার এই দল-বহুত্বের ভিতর ছুঁচ হয়ে ঢুক্‌ল। দেখাই যাচ্ছে যে, এ লোকটা মামুলি সোৎসিও নয়, কেননা এ শ্রেণী-বিরোধ চায় না, আবার মামুলি ন্যাশন্যালিষ্টও নয়, কেননা এ গরিবদের কথায় মাথা ঘামায় বেশ দস্তুর মতন। তা ছাড়া হিট্‌লার কমিউনিজমের যম ত বটেই।

পরাজয়ের অপমান

প্রঃ—আচ্ছা হিট্‌লারের মাথায় লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে এমন কোন্ কথাটা এসেছিল, যাতে দেশের লোকেরা একটা নতুন-কিছু পেতে পারে ?

উঃ—লড়াইয়ে জার্ম্মাণরা যে হেরে গেছে এই কুষ্ঠ জার্ম্মাণ নরনারীর প্রাণে ঘা মার্‌ত। জার্ম্মাণরা ভার্সাই সন্ধির অপমান কোনো মতেই সইতে পার্‌ত না। ঘরে ঘরে জার্ম্মাণ নরনারী ভার্সাইয়ের কথা ভাব্‌ত আর দাঁত কিড়মিড় করে' মর্‌ত। তাদের বিশ্বাস এই যে, জার্ম্মাণরা লড়াইয়ে হেরেছে একমাত্র সোশ্যালিষ্টদের ষড়যন্ত্রে। সোৎসিদেরকে স্বদেশদ্রোহী, কুলাঙ্গার, নরপিশাচ বিবেচনা করা ঐ সময়ে জার্ম্মাণদের একমাত্র চিন্তাধারা ছিল। তারা মনে কর্‌ত যে, সোৎসিরা শত্রুপক্ষের লোকজনের সঙ্গে ভিতরে-ভিতরে কথা চালিয়ে শত্রুপক্ষের সাহায্যে জার্ম্মাণ পল্টনের ভেতর স্বদেশ-দ্রোহ ঢুকিয়েছে। তার ফলেই জার্ম্মাণদের পরাজয়। বলা বাহুল্য এই মত সোৎসি দলের নয়। সোৎসি-বিরোধী যে সকল জার্ম্মাণ নরনারী,—তাদের প্রাণের কথা এইখানে। কাজেই জার্ম্মাণ সমাজে ভার্সাইয়ের বিরুদ্ধে ভিতরে-

ভিতরে খুব প্রবল আন্দোলন চল্‌ছিল। হিট্‌লার ভার্সাই-বিরোধী আন্দোলনেরই অন্যতম জবর প্রতিমূর্ত্তি। এই বিষয়ে হিট্‌লারকে একমেবাদ্বিতীয়ং অথবা সর্ব্বপ্রধান বিবেচনা কর্‌লে চল্‌বে না। অন্যান্য নামজাদা ন্যাশনালিষ্টের মতন হিট্‌লারও যখন-তখন যেখানে-সেখানে জার্ম্মাণ যুবার দলকে ভার্সাইয়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ত।

নাৎসি বনাম মামুলি ন্যাশন্যালিষ্ট

প্রঃ—হিট্‌লার ত ছোকরা মশায়, অজ্ঞাতকুলশীল। আর অন্যান্য ন্যাশন্যালিষ্টরা ত পাকা, ঝানু রাষ্ট্রনায়ক। লড়াইয়ের যুগের প্রতিপত্তি, টাকা-পয়সা, সমাজের ইজ্জদ্ ইত্যাদি সবই তাদের ছিল। তাহলে শেষ পর্য্যন্ত ১২।১৪ বছরের ভিতর হিট্‌লার দাঁড়িয়ে গেল কি করে' ?

উঃ—অন্যান্য ন্যাশন্যালিষ্টরা ভার্সাইয়ের বিরুদ্ধে দেশের লোককে ক্ষেপাত বটে, প্রতিহিংসার কথা তাদের প্রাণে সর্ব্বদাই জাগরুক ছিল বটে, লড়াইয়ের জন্য তাদের হাত-পা সর্ব্বদা সুড়্-সুড়্ কর্‌ত বটে, কিন্তু জার্ম্মাণ দেশটার ভিতরেই যে আর্থিক ও সামাজিক গলদ রয়েছে, আর সেই গলদগুলাকেও কেটে-ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া যে স্বদেশ-সেবকদের কর্ত্তব্য এ কথাটা নামজাদা ন্যাশন্যালিষ্টদের মগজে বড় বেশী ঢুকত না।

কিন্তু এই গরিবের দরদ নিয়েই হিট্‌লারের আবির্ভাব। হিট্‌লার হামেশা বল্‌ত—"লড়াইয়ের সময়কার মোটা মোটা মুনাফা যারা পেয়েছে সে সকল পুঁজিপতিদের উপর চড়াহারে ট্যাক্স বসাও। বড় বড় কোম্পানী, সঙ্ঘ, ট্রাষ্ট ইত্যাদি শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিপতিদের আওতা থেকে সরকারী তাঁবে আন। ছোট ছোট দোকানদার, বেপারী, বণিক্‌দেরকে যথাসম্ভব সাহায্য কর। মস্ত মস্ত জমিদারীগুলোকে ভেঙ্গে তার জায়গায় সার্ব্বজনিক চাষ বা

আর-কিছু ব্যবস্থা কর” ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এসব ঝাঁজে মামুলি ন্যাশন্যালিষ্ট মহলে বরদাস্ত হবার নয়। কিন্তু এগুলোই হিট্‌লার-নীতির “স্বার্থ-শৃঙ্খল ভাঙ্গা”র আসল কথা। এই জন্য হিট্‌লারের কথায় জন-সাধারণের চিঁড়ে ভিজ্‌ত।

সোশ্যালিষ্টদের নৈরাশ্য-নীতি (১৯১৯-২৪)

প্রঃ—হিট্‌লার যখন অজ্ঞাতকুলশীল, তখন আপনি জার্ম্মানিতেই ছিলেন? সে সময় হিটলারী হাবভাব জার্ম্মাণ-সমাজে কি রকম লক্ষ্য করেছেন?

উঃ—১৯২১-২২-২৩-২৪ সনের সময়কার কথা বলছি। তখন জন-সাধারণ ন্যাশন্যালিষ্ট আদর্শে বেশ-কিছু অনুপ্রাণিত ছিল। খোলাখুলি ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে বেশী-কিছু বলার সাহস অধিকাংশ লোকের ছিল না। বিশেষত রাইখ্‌ষ্টাগের সভ্যদের ভেতর সোৎসি দল প্রবল। ন্যাশন্যালিষ্ট ভাবাপন্ন লোকেরা গবর্ণমেন্টের বড় বড় কাজে বেশী কিছু করতে পেত না। সর্ব্বদাই সোশ্যালিষ্টরা নরম সুরে কথা বলে' ফ্রান্স ইত্যাদি দেশকে তোয়াজ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। জনসাধারণের মনে সোশ্যালিষ্টরা পার্লামেন্টের ভিতর আর বাহিরে বেশ একটা নৈরাশ্যের আবহাওয়া তৈরি কর্‌তে পেরেছিল। ভার্সাইয়ের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণির পক্ষে মাথা চেঁড়ে উঠা অসম্ভব এইরকম মত সোশ্যালিষ্ট-চালিত আর সোশ্যালিজ্‌ম্‌-ঘেঁষা সংবাদপত্রে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রচারিত হত।

প্রঃ—আচ্ছা মশায়, তাহলে ফরাসীরা যখন রুর দখল করেছিল, তখন তার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণরা ক্ষেপ্‌লে কি করে'?

উঃ—সে ১৯২৩ সনের কথা। সেই সময় জার্ম্মাণরা অল্প কিছু দিনের জন্য তেতে উঠেছিল। আর সেই কাজে সোশ্যালিষ্টরা সাহায্য করে নি। করেছিল ন্যাশন্যালিষ্টরা। তাদের ভিতর একজন নামজাদা

ক্রুর্মবীর ছিল,—অর্থশাস্ত্রী, সে ব্যাঙ্কের ওস্তাদ হেল্‌ফেরিখ। এরা ভারতের সুপরিচিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালিয়েছিল। এই সময়ে হিট্‌লার তত বেশী নামজাদা লোক ছিল না। কিন্তু তখনই হিট্‌লারের মত ছিল সম্মুখ সমর—সক্রিয় প্রতিরোধ। অবশ্য হিটলারের মত কিম্বা অন্যান্য যে-সকল ন্যাশন্যালিষ্ট রীতিমত লড়াই চেয়েছিল,—তাদের মত বেশী-কিছু জোর পায় নি!

যৌবন-আন্দোলনের আবহাওয়া (১৯১৯-২৪)

প্রঃ—তাহলে আস্তে আস্তে জার্ম্মাণ সমাজ হিট্‌লারকে আপনার ক'রে নিলে কি করে'?

উঃ—মনে রাখতে হবে যে, জার্ম্মাণ "গভর্ণমেণ্ট" ছিল প্রধানতঃ নরমপন্থী। বুড়োরা আর মাঝামাঝি বয়সের লোকেরা অনেকেই ঠিক সেইরূপ নরমপন্থী। লড়াই করে' ভার্সাই সন্ধিকে রদ করা মাতব্বরস্থানীয় লোকের কল্পনায় সম্ভবপর বিবেচিত হ'ত না। কিন্তু ছোকরার দল ছিল অন্য মেজাজের। বিশেষতঃ যারা ১৯১৮ পর্য্যন্ত খাঁটি লড়াইয়ে কোনোদিন মোতায়েন হয় নি অর্থাৎ ১৯১৮ পর্য্যন্ত যাদের বয়স মাত্র ১৪।১৫।১৬ বা ১৭ বৎসর ছিল তারা লড়াইয়ের কু-টা বুঝ্‌ত না। তাদের কাছে লড়াই করে' দেশের ইজ্জদ্ আবার ফিরিয়ে আনা অতি স্বাভাবিক কথা মনে হত। যতই দিন যেতে লাগল এই সকল ছোকরারা ততই দেশের দুর্দ্দশা দেখে প্রাণে-প্রাণে কষ্ট পেতে থাক্‌ল। কাজেই তাদের মাথায় নতুন একটা শক্তিযোগের খেলা দেখানো মামুলি ডালভাতের মত বোধ হত। এদের মধ্যেই হিট্‌লারের আর তার মতন অন্যান্য ভার্সাই-বিরোধী চাঁইদের,—সম্বর্দ্ধনা জুট্‌ত।

এইখানে আর একটা কথা জেনে রাখা ভাল। ১৯১৯এর পর থেকে ৪।৫ বছর ধরে' জার্ম্মাণিতে ছোকরারা স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে,

কুস্তিকসরতের দিকে, গানবাজনার দিকে আর বনপর্য্যটনের দিকে খুব ঢ'লে পড়েছিল। শনিবার দিন ইস্কুলের ছোঁড়াছুঁড়ি, আফিসের, ব্যাঙ্কের, কারখানার ছোঁড়াছুঁড়ি, সরকারী কর্ম্ম-কেন্দ্রের, আদালতের ছোঁড়াছুঁড়ি সব হন্যেমুখী হয়ে বেরিয়ে পড়্ত শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। দুজন পাঁচজন, দশ-বিশ জন, দুশ'-পাঁচশ' জন মাত্র নয়, হাজার-হাজার, লাখ-লাখের কথা বল্ছি। এরা বেরিয়ে পড়ত এক পোষাকে,—সামান্য হয়ত ট্রামে বা রেলে, কিন্তু তার পরই পায়দল। কোথাও চলেছে হ্রদের ধারে, কখনো চলেছে পাহাড়ের চূড়ায়। কোথাও বা সমতল পাইন বনের ভেতর যোজন-যোজন, দলে দলে ঘুরে বেড়াত। সকলেরই ঘাড়ে একটা বোচকা, আর সেই বোচকায় হয়ত বা একটা কম্বল, অনেক সময় তাও নয়। তবে সকলের সঙ্গে খানিকটা রুটি, কিছু মাখন হয়ত বা কিছু মাংসও থাক্ত।

এই রকম রসদ নিয়ে ছেলেমেয়েরা শনিবার আর রবিবার বনে বনে, দরিয়ার কিনারায়, পাহাড়ের কোলে ভ্যাঁগাবাণ্ডিজ্‌ম্ বা ভবঘুরে-গিরি করে' বেড়াত। যেখানে একটা মাঠ পেত, সেখানে সন্ধ্যাবেলায় কাঠ কুড়িয়ে জ্বালাত আগুন; আর যেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত, তখনি আগুনের চারধারে লাফিয়ে-লাফিয়ে নাচানাচি আর গান গাওয়া ছিল তাদের ব্যবসা। ঠিক যেন মধুচ্ছন্দার আগুন-ঋক্ আর তার আবহাওয়া। তাছাড়া দিনে দুপুরে যেখানেই একটা মাঠ পেত, লেগে যেত খেলতে,—কুস্তি কসরত ইত্যাদি। এরই নাম যৌবন-আন্দোলন;—সমাজের বাহিরে যাওয়া, শহরকে কলা দেখানো, এমন কি পল্লীরও তোয়াক্কা না রাখা, নরনারীকে ন-কড়া-ছ-কড়া বিবেচনা করা, মামুলী নীতি, ধর্ম্ম ও সামাজিক আদর্শ ইত্যাদির সঙ্গে অসহযোগ চালানো; তার বদলে কম্‌সে কম হপ্তায় দুদিন খোলামাঠে নাচা-কুঁদা,—ম্যাণ্ডোলিন-

গিটার বাজানো, গান গাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে দহরম-মহরম, আর সকল বিষয়েই প্রাকৃতিক জীবনযাপন। সোজা কথায় ইহার নাম স্বাধীনতা।

প্রঃ—এই যৌবন-আন্দোলনের সঙ্গে হিট্‌লারের কি যোগাযোগ দেখ্‌ছেন ?

উঃ—যৌবন-আন্দোলনের ভিতর আমি গোটা জার্ম্মাণ সমাজের একটা প্রায় সার্ব্বজনিক জীবনের গতিভঙ্গী দেখ্‌ছি। এমন কি পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর বয়সের নরনারীও ইহার ভিতর গা ঢেলে দিয়েছিল। তাদের ভেতর অনেকেরই রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, আর যাও বা ছিল, তাও জার্ম্মাণির অন্যান্য সব কিছুর মত নানা দলে বিভক্ত। অধিকন্তু এই ধরণের বনে বনে "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" হওয়া একমাত্র গরমের দিনে গ্রীষ্মকালেই সম্ভবপর হত অর্থাৎ বছরে মাস তিন-চারেক মাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, ন্যাশন্যালিষ্ট-পন্থী বা ন্যাশন্যালিষ্ট-ঘেঁষা ছোঁড়াছুঁড়িরা গুন্‌তিতে নেহাৎ কম ছিল না। তারা এই ধরণের স্বাধীন জীবন, প্রাকৃতিক স্বাধীনতা আর সমাজবিদ্রোহের আনন্দ চাখ্‌তে-চাখ্‌তে খাঁটি রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার নেশায়ও বেশ-কিছু মেতে উঠ্‌ত। তাদেরই ভেতর ২০০০।৫০০০ করে' আস্তে-আস্তে অনেকে উদীয়মান হিট্‌লারের বাণীও কিছু-কিছু আনন্দের সহিতই শুনতে অভ্যস্ত ছিল। যৌবন-আন্দোলনের ভিতর হিট্‌লার-পন্থী দল ছিল বটে। কিন্তু হিট্‌লার-বিরোধী, সোৎসি-পন্থী, কমিউনিষ্ট-পন্থী এবং অন্যান্য রাষ্ট্রিক দলও যৌবন-আন্দোলনের ভিতর আত্মপ্রকাশ করেছিল।

১৯২৩-২৪ সনের হিট্‌লার

প্রঃ—আচ্ছা, হিট্‌লার বাস্তবিক পক্ষে জার্ম্মাণ সমাজে নামজাদা হল কবে ?

উঃ—১৯২৩ সনের নভেম্বর মাসে। এই সময় মিউনিক থেকে কতকগুলা ভলাণ্টিয়ার নিয়ে হিট্‌লার চেয়েছিল বার্লিন আক্রমণ কর্‌তে?

প্রঃ—কেন, বার্লিনের উপর এত আক্রোশ কেন?

উঃ—বার্লিন জার্ম্মাণির রাজধানী ত বটেই। কাজেই রাজধানী যদি দখল করতে পারা যায়, তবে গোটা জার্ম্মাণি তাঁবে আসবে। কিন্তু তার চেয়েও আর একটা ছিল বড় কথা। ভার্সাই-সন্ধির ভয়ে জড়সড় নরমপন্থী কাপুরুষ নামে পরিচিত সোশ্যালিষ্টদের "বাথান" ছিল বার্লিন। কাজেই বার্লিনকে গুঁড়ো করা হিট্‌লারের জীবনের প্রথম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মিউনিকের রেলষ্টেসনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই হিট্‌লারকে সরকারী ফৌজ এসে পাকড়াও করে। হিট্‌লারের এই অভিযানে নায়ক ছিল জগদ্বিখ্যাত সেনাপতি লুডেনডর্ফ। তারপর হিট্‌লার এবং লুডেনডর্ফ দুজনেই বন্দী।

যথাসময়ে আদালতে বিচার। বিচারে,—যেমন দস্তুর,—দুজনেই ঝাড়লে ন্যাশন্যালিষ্ট বক্তৃতা। বক্তৃতার একটা ধুয়া নিম্নরূপ:—"আজকালকার জার্ম্মাণির প্রেসিডেণ্ট এবার্ট এবং জননায়ক শাই-ডেমান ইত্যাদি জোচ্চোরগুলোকে কয়েদ দাও। এরা বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী, জার্ম্মাণির শত্রু। এদের শত্রুতাতেই জার্ম্মাণি লড়াইয়ে হেরেছে, এবং আজও এরা দেশের শত্রুদের কথায় সায় দিয়ে ভার্সাই-সন্ধির কড়ার অনুসারে কাজ করে' যাচ্ছে।"

হিট্‌লারের বক্তৃতার দ্বিতীয় ধুয়া নিম্নরূপ—"আমি আমার জীবনের শেষ পাঁচ বছর ধরে' যে কথাটা খুব জোরের সহিত প্রচার কর্‌ছি, সেটা হচ্ছে কার্ল্ মার্ক্‌স্-প্রবর্ত্তিত কমিউনিজ্‌ম্ বা সোশ্যালিজম্ নীতির ধ্বংস সাধন।"

যাহোক হ'ল জেল ১৯২৪ সনে। জেলে বসে'—আবার যেমন দস্তুর রাষ্ট্রিক নেতাদের,—হিট্‌লার লিখ্‌লে একখানা বই। বেরিয়ে এল

১৯২৫ সনে। অমনি ছাপা হল বইটা। নাম "মাইন কাম্ফ্" অর্থাৎ আমার লড়াই)। ১৯২৩-২৫ এই সময়টাকে বল্তে পারি জার্ম্মাণ সমাজে হিটলারের প্রথম দেশব্যাপী কীর্ত্তিলাভ। এই সময়েই হিট্লার-প্রতিষ্ঠিত নাৎসি দল রাইখ্ষ্টাগে প্রথম সভ্য পাঠাতে সুরু করে। কিন্তু মজার কথা,—পার্ল্যামেণ্টে ঢুকে' যত রাজ্যের ন্যাশন্যালিষ্টদের সঙ্গে মিলেও হিট্লারের দল পাঁচ ভাগের এক ভাগ ভোটও পায়নি। অর্থাৎ হিট্লারের নাৎসি দল আর অন্যান্য ন্যাশন্যালিষ্টরা একজোটে ১৯২৪-২৫ সনেও নেহাৎ নগণ্য।

ডয়েস-ব্যবস্থায় জার্ম্মাণির আর্থিক পুষ্টি (১৯২৪-২৯)

প্রঃ—তাহলে দশ বছরের ভেতরে এমন কি ঘট্ল যাতে ন্যাশন্যালিষ্ট দলগুলো আর সঙ্গে-সঙ্গে হিট্লার জার্ম্মাণ সমাজে দিগ্বিজয়ী হ'তে পেরেছে?

উঃ—মনে রাখতে হবে, যতই দিন যেতে লাগল, ততই ছোঁড়ারা জোয়ান হতে লাগ্ল, ততই তাদের হাত-পা সুড়-সুড় করতে লাগ্ল। যারা ১৯১৪-১৮ সনে লড়াই করেনি,—আর যারা ১৯১৯-২৩ পর্য্যন্ত যুগের নৈরাশ্য দুঃখদারিদ্র্য আর ভার্সাই-জুজুর ভয় বড় বেশী ভোগে নি তাদের পক্ষে ১৯২৪ হতে একটা শক্তিযোগী, আত্মসম্মানশীল, দুনিয়ার মাথা-খাড়া-করা জার্ম্মাণি কল্পনা করা হাতীঘোড়া ছিল না। তাদের দল ক্রমশই বাড়তে থাকল। এই গেল সমাজের ভেতরকার আদর্শনিষ্ঠ চিন্তাশীল স্বদেশ-প্রেমিক নরনারীর প্রাণের কথা।

প্রঃ—কিন্তু আদর্শের জোরে কতখানিই বা সম্ভব হ'তে পারে।

উঃ—আর একটা কথাও জবর। সেটা "রূপচাঁদের" কথা, অতি বস্তু-নিষ্ঠ জিনিষ। ১৯২৪ সনের প্রথম হ'তে জার্ম্মাণিতে মুদ্রার সমস্যা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল। মার্কিণ ব্যাঙ্কার ডয়েস-প্রবর্ত্তিত আন্তর্জ্জাতিক নীতির ব্যবস্থায় জার্ম্মাণিতে নতুন মার্ক কায়েম হয়। ১৯২৩ পর্য্যন্ত

জার্ম্মাণিতে ক্রমাগত দু'তিন বছর ধরে' মার্ক-পতন ঘটেছিল। জার্ম্মাণ মুদ্রার এই যুগটাকে ইন্‌ফ্লেশন বা কাগজী মুদ্রার অতি-চলনের যুগ বলা হয়। এই দুরবস্থা থেকে জার্ম্মাণরা ডয়েস-ব্যবস্থায় অব্যাহতি পায়। ১৯২৯ সনের মাঝামাঝি অর্থাৎ বছর পাঁচেক ডয়েস-নীতির সুযোগগুলো ভোগ করার ফলে জার্ম্মাণিতে গোটা জার্ম্মাণ জাতের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বেশ কিছু ফুলে' উঠতে পেরেছিল। জার্ম্মাণদের পায়া আর সঙ্গে সঙ্গে কোমর বেশ কিছু মজবুদ হয়ে উঠেছিল। আর যাঁহা হাত-পায়ে জোর, তাঁহা গোঁফে চাড়া।

প্রঃ—এই ধরণের শক্তির খেলা সমাজের নানা শ্রেণীতে কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল মনে হয় ?

উঃ—তখন জার্ম্মাণির বুড়োরাও ছোঁড়াদের সঙ্গে, জোয়ানদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দুনিয়াকে কলা দেখাবার আওয়াজ শোনাতে সুরু করলে। জার্ম্মাণ সমাজের মাতব্বরদের ভেতর এত দিনে আস্তে আস্তে আত্মচৈতন্য ফুটে' উঠ্‌ল। তখন তারা ভাবতে আরম্ভ করলে,—বাস্তবিকই এখনও কি জার্ম্মাণরা ১৯১৮-১৯ সনের মতনই দুর্ব্বল, এখনও কি তাদের পক্ষে বিদেশীদের তাঁবে থেকে দেশ চালানো আবশ্যক ?

বিশ্বব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগে নাৎসি দলের সুযোগ (১৯২৯-৩৩)

প্রঃ—জার্ম্মাণ সমাজে যে এই ধরণের মত-পরিবর্ত্তন হয়েছে তা আপনি কিসে বুঝ্‌তে পার্লেন ?

উঃ—১৯৩০ সনে রাইখ্‌ষ্টাগে যেসব মেম্বর ঢুকলে তাতে দেখা গেল যে নাৎসি দল বেড়ে উঠেছে। দেশের লোক হিট্‌লারের কথায় নাচতে প্রস্তুত আছে। আর সোৎসি দল রাইখ্‌ষ্টাগে অনেকটা খাটো

হয়ে এসেছে। অবশ্য তখনও সোৎসিরা নাৎসিদের চেয়ে নাক-গুন্‌তিতে কিছু বেশী। এই সময়ে আমি দ্বিতীয়বার জার্ম্মাণিতে প্রবাসী (১৯২৯-৩১)

প্রঃ—১৯৩০এর পর শেষ পর্য্যন্ত এই যে অভাবনীয় নাৎসি-দিগ্বিজয় ঘটেছে, তার ভেতর আপনি নূতনত্ব কিছু দেখ্‌ছেন কি ?

উঃ—আলবৎ দেখছি। আমি ১৯২১ সন থেকেই বেশ বুঝে নিয়েছি যে, যে সময়েই হোক না কেন, ন্যাশনালিষ্টরা ভার্সাই-সন্ধির বিরুদ্ধে আজ কিম্বা কাল কিম্বা পরশু ক্ষেপে উঠ্‌তে বাধ্য। ১৯৩০ সনে তার একটা বেশ বড় প্রমাণ পাওয়া গেল। ১৯৩০ এর নাৎসিরা প্রকারান্তরে সকল প্রকার ন্যাশন্যালিষ্টদের অনেকটা ঐক্যবদ্ধ প্রতিনিধি স্বরূপ দাঁড়িয়ে গেল। অবশ্য জার্ম্মাণ সমাজে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালানো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। তা সত্ত্বেও জার্ম্মাণ নরনারীর ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয়েছিল যে, ১৯৩০ এর পরে কোনো না কোনো ন্যাশন্যালিষ্ট দিগ্বিজয় জার্ম্মাণ সমাজে অবশ্যম্ভাবী।

তবে এইখানে আর একটা মজার কথা জানা দরকার। মনে রাখতে হবে যে, ১৯২৯ সনের মাঝামাঝি থেকে আজ পর্য্যন্ত গোটা দুনিয়ায় আর্থিক মন্দা চল্‌ছে। পৃথিবীর সব কটা দেশই নিজ নিজ বেকার বা দারিদ্র্য-সমস্যায় একদম কাহিল। সবাই ভাবছে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" জার্ম্মাণ সমাজে ন্যাশন্যালিষ্টদের বা নাৎসিদের দিগ্বিজয় রুখ্‌তে চেষ্টা করা প্রধানত ফ্রান্সেরই মাথা-ব্যথা। কিন্তু জার্ম্মাণিতে পঞ্চাশ লাখ লোক বেকার। এতগুলো লোক অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে আর কয়লার অভাবে পাগলা কুকুরের মতন ফ্রান্সকে এসে আক্রমণ কর্‌বে যদি ফ্রান্স এখন জার্ম্মাণিতে হস্তক্ষেপ কর্‌তে যায়। বস্তুত আমেরিকার আর বিলাতের অবস্থাও বেশ-কিছু সঙ্গীন। আমেরিকায় এককোটি আর বিলাতে বিশ লাখ লোক বেকার। কারুর প্রাণে এমন খেয়াল

নাই যে, সে এখন ফ্রান্সের ধামাধরা হয়ে জার্ম্মাণির মৌচাকে গিয়ে হাত্ দেয়। কাজেই ন্যাশন্যালিষ্টরা আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্র অথবা কোনো ঐক্যবদ্ধ বিদেশী হস্তক্ষেপ হতে মুক্ত হয়ে' দেশটাকে গড়ে' তুলবার সুযোগ পেয়েছে।

প্রঃ—তাহলে কি আপনি বল্‌ছেন যে, অনেকগুলা ঘটনায় পড়ে' জার্ম্মাণরা আজ হিট্‌লার-ভক্ত?

উঃ—এইবার তা হলে অনেকটা বুঝেছেন। আসল কথা,—দলে-দলে লড়াই। আর, সময়ের ফেরফারে অন্যান্য দলগুলা আজ কল্কে পাচ্ছে না। তবুও সে-সব দল আজও নেহাৎ তুচ্ছ কর্‌বার সামগ্রী নয়। জার্ম্মাণ সমাজে সোৎসি-ঘেঁশা মতের নরনারী বেশ-কিছু জবরদস্ত। তাদেরকে অগ্রাহ্য করা আহাম্মুকি। তবে জার্ম্মাণ নরনারী ভাবছে—"তাইত, এতদিন সোশ্যালিষ্টের মাতব্বরিতে বেশী-কিছু হল না। সাধারণ ন্যাশন্যালিষ্টরা একালে ত দলে পুরু নয়। দেখা যাক না নাৎসিরাই বা কি করে?" লোকজনের মেজাজ অবশ্য সর্ব্বদাই,—দলগুলোকে পরখ করে' দেখার দিকে। সোৎসিদলকে ত এতদিন সুযোগ দেওয়া গেল, এখন তাহলে নাৎসিরাই বা কিছুদিন সুযোগ পাক না কেন,—এই চিন্তারই আবহাওয়ায় হিটলারের জার্ম্মাণিবিজয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ডয়চে আকাডেমী ও ভারতবাসীর জার্ম্মাণ বৃত্তি

(১৯৩৪-৩৫)*

প্রঃ—ভারতবর্ষের আর্থিক, সামাজিক এবং আত্মিক জীবনে জার্ম্মাণির কলকারখানায়, হাঁসপাতালে, বিজ্ঞানাগারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর স্থান ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই উপলক্ষে ভারতবাসীর জার্ম্মাণ ছাত্রবৃত্তি সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ করিতে চাই। আচ্ছা জার্ম্মাণির শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ডয়চে আকাডেমীর কিম্মৎ কিরূপ?

উঃ—ডয়চে আকাডেমী ("জার্ম্মাণ পরিষৎ") জার্ম্মাণির সেরা পণ্ডিতদিগকে লইয়া গঠিত। ১৯২৫ সনে মিউনিক শহরে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। গণিতশাস্ত্রী, প্রকৃতিবিজ্ঞানসেবী, রাসায়নিক, এঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসা-শাস্ত্রী, অস্ত্রচিকিৎসক, ঐতিহাসিক, ভূগোল-শাস্ত্রী, প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ, নৃতত্ত্ববিৎ, মনোবিজ্ঞানসেবী, ভাষাতত্ত্ববিৎ এবং অন্যান্য শ্রেণীর কলায় এবং বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞগণ ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত। "জার্ম্মাণ পরিষৎ" কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ-বিশেষ নয়, বা গবর্ণমেণ্টের কোনো শাসন-বিভাগের অন্তর্ভুক্তও নয়। সর্ব্বসাধারণের প্রদত্ত চাঁদা এবং দানের উপরই ইহা নির্ভর করিয়া চলে।

---

* কলিকাতার "ফরোয়ার্ড", "অ্যাডভান্স", "অমৃতবাজার পত্রিকা", "মর্ম্মবাণী", "খেয়ালী" "ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল রিভিউ", "আর্থিক উন্নতি", "ইনশিওর্যান্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ", দিল্লীর "ন্যাশন্যাল কল" ও "হিন্দুস্থান টাইম্‌স্", রেঙ্গুনের "ডেলি নিউজ" ইত্যাদি পত্রিকায় এই মোলাকাৎ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৩৪ সনের নবেম্বর হইতে ১৯৩৫ সনের জানুয়ারি পর্য্যন্ত)।

প্রঃ—ডয়চে আকাডেমী কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত্? এবং উহার কার্য্য-প্রণালীই বা কিরূপ?

উঃ—বলা যাইতে পারে যে, তিনটা প্রধান উদ্দেশ্য লইয়া ডয়চে আকাডেমী গঠিত :—(১) জার্ম্মাণ ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, স্থকুমার শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধনবিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং জার্ম্মাণ "কুল্টর" বা সংস্কৃতির অঙ্গীভূত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা চালানো।

(২) প্রবাসী জার্ম্মাণদিগের নিকট জার্ম্মাণ ভাষার শিক্ষক প্রেরণ এবং তাহাদিগকে সময়ে সময়ে জার্ম্মাণি এবং জার্ম্মাণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রকাশিত নতুন-নতুন গ্রন্থাদি প্রদান করা। ইয়োরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, বা আফ্রিকায় যে সমস্ত জার্ম্মাণ নরনারী প্রবাস-জীবন যাপন করিতেছে তাহাদিগকে এই জন্য ডয়চে আকাডেমীর নিকট আবেদন করিতে হয়।

(৩) বিদেশের নানা স্থানে জার্ম্মাণ ভাষার প্রচার সাধন করা। বিদেশী নরনারীকে জার্ম্মাণ ভাষা শিখাইয়া তাহাদিগকে জার্ম্মাণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি সংস্কৃতির নানা অঙ্গ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভের স্থযোগ দেওয়া জার্ম্মাণ পরিষদের মতলব।

প্রঃ—ডয়চে আকাডেমী যদি জার্ম্মাণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্যই গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় ছাত্র এবং গবেষকগণ কিরূপে তাহাদের প্রদত্ত বৃত্তিলাভ করিয়া জার্ম্মাণিতে শিক্ষালাভ করিতেছে?

উঃ—জার্ম্মাণি-প্রবাসী ভারতসন্তানদের বিশেষ অনুরোধে ডয়চে আকাডেমী ভারতবাসীর জন্য এইসকল স্থবিধার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, বীমা-অফিস, হাঁসপাতাল, মিউজিয়াম, এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভারতবাসীর উচ্চতর শিক্ষালাভের স্থবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য জার্ম্মাণি-প্রবাসী ভারত-সন্তানেরা ডয়চে আকাডেমীর নিকট আবেদন করিয়াছিল। তাহার ফলে আকাডেমী ১৯২৯ সনে "ইণ্ডিয়া

ইন্‌ষ্টিটিউট্” নামে একটী বিশেষ শাখা স্থাপন করে। ভারতবাসীর অনুরোধে ভারতবাসীর সুবিধার জন্যই ডয়চে আকাডেমী ভারতবাসীর জন্য জার্ম্মাণ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছে।

প্রঃ—জার্ম্মাণিতে ডয়চে আকাডেমীর মত আর এমন কোনো প্রতিষ্ঠান অছে কি যেখানে ভারতবাসীর কোনো সুবিধা মিলিতে পারে?

উঃ—ডয়চে আকাডেমীর “ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট্” প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণি-প্রবাসী ভারতীয় সুধীগণ জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষার্থী এবং সাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞানসেবক ভারতসন্তানদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সুবিধা করিয়া দেওয়ার অনুরোধ করিয়া আসিয়াছে। ১৯১৯ হইতে ১৯২৯ সনের মধ্যে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলার কর্ত্তৃপক্ষ এবং জার্ম্মাণ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিরেক্টরগণ বহুবার এইসকল অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্পশিক্ষার্থী এবং সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে সহায়তা করা জার্ম্মাণির পক্ষে নতুন-কিছু নয়। ডয়চে আকাডেমীর কার্য্যকলাপ ভারতসন্তান সম্বন্ধে জার্ম্মাণজাতির সনাতন সহানুভূতি ও সাহায্য প্রদান প্রবৃত্তির অন্যতম ও শেষ নিদর্শন মাত্র। আজকাল ভারতীয় সমাজের নানা কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল পণ্ডিত, ব্যবসাদার, চিকিৎসক, অধ্যাপক এবং গবেষক কিছু কিছু নামজাদা হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে জার্ম্মাণিতে জার্ম্মাণদের বন্ধুত্ব ও সাহায্য-ভোগীর সংখ্যা কম নহে। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনিয়ার, ব্যবসাদার, ল্যাবেরেটরির অধিনায়ক, এবং হাঁসপাতাল-অধ্যক্ষদের সহায়তায় আজ উঁহারা ভারতীয় সমাজে কথঞ্চিৎ উচ্চ আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং গণ্যমান্য ভারতীয় কৃতী ব্যক্তিদের ভিতর অনেকেই সাংসারিক হিসাবে জার্ম্মাণ নরনারীর নিকট ঋণী।

প্রঃ—ডয়চে আকাডেমীর পক্ষে ভারতসন্তানদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা

কিরূপে সম্ভব হয় ? তাঁহাদের তাঁবে কোনো ইস্কুল, কারখানা, হাসপাতাল, মিউজিয়াম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আছে কি ?

উঃ—ভারতীয় ছাত্র এবং শিক্ষানবিশদের সুবিধার জন্য বা তাহাদের জন্য কাজ করিবার স্থান পূর্ব্ব হইতে বাছিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ডয়চে আকাডেমী সদাসর্ব্বদাই টেক্‌নলজিক্যাল, কৃষি, বাণিজ্য, পশু, এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালগুলির শরণাপন্ন হইয়া থাকে। তাছাড়া জার্ম্মাণির মেকানিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল, কেমিক্যাল, এবং রেলওয়ে সংক্রান্ত কারখানায়-কারখানায়, ব্যাঙ্ক-বীমা-অফিসে, চিকিৎসা-ভবনে, মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তাদের দ্বারে-দ্বারে, নানা স্থানে নানা ব্যক্তির নিকট অনুরোধ-উপরোধ করাও ডয়চে আকাডেমীর বিশেষ ধান্ধা। অনুরোধ করিলেই যে সব সময়ে সাহায্য পাওয়া যায় তাহা নয়। কেননা জার্ম্মাণ ইস্কুল-কলেজ, কারখানা, হাঁসপাতাল ইত্যাদির উপর আবদার চালাইয়া থাকে দেশী-বিদেশী অনেকেই। সুতরাং অনেক সময়ে ভারতবাসীর জন্য সীট্ রিজার্ভ রাখা বা তাহার কোনো সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না। তবু আসল কথা এই যে, একমাত্র এই সমস্ত জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুগ্রহের উপরই ডয়চে আকাডেমীকে নির্ভর করিতে হয়। অন্যথা উহার পক্ষে ভারতবাসীদের কোনোরূপ সহায়তা করা সম্ভবপর হইত না।

প্রঃ—ডয়চে আকাডেমী কিভাবে ভারতীয় প্রার্থীদিগকে বাছাই করিয়া বৃত্তি দিয়া থাকে ?

উঃ—প্রথমতঃ, আবেদনকারীকে ভারতবর্ষে যতদূর সম্ভব সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা লাভের নজির দেখাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক, ব্যবসাদার, এঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, গবেষক ইত্যাদি ভাবে ব্যবহারিক বা পেশাগত অভিজ্ঞতার নজির দেখানোও আবশ্যক। মোট কথা, যে বিষয়ে বৃত্তি প্রদান করা হইবে সেই বিষয়ে প্রার্থীর হাতেকলমে অভিজ্ঞতা থাকা

চাই। বৃত্তি লাভের দ্বিতীয় সর্ত্তটা প্রথম সর্ত্তটা অপেক্ষা কোনো অংশে খাটো নহে। বস্তুতঃ অন্ততঃ তিন-চার বৎসরব্যাপী "কেজো জীবনের" অভিজ্ঞতা না থাকিলে একমাত্র ইস্কুল-কলেজের চাপরাশের জোরে জার্ম্মাণ বৃত্তি পাওয়া ভারতসন্তানের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। কাজেই বৃত্তি-প্রার্থীর বয়স সাধারণতঃ ছাব্বিশ-সাতাইশের কম হইতে পারে না।

প্রঃ—কোনো নামজাদা ব্যক্তিবিশেষের সার্টিফিকেটের জোরে বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নয় কি?

উঃ—না। আকাডেমী মোটের উপর ডজনখানেক বৃত্তি প্রদান করে। এর জন্ম কম সে কম শ'তিনেক দরখাস্ত পড়ে। বাছাই সম্পর্কে ভারতে কাহারও কোনো হাত নাই। কোনো ভারতসন্তান, বা ভারতপ্রবাসী জার্ম্মাণ, এমন কি জার্ম্মাণ কন্সালদের পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনো ক্ষমতা নাই। আবেদন করার সময় পর্য্যন্ত প্রার্থী কি কি কাজ করিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত বিচার করিয়াই আকাডেমী বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে।

তবে যে-যে অধ্যাপক, শিল্পী, ব্যবসাদার ইত্যাদি ব্যক্তির নিকট বৃত্তি-প্রার্থীরা ছাত্র বা শিক্ষানবীশ বা কেরাণী বা সহায়ক হিসাবে কর্ম্ম করিয়াছে তাঁহাদের সার্টিফিকেট ডয়চে আকাডেমী বিচার করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত সন্দেহ নাই।

বুঝা যাইতেছে যে, আকাডেমীর কোনো সদস্যের সহিত প্রার্থীর কোনোরূপ জানাশুনা থাকে না। সুতরাং বিদ্যার দৌড় আর অভিজ্ঞতার বহর ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বৃত্তি আদায় করা সম্ভবপর নয়। সময় সময় এমন অবস্থা ঘটে যে, জার্ম্মাণি-প্রবাসী কোনো ভারতীয় ছাত্র হয়ত অর্থাভাবে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় এইধরণের অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

প্রঃ—ডয়চে আকাডেমী কতদিন ধরিয়া এই সমস্ত বৃত্তি চালাইবে?

উঃ—ডয়চে আকাডেমী যদি দেখে যে, ভারতীয় নরনারী জার্ম্মাণ বৃত্তি আর ততটা গ্রাহ্য করিতেছে না, অথবা বিগত পনর বৎসর যাবৎ যে সমস্ত ভারতীয় এঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, রাসায়নিক, ভাষাতত্ত্ববিৎ ইত্যাদি ব্যক্তিগণ জার্ম্মাণিতে সুবিধা ভোগ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্যপ্রাপ্তির কথা ভুলিয়া জার্ম্মাণির প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখাইতে অভ্যস্ত তখন নিশ্চয়ই আকাডেমী ভারতবাসীর জন্য জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, মিউজিয়াম, শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট সুপারিশ করিয়া বেড়াইবার বোঝা নিজ ঘাড় হইতে ফেলিয়া দিতে উৎসুক হইবে। ভবিষ্যতে হয়ত আদৌ ভারতবাসীকে বৃত্তি দেওয়া হইবে না। কথাটা আবার বলিতেছি যে, ভারতবাসীর অনুরোধেই আর ভারতীয় স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্যই ডয়চে আকাডেমী ইত্যাদি জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবাসীর সেবা করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

প্রঃ—"হুম্‌বোল্ড" বৃত্তি কাহাকে বলে ?

উঃ—"হুম্‌বোল্ড" বৃত্তি ভারতবর্ষে বেশী পরিচিত নহে। বহুকাল যাবৎ বার্লিনে এই বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি একজন বাঙালী ছাত্র এই বৃত্তি লাভ করিয়া উচ্চতর নৃতত্ত্ব শিখিবার জন্য বার্লিনে গিয়াছে। বাংলার সীমান্তবর্ত্তী কয়েকটা উপজাতি সম্বন্ধে কয়েক বৎসর যাবৎ সে বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান চালাইয়াছে। বহু অধ্যাপক এসম্বন্ধে তাহাকে সুপারিস করায় তাহার ভাগ্যে এই বৃত্তি জুটিয়াছে।

প্রঃ—জার্ম্মাণি ছাড়া আর কোনো দেশে ভারতীয় সুধীগণ, ঐ সমস্ত দেশের কলকারখানায়, ব্যাঙ্কে, বীমা-অফিসে বা সাধারণ বিদ্যাপীঠসমূহে ভারতসন্তানদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছে কি ?

উঃ—ভারতীয় সুধীরা অন্যান্য দেশেও আপন দেশবাসীর সুবিধার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকা, অষ্ট্রিয়া, চেকো-

শ্লোভাকিয়া, ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান এবং সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। জার্ম্মাণির মত অন্যান্য দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির নিকটও একই ভাবে অনুরোধ-উপরোধ জানানো হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির মত বিভিন্ন প্রকারের এত বেশী সুবিধা আর কোনো দেশের নিকট হইতেই আদায় করা যায় নাই।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

"নয়া সাম্রাজ্য" গ্রন্থাবলী

গোদা-গোদা বই লিখিতে জার্ম্মাণরা ওস্তাদ। উহারা যে কোনো দিন ছোট-ছোট বই লিখিতে পারে তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারিতাম না। সম্প্রতি সেই ভুল ভাঙিয়াছে। মিউনিকের কাল্‌ভাই কোম্পানী আমাদের নিকট একসেট পুস্তিকা পাঠাইয়াছে। তাহাতে আছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিষয়ক সকল প্রকার রচনা। লেখকরা জার্ম্মাণ সমাজের ধুরন্ধর লোকও বটে। বইগুলা সম্পাদনের ভার ছিল মিউনিকের ডয়চে আকাডেমী বা জার্ম্মাণ পরিষদের হাতে।

বইগুলা সবই জার্ম্মাণ ভাষায় লেখা। কাজেই একমাত্র ইংরেজির জোরে এইগুলার ভিতর প্রবেশ করা অসম্ভব। তবে দুনিয়ার জার্ম্মাণ-জান্তা নরনারী বইগুলা পাইয়া সম্পাদক, প্রকাশক আর গ্রন্থকার-দিগকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য হইবে সন্দেহ নাই; কেন না অল্প বহরের ভিতর অনেকখানি মাল পাওয়া পাঠকমাত্রের পক্ষে যারপরনাই রেহাই বটে। অধিকন্তু আলোচ্য বস্তুগুলাও বিশেষরূপে জানিবার বস্তু। হিট্‌লার-রাজের আমলে জার্ম্মাণ সমাজে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে সেই সবের আলোচনাই বইগুলার মুখ্য উদ্দেশ্য। অথবা বলা চলিতে পারে যে, লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগে জার্ম্মাণির সম্মুখে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে সেই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য হিট্‌লারের আমল কিরূপ চিন্তাপ্রণালী ও কর্ম্মকৌশল কায়েম করিতে অগ্রসর হইয়াছে তাহার বৃত্তান্তই এই গ্রন্থাবলীর প্রাণ। গ্রন্থাবলীর নাম জার্ম্মাণ ভাষায় "ডাস নয়ে রাইখ" (নয়া সাম্রাজ্য)।

"ডয়চে আকাডেমী"

গ্রন্থাবলী সম্পাদন করিয়াছে ডয়চে আকাডেমী। এই পরিষদের নাম জার্ম্মাণিতে সুপরিচিত ত বটেই। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে আর এমন কি প্রত্যেক জেলায়ও "জার্ম্মাণ পরিষৎ" আজকাল বেশ-কিছু নাম-জাদা। কেন না কয়েক বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণিতে ভারতসন্তানকে গণ্ডা-গণ্ডা ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইতেছে। ফি বৎসরই ভারতীয় ছাত্রেরা জার্ম্মাণ বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া জার্ম্মাণিতে যাইতেছে। জার্ম্মাণির সর্ব্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কারখানায় ভারতীয় ছাত্রেরা লেখাপড়া ও গবেষণা কিম্বা হাতে-কলমে কাজকর্ম্ম করিবার সুযোগ পাইতেছে। এই সকল জার্ম্মাণ বৃত্তি যখন ভারতীয় পত্রিকায় ঘোষণা করা হয়, তখন ফি বৎসর গোটা ভারত হইতে কয়েক শ ছাত্র-ছাত্রী জার্ম্মাণিতে দরখাস্ত করিয়া থাকে। সেই সময়ে উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় যুবারা দলে-দলে জর্ম্মাণির ইস্কুল-কলেজ, জার্ম্মাণির বিজ্ঞানশালা, জার্ম্মাণ হাসপাতাল জার্ম্মাণ ফ্যাক্টরি, জার্ম্মাণ ডিগ্রী ইত্যাদির খোঁজখবর লয়। আর সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণির অভিজ্ঞতা-ওয়ালা ভারতসন্তানেরাও সেইসকল আবেদন-কারীর নিকট হইতে বহুসংখ্যক মোলাকাৎ ও চিঠিপত্র পাইয়া থাকে। ফলতঃ "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদককে ফি বৎসরই প্রায় গোটা শ'য়েক চিঠি বা মোলাকাৎ হজম করিতে হয়। এই বৎসরও হইয়াছে। এই যে জার্ম্মাণ ছাত্রবৃত্তির কথা বলা হইল সেই সবই ডয়চে আকাডেমীর দান। কাজেই ডয়চে আকাডেমী বা জার্ম্মাণ পরিষৎ আজ বাঙ্‌লা দেশে আর অবশিষ্ট ভারতে অতি লোকপ্রিয় বিদেশী প্রতিষ্ঠান।

হাউসহোফার

১৯৩০ সনে "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদককে মিউনিকের টেক্‌ন-লজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাভেরিয়ান গভর্মেণ্ট অধ্যাপকের পদে বাহাল

করিয়াছিলেন। অধ্যাপকের জন্য সকল প্রকার সাংসারিক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ডয়চে আকাডেমীর তরফ হইতে। সেই সঙ্গেই ডয়চে আকাডেমীর তদবিরে ভারত-বিষয়ক ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। এই বিষয়ে জার্ম্মাণির তরফ হইতে সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন "গেওপোলিটিক" বা ভূমি-রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক অধ্যাপক হাউসহোফার। তিনি তখন অন্যতম সভ্যমাত্র ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি আকাডেমীর প্রেসিডেন্ট। অধ্যাপক হাউসহোফারের নাম আজও বোধ হয় ভারতে সুপরিচিত নয়। "আর্থিক উন্নতি"র কোনো কোনো সংখ্যায় তাঁহার সম্পাদিত বার্লিন হইতে প্রকাশিত "গেওপোলিটিক" মাসিকের রস বাঁটা হইয়াছে। অধিকন্তু গেও-পোলিটিক বিদ্যাটা কি তাহার পরিচয়ও কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে ক্যালকাটা রিভিউ, ইনশিওর‍্যান্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ ইত্যাদি কাগজেও আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। হাউসহোফারের নাম দুনিয়ার পণ্ডিত-মহলে অল্পদিনের ভিতরই আরও ছড়াইয়া পড়িবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

টিয়ারফেল্ডার

ডয়চে আকাডেমীর কর্ম্মকর্ত্তার নাম টিয়ারফেল্ডার। ইনি ভাষাতত্ত্বের ডক্টর। জার্ম্মাণ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষাবিষয়ক ইঁহার রচনা জার্ম্মাণির নানা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা কেন্দ্রের লোকজনের সঙ্গে টিয়ারফেল্ডারকে চিঠিপত্র চালাইতে হয়। এই কারণে ভারতীয় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বহুব্যক্তি ইঁহার নাম জানেন। অধিকন্তু ভারতবাসীর জন্য জার্ম্মাণ বৃত্তি বিষয়ক সংবাদ ভারতের সকল প্রকার পত্রিকায় ছাপা হয় বলিয়া কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে টিয়ারফেল্ডারের নামও সংবাদপত্র-পাঠকদের ভিতর বেশ কিছু পরিচিত। জার্ম্মাণিতে যাইয়া যেসকল ভারতসন্তান ডয়চে আকাডেমীর সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাও টিয়ারফেল্ডারের সঙ্গেই

সর্ব্বপ্রথম মোলাকাৎ করিতে বাধ্য। কাজেই ভারতবর্ষে ডয়চে আকাডেমী বলিলে সহজে অনেকটা ডক্টর টিয়ারফেল্ডারকে বুঝা হইয়া থাকে।

নাৎসি নীতি

"নয়া সাম্রাজ্য" (বা নয়া জার্ম্মাণি) গ্রন্থাবলীর প্রথম পুস্তিকায় আছে "বিশ্বরাষ্ট্রে নাৎসি নীতি"। লেখকের নাম হাউসহোফার। তিনি এই বইয়ে হিট্‌লার-প্রবর্ত্তিত ন্যাশন্যাল-সোশ্যালিষ্ট মতের রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। করিয়া বলিতেছেন যে, এই মতটা হিট্‌লারের একচেটিয়া মাল নয়। "নাৎসি"-দর্শন জগতের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। একালের দুনিয়ায়—পূর্ব্বে, পশ্চিমে, চীনে, জাপানে, মায় ভারতেও, দেশোন্নতির জন্য এই ধরণের চিন্তাপ্রণালী আর কর্ম্মকৌশলই অবলম্বিত হইতেছে।

আত্মরক্ষায় অসমর্থ জার্ম্মাণি

সেনাপতি ফোন এৎস্‌টেন এই গ্রন্থাবলীতে একখানা বই দিয়াছেন। ইনি জার্ম্মাণ জগতের অন্যতম পয়লা নম্বরের লেখক। সমর বিষয়ক রচনায় ইহার নাম-ডাক খুব জবর। এই বইয়ে দেখানো হইয়াছে যে, জার্ম্মাণির অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক। আত্মরক্ষার জন্য জার্ম্মাণির তাঁবে কোনো ব্যবস্থা নাই। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইত্যাদি সকল পার্শ্ববর্ত্তী দেশের ফৌজ, পল্টন, নৌসেনা, আকাশযান ইত্যাদি জরীপ করা হইয়াছে। এই সমুদয়ের তুলনায় জার্ম্মাণরা সামরিক হিসাবে যে এক প্রকার নিরস্ত্র তাহা সহজে বুঝাইয়া দেওয়া এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

সোনার টাকা না কাগজী টাকা?

জার্ম্মাণির নিম-সরকারী কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের নাম রাইখ্‌স্‌বাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের তদবিরে একটা সংখ্যাবিষয়ক দপ্তর চলে। ইহাতে টাকা-

কড়ির লেনদেন, ব্যবসাবাণিজ্য, খাজনা, শুল্ক ইত্যাদি বিষয়ক অঙ্ক ও তথ্য সংগৃহীত ও আলোচিত হয়। এই বিভাগের কর্ত্তা ডক্টর ড্যেরিং যে বই লিখিয়াছেন তাহার নাম "সোনা না কাগজ?" ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন রাইখ্‌স্‌বাঙ্কের প্রেসিডেন্ট শাখ্‌ট্‌। ড্যেরিং বলিতেছেন যে, জার্ম্মাণরা রাইখ্‌স্‌ মার্কের অর্থাৎ বর্ত্তমানে প্রচলিত জার্ম্মাণ মুদ্রার দাম কমাইতে প্রস্তুত নয়। বলা বাহুল্য ইংল্যণ্ড ও ভারতের মতন পৃথিবীর অনেক দেশই নিজ নিজ মুদ্রার মূল্য কমাইয়া বসিয়াছে। জার্ম্মাণরা সেই পথের পথিক নয়,—এইরূপ বুঝানো এই পুস্তিকার মতলব।

বিলাতী পাউণ্ডের মূল্য কমাইয়া ইংরেজ গবর্মেণ্ট লাভবান হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই সঙ্গে অতিমাত্রায় কাগজী মুদ্রা জারি করার দরকার হয় নাই। কাজেই জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক বাড়ে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ফলে বিদেশী লোকেরা বিলাতের নিকট যত টাকা ধারিত তাহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। কাজেই বিদেশীরা সহজে বিলাতের কর্জ্জ শুধিতে পারিয়াছে।

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ রাইখ্‌স্‌মার্কের সঙ্গে বিলাতী পাউণ্ডের যে দর-সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাতে জার্ম্মাণির লাভ ছাড়া লোকসান নাই। সাধারণতঃ এক বিলাতী পাউণ্ড দিতে হইলে জার্ম্মাণদেরকে ২০ রাইখ্‌স্‌-মার্ক দিতে হইত। কিন্তু বিলাতী মুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে আজকাল দিতে হয় মাত্র ১৩ রাইখ্‌স্‌-মার্ক।

কিন্তু জার্ম্মাণরা যদি ইংরেজদের দেখাদেখি নিজ মুদ্রার দাম কমাইতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বেশী মার্ক দিতে হইবে। এরূপ আহাম্মুকি চালানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

প্রেসিডেণ্ট শাখ্‌টের মতে সায় দিয়া ড্যেরিং বলিতেছেন যে, সোনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলেই মুদ্রা-সংস্কার সাধিত হইল, এরূপ বুঝা উচিত নয়। অধিকন্তু বর্ত্তমানে দুনিয়ার সর্ব্বত্র যে আর্থিক দুর্য্যোগ

চলিতেছে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মুদ্রানীতির উপর ধর্‌ণা দিয়া পড়িয়া থাকিলেই চলিবে না। সংসারের কাজকর্ম্মে মুদ্রানীতি ছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছু আছে। সেই সকল দিকে নজর ফেলাও প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীর আর রাষ্ট্রিকের কর্ত্তব্য।

আর্থিক জার্ম্মাণি

আর একখানা বইয়ে আছে নয়া সাম্রাজ্যের অর্থকথা। লেখকের নাম শ্‌মিট্‌। ইহার ভিতর বক্তৃতা কিছুই নাই। আছে কেবল সংখ্যা। প্রথমেই দেখিতেছি চৌহদ্দি, জনবল। তাহার পর পাইতেছি ১৯২৬ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত আহার্য্য ও পানীয়ের পরিমাণ কত ছিল তাহার এক হিসাব। এই সমুদয়ের ভিতর কতখানি স্বদেশে উৎপন্ন হয় আর কতটা বিদেশ হইতে আমদানি তাহাও দেখানো হইয়াছে। পরের এক ফিরিস্তিতে আছে কৃষিসম্পদ্‌। কুদরত্তি মাল কোন্‌ কোন্‌ দেশ হইতে আসে তাহার বিবরণ আছে অন্য এক তালিকায়। দেখা যাইতেছে যে, এই হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রুশিয়া ও আর্জ্জেণ্টিনা এই চার দেশের পরই ভারতের ঠাঁই। জার্ম্মাণ মাল কোন্‌ কোন্‌ দেশে রপ্তানি হয় তাহার তালিকাও আছে, বলা বাহুল্য। এই খাতে প্রথমেই দেখিতেছি হল্যাণ্ডের নাম। তাহার পর যথাক্রমে, রুশিয়া, ফ্রান্স, বিলাত, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া সুইডেন, ইতালি, ডেন্মার্ক ও অষ্ট্রিয়া। এই বারটা দেশের পর ভারতবর্ষের নাম চোখে পড়িতেছে। অর্থাৎ জার্ম্মাণির পক্ষে ভারতীয় মাল খরিদ করা যত জরুরি ভারতবর্ষে মাল বিক্রী করা তত জরুরি নয়।

শ্বেতাঙ্গেরা মরিতে বসিয়াছে কি?

জার্ম্মাণির প্রধানতম সংখ্যাদপ্তরের ডিরেক্টর বুর্গড্যেফার্‌র একখানা

পুস্তিকা এই গ্রন্থাবলীর জন্য লিখিয়াছেন। তাহাতে একালের "আন্তর্জ্জাতিক জন্ম-ধর্ম্মঘট" বিবৃত হইয়াছে। জগতের সর্ব্বত্র লোকেরা আর সন্তান পয়দা করিতে চায় না,—এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহাতে মোটের উপর ইয়োরোপের,—বিশেষতঃ সাদা চামড়াওয়ালা জাতিপুঞ্জের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী এই কথা বুঝানো বুর্গড্যের্ফারের উদ্দেশ্য। বইটার নাম "শ্বেতাঙ্গেরা মরিতে বসিয়াছে কি?" এই আলোচনায় ল্যাটিন আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ইত্যাদি নানা ভূখণ্ডের অবস্থা বিবৃত করা হইয়াছে। সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া বুর্গড্যের্ফার সকল শ্বেতাঙ্গ জাতিকে,—বিশেষতঃ জার্ম্মাণকে সন্তান পয়দা করার কাজে উৎসাহিত করিতেছেন। ইতালির মুসলিনি আর জার্ম্মাণির হিট্‌লার এই মতের স্বপক্ষে আছেন। পূর্ব্বে বুর্গড্যের্ফারের বইয়ের সুবিস্তৃত সমালোচনা "আর্থিক উন্নতি"তে বাহির হইয়াছে।

বাস্তুশিল্পে যন্ত্র-নিষ্ঠা ও সৌকুমার্য্য

একখানা বইয়ে শ্‌মিটেন্নার বলিতেছেন যে, বাস্তুশিল্পের কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার চলিতেছে জোরের সহিত। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু এই সঙ্গে যেন মনে থাকে যে, সৌকুমার্য্য বাদ পড়িলে দেশের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। যন্ত্রনিষ্ঠার সঙ্গে সুকুমার শিল্পের সহযোগ কায়েম করা বিশেষ আবশ্যক।

ক্যাথলিক ধর্ম্মের জার্ম্মাণ-সমস্যা

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মতন জার্ম্মাণিতেও ধর্ম্মের দলাদলি অতি গুরুতর। খৃষ্টিয়ানে ইহুদিতে কোঁদল ত আছেই। এমন কি খৃষ্টিয়ানদের ভিতরও প্রটেষ্টাণ্টে ক্যাথলিকে ঝগড়া আজও মিটে নাই। বিসমার্কের আমলেও ছিল। আর আজ হিটলারের যুগেও আছে।

সমস্যা অতি জটিল। এই সমস্যাটাই খুলিয়া ধরা হইয়াছে বের্ণিঙের কেতাবে। রক্তের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, আর সংস্কৃতির অর্থাৎ সভ্যতা-ভব্যতার ঐক্য থাকা সত্ত্বেও একই খ্রীষ্টিয়ান সমাজ ক্যাথলিক আর প্রটেষ্টাণ্ট এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যেরূপ লড়ালড়ি করে তাহা এশিয়ার নরনারীর পক্ষেও আশ্চর্য্যজনক। হিটলারের আমলে ১৯৩৩ সনের জুলাই মাসে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সঙ্গে ক্যাথলিক গির্জ্জার সমঝৌতা কায়েম হইয়াছে। তাহার ফলে গ্রন্থকার জার্ম্মাণ সমাজে একটা যুগান্তর আশা করিতেছেন।

হিট্‌লার-রাজ সম্বন্ধে সুইডিশ মত

দেশবিদেশের লোকেরা হিট্‌লার-রাজ সম্বন্ধে কিরূপ বলাবলি করিতেছে তাহার পরিচয় জার্ম্মাণ সমাজে ও সাহিত্যে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হয়। সুইডেনের অধ্যাপক বোক একখানা বই লিখিয়াছিলেন সুইডিশ ভাষায়। জার্ম্মাণ ভাষায় তর্জ্জমা প্রকাশিত হইয়াছে এই গ্রন্থাবলীতে। এই উপলক্ষ্যে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ইংরেজিতে লখিত "হিট্‌লার-ষ্টেট" জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইয়া গিয়াছে। তর্জ্জমা করিয়াছিলেন হাউসহোফার। তাঁহার সম্পাদিত "গেও-পোলিটিক" পত্রিকার ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় (বার্লিন) সেই তর্জ্জমা বাহির হইয়াছে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জার্ম্মাণি-মুখো ভারত ও ভারত-মুখো জার্ম্মাণি

জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানে ভারতবাসীর প্রবেশ

(১৯২১-২৪)

প্রথমবার জার্ম্মাণিতে থাকিবার সময় বহুসংখ্যক ভারতসন্তানকে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ নরনারীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিবার সুযোগ বা সৌভাগ্য জুটিয়াছিল (১৯২১-২৪)। মারাঠা, মান্দ্রাজী, সিংহলী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী ইত্যাদি নানা প্রদেশের ভারতবাসী এই উপায়ে জার্ম্মাণ বণিক-ভবন, কারখানা, বিজ্ঞান-মন্দির, গ্রন্থাগার, গবেষণা-পরিষৎ, চিকিৎসালয়, আরোগ্যশালা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নিকট-সম্বন্ধে আসিতে পারিয়াছেন। আর বাঙালীরাও অনেকে গ্রন্থকারের মধ্যস্থতার ফলে জার্ম্মাণি হইতে নিজ নিজ ভবিষ্যতের জন্য কিছু-কিছু আত্মিক ও আর্থিক খোরাক আমদানি করিতে পারিয়াছেন। ভারত-সন্তানেরা কেহ চাহিতেন কারখানা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দর্শনের সুযোগ, কেহ চাহিতেন কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সাকরেতি করিবার সুযোগ। কেহ চাহিতেন বিনা পয়সায় অথবা অল্প পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা। কেহ চাহিতেন বিনা পয়সায় অথবা অল্প পয়সায় বিদ্যাপীঠে-গবেষণাভবনে-গ্রন্থশালায় প্রবেশের অধিকার। সস্তায় বাড়ীভাড়া হইতে সুরু করিয়া সস্তায় যন্ত্রপাতি কেনা পর্য্যন্ত ভারত-সন্তানের জন্য অনেক প্রকার আবদার চালাইয়া জার্ম্মাণ সমাজে বহুবার কৃতকার্য্য হইয়াছি। এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ব্যাঙ্কার, বেপারী, বীমাব্যবসায়ী, অধ্যাপক, চিকিৎসক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর জার্ম্মাণদের

নিকট কতবার কত উপলক্ষ্যে ভারতসন্তানের জন্য সহযোগিতা ও সৌহার্দ্দ্য পাইয়াছি তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই।

বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে একা এত কাজ সামলানো সম্ভবপর হয় নাই। এই জন্য যে সকল ভারতীয়,—বাঙালী-অবাঙালী,—সহযোগী জুটিয়াছিল তাহাদের ভিতর বার্লিনের ইণ্ডো-অয়রোপ্যেয়িশে হাণ্ডেল্স্-গেজেলশাফ্‌ট্‌ নামক বাণিজ্য-ভবনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বীরেনের বাণিজ্যভবন হইতে "কমার্শ্যাল নিউজ" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। তাহার সম্পাদনের ভার পড়িয়াছিল এই ঘাড়ে। সেই উপলক্ষ্যে ভারতসন্তানগণকে জার্ম্মাণির প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে পরিচিত করানো সহজসাধ্য হইয়াছিল। যে সকল ভারতবাসী এই যোগাযোগের ফলে লাভবান হইয়াছে তাহাদের ভিতর সম্পদ্‌বান্ লোকও ছিল। জার্ম্মাণির মহলে-মহলে কিছু-না-কিছুর জন্য সাহায্যপ্রার্থী ছিল না এমন কোনো ভারতবাসী আমি দেখি নাই। জার্ম্মাণদের নিকট হইতে কিছু-না-কিছু উপকার পায় নাই এমন কোনো ভারত-সন্তানও আমার জানা ছিল না।

অস্ত্রচিকিৎসক বিয়ার, জীমেন্স্-শুকার্ট কারখানার অন্যতম প্রধান এঞ্জিনিয়ার ক্যাট্‌গেন ও অন্যতম প্রধান ডিরেক্টর রাইস, বর্জিশ কার-খানার অন্যতম মালিক-ডিরেক্টর কনরাড বর্জ্জিশ, ক্রুপ কারখানার ডিরেক্টর-বর্গ, আউগ্‌স্‌বুর্গ ও ন্যিরন্‌ব্যর্গের এম-আ-এন কারখানার অন্যতম পরিচালক গুগ্গেনহাইমার, এঞ্জিনিয়ার-পরিষদের অধ্যাপক মাচ্চস, অর্থশাস্ত্রী শুমাখার, ভারতশাস্ত্রী ল্যিডার্স ও গ্লাজেনাপ ইত্যাদি ব্যক্তিগণের নিকট এই সূত্রে লেখকের কৃতজ্ঞতা সবিশেষ প্রকাশযোগ্য।

অন্য একটা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম করা যাইতে পারে। অন্যান্য দেশের মতন জার্ম্মাণিতেও "হিন্দুস্থান পরিষৎ"-সদৃশ একটা অরাষ্ট্রিক-

(সামাজিক ও সংস্কৃতিবিষয়ক) সঙ্ঘ কায়েম করা হইয়াছিল। এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠায়ও বর্ত্তমান লেখকের কিছু হাত ছিল।

রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যাঁহারা লিপ্ত তাঁহাদের পক্ষে জার্ম্মাণিতে শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক অথবা শিক্ষা-দীক্ষাবিষয়ক কাজকর্ম্ম চালানো সহজ নয়। ১৯২১-২৪ সনের মতন ১৯২৯-৩১ সনেও এইরূপ দেখিয়াছি, বর্ত্তমানেও বুঝিতেছি অবস্থা পূর্ব্ববৎ। যাঁহারা রাষ্ট্রিক কর্ম্মক্ষেত্রের লোক জার্ম্মাণি সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অন্যান্যের অভিজ্ঞতা হইতে স্বতন্ত্র।

গ্রন্থ-বিনিময় ও চিত্র-প্রদর্শনী
(১৯২২-২৩)

ভারতে-জার্ম্মাণিতে আত্মিক যোগাযোগ, চিন্তা ও কর্ম্মের আদান-প্রদান, "কুল্টুর-আউষ্টাউশ" বা সংস্কৃতি-বিনিময় ইত্যাদি ব্যবস্থা কায়েম করিবার জন্য জার্ম্মাণ গ্রন্থাবলী ভারতে আর ভারতীয় গ্রন্থাবলী জার্ম্মাণিতে পাঠাইবার আন্দোলন সুরু করিয়াছিলাম। এই আন্দোলনে সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছিলাম বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতশাস্ত্রী হাইনরিখ লিয়ডার্স আর সুপ্রসিদ্ধ "নোট্‌গেমাইন্‌শাফ্‌ট্" (অভাবগ্রস্ত-সঙ্ঘ)-দপ্তরের অধ্যক্ষ ডক্টর আডোল্ফ যুর্গেন্‌স্ এবং "জার্ম্মাণ প্রাচ্য তত্ত্ব পরিষদে"র কর্ম্মকর্ত্তা ডক্টর লিয়াট্‌কে ইত্যাদি সুধীর নিকট হইতে। সে ১৯২২ সনের কথা।

পর বৎসর বার্লিনের "নাট্‌সিওনাল গালারী" নামক জার্ম্মাণির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সরকারী প্রদর্শনী-ভবনে নব্যভারতীয় চিত্রকলার বাজার বসাইবার ব্যবস্থা করাইয়াছিলাম। এই কাজে সহায়ক বা মুরুব্বি ছিলেন সরকারী চিত্রশালাধ্যক্ষ য়ুষ্টি আর শিক্ষাসচিব ইস্‌লামশাস্ত্রী কার্ল বেকার। কলিকাতার "রূপম্"-সম্পাদক চিত্রশিল্পী অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলীর নিকট হইতে প্রদর্শনীর জন্য চিত্রগুলা আনানো হইয়াছিল। গ্রন্থবিনিময়

আর · চিত্রপ্রদর্শনী,—দুই কাজেই বীরেনের আর তাঁহার আফিসের সহযোগিতা ছিল বিস্তর।

জার্ম্মাণিতে প্রকাশিত লেখকের গ্রন্থাবলী

(১৯২২-২৩)

জার্ম্মাণিতে গ্রন্থকারের তিনখানা বই প্রকাশিত হইয়াছিল, যথা :—

১। "দি পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌স্ অ্যাণ্ড থিয়োরীজ অব দি হিন্দুজ" (লাইপৎসিগ ১৯২২)।

২। "দি ফিউচ্যরিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" (বার্লিন ১৯২৩)।

৩। "ডী লেবেন্‌স্-আনশাউঙ ডেস্ ইণ্ডার্স" (লাইপৎসিগ ১৯২৩)। জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত।

তিনখানাই প্রথম প্রবাসের সময়ে বাহির হইয়াছিল। জার্ম্মাণির বহুসংখ্যক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এই বই তিনটার লম্বা লম্বা সমালোচনা এবং সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। সমালোচনা-লেখকদের অনেকেই নিজ নিজ বিদ্যার ক্ষেত্রে অতি প্রবীণ লোক ছিলেন। তাঁহাদেরই লেখালেখির দরুণ লেখকের বক্তব্যগুলা একমাত্র জার্ম্মাণিতে নয়, যে-যে দেশে জার্ম্মাণভাষা ব্যবহৃত হয় সেই সকল দেশেও সুপ্রচারিত হইতে পারিয়াছে।

বলা বাহুল্য, যে-কোনো লেখকই এইরূপ ব্যবস্থায় নিজকে যারপর-নাই গৌরবান্বিত,—আর আসল কথা,—"কপালওয়ালা" বিবেচনা করিতে বাধ্য। জার্ম্মাণির ডজন-ডজন পণ্ডিতের নিকট আমার ঋণের পরিমাণ যে কত, বিজ্ঞানসেবী মাত্রেই তাহা ঠাওরাইতে পারিবেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুএকটা কথা বলা যাইতে পারে। ব্রেসলাওয়ের প্রবীণ ভারতশাস্ত্রী আল্‌ফ্রেড হিল্লেব্রাণ্ট্-প্রণীত "আল্ট্-ইণ্ডিশে

পোলিটিক" গ্রন্থে (১৯২৩) লেখকের "পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌স্‌" গ্রন্থের আসল মুদ্দাটা একপ্রকার প্রাথমিক ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই। আর "ফিউচ্যরিজম্‌" গ্রন্থের মোটা-মোটা কথা মিউনিকের অধ্যাপক হাউসহোফারের রচনাবলীর ভিতর বহুবার বহু উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতশাস্ত্রী য়ুলিউস য়োলিও "ফ্রাঙ্কফুর্টার ৎসাইটুঙ" কাগজে এই বইটার সুদীর্ঘ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণ সমাজে বর্ত্তমান ভারত

বর্ত্তমান ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় যাহাতে নিয়মিত ও নিত্যনৈমিত্তিক পঠন-পাঠন চলিতে পারে তাহার জন্য সেই ১৯২১-২৪ সনের যুগেই নানা মহলে আলোচনা চালাইতাম। অধিকন্তু ভারতীয় অধ্যাপক আমদানি করাইয়া যাহাতে জার্ম্মাণ বিদ্যাপীঠে তাঁহাদিগকে জার্ম্মাণ সুধীদের সহযোগী-রূপে স্থান দেওয়া যায় তাহার কথাও অনেক কেন্দ্রেই পড়িয়াছিলাম।

এই দুই প্রস্তাবের নূতনত্ব ও কঠিনত্ব সহজেই মালুম হইবে। প্রথমতঃ, প্রাচীন ভারত বা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব জার্ম্মাণ পণ্ডিত-সংসারে লোক-প্রিয় বস্তু। ইহারই নাম "ইণ্ডোলোগী" বিদ্যা। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের নরনারীও যে কতকগুলা ভাষায় কথা বলে, সাহিত্য সৃষ্টি করে, ছবি আঁকে, মূর্ত্তি গড়ে, গৃহস্থালী চালায়, ধর্ম্মকর্ম্ম করে, ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করে, ইস্কুল-কলেজে পড়িতে যায়—পড়াইতে যায়, চাষ-আবাদে লিপ্ত থাকে, ফ্যাক্টরী চালাইতে চেষ্টা করে, একটু-আধটু রাষ্ট্রিক

আন্দোলনেও মাতামাতি করে,—এই সকল কথা জার্ম্মাণির বিশ্ববিদ্যালয়ে —৫৯টা "হোখশুলে"তে একপ্রকার অজ্ঞাত।*

দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মাণদের সংস্কৃতি-মণ্ডলে ও শিক্ষা-জগতে মাঝে-মাঝে মার্কিণ অধ্যাপক আসে, ইংরেজ অধ্যাপক আসে, ইতালিয়ান অধ্যাপক আসে, আর ফরাসী অধ্যাপকও আসে। ভারতবর্ষ হইতেও যে ভারতীয় অধ্যাপক আসিয়া জার্ম্মাণিতে অধ্যাপনা-গবেষণা চালাইতে সমর্থ এই দিকে জার্ম্মাণ পণ্ডিত-মহলে ধারণা একপ্রকার ছিলই না। ভারত-সন্তান সকলেই জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের শিষ্যমাত্র, ইহার বেশী উঠা জার্ম্মাণিতে ভারত-সন্তানের পক্ষে সম্ভবপর নয়,—এইরূপ খেয়াল জার্ম্মাণির "কুল্টুর"-আবহাওয়ায় অতি স্বাভাবিকরূপে দেখা দিত, এখনও দেয়।

কাজেই বর্ত্তমান লেখকের প্রস্তাব দুইটা জার্ম্মাণদের কাছে বেশ-কিছু নতুন ঢঙের এবং গোলমেলে রকমের ঠেকিত সন্দেহ নাই। তবুও এই সকল প্রস্তাবে খানিকটা সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর জবাব পাওয়া যাইত নিম্নরূপ :—"তোমাদের দেশের পয়সাওয়ালা লোকদেরকে লেখ যে, তাঁহারা জার্ম্মাণ-জান্তা ভারতীয় 'গ্রন্থকার-

---

* জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলার শ্রেণী ও সংখ্যা নিম্নরূপ :—

১।	সাধারণ,—	২৩
২।	টেক্‌নলজিক্যাল,—	১১
৩।	বাণিজ্য,—	৫
৪।	কৃষি,—	৪
৫।	পশুচিকিৎসা,—	২
৬।	উপনিবেশ,—	১
৭।	খনি,—	২
৮।	বন,—	৩
৯।	ধর্ম্মতত্ত্ব,—	৮
	মোট	৫৯

অধ্যাপকদের' জন্য জার্ম্মাণির বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা চালাইবার খরচ পত্রের ব্যবস্থা করুন। শিক্ষা-সচিবের দপ্তর হইতে তাঁহাদিগকে অধ্যাপকের পদে হয়ত বাহাল করানো যাইতে পারিবে। আমাদের গবর্মেণ্টের তহবিল হইতে টাকা দিয়া বিদেশী অধ্যাপককে স্থায়ী বা নিয়মিতরূপে বাহাল করা দস্তুর নয়। ক্বচিৎ কখনো নেহাৎ এক-আধটা অজ্ঞাত ভাষা শিখাইবার জন্য বিদেশী লোককে জার্ম্মাণিতে তঙ্খা দিয়া বাহাল করা হয় মাত্র। কিন্তু তাহাতে তোমার প্রস্তাব মাফিক কাজ চলিতে পারে না।"

ভারতীয় অধ্যাপক রপ্তানির ব্যবস্থা

এই কথাটা আজ বৎসর বার-তের পর ১৯৩৫ সনেও মনে রাখা আবশ্যক। লেখাপড়ার তরফ হইতে জার্ম্মাণিতে বর্ত্তমান ভারতের ইজ্জদ বাড়াইবার অন্যতম উপায় হইতেছে ভারতীয় টাকায় জার্ম্মাণিতে ভারতীয় অধ্যাপক মোতায়েন রাখা। জার্ম্মাণদের সঙ্গে সমানে-সমানে আত্মিক লেনদেনের সুযোগ যত বেশী বাড়িয়া যায় ততই ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গল। যে-সকল ভারত-সন্তান বিদেশে "পরীক্ষার্থী ছাত্র"ভাবে বসবাস করেন তাঁহাদের পক্ষে বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গে সমানে-সমানে লেনদেন চলিতে পারে। "যথা লভ্যং" হিসাবে ইহাও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিদেশী সমাজের অন্য কোনো শ্রেণীর লোকের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে এইরূপ সমানে-সমানে সম্বন্ধ চালানো সাধারণতঃ সম্ভবপর হয় না। ঐ সকল দেশে শ'য়ে শ'য়ে অথবা ঝুড়ি-ঝুড়ি পি-এইচ-ডি, ডি-এস্-সি ইত্যাদি "ডক্টর" বাহির হয়। কাজেই দু-চার-দশ জন ভারতীয় শিষ্য উহাদের বিদ্যাপীঠ হইতে "ডক্টর" উপাধি পাইবার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া "পরীক্ষা" দিতে আসিয়াছে তাহা জানিয়া উহারা বিশেষ কিছু প্রভাবান্বিত হইতে পারে না। ইহা সহজেই বুঝা যায়।

"পরীক্ষার" জন্য লিখিত "ডিসার্টেশন", "থীসিস", প্রবন্ধ বা গ্রন্থের জোরে "গুরুদেব"দের সঙ্গে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ঐ সকল দেশের বিবেচনায় এই ধরণের রচনাগুলা সাধারণতঃ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। পরীক্ষার জন্য "থীসিস" লেখার পাঁচ-সাত বৎসর পর লেখাপড়ার লাইনে কি-কি কাজ করা হইল তাহা দেখিয়া লোকজনের "স্বভাব-চরিত্র" ও কর্ম্মক্ষমতা বিচার করা দস্তুর।

১৯১৫ সনে শাংহাইয়ের বিলাতী রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং ১৯১৬ সনে আমেরিকার কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য আহূত হই। তখন হইতে সর্ব্বদাই বিশবৎসর ধরিয়া এইরূপ বুঝিয়া আসিতেছি। দেশের লোকের দৃষ্টি বহুবার বহু উপলক্ষে এই দিকে আকৃষ্ট করিয়া আসিয়াছি। আজও আবার বলিয়া রাখিলাম (১৯৩৫)।

১৯১৬ সনে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হইবার সময় হইতেই বিদেশের সর্ব্বত্র ভারতীয় অধ্যাপকদের জন্য অধ্যাপক হিসাবে দুয়ার খুলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় কর্ত্তাদের আফিসে ভারতীয় অধ্যাপকদের নাম, ধাম, গ্রন্থাবলীর তালিকা ইত্যাদিও দিয়া রাখিতাম। এই সকল সংবাদ বিদেশ হইতে ভারতের নানা প্রদেশে জননায়কগণের নিকট যথাসময়ে পাঠাইতে কসুর করি নাই। ১৯২০ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আশুতোষের সঙ্গেও এই বিষয়ে চিঠিপত্র চলিয়াছিল। কিন্তু দেশে-বিদেশে এইরূপ বহু চেষ্টা চালাইবার ফলে মাত্র দুএকজন ভারতীয় অধ্যাপককে বিদেশে এক-আধটা বক্তৃতার জন্য ডাকিবার ব্যবস্থা হইতে পারিয়াছে। বুঝিতে হইবে ব্যাপার কিছু গুরুতর।

বিষয়টা কঠিন কোথায় এবং কেন এই সম্বন্ধে দেশের "সংস্কৃতি"-নায়ক ও জননায়কগণ গবেষণা চালাইতে সুরু করুন। সর্ব্বদাই মনে রাখা ভাল যে, জার্মাণিতে ভারতের নাম ছড়াইয়া পড়িলে এই

নাম একমাত্র জার্ম্মাণ সমাজেই আবদ্ধ থাকে না। ইয়োরোপের সকল দেশে আর আমেরিকায়, মায় জাপান এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশেও জার্ম্মাণ ভাষার মারফৎ ভারতবাসীর নাম-কাম সুপরিচিত হইয়া যায়।

ইংরেজি ভাষায় জার্ম্মাণ "কুল্টুর"

জার্ম্মাণির সকল মহলেই দেখিতাম তাঁহারা চাহেন যে, বিদেশীরা জার্ম্মাণ ভাষা শিখুক। তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্বাস বিদেশীরা জার্ম্মাণি ও জার্ম্মাণ নরনারী সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। জার্ম্মাণদের এইরূপ বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই। ভারত-সন্তানের পক্ষেও জার্ম্মাণ ভাষা দখল করিতে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সর্ব্বদাই আমি জার্ম্মাণির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আর নামজাদা পরিষৎ, বিদ্যাপীঠ, বণিকভবন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তাদিগকে সঙ্গে-সঙ্গে আর এক দিকেও নজর ফেলিতে পরামর্শ দিতাম।

একালে ইংরেজি ভাষা বিশ্বভাষায় পরিণত হইয়াছে। অল্প সময়ের ভিতর সংসারে দিগ্‌বিজয়ী হইতে হইলে ইংরেজি ভাষাকে নিজের কাজে লাগাইতেই হইবে। সুতরাং জার্ম্মাণ ভাষায় যে-সকল বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বস্তু সৃষ্ট হয় সেইগুলার প্রধান প্রধান অংশ ইংরেজি ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া অথবা তাহার সার সঙ্কলন করিয়া বিশ্ব-বাজারে ফেলিবার চেষ্টা করা জার্ম্মাণ স্বদেশ-সেবকদের কর্ত্তব্য। গোটা দুনিয়ায় রাতারাতি জার্ম্মাণ "কুল্টুরের" অর্থাৎ সংস্কৃতির বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিগ্‌বিজয় ইংরেজি ভাষার দৌলতে সহজসাধ্য।

এই দিকে জার্ম্মাণদের নজর গেলে বলা বাহুল্য ভারতীয় ইস্কুল-কলেজ, গবেষক-অধ্যাপক ইত্যাদির অনেক মঙ্গল সাধিত হইবে। অবশ্য প্রধানতঃ ভারতবর্ষের স্বার্থপুষ্টির জন্যই জার্ম্মাণ সমাজে এইরূপ মত প্রচার করিতাম। কোনো কোনো মহলে এই দিকে উৎসাহ সৃষ্ট

হইতেও দেখিয়াছি। বস্তুতঃ ভারতের জন্য জার্ম্মাণির শিল্পবাণিজ্য ও অর্থকথা সম্বন্ধে একখানা ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনের ভারও এই হাতে আসিবার উপক্রম হইয়াছিল।

একটা কথা মনে পড়িতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে ইংরেজ চিন্তাবীর ও সাহিত্যরথী টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) জার্ম্মাণ "কুল্‌টুরের" ভক্ত ছিলেন। জার্ম্মাণির জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষতঃ সাহিত্য ও দর্শন তিনি প্রচুর পরিমাণে ইংরেজ সমাজে প্রচারিত করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জার্ম্মাণ-নিষ্ঠার ফলে ইংরেজ সংস্কৃতি খানিকটা জার্ম্মাণ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ইংরেজি ভাষার মারফৎ জার্ম্মাণ "কুল্‌টুর" এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আমেরিকায় আর ভারতেও উচ্চশিক্ষিত নরনারী জার্ম্মাণ দর্শন ও জার্ম্মাণ সাহিত্য—কম-সে-কম গ্যেটে-কাণ্ট-ফিখ্‌টে-হেগেলের বাণী অনেকটা ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনের সামিল করিয়া লইতে পারিয়াছে। আজও সেইরূপ ইংরেজির সাহায্যে জার্ম্মাণির জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার সুসম্ভব।

মিউনিকের ডয়চে আকাডেমী

(১৯২৯ অক্টোবর-নবেম্বর)

১৯২৯ সনের জুন মাসে দ্বিতীয়বার ইয়োরোপে প্রবাস সুরু হইয়াছিল। সেই সঙ্গে জার্ম্মাণিতেও পর্য্যটন ঘটিয়াছিল। এইবারও দেশে-দেশে বর্ত্তমান ভারত বিষয়ক অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সম্বন্ধে, ভারত-সন্তানের জন্য কারখানায়-বিদ্যাপীঠে-হাসপাতালে সুযোগ সৃষ্টি সম্বন্ধে, আর ভারতীয় অধ্যাপক নিয়োগ সম্বন্ধে নানা সুধীমহলে আলোচনা জাগাইয়া তুলিয়াছিলাম। জার্ম্মাণিতে উপস্থিত হইয়াও ফ্রাঙ্কফোর্ট, কোলোন, বার্লিন ইত্যাদি কেন্দ্রে নয়া-পুরাণা জার্ম্মাণ বন্ধুদের সঙ্গে ঐ সকল কথা পাড়িতে ভুলি নাই।

দেশে থাকিতেই জানিতাম যে, আমার জার্ম্মাণি পরিত্যাগের পর ১৯২৫-২৬ সনে মিউনিক শহরে ডয়চে আকাডেমী নামক জার্ম্মাণ পরিষৎ কায়েম হইয়াছে। মিউনিকে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আবহাওয়ায়ও ঐ সকল কথা তুলিয়াছিলাম (অক্টোবর ১৯২৯)। "গেওপোলিটিক" বিদ্যার প্রবর্ত্তক কার্ল হাউসহোফার, টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রশাস্ত্রী প্রিন্‌ৎস আর অর্থশাস্ত্রী ডর্ন ইত্যাদি সুধীগণের সঙ্গে এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা হইয়াছিল। আকাডেমীর প্রেসিডেণ্ট চিকিৎসাশাস্ত্রী ফ্রীড্‌রিশ ম্যিলার, অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষাশাস্ত্রী গেঅর্গ কের্শেনষ্টাইনার, ডয়চেস মুজেয়ুম-প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌বিখ্যাত বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার ওস্কার ফোন মিলার ইত্যাদি সংস্কৃতি-নায়কদের মহলেও এই সকল কথা তুলিয়াছিলাম। আকা-ডেমীর কর্ম্মকর্ত্তা ডক্টর টিয়ারফেল্ডার বর্ত্তমান ভারত বিষয়ক প্রচেষ্টাকে ফলবতী করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন।

এই সময়ে ঘটনাচক্রে সপত্নীক ডক্টর তারকনাথ দাস মিউনিকে ছিলেন। দাস-পরিবার মার্কিণ প্রজা,—ভারত-প্রজা নন। তাঁহারা যতদিন জার্ম্মাণিতে প্রবাসী ছিলেন তত দিন তাঁহারা স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র ভারতবর্ষের স্বপক্ষে জার্ম্মাণ নরনারীর সস্নেহ দৃষ্টি টানিয়া আনিতে সচেষ্ট ছিলেন। ডয়চে আকাডেমীর "ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট" প্রতিষ্ঠায় দাস-পরিবারের কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কার্য্যের ফলে জার্ম্মাণিতে ভারতের নানা প্রদেশের বহু নরনারীর অনেক উপকার হইয়াছে। বলা বাহুল্য সপত্নীক তারক দাসের সঙ্গেও জার্ম্মাণিতে বর্ত্তমান ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যাপনা এবং ভারত-সন্তানের জন্য সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

"ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট" পূরাপূরি জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান। ইহার ভিতর কোনো ভারত-প্রজার ঠাঁই নাই। জার্ম্মাণ টাকায় জার্ম্মাণ নরনারীর

সৌহার্দ্দ্যে ভারত-সন্তানের জন্য জার্ম্মাণিতে সুযোগ সৃষ্টি করিবার মতলবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম।

জার্ম্মাণরা পূর্ব্বে ও ভারতবাসীকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে, এখনও গ্রহণ করিতেছে। এই খানে জানিয়া রাখা ভাল যে, বহুসংখ্যক ভারতীয় সুধীর,—হিন্দু-মুসলমানের, বাঙালী-অবাঙালীর,—"ব্যক্তিগত" কর্ম্মের ফলে জার্ম্মাণ সমাজের নানা মহলে নানা শ্রেণীর বন্ধুত্ব সৃষ্ট হইতে পারিয়াছে। কোনো দুএক জন জার্ম্মাণের অথবা ভারত-সন্তানের নাম করিলে জার্ম্মাণ জাতিকেও খাটো করা হইবে আর ভারতীয় সুধীবৃন্দকেও খাটো করা হইবে। ডয়চে আকাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণির নানা কেন্দ্রে ভারতসন্তানেরা ভারতবাসীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই তাহার কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে।

যুবক ভারত অনেকদিন ধরিয়া জার্ম্মাণ জাতির নিকট ঋণী। ঋণের বহর ও বেশ পুরু। এই ঋণের কথা ভুলিয়া থাকা আধুনিক ভারতের কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, ডয়চে আকাডেমী ছাড়াও বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান, পরিবার ও ব্যক্তি জার্ম্মাণির নানা শহরে ভারত-সন্তানের জন্য নানাপ্রকার বন্ধুত্বের কাজ করিয়া থাকে। ডয়চে আকাডেমীর বন্ধুত্বও যারপর নাই মূল্যবান্ সন্দেহ নাই। ভারতবাসীরা এই বন্ধুত্বের জন্য জার্ম্মাণ নরনারীর নিকট আর বিশেষতঃ ডয়চে আকাডেমীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য।

জার্ম্মাণ গ্রন্থের বাংলা তর্জ্জমা

(১৯২৬-৩২)

বাংলা ভাষায় দুইখানা জার্ম্মাণ বই তর্জ্জমা করিয়াছি। নাম নিম্নরূপ :—

১। "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (ফ্রীড্‌রিশ এঙ্গেল্‌স প্রণীত "ড্যর উর্‌স্প্রুং ড্যর ফামিলিয়ে" গ্রন্থ), ১৯২৬।

২। "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি" (ফ্রীড্‌রিশ লিষ্ট প্রণীত "ডাস সিষ্টেম ড্যর পোলিটিশেন য়েকোনোমী" গ্রন্থ), ১৯৩২।

বই দুইটাই অর্থশাস্ত্রবিষয়ক। লিষ্ট অর্থশাস্ত্রের অন্যতম জগদ্‌গুরু। আর এঙ্গেলস্ ছিলেন কার্ল মার্কসের অন্তরঙ্গ বন্ধু, কাজেই আর এক জগদ্‌গুরু।

লিষ্টের তর্জ্জমা প্রবন্ধের আকারে ১৯১৪-১৯ সনের ভিতর বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তখন আমি ছিলাম বিলাতে, আমেরিকায়, চীন-জাপানে।

এঙ্গেল্‌সের তর্জ্জমাও প্রথম বাহির হয় মাসিক পত্রিকায়,—১৯২৪-২৫ সনে। তখন ও আমি বিদেশে,—স্বইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ইতালি, অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণিতে।

জার্ম্মাণিবিষয়ক রচনাবলী

(১৯২২-৩৫)

যে সকল ভারতীয় পত্রিকায় লেখকের জার্ম্মাণিবিষয়ক রচনাবলী বাহির হইয়াছে নিম্নে তাহার নাম বিবৃত হইল :—

১। "কলেজিয়ান" (কলিকাতা, ১৯২২-২৪)। এই পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ "মডার্ণ রিভিউ" মাসিকে নিয়মিতরূপে উদ্ধৃত করা হইত।

২। "আর্থিক উন্নতি" (কলিকাতা, ১৯২৬—)।

৩। "জার্ণ্যাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স" (কলিকাতা, ১৯২৬-৩২)।

৪। "ক্যালকাটা রিভিউ" (১৯২৭-২৯, ১৯৩৩—)।

৫। "ইণ্ডিয়ান কমার্শ্যাল অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল রিভিউ" (কলিকাতা, ১৯৩৪ –)।

জার্ম্মাণি বিষয়ক কয়েকটা প্রবন্ধ এই সূত্রে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধগুলা পুস্তিকার আকারেও বাহির হইয়াছে। তালিকা নিম্নরূপ :—

১। "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সেণ্টার্স অ্যাণ্ড ইকনমিক ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌স্ ইন জার্ম্মাণি" (জার্ণ্যাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)।

২। "সোশ্যাল আইডিয়্যালিজম্ ইন গ্যেটেজ্ লিরিক্‌স্ অ্যাণ্ড ড্রামাজ্" (প্রবুদ্ধ ভারত, কলিকাতা, জুলাই ও আগষ্ট ১৯৩২)।

৩। "দি হিট্‌লার-ষ্টেট" (ইনশিওর‍্যান্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ, কলিকাতা, অক্টোবর-নবেম্বর ১৯৩৩)।

তৃতীয় রচনাটার জন্ম হইয়াছিল কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট জেটি ইন্‌ষ্টিটিউটের বক্তৃতায় (৯ জুন ১৯৩৩)। ১৯৩৩ সনের ১৪ জুন তারিখে এই বক্তৃতার সারমর্ম্ম কলিকাতার "লিবার্টি" দৈনিকে ছাপা হয়। "অ্যাডভান্স" ইত্যাদি দৈনিকেও বাহির হইয়াছিল। নাম ছিল "হার্ডার হইতে হিট্‌লার পর্য্যন্ত যুবক জার্ম্মাণির ক্রমবিকাশ।" সেই বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে বার্লিন হইতে প্রকাশিত "গেও পোলিটিক" মাসিক পত্রে এই বক্তৃতার জার্ম্মাণ তর্জ্জমা বাহির হইয়াছিল। অনুবাদক ছিলেন সম্পাদক হাউসহোফার স্বয়ং। পরে এই বক্তৃতা বিস্তৃত আকারে লেখা হইলে কিয়দংশ "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয় (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হয় "ইন্‌শিওর‍্যান্স অ্যাণ্ড ফিনান্স রিভিউ" পত্রিকার দুই সংখ্যায় (১৯৩৩ সনের অক্টোবর ও নবেম্বর)। পরে পুস্তিকার আকারে এই রচনা দুইবার প্রকাশিত হইয়াছিল, কলিকাতা ও দিল্লী)। দেশবিদেশের নানা পত্রিকায় প্রবন্ধটা আগাগোড়া উদ্ধৃত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সীয়াট্‌ল্

নগরে প্রকাশিত "ভাশিংটন ষ্টাট্স্-ৎসাইটুঙ" নামক জার্ম্মাণ পত্রিকার দুই সংখ্যা (১৯৩৪, ৮।১৫ ফেব্রুয়ারি) অন্যতম নিদর্শন।

জার্ম্মাণ ভাষায় রচনাবলী

(১৯২২-৩২)

জার্ম্মাণ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনেক নিমন্ত্রণ আসিত। কোনো কোনো সময় সম্পাদকেরা বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। আর কত পৃষ্ঠার মাল চাই তাহাও তাঁহাদের বরাতের ভিতর নির্দ্দিষ্ট করা থাকিত। দুইবারে যে সকল জার্ম্মাণ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে নিম্নে তাহার বৃত্তান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

১। ১৯২২ জানুয়ারি, ডয়চে রুণ্ডশাও (জার্ম্মাণ সমালোচনা), বার্লিন।

২। ১৯২২ মার্চ, " "

৩। ১৯২২ এপ্রিল, " "

৪। ১৯২২ সেপ্টেম্বর, এক্স্‌পোর্ট-ইম্পোর্ট রিভিউ (আমদানি-রপ্তানি), বার্লিন।

৫। ১৯২৩ ফেব্রুয়ারি, ষ্টিম্মেন ডেস্ ওরিয়েন্ট্স্ (এশিয়ার বাণী), কির্খহাইম টেক্।

৬। ১৯২৩ আগষ্ট, ডয়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ (দৈনিক), বার্লিন।

৭। ১৯২৪ অক্টোবর, ফারাইন ডয়চার ইঞ্জেনিয়রে নাখ্‌রিখ্‌টেন (এঞ্জিনিয়ারিং পরিষদ্ সংবাদ), বার্লিন।

৮। ১৯৩০, জুলাই, ডয়চে রুণ্ডশাও (জার্ম্মাণ সমালোচন), বার্লিন।

৯। ১৯৩০ জুলাই, ফর্শুঙেন উণ্ড ফর্ট্‌শ্রিট্টে (গবেষণা), বার্লিন।

১০। ১৯৩০ নবেম্বর, ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌লিখে নাখরিখটেন (শিল্প-বাণিজ্য), ভিয়েনা।

১১। ১৯৩০ নবেম্বর, বায়্যারিশে ইণ্ডুষ্ট্রী-উণ্ড-হাণ্ডেল্‌স-ৎসাইটুঙ (শিল্প-বাণিজ্য), মিউনিক।

১২। ১৯৩০ ডিসেম্বর, ভেল্ট-ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌ (বিশ্বদৌলত), বার্লিন।

১৩। ১৯৩১ ফেব্রুয়ারি, বেরিখ্‌টে য়্যিবার লাণ্ডভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌ (কৃষি), বার্লিন।

১৪। ১৯৩১ ফেব্রুয়ারি, নয়মান্‌স্‌ ৎসাইটশ্রিফ্‌ট্‌ ফ্যির ফার্জি-খারুংস্‌ভেজেন (বীমা), বার্লিন।

১৫। ১৯৩১ মার্চ, বাঙ্কভিস্‌সেনশাফ্‌ট্‌ (ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞান), বার্লিন।

১৬। ১৯৩১ এপ্রিল, ৎসাইট্‌শ্রিফট ফ্যির গেও-পোলিটিক (জনপদ মাফিক কর্ম্ম-কৌশল), বার্লিন।

১৭। ১৯৩১ এপ্রিল, মাশিনেন-বাও (যন্ত্রগঠন), বার্লিন।

১৮। ১৯৩১ এপ্রিল, কার্লসরুহার আকাডেমিশে মিট্‌টাইলুঙেন (পারিষদিক সংবাদ), কার্লসরুহে।

১৯। ১৯৩১ জুলাই, মাগাৎসিন ড্যর ভির্ট্‌শাফ্‌ট্‌ (শিল্পবাণিজ্য), বার্লিন।

২০। ১৯৩১ জুলাই, আলগেমাইনেস্‌ ষ্টাটিষ্টিশেস আর্খিফ্‌ (সংখ্যা-বিজ্ঞান পত্রিকা), য়েনা।

২১। ১৯৩১, আউস্‌লাণ্ডলিখে ফোর্ট্রেগে ড্যর টেখ্‌নিশেন হোখ্‌-শুলে ষ্টুটগার্ট (ষ্টুটগার্ট টেকনলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাবলী)।

২২। ১৯৩১, এস্‌সেনার ফোল্‌ক্‌স্‌-ৎসাটুঙ্‌ (দৈনিক), এস্‌সেন।

২৩। ১৯৩২, ক্যোল্‌নার ৎসাইটশ্রিফট্‌ ফ্যির্‌ সোৎসিওলোগী (সমাজ-বিজ্ঞান), কোলোন।

২৪। আর্থিফ ফ্যির ফারগ্লাইখেণ্ডে রেখ্‌ট্‌স্-ভিস্‌সেনশাফ্‌ট্‌ (আইন-বিজ্ঞান), বার্লিন।

২৫। আর্খিফ্ ফ্যির কুল্‌টুর-গেশিষ্টে (সংস্কৃতি), লাইপৎসিগ।

প্রকাশিত অবস্থায় ২৪ ও ২৫ নং রচনা দুইটা এখনো গ্রন্থকারের হস্তগত হয় নাই। জার্ম্মাণির বাহিরেও ইয়োরামেরিকার সকল দেশেই এই সকল পত্রিকার কাট্‌তি আছে। বলা বাহুল্য রচনাগুলা সবই জার্ম্মাণ ভাষায় লেখা।

বাংলা ও ইংরেজি রচনায় জার্ম্মাণ মাল

দুনিয়ার নানা দেশের রস চুষিয়া খাইতে থাকিলে হাড়গোড়ে বিদেশী মাল আপনাআপনিই আসিয়া হাজির হইতে বাধ্য। জার্ম্মাণ মালও লেখকের রচনাবলীর ভিতর যখন-তখন যেখানে-সেখানে উঁকি মারিয়াছে, কখনো-কখনো হয়ত লেখককে পাইয়াও বসিয়াছে।

বস্তুতঃ "সেকাল" হইতে "একাল" পর্য্যন্ত লেখকের সকল প্রকার রচনার ভিতরই জার্ম্মাণ চিন্তা অল্প-বিস্তর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেকালের কয়েকখানা বাংলা ও ইংরেজি বইয়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—

১। "সাধনা" (কলিকাতা ১৯১৩)।

২। "স্বদেশ-সাহিত্যে ভারতের বাণী" (কলিকাতা ১৯১৩)।

৩। "চাইনীজ রিলিজ্যন থ্রু হিন্দু আইজ্" (শাংহাই ১৯১৬)।

৪। "ল্যভ ইন হিন্দু লিট্‌রেচ্যার" (তোকিও ১৯১৬)।

তখনও জার্ম্মাণ ভাষা জানা ছিল না। জার্ম্মাণ ভাষা শিখিতে সুরু করি ১৯১৭ সনে চীন-জাপান হইতে আমেরিকায় ফিরিয়া আসিয়া হার্ভার্ডে আড্ডা গাড়িবার সময়।

জার্ম্মাণ তথ্য ও তত্ত্ব "একালে" প্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলার ভিতর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারিয়াছি :—

১। "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" (মান্দ্রাজ ১৯২৬)।

২। "পলিটিক্‌স্ অব বাউণ্ডারীজ" (কলিকাতা ১৯২৬)।

৩। "পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ সিন্স ১৯০৫" (মান্দ্রাজ ১৯২৮)।

৪। "কম্‌পারেটিভ পেডাগজিক্‌স্ ইন রেলেশন টু পাবলিক ফিনান্স অ্যাণ্ড ন্যাশন্যাল ওয়েল্‌থ" (কলিকাতা ১৯২৯)।

৫। "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র", প্রথমভাগ (১৯৩০), দ্বিতীয় ভাগ (১৯৩৫)।

৬। "অ্যাপ্‌লায়েড ইকনমিক্‌স্", প্রথম ভাগ (কলিকাতা ১৯৩২)।

৭। "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন," দুই ভাগ (১৯৩২)।

৮। "ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্স ভিজ্-আ-ভি ওয়ার্ল্ড্-ইকনমি" (কলিকাতা ১৯৩৪)।

৯। "বাড়তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪)।

১০। "সোশ্যাল ইন্‌শিওর‍্যান্স" (কলিকাতা ১৯৩৫)।

এই সকল রচনার ভিতর জার্ম্মাণির জমি-জমা, ব্যাঙ্ক, বীমা, মুদ্রা, কৃষি-ব্যবস্থা, শিল্পনিষ্ঠা, যন্ত্রসম্পদ, বাণিজ্য ও শুল্কনীতি, অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রদর্শন, আইন-কানুন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, মজুর-আন্দোলন, ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈববীমা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে জার্ম্মাণিকে তুলনা করিয়া দেখা হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়েই বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিস্তৃততর জার্ম্মাণ তথ্যমূলক গ্রন্থ লেখা আবশ্যক। আশা করি সেই ধরণের গ্রন্থ বাঙালীর কলমে শীঘ্রই বাহির হইতে পারিবে।

"কম্পারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্", "ওয়ার্ল্ড-ইকনমি," "কম্পারেটিভ পেডাগজিক্‌স্," "কম্পারেটিভ কালচ্যর-হিষ্টরি", বিশ্বদৌলত, বিশ্ব-সাহিত্য, "তুলনামূলক আলোচনা" ইত্যাদি বোলচালের নিরেট

বনিয়াদ্ গড়িবার জন্য "দেশ ও দুনিয়ার" আলোচনা চাই এক সঙ্গে। অর্থাৎ ভারতের বা বাঙলার সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য দেশের কথার অবতারণা করা অত্যাবশ্যক। কাজেই জার্ম্মাণ দেশের তথ্য ও তত্ত্ব আসিয়া জুটিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল আন্তর্জ্জাতিক বোল-চালের পশ্চাতে ও সম্মুখে সর্ব্বদাই রহিয়াছে এক জবর বস্তু। তাহার নাম বাঙালী জাতির বাড়তি-সাধন,—বৃহত্তর ও গভীরতর বঙ্গ-গঠন। জার্ম্মাণির সঙ্গে এবং অন্যান্য ছোট-বড়-মাঝারি দেশের সঙ্গে মাপিয়া জুকিয়া, দুনিয়ার বাট-খারায় ফেলিয়া বাঙলার নরনারীকে বাড়াইয়া দেওয়া অর্থাৎ "পরবর্ত্তী ধাপে" ঠেলিয়া তোলা এই সমুদায় আলোচনা-গবেষণার একমাত্র লক্ষ্য। বাঙালী জাত বড় জাত। এই বড় জাত বাড়িয়াছে। ইহার পক্ষে আরও বাড়িবার অন্যতম যন্ত্র হইতেছে জার্ম্মাণি-মুখো হওয়া। জার্ম্মাণি পর্য্যন্ত উঠা বাঙালীর পক্ষে আজ, কাল, পরশু, এখনো বহুকাল পর্য্যন্ত, হয়ত কোনো দিনই সম্ভবপর নয়। কিন্তু বাঙালীর পক্ষে "নিকটবর্ত্তী ধাপ", "পরের ধাপ", "তার পরের ধাপ" ইত্যাদি ধাপ-পরম্পরা বুঝিবার জন্য জার্ম্মাণ আবহাওয়ায় বাঙলার তথ্য অথবা বাঙালীর আবহাওয়ায় জার্ম্মাণির তথ্য ঢালিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই কাজে অনেক সুধীর সমবেত সাধনা প্রযুক্ত হউক।

জার্ম্মাণি ও ভারত

(১৮৭০-১৯৩৫)

বিস্‌মার্ক-প্রতিষ্ঠিত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের যুগে জার্ম্মাণ "কুল্‌টুর" বিষয়ক আলোচনা তামাম দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের ও প্রদেশে-প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলার দৌলতে ১৮৭০ হইতে ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত যুগের উচ্চশিক্ষিত লোকেরা গ্যেটে-শিলার, কাণ্ট-ফিখ্‌টে-হেগেল-শোপেনহাওয়ার, হুম্বোল্ড-হেল্‌ম্‌হোল্ট্‌স্, পেষ্টালোট্‌সি-ফ্রেবেল্

ইত্যাদি চিন্তাবীরগণ সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষার মারফৎ বেশ-কিছু জানিত।

স্বদেশী আন্দোলনের গৌরবময় যুগে যুবক বাঙ্‌লা জার্ম্মাণিকে শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষার পীঠস্থানরূপে বাছিয়া লইয়াছিল (১৯০৫-১৪)। সেই যুগে, বিশেষতঃ বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যাপক হিসাবে আমরা ফ্রীড্‌রিশ লিষ্টকে সংরক্ষণ-নীতির অবতার রূপে সম্বর্দ্ধনা করিতাম। মনে পড়ে, জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আবহাওয়ায় সেযুগের "উকিল-রাজা" দানবীর রাসবিহারী ঘোষ লিষ্ট-প্রণীত বইটার উপর জোরের সহিত আমাদের নজর টানিয়া আনিয়াছিলেন। সেই যুগের আবহাওয়ায়ই লিষ্টের গ্রন্থটা বাংলায় তর্জ্জমা করিতে সুরু করিয়াছিলাম (১৯১২-১৩)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার তখন স্বদেশ-সেবক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কর্ম্মবীর আশুতোষ যুবক বাঙ্‌লাকে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ দুনিয়ার সঙ্গে মিলাইয়া-মিশাইয়া বাড়াইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিলেন। আশুতোষের মগজে গোটা জগতের হাট-বাজার চলিত। বাঙালী জাতি আশুতোষের নিকট যত-কিছু পাইয়াছে তাহার ভিতর তাঁহার আন্তর্জ্জাতিকতা অর্থাৎ দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাঙালীর লেনদেন-প্রতিষ্ঠা অন্যতম।

জার্ম্মাণ "কুল্‌টুরের" সঙ্গেও আশুতোষের সহযোগ ছিল। তাহার অনেক সুফল পরবর্ত্তী কালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,—বিশেষতঃ বিজ্ঞান-বিভাগের মারফৎ,—ভারত-সমাজে ছড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। সেই যুগের আশুতোষ বাঙালী মাত্র ছিলেন না। গোটা ভারত তাঁহার ভাবুকতায় তাতিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আন্তর্জ্জাতিকতা,—বিশেষতঃ তাঁহার জার্ম্মাণ-নিষ্ঠা সমগ্র যুবক ভারতের পক্ষে অন্যতম আত্মিক শক্তিরূপে কর্ম্ম করিত।

লড়াইয়ের (১৯১৪-১৮) পরবর্ত্তী যুগে জার্ম্মাণিকে ছুঁইয়া আনিবার জন্য ভারতের নানা প্রদেশ হইতে নানাপ্রকার ছোট-বড় অভিযান গিয়াছে। এই যুগের জার্ম্মাণ-কথাই (১৯১৯-৩৫) "পরাজিত জার্ম্মাণি"-গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। একালে বহুসংখ্যক বাঙালী অবাঙালী জার্ম্মাণ-ভাষায় ফোয়ারা ছুটাইতে পারে। ১৯২১ সনে রবীন্দ্রনাথের জার্ম্মাণ শফর এই যুগেরই "সংস্কৃতি"-রাজ্যের অন্যতম বড় ঘটনা। জার্ম্মাণির অলি-গলি তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছে বহুসংখ্যক ভারত-সন্তান। জার্ম্মাণদের ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ আজ অনেক ভারতবাসী। জার্ম্মাণির কারখানায়, হাসপাতালে, বিজ্ঞান-পরিষদে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছে অনেকে। জার্ম্মাণির সঙ্গে ভারতের মাল আমদানি-রপ্তানির সম্বন্ধেও নবযুগ আসিয়াছে। ভারতীয় বেপারীরাও এই জার্ম্মাণ-ভারতীয় বাণিজ্যের হিস্সা লইতেছে।

কাজেই একালের ভারত-সমাজে জার্ম্মাণি ও জার্ম্মাণ "কুল্‌টুর" বেশ-কিছু সুপরিচিত বস্তু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভারতের আরও কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন কি ইস্কুল-কলেজের তদবিরেও, জার্ম্মাণ ভাষা পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকায় জার্ম্মাণির নানা কথা সম্বন্ধে সুচিন্তিত তথ্যমূলক ভারতীয় রচনা মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। একটা ছোটখাটো "জার্ম্মাণ আন্দোলন" যেন ভারতের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে বলা যাইতে পারে।

এই আবহাওয়ায় "পরাজিত জার্ম্মাণি" প্রকাশিত হইল (১৯৩৫)। এই গ্রন্থের ভিতর-বাহির, এপিঠ-ওপিঠ তলাইয়া-মজাইয়া বুঝিবার, সমালোচনা করিবার, স্বপক্ষে-বিপক্ষে বলিবার লোক ভারতের সর্ব্বত্রই আজ বিস্তর। বাড়তির পথে ভারতবাসীর ইহা অন্যতম লক্ষণ।

জার্ম্মাণরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত ধরণের যতপ্রকার বই লিখিয়া থাকে ভারতসন্তানেরাও জার্ম্মাণি সম্বন্ধে তত ধরণের তত প্রকার বই লিখিবার আকাঙ্ক্ষায় চাঙ্গা হইয়া উঠিবে এই আশা চিরকালই আছে।

বঙ্গীয় গোটে স্মৃতি পরিষৎ
(১৯৩২)

১৯৩২ সনে জার্ম্মাণিতে গ্যেটের মৃত্যুর শতবার্ষিকী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে ভারতের নানা স্থানেও গ্যেটে-তিথি পালিত হইয়াছে। বাঙলা দেশের জন্য বহুসংখ্যক বঙ্গবাসীর আনুকূল্যে একটা বঙ্গীয় গ্যেটে স্মৃতি পরিষৎ কায়েম করিয়াছিলাম। তাহার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ফোন হিণ্ডেনবুর্গের নিকট বঙ্গীয় গ্যেটে স্মৃতি পরিষদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের নামে জার্ম্মাণ ভাষায় তার পাঠানো হইয়াছিল। জার্ম্মাণিতে এই তারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পরিষদের বৃত্তান্ত যথাসময়ে অন্যত্র প্রকাশ করা যাইবে। সম্প্রতি বলিয়া রাখি যে, একালের অন্যতম বাঙালী জননায়ক অ্যাটর্নি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু কলিকাতায় গোটে-তিথি পালনের কাজে উৎসাহী ও অগ্রতৎপর ছিলেন। ১৯২৯ সনের প্রথম দিকে সপত্নীক ভারত-শাস্ত্রী লিডার্সের কলিকাতায় থাকার সময়ও যতীন বাবু জার্ম্মাণদের সঙ্গে ভারতীয় নরনারীর সামাজিক লেনদেনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় জার্ম্মাণ-বিদ্যাসংসদ
(১৯৩৩)

১৯৩৩ সনের জুন মাসে "বঙ্গীয় জার্ম্মাণ-বিদ্যাসংসদ" নামে একটা "কুল্টুর" বা সংস্কৃতি বিষয়ক পরিষৎ কায়েম করিয়াছি। বাঙলাদেশের

শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রের কয়েকজন প্রতিনিধি বন্ধুভাবে এই সংসদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। "ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোআর্টার্লি"র সম্পাদক এবং বঙ্গেশ্বরী কটন মিলের পরিচালক ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা এই সংসদের প্রেসিডেণ্ট। এই সংসদের সংশ্রবে জার্মাণ জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সকল বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে অন্যত্র তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতন বাঙলা দেশেও জার্মাণির ডিপ্লোমা-ধারী ও ডক্টর-উপাধিওয়ালা স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা বাড়িতেছে। জার্মাণির "বত্রিশ বিদ্যা ও চৌষট্টি কলা" সম্বন্ধে অনুসন্ধান, গবেষণা, বক্তৃতা ইত্যাদির জন্য বাঙালীর তাঁবে নানা সংসদ, সভা, গোষ্ঠী, ক্লাব ও পরিষৎ চলিতে পারিবে আশা করা যায় (১৯৩৫)।

ভীজবাডেনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

(১৯৩৪)

জার্মাণিতে আজকাল শুনিতে পাই অ-জার্মাণ চিন্তার পশার কম। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কফোর্টের কিছু-নিকটবর্ত্তী ভীজবাডেন শহরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত নয়া বেদান্তের ছোট্ট একটা ঢেউ জার্মাণ সমাজে গিয়া পড়িয়াছে (১৯৩৪)। এই শহরের ভোল্ফ্‌গ্রাম কথ্ নামক একজন খৃষ্টিয়ান দর্শনসেবীর ব্যক্তিগত আগ্রহ এইজন্য দায়ী। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী যতীশ্বরানন্দ জার্মাণ নরনারীর নিমন্ত্রণে মধ্য-রাইন জনপদের এই ভীজবাডেন শহরে গিয়া ধর্ম্ম ও দর্শন প্রচারের কাজে মোতায়েন আছেন। যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে যে, "শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।" জার্মাণরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাসম্পদ জার্মাণ ভাষায় তর্জ্জমা করার ভার লইতেছে। ভারত-মুখো জার্মাণির ইহা অন্যতম নতুন মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির কিম্মৎও ঢের।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

পরাজিত জার্ম্মাণির শ্বাস-প্রশ্বাস

(১৯১৮-৩৫)

জার্ম্মাণি-বিজয়ী আডোল্‌ফ্‌ হিট্‌লার

জার্ম্মাণিতে যেদিন প্রথম পদার্পণ করি সেই দিনই বুঝিতে পারি যে, অল্পদিনের ভিতরেই জার্ম্মাণ সমাজে নয়া জাত আর নয়া রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে। "পরাজিত জার্ম্মাণি"-গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই এই পুনর্গঠনের চিহ্নোৎ রহিয়া গিয়াছে। ১৯৩৩ সনের জানুয়ারি মাসে আডোল্‌ফ্‌ হিট্‌লার জার্ম্মাণ চিত্ত ও জার্ম্মাণ জাতকে দখল করিয়াছেন,—"জার্ম্মাণি-বিজয়ী" হইয়াছেন। আর ১৯৩৫ সনের জানুয়ারি মাসে জার্ম্মাণরা সার-জনপদ ফিরাইয়া পাইল। ইহাও হিট্‌লারের অন্যতম বিজয়লাভ।

কিন্তু এই সকল বিজয়লাভের বহু পূর্ব্বেই জাতীয় "ইজ্জৎ" রক্ষায় "ব্রতবদ্ধ" জার্ম্মাণ নরনারীর, হিট্‌লারের, অথবা হিট্‌লার-ঘেঁশা দলের বিজয়-লাভ যে অবশ্যম্ভাবী তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের অনেক স্থলেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। বহুসংখ্যক আদর্শনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বদেশভক্ত জার্ম্মাণ যুবা "জার্ম্মাণিকে দখল" করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক।

হিট্‌লার জার্ম্মাণির "সবে ধন নীলমণি" নন। হিট্‌লারের আগে, পরে, পাশে, সম্মুখে অগণিত নরনারীকে জার্ম্মাণির ইজ্জৎ রক্ষার জন্য দৃঢ়-